অযুত বিস্ময়ের মধ্যে সে কাহাকে লইয়া মাথা ঘামাইবে? কাহাকে পরীক্ষা করিবে সে? কাহার তত্ত্ব নিরূপণ করিবে? matterএর একটা সামান্য কণাকে লইয়া বিজ্ঞান যুগান্তর কাটাইল, আরো কাটাইতে পারে,—বিরাট বস্তু-বিস্তারের অন্তহীন রহস্যকে সে কবে উদ্ঘাটন করিবে?

যাক্, এখন শুধু matterএর গবেষণায় বিজ্ঞান কোথায় আসিয়া পৌঁছিল, তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

যুগযুগান্তর হইতে atomকে বিশ্লেষণ করিয়া করিয়া, mole, moleculeকে ছাড়াইয়া বিজ্ঞান যেদিন matterকে আবিষ্কার করিল, সেদিন সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, যাক্, এতদিনে matterকে চেনা গেল! এতদিন যে দোড়দৌড় করাইয়া লইয়া বেড়াইয়াছে, আজ তাহার গোড়ার ঘরে আসিয়া তাহাকে ধরা গেল।

কিন্তু হায়, ১৯১১ সালে Rutherford যে সমস্ত পণ্ড করিলেন! সমস্ত বিজ্ঞানের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সেই Democritus এর যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত অতীত ও বর্ত্তমান কালের সবার চাইতে সাংঘাতিক, সর্ব্বনাশা বিপর্য্যয় তিনি ঘটাইলেন; বিজ্ঞানের রাজ্যে একটা আজব প্রলয় ঘটিয়া গেল। তিনি কোথা হইতে electron নামক অপূর্ব্ব চীজকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন—যাহা ভাবা যায় নাই, কল্পনাও করা যায় নাই।

Atom তো অতি স্থূল ব্যাপার। এতদিন সে ছিল ঠাসা, কঠিন, Billiard ball— আজ Rutherford আসিয়া বলিলেন, atom অতি স্থূল, জড়—as porous as the solar system, তিনি atom কে বিশ্লেষণ করিয়া, dissolve করিয়া আবিষ্কার করিলেন, কতকগুলি tiny specks floating in void। হায়রে! atom এর ভিতরেও তেমনি আবার void! তার বুকের ভিতরেও আবার মহাশূন্যের বিস্তার! সীমাহীন আকাশে যেমন সূর্য্য চন্দ্র তারা নৃত্য করিতেছে, atom হইল একটা বিপুল সৌর [illegible] system—তার ভিতরেও তেমনি void এর মাঝে শূন্য ভরিয়া নৃত্য-চপল অগণ্য e[illegible] [illegible] বেড়াইতেছে।

Eddington বলিতেছেন: "The revelation by modern physics of the void within the atom is more [illegible] than the revelation by astronomy of the immense void of interstellar space." (The nature of the physical world, 1927. Gifford Lectures).

বিলিয়ার্ড-বল শ্রেণীর atom এর বদলে আসিল solar system ধরণের atom, যাহাকে আমরা স্থির, অচল ও সূক্ষ্ম কণিকামাত্র মনে করিয়া আসিয়াছি, সে আসলে স্থিরও নয়, অচলও নয়; সে সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর; সূক্ষ্মতর হইতেও সূক্ষ্মতম: সে একক, অবিচ্ছিন্ন নয়; সে জটীল ও বিচিত্র এবং একাধিক আলাদা ও স্বাধীন সত্ত্বার সমবায়। একটি atom অনেকগুলি বৈদ্যুতিক সত্ত্বার সমষ্টি। কেন্দ্রগত একটা স্বত্ত্বা বা পুঞ্জকে (nucleus) ঘিরিয়া এক বা একাধিক electron অবিশ্রান্ত আবর্ত্তিত হইতেছে; nucleus রহিয়াছে একেবারে অন্তর্লোকে, গুহাস্থিত, গভীর

নিরালায়—সকলের কেন্দ্রমণি ; আর তাহাকে চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছে electron এর দল। এই electronদের পরিক্রমণের গতি চমকপ্রদ, তাদের অন্তর্গত শক্তি অপরিসীম, আশ্চর্য্য। যাহা এতদিন মনে হইত শান্ত, স্থির, সেখানে আজ দেখা দিয়াছে অশান্ত তাণ্ডব, প্রচণ্ড আলোড়ন। যাহা এতদিন প্রতিভাত হইয়াছে একান্ত অচল, আজ সেখানে আবিষ্কার হইয়াছে গতির টর্ণেডো, চঞ্চলতার ঝড়।

কিন্তু এই যে electron,—এ কি ? এ প্রশ্নের জবাব বিজ্ঞান দেয় নাই, দিবে না। সে বলে, এ কি, তাহা জানি না ; এ আছে, তাহা জানি। কিন্তু কি ইহার স্বরূপ, কি ইহার প্রকৃতি, কোথায় ইহার আদি, কেমন ইহার বিকাশ—এ সব অজ্ঞাত, অনাবিষ্কৃত। একে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না—শুধু পাওয়া যায় আভাসে। Eddington বলেন,

"To a request to explain what electron really is supposed to be, we can only answer, "It is part of the A B C of physics." (Nature of the physical world).

অর্থাৎ electron যে কি বস্তু, সঠিক বলা শক্ত। বরং আরো ঠিক করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, ইলেকট্রন "বস্তু"ই নয়। "বস্তু" বলিতে আমরা বুঝি, তাহার রূপ আছে, তাহাকে দেখা যায়, ছোঁয়া যায়, ইন্দ্রিয়ের এক্তিয়ারে আনিয়া অনুভূতির সামিল করা যায়। তার সম্বন্ধে দুর্ব্বোধ্যতা নাই, সে স্পষ্ট দিবালোকের মত সুব্যক্ত, সুসীম জিনিষ। জড় "বস্তু" অর্থাৎ যাহাকে বলি Thing সে আমাদের অতি পরিচিত, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অতি অসন্দিগ্ধ, একান্ত নিরেট, অতি substantial অনুভূতি। Whitehead এর ভাষায় বলা যায়, "বস্তু"র "pushiness" আছে, কিন্তু electron বস্তু নয়।

রাসেল বলেন, "The electron ceases altogether to have the properties of "thing" as conceived by common sense ; it is merely a region from which energy may radiate."

এক কথায়, matter আর নাই ; matter চিরদিনের তরে বাষ্প হইয়া উড়িয়া গিয়াছে ; তার জায়গায় আছে শুধু কতকগুলো regions of radiation. রাসেল তাঁর অনুপম ভঙ্গীতে রহস্য করিয়া বলেন, ভূতের গল্পে আছে, যে-সব ঘরে ভূতের অদৃশ্য আনাগোনা হয়, সেই ঘরের আবহাওয়া একটা অননুভূত অস্তিত্বের ছোঁয়াচ লাগিয়া ছমছম্ করে ; ধরা ছোঁয়া যায় এমন কিছুই নাই ; নিছক অনস্তিত্বে ঘর পূর্ণ হইয়া আছে ; কিছুই নাই, তবু যেন কিসের অশরীরি আভাসে সমস্ত ঘর স্পর্শময় হইয়া আছে। Electronও সেই বাক্যাতীত, অশরীরি আভাসমাত্র ; স্পর্শময় আবহাওয়ার মত কেবল ইঙ্গিত বিকীরণ করে। "Influences that characterise haunted rooms in ghost stories." কাজেই atom গিয়াছে, matter ও গিয়াছে ; এবং তার জায়গায় আছে ইলেকট্রন। এ ইলেকট্রনও যে কী পদার্থ, তাহাও অনির্ণেয় ও অবাচ্য। রাসেল কাজেই

রামর্শ দিয়াছেন, "We should do better to think of it as like a ghost, which has no "pushiness" and yet can make you fly" (Outline of philosophy).

অতএব দেখা যাইতেছে, বিজ্ঞান যেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, সেখানে ধোঁয়ার রাজ্য। তবে কি বিজ্ঞানও mysticismএ আসিয়া উপস্থিত হইল? আমরা তো আধ্যাত্মিকতাকে বরাবর ধোঁয়াটে বলিয়া গালাগালি দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আজ দেখিতেছি, বিজ্ঞান ও আমাদের চিরদিনের দেখা-শুনা-জানা প্রত্যক্ষ concrete জগৎকে ছাড়িয়া রহস্যের সমুদ্রে একেবারে গলাজল তক্ নামিয়া দাঁড়াইয়াছে। উনিশ শতক ভরিয়া বিজ্ঞান যে নিশ্চিত আত্মবিশ্বাস ও পরিতৃপ্তির গাঁথুনী তৈয়ার করিয়া উঠাইয়াছিল, আজ সেখানে ভাঙ্গন ধরিবার উপক্রম হইল। বিজ্ঞানের রাজ্যে একটা নতুন ধরণের বড় বিপ্লব—একটা সর্ব্বনাশা ফরাসীবিপ্লব ঘটিয়া গেল। Rutherford এ বিপ্লবের প্রবর্ত্তন করিলেন কিন্তু এ নবাগত বিপর্য্যয়ের শেষ কোথায় যাইয়া হইবে তাহা আজো অজ্ঞাত। বিজ্ঞানের মহলে মহলে আজ তুফানের ঝাপ্টা লাগিয়াছে ; প্রশ্ন ও সংশয় আজ উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে : বিতর্ক ও সংঘাত আজ উত্তাল হইয়া জীবনকে উতরোল করিয়া তুলিয়াছে। "Rutherford is the real villain of the piece" কিন্তু ইহাই শেষ নয়।

ইতিমধ্যেই Minkowski ও Einstien এর আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ১৯০৫ হইতে ১৯০৮র মধ্যেই তাঁহারা আমাদের চিরপরিচিত time ও space কে একেবারে ঘোলাইয়া দিয়াছেন। বিশেষ করিয়া আইনষ্টাইনের আবির্ভাব বিজ্ঞানজগতে আর একটা খণ্ড প্রলয়ের সূচনা করিল। একদিকে Rutherford Atom অন্যদিকে Einstein এর Relativity— এই দুইটা বিপ্লবাত্মক ঘটনারই প্রকৃতি ও পরিণতি একই রকমের : তাদের গতি ও প্রভাব একই পথে মানুষের জগৎকে উদ্বর্ত্তিত করিয়াছে। আমাদের সমস্ত পূর্ব্বাবর জ্ঞানকে, চিন্তাকে, গণনাকে ইহারা ভাঙ্গিয়া, চূরিয়া, বিধ্বস্ত করিয়া নূতন পথে অভিনব প্রণালীতে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। Einstein এর Relativityও "বস্তু"কে,—জড় জগৎকে—সমস্ত কঠিন ও দৃঢ় concrete কে—অদৃশ্য, অননুভূত নিরাকারে মিলাইয়া দিয়াছে। রাসেল বলেন, "...The theory of relativity leads to a similar destruction of the solidity of matter by a different line of argument."

আজ আমাদের অসোয়াস্তির সীমা নাই। আমাদের এই কঠিন, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, ভরাট, নিরেট, মাটীপাথরের পৃথিবী,—আমাদের চিরদিনের এই নিঃসংশয়, সন্দেহাতীত অভ্যস্ত, অবিসংবাদিত চন্দ্র-সূর্য্য,—আমাদের উপভোগ্য লতাফুলপল্লব, আমাদের ব্যবহার্য্য টেবিল-চেয়ার-খাট,—আমাদের দাঁড়াইবার ভূমি, আশ্রয়ের ঘর,—এককথায় আমাদের সমস্ত জীবন, আমাদের সবকিছু আজ আমাদের সন্দেহের বিষয়, প্রশ্নের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; আমাদের অনুভূতি কি, আমাদের অনুভূত বস্তুনিচয় কি, আজ ঠিক করিয়া, নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। কাজেই বৈজ্ঞানিক জগতে আজ কলরব সুরু হইয়াছে, এ আমরা কোথায় আসিলাম ! আইনষ্টাইন এ কী করিলেন !

পরিচিত, অভ্যস্ত পরিধিকে ছাড়াইয়া আজ আমাদের বিজ্ঞান আমাদিগকে এ কোন মায়ালোকে লইয়া আসিল ? Einstein তাঁর relativityর মায়া-দণ্ড দিয়া আজ বিজ্ঞান-জগতে যাদুবিদ্যার সৃজন করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক-সমাজ আজ দুইহাতে চক্ষু রগড়াইয়া বলিতেছেন, এ কী দেখিতেছি! Whitehead বলিতেছেন, "Under the recent influence of relativity there has been a tendency towards subjectivist formation." (Science and the Modern World).

জগৎকে দেখিবার, বুঝিবার জন্য আজ আর আগেকার মাপকাঠীতে চলিবে না। নূতন যাদু-কাঠীতে আজ দুনিয়ার সবকিছুকে ওজন করিতে হইবে। সে কাঠী আমদানী করিয়াছেন আইনষ্টাইন সাধারণ দৃষ্টিতে জগতের কাজকর্ম্ম তেমনই চলিয়াছে ; প্রকৃত লোকের চোখে বিশ্ব-সংসার তেমনি নিরেট, তেমনি ভারবান, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময় বাস্তবরূপে দেখা দিতেছে ; নিত্য নূতন ঘটনাস্রোত তেমনি বহিয়া চলিয়াছে, যেমন আগে চলিত ; ভাঙ্গন-গড়নের বৈচিত্র্য তেমনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জানেন, সব কিছুর উপর দিয়া প্রলয়ের ঝড় বহিয়া গিয়াছে ; কিছুদিন আগেকার জগৎ আর নাই ; ছোট বড় সকল ঘটনা আজ নূতন মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে ; পুরান পৃথিবীকে ছাড়াইয়া আমরা নতুন লোকে উত্তীর্ণ হইয়াছি।

Eddington বলিতেছেন, "The change in the underlying conceptions is radical. We have travelled far from the old standpoint which demanded mechanical models of everything in Nature seeing that we do not now admit even a definite unique distance between two points. The relativity of current scheme of physics invites us to search deeper and find the absolute scheme underlying it so that we may see the world in a truer perspective." (Nature of the physical world).

Relativity র যাদুতে আজ আমাদের সনাতন দেশ ও কাল (time ও space) একান্ত illusory হইয়া দেখা দিয়াছে ; একটী point হইতে অন্য একটী point পর্য্যন্ত দূরত্বও আজ absolute নয়,—relative.

আমরা যে দৃশ্যমান জগতের অনুভূতি দিনরাত পাইতেছি, যাহার উপর আমাদের দিনরাত্রির সকল অনুষ্ঠান, অন্তর-বাহিরের সকল প্রয়াস দাঁড়াইয়া আছে,—তবে সে কি শুধুই মিথ্যা ? আমাদের চিরদিনের পরিচিত বর্ণ-শব্দ-রূপ-স্পর্শ সবই কি আজ বৈজ্ঞানিকের যাদুতে মিথ্যা বলিতে হইবে ? বিজ্ঞান বলে, "হাঁ, মিথ্যা। তুমি যে টেবিলটা দেখিতেছ, কাজে লাগাইতেছ, তাহার আকার প্রকার তুমি যেমনটী দেখ, তেমনটী মোটেও নয়। তোমার টেবিলটী আগাগোড়া শূন্যতায় (empty space) ভরা—এবং এই শূন্যতার বুক ভরিয়া অগণিত electric charge প্রবল বেগে ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতেছে। তোমার টেবিলকে ওজন করিয়া যে weight পাইবে, সত্যিকার ওজন তাহার এক

billion এরও একভাগ মাত্র। তুমি যাহা দেখ, অনুভব কর, তাহা সবই illusion, মায়া ও অসত্য আরোপ। তুমি যাহা দেখ তাহা সত্যি সত্যিই কিছু নাই ; আর যাহা সত্যি সত্যি আছে, তাহা তুমি মোটেও দেখনা, জানো না।" এখন দেখুন, বিজ্ঞান আমার আপনার এত কাজের টেবিলটার কিছুই রাখিল না,—কেবল খানিকটা ধোঁয়াটে দুর্ব্বোধ্যতা ছাড়া। কিন্তু উপায় নাই। এ যে বুদ্ধির নিকষে কষিয়া দেখা সত্য! বিজ্ঞান বলে আমাদের সমস্ত জ্ঞান symbolic. আমরা কতকগুলি symbol এর সহায়ে আমাদের ধারণাকে সূত্রে গাঁথিয়া তাহাকে "জ্ঞান" আখ্যা দিই। সত্যিকার আড়ালের বস্তুটীকে আমরা না পারি ধরিতে, না পারি ছুঁইতে। সত্যিকার বস্তুটীর স্বরূপ সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিলে, challenge করিলে, আমরা জবাব দিতে পারি না।

এডিংটন তাহার বিখ্যাত বইখানাতে (The Nature of the physical world) বহু-আলোচিত "হাতী-গড়ানোর" দৃষ্টান্তটি লইয়া বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়াছেন। ধরুন, একটা হাতী পাহাড়ের সবুজ গায়ের উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে; বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে হাতী-পদার্থটী অদৃশ্য হইয়া মিলাইয়া যাইবে। তাহার বদলে থাকিবে কি? বৈজ্ঞানিকের কাছে slope এর মানে নাই,—আছে কেবল ৬০ ডিগ্রি। ললিত কোমল ঘাসের মূল্য তাহার কাছে কেবল coefficient of friction হিসাবে। ঘাসের ধূসর বর্ণটি আর কিছুই নয়, শুধু কতকগুলা wavelengths of light, যাহা photo-meter এ ধরা পড়িয়াছে। সুতরাং "The poetry fades out of the problem and we are left only with pointer-readings." বর্ণ, গন্ধ, রূপ সব মিলাইয়া গেল, থাকিল কেবল pointer-readings. কতকগুলি আবছা ইঙ্গিত, অস্পষ্ট ইসারা। কিন্তু সকল ইসারার ওপারে, সব ইঙ্গিতের অন্তরালে আসল হাতী পদার্থটি কি? জবাব হইবে ইলেক্‌ট্রন। কিন্তু ইলেকট্রন কি? তার জবাব নাই।" "The answer will not be a description in terms of billiard balls or fly-wheels, or anything concrete, he will point, instead to a number of symbols, and a set of mathematical equations, which they satisfy." (Science and the unseen world).

যদি জিজ্ঞাসা করি symbol গুলি কিসের symbol? পিছনের বস্তুটী কি যাহাকে তুমি symbol এ ধরিয়া দিলে? "The mysterious reply is given that physics is indifferent to that ; it has no means of probing beneath the symbolism. To understand the phenomena of the physical world it is necessary to know the equations which the symbols obey but not the nature of that which is being symbolised." (Science and the unseen world)

আজ আর বিজ্ঞানের জগতে কঠিন স্থূলত্ব বলিয়া কিছু নাই, concreteness বলিয়া কিছু

নাই। দৃশ্যমান কঠিন জগৎ আজ আসিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে আড়ালে অনুস্যূত এক রহস্যময় সত্তায়।

ফলে কি দাঁড়াইল? দাঁড়াইল এই যে এতদিনকার বিজ্ঞানের materialism আজ ধূলিসাৎ হইয়া গেল। এডিংটন স্বীকার করিতেছেন যে, "Materialism, in its literal sense. is long since dead."

এখন দেখা যাক্, পৃথিবীর সব চাইতে বড় সমস্যা, সব চাইতে দুর্জ্ঞেয় প্রশ্ন সম্বন্ধে—অর্থাৎ মানুষের চৈতন্য, মানুষের মনোজগৎ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক কি বলেন!

Brain এর সঙ্গে চিন্তা ও চৈতন্যের সম্পর্ক কি? Scientific Materialism বলিবে,—"The dance of atoms in the brain really constitutes the thought, that in our search for reality we should replace the thinking mind by a system of physical objects and forces and that by so doing we strip away an illusory part of our experience." (Science and the unseen world)

আধুনিক যুগে যে জড়বাদ মানুষের মনে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে তাহার গর্ব্ব, সে Science এর উপর তাহার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। এ জড়বাদ তাই Scientific Materialism. কিন্তু Science আজ সুর হুবহু বদলাইয়া ফেলিয়াছে; matter এর অস্তিত্বকে সমূলে দূর করিয়া দিয়াছে এবং তার পরিবর্ত্তে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে এক দুর্জ্ঞেয় জগৎকে। Materialism এ জগৎ হইতে যায় নাই, এবং একথা সত্য যে বহু লোক আজো materialism এর জয়গান করিতেছে; কিন্তু materialism আজ আর scientific নাই, কারণ বিজ্ঞানের letters patent বা ছাড়পত্র তাহার কাছ হইতে কাড়িয়া লইয়া আজ Idealism কে দেওয়া হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

অমৃতের সন্ধানে

তড়িৎকুমার ঘোষ

......হু...হু...কোরে যেই বন্দী 'বেদনা'
যুগ যুগ ধরে কাঁদে
গোপন-হৃদয়-রন্ধ্রে...
তীব্র অভাব রুদ্র আঘাতে
জর্জর করি' কহে
যে বাণী ব্যাকুল-মন্দ্রে—
বুঝিয়াছ তার কিছু ?—
ওরে ও ক্লান্ত,
খেয়ালী পান্থ !
ক্ষত বিক্ষত কামনা সে তোর ছুটিয়াছে কার পিছু ?
বুঝিয়াছ তার কিছু ?......

আপন রক্তে পূজিয়াছ শুধু তুচ্ছ "আপন" টারে,
প্রকৃত 'আপন' কাঁদিয়া ফিরেছে হায়—
ক্ষতের জ্বালাতে, কুতূহল-কারাগার
......"জ্বলে গ্যালো !.........প্রাণ যায় !"...
হয়তো জাগিয়া কয়েছ কখনো কাঁদি' !
মাতালের সম 'চাওয়ার' নেশাতে মাতি'—
আবার আবার, আবার ছুটেছ, মরু-পথ ধরি' মরিচিকা ওই চেয়ে' !
কামনার পর কামনা এসেছে ধেয়ে !!
লক্ষ "চাওয়ার" বুকে বসিয়েছে লক্ষ "চাওয়া"সে ছুরি,—
ফুল না ফুটিতে অকালে মায়ার ঝড়েতে এমনি
ঝরেছে হাজার কুঁড়ি !!

চিৎকার করি' তবুও কয়েছ...কয়েছ তো কতবার......
—"চাই, চাই, আমি চাই !"—
বিশ্ব'-আকাশ বাতাস কভুও না পেলো নাগাল তার !
(শুধু) রেখে গ্যালো মুঠো ছাই—
—'কী যে চাও'—তা'র নিখোঁজ-বেদনা-বহ্নি
মরণোন্মুখ 'বাধন-গণ্ডি' মাঝে !
হায় তবু' এই অবিরাম 'চাওয়া' তৃষিত ধ্বনিতে বাজে !!

ওরে ও খেয়ালী ! চলিয়াছ কোথা ?—
...একি খেয়ালের ঝোঁক !—
কোটি মরণের অভিশাপে আজো
পড়িল না হায় চোখ !...
জীবন চাহিয়া শেষে......
মায়ার কুহকে ভুলিয়া চলিলি
মৃত্যুর বানে ভেসে !—
কুরূপে বসালি রাজার আসনে
স্বরূপ পালালো কাঁদি,
রূপের বিকট নেশায় নিভা'লি
রূপের-রূপালী বাতি !

...চোখ নাহি চলে !...তীব্র আঁধার...
হাসিয়া উঠিল হায়রে বিকট হাসি !—
পড়ে গেলি পাকে হাজার ধাঁধাঁর,...
জীবন হোলোরে জীবনের গলে জীবন্ত এক ফাঁসী !!
ওরে পথ ভোলা ! ফিরে চল, আজ চল...
বাহির খুঁজিয়া পচা মরণের মূল্য কি তাই বল ?

আপনার মাঝে আপনি ফিরিয়া
ভাঙ ভাঙ ভাঙ, ভাঙ মোহ-কারাগার—
এতদিন যাঁরে বেড়ালি খুঁজিয়া
মেলে কিনা দেখ—'সত্য ঠিকানা তার'—!

দুর্ব্বল তুমি!—কে বলে পাগল?—
কে বলেরে তোকে ক্ষুদ্র?...
আপনার পানে চেয়ে দেখ ওরে,—রুদ্রের ছেলে রুদ্র!
—তুমিও 'অগ্নি-কণা'—
"আপন" হইতে আপনি খসেছ,
ওরে ও' অন্যমনা!.......
কামনা তোমার খুঁজিয়া খুঁজিয়া যাকে
পিচ্ছিল পথে, পড়িল লক্ষ পাকে,
যে) আর কেহ নয়, আর কেহ নয় সে যে—
আপন বড়ো' সে-তোমারই "তুমি," ওরে!
বিশ্ব-ব্যাপিয়া 'চরণ-নূপুর' উঠিছে যাহার বেজে'—
গভীর-'চাওয়ার' সোরে!!......*

* এই কবিতাখানি বেদান্ত সোসাইটী সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত।

বাংলার রেনেঁসাসত্রয়

জয়ন্ত গুপ্ত

একটা জাতি জন্ম নেয়, লুপ্ত হয়ে যায় অনেক কারণে। বৈজ্ঞানিকদের মতে এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে এবং সে বিরোধ আজো ক্ষান্ত হয়নি। পৃথিবীতে বহু জাতির উদ্ভব হয়েছে; বহু জাতি সভ্যতার ভাণ্ডারে সমৃদ্ধি দান করেছে; বহু জাতি আবার নিরর্থক জীবন যাপন ক'রে যুগের পর যুগ কাটিয়ে দিয়েছে। আজো এমন অনেক জাতি রয়েছে যারা সভ্যতার দরবারে কোনো ভেট নিয়ে উপস্থিত হয়নি। আমরা তাদের 'অসভ্য' ব'লে আজো নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে থাকি। জীবন-সংগ্রামে এরা বাঁচতে পারছে না, এদের সংখ্যা ক্রমে বিরল হ'য়ে আসছে। এ ছাড়া বহু জাতি একদিন ছিলো, যাদের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে, যাদের নাম আছে ইতিহাসের পাতায় কিন্তু যাদের চিহ্ন নেই বাস্তব জগতে। প্রাচীন গ্রীক নেই; প্রাচীন রোমান জাত নেই; আসীরীয় নেই; ব্যাবিলোনীয় নেই; প্রাচীন মিশরীয় জাত আজ নিঃশেষে বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে।

স্বভাবতঃই এ নিয়ে মানুষের মন ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে; স্বভাবতঃই মানুষ চিন্তিত হয়ে ওঠে, কেন এই বিলুপ্তি, কেন এই ক্ষণিক দীপ্তির পরে অনিবার্য্য বিস্মৃতি! পণ্ডিতেরা সভ্যতার উত্থান নিয়ে, পতন নিয়ে, জন্ম নিয়ে, মৃত্যু নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিকে কর্ষণ ক'রে থাকেন। ফলে বহুবিধ মতবাদের ফসল ফলেছে সভ্যতার জন্ম-তত্ত্ব-নিয়ে, মৃত্যু-তত্ত্ব নিয়ে। ফসল যেমন ফলেছে, আগাছার সৃষ্টিও তেমনি হয়েছে। এই মতবাদের অরণ্যে প্রবেশ ক'রে লাভ নেই। কেবল এই তত্ত্বটুকুকে বেছে নিলেই চলবে যে একটা জাতির জীবনের ছন্দ রয়েছে; রয়েছে তার জীবনের বিচিত্র গতি। এবং এই ছন্দের একটানা গতিতে ব্যতিক্রম ঘটে, যখনি একটা জাতি অপর জাতির সঙ্গে মুখোমুখি হয়। জাতির সঙ্গে জাতির যখন মুখোমুখি হয়, তখন হয় ঘটে লড়াই ও সংঘর্ষ, নয়তো ঘটে মিতালী ও সহযোগিত্ব। কিন্তু শত্রুভাবেই হোক্, মিত্রভাবেই হোক্, পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের ঘটে যায় একটা নিবিড় সান্নিধ্য। একে অপরকে করে স্পর্শ। এই স্পর্শ ঘটে দেহ দিয়ে, মন দিয়ে। একের সঙ্গে অপরের হয় সংযোগ এবং এই সংযোগ থেকে জন্ম নেয় নতুন আবির্ভাব। বিভিন্ন দেহের সংযোগে যেমন জন্ম নেয় নবতর দেহ, তেমনি জাত হয় নবতর মানসিকতা বিভিন্ন মনন-রীতির যোগাযোগ থেকে। পৃথিবীর ইতিহাসে বার বার ঘটেছে এই বিভিন্নের সান্নিধ্য ও সংযোগ; বার বার ঘটেছে নতুন জাতি ও নতুন কৃষ্টির উদ্ভব।

যারা দেহকে বড়ো মূল্য দিয়ে থাকেন তারা বলে থাকেন, ইতিহাসে জাতির সঙ্গে জাতির দৈহিক মিশ্রনই মানব-সভ্যতার বড়ো ঘটনা, তাদের কাছে, পৃথিবীর ইতিহাস হলো রক্তের বা বংশের ইতিহাস। সভ্যতার মৃত্যু ঘটে নতুন রক্তের অভাবে। বিভিন্ন রক্তের ছোঁওয়া চাই

বারম্বার জাতির জীবনে। তবেই সেই স্পর্শ থেকে জন্ম নেবে নবতম প্রাণ ও নতুন ওজস্বিতা। রক্তের মিশ্রণ থেকে ঘটে নবজন্ম জাতির জীবনে। সভ্যতার কল্যাণের জন্য এই দ্বিজত্বের পুনঃ পুনঃ প্রয়োজন ঘটে। যে জাতির রক্তে পড়েনি অপরের রক্তের ছোঁয়া, তার জীবন চলতে থাকে একই একঘেয়ে, একটানা ছন্দে; পরে একদিন প্রাণ-শক্তি নিঃশেষ হয়ে ছন্দ যায় থেমে, গতি হয় স্তব্ধ। মরণ আসে অব্যর্থ নীতিতে। এরা মিশ্রণের পক্ষপাতী।

দ্বিতীয় দল আছেন যারা রক্ত-ধারার একটানা, একঘেয়ে ছন্দকেই মনে করেন বরণীয়। এরা বলেন, রক্তের বিশুদ্ধিই প্রাণ-শক্তিকে পোষণ করে, বাঁচিয়ে রাখে। বিভিন্ন রক্তের ছোঁয়ায় রক্ত হয় অশুদ্ধ এবং অশুদ্ধ রক্তের সৃজনী প্রতিভা ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হ'তে হ'তে একদিন ক্ষয় হ'য়ে যায়। জাতি হ'য়ে পড়ে জীর্ণ ও স্থবীর। এই রক্ত-বিশুদ্ধি বা Racial Purismএর ধ্বজা আজ জগতময় এক দল উড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। এদের নাম ফ্যাসিস্ত ; এদের জাতিতত্ত্বের সংকীর্ণতা থেকেই জন্ম নিয়েছে সংকীর্ণ জাতীয়তার পরস্পরের রক্তারক্তি ও রোখারুখি।

এই দুই দলই হলো দেহ-বাদী। এরা মানুষের রক্তকেই মনে করেন সভ্যতার মূল উপাদান। সভ্যতা হলো এঁদের কাছে রক্তের ইতিহাস, বংশের কাহিনী। দেহ থেকে, রক্ত থেকেই জন্ম নেয় কৃষ্টি বা মানব-সভ্যতা। এরা ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেন Race বা বংশ-তত্ত্ব দিয়ে। এরা ছাড়া অপর দল রয়েছে যারা দেহকে প্রাধান্য না দিয়ে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন মনকে। সভ্যতা হলো মানুষের মনের ইতিহাস : মানুষ যখন মানুষের সামনে মুখোমুখী দাঁড়ায় তখন একের মনকে স্পর্শ করে অপরের মন। একের আলোক-পাতে অপরের মন হয় আলোকিত এবং এমনি করে জাতির সান্নিধ্যে সভ্যতার প্রভা ছড়িয়ে পড়ে দূরে দূরান্তে। দৈহিক মিশ্রণ না হলেও মানসিক সঙ্গম ঘটে যায় জাতির সঙ্গে জাতির এবং তারই ফলে পৃথিবীতে একের কৃষ্টি বাহিত হয়ে আসে অপরের জীবনে। এমনি করে ঘটে সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন ব্যাপ্তি বা Diffusion. Cultural Diffusion আজকার সভ্যতার সব চাইতে বড়ো কথা।

দেহের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ যে কী এ নিয়ে আজকাল আলোচনা ও বিতর্ক চলেছে। বিজ্ঞান আজোও রয়েছে শিশু অবস্থায় ; বিশেষ ক'রে প্রাণ-বিজ্ঞান (Biology), মনো-বিজ্ঞান (Psychology) এবং জনন-বিজ্ঞান (Genetics) আজো অনিশ্চয়তার রাজ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। বংশবাদীরা (Racialist) যেমন অকাট্য নন, তেমনি ব্যাপ্তি-বাদীরাও (Diffusionist) দাবী করতে পারেন না অকাট্যতা। এরা উভয়েই সভ্যতার এক এক দিকের ওপরে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়ে একপেশে হয়ে উঠেছেন এবং কারুর মতবাদই "সম্পূর্ণ সত্যের" (whole truth) পর্য্যায়ে স্থান পেতে পারে না। ব্যক্তির যেমন দেহ ও মন দুইই প্রধান, তেমনি জাতিরও জীবনে দেহ ও মন দুয়েরই প্রাধান্য রয়েছে। একটা জাতির সঙ্গে যখন অপর জাতির সান্নিধ্য ঘটে, তখন একের দেহ ও মন দুইই অপরের দেহ ও মন উভয়কেই প্রভাবিত করে থাকে। পরস্পরের দৈহিক সংযোগে যেমন নতুন জাতি নবতর দৈহিক সম্পদ নিয়ে উদ্ভূত হয়, তেমনি পরস্পরের মানসিক

সঙ্গতির থেকে নবতর মানসিক সমৃদ্ধিও জন্ম নেয়। কৃষ্টির সংযোগে নতুন কৃষ্টি ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসে জাতির সঙ্গে জাতির মিশ্রন যেমন ঘটেছে কৃষ্টির সঙ্গে কৃষ্টির মিলনও তেমনি ঘটেছে বারবার।

আমাদের ভারতবর্ষে, তথা বাংলা দেশে বহু বিভিন্ন স্রোতোধারার সঙ্গম ঘটেছে। বহু প্রণালীতে বহুতর সমৃদ্ধি বয়ে এসে এখানে বার বার নব নব সমৃদ্ধি ও সঙ্গতির আবির্ভাব হয়েছে। কতো রকম বেরকমের দেহ নিয়ে কতো বিবিধ জাতি এসে মিশ্রিত হয়েছে; কতো রক্ত কতো ধারায় এসে এখানে আবর্তের সৃজন করেছে। বাংলা দেশ ভারতবর্ষে সব চাইতে বড়ো মিশ্রনের ক্ষেত্র। বাঙ্গালী জাতি ভারতের সকল জাতির চাইতে জটিলতর মিশ্র-জাতি। এক সময়ে 'আর্য্যামী' নিয়ে বিতর্ক উঠেছিল আমাদের মধ্যে এবং আমরা 'আর্য্যামীর' গৌরব নিয়ে মাতামাতিও করেছি অনেক। কিন্তু আজ নৃতত্ত্ববিদ্যার নব নব গবেষণার ফলে আমাদের সেই ভিত্তিহীন গর্ব্ববোধ ক্ষান্ত হয়েছে এবং নিতান্ত অজ্ঞ ছাড়া কোনো ওয়াকীব-হাল ব্যক্তিই সে অহমিকা আর পোষণ করেন না বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। Risleyর মতানুসারে বাঙ্গালী "Mongolo-Dravidian"ই হৌক, কিংবা অপরের মতানুযায়ী Western-Munda-Mongoloid"ই হৌক, বাঙ্গালীর রক্তে যে অগণিত রক্তধারা মিশেছে এ নিয়ে আজ মতদ্বৈধতা নেই। খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ শতকের আগে বাংলায় আর্য্যজাতি এসে পৌঁছায়নি; খৃষ্টের চার পাচ শ' বছর আগে থেকে বাংলায় আর্য্য-রা যাতায়াত সুরু করেছে। এর আগে এখানে ছিলো অনার্য্য আদিম জাতি। তারপরে পর পর বহু জাতি এসে এখানে হারিয়ে গেছে যুগে যুগে। বিচিত্র মিশ্রণের থেকে উদ্ভব হয়েছে বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতির। কাজেই আর যে ভ্রান্তিই বাঙ্গালীর থাকুক জাতিগত রক্তবিশুদ্ধির (Racial Purity) ভ্রান্ত অহমিকা যেন বাঙ্গালী না পোষণ করে।

তারপরে আসে কৃষ্টির কথা। বহু জাতি বয়ে এনেছে বহুতর কৃষ্টিকে। নানা পথে নানা মনো-ধারা, বিবিধ মনন-প্রণালী ও সংস্কৃতি এসে এখানে বৃহৎ সম্মেলনের সৃষ্টি করেছে। বার বার কৃষ্টিগত জীবনে তাই উঠেছে বহু আবর্ত্ত, নানা আলোড়ন সৃষ্ট হয়েছে নানা তরঙ্গের আঘাতে। একঘেয়ে দিন যাপনের অবসাদে জাতি বহুবার পড়েছে ঘুমিয়ে; প্রাণশক্তি স্তিমিত হয়ে উঠেছে, জড়ত্বের তন্দ্রা এসেছে দুচোখে ছেয়ে; নতুন স্রোতের অভাবে পঙ্কিল হয়ে উঠেছে জীবন-ধারা। এমন সময়ে বহুবার বাহির থেকে সগর্জ্জনে এসে পড়েছে বন্যার মতো নতুন স্রোত: অবসাদ গেছে ঘুচে, ঘুম গেছে ভেঙ্গে; নতুন উৎসাহের কলরোল উঠেছে দিকে দিকে, জাগ্রত চেতনা আবার নতুন সৃজনের পথে প্রবাহিত হয়েছে। পূর্ব্ব প্রচলিত কৃষ্টি যখন আবদ্ধ জলের মতো দূষিত হয়ে উঠেছে, নতুন কৃষ্টি বাহির থেকে সৃজন করেছে উন্মত্ত বিক্ষেপ; নবতর সংস্কৃতি জন্ম নিয়েছে সুতীক্ষ্ণ বেদনার মধ্য থেকে।

বাংলায় দৈহিক মিশ্রণ হয়েছে এবং তার ফলে দেহগত ও কৃষ্টিগত পরিবর্ত্তনও ঘটেছে; কারণ দেহের সঙ্গে মনের যোগ রয়েছে এবং দৈহিক সান্নিধ্য থেকে মানসিক নৈকট্যও ঘটে থাকে।

তাছাড়া 'দৈহিক' থেকে 'মানসিক' কতোটুকু, কী পরিমাণ বিবর্ত্তিত হয়, সে তত্ত্ব জনন-তত্ত্ব (genetics) আজো সঠিক বলতে না পারলেও একথা নিশ্চিত যে দেহতত্ত্ব দ্বারা মনস্তত্ত্ব খানিকটা প্রভাবিত হয়েই থাকে। আধুনিক Chromosome Theoryতে মানসিক মতিগতির ও রীতি-নীতির হদিস পাওয়া যায় না; কিন্তু তবু দেহ মনের সর্ব্ব-স্বীকৃত নিবিড় যোগ থেকে এটুকু ধরে নিলে দোষ হবে না যে দৈহিক সঙ্গমের ফলে জাতির মানসিকতাও প্রভাবিত হয়ে থাকে। Racialist (বংশবাদী) দের আতিশয্যকে স্বীকার না করেও একথা স্বীকার করা যায়। কিন্তু মানসিকতার ওপরে রক্তের প্রভাবের পরিমাণ ও ধরণ সম্বন্ধে অনির্দ্দেশ্যতা থাকার দরুণ সে আলোচনায় এখানে না প্রবেশ করাই ভালো। অপর পক্ষে জাতির কৃষ্টিগত পরিবর্ত্তন এত বেশী প্রত্যক্ষ যে সেখানে অনির্দ্দেশ্যতার ক্ষেত্র অতি ছোট।

বাঙলা দেশে যেসব কৃষ্টিগত বিপ্লব ঘটেছে তার মূলে বিভিন্ন সংস্কৃতির আঘাত অতি স্পষ্ট। বাইরে থেকে বাঙলার ওপরে এসে পড়েছে বিভিন্ন কৃষ্টি এবং তার ফলে বাঙলার মনন-জগতে বিপুল বিলোড়ন ঘটে গেছে বারবার। একাধিক বার এই বাঙলার ক্ষেত্রে অপর ক্ষেত্র থেকে নবতর সংস্কৃতি বাহিত হয়ে এসেছে এবং পূর্ব্বতন ও নবাগত সংস্কৃতিদ্বয়ের মিশ্রণের ফলে নতুন সংস্কৃতির শুভজন্ম হয়েছে। দুটো বিভিন্ন সংস্কৃতি যখন পরস্পরকে আঘাত করে, কিংবা আহ্বান করে, তখন নতুন একটা কৃষ্টির জন্মলাভ এতো প্রত্যক্ষ ও নিঃসংশয় ভাবে চোখের ওপরে ঘটে থাকে যে তা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশই থাকে না। বাঙ্গলাদেশে আমরা এমনি তিনটে বড়ো বড়ো বিপ্লবের সংবাদ পাই। তিন তিন বার বাংলার কৃষ্টিগত জীবনে ঝড় উঠেছে এবং তার ফলে জীবন-যাত্রার স্তরে স্তরে গভীর পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে। বাংলার কৃষ্টি-জীবনের ইতিহাস বলতে প্রধানতঃ এই তিনটে বিপ্লবের ইতিহাসই বোঝা যায়। এই তিনটে কৃষ্টিগত সংঘাত (cultural impact) বাংলার সংস্কৃতিকে নব নব ঐশ্বর্য্য দান করে জাতীয় জীবনকে ফলবন্ত করে তুলেছে। এই তিনটে বিপ্লবের প্রথম বিপ্লব হয়েছিল পাল বংশের আমলে খৃঃ নবম শতকে এর জন্ম হয়েছিলো বৌদ্ধ সংস্কৃতির সংঘাতের ফলে। দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটেছিল ১২শ শতকে। হিন্দু কৃষ্টির সঙ্গে ইস্‌লামীয় কৃষ্টির সংঘাতের ফলে। তৃতীয় বিপ্লব জন্ম নিয়েছে ১৮ শতকে য়ুরোপীয়ান সংস্কৃতির তীব্র আঘাতের ফলে। এই তিনবার বাঙালী সমাজের ঘুম ভেঙ্গে গেছে এবং তিনবার বাংলার সমষ্টি-মন সচেতন হয়ে জেগে উঠেছে। বাঙলা দেশের মনকে ও জীবনকে বুঝতে হলে এই তিনটে জাগরণের মর্ম্মকে বুঝতে হবে। বাংলা দেশ তিনবার জন্মান্তর লাভ করেছে এবং এই তিনবারে দ্বিজত্ব-প্রাপ্তির ইতিহাসই বাঙলার আত্মবিস্তারের ইতিকথা। বাঙালীর জীবন-বিকাশের ওপর আজো প্রচুর আলোকপাত হয়নি। একাকার অন্ধকারের মধ্যে এই তিনটি যুগ স্থির বিদ্যুতের মতো প্রভা বিকীরণ করছে এবং বাঙলার ইতিহাসকে ভাস্বর ক'রে তুলেছে।

আলেকজান্দারের অভিযানের আগে বাংলার ইতিহাস অতি অস্পষ্ট। তেমনি অস্পষ্ট মৌর্য্য-যুগের বাংলাদেশ। তারপরে গুপ্তবংশের বাংলাও ঢাকা রয়েছে গোধূলির অস্বচ্ছ আলোকে। বৌদ্ধ

আন্দোলন হলো মধ্যযুগের গণজাগরণের বিস্তৃত প্রকাশ। জাতিভেদের কাষ্ঠ-বন্ধন গেলো ভেঙ্গে; মনুষ্যত্ব নতুন মহিমা পেয়ে হয়ে উঠ্‌ল সৃজন-পর। সাহিত্যে, ধর্ম্মে, প্রেমে বাঙালী নব নব সৃজনী প্রতিভার অব্যর্থ পরিচয় দিলো। সে যুগের কাব্যসাহিত্য ও দর্শন সাহিত্য আজো জগতের বিস্ময়কে উদ্রেক করে।

ইস্‌লামীয় সভ্যতার সাম্য ও সার্ব্বজনীনতা বাঙালী সমাজকে আত্ম-সচেতন করে তুলেছিল। বৈষ্ণব আন্দোলনের সমাজ-সাম্য সেই নবজাগ্রত চেতনার বাস্তব রূপ। রক্ষণশীল দলের পণ্ডিতেরা এ কথার প্রতিবাদ করবেন; কিন্তু তদানীন্তন সমাজ-ব্যবস্থায় বৈষ্ণব আন্দোলন যে একটা বড়ো রকমের বিপ্লব একথা অস্বীকার্য্য। মুসলমান সম্রাট ও ব্যবস্থাপকেরা হিন্দু সমাজের সংস্কারেও মন দিয়েছিলেন। আকবরের বিবিধ চেষ্টা হিন্দু গোঁড়ামীর ভিত্তিতে কঠোর আঘাত করেছিল। যে সতীদাহ নিয়ে পরবর্ত্তী কালে বাংলা দেশে প্রবল আন্দোলন হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে মুসলমানেরাও অস্ত্র ধরেছিল। "......the mahomedans, that bear sway at present in Indostan, are enemies to that barbarous custom, and hinder it as much as they can......" (Bernier's letter to M. Chapelain).

মুসলমান আমাদের সমাজকে সচেতন আঘাত করেছে। বাল্য বিবাহ এবং বহু বিবাহও প্রচলিত ছিলো। আকবরের আইন থেকে বোঝা যায় এদিক দিয়েও মুসলমান হিন্দু সমাজের গোঁড়ামীকে আঘাত করেছিল নানা পথে। বিবাহপ্রথা সম্বন্ধে সমাজের সনাতনী শাসনের বিরুদ্ধে আকবর ঘোষণা করেছিলেন, "He (ie Akbar) abhors marriage that takes place between man and woman before the age of puberty. His majesty maintain that the consent of the bride and groom and the permission of the parent are absolutely necessary in marriage contract." আকবরের আমলে সারা ভারতে যে নব জাগরণ এসেছিল তারই অংশ হিসাবে বাংলার জাগরণ ঘটেছিল ষোড়শ শতকে। মুসলমান শাসন-ব্যবস্থার এবং সমাজ ব্যবস্থায় সার্ব্বজনীনতার প্রভাব বাংলায়ও হিন্দুসমাজের প্রাচীন কাঠামোকে আঘাত করেছিলো। ষোড়শ শতকে বাংলার জন-জাগরণ ঘটেছিল বৈষ্ণবদের মানবতা-বাদকে ঘিরে।

তারপরে স্থাপত্যকলায় ষোড়শ শতক হলো সব চাইতে উজ্জ্বল যুগ। পূর্ব্বতন বৌদ্ধরীতির সঙ্গে ইস্‌লামীয় রীতির সঙ্গমের ফলে গৌড়ে যে বিশিষ্ট কলা গড়ে উঠেছে তার তুলনা কোথায়? বাংলাদেশে প্রাচীনের সঙ্গে ঘটেছে নবীনের মিলন এবং তাতেই জাত হয়েছে বাংলার বিখ্যাত স্থাপত্যশিল্প। বাংলার বৌদ্ধরা যে বাঁশের ঘর বানাতো, সেই রীতির থেকেই জন্ম নিয়েছে গৌড়ের মুসলমানী মসজিদ ও প্রাসাদ এবং উত্তর ভারতে মোগলদের অনুপম নির্ম্মাণ-শিল্প। রাজপুতানায় ছড়িয়ে পড়েছে এই গৌড়ীয় রীতি। গৌড়ের সোণা মসজিদ, ছোট সোণা মসজিদ, জমী মসজিদ

ইত্যাদি সৌন্দর্য্য সৃষ্টির মূল উৎস হলো পূর্ব্বতন হিন্দুশিল্প এবং নবতন ইস্লামীয় প্রতিভার সঙ্গম। কলাবিদ্ হ্যাভেলের (Havel) ভাষায়, "When the subject is rightly understood, I have no doubt that the 16th century rather than the 17th will be appreciated as the classic epoch of Mahomedan architecture in India." ষোড়শ শতকে যে নতুন শিল্প-প্রতিভা অজস্র ফলে-ফুলে বিকশিত হয়ে উঠেছিল, তার জন্ম হয়েছিলো ইস্লামীয় এবং হিন্দু কৃষ্টির অবাধ মিশ্রণের ফলে।

কাজেই দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে ষোড়শ শতকে কাব্যে, সাহিত্যে, দর্শনে, সমাজে, শিল্পে যে অভিনব প্রাণ-মুঞ্জরণ ঘটেছিল তার প্রেরণা এসেছিল ইস্লামীয় সভ্যতার বলিষ্ঠ আঘাত থেকে। ঐ যুগে সারা উত্তর ভারতে যেমন জাগরণ এসেছিল তেমনি বাংলাদেশেও নবতর রেনেসাঁস আত্মপ্রকাশ করেছিল। এটা হলো বাংলার দ্বিতীয় রেনেসাঁস।

এর পরে ১৭শ শতক থেকে অবনতি শুরু হলো। জীবনস্রোত স্তিমিত হয়ে এলো এবং সৃষ্টি-প্রতিভা শুষ্কতায় নিঃশেষ হয়ে গেলো। আবার আরম্ভ হলো দুর্দ্দিন। সারা ১৮শ শতক ভ'রে বাংলার সমাজ-জীবন পলে পলে দুর্গতির অতলে নেমে গিয়েছিলো। যেমনতর কলঙ্কিত অবনতি নেমে এসেছিল একদিন ১১শ, ১২শ, ১৩শ, শতকে, তেমনি আবার নতুন করে অন্ধকার ছেয়ে এলো ১৮শ শতকে। রঘুনন্দন, দেবীবরের লৌহ-বন্ধনে সমাজের প্রাণপুরুষ আবার মুমূর্ষু হয়ে পড়েছিলো; বহুবিবাহ, বাল্য বিবাহ, সতীদাহ, সব মিলে জীবন হয়েছিল দুর্ব্বিসহ এবং অজ্ঞতায়, কুসংস্কারে জাতির বুদ্ধি ও আত্মশ্রদ্ধা হয়েছিল জর্জ্জরিত। এমন সময়ে আবার এলো বাইরে থেকে আঘাত।

য়ুরোপীয় সভ্যতার অমিত শক্তি নিয়ে ইংরেজ এলো বাংলার দ্বারে। ১৮ শতকের শেষদিকে ইংলণ্ডীয় কৃষ্টি এসে চারদিক থেকে বাংলার নিদ্রিত সমাজকে গেল ছুঁয়ে। সোণার কাঠির ছোঁওয়া লেগে ঘুমন্ত প্রতিভা উঠলো জেগে। চেতনায়, বুদ্ধিতে, ভাবে, কল্পনায় আবার শুরু হলো সৃজন-চাঞ্চল্য। আবদ্ধ ঘরের আড়ষ্ট আবহাওয়ায় এলো বাইরে থেকে ঝলকে ঝলকে তাজা, দুরন্ত হাওয়া। এক নিমেষে গ্রহীষ্ণু চিত্তে সমস্ত জাতির আত্মা আবাহন করে নিলো পাশ্চাত্যের তেজস্বিনী কৃষ্টিকে। বার বার যেমন ঘটেছে এবারও তেমনি ঘট্‌লো। ১৯শ শতকে এলো তৃতীয় জাগরণ। অভিনব রূপে দেখা দিলো নতুন রেনেসাঁস। বাঙ্গালীর জীবনে সুরু হলো সমুদ্র-মন্থন। বিষ উঠ্‌লো, অমৃতও উঠলো। একশ বছর ধরে এ মন্থন চলেছে, আজো শেষ হয়নি।

১৮ শতক থেকেই য়ুরোপীয় কৃষ্টি ভারতীয় কৃষ্টির চারদিকে ঘনিয়ে এসেছে। এই দুই কৃষ্টির সংঘাত ও সঙ্গতি থেকে যে জাগরণ এলো তা' পল্লবিত হয়ে উঠলো ১৯ শতকে। ১৯ শতক বাংলার তৃতীয় রেনেসাঁসের যুগ। একে সর্ব্বভারতীয় রেনেসাঁসও বলা চলে, কারণ বাংলার জাগরণই অগণিত পথে-সারা ভারতে ছড়িয়ে প'ড়ে সর্ব্বত্র এসেছে নব-জাগরণ। জলপ্রপাতের মতো য়ুরোপীয় কৃষ্টি যেদিন বাংলার সমাজে প্রবল বেগে পড়লো, সেদিন বাংলার সমাজে সৃষ্টি হলো তুমুল বিক্ষোভ।

একদল করলো য়ুরোপকে বর্জ্জন, একদল করলো আবাহন। যে সংঘাত আরম্ভ হলো তাতে গোঁড়ারা হলো কোণঠাসা: দেখ্‌তে দেখ্‌তে য়ুরোপীয় কৃষ্টি মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে নিলো। ধীরে ধীরে চল্‌লো নতুন ও পুরাতনের মিতালী: দুটো বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী বিকশিত হয়ে উঠ্‌লো: গর্ভশায়ী ভ্রূণের মতো এক নতুন সংস্কৃতি দিনে দিনে অগোচরে গড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। আজো সেই নবসংস্কৃতির বিকাশ চলেছে: আজো সেই সংস্কৃতি ভূমিষ্ঠ হয়নি, ভবিষ্যৎ বল্‌বে, কী সেই সংস্কৃতির রূপ, কী সমৃদ্ধি নিয়ে সে ভারতবর্ষে আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগ করে চলেছে সেই নব সংস্কৃতিকে রূপ দেবার সাধনা। দেড়শ বছর ধরে এই সাধনা অবিরাম চলেছে। ব্রাহ্ম বিপ্লব, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন ইত্যাদি নব নব বিক্ষোভ সেই সাধনার রূপ। এই সাধনার শক্তিতেই রঘুনন্দন-দেবীবরের জীর্ণ, বিচ্ছিন্ন সমাজ খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে। শোষণমূলক আর্থিক ব্যবস্থাকে উল্‌টে দিতে গণ-শক্তি আজ সংহত হয়ে উঠেছে, তথা-কথিত নিম্নশ্রেণী আজ সাম্যের তরে বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ছে, জাতিভেদের কপটতাকে গুড়ো গুড়ো করে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে। যে সংস্কৃতির অস্ফুট বাণী আজ জন-গণের মুখে ধ্বনিত হচ্চে, সেই সংস্কৃতি আজো শিশু-বৃক্ষের মতো রূপায়িত হচ্চে। একদিন সুবৃহৎ বনস্পতি হয়ে এই নবকৃষ্টি মানুষকে ছায়াদান করবে। কিন্তু নবজাত কৃষ্টির প্রথম আবির্ভাব ঘটেছে সেই ১৯শ শতকে। ১৯শ শতক হলো জাতির জীবনে প্রথম বসন্তোৎসবের যুগ। তাই কাব্যে, সাহিত্যে, দর্শনে, ধর্ম্মে, সমাজে, নীতিতে, শিল্পে—সর্ব্বত্র সূচনা হয়েছিল এক নতুন পুষ্পায়ন।

বাংলার এই তৃতীয় রেণেসাঁস আগের দুটো রেণেসাঁস থেকে আরো প্রবলতর এবং জাতির চেতনাকে আরো তীব্রতর আঘাত হেনেছে। য়ুরোপকে বাদ দিয়ে ভারতীয় সমাজের চলবার উপায় নেই। চোখের উপর দুটো সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটে নবতর সংস্কৃতির পথ উদ্ঘাটিত হচ্ছে, এ সত্যকে অবহেলা করবার অর্থ নেই। ঐতিহাসিক নিয়মে সমাজের আবর্ত্তন হচ্চে এবং নব নব কৃষ্টির উন্মোচন ঘটছে যুগে যুগে। বাইরের থেকে আঘাত এসেছে আজ। নতুন সংস্কৃতির জন্ম অনিবার্য্য। কৃষ্টির সঙ্গে কৃষ্টির যখন সঙ্গতি বা সংঘর্ষ হয়, তখনি ভূমিষ্ঠ হয় নবতর সংস্কৃতি। এ নিয়মের ব্যতিক্রম বাংলার ইতিহাস নয়, ভারতের ইতিহাসও নয়। নবতর সংস্কৃতিকে বিবর্ত্তিত ক'রে না তুলতে পারলে জাতির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। রক্ষণশীল সম্প্রদায় যতোই হাহাকার করুন ইতিহাস আপন নিয়মে ও ছন্দে ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করেছে। সে যাত্রা কোনো পিছুটানে থামেনি, থামবেও না। যাদের দূরদৃষ্টি আছে তারা এই তৃতীয় রেণেসাঁসকে পরিপূর্ণ রূপ দেবার তপস্যা বহুদিন থেকেই শুরু করেছেন।

চারদিন

রাণী রায়

আমার এখন সব কিছু মনে পড়ছে। বনের মাঝ দিয়ে ছুটে চলেছি, চারিদিকে গুলি ছুটছে, গাছের ডালপালা ভেঙে পড়ছে, পদপিষ্ট হোয়ে কত লতাগুল্ম বিনষ্ট হচ্ছে। অকস্মাৎ বনের শেষ-প্রান্তে দেখা গেল রক্তিম এক ছায়ামূর্তি। প্রথম কোম্পানীর সিডারোড্ (ও যে কি কি করে আমাদের সঙ্গে এল তাই ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেলাম) অকস্মাৎ মাটিতে বসে পড়ল। ওর ভীতি বিহ্বল বিস্তৃত নয়নদ্বয় তুলে আমার দিকে চাইল। এক ঝলক টাটকা রক্ত তার মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। হ্যাঁ, সেটা আমার ঠিক মনে আছে। এও ত আমি ভুল করিনি যে অরণ্যপ্রান্তে ঝোপের পাশেই আমি তাকে দেখতে পেয়েছিলাম। সে ছিল এক বিরাট তুর্কী জাতীয় পুরুষ আর আমি ক্ষীণ দুর্বল--কিন্তু তাতে আমি ভয় পাইনি, সোজা তার দিকে দৌড়ে গেলাম। হঠাৎ আমার সম্মুখ দিয়ে সাঁ করে কি যেন চলে গেল : সঙ্গে সঙ্গে কান দু'টো কট্ কট্ করে উঠল। "আমায় লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছে ও," আমি ভাবলাম। আমাকে এগুতে দেখেই সে ভয়ে আর্তনাদ করে ঝোপের পেছনে লুকুতে চেষ্টা করল। ইচ্ছে করলেই সে হয়ত পালাতে পরত, কিন্তু ভয়ে তার সব কিছু গুলিয়ে গিয়েছিল তাই তাড়াতাড়ি গিয়ে ঐ কণ্টকবহুল ঝোপের মাঝে আত্মগোপন করল। আঘাত করতেই ওর হাত থেকে রাইফেলটা পড়ে গেল। তারপর সজোরে বেয়নেটটা ওর বুকে চালিয়ে দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে একটা মর্মভেদী আর্তনাদ শুনতে পেলুম। সঙ্গীরা আনন্দসূচক ধ্বনি করে উঠল। তারপর বন থেকে বেরুবার সময় আমিও যে গুলি ছুঁড়েছিলুম সে কথাও আমার মনে আছে। বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ-ধ্বনিও বাড়তে লাগল, আমরাও এগুতে লাগলাম। ঠিক 'আমরা' নয়—আমাদের দলের সবাই এগুচ্ছিল কেবল আমি বাদে। ব্যাপারটা সত্যি অদ্ভুত...কিন্তু তার চেয়েও অদ্ভুত মনে হল যখন সব কিছু ধীরে ধীরে মুছে যেতে লাগল। গুলির শব্দ, চীৎকার ইত্যাদি সব কিছু নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আর কিছু শুনতে পেলুম না। চোখের সমুখে ভেসে উঠল গভীর নীলিমা—বোধ হয় আকাশের। তারপর ধীরে ধীরে তাও অদৃশ্য হয়ে গেল।

এ রকম অদ্ভুত অবস্থায় আমি কখনও আর পড়িনি। উপুড় হয়ে পড়েছিলুম—চোখে পড়ছিল শুধু এক টুকরো মাটি। কয়েকটা ঘাসের শীষ্, এরি মাঝে ওঠা-নামায়-রত একটি পিপীলিকা ; আর কিছু শুকনো পাতা—এই ছিল তখন আমার সারা জগত। এও দেখেছিলুম আমি এক চোখে—কারণ অন্য চোখটা বুজে গিয়েছিল শক্ত একটা কিসে যেন ঠেকে—যার উপর মাথা রেখে পড়েছিলুম এটা বুঝি তাই। বড্ড অসোয়াস্তি লাগছিল। নড়াচড়া করবার ইচ্ছা হচ্ছিল কিন্তু

কিছুতেই পারছিলুম না। না পারবার কোন কারণও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সময় বয়ে যেতে লাগল। ফড়িঙের ঝিনঝিনি, মৌমাছির গুণগুণানি ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছিলাম না। অনেক চেষ্টার পর বুকের তল হইতে ডান হাতটাকে মুক্ত করলাম। হাতের উপর ভর দিয়ে একবার উঠে বসবার চেষ্টা করলাম।

সারা দেহে একটা বৈদ্যুতিক স্পন্দন খেলে গেল যেন। পা থেকে উঠে তীক্ষ্ণ কি যেন একটা সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ল। আমি পড়ে গেলাম—সব কিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। বিস্মৃতি এসে আমায় অধিকার করল।

হঠাৎ জেগে উঠলাম। বুলগেরিয়ার তিমিরাচ্ছন্ন নীল আকাশে উজ্জ্বল তারকার ঝিকিমিকি দেখছি আমি? তবে কি আমি আমার তাঁবুতে নাই? কি করে সেখান থেকে চলে আসলাম? একটু নড়তেই পাদু'টো টন্ টন্ করে উঠ্‌ল।

বুঝেছি এবার, যুদ্ধের সময় আমি আহত হয়েছি। আচ্ছা, আমার আঘাত কি খুব সাংঘাতিক? ক্ষতটা স্পর্শ করলাম। পা দু'টো দেখি জমাট রক্তে মাখান। স্পর্শ করতেই বেদনা বেড়ে গেল। দাঁতের ব্যথার মত চিরস্থায়ী অরন্তুদ এ' বেদনা। কানদু'টো ভোঁ ভোঁ করতে লাগল. বুঝলাম দু'পায়েই আঘাত পেয়েছি। কিন্তু ব্যাপারটা কি হয়েছিল? আমাকে ওরা সঙ্গে করে নিয়ে যায়নি কেন? তবে কি তুর্কীরা জয়লাভ করেছে? কি যে হয়েছিল তা ভাবতে চেষ্টা করলাম। প্রথম প্রথম সব মনে পড়ছিল না—ধীরে ধীরে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে এল—মনে হল আমরা পরাজিত কিছুতেই হতে পারি না। কারণ, আমি ত পাহাড়ের মাথায় একটা খোলা জায়গায় পড়ে আছি। (আমার একথা ঠিক মনে নেই, তবে মনে আছে যে কি করে তারা দৌড়ে যাচ্ছিল কিন্তু আমি পারছিলুম না এবং চোখে আমার নীল আকাশ ছাড়া কিছুই পড়েনি।) আমাদের ক্ষুদ্র দলের অধিনায়ক আমাদিগকে এ'স্থানটা পূর্বেই দেখিয়ে বলেছিলেন—"শীঘ্রই আমরা ওখানে পৌঁছাব।" আমরা এখানে এসেই ত পৌঁচেছি—তবে কি করে আর আমাদের পরাজয় হ'ল। কিন্তু আমাকে ওরা সঙ্গে করে নিয়ে যায়নি কেন? খোলা জায়গা, সব কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বোধ হয় শুধু আমিই আহত হইনি—আরও অনেকে হয়ত হয়েছে। মাথা তুলে একবার চারিদিকটা দেখিনি। এবার সহজেই উঠতে পারব, কারণ, আরেকবার উঠতে গিয়ে উপুড় হয়ে না-পড়ে চীৎ হয়ে যে পড়েছিলাম—তাইত আকাশের তারা আমার চোখে এত স্পষ্ট ধরা পড়ছিল।

উঠে বসলাম। জখম লাগা পা নিয়ে উঠে বসা ভারী দুস্কর ব্যাপার। নৈরাশ্য আমায় অভিভূত করে ফেলল। তীব্র বেদনায় চোখদু'টো জলে ভরে উঠল। শুয়ে শুয়ে দেখছিলাম এক-টুকরো আকাশ—তারি গায়ে জ্বলজ্বল করছিল একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আর তার চারিপাশের নক্ষত্র-পুঞ্জ! আমার চারিদিকে দীর্ঘ, তমসাচ্ছন্ন লতাগুল্ম! আমি যে এরি মাঝে পড়ে আছি—তাই ওরা আমাকে দেখতে পায়নি।

হঠাৎ গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল !

গুলি লাগবার পর কি আমি এই ঝোপের মাঝে এসে পড়েছি ? বেদনায় অবশ হয়ে নিশ্চয় হামাগুড়ি দিতে দিতে এখানে এসে পৌঁচেছি। অথচ কি আশ্চর্য্য তখন যা স্বচ্ছন্দে পেরেচি এখন আর তা পারছি না। বোধ হয় তখন একটা পায়েই আঘাত পেয়েছিলাম। তারপর ঝোপের ভিতর আসবার পর হয়ত আরেকটা পায়ে আঘাত পেয়েছি।

ক্রমে আকাশ ধূসর হয়ে উঠল, জ্যোতিষ্কের উজ্জ্বলতা হ্রাস পেল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্ররাজি অদৃশ্য হতে লাগল—এবার চন্দ্র উঠবে। আঃ, এ সময় বাড়িতে কি আরামই না লাগত !

বিচিত্র সব শব্দ কানে আসছিল। মনে হ'ল কেউ যেন গোঙাচ্ছে। তবে কি আমার নিকটে কেউ আছে ? সে কি আমারই মত চলচ্ছক্তিহীন অথবা গুলিতে আহত এবং পরিত্যক্ত ? খুব সাম্নেই ত কে যেন গোঙাচ্ছে, কিন্তু কই কাউকে ত দেখছি না ! হা ভগবান ! এ যে আমি, আমি নিজেই। ক্ষীণ, অরুন্তুদ আর্তনাদ ! সত্যি কি এত ব্যথা করছে ? বোধ হয় করছে। আমার মাথায় সব গোলমাল হয়ে গেল। ওটা যেন সীসার মত ভারী হয়ে গেছে তাই কিছু ধরতে পারছি না।

চিন্তা ছেড়ে এবার শুয়ে একটু ঘুমাই। আঃ ঘুম, ঘুম, ঘুম...আমি কি আর জাগব ? কি আসে যায় তাতে ?

ঘুমুতে যাচ্ছিলাম হঠাৎ ক্ষীণ চন্দ্রালোকে আমার সম্মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দেখি কিছুটা দূরে কালো এবং বড় মতো কি যেন একটা পড়ে রয়েছে। চন্দ্রের আলো একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রতিফলিত হয়ে চক্‌চক্‌ করছে—নিশ্চয় ওটা কোটের বোতাম অথবা কোন অস্ত্রশস্ত্র. বোধ হয় ওটা কারো মৃতদেহ, নয়তো কোন আহত সৈনিক। যাকগে, এবার আমি ঘুমুব. .

নাঃ এ অসম্ভব ! আমাদের দলের লোকেরা নিশ্চই চলে যায়নি ! এইখানেই তারা আছে। তুর্কীদের তারা নিশ্চয় পরাভূত করেছে। কিন্তু কোন শব্দ শুনছি না কেন ? বোধহয় আমার শ্রবণ-শক্তি হ্রাস পেয়েছে। তারা এখানেই আছে।

"রক্ষা কর ! রক্ষা কর—!"

রুক্ষ কর্কশ স্বর আমার কণ্ঠভেদ করে বেরিয়ে এল কিন্তু কেউ জবাব দিল না। নিশীথ বাতাসে তা অনুরণিত হয়ে ফিরতে লাগল। ভেসে আসা ঝিল্লিরব ছাড়া চারিদিকে তেমনি প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা। আকাশ থেকে চন্দ্র আমার দিকে করুণ-ভাবে চাইতে লাগল।

'সে' যদি আহত হ'ত তবে নিশ্চয় জাগত। ও নিশ্চয় মরে গেছে। কিন্তু কে ও ? আমাদের কেউ না. কোন তুর্কী সৈনিক ? যাক গে; ঘুমে আবার আমার জ্বলন্ত চোখ দুটি বুজে এল।

চোখ বুঁজেই শুয়েছিলুম. কতক্ষণ হয় ঘুম ভেঙেছে; চোখ চাইতে ইচ্ছে হচ্ছে না। যে প্রখর সূর্য্যতাপ চোখ দুটো ঝলসে যায়। নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলাম। কালকে (মনে হয় কালকেই)

আহত হয়েছি। একটা দিন কেটে গেছে, এমনি করেই দিন কাটবে তারপর একদিন মরে যাব। যাক গে! নড়ে চড়ে লাভ নেই, চুপ করেই শুয়ে থাকি। চিন্তাশক্তি যদি নষ্ট হয়ে যেত তবে খুব ভাল হত—কিন্তু তাতো হবে না। চিন্তা আর স্মৃতি যে আমার মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। যাক্, আয়ু তাদের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—সমাপ্তি আসবে অতি সত্বর। থাকবে না কিছুই শুধু পত্রিকায় কয়েকটি ছত্র ছাড়া। হয়ত সেখানে লেখা হবে যে, ক্ষতি আমাদের বেশী হয়নি: অল্প কয়েকজন আহত হয়েছে আর আইভানোভ নামক একজন সাধারণ সৈনিক হত হয়েছে। নাঃ, নামটাও তারা উল্লেখ করবে না। শুধু লিখবে, "মৃতের সংখ্যা মাত্র একটি।" একজন সৈনিক আর একটি কুকুর—প্রভেদ কোথায়? হঠাৎ আমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে একটি বিস্মৃত ছবি পরিপূর্ণরূপ নিয়ে ফুটে উঠল। এ ছবি প্রথম জীবনের, আমার সারা জীবনের, পা ভেঙে এখানে শয্যা গ্রহণ করবার পূর্বের।...পথ দিয়ে চলেছি; হঠাৎ জনতা দেখে থেমে গেলুম। স্তব্ধ জনতা উন্মুখ হয়ে নিরীক্ষণ করছিল একটি শ্বেত পদার্থকে। সারা দেহে ওর রক্তমাখা—করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করছিল। ওটা ছিল সুন্দর একটা কুকুরের বাচ্চা—ট্রামের তলায় চাপা পড়েছে; আমার মত তারও এখন মুমূর্ষু অবস্থা। এমনি সময় কোত্থেকে একটা দরোয়ান ভিড় ঠেলে কুকুরটিকে কাঁধে ধরে তুলে নিয়ে চলে গেল। তারপর ভিড়ও ভেঙে গেল।

আমাকেও কি কেউ তুলে নেবে? না এখানে এমনি ভাবেই মরব। কিন্তু জীবনটা কতই না আনন্দের! যেদিন কুকুরটা আঘাত পেয়েছিল, সেদিন আমার ভারী আনন্দ হয়েছিল। সেখান থেকে যখন চলে এলাম তখন মনে হল আমি নেশা করেছি। এর অবশ্য কারণও ছিল। ওগো স্মৃতি, এবার আমায় রেহাই দাও, আর আমায় যন্ত্রণা দিও না! অতীতে যাহা ছিল আনন্দ, বর্তমানে তাই যে হয়ে দাঁড়িয়েছে দারুণ বিভীষিকা।...

সূর্য্যাতাপ ক্রমশঃ প্রখর হয়ে উঠছিল। চোখ মেলতেই চোখে পড়ল সেই লতাগুল্ম, সেই আকাশ, দিনের আলো, আর আমার সেই পড়সী! ঠিক, ও একটা তুর্কীই। মরে গেছে। উঃ! কি বিশাল ওর দেহ! এবার ওকে ঠিক চিনেছি, এযে সেই—

যাকে আমি হত্যা করেছি—সেই আমার সম্মুখে পড়ে। আচ্ছা, আমি তাকে কেন হত্যা করেছিলাম? ওই ত ওর রক্তাপ্লুত মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। ওর ভাগ্য ওকে কেন এখানে টেনে এনেছিল? কে ও? হয়ত আমার মত ওর ও আছে বৃদ্ধা মা? হয়ত তাঁর কুটীরদ্বারে তিনি বসে রয়েছেন উন্মুখ প্রতীক্ষায়: তাঁর প্রিয় অন্ধের নড়ি, ভবিষ্যতের আশা ফিরে আসছে বলে! আর আমি? আমিও—আমিও ওর সঙ্গে যেতে রাজী। ও তো সুখী, ও কিছু শুনবে না; ব্যথা অনুভব করবে না, যাতনায় চীৎকার করে উঠবে না, ওর তৃষ্ণাবোধ পর্য্যন্ত নেই। আমার বেয়নেটই তো ওকে হত্যা করেছে। ওর বুকে দীর্ঘ ক্ষত অঙ্কিত করে দিয়েছে—রক্তে বুক ভাসিয়েছে। ওঃ, আমিই এ করেছি!

কিন্তু হত্যা করবার ইচ্ছা ত ছিল না। কাউকে আঘাত করবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যুদ্ধে

যোগ দিইনি। আমাকে যে হত্যা করতে হবে এমন চিন্তা কখনও আমার মনে ওঠেনি। অপরের বন্দুকের সম্মুখে আমার বুক পেতে দেব এই ছিল আমার কল্পনা। আমি যে তা দিয়েছিও।

তারপর কি হ'ল? মূর্খ, মূর্খ! ঐ হতভাগ্য মিশরীয় চাষাটার (ওর গায়ে ছিল একটা মিশরীয় পোষাক) অপরাধ তো আমার চেয়েও কম। সে হয়ত পূর্বে কোনদিন রাশ্যা বা বুলগেরিয়ার নামই শোনেনি। বাক্সবন্ধ হেরিং মাছের মত চালান হয়ে অন্য সবার সঙ্গে এসে যখন কনস্তান্তি-নোপল্ পৌছল তখনই হয়ত প্রথম পরিচিত হল ঐ দুটি দেশের সঙ্গে। ওকে যাবার আদেশ দেয়া হয়েছিল—তাই সে গিয়েছে। যেতে সম্মত না হ'লে হয়ত তাকে বেত্রাঘাত করা হ'ত, নয়ত পাশার গুলিতে প্রাণ হারাত। ইস্তাম্বুল থেকে রাষ্টচক্ পর্যন্ত দীর্ঘপথ সে অতিক্রম করেছে অতি কষ্টে। আমরা তাদের আক্রমণ করেছি আর তারা নিজেদের রক্ষা করেছে, তাদের অদ্ভুত চেহারা আর মার্টিন বন্দুককে আমরা ভয় পাই না দেখে এবং আমাদিগকে অগ্রসর হতে দেখে ও ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়েছিল। ওকে পালাতে দেখে, একটি ক্ষুদ্রাকৃতি নর, যাকে ইচ্ছে করলেই ও এক ঘুষিতে ভবপারে পাঠাতে পারে, সেই ওর বুকে দিল বেয়নেট ঢুকিয়ে। কি করে আর ওকে অপরাধী বলা যায়।

যদিও আমি ওকে হত্যা করেছি তবু আমারই বা দোষ কি? কি আমার অপরাধ? তৃষ্ণা আমাকে কেন কাতর করে ফেলছে? তৃষ্ণা! তৃষ্ণা মানে আর কি কেউ জানে? ১০৫° ডিগ্রি উত্তাপের মাঝে যখন রুমানিয়ার ভিতর দিয়ে মার্চ করেছি তখনও তো আমার তৃষ্ণা পায়নি। আর কেউ যদি এখন আসত। হা ভগবান! নিশ্চয় ওর ওই পানপাত্রে জল আছে। ওর কাছে একবার যেতে হবে। যে করে হোক ওর কাছে যেতেই হবে।

হাত নাড়তে পারি না, শরীর অবশ হয়ে গেছে, তবু অনেক কষ্টে পা ঘষতে ঘষতে হামাগুড়ি দিতে লাগলাম। ওর শব পড়েছিল হাত বারো দূরে। কিন্তু আমার কাছে ওটুকু স্থানই অতি দীর্ঘ—বারো মাইলেরও উপরে। তবু আমাকে যেতেই হবে। আমার গলাটা জ্বালা করছে—যেন আগুনে ঝল্‌সে গেছে। জলছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। তবু, বোধ হয় তাই—আমাকে যেতে হবে। পা দুটো মাটিতে সেঁটে যাচ্ছে, একটু নড়লেও তীব্র বেদনায় টন্ টন্ করে উঠ্‌ছে। আমি গোঙাচ্ছি, আর্তনাদ করছি কিন্তু তবু হামাগুড়ি দিয়ে চলেছি। আঃ এবার এসে পৌছলুম! এই যে পানপাত্র। বাঃ পাত্র ভরা কত জল। অর্দ্ধেকেরও বেশী ভরা দেখছি। এতেই আমার অনেকদিন চলবে—হয়ত মৃত্যু পর্যন্ত।

হে আমার বলি, তুমিই আমার প্রাণ বাঁচালে। কনুইতে ভর দিয়ে পানপাত্রের বোতাম খুলতে যেতেই হঠাৎ কাৎ হয়ে আমার রক্ষাকর্তার বুকের উপর পড়ে গেলুম। শবটা থেকে একটা তীব্র দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল।

জলপান করলাম। গরম লাগল, হোক গরম, বিশুদ্ধ ত। তাছাড়া অনেকটাই আছে। হয় ত আরও কয়েকটা দিন বাঁচব। মনে পড়ে 'The Physiology of every day Life'এ পড়েছিলাম

যে জলপান করেও মানুষ সাতদিনের ওপর বাঁচতে পারে। ও বইতেই পেয়েছিলাম একটা লোকের প্রায়োপবেশনে আত্মহত্যা করবার ইতিহাস। জলপান করেছিল বলেই ত ও অনেকদিন বেঁচেছিল।

থাক গে আমার তাতে কি? আমি যদিও বা পাঁচ ছয়টা দিন বেশীই বাঁচি তাতেই বা কি? আমাদের দলের লোকেরা চলে গেছে, বুলগারিয়ানরাও পালিয়েছে। কাছাকাছি আর পথ নেই। সব রকমেই আমার মরতে হবে। শুধু যন্ত্রণার মেয়াদ বাড়িয়ে দিচ্ছি। যত শীঘ্র এর সমাপ্তি টানা যায় ততই মঙ্গল। আমার পড়সীর পাশে পড়ে রয়েছে ওর বন্দুক। কি চমৎকার বন্দুকটা। শুধু আমার হাত বাড়াবার অপেক্ষা; তারপর—এক মুহূর্ত, তারপর সব শেষ! টোটার অভাব কি? ওর চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে কত টোটা—সব গুলো ত ও আর ব্যবহার করবার অবসর পায় নি।

আচ্ছা, অমনি করে শেষ করব জীবনটাকে? না, অপেক্ষা করব? অপেক্ষা করবই বা কেন? উদ্ধারের আশায়? না সহজ মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষায় তুর্কীরা আসুক এবং এসে আমার আহত পা দুটোর চামড়া তুলে নিক এই কি আমি চাই? তাতো আমি নিজেই পারব। না, হতাশ হলে চলবে না। শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত আমি সংগ্রাম করব। ওরা আমায় দেখতে পেলে আমি বাঁচতে পারব নিশ্চয়।

আমি আবার দেশে ফিরে যাব, আমার মা, মাশা—ভগবান, ওরা যেন আমার এই দুরদৃষ্টের কথা কিছুই জানতে না পায়। আমি মরে গেছি শুধু এই সংবাদই যেন ওদের কাছে পৌঁছয়। যদি ওরা শোনে যে আমি দীর্ঘ চারদিন এমনি যন্ত্রণা সহ্য করে কাটিয়েছি তবে যে ওরা পাগল হয়ে যাবে।

মাথাটা ঘুরছে। অমনি করে হামাগুড়ি দিয়ে চলায় সারা শরীরটা যেন অবশ হয়ে গেছে। তার উপর এই দুর্গন্ধ। সারা দেহ ওর কালি হয়ে গেছে। কালকে বা পরশু ওকে না জানি কেমন দেখাবে। চলবার ক্ষমতা আমার নেই—তাই নিরুপায় আমি এখানেই পড়ে আছি। একটু বিশ্রাম নিয়ে নি তারপর আবার আমার আগের জায়গায় ফিরে যেতে চেষ্টা করব। ভাগ্যিস উল্টো দিক থেকে বাতাস বইছে—তাই গন্ধ একটু কম লাগছে। শক্তিহীন আমি আবার শুয়ে পড়লাম। রৌদ্রে আমার মুখ আর হাতদুটো পুড়ে যেতে লাগল। শরীরটা ঢেকে দেবার মতও কিছু নেই আমার। রাতের অপেক্ষায় পড়ে আছি—বোধহয় এই আমার দ্বিতীয় রাত্রি।

চিন্তাধারায় জট পাকিয়ে গেল। আমি ঝিমুতে লাগলাম। রাত হয়ে গেছে দেখছি। উঃ অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি ত। কিন্তু কিছুই যে পরিবর্ত্তন হয় নি; আমার বেদনার তীব্রতা একটুও কমেনি, আর আমার পড়শীর বিশাল দেহ অমনি নিশ্চল ভাবেই পড়ে আছে। ওর কথাই যে বার বার মনে পড়ছে। আচ্ছা, এই হতভাগ্যের মরণ ঘটাতেই কি আমি আত্মীয় স্বজন ছেড়ে, হাজার মাইল দূরে এসে এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছি? এই উদ্দেশ্যেই কি আমি শীত গ্রীষ্ম বা অনাহার

সহ্য করেছি? আমার এই চলচ্ছক্তিহীনতা এবং অসহ্য বেদনা কি এরি জন্য? কিন্তু শুধু এই হত্যা ছাড়া আমি আমাদের সামরিক অভিযানের কতটুকু সাহায্য করেছি?

হত্যা? হত্যাকারী? কে সে? আমি!

আমি সৈন্যদলে যোগ দিতে মনস্থ করেছি শুনে মা কিংবা মাশা আমায় বাধা দেয় নি। নীরবে শুধু তারা অশ্রুবর্ষণই করেছিল। তখন আদর্শ ছিল আমার উচ্চ তাই সেদিকে নজর দেবার অবসর আমার ছিল না। তখন আমি বুঝতে পারিনি (কিন্তু এখন বেশ বুঝছি) যে, প্রিয়জনের কি সর্বনাশ আমি করলাম। কিন্তু সে-সব কথা মনে করে আর লাভ কি? যা হয়ে গেছে তা আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। সৈন্যদলে নাম লেখায় কতপ্রকার অদ্ভুত ব্যবহারই না করেছিল আমার বন্ধুরা। "কি দুর্দৈব. যা জানে না সে-কাজেই যে হাত দিল ও", ঠাট্টা করে বলেছিল আমার বন্ধুরা। কি করে তারা ওকথা বলতে পারল? বীরত্ব এবং স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধে তাদের যে ধারণা তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে কি করে তারা ও কথা বল্ল? তাদের মতে আমার ত ওসব গুণই ছিল তবু আমি একটি 'পাগল'।

আমাকে কিসিনেভ্ যেতে হবে। রসদের থলে এবং অস্ত্রপাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি; আমার মত আরও হাজার হাজার লোক অপেক্ষা করছে। এদের কয়জন আর আমার মত নিজের ইচ্ছায় চলেছে? যদি অনুমতি পেত তবে অনেকেই হয়ত বাড়ি চলে যেত। কিন্তু তবু তারা নিষ্ঠার সঙ্গেই চলবে, যুদ্ধ করবে ঠিক আমাদেরই মত, হয়ত বা আমাদের চেয়ে ভাল ভাবেই। তারা তাদের কর্তব্য করবে কিন্তু অনুমতি পেলেই সব ছেড়ে বাড়ি যেতেও ইতস্তত করবে না।

ভোরের বাতাস বইতে লাগল। বৃক্ষশাখায় মর্মর ধ্বনি উঠল। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় একটা পাখী নীড় ছেড়ে উড়ে পালাল। কালো আকাশ পাণ্ডুর হয়ে এল, কোমল শুভ্র মেঘে আকাশ ঢেকে গেল। ধূসর কুজ্ঝটিকা ভূতল হতে উত্থিত হতে লাগল। তৃতীয় দিবস সুরু হল আমার—কি বলব? জীবনের?—না বেদনার?

আজ তিন দিন—কিন্তু এমনি আর কতদিন চলবে? খুব বেশী দিন নয় নিশ্চয়। ভারী দুর্বল হয়ে পড়েছি। মৃতদেহটার কাছ থেকে নড়বার মত শক্তিও যে আমার নেই। কদিন পরে ত আমরা দুজনেই এক হয়ে যাব। ওকে আর আমার অসহ্য লাগবে না।

ভারী পিপাসা পেয়েছে, জল খাব। ভোরে দুপুরে আর সন্ধ্যায় তিনবার করে জলপান করব বলে ঠিক করেছি।

সূর্য্য উঠছে। সুকৃষ্ণ লতাগুল্মের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যদেবের সুবিশাল রক্তিমচক্র দেখা যাচ্ছিল। মনে হয় আজ ভীষণ গরম পড়বে। ওগো আমার পড়শী, তোমার কি হবে? গন্ধ যে এখনই অসহ্য হয়ে উঠল।

ওর দেহ গলতে আরম্ভ করেছে। মাথার চুল উঠে যাচ্ছে। গায়ের কালো চামড়া আরও বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। ওর স্ফীত হলদে মুখের উপরের চামড়া এত টান হয়েছে যে কানের পেছনে

জায়গায় জায়গায় ফেটে গেছে। গায়ে পোকা পড়েছে। গোটার পরা গোড়ালি দুটো অসম্ভব ফুলে উঠেছে। ফুলে ও যেন ঢোল হয়েছে। এই প্রখর রৌদ্রতাপে আজ তার কি অবস্থা হবে।

ওর এত নিকটে শুয়ে থাকা সম্ভবপর নয়। যে করেই হোক আমাকে একটু দূরে সরে যেতে হবে। কিন্তু তা পারব কি? হয়ত হাত তুলে জলপান করতে পারি কিন্তু তা বলে কি এই অচল দেহটাকে নাড়তে পারব? নাঃ, তবু আমাকে চলতে হবে, যত ধীরেই হোক—যদি দীর্ঘ সময় লাগে তবুও।

স্থান পরিবর্তন করতেই সারা সকালটা কেটে গেল। ব্যথা তীব্রতর হয়ে উঠল, কিন্তু তাতে কি আসে যায়? আমার স্মরণশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে, আরাম যে কি জিনিষ তাও আমি এখন কল্পনা করতে পারি না। মনে হয় যন্ত্রণাই আমার চিরসঙ্গী। সারা ভোরে মোটে হাত ছয়েক এগিয়েছি। যাক, তবু আগের জায়গায় এসে পৌঁচেছি ত। কিন্তু টাটকা হাওয়া পাচ্ছি কই? এখানেও সেই দুর্গন্ধ। বাতাসের গতি ঘুরে গেছে। আবার সেই দুর্গন্ধ আমার নাকে আসছে। শরীরটা কেমন করে উঠল। পেটের ভিতরটা মোচড়াতে লাগল—মনে হল নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে আসবে যেন। নিরুপায় আমি কেঁদে ফেললাম।

অকস্মাৎ—একি বিশৃঙ্খল মস্তিষ্কের ভ্রান্তি? আমি যেন শুনতে পাচ্ছি—না—হ্যাঁ—আমি শুনতে পেয়েছি, মানুষের কণ্ঠস্বর, অশ্বপদধ্বনি। আনন্দে আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম প্রায় কিন্তু ওরা যদি তুর্কী হয়? ওরা যদি তুর্ক সৈন্য হয় তবে আমার কি অবস্থা হবে? আমার এ ব্যথা ত ঘুচবেই না বরঞ্চ এর উপর সহ্য করতে হবে ওদের অমানুষিক অত্যাচার। ভাবতেই শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। ওরা আমার চামড়া ছিঁড়ে ফেলবে আর আমার পা দুটো দিয়ে রোষ্ট বানাবে—এখানে মরার চেয়ে তাদের হাতে পড়ে অগ্নি করে মরাই কি ভাল?

কিন্তু ওরা যদি আমাদের লোক হয়? সম্মুখের এই নিবিড় লতাগুল্ম যে আমার দৃষ্টিশক্তিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। পরিষ্কার কিছুই যে আমি দেখতে পাচ্ছি না। ছোট্ট ঐ ফাঁকটুকুর মাঝ দিয়ে শুধু দেখা যাচ্ছে তরুলতাশোভিত ঐ ক্ষুদ্র উপত্যকা। মনে হয়, ওখানে যে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী আছে সেখানেই যুদ্ধের আগে জলপান করেছিলাম। হাঁা, ঠিক. ওখানেই আছে একটা সেতু। তাদেরও ঐ সেতু পেরিয়ে আসতে হবে। কিন্তু কণ্ঠস্বর দেখি থেমে গেল। ওদের ভাষাটাও ত ঠিক ধরতে পারছি না—শ্রবণশক্তিও বুঝি নষ্ট হয়ে গেল। হে দয়াময়, ওরা যেন আমাদেরই লোক হয়। আমি চেঁচালে ওরা সেই সেতুর উপর থেকেই শুনতে পাবে।

এত দেরি করছে কেন ওরা? আর যে আমি অপেক্ষা করতে পারছি না। সেই দুর্গন্ধের কথাও আর আমার এখন মনে নেই।

অকস্মাৎ সেতুর উপর দেখা গেল কসাক সৈন্যদের গায়ে তাদের নীল কোর্ত্তা। হাতে বল্লম। সংখ্যায় তারা একশত জন। চমৎকার একটা ঘোড়ায় চড়ে কালো দাড়িওয়ালা একজন সৈন্যাধ্যক্ষ আসছেন সবার আগে আগে। সেতু পার হতে না হতেই সৈন্যাধ্যক্ষটি মুখ ঘুরিয়ে হুকুম দিলেন।

"মার্চ !"

"থামি, থাম, ভগবানের দোহাই একটু থাম ! বন্ধুগণ রক্ষা কর, আমায় রক্ষা কর।" বলে চেঁচিয়ে উঠলাম।

কিন্তু ঘোড়ার খুরের শব্দে, অস্ত্রের ঝনঝনানিতে, ওদের কথাবার্ত্তায় আমার কণ্ঠস্বর ডুবে গেল। আমার আহ্বান ওদের কানে গেল না ! হা ভগবান ! পরিপূর্ণ অবসাদে আমি মাটিতে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলাম। আমার হাতের ধাক্কা লেগে পানপাত্রটা কাৎ হয়ে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে যে জল ছিল আমার প্রাণ, আমার মুক্তি, মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখবার যে ছিল শেষ সহায় তা গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল। অর্দ্ধেক গ্লাসের মত জল পানপাত্রে থাকতে এটা আমার নজরে পড়ল। কিন্তু তখন আর কিছু করবার উপায় নেই। লোভাতুরা, তৃষিতা ধরিত্রী তা তখন নিঃশেষে শুষে নিয়েছে।

তখনকার অবস্থা বুঝিয়ে বলবার মত শক্তি আমার নেই। অর্ধনিমীলিত নয়নে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলাম। বাতাস তখন এলোমেলো ভাবে বইছিল—তাই এই দুর্গন্ধের ফাঁকে ফাঁকে পাচ্ছিলাম সতেজ টাটকা হাওয়া। আমার পড়শীর অবস্থা হয়ে উঠেছে বীভৎস। একবার চোখ মেলে ওর দিকে তাকাতেই সমস্ত শরীরে একটা বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল। ওর মুখে মাংসের কোন চিহ্ন নেই। হাড়গুলো দেখা যাচ্ছে। দাঁতগুলো সব বেরিয়ে পড়েছে। উঃ কী বিকট সে মূর্ত্তি ! আমি নিজের হাতে মানুষের মাথার খুলি নেড়েছি, মস্তকও ব্যবচ্ছেদ করেছি কিন্তু এমনটি আর দেখিনি। ভয়ে এবং ঘৃণায় আমার সমস্ত শরীর সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। কঙ্কালে গাঁয়ের কুর্ত্তার বোতামগুলি সূর্য্যকিরণে জ্বল জ্বল করছিল। "এই ত যুদ্ধ" আমি মনে মনে ভাবলাম, "আর ওগুলো হচ্ছে তারি নিদর্শন।"

রৌদ্রতাপের প্রখরতা একটুও কমেনি। আমার হাত আর মুখ জ্বালা করতে লাগল। বাকী জলটুকুর শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত পান করে ফেল্‌লাম। ভাবলাম একচুমুক খেয়েই বাকীটুকু রেখে দেব। কিন্তু পারলাম না। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল—তাই এক নিঃশ্বাসেই সবটুকু ফুরিয়ে গেল। ভাবলাম ঃ কসাকরা যখন নিকটে এসেছিল তখন চেঁচালাম না কেন ? যদি ওরা তুর্কী হত তবুও ওদের হাতে পড়লে এই নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হত না। ওরা হয়ত দু' এক ঘণ্টা অত্যাচার করত—কিন্তু এখানে আরও যে কতক্ষণ যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে তা কে জানে ?

মা ! মাগো ! কোথায় তুমি ? আমার এই দুরবস্থার কথা শুনলে তোমার কি অবস্থা হবে ? নিজের চুল ছিঁড়ে, দেয়ালে মাথা কুটে ভগবানকে অভিশাপ দেবে। অভিশাপ দেবে তাদের যারা মানুষের প্রতি অত্যাচার করবার জন্যই আবিষ্কার করেছিল যুদ্ধ।

কিন্তু তুমি আর প্রিয়তমা মাশা হয়ত আমার এই নরকযন্ত্রণার কোন সংবাদই পাবে না ! যাক্, বিদায় মা, বিদায়। ওগো প্রেয়সী আমার, বিদায়। উঃ কি কষ্ট, কি যন্ত্রণা। আমার দম যে বন্ধ হয়ে আসছে—

আঃ সেই কুকুরের ছানাটা ! কিন্তু কি নির্দয় সেই দারোয়ানটা, বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে ওর

মাথাটা আচ্ছা করে ঠুকে দিল দেয়ালের সঙ্গে, তারপর ফেলে দিল ময়লা জল আর আবর্জনা ভরা পচা নর্দমায়। সারাটা দিন ও ওখানে পড়ে কষ্ট পেয়েছিল। কিন্তু আমি যে ওর চেয়েও হতভাগা— আজ তিনদিন ধরে যন্ত্রণায় ভুগছি। কালকে হবে চারদিন—তারপর পাঁচ, তারপর ছয়—ওগো মরণ তুমি কোথায়? তুমি এসো, এসো, এসে তোমার ঐ শান্ত শীতল ক্রোড়ে আমায় টেনে নাও!

মৃত্যু কিন্তু আসল না—তার ক্রোড়ে আমায় স্থান দিল না। এই প্রচণ্ড সূর্য্যতাপের মাঝেও আমি পড়ে আছি, উন্মুক্ত প্রান্তরে—নিশুষ্ক ওষ্ঠ ভিজাবার মত একফোঁটা জল নেই। সম্মুখে ওই গলিত শব। হাজার হাজার পোকা ওর গা বেয়ে নেমে বেশ চলে যাচ্ছে! ওকে খেয়ে প্রায় শেষ করে এনেছে। তারপরেই ত আমার পালা! আমারও ত অম্নি অবস্থাই হবে!

দিনটা কেটে গেল। তারপর রাত্রিটাও। কোথাও কোন পরিবর্তন নেই। ধীরে ধীরে ভোর হল—ঠিক আগেরই মত। বেলা বাড়তে লাগল—

মৃদু বাতাসে লতাগুল্মে জাগল মর্মরধ্বনি; ওরা যেন কানাকানি করছে—বলছে, "ও মরবে, ও মরবে, মরবে।"

জবাবে কারা যেন বলে উঠল, "ওকে কেউ দেখবে না, দেখবে না, দেখবে না।"

"এদের দেখতে পাওনি," আমার খুব কাছে এসে কে যেন ভারী গলায় বলে উঠল।

হঠাৎ আঁৎকে আমি সজাগ হয়ে উঠলাম।

এ যে আমাদের ল্যান্স-কর্পোরাল টোকোলেভ্, ওর দুটো দয়ার্দ্র নীল চোখ মেলে চেয়ে আমার দিকে।

"কোদাল আন," ও চেঁচিয়ে উঠল, "এখানেও দুটি লোক আছে দেখছি।"

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "কোদালের দরকার নেই, আমি ত মরিনি, আমায় কবর দেবে কি?" কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না, শুধু একটা ক্ষীণ আর্তনাদ ছাড়া।

"ভগবান, ওকি বেঁচে আছে? এযে আমাদের আইভানোভ্। এই, এদিকে শীগ্‌গির এসো। ও এখনো বেঁচে আছে। শীগ্‌গির ডাক্তার ডাকো।"

মুহূর্তে ভডকা আর জল ওরা নিয়ে এলো। ধীরে ধীরে আমার সমুখ থেকে দিনের আলো মুছে গেল। ষ্ট্রেচারটা দুলতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহটাও। ভারী আরাম লাগছিল। ক্ষণিকের জন্য চেতনা ফিরে এল, তারপর আবার অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

"থাম! ষ্ট্রেচার তুলে নাও! বেশ এবার চল, মার্চ!" হুকুম দিচ্ছিলেন আমাদের Red cross officer, পিটার আইভানোভিচ্। দেখতে তিনি খুবই লম্বা, ছিপছিপে আর ভারি দয়ালু। ষ্ট্রেচারে শুয়ে শুয়েও আমি ওর মাথা বেশ পরিষ্কার দেখছিলাম—এত লম্বা তিনি।

"পিটার আইভানোভিচ্," আমি অস্ফুটে ডাকলাম।

"কিছু বলছ আমায়?" সে আমার উপর ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলে।

"ডাক্তার তোমায় কি বল্লেন পিটার? আমি বুঝি বেশী দিন বাঁচব না?"

"কি বাজে বকছ, আইভানোভ ! মরবে কি হে ! তোমার হাড়গুলো জবর শক্ত। আচ্ছা এই সাড়ে তিনটা দিন কি করে বাঁচলে হে ? কি খেয়েছিলে এ কদিন ?"

"কিছুই না।"

"পান করেছিলে কি ?"

"ওই তুর্কীটার জলের বোতল আমি নিয়ে এসেছিলাম। আমি এখন বেশ বলছি পিটার, কে জানে হয়ত পরে—"

"থাম এখন। ভগবান তোমার সহায় হোন ! এবার একটু ঘুমাও তুমি।"

একটু পরেই আবার চেতনা হারিয়ে ফেললাম।

হাসপাতালে এসে জ্ঞান হ'ল। ডাক্তার আর নার্স এসে আমাকে ছেঁকে ধরল। এদের ভেতর একজন ডাক্তারকে চিনতে পারলাম। তিনি হচ্ছেন পিটার্সবার্গের একজন নামজাদা সার্জেন। নীচু হয়ে তিনি আমার পা দুটো পরীক্ষা করছিলেন। তাঁর হাতে রক্ত মাখা। খানিকক্ষণ পাটা নাড়াচাড়া করে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন :—

"তোমার অদৃষ্ট খুব ভাল। এজন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করতে পার। জীবনের কোন আশঙ্কা নেই। একটা পা হয়ত কেটে ফেলতে হবে—এ অবশ্য তেমন কিছুই নয়। কথা বলতে তোমার কিছু অসুবিধা হচ্ছে না ত ?

কিছুই হচ্ছে না বলেই এখানে যা লিখলাম ওঁদেরও আমি তাই বলেছি।*

* রুশ দেশীয় গল্প হইতে
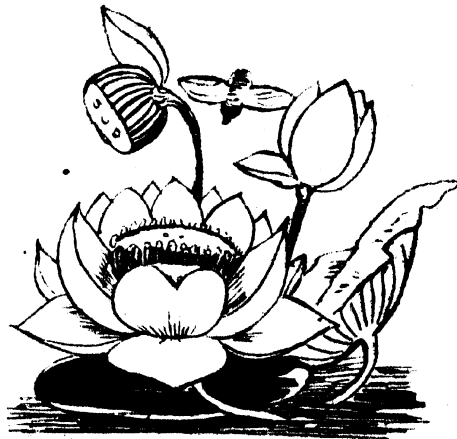
ফ্যাসিজম্‌, কম্যুনিজম্‌ ও ভারতবর্ষ

শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ

মহাযুদ্ধের পর এই কয়েক বৎসর ধরিয়া ইউরোপের চিত্রপট এত দ্রুত সিনেমার তালে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, যে তাহার তুলনায় পিছনের দিকের শতাব্দীগুলির দিকে তাকাইয়া দেখিলে মনে হয়, তাহারা যেন সব মন্দাক্রান্তাছন্দে চলিয়াছিল। রাতারাতি রাশিয়াতে কম্যুনিজম্‌ অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করিল এবং নবপ্রেরণার আবেগে অনুভব করিল যেন দেখিতে-না-দেখিতে পৃথিবীটারই রূপ বদলাইয়া দিবে। পাঁচ ছয়টা বৎসর অতিক্রান্ত না হইতেই রোম সভ্যতার গর্ব্ব ভূতপূর্ব্ব সোস্যালিষ্ট মুসোলিনীর স্কন্ধে ভর করিল, ফ্যাসিষ্ট্‌ মূর্ত্তিতে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া তিনি কম্যুনিজম্‌কে পাল্টা জবাব দিলেন। পিছনে পিছনে আর্য্যসভ্যতার বাহন হইয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল জার্ম্মেনী,—অভিনব নাৎসী হুঙ্কার। তারপর আজ রাজ্যে রাজ্যে তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতেছি। ফ্যাসিজমের প্রথম আবির্ভাবে আমরা নিপীড়িতের দল মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, ইহা টলটলায়মান ধনতান্ত্রিকতার শেষ মরণ-কামড়। সুতরাং ভয় কি? কিন্তু আজ দেখিতেছি, মরণ-কামড় বড় সহজ কামড় নয়, মরিবার আগে সারা পৃথিবীটাকে মারিয়াই যায় নাকি, তারই বা ঠিক কি'?

পশ্চিমের সমস্ত তরঙ্গাভিঘাতের মত এই ফ্যাসিজম্‌-কম্যুনিজমের তরঙ্গও ভারতবর্ষের উপকূলে আসিয়া আঘাত করিতেছে। গর্জ্জন 'বেশ পরিষ্কার শোনা যায়। আমাদের দেশের মধ্যে এই যে আজ ভিন্ন ভিন্ন দিকে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইতেছে, তাহার মূল স্বভাবজাতভাবে মাটির মধ্য হইতে উঠিতেছে, কি ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখম্‌ হইয়া চারিদিক আচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, ঠিক বুঝিতে না পারিলেও ইহাদের অস্তিত্ব ও পরস্পর সংঘাতকে আজ আর অস্বীকার করা যায় না। কম্যুনিজমের জন্ম ইতিহাসের হিসাবে ফ্যাসিজমের চেয়ে আগেকার, সেই অনুসারে ভারতবর্ষেও ইহা ফ্যাসিজমের চেয়ে আগে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। কিন্তু কিছুকাল হইতে আমাদের রাজনীতিক গগনে শুধু যে কম্যুনিজমের বার্ত্তা শুনিতেছিলাম, সম্প্রতি তাহার মধ্যে ফ্যাসিজমের কাণাকাণিও শোনা যাইতেছে। ফ্যাসিষ্ট নামধারী কোনও দল এখনও ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয় নাই সত্য, কিন্তু মতের দিক দিয়া যে একটি ফ্যাসিস্ত মতবাদ সুস্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে, সেবিষয়ে আজ সন্দেহের অবকাশ নাই।

বিদেশী শাসনের বিলোপ না হওয়া পর্য্যন্ত দেশে আমাদের ইচ্ছানুযায়ী কম্যুনিষ্ট বা ফ্যাসিষ্ট কোনও তন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না, একথা সত্য, এবং এই শাসন ধ্বংস করিতে হইলে কোন্‌ পন্থা সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত ও সম্ভবপর, সেই প্রশ্নের মীমাংসাই আজ আমাদের সম্মুখে সব চেয়ে

বড় কথা। কিন্তু তথাপি দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া যেদিন আমরা স্বাধীন ভারতে পৌছিব, সেদিনকার সমাজের রূপ কি হইবে, তাহাও গোড়া হইতেই সমগ্রভাবে পরিষ্কার করিয়া লওয়া বাঞ্ছনীয়। আজ যখন আমরা নানাভাবের নানাকথা শুনিতে ও ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছি, তখন সংঘবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে কথাগুলিকে আরও পরিষ্কার করিয়া ভাবিবার ও বলিবার সাহস থাকা ভালো। নতুবা গোঁজামিল দিয়া হাত মিলাইতে গেলে সে সংঘবদ্ধতা সহজেই শিথিল হইয়া পড়িবে। ভবিষ্যৎ আদর্শের সুস্পষ্ট আলোকে সংগঠিত হইতে থাকিলেই পথের মধ্যে অকারণ শক্তিক্ষয় কম হইবার সম্ভাবনা।

ফ্যাসিজম্, সোশ্যালিজম্ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ যাঁহারা পোষণ করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ আদর্শের শ্রেষ্ঠতা, যৌক্তিকতা ও ব্যবহারিক সম্ভবপরতা প্রভৃতি নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন। কোনপক্ষেই যুক্তিপূর্ণ গবেষণাগ্রন্থের অভাব দেখি না। কারণ, লোক ভিন্নরুচি, এবং রুচি অনুসারেই যুক্তি তৈয়ার হয় ও গ্রাহ্য হয়। সকলই আপেক্ষিক। সুতরাং ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কোনটি কার্য্যকরী হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে, কে বলিতে পারে? আজকাল সমাজজীবন ও ব্যক্তিজীবন সর্ব্বত্রই পারিপার্শ্বিকের প্রভাবকে অতিশয় বড় করিয়া মানিয়া লওয়া হয়। অনেকেই মনে করেন, মানবসমাজ ও ব্যক্তিজীবন একমাত্র তাহার পারিপার্শ্বিক দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া চলিয়াছে। ধারণাটি সম্পূর্ণ সত্য কিনা জানি না, তবে অনেকাংশেই সত্য এবং প্রবল সত্য, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু পারিপার্শ্বিক বলিতে যাঁহারা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক পারিপার্শ্বিক বুঝিয়া থাকেন, তাঁহাদের সহিত একমত হইতে দ্বিধা আছে। মানুষের নানা পারিপার্শ্বিক নানাভাবে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহার মধ্যে আর সবগুলিকে অন্তরালে ফেলিয়া একমাত্র অর্থনীতির প্রভাবটিই যদি লক্ষ্য করি, এবং তদনুসারী ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়া জীবনকে নিয়মিত অথবা পরিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করি, তবে অনেক সময় বিফলমনোরথ হইবার সম্ভাবনা। যেগুলিকে নগণ্য মনে করিয়া বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিলাম না, তাহারাই হয়তো চুপে চুপে বড় হইয়া অতর্কিত আক্রমণে আমাদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে পারে।

এই আশঙ্কা মনে জাগে বলিয়াই বর্ত্তমান ভারতবর্ষের অবস্থা ও পারিপার্শ্বিককে সমগ্রভাবে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ফ্যাসিজম্-কম্যুনিজমের প্রতি ভারতীয় মনোভাব ও ভারতে ইহাদের সফলতা বিফলতার সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন ও সমস্যা দেখিতে পাই। রাশিয়াতে যখন সোভিয়েটতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার প্রাক্কালে রাশিয়ার বাহিরের পরিপার্শ্ব যেরূপ ছিল, আমাদের আজিকার ভারতবর্ষকে মিলাইয়া দেখিলে তাহার সহিত কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। রাশিয়ার ভৌগোলিক আয়তন, তাহার লোকসংখ্যার বিপুলতা, তাহার ভাষার বহুবিচিত্রতা ভারতবর্ষের অনুরূপ; রাশিয়ার জনগণের দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা, তাহাদের কৃষিপ্রাধান্য ও যন্ত্রপ্রভাবের অপ্রাচুর্য্য ভারতবর্ষের তুলনায় উনিশ ও বিশ মাত্র; রাশিয়ার তাৎকালীন

মধ্যযুগীয় ও সংস্কারবহুল সমাজপ্রথার সহিতও আধুনিক ভারতবর্ষের সাদৃশ্য অনেক। সুতরাং রাশিয়াতে সেই অবস্থার ভিত্তির উপরে যে নূতন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইয়াছিল, আজিকার ভারতবর্ষেও তাহা সম্ভবপর না হওয়ার কারণ নাই, এরূপ আশা অনেকে করিতে পারেন। (অবশ্য তৎকালীন রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সহিত আমাদের মিল আদৌ নাই, ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য)। অন্যদিকে, ফ্যাসিজ্‌মের জন্মভূমি ইটালী ও পদাঙ্কানুসারী জার্ম্মেনীর পানে তাকাইলে বাহিরের অবস্থার দিক্ দিয়া ভারতের এরূপ কোনই সাদৃশ্য দেখিতে পাই না। বরঞ্চ বৈসাদৃশ্য অনেক। কিন্তু ফ্যাসিজ্‌ম যে মতবাদ জগতের সম্মুখে দাঁড় করাইয়াছে তাহার সহিত ভারতবর্ষের মজ্জাগত মতবাদের মিল অনেকখানি। প্রথমতঃ, ফ্যাসিজ্‌মের গোড়ার কথা একনায়কত্বে নির্ব্বিচার আনুগত্য, এবং ভারতবর্ষের সমাজনীতিরও তাই—রাজপদে নির্ব্বিচার চলা ভক্তি। বহুনায়কত্বের প্রতি উভয়েই অনাস্থাবান্। উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা ইউরোপ হইতে ডিমোক্র্যাসীর মন্ত্র আমদানী করিয়া আনিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতে পারি নাই। দ্বিতীয়তঃ, ফ্যাসিষ্ট সমাজের প্রধান কথা বৈষম্য ও শ্রেণী বিভাগ. ভারতবর্ষের মনে প্রাণেও গাঁথিয়া আছে সনাতন জাতিভেদপ্রথা ও অধিকারীভেদ। তৃতীয়তঃ, ফ্যাসিজম্ ব্যক্তিগত সম্পত্তিপ্রথা রক্ষণে যত্নপর, এবং ভারতবাসী এ প্রথার প্রতি এত আস্থাবান যে প্রাণ গেলেও পৈত্রিক ভিটাখানি কদাপি ছাড়িতে পারে না। বাস্তুভূমির প্রতি এমন অতিরিক্ত অনুরক্তি অন্য কোনও জাতির মধ্যে আছে কিনা সংশয়। চতুর্থতঃ, ফ্যাসিজ্‌ম্ পুরুষ ও নারীর মধ্যে একটি দৃঢ় ব্যবধান তুলিয়া দিয়া নারীকে রন্ধনশালায় সীমাবদ্ধ করিতে, ও কেবলমাত্র বীর প্রসবিনীত্ব দ্বারাই জীবন সার্থক করাইতে ব্যগ্র; এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের সহিত ইহার ঐক্য এত আশ্চর্য্য যে এবিষয়ে বলাই বাহুল্য। পঞ্চমতঃ, আর্য্যরক্ত অথবা রোমকরক্ত বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য হতভাগ্য ইহুদীদের উপর নৃশংস অত্যাচার করিতে ফ্যাসিজ্‌মের গৌরবের অবধি নাই, আর ভারতবাসী হিন্দুর প্রাচীনকাল হইতে ম্লেচ্ছনিবহনিধনে যে কি ঐকান্তিক প্রযত্ন, তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। শেষতঃ, ভারতবর্ষ 'ধর্ম্ম ধর্ম্ম' করিয়া পাগল, এবং ফ্যাসিজ্‌ম্ ধর্ম্মপাগল না হইলেও ধর্ম্মের ধ্বজাটিকে আস্ফালিত করিয়া রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ।

অতএব দেখিতে পাই বাহিরের অবস্থার দিক দিয়া রাশিয়ার সহিত ভারতবর্ষের কয়েকটি সাদৃশ্য এবং ভাবের ও সংস্কারের দিক দিয়া ফ্যাসিষ্ট মতবাদের সহিত ঘনিষ্ঠ ঐক্য। সুতরাং কোনটিকে গ্রহণ করিতে বর্ত্তমান ভারতবর্ষ উন্মুখ অথবা বাধ্য হইবে বলা কঠিন। যাঁহারা কম্যুনিজম পন্থী তাঁহারা অর্থনৈতিক ও বাহ্যিক পরিপার্শ্বকেই অধিক বলশালী মনে করেন বলিয়া এই অন্তরায় গুলিকে ততটা প্রাধান্য হয়তো দেন না, কিন্তু বস্তুতঃ সংস্কারের শক্তিও অতিশয় প্রবল এবং হয়তো বা সূক্ষ্ম বলিয়াই অধিকতর কার্য্যকরী। এবং এই যে সংস্কার, ইহা কেবলমাত্র যে সমাজের উচ্চস্তর গুলিতেই সীমাবদ্ধ তাহা নয়, ইহার কতকগুলি ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণেরই মধ্যে অক্টোপাসের মত জড়াইয়া আছে। ক্ষুধার তাড়না জীবের আদিমতম তাড়না হইলেও সংস্কারে

শক্তিও মানুষের মনে কম উগ্র নয়। বিশেষতঃ ফ্যাসিজ্‌ম্ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবারও লোভ দেখায়, অধিকন্তু সংস্কারগুলিকেও পরিপুষ্ট করে। সুতরাং ভারতবর্ষের মাটিতে লড়াই করিয়া এই ফ্যাসিজ্‌ম্‌কে হটাইয়া দেওয়া কম শক্ত কথা হইবে বলিয়া বোধ হয় না। একে বর্ত্তমান ভারতবর্ষ অতিমাত্রায় জড় ও রক্ষণশীল, নূতন কোনও আলোক গ্রহণ করিতে একান্ত কুণ্ঠিত, তাহাতে ফ্যাসিজ্‌মের সহিত স্বীয় সনাতনী প্রথাগুলির আশ্চর্য্য সৌভ্রাত্র্য, তদুপরি আজ ফ্যাসিজ্‌মের নাটকীয় বিজয়গতি ইউরোপভূমিতে চোখের সামনে অভিনীত হইতে দেখিতেছে সুতরাং প্রলুব্ধ হইবার কথাই। এতদিন যে পশ্চিমের সভ্যতার ছোঁয়াচ পাইয়া শিক্ষিত ভারতবাসী অন্ততঃ মৌখিকভাবেই কিঞ্চিৎ উদারতা ও সংস্কারমুক্ততা দেখাইতে সুরু করিয়াছিল, সেই পশ্চিমাঞ্চল হইতেই যখন আজ বজ্রবে আমাদের মনুসংহিতার পুনরাবৃত্তির নজীর পাইয়াছে, তখন যে প্রতিক্রিয়ার উল্লাসনৃত্য আরম্ভ হইবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক।

তাই মনে হয়, কম্যুনিজ্‌মের উদার সাম্যনীতি আমাদের বঞ্চিত শোষিত জীবনের কাছে যতই লোভনীয় ও বরণীয় হইয়া দেখা দিক না কেন, ভারতবর্ষের যুগসঞ্চিত সংস্কারগুলি ফ্যাসিজ্‌ম্‌কে ইহার প্রবল প্রতিপক্ষরূপে দাঁড় করাইবে। আজকাল মুখে মুখে যাঁহারা সোস্যালিজ্‌মের কথা অনবরত কহিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের নিকট উহা শুধু মুখের কথা; অনেককে একটুখানি তলাইয়া নাড়া দিলেই ভিতরকার গূঢ় সংস্কারাবদ্ধ জীবটি বাহির হইয়া পড়ে, এবং কেহ কেহ উহা ব্যবহার করেন মুখোসরূপে। সুতরাং আকাশে বাতাসে কম্যুনিজ্‌ম্ সোস্যালিজ্‌ম্ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইলেও তাহা বোধহয় ততখানি গভীর নয়, এবং ইতালী-জার্ম্মানী-জাপানের নগ্ন বর্ব্বরতা প্রত্যক্ষ করিয়া চক্ষুলজ্জার ভয়ে প্রকাশ্যে ফ্যাসিজ্‌মের পোষকতা কেহ স্বীকার না করিলেও তলে তলে ইহা সুদৃঢ় শিকড় বিস্তৃত করিতেছে বলিয়া শঙ্কা হয়। সুতরাং ফ্যাসিজ্‌ম্‌কে যদি ভারতবর্ষের মাটিতে প্রশ্রয় দিতে না চাই তবে কর্ম্মীদিগকে আরও সতর্ক ও অতন্দ্রিত হইয়া পাহারা দিতে হইবে, এ কথা যেন না ভুলি।

ফ্যাসিজ্‌ম্ অথবা কম্যুনিজ্‌ম্ কোন্‌টির পক্ষে ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করিবার সম্ভাবনা কতখানি, তাহাই অনুমান করিবার চেষ্টা করিলাম মাত্র। কোন্‌টি আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, সেকথা আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু একটি কথা মনে রাখা উচিত,—দেশে ও বিদেশে অহরহ কেবল 'কম্যুনিজ্‌ম্' ও 'ফ্যাসিজ্‌ম্' এই দুইটি শব্দের বাগ্‌বিতণ্ডা শুনিয়া এ ধারণা যেন আমাদের পাইয়া না বসে যে জগতে শুধু এই দুইটি শব্দই আছে। আমাদের রাজনীতিতে অথবা সমাজনীতিতে যে এই দুইটিরই একটিকে অবিকল অনুকরণ করিয়া লইতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। অনেককে এরূপ ধারণা পোষণ করিতে দেখি যে, যিনি ফ্যাসিজ্‌ম্ বিরোধী তাঁহার কম্যুনিষ্ট না হইয়া উপায়ান্তর নাই, এবং যিনি কম্যুনিজ্‌ম্‌কে বরণ করিতে অস্বীকৃত তিনি অবশ্যরূপে ফ্যাসিষ্টই হইবেন। কিন্তু এ ধারণাকে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করি। বহু শতাব্দীর দাসত্বের ফলে আমরা একটি দুর্ব্বল মনোভাব দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি বলিয়াই বোধহয়

আজ আমরা সকল দিকে স্বাধীন চিন্তাশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি। তাই বিদেশে বিশেষতঃ পশ্চিমদেশে যে সমস্ত তথ্য অথবা নীতি আবিষ্কৃত হইতে থাকে তাহারই পানে আমরা আকুল নয়নে চাহিয়া থাকি এবং তাহারই কোন-না-কোনটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আত্মোদ্ধারের প্রয়াস পাই। কিন্তু ইহা ছাড়াও কোনদিকে কোনও নূতন গবেষণার ক্ষেত্র আছে কিনা, তাহা খুঁজিয়া দেখিতে ভুলিয়া যাই। অন্যের প্রদর্শিত পথে পদাঙ্কানুসরণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ, তাই নিজের সাহসে ও বীর্য্যে জঙ্গল কাটিয়া পথ তৈরী করিয়া লওয়ার কথা মনেও হয় না। এক্ষেত্রেও তেমনই হইতেছে। অথচ এরূপ হইতে পারে যে, ফ্যাসিজ্‌ম্ অথবা কম্যুনিজ্‌ম্ ইহার কোনটিই মানবজাতির কল্যাণের পক্ষে সম্পূর্ণ নহে, সুতরাং একান্তভাবে বরণীয়ও নহে। হয়তো ভারতবর্ষ যাহা প্রতিষ্ঠিত করিবে, তাহা এ উভয়েরই অপেক্ষা অন্যরূপ। তাহার রূপটি কি হইবে, সে আদর্শটি কি তাহা আমাদের স্বকীয় প্রতিভাবলে আমাদেরই চিন্তনীয়। ইউরোপ খোরাক জোগাইবে আর আমরা শুধু হাত পাতিয়া লইব ও গলাধঃকরণ করিবার চেষ্টা করিব, ইহাই একমাত্র সম্ভাবনা নয়; আমরাও বৃহত্তর ও সম্পূর্ণতর কোনও পথের সন্ধান মানব জাতির কাছে নির্দ্দেশ করিতে পারি, এ সম্ভাবনাও হয়তো আছে।

বসন্তের গান

[Hermann Hesse]

অনুবাদক : **হরপ্রসাদ মিত্র**

ঝড়ের কান্না শুনি প্রতি রাত্রে
তার প্রকাণ্ড, ভিজে ডানা
কাঁপতে কাঁপতে দ্রুতবেগে এগিয়ে যায়।
স্বপ্নাতুর টিটিপাখী খ'সে পড়ে আকাশ থেকে।
এখন সমস্ত সৃষ্টি উঠেছে জেগে,
পৃথিবীর মাটিতে নতুন আনন্দের স্পন্দন।
বসন্ত দিয়েছে ডাক।

আহা, এই সব রাত্রে আমার চোখে ঘুম আসে না!
অন্তরে চঞ্চল যৌবনের আবেগ।
স্মরণের নীল হ্রদ থেকে বিচ্ছুরিত হয়
দূর প্রত্যূষের কবোষ্ণ উজ্জ্বলতা।
আমার চোখে, কী গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সেই আলো;
তারপর, কাঁপতে কাঁপতে অদৃশ্য হয়।

স্থির হও,—স্থির হও, হে অশান্ত মন!
বেদনার্ত্ত মধুর উত্তেজনা রক্তে দিক দোল,—
টানুক পুরাতন, পরিত্যক্ত পথ।
তবু, মনে রেখো, যৌবন আজ নিরুদ্দেশ,
—চিরকালের জন্য নিরুদ্দেশ॥

কবি চন্দ্রাবতী

বিনয়েন্দ্রনাথ রায়

বাংলার আদি নারী কবিদের মধ্যে চন্দ্রাবতীর স্থান অতি উচ্চে, তাঁহার রচিত কাব্য বাঙলায় অতুলনীয়, তাঁহার অমর লেখনীস্পর্শে যে সকল কাব্য সৃষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে 'মলুয়া', 'দস্যু কেনারাম', 'রামায়ণ' ও 'দেওয়ান বউ' সাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্পদ।

প্রত্যেক কাব্যে কতকগুলি বিশেষ বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, মানব মনের প্রতিটি অনুভূতির নিখুঁত রূপ ফুটাইয়া তোলাই তার মধ্যে অন্যতম, এই অনুভূতিই কাব্যের জীবন। অনুভূতিহীন কাব্য কাব্যই নয়। চন্দ্রাবতীর কাব্যে ইহার ব্যতিক্রম কোথাও দেখিতে পাই না। তিনি তাঁহার কাব্যে কোন জড় বস্তুকেও প্রাণহীন করিয়া রাখেন নাই। প্রত্যেকের মধ্যে তিনি প্রদান করিয়াছেন জীবনীশক্তির বিপুল স্পন্দন।

সহজ, সরল ভঙ্গীতে লিখাই তাঁহার অন্যতম কৃতিত্ব। মলুয়া, রামায়ণ, দেওয়ান বউ প্রভৃতি প্রত্যেকটি কাব্যেই ভাষার কোন বৃথা আড়ম্বর নাই—কথার মারপেঁচ নাই—কৃত্তিবাসের ভাষার ন্যায়ই সরস, স্বচ্ছ ও সহজবোধ্য।

এই অমর কবির কাব্য পাঠে মনপ্রাণ মাতিয়া উঠে—কাব্যের আলোচ্য চরিত্রগুলি যেন বর্ণনার মাধুর্য্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পাঠকের সম্মুখে আসিয়া বায়স্কোপের পট পরিবর্ত্তনের ন্যায়ই একে একে সরিয়া যায়। এমনই ছিল তাঁহার বর্ণনার সাবলীল গতি, স্বামীহারা "মলুয়ার" দুঃখের কাহিনী তিনি এমন দক্ষ শিল্পীর ন্যায় আঁকিয়াছেন যে অতি পাষাণ হৃদয়ও তাহা পাঠে চোখের জল না ফেলিয়া পারিবে না। এ হেন মহাকবির কাব্যের অনুবাদ পাঠ করিয়া রোমারোঁলা প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণ আজ তাঁহার আত্মার উদ্দেশ্যে প্রণতি জানাইয়াছেন।

পূর্ব্ব মৈমনসিংহের কোন পল্লীতে এই অমর কবির জন্ম, তাঁহার পিতা দ্বিজ বংশীদাস একজন বিদ্যোৎসাহী এবং সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, সংস্কৃত ভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়া তিনি নিজ অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করেন। এই জ্ঞানচর্চ্চা তিনি অধিক দিন করিতে পারেন নাই—গরীব ঘরের চিরন্তন নির্ম্মম সত্য জঠর জ্বালার হাত তিনি এড়াইতে পারেন নাই। চন্দ্রাবতী তাঁহার পিতার অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

> "দূরিতে দারিদ্র্য দুঃখ দিলা উপদেশ।
> ভাসান গাইতে স্বপ্নে করিলা আদেশ॥
> মনসা দেবীরে বন্দি[১] করি করযোড়।
> যাঁহার প্রসাদে হৈল দুঃখ দূর॥"

---

১ বন্দনা করি।

সেই হইতে বংশীদাস স্বপ্নাদেশ মত 'মনসা ভাসান" গান করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। আজও শুনিতে পাওয়া যায় বংশীদাস এত দরদ দিয়া "মনসা ভাসান" গাইতেন যে মানুষ-ত দূরের কথা বনের পশুপাখীও স্তব্ধ বিস্ময়ে তাঁহার গান শুনিত। সত্য হউক মিথ্যা হউক তিনি যে বড় গাইয়ে ছিলেন সে "কেনারাম" নামক চন্দ্রাবতীর কাব্যেই প্রমাণ পাওয়া যায়। যে দুর্দ্দান্ত দস্যুর মানুষের প্রাণ সংহার করাই পেশা ছিল সেই রত্নাকর সদৃশ কেনারামও বংশীদাসের গান শুনিয়া দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিল। এইভাবে ভারতের বনে একদিন দস্যু রত্নাকরও দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া মহর্ষি বাল্মিকী হইয়াছিলেন—আর দস্যু কেনারাম হইল সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। পিতার গানের মাহাত্ম্যে কেনারামের কি ভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন আসিল তাহাই চন্দ্রাবতী বলিতেছেন—

আকাশ চাঁদোয়া হইল কান্দে[১] পশু পাখী।
কেনারাম বসিল যে হাতের খাণ্ডা[২] রাখি ॥
*   *   *   *   *   *
যখন গাইলা পিতা বেউলা[৩] হইল রাড়ি[৪]।
কেনারামের চক্ষে জল বহে দরদরি ॥
*   *   *   *   *   *
যখন গাইলা পিতা মনসা ভাসান।
ফেলিয়া হাতের খাণ্ডা কান্দে কেনারাম ॥"

চন্দ্রাবতীর বয়স যখন সাত আট বৎসর তখন হইতেই তাঁহার লেখাপড়া শিখিবার জন্য একান্ত আগ্রহ জন্মিল। বংশীদাসও বাড়ীতে থাকা কালীন তাঁহাকে আগ্রহ সহকারে বিদ্যাশিক্ষা দিতেন; তখনই তিনি কন্যার অস্বাভাবিক ভাবের পরিচয় পান। মেধাবিনী চন্দ্রা অল্পদিনেই মেধাশক্তির বিশেষ পরিচয় প্রদান করিলেন। এমনি করিয়া লেখাপড়া, খেলাধূলা, ঝগড়াকলহের ভিতর দিয়া চন্দ্রাবতীর দিন গড়াইয়া যায়—যেমন করিয়া দুনিয়ার সকল ছেলেমেয়েদের দিন কাটে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপনার অজ্ঞাতসারেই বীণাপাণির বীণার ঝঙ্কার তাঁহার গতানুগতিক জীবনের উপর দিয়া ঝড় তুলিয়া দিল। চন্দ্রাদেবীও কাব্যকুসুমাঞ্জলী লইয়া বীণাপাণির চরণ প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পিতার উৎসাহে তিনি কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

এই সময় জয়ানন্দ নামক এক যুবক চন্দ্রার হৃদয়দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার জীবনের আর এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। জয়ানন্দ সুপুরুষ, বিদ্বান অধিকন্তু কবিও বটে। উভয়েই কাব্য রচনায় বিভোর হন, এবং ধীরে ধীরে উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের বীজ অঙ্কুরিত হইতে থাকে।

১ কাঁদে ২ তরবারী ৩ বেহুলা ৪ বিধবা

চন্দ্রাবতীর বয়স চৌদ্দ হইল, দেহ তাঁহার যৌবনের জোয়ারে কাণায় কাণায় ভরিয়া গিয়াছে, বংশীদাস কন্যার বিবাহের পাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, জয়ানন্দ ইহা শুনিয়া চন্দ্রাকে বিবাহ করিতে চাহিল। উভয় পক্ষই সানন্দে সম্মতি প্রদান করিলেন।

ক্রমে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। আয়োজন সম্পূর্ণ। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, বরের দেখা নাই। ক্রমে তাহারা সংবাদ পান যে জয়ানন্দ গোপনে এক মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করিয়া ধর্ম্মত্যাগ করিয়াছে।

বাড়ীতে পড়িয়া যায় হাহাকার। বাদ্যভাণ্ড থামিয়া যায়। উৎসব মুখরিত বংশীদাসের বাড়ীতে হঠাৎ যেন উল্কাপাত হইয়া সবকিছু চুরমার করিয়া করিয়া দিল। চন্দ্রাবতীর তাসের ঘর অকালে ভাঙ্গিয়া পড়ল। কবি নয়ানচান্দ চন্দ্রাবতীর অবস্থা সংক্ষেপে লিখিলেন—

"না হাঁসে না কাঁদে কন্যা নাহি বলে বাণী।
আছিল[১] সুন্দরী কন্যা হইল পাষাণী॥
সুধাইলে না কহে কথা মুখে নাই হাসি।
এক রাত্রে ফোটা ফুল হইয়া গেল বাসি॥
* * * * * *
শৈশবের যত কথা আর ফুল তোলা।
ফুলেশ্বরী[২] জলে নামি আর জল খেলা॥
সেই হাসি সেই কথা সদা পড়ে মনে।
ঘুমাইলে দেখে কন্যা তাহারে স্বপনে॥
নয়নে না আসে নিদ্রা অঘুমে রজনী।
ভোর হইলে উঠে কন্যা যেন পাগলিনী॥"

গ্রামের পাঁচজন অবশ্য চন্দ্রাবতীকে আবার বিবাহ দিতে চাহিল। কিন্তু চন্দ্রা আর কিছুতেই বিবাহ করিতে চাহিলেন না। তিনি আজন্ম ব্রহ্মচারিনী থাকিয়া দেবতার আরাধনায় ও কাব্য চর্চ্চায় জীবন উৎসর্গ করিবেন স্থির করিলেন। বংশীদাসও বঙ্গসাহিত্য চর্চ্চায় নূতন প্রেরণা জাগাইয়া তুলিলেন। সব কথা ভুলিয়া, জয়ানন্দকে ভুলিয়া তিনি গ্রন্থ লিখনই জীবনের ব্রত করিলেন।

দিন গড়াইয়া যায়। চন্দ্রারও দিন কাটে। পিতাকে শিবপূজা করিতে দেখিয়া তিনিও শিবমন্ত্রে দীক্ষা নিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বংশীদাস আনন্দ সহকারে কন্যাকে নিজেই শিব-মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন।

১ ছিল ২ ফুলেশ্বরী নদী। অধুনা লুপ্ত

চন্দ্রাবতী অনন্যকর্ম্মা হইয়া শিবপূজা আরম্ভ করিলেন। পূজা শেষে পিতার নিকট নিত্য নূতন শিবস্তোত্র শিক্ষা করেন। ক্রমে দেখা গেল চন্দ্রাদেবী প্রহরের পর প্রহর ধ্যানে আবিষ্ট হইয়া থাকেন। বংশীদাস কন্যার জন্য বাড়ীতেই এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া পাষাণ শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। চন্দ্রাবতীর আর আনন্দের সীমা নাই। মন্দিরের ভিতর হইতে অর্গল বন্ধ করিয়া তিনি ধ্যানে মগ্ন হন। পূজাবসানে মন্দিরের বাহিরে আসিলে তাঁহার দেহে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে— অপূর্ব্ব সে সৌন্দর্য্য—স্বর্গের দেবী বলিয়াই ভ্রম হয়। এমনি করিয়া দিন কাটে।

এই সময়ে পিতার উপদেশে চন্দ্রবতী রামায়ণ লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার রচিত রামায়ণ বঙ্গসাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্পদ। আজও পূর্ব্ব মৈমনসিংহের ঘরে ঘরে তাঁহার রামায়ণের গানগুলি গীত হয়।

"চন্দ্রাবতী গাহে গান পাথর গইল্যা[১] যায়।"

নারীহৃদয় চন্দ্রাবতী যুদ্ধ বর্ণনায় তাঁহার রচিত রামায়ণে বেশী উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই।

তারপর তিনি তাঁহার পিতা-রচিত "মনসামঙ্গলের" ছায়া অবলম্বনে পদ্মপুরাণ নামক আর একখানি কাব্য বঙ্গসাহিত্যে উপহার দেন। সম্পূর্ণ স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন ছন্দে গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন।

ক্রমে তিনি মলুয়া, কেনারাম ও দেওয়ান প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। মলুয়াতে তাঁহার স্বাধীন চিন্তা সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। রচনার লালিত্যে, কাহিনীর বিচিত্রতায় অপূর্ব্ব সেই কাব্যখানি। বেহুলার ন্যায় আদর্শ সতী বাঙলার নারী জাতির সম্মুখে আর নাই। তাঁহারই আদর্শে গঠিত চন্দ্রাবতীর জীবন। বহু যুগ থেকেই বাঙলার নারী সতীত্বের আদর্শ স্থাপনে মহীয়সী। কোন দেশ কোন কালে বেহুলা, সাবিত্রীর ন্যায় সতী কল্পনা করিতে পারিয়াছিল? কোন সতী নারীর ভেলা মৃত স্বামীর সাথে দেবপুরে গিয়াছিল? কোন সতী নারী যুক্তিপূর্ণ তর্কে স্বয়ং যমরাজকে হারাইয়া স্বামীর জীবন পুরস্কার পাইয়াছিল?—সে আমাদের বেহুলা, সে আমাদের সাবিত্রী। বেহুলা, সাবিত্রীর সিঁথির সিঁদুর কোনদিন মুছিয়া যায় নাই। সত্য হউক—মিথ্যা হউক— বেহুলা জগতে অপূর্ব্ব সৃষ্টি—কল্পনার চরম বিকাশ। এই বেহুলা সৃষ্টি করিয়াছেন পিতা বংশীদাস আর কন্যা চন্দ্রাবতীর অমর তুলিকা স্পর্শে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল 'মলুয়া'। মলুয়া স্বর্গের দেবী—মর্ত্ত্যে আবির্ভাব আদর্শ সৃষ্টির জন্য—মলুয়ার স্বামীভক্তি জগতে দুর্ল্লভ—মলুয়া জগতের নমস্য।

সতীসাধ্বী সীতার তপ্তশ্বাসে যেমন বিপুল রাবণবংশ পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল তেমনি মলুয়ার চোখের জলে দুষ্ট কাজী ভাসিয়া গেল, দশাননের মুঠার ভিতর থাকিয়াও তাহার কুপ্রস্তাবে

১ গলিয়া

সীতা যেমন তীক্ষ্ণ ভাষায় ভর্ৎসনা করিতে ভয় পান নাই তেমনি মলুয়া একদিন অসদুদ্দেশ্যে প্রেরিত কাজীর লোককে তীক্ষ্ণ ভাষায় কহিলেন :—

"কাজীরে কহিও কথা নাহি চাহি আমি,
রাজার দোসর সেই আমার সোয়ামী [১]॥
* * * *
বাচ্যা[২] থাকুক স্বামী আমার লক্ষ প্রমাই পাইয়া।
কাজীর থানের মোহর ফেলি লাথি দিয়া ॥

এই স্বামীবিরহ বিধুরা মলুয়ার "বারমাসী" চন্দ্রাবতী এমন নিপুণ তুলিকা দ্বারা আঁকিয়াছেন যে তাহা পাঠে চোখের জল রাখা যায় না।

যে রূপের মোহে জয়ানন্দ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল সেই মোহ বেশীদিন থাকিল না। ক্রমে চন্দ্রাবতীর পূর্ণ ভালবাসার কথা মনে হওয়ায় সে বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় আঘাত পাইতে লাগিল। চন্দ্রাদেবীর সাহচর্য্যে সেও কবি হইয়াছিল—চন্দ্রার গান আজ মাঠে মাঠে ঘরে ঘরে গীত হয়—কিন্তু তাহার কবিত্বশক্তি যে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গেল, নিজের জীবনে আসিল ধিক্কার। প্রায়শ্চিত্য করিবে স্থির করিল—মহাদেবীর চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া ক্ষমা চাহিবে। জয়ানন্দ এই কয় লাইন লিখিয়া দিল—

"শুনরে প্রাণের চন্দ্রা তোমারে জানাই।
মনের আগুনে দেহ পুইড়া[৩] হৈছে ছাই ॥
অমৃত ভাবিয়া আমি খাইয়াছি গরল।
কণ্ঠেতে লাগিয়া আছে কাল হলাহল ॥
ভাবিয়া ফুলের মালা (লৈলাম) কাল সাপ গলে।
আনিয়াছি মৃত্যু আমি ডাকিয়া অকালে ॥
* * * *
জলে বিষ বাতাসে বিষ না দেখি উপায়।
ক্ষমা কর চন্দ্রাবতী ধরি তোমার পায় ॥
এই দেখা চক্ষের দেখা এই দেখা শেষ।
সংসারে আমার নাই সুখ শান্তি লেশ ॥
একবার দেইখ্যা[৪] আমি ছাড়িব সংসার।
কপালে লিখেছি বিধি মরণ আমার ॥"

জয়ানন্দ বহু চেষ্টায়ও ধ্যানমগ্না চন্দ্রাবতীর দেখা পাইল না, দারুণ ক্ষোভে, দুঃখে ও অনুশোচনায় সে নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল—আর উঠিল না।

---

১ স্বামী, ২ বাঁচিয়া, ৩ দগ্ধ, ৪ দেখিয়া।

জয়ানন্দের মৃত্যু সংবাদে চন্দ্রার মধ্যে কোনরূপ চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল না। আজ তিনি বিশ্বস্রষ্টার চরণে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার মন পার্থিব জগতের বহু উর্দ্ধে। সাধারণ লোকের ন্যায় জরা, মৃত্যু, শোক তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না।

জয়ানন্দের মৃত্যুর পরও চন্দ্রাবতী দশ বার বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সময় অধ্যাত্ম জীবনে প্রভূত উন্নতি ব্যতীত বিশেষ কোন বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় নাই। কবি নয়ানচান্দ চন্দ্রাদেবীর শেষ জীবনের কথা অতি সংক্ষেপে সুন্দরভাবে লিখিয়াছেন :—

"যোগাসনে বসে কন্যা নয়ন মুদিয়া।
শিবপূজা করে পুষ্প বিল্বপত্র দিয়া॥
শুকাইল অশ্রু গেল সর্ব্বচিন্তা দূরে।
একমনে পূজে কন্যা অনাদি শঙ্করে॥
কিসের সংসারবাস কেবা পিতামাতা।
পূজায় ভুলিল কন্যা সংসারের কথা॥
জয়ানন্দে ভুলি কন্যা পূজিল শঙ্করে।
মনপ্রাণ সমর্পিল দেব বিশ্বেশ্বরে॥

পূর্ব্বাপর

হাসিরাশি দেবী

ছোট,....টিন আর খড়ে ছাওয়া ষ্টেশান ঘরের জানালা থেকে প্রায় মাইল খানেক তফাতে যে কয়টা তাল নারকেল গাছকে লম্বা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, সে জায়গাটার নাম রাইগঞ্জ ; গণ্ডগ্রাম,...তাই সেখানে গ্যাসের আলো আর বাঁধা রাস্তা না থাকলেও মাটির রাস্তা আছে, যে রাস্তায় মোটর, বাস না চ'ললেও শুক্‌নো কাল থেকে জলকাদার কাল পর্য্যন্ত চলে—গো-যান। সে চলার চাকার আঘাতে পথের দুধার খোল হ'য়ে জমে ওঠে প্রায় হাঁটু খানেক জল আর কাদা, যেখানে অজান্তে না প'ড়লে সহজে নিজেকে এড়ানো তো যায়ই না উপরন্তু সমস্ত শরীরেই সে এঁকে দেয় স্নেহস্পর্শ।

এমনি গণ্ডগ্রামে একদিন যে লোকটি একখানি সাইকেল আর টর্চ্চলাইট নিয়ে রবারের ফিতে বাঁধা পাম্প্‌স্থ প'রে, গায়ে পাঞ্জাবী চড়িয়ে এসে হাজির হ'লো, তার নাম নুটুবেহারী। নুটুবেহারীর উপাধি পরামাণিক।

বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে, রোগা একহারা চেহারা, মুরুব্বী মুরুব্বী ভাব।

অনেকদিনের পর গ্রামে ফিরে নুটুবেহারী এসে দাঁড়ালো নীলুর মুদিখানার দোকানে। ঠোঁট বাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"আয় হয় এতে? এই পাড়াগাঁয়...তিন পয়সার দোকান ফেঁদে সংসার চালাতে পারো নীলু? দিন চলে?..."

গ্রামের অনেকের মতই নুটুবেহারীকে কেষ্ট-বিষ্টু-গোছ্ ঠাউরে সবিনয়ে নীলকণ্ঠ উত্তর দিলে

"ঐ কোনও রকমে বলা চলে বড় জোর,—আর তাও দেশ ঘর ব'লে, নইলে হাঁড়ি সিকেয় উঠতো।"

নুটুবেহারী পাঞ্জাবীর পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে নস্যলাগা নাক ঝাড়তে ঝাড়তে ব'ললে—

"ঐ জন্যেই তো জাতব্যবসা ছেড়েছি, অমনি কি আর? বড় দুঃখে; নইলে বাপ পিতেমোর ভিটে,...গাঁয়ে ব'সেই তাঁরা যা ক'রে খেয়েছেন—তাই ক'রে খেলে কি আর আমার একার পেট্‌টা ভ'রতো না?—খুব ভ'রতো, কিন্তু দেখ্‌লাম দেশকাল এখন আর সে রকম নেই—সব একদম পাল্টে গেছে।..."

সে আবার নস্য নেয়।

নীলকণ্ঠ জিজ্ঞাসা ক'রলে—

"কি করা হয় এখন ?—"

"এখন ?"

একটু ভেবে নুটু উত্তর দিলে—

"মাষ্টারী।"

"কোন স্কুলে ?"

একটু রূঢ়স্বরে নুটু ব'ললে—

স্কুল তো অনেক,—নাম ক'রলে চিনবি নাকি যে বড় শুধোচ্ছিস ? সে আর তোর এই পাড়া গাঁ নয়, তার নাম কল্‌কেতা শহর, সেখানে অলিতে গলিতে স্কুল-কলেজ খোলা,—হাজার হাজার পড়ো দু-বেলা এত এত বই খাতা নিয়ে পথ হাঁটাহাঁটি ক'রছে ; সেখানকার কোন জায়গাটার নাম ক'রলে চিনবি তুই ? তার এ কথায় শুধু নীলু নয়,—দোকান সমেত সবাই আশ্চর্য্য, অপ্রস্তুত হয় ; ভাবে সেখানে,—সেই ক'লকাতায় মাষ্টারী করে নুটুবেহারী—তাদেরই গাঁয়ের তারক পরামাণিকের ছেলে নুটুবেহারী !—যেমন এখানের তিন ক্রোশ তফাতের মাইনর ইস্কুলের মাষ্টারেরা ছেলে পড়ায়,—কথায় কথায় চোখ রাঙায়, বেত্ লাগায় দুষ্টু ছেলেদের,—তেমনি ?...না তারও বেশী। হয়তো এসব মাষ্টারদের চেয়েও তার সেখানে বেশী সম্মান....!

দিনের পর দিন ওরা একথা ভাবে, আনন্দে ওরা পুলকিত হয়, ঈর্ষাও হয় বোধহয়, ওর সৌভাগ্যে ; কিন্তু তা চেপে যায়, কারণ নুটু এখন শুধু বিদ্বানই নয়, মাষ্টারী ক'রে অনেক টাকাও জমিয়ে ফেলেছে।

নুটু প্রতিদিনই ওদের মধ্যে কিছুক্ষণ বসে,...সিগারেট খায়, নস্য নেয়, গল্প করে, তারপরে বলে—

"একটা লোক ধ'রে কিছু চাল ডাল, ঘি ময়দা, আর ভালো চা চিনি খানিকটা আমার বাড়ী পাঠিয়ে দিস্ তো নীলু,—আর দেখ্, আমি ভুলো মানুষ—মাথার ঠিক নেই,—যখন যা দিবি লিখে রাখিস খাতায়, মাসকাবারে দাম পাবি।"

নীলকণ্ঠ কৃতার্থ হয়—ভাবে মোটা খদ্দের...। বলে—তার জন্যে আর লিখব কী দা-ঠাকুর—তুমি টাকার মানুষ, তাতে অমন উঁচু মন তোমার, না লিখলেই কি তুমি আমার মত গরীবকে ঠকাতে পারো, না সে পিরবিত্তি হবে তোমার ?"

নুটু ওঠে ;—পানের ছোপে রাঙা দাঁত কয়টা বার ক'রে,—কাৎ করা বাইকখানা টেনে নিয়ে চলতে চলতে বলে—

"তা যা বলেছিস্ ;—ওরকম নজর আমার তো নয়ই, আমার ঠাকুরদারও ছিল না।"

সে চলে যায় ;

পরে দেখা যায়—হয় নীলকণ্ঠ লোক ধরে জিনিস পাঠাচ্ছে, নয় তো নিজেই বয়ে দিয়ে আসছে ছেলের সঙ্গে।

পুরানো বাড়ী নারাণ পরামাণিকের,—তাই পাকা কোঠাটার একপাশ পড়েছে ধ্বসে, আর কাঁচা গাঁথুনীর অন্য ঘরগুলো এতদিনের ঝড়ে জলে গ'লে ভেঙ্গে গেছে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে,—শুধু উঁচু পোঁতাগুলো সাক্ষ্য দেয় মাত্র।

সেই উঁচু পোঁতাগুলোর ওপরে আশশ্যাওড়া আর ফনীমনসা গাছের সঙ্গে মিলে মিশে প্রতিবাসিনী পাঁচুর মার লঙ্কার চারা পুঁইয়ের মাচা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, ওদের মাঝখানে গোটাকতক বেগুন গাছও দেখা যায়।

নুটুবেহারী বাড়ী ফিরতেই পাঁচুর মা ব'লেছে—

অন্যায় করেছি নুটু, তোমার ভিটেয় গাছ পুঁতে ;—কিন্তু কি করবো বল, অনাথ নিরাশ্রয় বিধবা মানুষ আমি, তোমাদের মুখ চেয়ে পেঁচোকে নিয়ে যখন বেঁচে আছি বাবা, তখন আমাকে দেখা—এমন কি সাহায্য করাও কি তোমাদের উচিত নয়? আর বেঁচে যখন থাকতে হবেই,—তখন মুখেও দুটো দিতে হবে বৈকি, কিন্তু পাই কোথায়?—তাই গাছ গাছড়ার ফলফুল বেচে দিন চলে। আর এ দীন দুঃখীকে তোরা না রাখলে কে রাখবে বাবা নুটু?—আজ তোর মা বেঁচে থাকলে...

পাঁচুর মায়ের চোখে জল আসে, গলা ধ'রে যায় ; বলে সে বেঁচে থাকলে আমার দুঃখ কিসের ছিল?—সে যদি এক মুঠো খেতে পেতো তো আমার অভাব হতো না ;—কতদিনের ভাবসাব তার সঙ্গে, কত দুঃখ সুখের কথা।...

পাঁচুর মা চোখ মোছে, কিন্তু নুটুবেহারীর মুখে সুখ কি দুঃখের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না।

অকারণে মুখখানায়—একবার হাত বুলিয়ে বলে "আঃ—মুখখানা, কি নোংরাই হয়েছে যে, বাবা! পাড়াগাঁয় একটা নাপিত পর্য্যন্ত মেলে না!—

বলেই নিজের কামাবার সরঞ্জাম-পত্র বার করতে বসে।

সকাল—মানে সাড়ে সাতটা।

চারিদিকের রোদ খাঁ খাঁ করতে করতে গাছের মাথা থেকে গুঁড়িতে নেমেছে চোখে পড়তেই

র চায়ের নেশা চড়ে উঠলো ; বিছানা ছেড়ে উঠেই তিনখানা ইটের উনোনে পাতা আর পুরানো গুজ জ্বেলে চায়ের জল চড়িয়ে দিলে মাটির হাঁড়িতে।

এমনি সময়ে নামাবলী গায়ে খড়মের খটাখট্ শব্দে চারিদিক মুখরিত করে, যিনি এলেন তাঁর ম—জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য। ভট্চায্ খুড়ো বহুদিনের পরিত্যক্ত পায়া নড়া জলচৌকীখানা টেনে সে বললেন—

"কি চড়ানো হয়েছে ওটা ? চায়ের জল ?—তা, চা জিনিসটে খেতে মন্দ নয়, বিশেষ এই তের সকালে ; গরম গরম দু' এক চুমুক খেতে খেতে দেহটা যেন বেশ তাজা ঝর ঝরে হয়ে ঠে।"

নুটু শুধোলে—

"খাবে খুড়ো ? এক কাপ ? বেশ গরম গরম ? জানোতো, ফ্রেশ্ জিনিস খাই আমি, একদম কে বলে তাজা। কলকাতা থেকে রীতিমত অর্ডার দিয়ে এনেছি,—ও তোমাদের নীলুর দোকানের তা পচা রদ্দি-রাবিশ জিনিস এ নয়।...খাবে ? জগন্নাথের লুব্ধ দৃষ্টি চায়ের আশেপাশে রছিল।—

লেন—

"চা-টা খাওয়াবে নেহাতই ?—দাও তবে, কিন্তু দেখো বাবাজী, তোমাদের ও মেলেচ্ছ— চের কাপে টাপে আমায় দিওনা ;—ওর চেয়ে একটা পাথর বাটীতে..."

নুটু বললে—

"কিন্তু সে সব পাট তো নেই।"

"নেই ?...তবে মাটির গেলাস একটা ?"

"দেখছি—"

ব'লে উঠে একটা পুরানো মাটির গেলাশ খুঁজে এনে তাতে চা দিয়ে বললে—

"খাও খুড়ো—কিন্তু কি কারণে—আজ আমার বাড়ী তোমার পায়ের ধুলো পড়লো—বল কিন, সোজা বাংলা কথায়!"

ঢক্ ঢক্ ক'রে—চাটুকু ঠাণ্ডা করে খেয়ে ফেলে—খুড়ো বললেন সে অনেক কথা।—বড় বিপদেই পড়েছি বাবাজী, বুঝলে কিনা, বড় বিপদ....।"

"ব্যাপার কি ?"

মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলে নুটু।

খুড়ো বললেন—

"বিপদটা আমার অবশ্য নয়, পরের—কিন্তু জড়িয়ে পড়তে হয়েছে, আমাকেই। মোট কথা— আমার ভাইদের জানোতো!—চিরকালই ঘরশত্রু বিভীষণ হয়ে আমার শত্রুতা করে এসেছে, আমি কিন্তু তা করিনি কখনো, ক'রবোও না। এ ব্যাপারটাও তাদেরই,—দারুণ দুরবস্থায় পড়ে

আমার শরণাপন্ন ; বল্লাম বেশ, টাকা আমি না হোক অপরের কাছ থেকে দেওয়াব, কিন্তু শুধু হাতে নয়,—অন্ততঃ বাড়ীখানা বন্ধক রাখতে হবে, তবে—"

নুটুর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ; বললে—

"তারপর ?"

মুখে একটা শব্দ করে খুড়ো বললেন—

"আর কি, বন্ধকী কাগজপত্রগুলো কিছুদিন তোমার জিম্মায় রেখে আমায় ফেরৎ দেবে,... বশ্য কিছু পাবে তুমি,—একেবারে শুধু হাতে তোমায় খাটাব না..."

খুড়ো উঠলেন।

এর পরের একদিন যেদিন জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য পৈতা হাতে নিয়ে সজাগ কণ্ঠে নির্ব্বিকার ত্ত নুটুবেহারীকে শাপ শাপান্ত করতে করতে গ্রামছাড়া হলো, সেদিন সকলেই জানলে—জগন্নাথ ট্টাচার্য্য নিজস্ব ভাগ সমেৎ ভাইদের সমস্ত সর্ত্ত নুটুবেহারীর কাছে বন্ধকী রাখায়—নুটুবেহারী াদের ভিটাচ্যুত করেছে।

অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে সম্মুখে এসে দাঁড়ালো নীলকণ্ঠ।—ডাকলো "দা ঠাকুর।"

নুটু মুখ তুলে তাকালো।—

নীলু বললে—

"বড় বিপদেই পড়েছি।—টাকার বড় টানাটানি,—যদি কিছু দেন দয়া করে.."

নুটু ভ্রুকুঞ্চিত করে তাকালো ;—

"দয়া করে মানে ? দয়া করবারও একটা সময় অসময় আছে তো ? না মেলা দয়া করলেই লো ?"—

কুণ্ঠিত নীলু জানালে—তার ছেলেটার বড্ড অসুখ, শহর থেকে ডাক্তার আনতে হবে। নুটুর াছে যত টাকা বাকী পড়েছে সব সে চায় না, কিন্তু তা থেকে কিছুও যদি সে পায় তবে..

নুটু রুখে উঠলো—

"তোদের আক্কেলকে বলিহারী নীলু—ছোট লোক তোদের সাধে বলে ?—দায়ে পড়ে বলতে য়। নইলে অন্যায় আব্দার করিস,—টাকা দিতে হবে ! আরে টাকা পাব কোথায় সেটা বেচনা করবি তো ?—"

নিমেষে সে উঠে দাঁড়ায়,—গায়ের পাঞ্জাবীটা টানতে টানতে বলে—"কই, চল দিকিন দেখি ছলের তোর কেমন অসুখ, আর কত বড় ডাক্তার ডাকতে হবে—চল—"

নীলু আবার কাৎরে উঠলো,—"বড্ড ব্যয়রাম দা ঠাকুর,—বাহ্যে বমিতে ছেলেটা নেতিয়ে াড়েছে,—বাড়ীতে কাঁদতে লেগেছে,—আমি তাই এইছি।"

নুটু ধমক দিলে—

"আরে চল্ না; বল্ গিয়ে বৌকে, যে আমিও একদিন রীতিমত পয়সা দিয়ে কলেজ ইস্কুল থেকে ডাক্তারী শিখেছিলাম, পশার হ'লোনা তাই মাষ্টারী ধরতে হলো।—সেকথা বিশ্বাস করতে কি পারবি তোরা ?—কথায় বলেনা গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না।"—

নীলুকে নিয়ে সে এগিয়ে গেল, ফের যখন বাড়ী ফিরে এলো, তখন শীতের বেলা পড়ন্ত রোদটুকুর সঙ্গে নীলকণ্ঠের একমাত্র ছেলেকে জীবনের দরোজা থেকে বিদায় দেওয়া হয়েছে।

দিনকয়েকের মধ্যে গ্রামে কলেরার মতন লাগলো,—এমন কি কারো ঘর থেকে মড়া বার হয় তো—কারো ঘর থেকে বার হয় না। এই অবস্থায় কম্পাউণ্ডারী পাশ, তারিণী চক্রবর্ত্তীর তো ডাকের অন্ত নাই, কিন্তু নুটুকে কেউ ডাকলো না দেখে সে একটু মুস্ড়ে পড়লো ;—

মনে মনে এই ভাবনাটার আলোচনা আর মুখে একটা গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে নুটু ওর জুতো বুরুশ করছিল,—অমনি সময়ে কেঁদে এসে পড়লো—পাঁচুর মা !—

"পাঁচুকে আমার ঐ কাল রোগে ধরেছে বাবা নুটু—তুই রক্ষে কর"—

"রক্ষে, মানে ?"—

গিয়ে আর চিকিৎসার ভার হাতে নিতে নুটুর সাহস হলোনা,—

নীলুর ছেলেটার মৃত্যুকালিমা যেন ওকে ঘিরে আছে বলে মনে হচ্ছে, বললে—

"রক্ষে করবো আমি ? কেমন করে ?"—

পাঁচুর মা পেট কোঁচড় থেকে এক ছড়া সোনার হার বের করে সামনে রাখলে ;—বললে—

"আর কিছু নয়—এরই বদলে আমায় কিছু দে বাবা, আমি শহর থেকে ভালো ডাক্তার আনাই,"...

পাঁচুর মা কাঁদতে লাগলো ;

হার ছড়া হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, নুটু—মাথা নাড়লে ; বললে—

"তুমি আপনজন, ঠকাতে পারবো না তোমাকে ;—কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি এ জিনিসের দাম বাজারে বেশী হবে না ; একে পুরোনো সোনা, তাতে পান-মরা দেওয়া। টাকা আট দশ বড় জোর দাম হবে,—এর বেশী নয়। এতেই যদি মত হয় তো দিয়ে যাও, নয়তো"···আর বলতে হলো না। পাঁচুর মার প্রসারিত হাতের মুঠোয় টাকা কয়টা গুণে দিতেই সে যন্ত্রচালিতের মত উঠে দাঁড়ালো।

এর পরদিন,—যখন পুত্রহারা পাঁচুর মার করুণ ক্রন্দনধ্বনি চারিদিক কাঁপিয়ে তুলেছিল,—

তখন দেখা গেল—নুটু ওর সুটকেশের ধূলো ঝেড়ে তার ভেতর কতকগুলি আবশ্যকীয় জিনিসপত্র বন্ধ ক'রে ঘরের দরজায় তালা দিচ্ছে।

ষ্টেশানে যাবার পথে নীলুর বন্ধ দোকানের সামনে একবার দাঁড়ালে; কি ভাবলে,—তারপর পথ চলন্তি বাগ্দীদের নিমাইকে ডেকে ব'লে দিলে—

"বলিস্ নীলুকে,—ক'লকাতা যাচ্ছি, সময় নেই ব'লে দেখা ক'রতে পারলাম না, কিন্তু তাই ব'লে তার পয়সা আমি মারবো না,—কড়াক্রান্তি পর্য্যন্ত হিসেব ক'রে এই পূজোর বন্ধে এসে শোধ দেব; ব'লে দিস্..."

কথাটা পরে নীলুর কানে গেল, কিন্তু কোনও আলোচনা সে করলে না। উদাস দৃষ্টিতে ধূলি ধূসর ষ্টেশানের পথটার দিকে তাকিয়ে যেমন বসেছিল, তেমনি বসে রইল।

এক এক করে আটবার পূজা এসে চ'লে গেছে, নুটু কোনও পূজোতেই বাড়ী ফেরেনি,—নীলুর দেনাও শোধ করেনি; কিন্তু যেদিন সত্যই ফিরে এলো সেদিন নীলু—বেঁচে নেই, পূজোও আসেনি, শুধু সমস্ত বর্ষার আকাশটা হাল্কা মেঘে ঢেকে ফেলেছে।

অতি বৃদ্ধা পাঁচুর মা ঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখলে দীর্ঘদিন পরে নুটবেহারী বাড়ী ফিরে বারান্দায়ই শুয়ে পড়ে অবিশ্রান্ত কাঁসছে...আর সে কাসির সঙ্গে উঠে আসছে ঝলকে ঝলকে টাটকা রক্ত।

পাঁচুর মা এগিয়ে এলো,—এক'পা এক'পা ক'রে বারান্দায় উঠে ডাকলে—

"নুটু এলে? অ নুটু?"...

নুটু যেন ঝিমুচ্ছে। পাঁচুর মা চোখে ভালো দেখতে পায়না, তবু অনুভব করলে—নুটু যেন ওর শীর্ণ হাতে কোমর বন্ধের গিঁঠ খুলে কি বের ক'রছে;—হাঁফ নিতে নিতে বললে—

"হ্যাঁ আমিই পাঁচুর মা,—আবার এসেছি।"

ব'লতে ব'লতে একটা ছোট পুলিন্দা পাঁচুর মার হাতে দিয়ে বললে—

"এগুলো আমায় শান্তিতে মরতে দিলে না পাঁচুর মা, তাই আমার এই ফিরে আসা, নইলে আসতুম না।"

সে আবার কাসতে লাগলো, সে কাসি আর ঘন্টাখানেকের মধ্যে থামলো না যখন থামলো—তখন বড় পরিশ্রমে নুটুর চোখ ছুটোর সঙ্গে বুকের ধুক্ধুকুনীটাও থেমে এসেছে।

পাঁচুর মা বার ছুই ওর নাম ধরে ডাকলে, তারপর গ্রামের ছুই একজন পথ চলন্তি লোক ডেকে দেখালে—নুটু ওর পাপাশ্রিত রোগজীর্ণ দেহখানার সঙ্গে পরলোকগত নীলু-মুদির টাকা, জগবন্ধু ভট্টাচার্য্যের ভিটে বাঁধা দেওয়ার কাগজপত্র, আর তার পাঁচু মারা যাবার সময় বিক্রয় করা গলার হার, এই সমস্তই এখানে ফেরৎ দিয়ে গেছে।

ভারতীয় নারী শ্রমিক

কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

খনির স্ত্রী-শ্রমিক

খনি সম্পর্কিত শিল্পে স্ত্রী-শ্রমিকের অবস্থার এক আমূল পরিবর্ত্তন চলেছে। খনির নীচের কাজ মেয়েদের পক্ষে নিষিদ্ধ করবার নীতি ভারত গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ কোরেছেন এবং ১৯২৯ থেকে স্ত্রী-শ্রমিকদের ক্রমেই দ্রুত বাদ দিয়ে আসা হোচ্ছে।

নীচে উদ্ধৃত সংখ্যায় এই বাদ দেবার নীতির ক্রমঃ প্রসারের পরিচয় পাওয়া যাবে।

	পুরুষ		স্ত্রী	
	১৯৩৩	১৯৩৪	১৯৩৩	১৯৩৪
খনির নীচের কাজ—	৯৯,৫৫৬	১০৯,০১৩	১২,৭৯৯	১১,১৯৩
উন্মুক্ত জায়গায় কাজ—	৩০,৮৬৬	৩৮,৪৩১	১০,৭২১	১২,১৭৩
খনির উপরে কাজ—	৪০,৬১৬	৪৪,৭৫৬	১১,৯৪৯	১৩,৮০৫
মোট—	১৭১০,৩৮	১৯২,২১০	৩৫,৪৬৯	৩৭,১৭১

নীচের উদ্ধৃত তালিকা থেকে বোঝা যাবে যে ১৯৩০-৩৪ এর মধ্যে খনির নীচের কাজে স্ত্রী-মজুরের শতকরা হার কমে আসছে।

খনির নীচের কাজে স্ত্রীমজুরের শতকরা হার :—

১৯৩০	—	১৮·৩৯
১৯৩১	—	১৬·৮১
১৯৩২	—	১৪·৮৪
১৯৩৩	—	১৩·১৪
১৯৩৪	—	১০·৯৪

যে সব খনিগর্ভে কাজ বেশী বিপদসঙ্কুল সে সব থেকে মেয়েদের একেবারে বাদ দেওয়া হায়েছে। কিন্তু বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের কয়লার খনি ও পাঞ্জাবের লবণের খনির উপর, ১৯২৯ এর খনি আইন প্রয়োগ করা হয়নি। প্রস্তাব হয়েছিল যে দশ বৎসরের মধ্যে স্ত্রীমজুরের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস কোরে ১৯৩৯ এর মধ্যে উপরোক্ত খনিগুলির উপরেও ১৯২৯ এর আইন প্রয়োগ করা হবে। এবং খনিগর্ভে স্ত্রী-লোকদের কাজ করবার প্রথা একেবারে বন্ধ করা হবে।

এই ক্রমশঃ বাদ দেওয়ার কাজ আশাতীত দ্রুত অগ্রসর হোয়েছে এবং ১৯৩৬শের জুলাই পর্য্যন্ত ভারতের খনিগুলিতে মাটীর নীচের কাজে স্ত্রী-মজুর আর নিযুক্ত হবে না। এ আশা করা যায়।

এই পরিবর্ত্তনের ফলে স্ত্রীমজুরদের আরও অসুবিধা হোয়েছে। খনির নীচের কাজ যে মেয়েদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিজনক একথা স্বীকার্য্য—কিন্তু এই কাজ থেকে মেয়েদের বাদ দেবার রীতি সমর্থণ করবার সঙ্গে সঙ্গে, একথাও মনে রাখা উচিত যে খনি থেকে অপসৃত এই সব স্ত্রী-মজুরদের অপেক্ষাকৃত ভাল জীবিকা উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করা আমাদের উচিত। তা না হোলে খনি থেকে বেরিয়ে তাদের অনাহারে থাক্‌বার ব্যবস্থাকে সমর্থন করা হবে।

এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষে খনির নীচের কাজ অত বিপজ্জনক নয়। এদেশের খনিগুলি অত গভীর নয় এবং আধুনিক উপায়ে যদি নীচের অবস্থাকে উষ্ণ করা হয় তবে খাদের কাজ খুব অনিষ্টকর হবে না।

খাদের কাজ থেকে স্ত্রীশ্রমিকদের বাদ দেওয়ার দরুণ, খনির মজুর পরিবারের আয় অনেক কমে গেছে। আসলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে একত্রে কোন প্রকারে টিকে থাক্‌বার মত মজুরী উপার্জ্জন করতো। এখন খনির মজুর, সাহায্যের জন্য স্ত্রীর বদলে পুরুষ মজুর রাখে ও নিজের আয় থেকে তাকে মজুরী দিতে হয়—ফলে কোনমতে টিকে থাকার ব্যবস্থাও আর নেই। এ অবস্থার দরুণ গৃহজীবনে একটা সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় আস্‌বে, কারণ স্ত্রীউপার্জ্জন করতে না পারলে তাকে গ্রামে রেখে আস্‌তে হবে—ফলে মজুরদের গৃহ বলে কিছু থাক্‌বে না আর খনিগুলির অধুনা অবনত নৈতিক আব্‌হাওয়ার আরো অবনতি ঘট্‌বে।

বিহারে মদ তৈরীর যে ব্যবস্থা আছে (out still system) তাতে মদ অতি সুলভ হোয়েছে—কর্ম্মস্থলে পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব-মুক্ত মজুরেরা তাদের কষ্টার্জ্জিত পারিশ্রমিক মদের দোকানে ব্যয় করবে এটা স্বাভাবিক —ফলে এই নিরক্ষর মজুরদের অবস্থা কি হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। বস্তুতঃ অতিরিক্ত মদ্যপানে বর্ত্তমানেই খনির মজুরদের নৈতিক ও দৈহিক অবনতি যথেষ্ট ঘটছে—এর উপর যদি এদের কোন গৃহ না থাকে, যেখানে সারা দিনের কাজের পর এরা ফিরে আসতে পারে তবে মদ্যপানের মাত্রা আরো বাড়্‌বে সন্দেহ নেই। একথাও উল্লেখ করা দরকার, যে এক মদের দোকান ছাড়া শ্রমবিনোদনের কোন উপায় বা স্থান এই মজুরদের নেই। কোন সেবা-প্রতিষ্ঠানের প্রথম কর্ত্তব্যই হবে, চিত্তাকর্ষক চায়ের দোকান, সিনেমা অথবা খেলার ব্যবস্থা করা যাতে মদের দোকান থেকে লোকদের দূরে রাখা যায়।

এদের দুঃখ দুর্দ্দশা কিছু কমে, এরূপ নীতিই আমাদের নেওয়া উচিত—মজুরদের নিম্নতম মজুরীর হার নির্দ্দিষ্ট কোরে দিয়ে এবং খনির নিকটে কর্ম্মচ্যুত স্ত্রী-মজুরদের জন্য কোন ব্যবসায়ের (Subsidiary occupation) ব্যবস্থা কোরে, এ করা যেতে পারে। এদ্বারা মজুরেরা কর্ম্মস্থানে পরিবার প্রতিপালন করতে পারবে।

এই অন্যতর কাজগুলির ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত স্ত্রী-শ্রমিকদের একেবারে উঠিয়ে দেবার প্রস্তাব সমর্থন করা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না, কারণ বর্ত্তমান অবস্থায় যদি খাদের কাজ থেকে এদের সরানো হয়—মজুরদের দুরবস্থা এত চরমে উঠবে যে, খনির নীচে কাজ করবার জন্য ক্ষতির তুলনায় তা অনেক বেশী।

স্ত্রী-মজুরদের বাদ দেবার প্রস্তাবের গোড়ার কথা—মজুরদের জন্য শ্রেষ্ঠতর জীবনের ব্যবস্থা করা—সেই আদর্শই যদি লাভ না করা যায়—তবে প্রস্তাবটী কজে পরিণত করাতে, তার উদ্দেশ্যই পরাভূত হবে।

চা-বাগানের স্ত্রী-মজুর

ভারতীয় আবাদের (Plantation) ব্যবসাগুলির মধ্যে মজুরের সংখ্যা, উৎপন্ন জিনিষের মূল্য এবং আবাদকরা ভূমির পরিমাণ ইত্যাদির দিক থেকে চায়ের আবাদ প্রধানতম। চায়ের পর—কাফি রবারের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। সিঙ্কোনার চাষও কম নয়—কুইনাইন তৈয়ার উদ্দেশ্যে এটা রাষ্ট্র পরিচালিত এক শিল্প।

কারখানা ও খনিগুলি অপেক্ষা আবাদগুলিতে স্ত্রীমজুরদের অবস্থা ভাল। এর কারণ চাষের ব্যবসাগুলি মজুরদের পারিবারিক জীবন অব্যাহত রাখ্‌বার জন্য, সপরিবারে মজুরদের নিযুক্ত করবার নীতি গ্রহণ কোরেছে। অন্যপক্ষে কারখানাগুলি চেয়েছে ব্যক্তিকে। এজন্য পরিবার গ্রামে রেখে আস্‌তে মজুরেরা বাধ্য হোয়েছে—কারণ তাদের স্ত্রী ও পুত্রদের উপযোগী কোন কাজ কারখানাগুলি দিতে পারেনি। অপরপক্ষে চাষের কাজে যে সব মজুরেরা তাদের পরিবার নিয়ে যায়—তাদের লাভজনক কাজের প্রচুর সুযোগ রয়েছে—উপরন্তু এই চাষের কাজে তাদের অভ্যস্ত জীবন যাপন প্রণালী অব্যাহত থাকে। চা-বাগানগুলির বর্ত্তমান অবস্থায় এ কথা আরোও বিশেষভাবে সত্য। অতীতে মজুর সংগ্রহের নামে গুরুতর অন্যায় করা হোতো। বিশেষতঃ বসবাসের ও চাকুরীর ব্যাপারে অবিচারের অবধি ছিল না। আবাদগুলিতে কিংবা বিশেষ শস্য উৎপাদনে যত সংখ্যক মজুর নিযুক্ত রয়েছে, তার মধ্যে প্রয় শতকরা ৬০ জনই চা-বাগানের মজুর। এইসব চা-বাগানের মজুরদের মধ্যে স্ত্রীমজুরের সংখ্যা—শতকরা ৪৫ এর উর্দ্ধে। এছাড়া কাফি, রাবার, সিনকোনা, পান ও অন্যান্য শস্য উৎপাদনে নিযুক্ত স্ত্রীলোকের সংখ্যাতেও এইরূপ হার দেখা যায়।

সমস্ত ব্যবসায়ে স্ত্রী-মজুর

এখন অন্যান্য যে সমস্ত চাকুরীতে স্ত্রী-মজুর নিযুক্ত হয় তাদের কথায় আসা যাক্‌। এখানে একটা মোটামুটী সংখ্যাগত হিসেব থেকেই অবস্থা সম্বন্ধে চলনসই একটা ধারণা পাওয়া যাবে। লক্ষ্য করতে হবে, চাকুরীগত সংখ্যা কারখানার মজুর বল্‌তে আইনতঃ যাদের বোঝায়

কেবল সেই শ্রেণীর মজুরেরাই নয়। ভারতবর্ষে শ্রমজীবি সম্পর্কিত আইন রয়েছে তার সুবিধা ও আশ্রয় থেকে নানা ব্যবসাতে নিযুক্ত মজুরদের বেশীর ভাগই বঞ্চিত। এরা খেটে জীবিকা অর্জ্জন করে, এ সত্বেও এরা আইনের রক্ষণাবেক্ষণের বাইরে। ভারতবর্ষের শ্রমিকদের অবস্থা উন্নত কোরে জগতের অন্যান্য দেশের তুল্য করতে হোলে ভারতীয় শাসকদের বহু বৎসরের শ্রমের প্রয়োজন হবে। নীচে উদ্ধৃত সংখ্যা থেকে পুরুষের তুলনায় নারী শ্রমিকের সংখ্যায় কি পরিবর্ত্তন ঘটেছে তা স্পষ্ট হবে এবং বোঝা যাবে যন্ত্রশিল্পের প্রবর্ত্তনের ফলে কোন্ কোন্ শিল্পে নারী শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস হোয়েছে।

ব্যবসা	মোট শ্রমিকের সংখ্যা		স্ত্রী-শ্রমিকদের শতকরা হার	
খনিজ ব্যবসায়	১৯১১	৩০৮৪৪৯	১৯১১	৩১'৭
	১৯৩১	৩২৪১৪২	১৯৩১	২৩'৬
কয়লা ও পেট্রোলিয়াম	১৯০১	৬৬৫৪৯	১৯০১	৪১'৬
খনিতে কাজ	১৯৩১	১৯২৯৩৫	১৯৩১	২৩'৮
ধাতব খনিজ পদার্থের কাজ	১৯০১	২৫০৮৪	১৯০১	১১'৬
	১৯৩১	৪৬৬২৮	১৯৩১	২১'১
যন্ত্র-শিল্প	১৯১১	১৭৫১৫২৩০	১৯১১	৩৪'৩
	১৯৩১	১৩৫৫৩৩৯৫	১৯৩১	২৪'১
কাঠের কাজ	১৯০১	১৭২২০১৮	১৯০১	২৫'০
	১৯৩১	১৪৯৫৭৪৪	১৯৩১	১৭'৭
ধাতুর কাজ	১৯০১	৭৫৯২৮৮	১৯০১	১০'৪
	১৯৩১	৬৬৫৯৫৬	১৯৩১	৫'৭
মৃৎশিল্প	১৯০১	১০৪৩৪৩২	১৯০১	৩২'৪
	১৯৩১	৯১৭৭৩৬	১৯৩১	২৪'৫
নির্ম্মাণ ও মাল বহনের কাজ	১৯০১	৪৯৩৫০	১৯০১	৪'৩
	১৯৩১	২৭৮৯৯	১৯৩১	১'৭
পশম শিল্প	১৯০১	১৯৭৪৯৪	১৯০১	৬৯'৩
	১৯৩১	৮৬৬৯৩	১৯৩১	৩৩'২
রেশমের কাজ	১৯০১	২২৪৭৪৩	১৯০১	৫২'৩
	১৯৩১	৬১৩২৩	১৯৩১	৪৫'৯
রং, ধোলাই ও ছাপাইর কাজ	১৯০১	১০০২২০	১৯০১	২৭'৩
	১৯৩১	৯৩১৬৪	১৯৩১	২০'৭

ব্যবসা	মোট শ্রমিকের সংখ্যা		স্ত্রী-শ্রমিকদের শতকরা হার	
লেস ও এমব্রয়ডারি	১৯০১	২৪১৬৭	১৯০১	৪০.৫
	১৯৩১	২৫৮৭৮	১৯৩১	৩৮.৫
চামড়ার কাজ	১৯০১	১৪০১১৯৯	১৯০১	১৮.০
	১৯৩১	২৮৩৯০৯	১৯৩১	১১.৬
রাসায়নিক কাজ	১৯০১	১৫৮৩৯২	১৯০১	২৫.১
	১৯৩১	৫৫১৫৯০	১৯৩১	৩০.৩
খাদ্য প্রস্তুত শিল্প	১৯০১	৪৫৪৬৭৪৮	১৯০১	৪৯.১
	১৯৩১	১৩৫০১৫৮	১৯৩১	৪৯.৭
চাউলের কলে কাজ	১৯০১	৬৫৭১৬৮	১৯০১	৮৫.৫
	১৯৩১	৫০৬৮৬৫	১৯৩১	৮০.৩
পোষাক ও প্রসাধনের শিল্প	১৯০১	৯৪০৩৫৯	১৯০১	২৬.৩
	১৯৩১	৩০৬১৩৪৫	১৯৩১	২০.৭
আস্‌বাব পত্র	১৯০১	১০৪৫	১৯০১	৪৬.৬
	১৯৩১	১৯৭১৬	১৯৩১	১৬.১
গৃহ নির্ম্মাণ শিল্প	১৯০১	৬৭৩১৩৫	১৯০১	১৮.১
	১৯৩১	৫৮৬২৫৪	১৯৩১	১২.৭
উত্তাপ আলো ও বৈদ্যুতিক	১৯১১	৭২৫৭	১৯১১	৩.২
কাজ	১৯৩১	২৩৪৫৩	১৯৩১	৯.৫
বিলাস সামগ্রী, সাহিত্য	১৯১১	৮২৩১০০	১৯১১	৯.৯
চারুকলা ও বৈজ্ঞানিক কাজ	১৯৩১	৬৭৪৫৫৮	১৯৩১	৪.৮

উপরোক্ত ব্যবসায়ের সংখ্যা থেকে দেখা যাবে—ধাতব খনিজদ্রব্য সংশ্লিষ্ট, রাসায়নিক, আহার্য্য ত্তাপ, আলো ও তাড়িত শিল্পগুলি ব্যতীত মোট মজুরের তুলনায় নারী, মজুরের সংখ্যা হ্রাস য়েছে। এই হ্রাস কতকগুলি ব্যবসায়ে বেশ সুস্পষ্ট—যেমন গৃহসজ্জা-শিল্পে শতকরা .৬ থেকে ১৬.১ কয়লার খনি ও পেট্রোলিয়াম কূপে শতকরা ৪৩.৪ থেকে ২৩.৮, কলকারখানায় তকরা ৩৪.৩ থেকে ২৪.১, কাষ্ঠশিল্পে শতকরা ২৫.০ থেকে ১৭.৭, মৃৎশিল্পে ৩২.৪ থেকে .৫, বস্ত্র রঞ্জন ও ধোলাইতে ২৭.৩ থেকে ২০.৭, চামড়া ইত্যাদির ব্যবসায়ে ১৮.০ থেকে ১১.৬ স পেয়েছে। এসব ব্যবসায় মোট মজুরের সংখ্যা ও সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-মজুরের হারে হ্রাস দেখা য়—যেমন কলকারখানায় মোট মজুরের সংখ্যা ১৯১১ সনে ১৭,৫১৫,২৩০ থেকে ১৯৩১ সনে ,৫৫৩,৩৯৫ হোয়েছে। স্ত্রীমজুরদের বেকার সমস্যার তীব্রতা অত্যন্ত কষ্টের কারণ হায়েছে।

কোন কোন ব্যবসা—যেগুলি পূর্ব্বে বহু সংখ্যক মজুরদের কাজ দিত—এখন ক্রমেই লোপ পাচ্ছে ও তার ফলে বহুসংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রী-মজুরদের জীবনযাত্রা প্রভাবান্বিত কোরছে। এ ধরণের ব্যবসা বল্‌তে—দলবদ্ধভাবে নির্ম্মাণ কার্য্য—যানবাহন চালানো—পশম, রেশম, চর্ম্ম, আহার্য্য ও সৌখিন দ্রব্যের শিল্প প্রভৃতি বোঝায়। এইসব ব্যবসায়ে দেশী জিনিষের স্থান বিদেশী জিনিষ গ্রহণ করাই ভারতীয় মজুরদের উন্নতির প্রধান পরিপন্থী হোয়েছে। বিদেশী প্রণালীতে যাতায়াত এবং মাল বহনের জন্য রেলগাড়ী, বাস, ষ্টীমার ইত্যাদির ব্যবস্থা হওয়াতে গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, নৌকা ইত্যাদি ভারতীয় শিল্পগুলি ধ্বংস পেয়েছে। বিদেশী পশমী বস্ত্র ও সস্তা রেশম—পশিমা, কম্বল, লুই প্রভৃতি দেশী জিনিষ বেশী সংখ্যক ক্রেতা ক্রয় না করাতে বাজার থেকে বিতাড়িত হোয়েছে—এবং জাপানী অথবা ইটালীয়, ইংলণ্ডীয় অথবা ফরাসী কৃত্রিম রেশম, কাশ্মীর, বেনারস, মুর্শিদাবাদ, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানের রেশম শিল্পকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। বিদেশী চামড়া ও চর্ম্ম নির্ম্মিত জিনিষ আমাদের গ্রামের চামড়া ব্যবসায়ীদের প্রভূত ক্ষতি কোরেছে। অনুরূপ কারণে রাবার-সোল জুতোর ক্ষতিটাও যোগকরা যেতে পারে। তেল, ময়দা, চাল ইত্যাদির মিল প্রতিষ্ঠা দ্বারা এবং বিদেশী উদ্ভিজ্জ ঘি, জ্যামজেলি ও মিষ্টান্ন ইত্যাদির এদেশে প্রবেশের ফলে বহু ভারতীয় স্ত্রী-মর্জ্জুর বেকার হোয়েছে।

আমাদের বহুসংখ্যক বেকার ভাইবোনদের জীবিকা ফিরে পাবার ও তাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবার কাজে ভারতীয় নারীরা অনেকটা সাহায্য করতে পারেন—যদি তাঁরা পশমী, রেশমী, চামড়ার ও অন্যান্য সৌখিন জিনিষ কিন্‌বার সময় স্বদেশী জিনিষ ক্রয় করেন।

সৌন্দর্য্য বিচারে জাতীয় ভাব বিকাশ পেলে—এই পুনর্গঠনের কাজে বিশেষ সাহায্য হবে। কারণ আমাদের দেশজ জিনিষগুলি লুপ্ত হবার কারণ, এদের নিকৃষ্টতা নয়—কিন্তু তথাকথিত "ফ্যাসানের" ও জাতীয় হেয়ত্বের অজুহাতজাত সাময়িক অন্ধতা।

উপরের তালিকাতে যদিও স্ত্রীমজুরদের সংখ্যায় হ্রাস দেখা যায়—তবুও জীবিকাউপার্জ্জনের জন্য বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রগুলিতে বহুসংখ্যক স্ত্রীমজুর কাজ কোরে থাকে ও ভবিষ্যতেও করবে। কাজেই দেশের মঙ্গলকামীদের, কি অবস্থায় তারা কাজ করছে সে সম্বন্ধে সচেতন হওয়া উচিত।

কাজের পারিপার্শ্বিক

স্ত্রীমজুরেরা যেসব অসুবিধায় কাজ করে তার সংখ্যা বহু। কতকগুলো অসুবিধা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান, কিন্তু অন্য কতকগুলো অসুবিধা শুধু স্ত্রীমজুরেরাই ভোগ কোরে থাকে। এগুলি দূর কর্‌বার জন্য বাইরে থেকে বিশেষ চেষ্টা হয়না।

প্রধান অসুবিধা হোচ্ছে নিয়োগবিধি। যাতে কৃষিজীবিকে কলকারখানর কেন্দ্রে এনে ফেলা য়। জব্বর, সর্দ্দার, মুকদ্দামদের মধ্যস্ততায় সর্ব্বত্র মজুর নিয়োগ হো'য়ে থাকে। এঁরা মালিক ও জুরদের মধ্যে মধ্যস্ততা ক'রে থাকে এবং ক্ষমতার অপব্যবহারও এরা করে। ঘুস নিয়ে যেমন ইচ্ছে

[ম]জুরদের কর্ম্মচ্যুত ও নিযুক্ত করে। এধরণের ব্যবস্থায় স্ত্রীমজুরদের কাজ করা বিশেষ অসুবিধাজনক [হ]ন জব্বরদের স্ত্রী সংস্করণ নেইকিন ও মুকদমালী জব্বরদের মতই নৈতিক চরিত্রে হীন, ফলে [কা]জ রাখবার জন্য মেয়েদের বহু অপমান সহ্য কোরতে হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে [স]প্রতি খবর পাওয়া গেছে যে বোম্বেতে মালিকেরা নিজেরাই মজুরদের কাজে নিযুক্ত করতে [আ]রম্ভ কোরেছে। আইন দ্বারা জব্বর প্রথা আশু বন্ধ কোরে দেওয়া উচিত।

এ সম্পর্কে রয়েল কমিশনের প্রস্তাবগুলি সত্বর কাজে পরিণত করা উচিত এবং যেখানে [স্ত্রী]-মজুরদের সংখ্যা অধিক সেখানে দায়িত্বশীল শিক্ষিত মহিলাদের উপযুক্ত বেতনে পর্য্যবেক্ষণরূপে নিযুক্ত করা প্রয়োজন।

যেসব স্ত্রী-মজুর কারো অধীনে কাজ করে অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে উপার্জ্জন না কোরে অন্য কোন মজুরের কাজে সাহায্য করা বাবদ বেতন বা ভরণপোষণ পায় তাদের সমস্যাও কম নয়। এইরূপ পরনির্ভর কর্ম্মীদের, প্রতি ১০০০ এ ৭৩৩ জন স্ত্রীলোক, অপর পক্ষে সাক্ষাৎভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করে মাত্র প্রতি ১০০০ এ ২২২ জন মেয়ে। এরূপ ব্যবস্থায় স্ত্রীমজুরদের স্বার্থ প্রায়ই রক্ষিত হয় না, এবং ক্রমশঃ এই পরোক্ষ নিয়োগ বন্ধ হোয়ে সাক্ষাৎ নিয়োগ বিধি প্রচলন হওয়া দরকার। সাক্ষাৎভাবে কাজে নিয়োগ ও পারিশ্রমিক লাভ এবং সমস্ত নারী শ্রমিকদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার ভারতীয়-স্ত্রী শ্রমিকদের জীবনের আজও প্রধান সমস্যা।

বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ, ও মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতের কতকগুলি প্রদেশে বহুসংখ্যক মজুর কাজের অন্বেষণে অন্যত্র যায়। বিদেশগামী শ্রমিকেরা যাতে প্রবাসে, লাভের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সকল তথ্য জানতে পারে, তার জন্য প্রচারের ব্যবস্থা থাকা উচিত। যেসব প্রদেশ থেকে বহু চাষী ও মজুর অন্যত্র যায় সেসব প্রদেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী, ব্যক্তিগত লাভের দ্বারা তা পুরণ হোচ্ছে কিনা অন্তত সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

বেকার সমস্যা

কাজের প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে বেকার সমস্যা স্বাভাবিক ভাবেই উঠে। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে বেকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সমস্যা সমাধান করবার জন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ চেষ্টা হয়নি। এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন কারণ ভারতবর্ষের মজুরেরা কলকারখানার কাজ স্থায়ী জীবিকা হিসাবে অনেক ক্ষেত্রেই গ্রহণ করে না। অস্থায়ী, বিশেষ সময়ের জন্য, অর্দ্ধ-স্থায়ী বা স্থায়ী কাজ করে। রেল লাইন তৈরী, খাল তৈরী প্রভৃতি সাময়িক কাজের পর তারা তাদের নিজেদের কাজে ফিরে যায়, কোন গুরুতর বেকার সমস্যাও উঠে না।

কোন বিশেষ ঋতুর উপর যেসব শিল্প নির্ভর করে—সেসব শিল্পের মজুরদের অন্য সময়ের জন্য কাজের ব্যবস্থা প্রায়ই থাকে। যাদের সে রকম ব্যবস্থা নেই তাদের জন্য কুটীর শিল্পের প্রবর্ত্তন হোলে খুব সুবিধা হবে।

যে সব শিল্পে বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন এবং যাতে হয় অর্দ্ধস্থায়ী বা স্থায়ী ভাবে মজুর নিযুক্ত করা হয় তাতে বেকার সমস্যা অতি গুরুতর। এসব শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকেরা প্রায়ই বুক্তদূরবর্ত্তি গ্রাম থেকে এসে থাকে। কর্ম্মচ্যুতি ঘট্‌লে এদের আর কোন কাজই থাকেনা যাদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন চল্‌তে পারে।

এরূপ বেকার থাকা কালে, অন্তত যারা দুবছর ক্রমান্বয়ে কোন শিল্পে কাজ কোরেছে এ ধরণের মজুরদের সাহায্যের জন্য বেকার ইন্‌সিওরেন্সের (unemployment insurance) ব্যবস্থা থাকা উচিত। মালিক ও মজুরদের থেকে অর্থ নিয়ে এবং বিশেষ বিশেষ শিল্পের উৎপন্ন মালের উপর কর বসিয়ে এই insurance-এর ব্যবস্থা করা উচিত।

মজুরদের বাসের ব্যবস্থা—

কলখানাগুলিতে মজুরদের বাসের ব্যবস্থা অ-স্বাস্থ্যকর ও অপরিচ্ছন্ন। বায়ু চলাচলহীন অস্বাস্থ্যকর বাড়ীতে বাস করার অসুবিধা অপেক্ষাও অধিকতর অসুবিধাজনক হোচ্ছে স্ত্রীমজুরদের বহু ঘণ্টা সারবেঁধে দাঁড়াবার প্রথা। মজুরদের বাসস্থানে বায়ুচলাচল ও স্থানাভাবের দরুণ অসুবিধার কথা সকলেই জানেন। অনেক কারখানা ও খনি সংশ্লিষ্ট মজুরদের বাসস্থানগুলো যে কোন শ্রেণীর প্রাণীর পক্ষেই বাসের অযোগ্য। এসব বাসস্থানের কতকগুলিতে পরিদর্শনের সময় দুপুর ১১টাতেও ভেতরে কিছু দেখা যায়নি. এ ধরণের ঘরে ৪ কি ৫ জন নিয়ে গঠিত পরিবারের সমস্ত ব্যবস্থা মেয়েদের করতে হয়।

বৃষ্টির দিনে এখানে রান্নার পর সেই অস্বাস্থ্যকর ধূমপূর্ণ ঘরেই পরিবার সহ তাদের রাত্রি যাপন করতে হয়। কাজেই এই মজুরদের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যবান কর্ম্মঠ শ্রমিক হবার সুযোগ কতটা আছে স্পষ্টই বোঝা যায়।

আহম্মদাবাদের মজুরদের বাসস্থানের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় ২৩,৭০৬টী ঘরের মধ্যে ৫৬৬৯টীতে জল সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নেই, খুব কম সংখ্যক গৃহেই জল নিকাশের ব্যবস্থা আছে। শুধু আহম্মদাবাদে নয় সমস্ত শ্রমিক কেন্দ্রেই এই অবস্থা। বাসস্থানের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রমিকদের মধ্যে শিশু মৃত্যু ও সাধারণ মৃত্যুর হারে।

এবিষয়ে বাংলার শ্রমিকদের অবস্থা কিছু ভাল, এখানে বাসস্থানের ও জল সরবরাহের ব্যবস্থা খুব খারাপ নয়। তবে বস্তীগুলি সম্পর্কে একথা খাটে না। মধ্যপ্রদেশে এ সম্পর্কে পরীক্ষা চল্‌ছে—তা যদি সফল হয় তবে শ্রমিকদের বাসস্থানের নূতন আদর্শ স্থাপিত হবে। নারীশ্রমিকদের শালীনতা রক্ষার ব্যবস্থা, বাসস্থান সম্পর্কিত আর একটী সমস্যা। বর্ত্তমানে সমস্ত শ্রমিক কেন্দ্রগুলিতে, পারিবারিক জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন যে শালীনতা, তার একান্ত অভাব রয়েছে।

ছাড়া শ্রমিক কেন্দ্রগুলিতে পায়খানারও একান্ত অভাব। সর্ব্বত্র পায়খানার ব্যবস্থা থাকা এবং যথেষ্ট সংখ্যক কেবলমাত্র স্ত্রী শ্রমিকদের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখা প্রয়োজন।

সন্তান জন্মকালীন সুবিধা—

সন্তান জন্ম, সন্তান পালন ও বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা সংক্রান্ত ব্যাপারে স্ত্রীশ্রমিকদের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। যেসব স্ত্রীলোকদের জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য সমস্ত দিন বাইরে থাকতে হয়— তাদের সন্তানদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা ও হাঁসপাতাল ইত্যাদির সংখ্যা খুবই সামান্য। ভারতবর্ষের কতকগুলি শ্রমিককেন্দ্রে এরূপ ব্যবস্থা স্বতঃপ্রবৃত্ত হোয়ে বা আইন কোরে করা হোয়েছে। এসম্পর্কে বোম্বাই প্রশংসার যোগ্য কারণ এরূপ ব্যবস্থাই শুধু এখানে হয়নি সুপুণভাবে তার পরিচালনাও হোয়ে থাকে। অন্যান্য প্রদেশেও উন্নততর শিল্পকেন্দ্রগুলিতে এর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আইনগত কোন অনুশাসন না থাকার দরুণ শ্রমিকদের মঙ্গল সম্বন্ধে উদাসীন মালিকেরা সুযোগ নিয়ে থাকে। কাজেই এরূপ একটী সর্ব্বভারতীয় আইন শীঘ্রই পাশ হওয়া উচিত।

খনি কেন্দ্রগুলিতে কর্মচ্যুত স্ত্রী-মজুর

খনিগুলির কর্ম্মচ্যুত স্ত্রীমজুরদের অবস্থার কথা বিশেষভাবে এখানে উল্লেখ প্রয়োজন। খনির কাজ থেকে স্ত্রীমজুরদের সরিয়ে দেবার ফলে এবং অন্যকোন ব্যবসার অভাবের দরুণ এক গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হোয়েছে। ব্যবসান্তর গ্রহণের পূর্বে বেকার সময়ের জন্য এই স্ত্রীমজুরদের কোন প্রকার বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা দ্রুত করা উচিত। এই অঞ্চলে কুটির শিল্পও এমন সব ব্যবসার প্রবর্ত্তণ করা প্রয়োজন যাতে মজুরদের উপকার হয় এবং দুঃস্থেরও আয়ের পন্থা হয়। ঝরিয়ার কুস্তোর কয়লার খনিতে এদিকদিয়ে চমৎকার কাজ হোচ্ছে— এতে ৫০০ স্ত্রীমজুরের জীবিকার ব্যবস্থা হোয়েছে। এখানে নিম্নলিখিত কুটীরশিল্পগুলি প্রবর্ত্তণ করা হোয়েছে এই উৎপন্ন জিনিষগুলি স্থানীয় খনিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের নিত্য-ব্যবহারের জিনিষ। যথা:—
(১) ধানভানা, (২) গম পেঁষা (৩) সুতা কাটা ও কাপড় বোনা (৪) বেতের কাজ (৫) বিড়িতৈরী (৬) সাবান তৈরী (৭) কাগজের ঠোঙ্গা তৈরী (৮) ডাল ভাঙ্গা (৯) নানা প্রকারের কারিগরী কাজ (১০) কুমোরের কাজ। উৎপন্ন জিনিষগুলি সহজেই স্থানীয় ৮০০০ মজুরদের মধ্যে বিক্রী হয়ে যায়। তবে স্ত্রীলোকেরা এখনো খনির নীচে পুরুষদের সঙ্গে কাজ করতেই পছন্দ করে বেশী। কুস্তোর মিলে যে ধরণের ব্যবস্থা হায়েছে বড় বড় খনিগুলিতেও সেরূপ ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব—ছোট ছোট খনিতে কয়েকটী খনি মিলে এরূপ ব্যবস্থা হোতে পারে। নারী-প্রতিষ্ঠানগুলির এদিক দিয়ে এ কাজের ক্ষেত্র পড়ে আছে। এদিক দিয়ে কোন সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা কোরতে হোলে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ও আইন গত উভয় প্রকারের উদ্যম মিলিত হওয়া প্রয়োজন।

সমাপ্তি

শ্রমিকদের সুখ স্বচ্ছন্দ সংক্রান্ত মূল প্রশ্ন হচ্ছে, জনবহুল শ্রমকেন্দ্রগুলিতে না গিয়েও এরা উপযুক্ত উপার্জ্জন করতে পারে কিনা তার মীমাংসা করা। এবিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া উচিত যে শিল্প-কেন্দ্রগুলিতে এরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা, যাতে পারিবারিক জীবনের উপযোগী আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। যদি এ সম্ভব না হয় তবে আবার গ্রামে ফিরে যাবার প্রস্তাবই সমর্থন করা প্রয়োজন হবে। এবং কেন্দ্রানুগ না কোরে অর্দ্ধ-যান্ত্রিক কেন্দ্রাতিগ জীবন প্রণালীই বরণ কোরে নিতে হবে। এই অ-কল্যাণকর বিপুল উৎপাদন প্রথা অপেক্ষা উপযুক্ত বৈদ্যুতিক ও যাতায়াতের ব্যবস্থা দ্বারা বিচ্ছিন্ন কুটীর শিল্পগুলি যুক্ত হোলে দেশ অধিকতর সমৃদ্ধ হবে।

সবচেয়ে জীবন্ত প্রশ্ন—বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের শিল্প ব্যবস্থার অংশবিশেষ যে পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করা। তবে একমাত্র জাতীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক নূতন সংগঠনের মধ্য দিয়েই শ্রমিকদের সমস্যার উপযুক্ত সমাধান হওয়া সম্ভব।

ব্যবধান

অনিলচন্দ্র রায়

তোমার সনে আমার ব্যবধান—
এক মিলিয়ন লাইট্-ইয়ার কিংবা আরো বেশী ;
ডাইনে, বাঁয়ে, চারদিকে যে চলছে বয়ে অন্ধকারের স্রোত,
আর, স্পেস্-টাইমের ঝড়,
সেই তামসী রাতের বুকের
নরম অন্ধকার
ছিঁড়ে ছিঁড়ে
অবিশ্রান্ত একটী ছোট্ট রশ্মি
তোমার তারা থেকে
রওনা হ'য়ে কবে থেকে আস্‌ছে আমার পানে ;
পথে পথে পড়েছে তার
কতো বিশাল নেবুলা আর কতো ছায়াপথ
কতো যে কস্‌মিক্ ধূলার যুগান্তরের স্তূপ।

সৌরলোকের একটী প্রান্তে এথা
মোর পৃথিবী
নিরুদ্দেশে ঘুরে বেড়ায় বিপুল শূন্য ভ'রে
পথ-হারান ব্যাকুল উন্মাদ।
পৃথিবী নয়,—এ যেন মোর
চিরদিনের পুরোণো আর তুষার-ঢাকা, শুক্‌নো, মরা চাঁদ
চেয়ে আছে ঊর্দ্ধপানে উন্মুখ আশায়
কবে এসে পৌঁছুবে যে
তোমার তারার পথিক আলোর রেখা।

নাইকো বায়ু, শব্দ নাইকো এথা
আবহাওয়ার পুরু পর্দ্দা
জড়ানো নাই কোথা।
শুধু কেবল রাত্রে আছে সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ শীত
কালো কালীর মতো
কিংবা—কালো-রঙা পাথর-সম কঠিনতর কালো।
গোধূলি নাই, উষাও নাই
আছে কেবল আচম্বিত মধ্যাহ্ন আর অকস্মাতের রাত।

পথহারা, জ্যোৎস্না-বিহীন, মৃত চাঁদের মতন
শূন্য-চারী, ধূলায় ধূসর আমার পৃথিবীতে
তোমার রশ্মিটুকু
সবুজ রসে পল্লবিত ফল ফুল আর লতার মঞ্জরী
ফোটাবে কি অনাদিকাল পরে
কোনো এক প্রভাতে?

তোমারি চোখে নামিল ঘুম

মন্মথকুমার চৌধুরী

একদা যেখানে ছিল বিরাট গহ্বর, বর্ত্তমানে সেখানে গড়ে উঠেচে একটা ছোটো খাটো সহর ; "দেশবন্ধু কটন মিলস লিমিটেড" কোম্পানীর এখানেই গোড়া পত্তন। বহু সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে বিলেত থেকে কলকব্জা সরবরাহ করা হোয়েচে এবং একে চালু করবার জন্যে আরও শ' কয়েক মজুর বসান হয়েচে আশে পাশে। এ সহরের প্রধান অধিবাসী কিন্তু এই মজুররাই—এদের স্বতন্ত্র পোষ্ট অফিস, দোকান, হাট, মায় মদের দোকান পর্য্যন্ত আছে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত গতর খাটিয়ে এরা খুবই অল্প বেতন নিয়ে সন্তুষ্ট। মজুরী নিয়ে এরা হট্টগোল করে না, মানে হট্টগোল করতে জানে না।

একদা জীবনে এদের আবির্ভাব হলো একদল কর্ম্মীর। মিল অঞ্চলে সেদিন রীতিমত সাড়া পড়ে গেল, মোটরে করে খদ্দর পরা বাবুরা এসেচেন মজুরদের সাথে আলাপ করতে, তাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনতে।

অক্লান্ত উৎসাহে "দেশবন্ধু কটন মিলসের" শ্রমিককেন্দ্রে সমাজতন্ত্রবাদের প্রচার চল্‌লো, রোজ শনিবার দিন খোলা মাঠে বিরাট সভার আয়োজন হয়। বিজন প্রায়ই বক্তৃতা করে, 'সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির জোরে কি করে ধনতন্ত্রের উদ্ধত অত্যাচারকে দূর করতে হবে। তাই নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করে, মজুররা অনেকেই বিজনের সোসালিষ্ট থিওরি বুঝতে না পেরে বোকার মত মাথা নাড়ে। বিজনকে তখন বাধ্য হয়ে সোজা ভাষায় বিষয়টা পুনরাবৃত্তি করতে হয়—কাজটা বিরক্তিজনক, তবু বিজনের বেশ লাগে। সহরের বক্তৃতাসর্ব্বস্ব রাজনীতির চর্চা ছেড়ে সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসৃষ্ট করতে পেরেচে পরাধীন দেশের পরাভূত মানুষের জন্য—যারা প্রত্যেকটি রক্তকণা দিয়ে গড়ে তুল্‌লে সভ্যতার বনিয়াদ। এদের শৃঙ্খল মোচন না করলে দেশের মুক্তি নেই, একথা বিজন অন্তর দিয়ে বিশ্বেস করতো ; তাই সে দশজন বিশ্বস্ত কর্মী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো সঙ্কটসঙ্কুল রাজনীতিক জটিল আবর্তে। নিপীড়িত মানুষের বুকে গণদেবতার উদ্বোধনই হলো এদের জীবনের ব্রত।

এই নিরক্ষর লোকগুলির সংস্পর্শে এসে বিজন এদের অধঃপতন দেখে কতকটা হতাশ হয়ে গেলো। বহু দিনের উৎপীড়ন এদের মেরুদণ্ড ভেঙে গেচে, এরা পড়ে পড়ে মার খেতে জানে, তবুও একেবারে ক্ষিপ্তের মতো মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস এদের নেই। অতি সামান্য ত্রুটিতেই তাদের বেতন কাটা যায়, কখনো বা লাঠির গুতো সইতে হয়, তবু তারা মুখ বুজে সব সহ্য করে। বিজন বল্লে—"দিনের পর দিন তোমরা যে গরু ভেড়ার মতো ব্যবহার সইচো, এর বিরুদ্ধে কি তোমাদের কোন নালিশ নেই?" মজুরদের সর্দার হরিদাস কপালে অঙ্গুল ঠুকে মরা গলায় বল্লে,

'সবই নসিবের লেখা বাবু। নইলে বাড়ী ঘর ছেড়ে কি কেউ কলের চাকা ঘুরাতে আসে? আমাদের বরাতই মন্দ।' বিজন বুঝিয়ে বলে, 'এ তোমাদের ভুল ধারণা। তোমরা সংখ্যায় পাঁচ শ' জন, এতগুলো লোককে মাত্র সাত জন ডিরেক্টার কুকুরের মতো খাটিয়ে মারবে—এ তোমরা চোখ বুজে সইবে হরিদাস?'

হরিদাসের সেই এক কথা,—

"না সয়ে উপায় কি? কপালে যখন দুর্দ্দশা আছে তা সইতে হবে বৈ কি? এই মিলের বাবুরা ত পরিবার নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করেন না। চা-বাগানে থাকতে ঘরে মেয়েছেলে রাখাই দায় ছিল যে!"

দেহের সাথে সাথে মানুষের মনটাও যখন সংস্কারের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে তখন কোন মহান আদর্শই তার প্রাণে আবেদন জানায় না। এই লাঞ্ছনাকে ওরা ভুল করেচে জীবনের এবং সমাজের সুস্থ অবস্থা বলে। তাই ওদের চোখে ঘুমিয়ে নেই তারা-ভরা নীল আকাশের স্বপ্ন—ওদের মনের কোণে উঁকি মেরে উঠে না মুক্তির সোনালী দিগন্ত!!

বিজন তবু সংস্কারের কাছে পরাজয় মেনে নেবে না। এই বিপুল শ্রমজীবীদের টেনে তুলতে-হবে চরম নৈতিক এবং মানসিক স্খলনের গহ্বর থেকে. এদের কাণে ঢেলে দিতে হবে বীর্য্যের মন্ত্র, এদের মর্ম্মে মর্ম্মে ধ্বনিত করে তুলতে হবে বিদ্রোহের দৃপ্ত সুর......

বিপুল উৎসাহে সোস্যালিজমের মন্ত্র প্রচার চলে। এই দু'মাসের সংস্পর্শে বিজন শ্রমিকদের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেচে। মাঝে মাঝে বিজন এদের অর্থ দিয়ে সাহায্যও করে। এদের 'পর অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী শুনে বিজনের তাজা রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে উঠে, ইচ্ছা হয় ডিনামাইট দিয়ে মিলের হিংস্র যন্ত্রদানবকে বাতাসে মিশিয়ে দেয়। কিন্তু পর মুহূর্ত্তে তার মনে হয় এপথে শুধু আগুনই জ্বলে উঠ্‌বে, দাসত্বের শৃঙ্খাল তাতে খসে পড়বে না এক চুলও......

ক'মাসের মেলা মেশায় মেয়ে পুরুষ সবাই বিজনকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেচে। দেবতা ছাড়া মানুষের বুকে কী মজুরদের জন্য এত করুণা জমা হয়ে উঠ্‌তে পারে? আকস্মিকভাবে একদিন পারুলের সাথে আলাপ হলো বিজনের, পারুল মজুরের মেয়ে, ওর কথাবার্তার ধাঁচ দেখে মনে হয় পারুল যেন কোন শিক্ষিত পরিব্বারের মেয়ে, পালিয়ে এসে এখানে চাকরি নিয়েচে। বিজন জিজ্ঞাসা করে, 'তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞেস করবো, সত্যি উত্তর দেবে?' পারুল জবাব দেয়, 'আপনার এ ধারণা কেমন করে হলো যে আমি সব কথাই মিথ্যে বলবো?'

বিজন বিব্রত হয়ে বলে—তা মোটেই নয়, মোটেই নয়, মানে আমি যে কথা জানতে চাইছি তা সবার কাছে তুমি অসঙ্কোচে নাও বলতে পার।

পারুল শান্ত কণ্ঠে বলে,—'বেশ, কি বলেছিলেন, বলুন।'

"সত্যিই কি তুমি মজুরের মেয়ে, পারুল? তোমার চেহারা, কথাবার্তা সব কিছুতেই যেন একটা স্বাতন্ত্র্যের ছাপ পড়েছে।'

মত মস্তকে পারুল শুধায়, 'আপনার কি মনে হয়?'

'আমার মনে হয়,' বিজন আবিষ্কারের গর্বে উৎফুল্ল হয়ে উঠে, বলে, 'তুমি মজুরদের কেউ নও, সহর থেকে পালিয়ে এসে পেটের দায়ে চাকরি নিয়েচো মিলে।'—

পরিম্লান সুরে জবাব দেয় পারুল, 'আমিত মিলে চাকরি করি না বিজন বাবু।'

খানিকটা আস্বস্ত হয়ে বিজন বলে, 'তা হলে সত্যিই তুমি হরিদাসের মেয়ে পারুল?'

আহত কণ্ঠে পারুল প্রতিধ্বনি করে -'না', বিস্মিত কণ্ঠে বিজন জিজ্ঞেস্ করে, 'ইচ্ছে করে তাহলে তুমি এই নরকে পড়ে আছো?'

এক পশলা বিবর্ণ হাসি ঝড়ে পড়্লো। অসহায় গলায় পারুল উত্তর দেয়, 'সাধ করে কি কেউ নরকে পচে মরতে চায়; বিজন বাবু, এ অন্ধকূপ থেকে আমাদের মুক্তি নেই যে।'

পারুলের চোখের কোণে এক ফোঁটা জল জমে উঠে। সমবেদনায় ভেঙে পড়লো বিজন, 'একি তুমি কাঁদচ, পারুল। কী তোমার দুঃখ?'

ঝাপসা গলায় পারুল বলে, 'সে দুঃখ আপনার জেনে লাভ নেই বিজন বাবু; আপনাদের কাঁধে আমাদের মতো হতভাগিনীদের দুঃখের বোঝা নাই বা চাপালুম......

"আমাদের তুমি যেন পর ভেবোনা, পারুল। তোমাদের দাসত্বের চোরা কোঠায় পুরে রেখে দেশের যে মুক্তি নেই!"

নূতন সমাজকে গড়বার আকাঙ্খা যারা জীবনের ব্রত করে নিয়েচে, তাদের কাছে নারী পুরুষের দাবী যে সমান।'

পারুল যেন অন্ধকারের মাঝে সূর্য্যের ক্ষীণ রশ্মিটুকু দেখতে পেলে। তাই যদি সত্যি হয় তাহলে আমি আপনার সাথে যাব বিজন বাবু: দেশের মুক্তিসংগ্রামে মেয়েরা কি চিরদিনই পেছনে পড়ে রইবে? দেশ কি শুধু পুরুষের একার?"

বিজনের দৃষ্টিতে প্রশংসার বিচ্ছুরণ। বলে 'অত সব কথা শিখলে কোথায় পারুল? তোমার লেখাপড়া ত কথামালা পর্য্যন্ত?'

পারুল এবার কৃত্রিম রাগে ধারালো কণ্ঠে জবাব দেয়। 'দেশকে ভালবাসতে হলে পাশ বুঝি করতে হয়, বিজন বাবু? ও কি একটা প্রেরণা নয়? এ ছাড়া আমি ও একবার কংগ্রেসেই ছিলুম। তারপর গলা নীচু করে পারুল বলে, 'একদিন ওরা লোভ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এলো।'

'কারা পারুল?' বিজনের সুরে উত্তেজনার আগুন।

'ঐ মিলের বাবুরা—টাকার তোড়া বাড়ীওয়ালার হাতে গুঁজে দিয়ে বুঝিয়ে দিলে মিলের ওখানে লাভ অনেক বেশী। মজুররা ত পরিবার নিয়ে থাকে না, সব টাকা আমাদের পায়ে এসে লুটিয়ে পড়বে; তাই, আসতে হলো আমাদের।'

'তোমার মত আরোও মেয়ে এখানে আছে নাকি?"—'আছে বৈ কি?' 'তবে ওদের

বাইরের মেয়ে বলে চেনবার উপায় নেই। ওরা কারো বা বউ কারো বা মেয়ে বলে পরিচিতা।'

'ইচ্ছে করে তোমরা এখানে মরতে এসো কেন?' নিস্তেজ কণ্ঠে পারুল জবাব দেয়, 'না এসে উপায় ছিল না যে?

'আর আমার একার ইচ্ছা অনিচ্ছার মূল্য সেখানে কতটুকু, বিজন বাবু। ওদের শক্তির বিরুদ্ধে একটা অসহায় মেয়ে কি করতে পারে?'

'তোমাদের কাছে পেয়ে মজুররা সুখে আছে বলতে হবে।'

'সুখ নয়, বিজন বাবু? ওরা যে জিনিসটাকে সুখ বলে ভাবছে, ও একটা সাময়িক উত্তেজনা; এই মোহ আছে বলেইত হতভাগা লোকগুলো সব অত্যাচার নীরবে সইতে পারচে।'

পারুল নিজের আবেদনে ফিরে আসে, 'আমি আপনার সাথে যাব, বিজন বাবু। নিঃস্ব লোকগুলার জন্যে মেয়েদের কি কোন কর্তব্য নেই?'

'সে পথ যে বড় কঠিন পারুল,' গম্ভীর কণ্ঠে বিজন বলে 'হোক কঠিন' পারুল এবার উত্তেজিত হয়ে উঠে; 'কঠিনের সাধনা কি শুধু পুরুষের?'

বিজন হাসিতে স্নিগ্ধ হয়ে উঠে. বলে 'বেশ. তাই হবে, দেশের ডাক যদি পাগল করে তুলেচে. তাকে ঠেকিয়ে রাখবার ক্ষমতা যে কারো নেই, পারুল। কিন্তু তোমার জীবনের ইতিহাস একদিন খুলে বলবে আমায়। তোমার বিদ্যে নিশ্চয়ই কথামালায় সীমাবদ্ধ নেই. সে আমি বেশ বুঝতে পারছি।'

পারুল বলে, 'সে ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবী রইলো. আমায় নিয়ে যাবার কি ব্যবস্থা করলেন?'

'কথা যখন দিয়েচি, তখন তোমায় নিয়ে যাবই, তবে সর্দারের সাথে একবার আলাপ করতে হয়।'

দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখে পারুল যেন চমকে উঠলো,—'গেরস্তকে জিজ্ঞেস্ করে জিনিস নিয়ে পালাবেন? তা' হলেই হয়েচে আর কি?'

—'কিন্তু এই ব্যাপার নিয়ে যদি একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটে!'

মুহূর্তের জন্যে পারুল ঝলমল করে উঠলো মনের দীপ্ত তেজে, যৌবনের বিদ্যুৎ চমকে। বিজনের কাছে সরে এসে অনাবৃত প্রখর কণ্ঠে বল্লে 'পারুল, নিজের এবং মনের শুচিতা রক্ষার জন্যে যদি ওদের মাঝে জ্বলে উঠে অসন্তোষের আগুন—তবে সে আগুনে ওরাই পুড়ে মরুক, তা'র দায়িত্ব আমারও নয়, আপনারও নয়, এইটুকু দৃঢ়তা না থাক্‌লে এদের বিলাসের স্রোত আপনি কেমন করে রুদ্ধ করবেন শুনি?'

বিজন নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকে, রূপে ও ব্যবহারে ঐ মেয়েটি যেন স্বাতন্ত্র্যে প্রখর, মৌলিকতায় প্রোজ্জ্বল, ঐশ্বর্য্যে অপ্রতুল।

*   *   *   *   *

বিজনের অবিরাম পরিশ্রম একদিন সফল হয়ে উঠ্‌লো, পাঁচশ শ্রমিক একদিন তাদের কাজের মোহ ছিন্ন করে নিম্নতম দাবী পূরণের জন্য মাথা তুলে দাঁড়ালো, বিজনের মারফতে মিল কর্ত্তৃপক্ষের সাথে যখন আপোষের সব আলোচনাই ব্যর্থ হয়ে গেল, তখন বাধ্য হয়ে তাদের শেষ অস্ত্র ছাড়তে হলো। ফলে মিলের দরজা বন্ধ, বুভুক্ষু নরনারী রক্ত পতাকা হাতে নিয়ে মিলের সামনে এসে জড়ো হলো—তাদের দাবী পূরণ হয় ভালো, না হয় মিলকে তারা ধূলোর সাথে মিশিয়ে দেবে। বিজন এসে দাঁড়ালে। সবার পুরোভাগে অর্থ দিয়ে, আশা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে বিজন এদের নিষ্প্রাণ জীবন যাত্রায় আনলে বিদ্রোহের বলদীপ্তি। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার জন্যে নিস্তেজ জনসঙ্ঘকে সে দিলে জাগরণের অগ্নিমন্ত্র।

কায়েমী স্বার্থের যারা উপাসক তারা কিন্তু এ ধর্ম্মঘটকে উপেক্ষার চোখে দেখলে না। বিদ্রোহের আগুণ গোড়াতেই চাপা দিতে না পারলে সে স্ফুলিঙ্গ একদিন ক্যাপিট্যালিজমের সৌধকে ভস্মিভূত কোরে দেবে, মালিকরা তা ভাল করেই বুঝলে। তাই এই পিকেটারদের পর সুরু হলো অমানুষিক অত্যাচার। ধর্ম্মঘটে যারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেনা কাজে, যোগ দিবার জন্যে তাদের পর চল্‌লো গুপ্তচরের দুর্বিসহ দৌরাত্ম্য, তবু সব অন্যায় সব নির্য্যাতন সহ্য করে শ্রমিকেরা প্রতিজ্ঞায় অটল রইলো—আর পুরাভাগে দাঁড়ালে তাদের তরুণ নেতা বিজন কুমার।

পারুল তাকে কত অনুনয় জানালে—'মার খেতে হয় আমরা আছি, তুমি কেন মিছিমিছি আমাদের জন্যে এত সইবে? তুমি যেমন আমাদের নেতা ছিলে তেমন দূরে দাঁড়িয়ে, লাঞ্ছিতের প্রণাম গ্রহণ করো। তোমার জীবনের মূল্য অনেক বেশী যে?'

মূহূর্ত্তের জন্য আদর্শের গরিমায় বিজনের চোখ দু'টো জ্বলে উঠ্‌লো বল্লে, 'আমি অমন ফাঁকা নেতৃত্বে বিশ্বেস করিনে পারুল। মানুষ যাকে শ্রদ্ধার আসনে বরণ করে নিলো, প্রথম আঘাত মাথা পেতে নেবার দায়িত্ব যে তারই।'

পরুল মুগ্ধের মতো শুনে যায়। মনে মনে এই নীরব কর্ম্মীকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন না করে পারে না। তার চোখে ভেসে উঠে বিজনের দীপ্ত মূর্ত্তি; সমস্ত নিপীড়নকে উপেক্ষা করে সুগৌরবে অমানিশার বুক চিরেও তরুণ সাধক ছুটে চলে মুক্তির উদয়াচলের সন্ধানে। পদে পদে তার বাধা বিপত্তির অভ্রভেদী পর্বত। মুহূর্ত্তে তার বুকে বাজে বেদনার হাহাকার। তবু তাকে অবিরাম এগিয়ে যেতে হবে আদর্শের ধ্রুবতারা লক্ষ্য করে। পঙ্গু জাতিকে তার শুনিয়ে দিতে হবে গণ-দেবতার গভীর আশ্বাসবাণী, দেশমাতৃকার বন্ধন মোচনের গুরুদায়িত্ব স্বেচ্ছায় যারা বরণ করে নিয়েচে, তাদের যে বিশ্রাম করবার অবসর নেই। দুনিয়ার শৃঙ্খলিত বেদনাতুর মানুষ নিবিড় আগ্রহে তাকিয়ে আছে তাদের একনিষ্ঠ তপস্যার দিকে।

মালিকেরা অসহিষ্ণু হয়ে পুলিশ ডাক্‌লে, লাঠির ভয় যখন নিষ্ফল হলো, পুলিশ তখন গুলি চালালে। নির্ভীক পদে পুলিশের বন্দুকের সামনে বিজন এগিয়ে গেল—তাকে আগে আঘাত না করে যেন একজন মজুরের বুকেও গুলির স্পর্শ না লাগে।

ছোটখাটো সংঘর্ষের ফলে তিনজন প্রাণ হারালে। পারুল সারা রাত জেগে বিজনের শুশ্রূষা করে ভোরের দিকে মোটর করে বাড়ী নিয়ে এলো। সুজাতা কিন্তু পারুলকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলে না।

(*)

ক'দিন শুশ্রূষার ফলে বিজন প্রায় সুস্থ হয়ে উঠ্‌লো। ওদিকে ধর্ম্মঘট তখনও চলছে, আর ঘরে বসে থাকা চলেনা। একমাস সংগ্রামের পর মজুররা অনেকেই হাল ছেড়ে দিয়েচে। অনাহারে অর্দ্ধাহারে আর কতদিন ওরা একটা সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে লড়বে? এ ছাড়া মুস্কিল হয়েছে পারুলকে নিয়ে; ওকে নিয়ে আসার জন্যে মজুররা নাকি খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—অনেকে এর বিকৃত অর্থ করতেও ছাড়েনি। সে যাই হোক—বিজন আজ সব অবস্থা ওদের খুলে বল্‌বে—পারুলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বন্দী করে রাখবার অধিকার ত কারো নেই।

খান কয়েক নোট পকেটে পুরে বাইরে যাবার জন্যে বিজন তৈরী হয়ে নিল, কিন্তু বাধা দিলে সুজাতা।

'এরই মধ্যে আবার বেরুচ্ছ যে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বল্লে সুজাতা। '—মজুরদের অবস্থা একবার দেখে আস্‌তে হবে না,' বিজন যেন আকাশে দাঁড়িয়ে কথা বল্‌চে—'টাকা না দিলে ওরা খাবে কি সুজাতা?'

'সে দায়িত্ব বুঝি তোমারই একার?' ধারালো তলোয়ারের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠ্‌লো সুজাতার কণ্ঠস্বর।

—'নেতা হবার সৌভাগ্য যদি আমার একার হয়ে থাকে,'—হাসিতে মস্থন হয়ে এলো বিজন; তা' হলে ওদের সাহায্য করবার দায়িত্বটুকুও আমার একার।'

শূন্য গলায় বল্‌লে সুজাতা, 'আমি তোমার কাছে এমন কি অপরাধ করেছিলাম যে আজ এমন করে তার শাস্তি পেতে হচ্ছে।' কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সুজাতা।

বিজন বিব্রত হয়ে পড়লো। বল্‌লে—'অপরাধ? না, তোমার বিরুদ্ধে আমার তো কোন নালিশ নেই সু, শাস্তির প্রশ্নটা অবান্তর।'

—তবে তুমি এমন করে—' পাথর চাপা ঝরণার জল যেন আচমকা উছলে পড়্লো—'সারা রাতদিন ঐ মুটে মজুরের পাছে পাছে ঘুরে বেড়াবে কেন শুনি? দেশের সেবা করবার আর কোন উপায়ই তুমি খুঁজে পেলে না?'

'—সাধনার বেদীকে আবার নতুন করে রচনা করবার সময় হয়েছে সু'—চেয়ারটায় সোজা হয়ে বসলে বিজন, 'দেশের মাটীর সাথে যাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাদের উপেক্ষা করে জাতির মুক্তির স্বপ্ন কি কখনো সফল হ'য়ে উঠবে?'

—'তাই বলে' সুজাতা বিজনের খুব কাছে মুখ নিয়ে এলো—'একটা মজুরের মেয়েকে তুমি উপযুক্ত সঙ্গিনী বেছে নিলে? আমি তোমার কেউ নই, আমি কি পারতুম না তোমার কর্ম্মের সাথী হোতে?'

বিজন ম্লান কণ্ঠে বল্লে—'তুমি আমায় ভুল বুঝোনা সু'। একজন অসহায় মেয়েকে ইচ্ছে করে তো ঝড়ের মুখে ঠেলে দিতে পারিনে।'

'ওকে আশ্রয় দিয়ে তুমি কি মজুরদের চোখে ছোটো হয়ে যাওনি, একদিন যারা তোমায় দেবতার মতো পুজো করতো, আজ তারা তোমাকে যা নয় তাই বলে ঘৃণা করছে সে খবর রাখো।'

'—জানি এবং এর জন্যে দায়ী যে মিলমালিকদের হীন প্রচার, সেও তোমায় জানিয়ে রাখা প্রয়োজন মনে করি।'

'—যাদের মুক্তির জন্য' কথার বিদ্যুৎ চম্‌কে ঝলসে উঠ্‌লে সুজাতা 'বন্দুকের মুখে বুক পেতে দিতে তুমি পেছপাও হওনি, তারা কেমন করে বিশ্বেস করলে...এক নিমেষে এমন সব বিচ্ছিরি কুৎসাকে ধ্রুবসত্য বলে মেনে নিলে, তোমার সব ত্যাগ, সব সাধনা এক মুহূর্ত্তে তাদের কাছে মিথ্যে হয়ে গেল।'

বারান্দায় পা দিয়ে গভীর কণ্ঠে জবাব দিলে বিজন,—'কোন সাধনাই ব্যর্থ হয়ে যায় না সু—'

সুজাতা সামনে এসে দাঁড়ালে—'অসুস্থ শরীর নিয়ে আবার যাচ্ছ বুঝি? ওরা যদি তোমায় অসহায় পেয়ে আক্রমণ করে?'

'তা করলেই বা'—উদাসীন কণ্ঠে বল্লে বিজন—'দেশকে জাগাতে হলে এমনি বিপদের ঝুঁকি নিতে হয় বৈ কি। শতাব্দীর পর শতাব্দী যাদের পায়ের নীচে মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলেছি, আজ তাদের সহযোগিতার বিনিময়ে অনেক কঠিন মূল্য চুকিয়ে দিতে হবে' বিজন সোজা মোটরে উঠে বস্‌লো।

সুজাতা কীই বা করতে পারে, ম্লান চোখে শুধু তাকিয়ে রইলো।

বিবর্ণ গলায় পারুল ডাক্‌তে চেষ্টা করলে—'সুজাতা দি'। কিন্তু স্বর তার দুঃস্বপ্নের বিহ্বলতায় নীরব হ'য়ে রইলো, দৈনিক কাগজের সব সংবাদকে বিশ্বেস্ করতে নেই। তবু আজকের এই ছোটো সংবাদটা যেন তার সামনে জীবন্ত মৃত্যুর মতো ভয়াল হয়ে দাঁড়িয়েচে। বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে পারুল খবরটা আবার পড়তে চেষ্টা করলে—

"দেশবন্ধু কটন মিল্‌সের ধর্ম্মঘটের শোচনীয় পরিণতি ঘটিয়াছে। গত সন্ধ্যায় বিখ্যাত শ্রমিক নেতা বিজন কুমার সরকার মোটর যোগে মিল অঞ্চলে আসিলে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। উত্তেজিত জনতা নিষ্ঠুরভাবে তাহাকে মিলের জলন্ত কয়লার ভিতরে ঠেলিয়া জীবন্ত দগ্ধ করে। হত্যার সঠিক কারণ এখনও জানা যায় নাই। তবে বহুদিনের ধর্ম্মঘট হেতু ক্লিষ্ট মজুরেরা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। দুষ্ট লোক রটনা করিয়াছে যে বিজনবাবু কর্ত্তৃক পারুল নাম্নী একটি মেয়েকে শ্রমিক কেন্দ্র হইতে উদ্ধার করাই নাকি এই নিষ্ঠুর হত্যার কারণ।"

বিরোধের মূল

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রভাসচন্দ্র ঘোষ

এই রকম মিথ্যা প্রচার সকল দেশে সব সময়েই চলবে, সব দেশেরই রাষ্ট্রনেতারা কয়েকজন মাত্র অস্ত্রব্যবসায়ীরই ইচ্ছানুসারে দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করচেন; জাতীয়কল্যাণের সকল পথই এখন বন্ধ, সব দিক থেকেই দেশের ভীষণ ক্ষতি সাধিত হচ্ছে, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রেরা আরো বেশী দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে, অবশেষে সকলেরই সর্ব্বস্ব হারিয়ে অবর্ণনীয় দুর্দ্দশা ভোগ করতে হবে: কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন কোটিপতির ঐশ্বর্য্যের বিপুল ভার অসীম হয়ে উঠবে: সাধারণ লোকের বর্ত্তমান অবস্থা এতই শোচনীয় যে তারা যথেষ্ট পরিমাণে অন্ন বস্ত্র কিনতে পারচে না, তাদের চরমতম শোষণ করে যা মুনাফা পাওয়া যেতে পারে তাত নেওয়া হয়ে গেছে, আগে মুনাফা চাই, এখন একমাত্র উপায় আছে, সমগ্র বিশ্বব্যাপী আসন্ন যুদ্ধের মিথ্যা আতঙ্ক সৃষ্টি করতে হবে; তাতে সকল দেশেরই জনসাধারণ দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়েই মহাবিপুল সমর সজ্জা করতে প্রবৃত্ত হবে; তখন অস্ত্র ব্যবসায়ীরা যা কিছু বলবেন, যা কোনো দর চাইবেন, সব কিছুতেই সকলকে রাজী হতে হবে, তাঁরা যে কোনো জিনিষই সরবরাহ করুন না কেন, বিনাবাক্যে তা নিয়ে নিতে হবে, যত বেশী নিকৃষ্ট, যত বেশী ক্ষতিকরই হোক না কেন, তাঁদের জিনিষ তাঁদের দরেই কিনতে হবে।

এঁরা বেশী মুনাফার লোভে দেশের কাছে অত্যন্ত খেলো জিনিষই বিক্রী করেছেন, এমন ভীষণ অকর্ম্মণ্য, এমন অসম্ভব রকমের খারাপ জাহাজ ও বিক্রয় করেছেন যে, তাতে চড়লে সৈনিকদের অনেক সময়েই অবধারিত মৃত্যু হত: বিগত মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ১৯১৭ সনে বিমান বিভাগে একশত কোটি ডলার খরচ করেছিলেন, অথচ ১৯১৮ সনের নভেম্বরের পূর্ব্বে যুদ্ধোপযোগী কোনো বিমানই ফ্রান্সের সমরাঙ্গনে পৌঁছয় নি; "লিবার্টি" এরোপ্লেনগুলি এমনই বেশী খারাপ, এতই বেশী বিপজ্জনক যে বৈমানিকেরা তাদের flaming coffins নামেই অভিহিত করত; এগুলির সমস্ত দোষ জেনেও কর্ত্তৃপক্ষেরা আরো বেশী অর্ডার দিয়েছেন; এতে অনেক অমূল্য জীবনই বৃথা ধ্বংস হয়েছে।

সমরাতঙ্কের সময় অস্ত্রব্যবসায়ীদের যে কত ভীষণ লাভ হয় তার কোনও ইয়ত্তা নেই। এইত সেদিন আক্রমণের ভয়ে গ্রেট-ব্রিটেন অল্প কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বহুলক্ষ বালির বস্তা কিনেছিল, সে সম্বন্ধে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ ২৪শে অক্টোবর তারিখের সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখেছেন,—

"In Britain one of the least pleasing features of last month's crisis was the orgy of profiteering it produced. Owing to the stocking tardiness of those responsible for organising A. R. P. (Air Raid Precautions),

there were sudden frantic demands for all sort of materials, and prices rocketed amazingly. Many local authorities found they had to pay 1/- each for sand-bags which had cost 3½ d a few days previously, in some places a figure 600 percent above normal is reported to have been quoted. Digging implements in certain areas were almost unobtainable except for fantastic sums, and in the west country and other parts which were thought likely to be spared the attentions of German bombers house rents rose for a brief period to unprecedented heights."

"ধর্ম্ম বিপন্ন" এই চীৎকার করে অনেক ধার্ম্মিকেরা যে কত বেশী অর্থ নিজেদের হস্তগত করেন আমরা তা অনেকবারেই দেখেছি এবং দেখে আসছি; "দেশ বিপন্ন" এই চীৎকার করে অনেক ব্যবসায়ীই অনেক কোটী টাকা লাভ নিয়েছেন এবং নিচ্চেন; মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়ান সাম্রাজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে ট্রটস্কি তাঁর ইতিহাসে বলচেন,—"কেন্দ্রীয় আধার হতে যেমন সমস্ত দেশে জল সরবরাহ হয় তেমনি এই সম্মেলন হতেও অসংখ্য ধারা বের হয়ে বিভিন্ন ব্যবসাগুলিকে পুষ্ট করেছিল ও অসংখ্য ক্ষুধার্ত্ত ধনিকের ক্ষুধা নিবৃত্ত করেছিল। রাষ্ট্রীয় পরিষদে ও খবরের কাগজে ১৯১৪-১৫ সালে লাভের যে যে বিবরণ ছাপা হয় তাতে জানা যায় 'রিয়াবুশিনস্কী'র মাস্কো টেক্সটাইল কোম্পানী লাভ করে শতকরা ৭৫ ভাগ, জার কোম্পানী' ১১১, 'কোলচুগিন' কোম্পানী লাভ করে ১০ মিলিয়ন মূলধনের মধ্যে ১২ মিলিয়ন টাকা। এই সকল পুঁজিদার ব্যবসায়ী অতি শীঘ্রই আবার দেশহিতৈষী বলে পুরস্কৃত হয়। বাজারে সর্ব্বপ্রকার দালালী ও জুয়াচুরীর চরম দেখা গিয়েছিল। ধনের রাশি যেনো রক্তের সমুদ্র হতে ভেসে এলো। দরিদ্রের আহার্য্য ও জ্বালানী কাষ্ঠের যত অভাবই হোক না কেন কাউন্ট জহুরী (Jeweller) "ফেবারগেট" কিন্তু বলতে পেরেছিলেন যে এবারের মত লাভজনক ব্যবসায় আর কখনো করেন নি। ১৯১৪-১৫ সালের শীতকালের মত আর কখনো এমন গাউনের শোভা দেখা যায় নাই। এত হীরা আর কখনো কেনা হয়নি।...খরচ করতে কেউ ভীত নয় সব যেন সোণা ঝরে পড়ছে অনবরত। চারিদিকে শুধু বিলাসের ও অনাচারের প্রাচুর্য্য। যত অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকরা, ব্যবসায়ী, ডিউক ইত্যাদি সকলেই যেন ধনের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে ভোগলোলুপ হয়ে উঠেছিল যদি বা এই ধনবর্ষণ ক্ষান্ত হয় এই ভয়ে। যুদ্ধশান্তির সময় তখন যেনো আসেনি কারণ তারা শান্তির চিন্তাকে লজ্জা ও ক্রোধের সহিত প্রত্যাখ্যান করেছিলো।"

সকল সাম্রাজ্যেই এই একই অবস্থা, সর্ব্বত্রই ব্যবসায়ীরা তাঁদের অল্প মূলধনের বহুগুণ লাভ করেছিলেন; "দেশের নামে, জাতির নামে" তাঁরা ব্যবসায়ে নেমে যুদ্ধের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহ করবার ভার নিয়েছিলেন, এবং কয়েকজনে মিলে সমস্ত ব্যবসাটাই নিজেদের মধ্যে একচেটে করে ফেলেছিলেন: সুতরাং তাঁদের এই অসাধারণ দেশভক্তির অসামান্য পুরস্কার লাভ হয়েছিল। গ্রেট ব্রিটেনের ভিকারস্ আরমষ্ট্রং, জার্ম্মানির ক্রুপ, ফ্রান্সের শ্নাইডের ক্রোয়সো,

জাপানের মিট্‌সুই, চেকোশ্লোভাকিয়ার স্কোডা প্রভৃতি, এঁদের নাম বিশ্ব-বিশ্রুত, এঁরাই এখন সমস্ত সভ্যজগতটাকে নিজেদের হাতের মুঠোর মধ্যে রেখেছেন, বিশ্বমানবের সমরশান্তি জীবন মরণ এঁদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এদের সঙ্গে এসে জুটেছেন, কয়েকটি বিরাট রাসায়নিক কারখানা, যথা I. C. I., এর মূলধন সাতকোটী পাউণ্ড, ১৯৩২ সনে এর লাভ হয়েছিল, ৬,৪২৫,৪২৩ পাউণ্ড। এখন যে কত বেশী লাভ হচ্চে তার খবর অনেকেই রাখেন না। মাত্র কয়েকজনে এই সমস্ত লভ্যাংশ ভোগ করচেন। সুতরাং এই "জাতীয়" সম্পদের বহর দেখে সমস্ত দেশভক্তরই পুলকিত হওয়া উচিত।

জাতিতে জাতিতে বিরোধের একটা কারণ বোঝা গেল : ১৯১৪-১৮ সনের গত মহাযুদ্ধের সময়ে এবং তার পূর্ব্বে মুনাফার লোভে অস্ত্রব্যবসায়ী প্রভৃতি ধনিকেরা যেমন সমস্ত সভ্যদেশেরই রাষ্ট্রপতিদের (ও তাঁদের অন্ধ অনুবর্ত্তীদের) পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে দিয়ে উভয়পক্ষকেই খুব বেশী চড়া দামে যুদ্ধোপকরণ বিক্রী করে অকৃত্রিম স্বদেশ প্রেমের পুরস্কার স্বরূপ যৎকিঞ্চিত কাঞ্চন মূল্য লাভ করেছিলেন, তাতে তাঁদের পেট ভরেনি ; যুদ্ধ শেষ হবার পরেই শান্তি স্থাপন ও নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাবে তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, এই সময়ে তাঁদের দুর্ব্বৎসর পড়েছিল, মুনাফা কিছু কম হচ্ছিল. আবার ঠিক কবে ব্যবসায়ের সুদিন ফিরে আসে সেই বিষয়েই অনেক পুরামর্শ করেছিলেন। তাঁদের একটা মন্ত্র এই, যদি শান্তি চাও, নিরাপদে থাকতে চাও, যদি যুদ্ধ থামাতে চাও, যুদ্ধ আর যাতে না বাধতে পারে তার ব্যবস্থা করতে চাও, তাহলে আরো বেশী সমরসজ্জা করতে থাকো ; পৃথিবীর সকল দেশের লোকই যত অস্ত্রশস্ত্র কিনবে ততই তাদের মঙ্গল। অবশ্য ১৯১৯ থেকে তাঁরা অনেক দেশেই অনেক যুদ্ধ বাধিয়ে চলেছেন ; যুদ্ধে যাদের যতবেশী উৎসাহ তাদের ততবেশী সমর্থন এবং সাহায্য করে আসচেন ; (WickhamSteed's *Hitler : whence and whither ;* Leland Stowe's *Nazi Germany Means War ;* Ernst Henri's *Hitler over Europe*) মুসোলিনী এবং হিট্‌লার প্রভৃতি শতমুখেই যুদ্ধের অসংখ্য গুণের প্রশংসা করে আসচেন। এবং এঁদের সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করাতেই ধনিকদের স্বার্থ, এঁরা একদিকে সমস্ত দেশেরই শ্রমিক দলনে সবচেয়ে বেশী উৎসাহী ও সফল ; আবার এঁদেরই বিশেষকরে হিট্‌লারের আঘাতেই শ্রমিকদের সাধারণতন্ত্র সোভিয়েট্‌ রাষ্ট্রের সর্ব্বনাশ হবার সম্ভাবনা. সেই জন্যেই পশ্চিম ইয়োরোপ এবং ফ্যাশিস্‌ট্‌ জার্ম্মাণীর মিলনে সকলে এত বেশী উল্লসিত, এ বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী অনেকদিন পূর্ব্বেই অনেকে করেছেন, The Western European Powers might be glad to allow Germany a free hand in the Slavic East and South for the satisfaction of any further expansionist aims—(*Germany enters the Third Reich*) হিট্‌লার স্বয়ং (*Mein Kampf*) এবং রোসেনবার্গও (*The future path of a German Foreign Policy*) এই মর্ম্মে লিখেছেন।

বর্ত্তমান অর্থসঙ্কট সমাধানেরও একমাত্র পথ আবার সমরসজ্জা ; শান্তির সময়ে মুনাফার

হার কমে আসে, ব্যবসায়ীরা জিনিষপত্র বেচে বেশী দর পান না, তখন দর বাড়াবার জন্যে তাঁরা অবাধে প্রচুর পণ্যই নষ্ট করে ফেলতে থাকেন (অবশ্য পৃথিবীর অধিকাংশ সাধারণ লোকেই অর্দ্ধাশনে অনশনেই আছে), তাতেও বেশী লাভ হয় না; ফাশিস্ট্ দেশগুলিতেও মন্দা খুব বাড়তে থাকে, (*Einzig : Economic Foundations of Fascism*) শান্তির পণে, সাধারণ পণ্য বিক্রী করে বেশী লাভের আশা নেই ; যুদ্ধোপকরণেই অপরিমিত লাভ, তাই সেই দিকেই ধনিকদের ঝোঁক পড়ে। কেইনস্ ১৯৩৩ সনেই লিখেছিলেন, *cynics. ...conclude that nothing except a war can bring a slump to its conclusion.* (*The Means to Prosperity*).

এখন ধনিকেরা সকলেই cynics ; ভবিষ্যতে যা হবার হোক, এখনত অব্যবহিত লাভ চাই, আজ এখনই যে কোন উপায়ে হোক অপর্য্যাপ্ত মুনাফা অর্জ্জন করতে হবে ; অসংখ্য লোকে অবশ্য অর্থাভাবে খাদ্যাভাবে তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করচে, কিন্তু তাদের জীবনের সুব্যবস্থা করতে এখনই কোনো লাভের আশা নেই, কিন্তু দেশের মধ্যে হঠাৎ যুদ্ধের আতঙ্ক জাগাতে পারলে আসল মূলধনের বহুগুণ লাভ হবেই হবে, অতএব যুদ্ধই ভাল। ধনিকদের এত বহুকোটি টাকা বৃথা পড়ে রয়েছে, সে টাকাত খাটাতে হবে, যুদ্ধের আয়োজনেই খাটানো যাক, আর যাই হোক অফুরন্ত মুনাফাত হবেই। Any demands for goods, however artificial and unproductive, is calculated, on balance to benefit trade (Einzig : *The Economics of Re-armament*).

প্রত্যহ প্রাতঃকালে খবরের কাগজগুলি পড়লেই বুঝতে পারা যাবে যে অস্ত্রব্যবসায়ীদের, ধনিকদের জয় জয়কার হচ্চে। সাধারণ লোকের প্রয়োজনের অর্থ ব্যবস্থা করবার কোনও উপায়ই নেই, কারণ—"টাকার অভাব" ; কিন্তু সমর সজ্জার জন্যে প্রতিদিনই অসংখ্য কোটি টাকার বরাদ্দ হতে পারচে। অস্ত্রকারখানাগুলির সমৃদ্ধিরত কোনও শেষই নেই। শেয়ারের দর হু হু শব্দে বাড়বে, এতবেশী লভ্যাংশ অনেক বছরই পাওয়া যায়নি।

প্রতীক

আভা দেবী

(১)

অতি সাধারণ আমি,
মানুষ বলিতে তোমারেই শুধু জানি,
মিলনে অধীর, বিরহে বিধুর,
তবু মনে হয় যেনো বহুদূর,
এ প্রেম আমার ঊর্ধলোকের আশীর্বাণী।
সবারই মতন আমিও বিরহে নীরবে কাঁদি,
সবারই মতন লীলায়িত করে বাঁধি,
তবু মনে হয়, এতো প্রেম নয়
কী যেনো এখনো রয়েছে বাঁকী
চরম সত্য মিথ্যা মিলনে
তোমারে আমারে দিতেছে ফাঁকি।

(২)

তোমারে মানুষ যদি বলি,
দেবতারে খুঁজিয়া না পাই ;
মন্দিরের পাষাণেরে দেবতা ভাবিয়া
ভালো যদি বাসিবারে চাই
অন্তরের অন্তস্থল হতে
কে যেনো বিদ্রূপ ভরে কয়,
মানুষের বেশে আমি এতো তোরে বাসিলাম ভালো
তবু তোর হোল না প্রত্যয় ?
প্রেমের প্রতীক তুমি দেবতা আমার
মানুষ তোমারে কেবা কয়।

তুরস্ক ও কামাল আতাতুর্ক

বিনয় ঘোষ

মহম্মদের ইস্‌লাম ধর্ম্ম বয়সে খৃষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা প্রায় ছয়শত বৎসরের ছোট। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে কতকগুলি অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। ঐতিহাসিকেরা এই পরিবর্ত্তনকে বলিয়াছেন মধ্যযুগ হইতে আধুনিক যুগের রূপান্তর। খৃষ্টানরা পোপ ও ধর্ম্মধ্বজী রোমান সম্রাটের আধিপত্যকে অস্বীকার করিয়া তাহাদের দৃষ্টি স্বাধীনতাক্ষেত্রে আরও একটু প্রসারিত করিল এবং আমরা তাহার প্রতিধ্বনি শুনিলাম রেণেসাঁস-এর বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহ্যমুক্ত আন্দোলনের মধ্যে। মুশ্লিম যুগের চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে অর্থাৎ আমাদের এই বর্ত্তমান যুগে ইস্‌লামও ঠিক সমাবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে; খলিফ ও অটোমান্ সম্রাটের একচ্ছত্র প্রাধান্যকে বর্জ্জন করিয়া মুশ্লিমরা প্রতীচ্যাদর্শে জাতি ও রাষ্ট্রগঠনে মনোযোগ দিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মের কৈশোরে তাহার যে স্বাভাবিক চাঞ্চল্য দৃষ্ট হইয়াছিল আজ ইস্‌লাম-এর কৈশোরেও ঠিক সেই একই চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে।

অটোমান্ তুর্কেরা ভ্রাম্যমান জীবন পরিত্যাগ করিয়া বহুপরে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। গোবী মরুভূমিতে তাঁবু ফেলিয়া তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, তারপর টার্টারদের দ্বারা পশ্চিমদিকে ধাবিত হইয়া আনাটোলিয়াতে যাইয়া আশ্রয় লইল এবং সেখানে পরে বসবাস করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। আরব্য মুশ্লিমরা তাহাদের ঘৃণা করিত বটে, কিন্তু তাহাদেরই সহায়তায় পারস্য উপসাগর হইতে আড্রিয়াটিক্ পর্য্যন্ত তাহারা এক বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল একজন মুশ্লিমের শাসনাধীনে। উনবিংশ শতাব্দীতে মুশ্লিম সাম্রাজ্যের অধঃপতন সুরু হইল। ভল্টেয়ার বলিতেন, "ইহা মুশ্লিমও নয়, সাম্রাজ্যও নয়, তুর্কীও নয়।" মুশ্লিম নয় কারণ বল্‌ক্যান্ ও এশিয়ামাইনরের খৃষ্টানরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ: সাম্রাজ্য নয় কারণ খৃষ্টানরা কতকগুলি স্বাধীন ষ্টেট-চার্চ্চের অনুশাসন মানিয়া চলিত এবং বিদেশী বণিকেরা তাহাদের নিজ নিজ কন্‌সালের নির্দ্দেশ অনুযায়ী সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য করিত, সাম্রাজ্যের কোন আইন কানুনের ধার ধারিত না; তুর্কী নয় এইজন্য যে সেখানকার ভাষা ও সাহিত্য ছিল আর্বী, আইন প্রণয়নে শাসক সম্প্রদায়ের কোন ক্ষমতা ছিল না, ছিল কোরাণের ও দেবতার, এবং সেই সব আইন পর্য্যালোচনা করিবার ভার অটোমানদের উপর ছিল না, ছিল 'উলেমা' অর্থাৎ Learned Path'এর মহাপুরুষদের উপর।

এই সুযোগে য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলি সাম্রাজ্যটিকে ভাঙিয়া ফেলিবার ষড়যন্ত্র করিল। ইংলণ্ড ফ্রান্স ও রাশিয়ার সহায়তায় গ্রীস ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্য হইতে নিজেকে ছিন্ন করিয়া লইল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তুর্কীর সুলতানের সহিত তাঁহার ঈজিপ্টের ভাইসরয়ের যুদ্ধ বাঁধিল। তুরস্কের উপর রাশিয়ার তখনলোভ ছিল বেশী এবং শ্লাভদেশ বলিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়াও বুলগেরিয়া ও সার্বিয়ার শ্লাভদের রক্ষণাবেক্ষণের দাবী করিল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ক্রাইমিয়ান যুদ্ধে ইংলণ্ড তুরস্ককে সাহায্য করিয়াছিল, কারণ অদূর প্রাচ্যে তাহার শক্তি সাম্য বজায় রাখিতে হইলে রাশিয়াকে দাবাইয়া রাখা একান্ত প্রয়োজন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার রাশিয়া বল্‌ক্যান্-এর খৃষ্টানদের বিদ্রোহের সুযোগ লইয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সেবারও ইংলণ্ড রাশিয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিল এবং দুইটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ প্রায় ঘনাইয়া আসিয়াছিল কিন্তু পর বৎসর বার্লিনের চুক্তিতে যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যায় এবং রুমানিয়া, সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, বুলগেরিয়া আংশিক স্বাধীনতা লাভ করে এবং ইংলণ্ড সাইপ্রাস্ পায়।
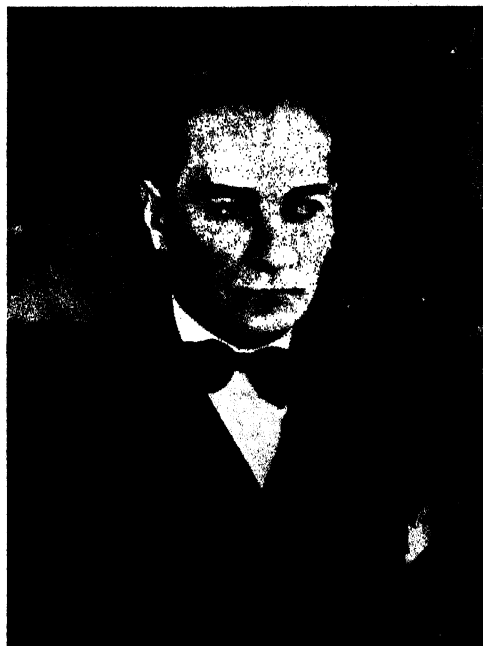
কামাল আতাতুর্ক

ইহার তিন বৎসর পরে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের জাতীয় জীবনের ঘোরতর সঙ্কটের দিনে স্যালোনিকায় এক কাষ্ঠব্যবসায়ীর গৃহে কামাল জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালেই কামাল পিতৃহীন হইয়াছিলেন। ছাত্রজীবন তিনি বেশী দিন যাপন করেন নাই, কারণ শিক্ষকের অনুশাসন তাহার সহ্য হইত না। স্কুলে অধ্যয়নকালে গণিতশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ মেধার পরিচয় পাইয়া শিক্ষকেরা তাঁহাকে 'কামাল' (perfection) বলিয়া ডাকিতেন। স্কুল পরিত্যাগ করিবার পর মায়ের কাছে শিক্ষা পাইয়াই কামাল মানুষ হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিলেন। কামাল সামরিক শিক্ষায় আকৃষ্ট হইলেন এবং সামরিক কর্ম্মচারীদের সঙ্গপ্রভাবে ক্রমে ক্রমে জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন হইয়া উঠেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তরুণ তুর্কদের উদ্যোগে "কমিটি অফ্ ইউনিয়ান্ এ্যাণ্ড প্রগ্রেস্" নামে একটি গুপ্ত বিপ্লবী সঙ্ঘ স্থাপিত হয় এবং কামাল তাহাতে যোগদান করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে নব্য তুর্কী বিপ্লবের সময় কামাল তাহাতে যোগ দেন এবং ১৯১১-১২ সালে ত্রিপোলিতে ইতালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া

তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখান। ইতালো-তুর্কী যুদ্ধে বল্‌ক্যান্‌ রাষ্ট্রগুলি তুরস্কের অস্তিত্ব য়ুরোপ হইতে বিলুপ্ত করিবার সুবর্ণ সুযোগ পায়। প্রথম বল্‌ক্যান্‌ যুদ্ধ তুরস্কের দ্রুত পরাজয়ের জন্য ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল। দ্বিতীয় বল্‌ক্যান্‌ যুদ্ধে তুরস্ক বুলগেরিয়ার নিকট হইতে আদ্রিয়ান্‌ পোল পুনরুদ্ধার করে। এই যুদ্ধে কামাল যথেষ্ট সামরিক পারদর্শিতা দেখান। তারপর গত মহাযুদ্ধের সময় তুরস্ক জার্ম্মানির পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে এবং এন্‌ভার জার্ম্মাণ সমরদক্ষদের তুরস্কে লইয়া

কামাল আতাতুর্ক ও তাঁহার পত্নী

আসেন। কামাল এই বিদেশী সামরিক কর্ম্মচারী আমদানির পক্ষে ছিলেন না। ১৯১৫ সালে গ্যালিপোলি যুদ্ধে সেনাপতি হিসাবে কামালের খুব সুনাম হয় এবং যুদ্ধের শেষভাগে তিনি সাইরিয়ান্‌ ফ্রন্টেও যুদ্ধ করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে যদি কামালের মৃত্যু ঘটিত তাহা হইলে নির্ভীক সেনাপতিত্ব ও বীরত্বের জন্য দারদানেল্‌স্‌ অভিযানের কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের একটি নিরালা কোণে তিনি স্থান পাইতেন। কিন্তু কামালের দায়িত্ব শুধু সেনাপতিত্বেই শেষ হয় নাই,

হিণ্ডেনবুর্গ ও পিলস্সুড্স্কির মত তাঁহার উপরেও জাতি গঠনের গুরুভার পড়িয়াছিল এবং জাতিগঠন মূলক কার্য্যে হিণ্ডেনবুর্গ বা পিল্সুড্স্কি অপেক্ষা কামাল অনেক বেশী কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। যে প্রতিকূল পরিবেষ্টনের বৈরীতার বিরুদ্ধে কামালকে অক্লান্ত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, হিণ্ডেনবুর্গ বা পিলস্সুড্স্কি তাহা কল্পনাও করিতে পারেন না। তাই কামালের জীবনেতিহাস শুধু একজন রণকুশল বীর সেনাপতির রোমাঞ্চকর সমরকাহিনী নয়, সমগ্র তুর্কীজাতির অভ্যুত্থানের উদ্দীপিত ইতিহাস।

কামাল স্থির করিলেন য়ুরোপের "মুমূর্ষু রুগীকে" চিকিৎসা করিতে হইবে এবং সে চিকিৎসায় সফলকাম হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বিষাক্ত বিজাণুগুলিকে ধ্বংস করিতে হইবে। স্বৈরতন্ত্রী স্বেচ্ছাচারী সুলতানী শাসনতন্ত্র নির্ম্মূল করিয়া যাবতীয় কদর্য্য কুসংস্কার ও ধর্ম্মবেশী দুর্নীতির আবর্জ্জনা দূর করিয়া তুরস্কের গবর্ণমেণ্টকে পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে তুরস্কের আরোগ্যলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের তুরস্ক হইতে হঠাইতে হইবে। কামালের দায়িত্ব অনেক এবং অবশেষে কণ্টকাকীর্ণ পথে সেই দায়িত্বের ভার বহন করিবার সুযোগও মিলিল। আনাটোলিয়ায় বিদ্রোহীদের সাড়া পাইয়া সুলতান কনষ্ট্যান্টিনোপোল হইতে কামালকে সেখানে স্থানান্তরিত করিলেন নরম সৈন্য বাহিনীর ইনসপেক্টর পদে নিযুক্ত করিয়া। বুদ্ধিমান কামাল আনাটোলিয়ায় পৌঁছিয়া সুলতানের নির্দ্দেশ অবমাননা করিয়া বিদ্রোহীবাহিনীর নেতৃত্ব আরম্ভ করিলেন এবং সেই সুযোগে বহু বাধাবিপত্তির মাঝখানে একটি শক্তিশালী সৈন্য-বাহিনী গঠন করিয়া ফেলিলেন। ধ্বংসোন্মুখ তুরস্কের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তিনি সৈন্যদের যত্ন করিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কামালের গতিবিধি দেখিয়া সুলতান ভয় পাইয়া তাঁহাকে আনাটোলিয়া হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু কামাল সুলতানকে জানাইয়া দিলেন; "যতদিন না তুরস্ক স্বাধীন হইবে ততদিন আমি আনাটোলিয়াতেই থাকিব।" তুরস্কবাসীর অবসন্ন স্নায়ুকে উত্তেজিত করিতে কামালকে যথেষ্ট ধৈর্য্য ধরিতে হইয়াছে। তাহারা সুলতান ও খলিফের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে ধর্ম্মের ভয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। কামাল তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেন যে বিদ্রোহ সুলতানের বিরুদ্ধে নয়, বিদ্রোহ করিতে হইবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে। কামালের ব্যক্তিত্বের এমন একটি শক্তিশালী প্রভাব ছিল যে সেই সৈন্যবাহিনীর দলপতি হইতে তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর দেশের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিদের লইয়া সিভাস্-এ একটী কংগ্রেস হয় এবং সেখানে তুরস্কবাসীর পক্ষে 'ন্যাশানাল প্যাক্ট' নামে একটি ডকুমেণ্টে কতকগুলি শান্তিসর্ত্ত লিখিয়া সুলতানের নিকট চরমদাবী হিসাবে প্রেরণ করা হয়। এই সঙ্গে পার্লামেণ্টের পুনঃ নির্ব্বাচনও দাবী করা হয় এবং সুলতান আপত্তি সত্ত্বেও সম্মতি দিতে বাধ্য হন। এই সঙ্গে পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হয়। তুরস্কের এই নবজীবনের কোল্যাহলে সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সুলতান ঘন ঘন ধর্ম্মের দোহাই দিয়া জাতির অধঃপতনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। সমস্ত দেশ জুড়িয়া অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হইল;

কামালকে বিদ্রোহী ঘোষণা করা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইয়া দেওয়া হইল যে যে কেহ কামাল ও তাঁহার অনুচরবর্গকে হত্যা করিতে পারিবে সে ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া ইহজগতে তো বটেই, পর জগতেও পুরস্কৃত হইবে। কিন্তু নির্ভীক কামাল এইভাবে চতুর্দ্দিক হইতে শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়াও ঋজু মনে নিজের সংগ্রাম-সঙ্কুল কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সেই সময় গ্রীক সৈন্যবাহিনী স্মার্ণায় অবতরণ করিল। কামাল গণমতকে জয় করিয়া বহু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্য পাইলেন এবং অন্তর্বিপ্লব থামিয়া গেল। কামালের নির্দ্দেশানুসারে গ্র্যাণ্ড ন্যাশানাল এ্যাসেম্‌ব্লি নামে নূতন পার্লামেণ্ট গঠন করা হইল এবং কামাল সেই এ্যাসেম্‌ব্লির প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইলেন। এই এ্যাসেম্‌ব্লি তুরস্কের আইনী গবর্ণমেণ্ট বলিয়া ঘোষণা করিল। এদিকে তুরস্কের এই নূতন অবস্থার ঢেউ প্যারীসের শান্তি সভায় আঘাত করিল। সকলেই ভাবিয়াছিলেন মহাযুদ্ধে তুরস্কের শেষ হইয়া যাইবে, তাই এই নূতন পরিস্থিতির অর্থ তাঁহাদের মালুম হইল না। কে কামাল কোথা হইতে আসিয়া হঠাৎ একটি পঙ্গু জাতিকে এইভাবে সজীব করিয়া তুলিল—এই দুশ্চিন্তায় শান্তিকামী রাজনৈতিক ধুরন্ধরদের মনের শান্তি নষ্ট হইয়া গেল। বিজয়দাম্ভিক সাম্রাজ্যবাদীদের ম্লেচ্ছপ্রবৃত্তি সজাগ হইয়া উঠিল, তাঁহারা সঙ্কল্প করিলেন তুরস্ককে একেবারে টুঁটি টিপিয়া মারিতে হইবে। মিত্র রাষ্ট্রগুলি ষড়যন্ত্র করিয়া তুরস্কের জন্য একটি চুক্তিপত্র প্রকাশ করিল। এই চুক্তি হইতেছে ১৯২০ সালের বিখ্যাত সেভারস্ চুক্তি। এই চুক্তিতে তুরস্কের স্বাধীন সত্তার উপর মৃত্যুর রায় দেওয়া হইল। চতুর্দ্দিক হইতে তাহাকে পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করা হইল। সাম্রাজ্যবাদীদের চুক্তির যাহা দস্তুর, কামাল সেভারস্ চুক্তিতে সেই পৈশাচিক প্রবৃত্তির পরিচয় পাইলেন। তুরস্কবাসীরা আরও বেশী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। কামাল কনষ্ট্যানটিনোপোলে অগ্রসর হইলেন। কনষ্ট্যানটিনোপোলে শত্রু পক্ষের সৈন্য বেশী ছিল না, আর নূতন আমদানি করাও সম্ভব নয়, কারণ যুদ্ধের পর সকলেরই মানসিক অবসন্নতা আসিয়াছে। কিন্তু গ্রীক প্রধানমন্ত্রী ভেনীজেলস্ তখন গ্রীক সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিতেছেন, তিনি এশিয়ামাইনরের কিছু বক্‌রার পরিবর্ত্তে স্মার্ণায় অবস্থিত গ্রীক সৈন্যবাহিনী দ্বারা মিত্ররাষ্ট্রগুলির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। মিত্ররাষ্ট্রগুলি দ্বিরুক্তি করিল না, গ্রীসো-তুর্কী যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কামাল একটুও বিচলিত হইলেন না। তিনি তাঁহার তুর্কী সৈন্যদের লইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং গ্রীক সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। তারপর ১৯২৩ সালের লোজান চুক্তিতে তিনি বল্‌ক্যান্ যুদ্ধে তুরস্কের হৃত রাজ্যগুলির পুনরুদ্ধার করিলেন। এইবার দেশীয় শত্রু সুলতানকে বিনাশ না করিলে তুরস্কের কোন মুক্তি নাই। সুতরাং তুরস্কে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়া তিনি অবিলম্বে সুলতান পদ উঠাইয়া দেন এবং ১৯২৩ সালেই তুর্কী সাধারণতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট ও ডিক্টেটর হইয়া কামাল তুরস্কের পালক বলিয়া 'আতাতুর্ক' নাম গ্রহণ করেন।

তুরস্কের রাষ্ট্রনায়কপদে নির্ব্বাচিত হইয়া আতাতুর্ক দেখিলেন যে তুরস্কের নূতন জীবন

সঙ্কার করিতে হইলে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে সংস্কারবদ্ধ ঐসলামিক ধর্ম্মের প্রভুত্বকে বিনাশ করা। অর্থাৎ খলিফাদের হীন বিলাসিতার পঙ্ককুণ্ড হইতে তুরস্ককে আগে উদ্ধার করিতে হইবে। স্বার্থান্বেষী বিশ্বাসঘাতক খলিফরা তাহাদের ক্লিন্ন মনোবৃত্তি গোপন করিয়া রাখিবার জন্য কোন দিনই তুর্কীদের সংস্কারমুক্ত কবিবার চেষ্টা করে নাই। খলিফরা তুরস্কবাসীদের সংস্কারের নিগড়ে বাঁধিয়া তাহাদের নির্জীব করিয়া দিয়াছে। তাহাদের আত্মনির্ভর বা আত্মশক্তিতে আস্থা নাই। ঐস্‌লামিক ধর্ম্মের নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া জাতির প্রাণস্পন্দন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আতাতুর্ক খিলাফৎ ও সুলতানকে উচ্ছেদ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন এবং মিথ্যা ধর্ম্মবোধের পরিবর্ত্তে জাতীয়তাবোধে দেশবাসীকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। সুলতানের বিলুপ্তি ঘটাইয়া আতাতুর্ক দেশদ্রোহের অভিযোগে আবদুল মজিদকে অভিযুক্ত করিলেন। রাষ্ট্রশক্তিকে নিরঙ্কুশ রাখিবার জন্য আতাতুর্ক যখন খলিফের পদবিলোপের সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন তখন চতুর্দ্দিকে ইস্‌লামের নামে সোরগোল উঠিয়াছিল যে আবদুল মজিদকে খলিফের পদে অধিষ্ঠিত করা হউক। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদীদের খয়েরখাঁ আগা খাঁ ও আমীর আলি এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলেন এবং সেই পত্র পাইয়া আতাতুর্ক খিলাফৎ বিনাশের জন্য আরও বেশী দৃঢ় সংকল্প হইলেন। আতাতুর্ক দেশবাসীদের বুঝাইয়া দিলেন যে আগা খাঁ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদীদের অনুচর এবং তাহাদের কুমতলব শুনিয়াই তিনি এই চিঠি লিখিয়াছেন। আতাতুর্ক ধর্ম্মভাবকে পরাজিত করিয়া এমন সুকৌশলে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিলেন যে এ্যাসেমব্লীতে ডেপুটিরা খিলাফৎ বিলুপ্তির পক্ষে প্রায় মতৈক্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আবদুল মজিদ য়ুরোপে পলায়ন করিলেন এবং খিলাফতের কবল হইতে সংস্কারাচ্ছন্ন তুরস্ককে মুক্ত করিয়া, রাষ্ট্রকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিজয়ী আতাতুর্ক মুস্‌লিম ইতিহাসে যুগান্তর আনিলেন। ১৯২৮ সালে ইস্‌লাম গণ-তান্ত্রিক তুরস্কের রাষ্ট্রধর্ম্ম, এই ধারাটিও তুলিয়া দেওয়া হয়। শরিয়তের পরিবর্ত্তে আতাতুর্ক জার্ম্মানি, ইতালী ও সুইজারল্যাণ্ডের আইন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলেন। ধর্ম্মের সহিত রাষ্ট্রের যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করিয়া কুলিশচরিত্র আতাতুর্ক দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে 'খোদার নামে' দেশ-শাসন করা আর চলিবে না, আত্মসম্মান ও জাতির নামে শপথ করিয়া দেশ শাসনের পবিত্রভার গ্রহণ করিতে হইবে। ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামি ও ধাপ্পাবাজি করিয়া দেশসেবা করা যায় না। দেশসেবা আর ধর্ম্মদাসত্ব পরস্পর বিরোধী।

প্রাক্‌সামরিক যুগে তুরস্ক পাশ্চাত্য শক্তিগুলির মুখাপেক্ষী ছিল। আজ আতাতুর্ক বহু পরিশ্রম করিয়া তাহাকে নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার মত শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি বাণিজ্যের সব শাখাপ্রশাখাগুলিকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। বিদেশী বণিকদের চাপে পড়িয়া তুরস্কের প্রাচীন করশিল্পগুলি প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তুরস্কবাসীরা চাসবাসের উপরেই বেশী নির্ভর করিত। অর্থ-নৈতিক সঙ্কটের সময় কৃষিপণ্যের মূল্য কমিয়া যাওয়াতে কৃষিজীবীদের চরম দুর্দ্দশা হয়। তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য আতাতুর্ক বিদেশী পণ্যের উপর উচ্চশুল্ক বসাইলেন

এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য যতদূর সম্ভব যত্নবান হইলেন। আজ আনাটোলিয়ার প্রচুর ধনসম্ভার ও ঐশ্বর্য্যের দিকে সমস্ত তুরস্কবাসী একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। ১৯৩৪ সালে তুরস্ক পঞ্চবার্ষিক প্ল্যান্ আরম্ভ করে। এই পঞ্চবার্ষিক প্ল্যানের ফলে আজ তুরস্কের তন্তু, লৌহ কাগজ, চিনি, কাচ প্রভৃতি অনেকগুলি শিল্প উন্নত। তন্তুশিল্পে তুরস্ক প্রায় আত্মনির্ভরশীল হইয়াছে। ইস্পাতের চাহিদা আজ সে নিজেই মিটাইতে পারে। আজ আর বিদেশ হইতে চিনি বা গম আমদানি করিতে হয়না, বরং তুরস্কই বাহিরে গম চালান দেয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক প্ল্যানও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং এই প্ল্যানে খনি ও বৈদ্যুতিক শক্তি বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।
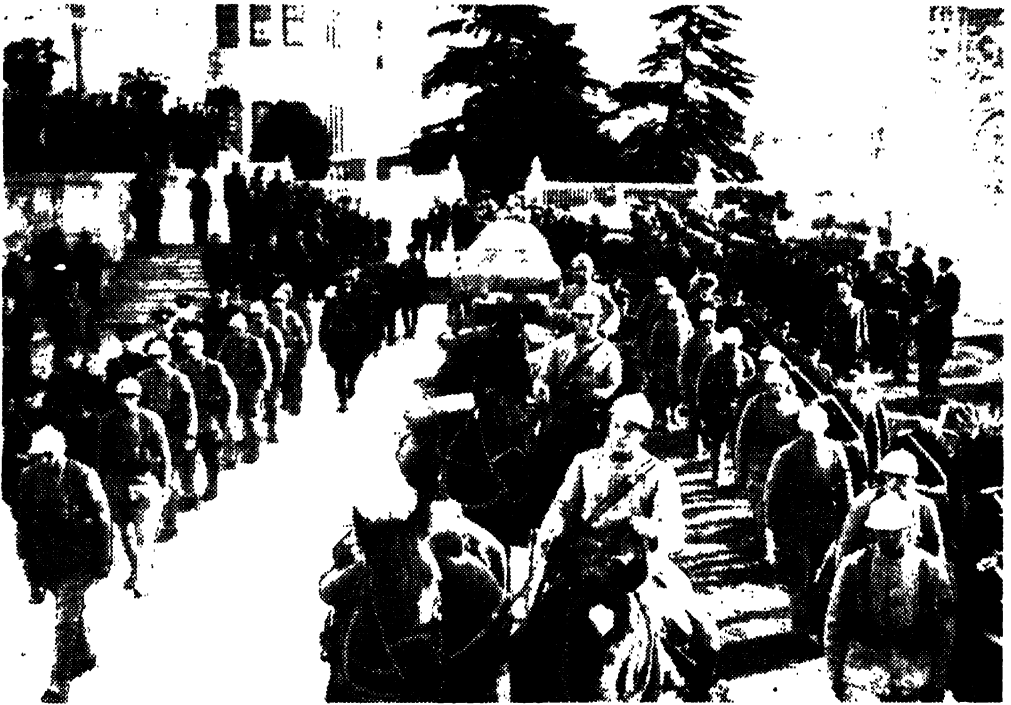
আতাতুর্কের কফিন ডল্‌মাবাগ্‌টী প্রাসাদ হইতে গান্ ক্যারেজে করিয়া যুদ্ধ জাহাজে নীত হইতেছে।

প্রাচীন জরাজীর্ণ সমাজের ধর্ম্মক্লিষ্ট কুৎসিত মূর্ত্তিকে পরিমার্জ্জিত করিয়া আতাতুর্ক তাহার অঙ্গসৌষ্ঠবের দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিলেন। কৃষিজীবী কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটি জাতিকে য়ুরোপীয় সভ্যতায় দীক্ষিত করা সহজ নয়। আতাতুর্ক বুঝিলেন একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষাদান ব্যতীত এ-সমস্যার সমাধান অসম্ভব। তিনি ঐস্‌লামিক ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হইতে শিক্ষাব্যবস্থাকে মুক্ত করিয়া পাশ্চাত্য রীতিতে দেশে শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিলেন। প্রথমে আতাতুর্ক বাহিরের কয়েকটি কুসংস্কার দূর করিয়া তাঁহার পরিকল্পিত সমাজ গঠন সুরু করিলেন। ১৯২৫ সালের নভেম্বর

মাসে আতাতুর্ক ফেজ ও পাগড়ী পরিধান নিষেধ করিয়া য়ুরোপের মত হ্যাট্ পরিধানের আদেশ দিয়া এক আইন জারী করিলেন। পানামা হ্যাট্ পরিধান করিয়া আতাতুর্ক যখন নিজেই জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন তখন সকলে হতভম্ব হইয়া গেল। তুরস্কবাসীরা প্রথমে ঘোরতর আপত্তি জানাইল, কিন্তু আতাতুর্ক বলিলেন যে তাঁহার আদেশ পালন করিতেই হবে এবং যে অমান্য করিবে তাহাকে কঠিন দণ্ড দেওয়া হইবে। ফেজ পরিধান করা অজ্ঞতার পরিচয়, সুতরাং ফেজ পরিধান করিয়া কিম্ভূতকিমাকার বেশে ঘুরিয়া বেড়াইলে চলিবে না। বিদ্রোহ থামিয়া গেল; তুরস্কবাসী ঘাড় হেঁট করিয়া আতাতুর্কের আদেশ মানিয়া লইল।

আতাতুর্কের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হইতেছে পরাধীন নারীদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান। যাহারা পর্দ্দায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া পথে চলাফেরা করিত, প্রমোদগৃহে একটি নির্জ্জন কোণে যাহাদের বসিবার স্থান ছিল, ট্রামে বাসে একদিকে পর্দ্দার আড়ালে যাহারা জড়সড় হইয়া বসিয়া থাকিত, যাহাদের স্বামীর দাসীবৃত্তি করাই ছিল জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তাহারা আজ পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিয়া আলোবাতাসের মাঝখানে সোজা হইয়া পথ চলে, আজ কর্ম্মক্ষেত্রে তাহারা স্বেচ্ছায় আগাইয়া যায়, এমন কি সামরিক শিক্ষাতেও আজ তাহাদের যোগ্যতা কিছু কম নহে। সেই জন্যই আতাতুর্কের মৃত্যুর পর তুরস্কের নারীরা দলে দলে পথে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। আতাতুর্ক একজন পাশ্চাত্যশিক্ষিতা তুরস্ক রমণীকে ভালবাসিয়াছিলেন এবং পরে তাহাকেই বিবাহ করিয়া নারীস্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ হইয়া যায় এবং নারীরা বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার পায়। পর্দ্দাপ্রথা তুলিয়া দিয়া তুরস্ক নারীদের য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ ব্যবহারের আদেশ দেওয়া হয়। স্ত্রীশিক্ষার জন্য য়ুরোপীয় আদর্শে বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে শিক্ষকতা, আইন, চিকিৎসা ব্যবসা প্রভৃতি সকল রকম বৃত্তি অবলম্বনে তুরস্করমণীদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ১৯১৯ সালের নারীরা ভোটদানের প্রথম অধিকার লাভ করে এবং ১৯৩৪ সালে রাষ্ট্রীয় নির্ব্বাচনে ও পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিবার অধিকার তাহাদের দেওয়া হয়।

প্রাচীন তুরস্কের ধ্বংসাবশেষ আর্বী অক্ষর তুলিয়া দিয়া আতাতুর্ক ১৯২৮ সালে ল্যাতিন হরফ প্রচলিত করেন। ১৯২৯ সাল হইতে সরকারী কাগজপত্র, সাময়িক পত্রিকা, সংবাদপত্র প্রভৃতি মুদ্রণে ল্যাতিন হরফ ব্যবহৃত হইতে থাকে। বিশুদ্ধ তুর্কী ভাষাকে জাতির একমাত্র ভাষারূপে প্রচলিত করা হয় এবং সম্পূর্ণ কোরাণকে তুর্কী ভাষায় তর্জ্জমা করা হয়। অক্ষর ও ভাষা সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাসায় ধর্ম্মমূলক শিক্ষার পরিবর্ত্তে আধুনিক পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। মোল্লাদের হাত হইতে শিক্ষাদানের ভার কাড়িয়া লইয়া পাশ্চাত্য আদর্শে বহু বিদ্যালয় স্থাপিত করা হয়। অক্ষর ও শিক্ষা ছাড়াও আতাতুর্ক নাম সংস্কার করেন এবং 'আলি' 'আহাম্মদ', 'মুস্তাফা' প্রভৃতি পদবী ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন। এইভাবে প্রাচীন অপ্রচলিত সামাজিক বিধিবিধানের আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি তুরস্ককে রূপান্তরিত করিলেন।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে সুলতানের রাজত্বের সময় যদিও তুরস্ক স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য হইত তাহা হইলেও আতাতুর্কের গণতান্ত্রিক নব্যতুরস্কের সহিত তাহার আকাশমাটি ব্যবধান। য়ুরোপের সাম্রাজ্য বাদী শক্তিবর্গের অধীনে তাহার যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সার্ব্বভৌমত্বে বিনাশ ঘটিয়াছিল সেগুলি এখন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সীমান্তে তুরস্ক দণ্ডায়মান এবং যে ভৌগলিক স্থান সে দখল করিয়া রহিয়াছে তাহা যে-সমস্ত রাষ্ট্র কন্টিনেণ্টে রাজনীতিক শক্তিবৃদ্ধির আশা করে তাহাদের কাছে লোভনীয়। যে ফুরহার বৃহত্তর জার্ম্মানির রঙিন স্বপ্নে মশগুল্ তাঁহার কাছে তুরস্ক যেমন লোভনীয়, যে-ডুচে ভূমধ্যসাগর ইতালীয় হ্রদে পরিণত করিয়া রোমান্ সাম্রাজ্যের কল্পনা করিতেছেন তাঁহার নিকটেও তুরস্ক সমান লোভনীয়। এশিয়ামাইনরে নিজের অবস্থা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য এবং ভারতবর্ষের সমুদ্রপথ আগলাইয়া রাখিতে ব্রিটেনের যতখানি তুরস্কের জন্য মাথাব্যথা থাকা স্বাভাবিক, সাইরিয়া রক্ষার জন্য ফ্রান্সের যে তাহা অপেক্ষা কিছু কম থাকিবে এমনও বলা যায় না।

আতাতুর্কের তুরস্ক বিশ্বমানবের শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়াছে কারণ তুরস্কের পররাষ্ট্র-নীতি কোনদিন শান্তিভঙ্গ করিয়া সাম্রাজ্য বুভুক্ষায় উদভ্রান্ত হইয়া বা ফ্যাশিস্ত রাষ্ট্রগুলির সহিত গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া পৈশাচিক ধ্বংসলীলায় ও বলাৎকার ব্যবসায় প্রবৃত্ত হয় নাই। শান্তির এই মহৎ উদ্দেশ্যের মিলন হওয়াতেই তুরস্কের সহিত সোভিয়েট্ রাশিয়ার সমস্ত বৈদেশিক ব্যাপারে আন্তরিকতা দৃষ্ট হইয়াছে। শুধু তাই নয়, আতাতুর্কের তুরস্ক তাহার সকল প্রতিবেশীর সহিত আন্তরিকতা বজায় রাখিবার জন্য চিরদিনই চেষ্টা করিয়াছে। গ্রীকদের সহিত বিবাদ মীমাংসা আতাতুর্কের পররাষ্ট্র নীতির একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। তুরস্কের জাতীয় মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য আতাতুর্ক যে সকল সর্ত্তে গ্রীসের সহিত শান্তিচুক্তি করিয়াছিলেন তাহার একটিও তিনি বিশ্বাসঘাতক সাম্রাজ্যবাদী বা ফ্যাশিস্ত রাষ্ট্রনায়কদের মত ভঙ্গ করেন নাই। তুরস্কের জন্যই বল্‌ক্যান্ রাষ্ট্রগুলি এতদিন সমস্ত সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইয়াছে। এইসব কারণেই আতাতুর্কের ডিক্টেটরশিপ্-এর সহিত হিট্‌লার মুসোলিনীর ডিক্টেটরশিপ্-এর প্রভেদ অনেক। আতাতুর্ক ও তাঁহার অনুচরবর্গ প্রতারণাও শঠতা ঘৃণা করিতেন। আবিসিনিয়ান্ যুদ্ধ ও রাইন্‌ল্যাণ্ড পুনরাধিকারের সময় জেনেভায় যাইয়া দারদানেল্‌স্-এর জন্য আবেদন করিতে তুরস্ককে মিথ্যা সম্মানজ্ঞান বাধা দেয় নাই। য়ুরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি যখন তীব্র জাতীয়তা ও তাজা রক্তের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে ব্যস্ত তখন তুরস্ক প্রাচীন এসিয়াতিক বর্ব্বরতা হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া মানবতার বিশাল ভিত্তির উপর দেশশাসন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান। বিশ্বের ইতিহাসে ইহার সমদৃষ্টান্ত এক সোভিয়েট্ রাশিয়া ভিন্ন আর একটি সত্যই দুর্ল্লভ।

১৯৩৬ খ্রীঃ অব্দে জুন মাসে মনক্রস্ক্ চুক্তিতে দারদানেল্‌স্ রক্ষার অনুমতি পাইবার পর তুরস্কের পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। এই প্রথম তুরস্ক অন্যান্য য়ুরোপীয় শক্তিগুলির সমস্তরে উন্নীত হইল। সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত তুরস্কের বন্ধুত্ববন্ধন ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতে

লাগিল। তুরস্কের সহিত মস্কোর সোহার্দ্দ্য দেখিয়া একদিন লণ্ডনে সকলে বিদ্রুপ করিয়া বলিত যে তুরস্কের বৈদেশিক অফিস ক্রেমলিনে। ১৯৩৭ সালের আগষ্ট মাসে ট্রট্স্কিপন্থী বলিয়া কারাচান্কে গুলি করিয়া মারা হয়। ১৯৩৬ সালে নভেম্বর মাসে আতাতুর্ক নিজে ঘোষণা করিলেন, আলেকজাণ্ড্রেটার সাইরিয়ান্ শ্যানজ্যাকে তুরস্কের স্বার্থ আছে এবং যদিও আতাতুর্ক ফ্রান্সের সহিত তাঁহার বন্ধুত্বের কথা বার বার উল্লেখ করিতে ভুল করেন নাই তথাপি তিনি এমন একটি সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা য়ুরোপীয় রাজনীতিতে যথেষ্ট উদ্বিগ্নতার কারণ হইবে। স্পেনীয় ব্যাপারে ইজিয়ান্ সাগরে সাবমেরিন্ সম্বন্ধে গতবৎসর রাশিয়া যখন ইতালীর বিরুদ্ধে তুরস্কের নিকট সাহায্য চাহিয়াছিল তখন আতাতুর্ক তাহাতে সম্মতি দেন নাই। সেইজন্য তাঁহার বিখ্যাত প্রধান-মন্ত্রী ইস্‌মেত ইনোন্নু পদত্যাগ করিয়াছিলেন।

আজ আতাতুর্ক মৃত, তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইয়া কোন লাভ নাই। ইসমেত ইনোন্নু তুরস্কের প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আতাতুর্ক শেষ জীবনে ভীষণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিয়া আতাতুর্ক সম্মিলিত নিরাপত্তার উপর আস্থা হারাইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া একদিক হইতে শুধু অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন। ঈজিপ্ট, আফগানিস্থান, বল্‌ক্যান্, রাশিয়া তো আছেই, ইরাক্ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের সহিত চুক্তি করিয়াছেন, গ্রীসের সহিত চুক্তি নূতন করিয়া করিয়াছেন এবং সম্প্রতি ফ্রান্সের সহিত চুক্তি করিয়াছেন আলেকজানড্রেটার রক্ষণের জন্য। কিছুদিন পূর্ব্বে লণ্ডনের 'ষ্টার' পত্রিকা ভীষণ প্রচার সুরু করিয়াছিল যে গ্রেটব্রিটেনের সহিত তুরস্কের

ইস্‌মেত ইনোন্নু তুরস্কের বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট

বন্ধুত্বের পাকাপাকি বন্দোবস্ত ঘনাইয়া আসিয়াছে এবং ব্রিটিশ প্রেস আজও ঘন ঘন ঘোষণা করিতেছে যে প্রাচ্যে ব্রিটেনের উদ্দেশ্য হইতেছে ইংলণ্ড, তুরস্ক ও ইহুদী রাষ্ট্রের মধ্যে সুয়েজ খালের নিরাপত্তার জন্য মিত্রতা স্থাপন করা। এই বৎসর জানুয়ারী মাসে তুরস্ক ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর কয়েকজন লণ্ডন যাত্রা করেন এবং সেখানে ইস্তাম্বুল ও ইজমিরের বন্দরগুলি বর্দ্ধিত করিবার প্রস্তাব করা হয় এবং ব্ল্যাক সি-তে কতকগুলি বন্দর পুনর্গঠন করিবার কথা উঠে। তুরস্ক নিরপেক্ষ নীতিও

অবলম্বন করিয়াছে এবং ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ-ইতালীয়ান্ বুঝাপড়ার বহুপূর্ব্বে আতাতুর্ক ফ্রাঙ্কোর নিকট এজেন্ট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

এ্যাক্সিস্-এর মোহে আতাতুর্ক যে শেষজীবনে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন একথা আজ আমাদের খুব দুঃখের সহিতই স্বীকার করিতে হইতেছে। আতাতুর্ক বুঝিয়াছিলেন যে বর্ত্তমানে এই ফ্যাশিস্ত এ্যাক্সিসের চারিদিকেই য়ুরোপীয় রাজনীতি ঘূর্ণায়মান। তিনি যে অবস্থার মধ্যে তুরস্ককে রাখিয়া গিয়াছেন সে অবস্থায় বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট ইস্মেত ইনোনুর দায়িত্ব অনেক। ইস্মেত ইনোনু তুরস্কের পররাষ্ট্র নীতিকে কতদূর ঠিকপথে চালিত করিতে সক্ষম হইবেন জানিনা, তবে এ কথা ঠিক যে ইনোনু সমর পরিকল্পনায় ও রাজনীতিক্ষেত্রে আতাতুর্কের পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া এতদিন যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, একনিষ্ঠতা, দূরদৃষ্টি, অধ্যবসায় ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তিনিই তুরস্কের শাসনভার গ্রহণ করিবার যোগ্যতম ব্যক্তি। ইস্মেত ইনোনুর রাজনৈতিক পরিচালনার উপর শুধু তুরস্কের নয় সমগ্র প্রাচ্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ইনোনু হয়তো ভুলিবেন না যে ডোডোকানেস্ দ্বীপমালায় ইতালীর জাহাজ ও বিমান ঘাঁটি থাকিলে তুরস্কের নিশ্চিন্ত থাকিবার কোনই কারণ নাই। এবং দার্দ্দানেল্স্ এর জন্য য়ুরোপীয় সঙ্কটে তুরস্ককেও অংশীদার হইতে হইবে। ইহা ব্যতীত দক্ষিণ-পূর্ব্বে আর্মেনিয়ান, কুর্দ ও সাইরিয়ানদের মধ্যে আজও হিংস্র বৈরীভাব জাগ্রত রহিয়াছে এবং ইরাক এর তৈলভূমির নিকট যে তুরস্কের স্থান তাহাকে যে ব্রিটেন্ নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিবে ইনোনুর পক্ষে এ রকম ভ্রান্ত ধারণা থাকাও ক্ষতিকর।

গ্রন্থ-পরিচয়

Power : A New Social Analysis

By—Bertrand Russell.

p p. 328, Allen and Unwin. 1938. 7/6d.

সৃষ্টির আদি যুগে মানুষ পৃথিবীতে ছিল একান্ত দুর্ব্বল ও অসহায়। চারিদিকের নিষ্করুণ, ভয়াবহ প্রকৃতি এবং হিংস্র জীবজন্তু প্রতি পদক্ষেপে তার জীবন যাত্রা দুর্গম ও সঙ্কট-সঙ্কুল করে রাখত। সে সময় সহজাত বুদ্ধি ও সবল হস্ত ভিন্ন প্রকৃতি তাকে আত্মরক্ষার কোন নির্ভরযোগ্য অস্ত্র দেয় নাই। শুধু সামান্য সম্বল ও সুম্ভাবনা নিয়ে আদি মানব যাত্রা শুরু করে সৃষ্টির উষাগর্ভ হতে। যাত্রা পথে প্রকৃতির বিশ্বব্যাপী বিরাট শক্তি প্রথমে তাকে অভিভূত করল। পরে কোন শুভক্ষণে তার ইচ্ছে জাগল নিজকে শক্তিশালী করতে, পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে আপন আয়ত্তাধীনে আনতে। মানব সভ্যতার ইতিহাস সেই শক্তি সাধনা ও সঞ্চয়ের ইতিহাস।

আদিম যুগ হতে আজ পর্য্যন্ত মানুষের শক্তি সম্বন্ধে ধারণা ও শক্তি অর্জ্জনের পথ নানা পরিবর্ত্তন পরম্পরার ভিতর দিয়ে এসেছে। Browning তাঁর 'Caliban upon Setebos' কবিতায় আদিম মানব প্রকৃতির রুদ্রলীলা দেখে ভয় বিহ্বল চিত্তে শক্তি সম্বন্ধে কি চিন্তা মনে মনে করেছিল তার একটা কাল্পনিক ছবি দিয়েছেন। আদি যুগের সে অস্ফুট, ক্ষীণ ধারণা নানা ভুল ভ্রান্তির ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে যুগের পর যুগে যাদুবিদ্যা, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানে উজ্জ্বল স্পষ্টতা লাভ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে শক্তি অর্জ্জন ও ক্ষমতাপ্রিয়তা মানব হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়েছে। যাদু ও আধিভৌতিক ক্ষেত্রে ব্যর্থ প্রয়াস হয়ে মানুষ যখন বাস্তব জগতে ক্ষমতা লাভ করতে মন দিল, তখন ইতিহাসের এক অভিনব অধ্যায় সুরু হল।

সঙ্ঘবদ্ধ জীবন শক্তি সঞ্চয়ের সহায়ক। সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতি সংগঠনের মূলে রয়েছে এ প্রেরণা। কাজেই সমাজ এবং রাষ্ট্র বিজ্ঞানের গোড়ার কথা শক্তি।

রাসেলের বইখানা এ মূলসূত্র অবলম্বনে লেখা। ভাষা অনবদ্য এবং লেখনভঙ্গী অনুপম। প্রতি পৃষ্ঠায় তীক্ষ্ণ, শাণিত শ্লেষাত্মক উক্তিগুলি বর্ত্তমানকালের Voltaireএর পক্ষেই সম্ভব। তাঁর মতে জড় বিজ্ঞানে Energy যেমন মৌলিক পদার্থ এবং দৃশ্যমান জগত সে Energyর সংঘাত সংযোগের ফল তেমন সমাজ বিজ্ঞানে ক্ষমতা। Energy যেমন অবস্থা ভেদে বিভিন্ন রূপ পায়, রূপান্তরিত হয়েও এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত, এক অবস্থার বিলুপ্তিতে অন্য অবস্থার বিকাশ হয় তেমন সমাজ ক্ষেত্রে সব কিছুর মূলে রয়েছে ক্ষমতা। বিভিন্ন পরিবেশে ক্ষমতা বিভিন্ন রূপ নিয়েছে, নানা পরিবর্ত্তন সাধন করেছে। এখানে বলে রাখা ভাল যে Oswaldএর 'Law of Energetics'এর ন্যায় কোন mechanistic কাঠামোর ভিতর সমাজতত্ত্বকে ফেলতে রাশেল্ চান না।

'The laws of social dynamics are laws which can only be stated in terms of power, not in terms of this or that form of power' । যেমন শুধু economic power.

তিনি সমাজ ক্ষেত্রে ক্ষমতার সংজ্ঞা দিয়েছেন, 'abilities to produce intended effects upon men in societies তার এ সংজ্ঞানুসারে রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামরিক ও প্রচার প্রভৃতি একই ক্ষমতার নানা বিকাশ। বিভিন্ন প্রকাশ পরস্পর অবচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত এবং আভ্যন্তরিক ঘাত প্রতিঘাত এরূপ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় অহরহ উদ্বেলিত ও উৎক্ষিপ্ত। পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত করে এদের বিশ্লেষণ করা যায় না।

বিভিন্ন অবস্থায় মানব সমাজে শক্তির রূপ কিভাবে পরিবর্তিত হয় রাসেল তা বিশ্লেষণ করে, ব্যক্তি ও রাষ্ট্র জীবনে তাদের প্রভাব অনুসারে শ্রেণী বিভাগ করেছেন। তাঁর নির্দ্ধারিত শ্রেণী বিভাগে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১। নগ্ন ক্ষমতা যাহা শুধু পাশবিক বলে অন্যকে শাসন করে।

২। ক্ষমতা যাহা নানা স্বার্থ সিদ্ধির প্রলোভন ও সুযোগ দিয়ে শ্রেণী বিশেষকে অনুগত রাখে।

৩। ক্ষমতা যাহা বিশেষ মতবাদের সাহায্যে চিন্তা রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করে।

খুব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সাহায্যে উক্ত তিন শ্রেণীর ক্ষমতার ভিতর পরস্পরের প্রতিক্রিয়া এবং সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে তাদের প্রতিফলন বেশ সুন্দরভাবে দেখান হয়েছে।

ব্যক্তি ও সমাজে কোন মনোভাবের প্রভাব প্রবল হলে Dictator এবং Fascism উদ্ভব হয় তার খুব স্পষ্ট ও সহজবোধ্য ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন;

তাঁর মতে বহুমুখী, বহুবিচ্ছিন্ন জীবন যাত্রা ও এর জটিল সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়াচঞ্চল বর্ত্তমান সভ্যতা কখনই প্রগতির পথে চলিবেনা যতদিন ক্ষমতা যথাযথভাবে ব্যবহার ও বশীভূত না হবে। ইহা বাস্তবে পরিণত করতে হলে তার বাধা বিঘ্ন যত বেশীই থাক না কেন, তিনি বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ সমাজ ও সভ্যতা সম্বন্ধে নিরাশ নন।

'Hitherto, the kind of naked tyranny which has recently been established by dictatorships, has never been proved a stable form of government. There is, therefore, no reason hastily to assume that we are living through the final extinction of civilisation. The preservation of civilisation depends on preventing those who love power from arbitrary exercising it.

তিনি মনে করেন ইহা শুধু সম্ভব Democracy ও Socialismএর ভিত্তিতে রাষ্ট্র সংগঠন, যুদ্ধ বিগ্রহের লোপ সাধন এবং উদার লোকশিক্ষার প্রচলন।

ক্ষমতা যথাযথভাবে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা বহুকাল হতে চলেছে কিন্তু অতীত ও বর্ত্তমানে তা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব হয় নি। 'Both old-fashioned democracy and new-fashioned Marxism have aimed at taming of power. The former failed, because it was only political, the latter because it was only economic. Without a combination of both nothing approaching to a solution of the problem is possible.

শৈলেশচন্দ্র রায়

বাংলাসাহিত্যে নবতম চিন্তা

ইদানীন্তন যুগে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ নবযুগের নবচিন্তার প্রথম প্রদর্শক। কিন্তু ৫০ বৎসরের অধিককাল ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চিন্তাধারায় মানুষের চিত্তভূমিকে এমনভাবে প্রসিক্ত করিয়া গিয়াছেন যে তাহার ফলে আমরা চারিদিকেই সাহিত্যোন্মেষের নূতন নূতন অঙ্কুর দেখিতেছি। সম্প্রতি অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রণীত **'ক্ষণলেখা'** নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ বাহির হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে লেখকের দুই-চারিটি কবিতা মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল বটে কিন্তু তিনি এতদিন কবি হিসাবে পরিচিত ছিলেন না। তাঁহার একটি স্বতন্ত্র দার্শনিক দৃষ্টি আছে যাহা আধুনিক প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ধারা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই দৃষ্টির দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া **'ক্ষণলেখার'** রেখাপাত ঘটিয়াছে।

লেখক দার্শনিকরূপে দেশে ও বিদেশে সুপরিচিত ও সুবিখ্যাত। কিন্তু 'ক্ষণলেখাতে' তাঁহার যে কবিস্বরূপের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে তাহাতে চিত্ত বিস্ময়ে ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। কবি কথাটির প্রাচীন অর্থ "ক্রান্তদর্শী"—অর্থাৎ সাধারণ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে আমরা যাহা দেখি, কবি তাহার ব্যাপক ও গভীর স্বরূপটিকে প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু কেবলমাত্র বস্তুর গূঢ় স্বরূপকে প্রকাশ করিলেই কাব্য হয় না, যখন তাহা রচনার কৌশলে ও রমণীয়তায় বা ব্যঞ্জনার দ্বারা রসাপ্লুত হইয়া প্রকাশ পায়, যাহা পাঠকের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে আনন্দে অভিষিক্ত করিয়া দেয়, তখনই তাহাকে কাব্য বলা যায়। ক্ষণলেখার কবির দৃষ্টিভঙ্গী অভিনব, বিশ্ব-প্রকৃতির ও মানবচিত্তের চিরন্তন রহস্য তাঁহাকে অতি গভীর ও নবীনভাবে স্পন্দিত করিয়াছে, সেই উপলব্ধির প্রেরণায় তিনি সত্যের নূতন নূতন রূপ তাহার দীপ্তিতে ও আনন্দে ছন্দ ও ভাষার আবেষ্টনে অতি সুন্দর ও সাবলীলভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তবে কবির এই দৃষ্টি সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া পাঠককে সতর্ক হইয়া তাঁহার কাব্যে প্রবেশ করিতে হয় পাছে অনবধানতায় ও অপরিচয়ের জন্য মূল মর্ম্মকথাটিকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে না পারি, কিন্তু তাঁহার দেখার প্রণালীতে কোনও নিরর্থক জটিলতা নাই এবং তাহা এমনই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে যে সহজেই আমাদের কাছে সত্যের অন্তরঙ্গ রূপটি অনাবৃতরূপে ও সুসমঞ্জসভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

বিশ্বজগতের যে গূঢ় রহস্য অনাদিকাল হইতে আপনার বিচিত্র লীলায়, বর্ণে রূপে স্পর্শে গন্ধে সুষমায়, আকাশে বাতাসে, বনস্পতি তৃণগুল্মে, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গে, প্রাণধারার প্রবাহে, মানবমনের দুঃখ সুখের দোলায় উত্থানে পতনে নিত্য উৎসারিত হইয়া চলিয়াছে, তাহাকে জানিবার আকুল কামনা মানুষের চিত্তকে আলোড়িত ও মথিত করিয়া তোলে।

কোথায় মহিমা লুকায়ে রেখেছ তব
কোথা আরম্ভ কোথা শেষ চির নব ?

*   *   *   *

একটি ফুলের কোমল পাপড়ি লয়ে
কি খেলা খেলিছ রঙের ঝর্ণা হয়ে ?
কীট-পতঙ্গ পাখায় আঁকিছ ছবি
পশু বিহঙ্গে কুতুক রঙ্গ লভি।

কিন্তু ইহার সমাধান কোনও অসীম বা অলৌকিকের মধ্যে অন্বেষণ করিতে যাওয়া বৃথা, আপনার হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতির মধ্যেই তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়—

হৃদয়দলে ফুটেছে যাহা মিলায়ে তার সাথে
অর্থ কিছু পড়িছে ধরা নিখিল ধারাপাতে।

না জানার বেদনার দহনে হৃদয় যখন একটি শুদ্ধ শিখায় জ্বলিয়া ওঠে, তাহাতে তাহার পরিচয় কিছু ফুটিয়া ওঠে—

দলিত-হৃদয় চন্দন-তেল সম
গোপনে জ্বালায়ে তুলিবে প্রদীপ মম
তাহাতে জ্বলিবে একটি শুদ্ধ শিখা
তোমার নামটি হইবে তাহাতে লিখা।

এই জিজ্ঞাসা যখন তীব্র হয় এবং মানুষ নানা প্রকারে জ্ঞানে, ধ্যানে বা কর্ম্মে তাহার সমাধান করিতে প্রয়াসী হয়, তখন তাহার বেদনা আরও নিবিড় হইয়া উঠে। দুর্গম সাধনপথে সে একান্ত একাকী। কিন্তু সেই দুঃস্বপ্নের বেদনার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে সে অনুভব করে যে যাহা সে পাইয়াছে, যাহা জানিয়াছে তাহার মধ্যেই অজানা রহস্যের স্পর্শ রহিয়াছে। প্রার্থনার ধন যিনি, পরম বন্ধু যিনি, তিনি তাহারই সহযাত্রী :—

নিমেষে বুঝিনু বন্ধু আমার র'য়েছেন চিরসাথী
চিরজনমের প্রিয়তম মোর বন্ধু দিবসরাতি।

কিন্তু এই ক্ষণিকের পরিচয়েতো—তাঁহার সমগ্র স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। আলো যেমন তাহার স্বচ্ছতার দ্বারাই আপনার পরিচয়কে আবরিত করিয়া রাখে, জগতের রহস্যও যেন আপনার প্রকাশের লীলায়, প্রকাশের অতীত নিজের গহন-স্বরূপকে লুক্কায়িত রাখিয়াছে। আমরা শুধু আমাদের কল্পনায় নূতন নূতন ছবি আঁকিয়া নূতনভাবে তাহাকে উপলব্ধি করি, কিন্তু তিনি হিরন্ময় পাত্রের দ্বারা আপনাকে আবৃত রাখিয়াছেন।—

আমাদের যত শিশু কল্পনা
তাই নিয়ে মোরা আঁকি আল্পনা
তব রহস্যবিলীন দূরে।

*　　*　　*　　*

সোণার পাত্রে তোমার মহিমা
রাখিয়াছ ঢেকে নাহি তার সীমা
মগন আপনি নিজ রচনে।
তোমা নাহি পাই মনে বচনে॥

তবে সত্যকে সম্পূর্ণভাবে জানা না গেলেও তাহাকে দেখার বৈচিত্র্যে, তাহার নূতন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। যুগে যুগে মানুষের এই দৃষ্টির প্রকার বা ভঙ্গিমাতেই সেই অজানার নৃত্যচ্ছন্দের নবগুঞ্জরণ ধ্বনিত হয়, সুতরাং এই

নূতন করিয়া দেখার প্রয়াসেই অজানাকে লাভ করা যায়। কবির সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিতে এই রহস্য প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে কোন্ বিচিত্রস্বরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে তাহা কবিতাগুলির মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতিকে কবি কোনও মিথ্যা কাল্পনিক বা অবাস্তবরূপে দেখেন নাই—তাহা 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিতম্। অথচ প্রকৃতির সহজ লীলায়, শস্যে তৃণে-গুল্মে প্রাণধারার প্রবাহে, ঝড়ে ঝঞ্ঝায়, প্রবল বর্ষণের ভীষণতায়, শারদীয় জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতায়, বসন্তের মুঞ্জরিত বনশ্রীতে সর্ব্বত্র যেমন ভাব হইতে ভাবান্তরে, রূপ হইতে রূপান্তরে অবিরাম গতি সঞ্চারিত হয়, মানুষের মনেও সেই একই নিয়মে দুঃখ ও সুখের ভয়ের ও শান্তির বিভিন্ন আলোড়ন নিত্য চেতনাকে জাগ্রত রাখিয়াছে। প্রকৃতির জীবনের সহিত মানুষের জীবনের, বহির্লোকের সহিত অন্তর্লোকের এই একাত্মবোধই আমাদের পরম মুক্তি। ইহার বাহিরে আর কিছুই নাই।

এই দুঃখসুখময় জীবন মরণ
গতি নিরন্তর
ভাব হোতে ভাবান্তরে নিত্য বিহরণ
যেথায় অন্তর
আপন জাগ্রত ধর্ম্মে রবে সদা জাগি
প্রকৃতির সাথে
ঋতুর পর্য্যায়ক্রমে নেবে হর্ষ মাগি
বসি একপাতে।
* * * *
নিস্পন্দ নিস্তব্ধ মুক্তি যেথা থাকে থাক্
মিথ্যার প্রাচীরে
প্রভাতে সন্ধ্যায় রাত্রে তুমি দিয়ো ডাক্
অন্তরে বাহিরে।

প্রকৃতির সহিত এই যোগ আমাদের সমগ্র জীবনকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। শৈশবে ভোগের মধ্যে প্রকৃতিকে পাই, কিন্তু সেই মূঢ় ভোগের মধ্যে তাহার গভীর স্বরূপ আমাদের স্পর্শ করিতে পারে না। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্রতর রূপে তাহাকে দেখিয়া আনন্দ লাভ করি কিন্তু তখনও তাহার তাৎপর্য্যটি স্ফুট হইয়া ওঠে না।—কিন্তু যখন তাহার প্রেরণায় আমাদের চেতনা সম্যক উদ্বুদ্ধ হয়, তখনই বুঝিতে পারি আমার প্রাণ আমার চিত্ত প্রকৃতির লীলারই একটি অংশমাত্র ; আমার বাসনা, বিক্ষোভ, ভোগ, প্রেম ও ত্যাগ প্রকৃতির জীবনস্রোত হইতে উদ্ভূত। মূক মৌন বহি প্রকৃতির একটি প্রতিচ্ছবি আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়। তাই কবি বলেন প্রকৃতি অপেক্ষা অন্তরঙ্গ আর কিছু নাই।

তুমি মাতা তুমি ধাত্রী প্রিয়তমা তুমি বসুন্ধরা
কেহ নাই তোমা হতে মোর প্রিয়তরা।

* * * *

প্রাণের ঝরণা উঠেছে তোমার গর্ভের মাঝে ত্বলি
শ্যামল শষ্পে বৃক্ষে গুল্মে উঠিয়াছে ফুলফুলি
তারি মাঝে মোর কত জন্মের পেয়েছি পরশচিহ্ন
কোরক যেমন পাপড়ি ফুটায়ে আপনারে করে ছিন্ন।

তাহাকেই অবলম্বন করিয়া অসীম চেতনালোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে—

জড়ের আগুন গিয়াছে থামিয়া ফুটেছে অসীমলোক
চেতনা ফুটেছে উজ্জ্বল হ'য়ে মুছেছে দুঃখশোক
মুক্তামালায় রহিয়াছে বাঁধা ধবল যুগলশুক্তি
বন্ধনমাঝে অন্ধ হৃদয় পেয়েছে তাহার মুক্তি।

মানুষের সহিত মানুষের যে যোগ তাহা অপেক্ষা আরো নিবিড় আরো ঘনিষ্ঠ বন্ধনে প্রকৃতির সহিত আমরা জড়িত। তাহারই উপাদানে ক্রমশঃ মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে যুগযুগান্তরের সেই মিলন ধমনীতে শোণিত ধারার সহিত প্রবাহিত হয়

—মানুষের সাথে চিত্ত বাঁধা নিত্য আছে সেই তারে
অজস্র সুধার বৃষ্টি নিরন্তর ঝরে শতধারে
তার চেয়ে বহুদূরে গূঢ়তম কোন্ ধমনীতে
বহিছে তোমার স্রোত আজো তাহা পারিনি জানিতে।

সেই জন্যই প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে, বেণুবনের কলোচ্ছ্বাসে শৈবালবেষ্টিত দীঘির ঘাটে, ধানের ক্ষেতে, খেজুর গুয়াবনে কবির চিত্ত উচ্ছ্বাসিত হয়

—হৃদয় আমার মেতেছে আজ
বেণুবনের কালোচ্ছ্বাসে
আজকে আমি ফিরব ঘরে
কোন্ ভরসায় কি বিশ্বাসে।

তাই গহনরাতের তারালোকের সভা হইতে নীরব বাণী তরুলতার মৌনরাগিনী তাঁহার কর্ণে ঝঙ্কৃত হইতে থাকে—

তরু সভার মাঝে যত গান
সুরের ধারায় ভরে দেয় সে কাণ
আঁখি আমার করছে তাহে স্নান।

প্রকৃতি মানুষের বেশে মানুষকে মুগ্ধ করে না—তার স্বাভাবিক মূর্ত্তিতেই মানুষের সঙ্গে তার নিগূঢ় পরিচয়—

তরুলতা মাঝে অনাদি কালের রয়েছে যে পরিচয়
জনমে জনমে প্রতি অনুভবে সে নবীন রূপলয়।

মানুষের চিত্ত তাহারই উপাদানে ক্রমশঃ বিকশিত হইয়াছে, তাই সেই স্বল্প উপকরণ দিয়াই এই অসীম ও অনন্ত রহস্যকে যে আমরা জানিতে চেষ্টা করি, বিরাটের সম্মুখে তাহার তুচ্ছতা উপলব্ধি করিয়া গভীর দীনতায় ও সম্ভ্রমে কবি বলিতেছেন—

এ বিরাট্ মাঝে পরমাণুকণাসম
কেন এ হৃদয় ফুটিয়াছে অনুপম
তুচ্ছ কাচের ছায়া।
কেমনে ধরিব তাহাতে বিশ্বমায়া।
... .
অসীমে বাঁধিব লইয়া সীমার ডোর
তারি অভিমান শৈলসমান মোর।
অভয়বাণীতে তোমার শঙ্খ বাজে
আমি দীনহীন মরি অপমানে লাজে।

যে 'আমিত্ব' বোধের দ্বারা এই রহস্যকে জানিতে চেষ্টা করি সে 'আমি' এই রহস্যের বাহির ও অন্তর এই দুই অংশের মিলনরেখামাত্র আর কিছু নহে। বাহিরের রূপ যখন ইন্দ্রিয়ের পথে জ্ঞান বা অনুভূতির আকারে রূপান্তরিত হয়, তখনই এই 'আমি' বোধ উৎপন্ন হয়।

ভিতর ছোটে ভুবনপানে
মেলিয়া তার পাখা
... .
দুই ভুবনের দ্বন্দ্ব মাঝে
আমার সাথে দেখা
আমার সকল 'আমির' মাঝে
নামটি তব লেখা।

তাই প্রকৃতি, মানুষ ও অন্তর্যামী পরমদেবতা, ইহারা কেহই ভিন্ন নহে। যে নিয়মে প্রকৃতির লীলায় জীবের উদয় হয় তাহারই বিধানে জীবের চেতনার একটি বিশিষ্ট স্ফুরণে দেবতার আবির্ভাব হয়।—

দেবতা মোর এদের মাঝে
মনে হয় যে গুপ্ত আছে
রূপহারানো হৃদয়স্বামী
গভীর গহনরূপের পাছে।

যে অজ্ঞাত সীমাহীন রহস্যের সুরে বিশ্বসংসার নিত্য স্পন্দিত হয়, তাহারই একটি মূর্চ্ছনা মানুষের মনে তাহার অনন্ত প্রেমরূপে ঝঙ্কৃত হইয়া ওঠে। তাই অনাদি পুরুষ তাহার চির-আকাঙ্ক্ষিতার প্রেমের সুঘ্রাণে মুগ্ধ হইয়া ছুটে কিন্তু তাহাকে নিঃশেষে পায় না। চেতনার বিমুগ্ধ বলাকা অনাদি অনন্তকাল পক্ষবিস্তার করিয়া চলিলেও প্রেমের সেই মালাখানির ছায়ামাত্র পায়—কিন্তু তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।—

হে দেবি, তোমার মালা ছোঁয়া নাহি যায়
এ শুধু হৃদয়মাঝে আবেগের বেদনা জানায়
চেতনার বিমুগ্ধ বলাকা আপন অজ্ঞাতে ছুটে চলে
অনন্ত নীলিমামাঝে ডানা তার তুলি বারংবার
অস্ফুট অজ্ঞাত কোন্ মানসের সরোবরজলে।

তাই প্রিয়জনের স্নিগ্ধতায় প্রকৃতির মাধুর্য্য ও স্বর্গের পবিত্রতা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—

আজকে তুমি এনো শুধু ভোর বেলার ঐ হাসি,
ফুট্‌বে তাতে বনবীথির ঝরাফুলের রাশি
সেই জোয়ারে করব আমি স্নান
গঙ্গোত্তরী অভিষেকের পুণ্যভরা প্রাণ।

…………এবং তাহারই মধ্যে যেন অমরতার আভাস পাই

শুধু একটু শিশির সিক্ত বায়ু
এনেছিলে পাগল হয়ে বয়ে
তারালোকের আয়ু।

একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন ওঠে—প্রকৃতি আমাদের চেতনাকে যে রূপের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করে সেই রূপের উদ্ভব কোথা হইতে হয়? ইহার উত্তরে কবি বলেন যে শ্যামল বনবীথিকায়, প্রভাতে, সন্ধ্যায় আকাশের নব নব বর্ণোদ্ভাসে, নারীর কোমল সুষমায়, লাবণ্যে যে রূপের লীলা দেখি, সেই রূপ তাহার অন্তরালে যে সৃষ্টি শক্তি আছে তাহারই কিঞ্চিৎ প্রকাশ মাত্র। যে অন্তর্লীন শক্তির প্রেরণা প্রকৃতিকে বহুধা বিকশিত করিয়া তোলে তাহারই নির্ম্মল ও দীপ্ত শুচিতাই এই রূপের দ্বারা সূচিত হয়।—

সৃষ্টির পিছে আছে পবিত্র
শুভ্র নির্ম্মলতা
রূপ লিখে দেয় ঘোষণা তাহার
অমল উজ্জ্বলতা।

সেই সুন্দরের অনুভূতি কি করিয়া হয় ইহার উত্তরে কবি বলিতেছেন যে প্রকৃতির মধ্যে যে ছন্দ আছে, রেখা ও বর্ণের সামঞ্জস্য আছে জীবনের প্রথম হইতে তাহার সহিত আমাদের চেতনার একটি পরিচয় ঘটে। পরে যখনই কোনও কিছু সুন্দর দেখি তখনই সেই মূঢ় পরিচয় জাগ্রত হয় ও তাহাকে আত্মীয় করিয়া ও সুন্দর বলিয়া গ্রহণ করে এবং এই সহজ সামঞ্জস্যের মিলনে যে আনন্দ উদ্বুদ্ধ হয় তাহাই সৌন্দর্য্যবোধের আনন্দ।

জনমে জনমে যুগ যুগান্তে রয়েছে যে ইতিহাস
অন্তরে গাঁথা চিরপরিচয় তব
তাই হেরি তোমা প্রতিদিন অভিনব।

এই রূপের যখন প্রথম অনুভূতি হয় অথচ তাহাকে প্রকাশ করিতে পারি না—তাহার সুন্দর বিশ্লেষণ পাই। শব্দ, সুর ও অর্থ যেমন পরস্পর মিলিত থাকে, একটিকে ছাড়িয়া অপরটি অর্থহীন, বাহিরের রূপ, দেহের ধমনীতে রক্ত সঞ্চরণ ও চেতনা ইহাদের মধ্যেও তেমনই একটি একাত্মযোগ রহিয়াছে। যে রূপ ইন্দ্রিয়ের পথে আসিয়া চেতনাকে স্পর্শ করে তাহাই রক্তের তালে তালে মৃঢ়ভাবে স্পন্দিত হইতে থাকে। তাই রূপের আনন্দ এক অব্যক্ত বেদনায় চিত্তকে পূর্ণ করে যাহাকে প্রকাশ করা যায় না—অথচ তাহা চেতনাকে গুঞ্জরিত করিয়া তোলে।

হাহাকারে ধমনীতে
কাহারে খুঁজিতে চায়
নাহি আদি নাহি শেষ
শুধু যেন গান গায়

* * * *

শুধু বুকে মাঝে মাঝে
পায় নব শিহরণ
গভীর সুখের মাঝে
বেদনার বিহরণ।

প্রকৃতির নিকট হইতে শুধু যে আনন্দই পাই তাহা নহে ঋতুর বিভিন্ন পর্যায়ে ভীষণ ও মধুর একই সঙ্গে জড়িত থাকে ও আমাদের জীবনেও সেই নিয়মই নিত্যকাল ক্রীড়া করে। কত কোমল সুখ ও হর্ষ প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের কঠোর রুক্ষ মূর্ত্তি দেখা দেয়, তথাপি তাহাতে আমাদের ভয়ের কারণ নাই। যিনি ভীষণং ভীষণানাং তাঁহারই দানের অজস্রতায় জীবন পূর্ণ হয়—

ঋতুচক্রের বক্র গতিতে ঘুরেছি ধরার সাথে
রোদে জ্যোৎস্নায় কাঁটা ও ফুলের আশীস পেয়েছি মাথে।

* * * *

যে নিয়ম বলে এ ভুবন চলে তারি হোক্ মহাজয়
তারি পথ ধরি মাথা নত করি, নাহি ভয়, নাহি ভয়।

এই গভীর আশ্বাসে, শত বিঘ্ন বিপদের মধ্যে অপরিমেয় আশা উৎসাহের সুগভীর আনন্দ কবির চিত্তকে নিরন্তর উদ্দীপ্ত অভিষিক্ত করে। সকল ঝঞ্চার মধ্যে ভীষণতার মধ্যে তাই তিনি কৌতুক মিশ্রিত উৎসাহবোধ করেন—অনায়াসে লীলাচপল ক্রীড়ার আনন্দে ভয় বা দুঃখ কুজ্ঝটিকার মতই বিলীন হইয়া যায়—

অম্বর ভেদি উল্কা উঠিল জ্বলি
গ্রহ তারাদল নিমেষে পড়িছে স্খলি
ডম্বরু তব বাজাও
জটাবন্ধন সাজাও
বিশ্ব ভুবনে একেলা দাঁড়াও বলী।

তাই তিনি বলেন 'তেল না থাকে বজ্র দিয়ে প্রদীপ জ্বালো।' কোনও শঙ্কা নাই ভাবনা নাই—জীবনের দুর্গমপথে সকল বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া যে অনন্তের অভিযানে প্রকৃতির ও সংসারের গতি চলিয়াছে, সেই যাত্রায় অগ্রসর হও। ক্লিন্নতা থাকে গ্লানি থাকে দুঃখ নাই—সেই পঙ্কের আবরণ দীর্ণ করিয়া আপন শ্রেয়োবোধের অনুপ্রাণনায় পরম কল্যাণের ঐশ্বর্য্য সম্ভার লইয়া মানুষের চিত্ত ঊর্দ্ধে আকাশ লোকে স্পর্শ করিবে—

'মাটির পাঁকে যদি থাক নারে তোর মূল
সেখান থেকে আকাশ ফেড়ে উঠুক না তোর শূল—'

তাহাকে রুদ্ধ করিতে পারে এমন কিছু এ সংসারে নাই—

ঝর্ণা যখন ছুটতে থাকে বণ্ডয়ার টানে
সে কি তখন শিলানুড়ির বাঁধন মানে?

যে তেজস্বিতা ও বীর্য্যের প্রেরণায় সকল বিপদের মধ্যে অবিক্ষুব্ধ থাকিতে পারা যায়, সকল বিক্ষোভকে আপনার অজেয় শক্তিতে সংহত করা যায় তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া কবি বলেন—

তবু উন্নত রহ উন্নত রহ
উন্নত কর শির
শত শঙ্কাতে ডঙ্কা বাজাও
স্পর্দ্ধিত রহ বীর—
হও বন্দিত শুভ মন্ত্রিত দূরের যাত্রা পথে
অতি দুঃসহ তব দুর্জ্জয় নূতন স্বর্গরথে।—

দুঃখ ক্লেশ রূপান্তরে সুখেরই বৈভবমাত্র, কর্দ্দমের দান অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করে, বেদনায় অন্তরে নূতন ধূপ-শিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়া জীবনের সার্থকতা বহন করে।

দুঃখ ক্লেশ রূপান্তরে সুখের বৈভব
কর্দমের দান,
শীত স্নিগ্ধ জলধারে লভে নবরূপ
চিত্তের অমৃতে
জ্বালিবে নূতন ধূপ ব্যথা বেদনায়
অন্তরে নিভৃতে।—

যে আমি এতদিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় প্রকৃতির দানের প্রাচুর্য্যে সংসারের বিবিধ আবর্ত্তনে গড়িয়া ওঠে, পরিণামে তাহার কি হইবে এই প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। সকল কবিতার মধ্যে কবির যে দৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছে তাহারই সহিত সুসমঞ্জসভাবে তিনি ইহার উত্তর দিয়াছেন। মানুষ প্রকৃতিরই অংশমাত্র তাহার নিয়মে তরুলতাগুল্মের যে পরিণতি, মানুষেরও তাহাই তদতিরিক্ত কিছু নহে। সমস্ত জীবন ভরিয়া নিঃশেষে আপনার সুঘ্রাণ ও সৌন্দর্য্য বিতরণ করিয়া গন্ধরাজ, মল্লিকা, হেনা ঝরিয়া পড়ে তাহাদের স্থান আবার নূতন আসিয়া গ্রহণ করে। মানুষ ও জীবনের শেষে কার্য্য সমাপনান্তে তেমনই ঝরিয়া পড়িবে ইহাতে দুঃখ বৃথা—

আজকে এলো কাল কাটাবার দিন,
কতই গাছে ফুটছে কত ফুল
বাতাস ভরা সৌরভে আকুল,
তাদের কাছে দে না এখন সকল কাজের ভার।
গন্ধ যদি বিদায় তোদের নিল সাগর পার
তারে ফেলে রইবি কেন পিছে
পড়ে থেকে বেঁচে থাকা মিছে।—

ইহাই তো স্বাভাবিক নিয়ম—

প্রভাতে ফোটে যে কাননের ফুল ঝরে সে
সন্ধ্যাকালে
অনাদি কালের ফোটা আর ঝরা রয়েছে
মোদের ভালে।—

তবে এই ঝরিয়া পড়ার মধ্যে একটি গভীর বেদনা আছে তাহাকে কবি অস্বীকার করেন না। দীর্ঘকাল ধরিয়া দিনে দণ্ডে পলে নব নব প্রেরণায় বিচিত্র অনুভূতির শিহরণে যে জীবন পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়াছে, প্রভাতে বিহগকূজন যাহাকে অভিনন্দিত করিয়াছে, প্রকৃতির শোভা যাহাকে হর্ষে পুলকে স্পন্দিত করিয়াছে, কর্ম্মের বিবিধ স্রোতে যাহার নব নবরূপে আত্ম-পরিচয় ঘটিয়াছে—সেই জীবনের সন্ধ্যায়, রূপরসগন্ধময়ী প্রাণময়ী পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার সময়, আসন্ন বিচ্ছেদের ম্লানছায়ায়—সব যেন স্বপ্নসম মনে হয়—

সে সব কাহিনী এবে স্বপ্নসম ভাসে
সব যেন পলে পলে মিথ্যা হ'য়ে আসে।
আজ মোরে ক্ষমা কর, দেহ গো বিদায়
অন্তহীন অন্ধকারে এ নয়ন চায়।

যদি অবশেষ কিছু থাকে তাহা কেবল কোন স্নেহ সিক্ত হৃদয়ের স্মৃতিপটে।

তাই' ত কালের ভিজাক্ষেতে
মনে হয় পথে যেতে যেতে
ফেলে যাই হৃদয়ের বীজ ফাঁকে ফাঁকে।
জীবনজলের মোর রেখা
যবে আর নাহি যাবে দেখা
কোন হিয়া মাঝে যদি তারা বেঁচে থাকে।

কিন্তু তাহার বেশী কোনও লোকাতীত অস্তিত্বের কথা তিনি বলেন না। যাহা সত্য তাহাই তাঁহার আশ্রয় ও সান্ত্বনা। সমগ্র জীবনের কার্য্যে সৃষ্টিতে এই 'আমি' যতটুকু বিকশিত হইয়াছে—যদি তাহার দান মানবসমাজে অক্ষুন্ন থাকেতো আনন্দের কথা, কিন্তু তাহার আপন সার্থকতা তাহার চেতনার ক্ষণিক উল্লাসে সে

বিশ্বকে প্রতিবিম্বিত করিতে পারিয়াছে সেইটুকুতেই। এই আমি বা যাত্রী অনন্ত যাত্রা হইতে পৃথক নহে—সে তাহারই গতির একটি আবর্ত্তমাত্র।

মোর গতি আছে বিশ্বগতির সাথে
অনু-পরমাণু বৃক্ষলতার পাতে
এইখানে ঝরা এইখানে ফুটে ওঠা
নব নব প্রাণে প্রাণের বন্ধ টোটা।

সেজন্য কোনও ক্ষোভ নাই, ভাবনা নাই—

জীবনের শেষে কি যে রেখে যাব, এ ভাবনা করা মিছে,
কোথা যায় ঝরা ফুল?
কোথা ভাঙে নদীকূল?
সব আছে হেথা যুগলমিলনে এই আকাশের নীচে।

এই ফুটিয়া ওঠাই তাহার চরম লাভ—ইহার বাহিরে অন্যত্র অলৌকিক কাম্য কিছু নাই—

এইখানে আছে, এইখানে আছে, কহে বলাকার পাখা
মুক্ত আকাশে ভাসা
সকলের এক ভাষা!

রবীন্দ্রনাথের পত্রোত্তরে তাই তিনি আরও বলেন—

হে যন্ত্রী হও হারা
শুধু চেতনার ধারা
যন্ত্রীর হাতে শত জীবনেতে যুগে যুগে শুনি বাজে।
স্বর্ণতন্ত্রীতে নাহিরে নাহিরে ঠাঁই
যত খুঁজি শুধু ছন্দরাগিনী পাই
শত মানবের শত শত ধারাসাথে
কবির হৃদয় মিলিবে বর্ষাপাতে

সুরমা মিত্র

সম্পাদকীয়

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে দেশে যে ক্ষতি হলো কোনদিন তার পূরণ হবে কি না জানি না। উনিশ শতকের যে কজন মনীষী আজো আকাশস্পর্শী মহিমা বিকীরণ করছেন, তাঁদের মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথের স্থান অদ্বিতীয়। দর্শনে, বিজ্ঞানে, সমাজবিদ্যায়, তাঁর মত এতো ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান আর কারুর ছিলো বলে আমরা জানিনে। বিশেষতঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ জ্ঞানে তাঁর অধিকার নিরঙ্কুশ ছিলো। ছিলো বলেই তাঁর জীবনের মূল্য আজিকার কৃষ্টি-সঙ্কটের দিনে এতো বেশী। তাঁর "New Essays in Criticism" এবং "Positive Sciences of the ancient Hindus" নামক বই দুখানা চিরদিন পণ্ডিত সমাজের বিস্ময় উদ্রেক করবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই অমূল্য বই দুখানা আজ দুষ্প্রাপ্য এবং আধুনিক যুগের স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এর খবর পর্য্যন্ত জানে না। এ ছাড়া তাঁর অবদান নানা ক্ষেত্রকেই সমৃদ্ধ করেছে। "Positive background of Hindu sociology" নামক ক্রমিক বইগুলিতে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের দান কম নয়। এমন কি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রণীত "History of Hindu Chemisty" নামক বিখ্যাত বইখানায়ও আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের অবদান প্রচুর। তাঁর কবি-প্রতিভা যে বিচিত্র কাব্য-গ্রন্থকে সৃষ্টি করেছে তার নাম "The Quest Eternal"। এই বইখানা তাঁর দার্শনিক প্রতিভার আলোকপাতে মধুর-গভীর ওজস্বীতায় সমৃদ্ধ হয়েছে।

বহুবিধ ভাষা এবং বহুমুখী জ্ঞান তাঁর পাণ্ডিত্যকে সমুদ্রের মতন স্থৈর্য্য ও প্রশান্তি দান করেছিল। তাঁর অগাধ-সঞ্চারী প্রতিভা বৃথা কোলাহল ও চাঞ্চল্যকে চিরদিনই বর্জ্জন করে চলেছে। আজকালকার পল্লব-গ্রাহিতার দিনে তাঁর জীবনের মত অনাড়ম্বর, নীরব জীবন সহজে সাধারণ লোকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে না, একথা জানি। কিন্তু এযুগের যারা পাণ্ডিত্যের জহুরী তাঁরা জানতেন তাঁর জীবনের বহু-প্রসারী বিস্তৃতির খবর। আমাদের দেশে আজ বাইরে থেকে সহস্র ধারায় নতুন জীবন স্রোত এসে প্রবেশ করছে; প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় গভীর বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের মন নানা প্রশ্নে আন্দোলিত। এমন চিন্তা-সঙ্কটের সময়ে আজ এমন বিচার-প্রবণ চিন্তানায়কের প্রয়োজন যিনি ভূতকাল ও বর্ত্তমান কালের সকল জ্ঞানবিজ্ঞানকে আপন সংগঠনী প্রতিভায় গ্রথিত ক'রে ভাবীকালের উদার আদর্শকে সমাজের সম্মুখে ধরবেন। বর্ত্তমান কালে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের মধ্যেই সেই প্রতিভা দেখা গিয়েছিল এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিরা

আশা করেছিলেন যে ব্রজেন্দ্রনাথের এই সুগভীর প্রতিভার মধ্য থেকেই জন্ম নেবে ভাবী ভারতবর্ষের যুগানুযায়ী সমাজদর্শন। ব্রজেন্দ্রনাথের জীবনের পরিসমাপ্তিতে সেই আশা নির্ম্মূল হোলো। ব্রজেন্দ্রনাথের প্রতিভার কাছে যার যা-ই আশা থাকুক, আমরা একথা উল্লেখ না করে পারছিনে যে প্রতিভার যোগ্য কোনো স্থায়ী ও বিশাল সৃষ্টি ব্রজেন্দ্রনাথ রেখে জাননি। মাত্র টুক্‌রো টুক্‌রো কয়েকখানা লেখা তাঁর বিপুল প্রতিভার ছাপকে বহন করে বেঁচে থাক্‌বে; তাঁর স্মৃতির এই এই সংকীর্ণ নিদর্শন এবং তাঁর প্রতিভার এই সামান্য পরিচয় আমাদের চিরকালের অতৃপ্তির কারণ হয়ে রইলো। বহুলোক শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন যে প্লেটো, অ্যারিষ্টটল্, ব্যাস যে শ্রেণীর মণীষার অধিকারী ছিলেন, আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথও সেই শ্রেণীর বিশাল পাণ্ডিত্য ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু কি তত্ত্ববিদ্যার ক্ষেত্রে, কি সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে, তিনি বর্ত্তমান যুগের উপযোগী কোনো সুসম্বদ্ধ চিন্তাসংঘাত (system) গড়ে তোলেন নি। তাঁর স্মৃতি-শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে এই নৈরাশ্যকর বেদনাকেও জাগাবে।

ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন এককালে হেগেল-ভক্ত, কিন্তু পরবর্ত্তি কালে তিনি হেগেলীয় দর্শনের সংস্কার ও সংশোধনের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। তাঁর "New Essays in criticism" এর ভূমিকায় তিনি অসঙ্কোচে হেগেলের কাষ্ঠ-কঠিন ডায়ালেকটীক ফর্ম্মূলার গোঁড়ামীকে সমালোচনা করেছেন। হেগেলীয় "অভাব" বা negationর ধারণা এবং ডায়ালেকটীক ক্রমবিকাশের (evolution) পরিকল্পনাকে তিনি একদেশদর্শী বলে অগ্রাহ্য করেছেন। সাংখ্য দর্শনও তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলো। আজকাল হেগেলীয় ডায়ালেকটীক নীতি আবার বহুলোকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছে। ব্রজেন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ও সুসম্বদ্ধ আলোচনা করলে জিজ্ঞাসুরা উপকৃত হতেন সন্দেহ নেই। কিন্তু যা হয়নি তা' নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। আজকে ব্রজেন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করতে গিয়ে শুধু এই কথাই মনে হয় যে জাতীয় জীবনে তাঁর অভাব অপূরণীয় শূন্যের সৃজন করেছে, তাঁর সরল মধুর বাক্য, তাঁর গম্ভীর চরিত্র এবং নিরভিমান জীবন চিরকাল বিদ্বৎজনের আদর্শ হয়ে থাক্‌বে। দেশ বিদেশে সর্ব্বত্র তাঁর গুণমুগ্ধ পণ্ডিতেরা আজ তাঁর স্মৃতিতে শোকাচ্ছন্ন হয়েছেন। আমরাও আজ তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশবাসীকে অনুরোধ করছি যেন তারা এই মনীষীর যোগ্য স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই সঙ্গে একথাও উল্লেখ করা দরকার যে ব্রজেন্দ্রনাথের সমস্ত প্রবন্ধ, বই, ইত্যাদি একত্র ক'রে একটা ভালো সংস্করণ বের করলে ব্রজেন্দ্রনাথের স্মৃতির যোগ্য সমাদর হোতো।

ফেডারেশনী মনোভাব

যতই দিন যাচ্ছে ততই আশঙ্কা হচ্চে যে ফেডারেশনের শিকল হয়তো নানা কৌশলে ভারতবর্ষের পায়ে পরিয়ে দেওয়া হবে। মন্ত্রীত্বগ্রহণ ক'রে যেমন আমাদের সংগ্রামশীলতা খর্ব্ব হয়ে পড়েছে, তেমনি নতুন শিকলে বাঁধা পড়লে আমাদের বিপ্লবী মনোভাব দীর্ঘদিনের জন্য

বিলীন হয়ে যাবে। আটটা প্রদেশে আজ ক্ষমতার মোহ আমাদের সাম্‌নে মরীচিকার সৃষ্টি করেছে। অপরের উপর শক্তি প্রয়োগ করবার এবং প্রভুত্ব করবার একটা মনোহরণী মাদকতা আছে। এমন কি সত্যিকার শক্তি না থাকলেও, প্রভুত্বের অভিনয়েও আনন্দ আছে। একবার সেই মাধুর্য্যের আস্বাদ পেলে মানুষ সহজে এর মত্ততা ও মূঢ়তাকে ছিঁড়ে ফেলে বিপ্লবসাধনার কণ্টকিত পথে নেবে দাঁড়াবার ভরসা পায় না। অথচ আমাদের কংগ্রেসী বিপ্লবীদের সেই মূঢ় অবস্থাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন ফৌজদারী আইনের বাছা বাছা অস্ত্রগুলোকে দেশের স্বাধীনতা-কামীদের উপরে প্রয়োগ করতে আর দ্বিধা হয় না; মজুরদের উপরে গুলি চালাবারও কোনো সঙ্কোচ নেই। নিয়মতান্ত্রিকতার পাকা সড়ক দিয়ে আমরা চলেছি নিশ্চিন্ত শান্তির দিকে। কণ্টক-দীর্ণ বন্ধুর পথ যে নিদারুণ বিপ্লব ও নির্ম্মম অশান্তির দিকে গিয়েছে সে দিকে কে যাবে?

বাংলাদেশেরও অবস্থা আজ এই একই ইঙ্গিত করছে। সেই স্বদেশী যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত বাংলা বিপ্লবকে আবাহন করবার সাধনাই করেছে। সেদিন পর্য্যন্ত বাংলার জেলায় জেলায় চরম পন্থার রক্ত নিশান উড়েছে। পতনে অভ্যুদয়ে বন্ধুর যে পথ সেই পথে কবে বিপ্লবের শুভোদয় হবে. সেই প্রতীক্ষায় আজো বাংলার যৌবন শক্তি অনিমেষ চোখে রাত্রি জাগ্‌ছে। অথচ চারদিকের আবহাওয়ায় বিপ্লবাভিমুখী মনোবৃত্তির কোনো চিহ্নও নেই; আছে কেবল সংগঠনের নামে সংকীর্ণ ক্ষেত্রে শান্তি মূলক কর্ম্ম প্রয়াস, এবং স্থিতিশীল মনোভাবের অক্ষম ও দুর্ব্বল পরিচয়। বাংলায় কোয়ালিশানী মন্ত্রী সভা গঠিত হবার কানাকানি শোনা যাচ্ছে। রাষ্ট্রপতির বাক্যে ও ঘোষণায় এর আসন্ন সম্ভাবনাও সূচিত হচ্চে। কিন্তু আমাদের মনে আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে. এবং সন্দেহ হচ্চে, এই কোয়ালেশানী মন্ত্রীত্ব গ্রহণে বিপ্লবাত্মক সাধনা ব্যর্থ হবে এবং নিয়মতান্ত্রিকতার মধুর শৃঙ্খলকে আমরা সানন্দে গলায় পরব। একে তো বাংলাদেশে গণআন্দোলন গড়ে ওঠেনি। তাতে যদি আবার কংগ্রেসী মন্ত্রী সভার মিথ্যা ক্ষমতার মোহ ফাঁস হয়ে আমাদের গলায় জড়িয়ে যায়, তবে বাংলাদেশের অবস্থা আরো শোচনীয় হোয়ে দাঁড়াবে। চারদিকে নিয়মতান্ত্রিকতার জয়জয়কার পড়লে কোথায় থাক্‌বে বিপ্লবী মনোভাব? ফেডারেশানকে সজোরে বর্জ্জন করবার মতন সংগ্রাম-প্রবণ, বলিষ্ঠ মনোভাব নিয়মতান্ত্রিকতার ক্ষীণ আবহাওয়ায় জন্মাতে পারে না, এ কথা ইতিহাস-পাঠক মাত্রই জানেন। ফেডারেশনী মনোভাবকে প্রতিরোধ করবার সংহত প্রয়াস যদি এখন থেকে না করা হয়. তবে বিপ্লবী মনোবৃত্তি ও কর্ম্মপ্রণালী দীর্ঘকালের জন্য অন্তর্হিত হবে এদেশ থেকে। যারা বিপ্লবকে ভয় পান, তারা ধীরে ধীরে নিয়মতান্ত্রিক কার্য্য-পথে কংগ্রেসকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। তারা দেশে ফেডারেশানী মনোভাবকে সৃজন করবার ষোলআনা আয়োজনই পূর্ণ করেছেন; কারণ ফেডারেশানী পাঁকে একবার পড়লে আর সহজে উদ্ধারের উপায় নেই, একথা তাঁরা জানেন। যারা ফেডারেশানের বিরোধী বলে নিজেদের ঘোষণা করেছেন তাদের অবহিত হবার সময় এসেছে। মৌখিক বিরোধিতার পরিবর্ত্তে অতি সত্বর কার্য্যকরী পন্থা

অবলম্বন করে সঙ্ঘবদ্ধ হবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছে। যারা বিপ্লবী তাঁদের দৃষ্টি আমরা এই অতি গুরুতর বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করছি।

আউন্ধ রাজ্যের সুমতি

দক্ষিণ দেশে আউন্ধ রাজ্য বিদ্বজ্জন মহলে অতি পরিচিত। দান ধ্যান এবং সংকর্ম্ম নিষ্ঠায় এর শাসকের সুনাম বহুদিন হতেই আছে। কিছুদিন আগে আউন্ধের রাজা ঘোষণা করেছেন যে আউন্ধ রাজ্যে স্বায়ত্ব শাসনের ভিত্তিস্থাপন করা হবে। স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের পরিবর্ত্তে প্রজাদের শাসন-কর্ত্তৃত্ব বহুল পরিমাণে দেওয়া হবে। গ্রাম পঞ্চায়েৎ-প্রথার প্রবর্ত্তন করা হবে; পঞ্চায়েৎগুলির নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্টরা মিলে "তালুক সভা" গঠন করবেন এবং তালুক সভার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা "কেন্দ্রীয় পরিষদ" গঠিত হবে। এই নির্ব্বাচিত পরিষদের ভোট দ্বারা মন্ত্রীরা নিয়ন্ত্রিত হবেন। রাজ্যের অর্দ্ধেক রাজস্ব "তালুক সভা" ইচ্ছামত খরচ করতে পারবেন।

আউন্ধ রাজ্যের রাজা শ্রীমন্ত বালা সাহেব গত ৯ই ডিসেম্বর ওয়ার্দ্ধা নগরে উপরোক্ত শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তন করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন। এছাড়া ওয়ার্দ্ধা শিক্ষা পরিকল্পনার ভিত্তিতে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থারও প্রচলন করা হবে যাতে আউন্ধ রাজ্যে বেকার সমস্যা প্রবল না হতে পারে। শিক্ষা প্রচার ও কৃষ্টিগত ব্যাপারে আউন্ধ রাজ্যের রাজার উদার দাক্ষিণ্য ও বিদ্যোৎসাহ বিখ্যাত। কিন্তু প্রজা শক্তিকে সত্যিকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকার না দেওয়া পর্য্যন্ত কেবল শিল্পকলা ও শিক্ষার বিস্তারেই রাষ্ট্রীয় শক্তি গড়ে উঠে না। রাজা শ্রীমন্ত বালাসাহেব প্রজা কর্ত্তৃত্বের সূচনা করে শুভ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। আজ ভারতের সর্ব্বত্র দেশীয় রাজ্যে প্রজা জাগরণ আরম্ভ হয়েছে। জনসাধারণের জাগ্রত দাবীর কাছে সমস্ত রাজশক্তি একদিন আগত হবে। সেই অনিবার্য্য দিনকে দূরদৃষ্টিতে দেখে আউন্ধরাজ যুগানুরূপ কাজই করেছেন।

পাকস্তান

কিছুদিন আগে করাচী অধিবেশনে মুসলীম লীগ আবার 'পাকস্তান'এর পুরোণো কথাটা তুলেছিল। ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার বিষ যে রকম ছড়িয়েছে, তাতে নতুন কোরে 'পাকস্তানে'র ধান্ধা এক শ্রেণীর মুসলমান নর-নারীর মধ্যে যে জেগে উঠবে, তাতে সন্দেহ নেই। এরা স্বপ্ন দেখছেন যে 'হিন্দুস্তানে'র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 'পাকস্তান' নব ইসলাম রাজ্যের ধ্বজা উড়াবে। এ স্বপ্ন যে অতি পুরাতন 'Pan-Islamism'এর বিকৃত স্বপ্ন এবং বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে যে এ একেবারে অচল, এ কথাটা এঁরা বুঝেও বুঝতে চাচ্ছেন না। বুঝতে হলে স্বার্থ সিদ্ধির পথ রুদ্ধ হয়, সে কথা আমাদের জানা আছে। কিন্তু ইতিহাস এ যুগের আকাশে আগুনের আখরে যে কথা লিখে যাচ্ছে, সে কথাকে তাচ্ছিল্য না করবার মত বুদ্ধি চাতুর্য্য অন্ততঃ এঁদের আছে বলে আমরা মনে করেছিলাম।

বিংশ শতকের প্রথম দশকে সমস্ত এশিয়ায় 'Pan-Islamism' বা ইস্‌লামীয় সার্ব্ব-ভৌমিকতার হাওয়া উঠেছিল। সে হাওয়ার প্রভাবে এ দেশের মুসলমানকেও Pan-Islamism এর মোহ পেয়ে বসে। তখন তুর্কী, পারস্য, মিশর, আফগানিস্থানে নব জাগরণের ঢেউ উঠেছিল এবং সদ্য জাগ্রত মুসলমান কর্ম্মীরা তখন আত্মশ্রদ্ধায় বিভোর। আত্ম জাগরণের সেই প্রথম মুগ্ধাবস্থায় বিশ্ব মোসলেম ঐক্যের স্বপ্ন এদের চিত্তকে অভিভূত করেছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের সুকঠোর বাস্তব এই স্বপ্নকে নিষ্ঠুর আঘাত করেছে এবং অতি আধুনিক পারিপার্শ্বিকে এর বিন্দুমাত্র স্থান আজ নেই। তুর্কীর নেতৃবৃন্দ তাই ভারতের মুসলমান সমাজকে "বিশ্ব মোসলেম"এর স্বপ্ন না দেখে 'নিখিল ভারতে'র স্বপ্ন দেখ্‌তেই পরামর্শ দিয়ে এসেছেন। ভৌগলিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বার্থ ইত্যাদিকে উড়িয়ে দিয়ে কেবল মাত্র ধর্ম্মের ঐক্যের ওপরেই একটা আন্তর্জ্জাতিক ঐক্য গড়ে তুলবার ভ্রান্ত আদর্শ অত্যকার জগতে চলবে না, একথা ইস্‌লামীয় দেশের বিপ্লবীরা সবাই বুঝেছেন। কিন্তু তবু এদেশে 'মোসলেম লীগ' সেই বিলীয়মান স্বপ্নকেই আবার নতুন কোরে জাগিয়ে তুলতে চাচ্ছেন।

সিন্ধু, বেলুচিস্থান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, পাঞ্জাব এবং কাশ্মীর, এই পাঁচটী প্রদেশ নিয়ে একটা নতুন রাষ্ট্র হবে; এই রাষ্ট্রের নাম হবে "পাকস্তান"। প্রথমতঃ এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিবাসীদের পাঁচ ভাগের চারিভাগই মুসলমান এবং ধর্ম্ম, কৃষ্টি, ইতিহাস, রক্ত ও বংশে এরা হিন্দুস্থানের অন্যান্য অধিবাসীদের থেকে স্বতন্ত্র ও পৃথক। দ্বিতীয়তঃ হিন্দুরা যে সকল প্রদেশে সংখ্যায় অধিক, সেখানে মুসলমানদের ওপর অবিচার হয়ে থাকে। এই দুটো যুক্তি দেখিয়ে 'মোসলেম লীগ' 'পাকস্তান' নামক নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবার কথা বলে থাকেন।

এ সম্বন্ধে এইটুকু উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে যে এসব যুক্তি বারবার খণ্ডিত হয়েছে। পশ্চিম ভারতের কৃষ্টি আলাদা, এত বড়ো ভুল কথা কেবল অজ্ঞ লোকেরাই বল্‌তে পারেন। ভারতবর্ষের কোনো প্রদেশই কৃষ্টির বিশুদ্ধি দাবী করতে পারে না। নানা পথে নানা কৃষ্টি এসে এখানে মিশ্রিত হয়েছে, এবং বাইরের নানা বৈচিত্র্য থাকা সত্বেও বহু মিশ্রণের ফলে একটা কৃষ্টিগত ঐক্য ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই রয়েছে। কৃষ্টিগত প্রবল পার্থক্য পশ্চিমভারতীয়দের সঙ্গে অন্যান্যদের রয়েছে, এ কথা অবৈজ্ঞানিক ও অস্বীকার্য্য। তারপরে ধর্ম্মগত ভেদকে বড়ো করে যারা জাহীর করতে চান, তাঁরা ইস্‌লাম এবং অন্যান্য ধর্ম্মের মধ্যে যে গভীর ঐক্য রয়েছে তাকে ভুলে যান। বাজনা এবং এবম্বিধ খুটীনাটী যে কোন ধর্ম্মেরই গোড়ার কথা নয়, এরা যে একান্ত বাহ্য ও তুচ্ছ, এ কথা যাঁরা সকল ধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন তাঁরাই জানেন। বংশগত পার্থক্যের যুক্তি এতো ভিত্তিহীন যে এর জবাব দেওয়াই অনাবশ্যক। সকলেই জানে যে ভারতীয় মুসলমান ভারতেরই প্রাচীন বাসিন্দা এবং এঁদের বেশীর ভাগেরই পূর্ব্ব পুরুষ হিন্দু ছিলেন এবং ধর্ম্মান্তর দ্বারা মুসলমান হয়েছিলেন। ভারতীয়দের বংশগত ঐক্য সর্ব্বত্রই প্রমাণিত হয়েছে, হিন্দু ও মুসলমান, খৃষ্টান, কেউই বংশে ও রক্তে আলাদা নন। দ্বিতীয়তঃ হিন্দু প্রদেশে মুসলমানদের উপর অবিচার

হয়, একথা নিয়ে ইদানীন্তন অনেক আলোচনা হয়েছে এদেশে। এমন কি কংগ্রেস প্রদেশের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছিল, সেও যে ভিত্তিহীন, তা প্রমাণ হয়েছে।

আজ জাতীয় সংগ্রামের দিনে ঐক্য ও সংহতির জন্য দাবী উঠেছে চারদিকে। গোটা ভারতবর্ষ এক মন্ত্র ও এক পন্থা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, এই আশা জনমনকে আন্দোলিত করছে। এমন দিনে পরিত্যক্ত "বিশ্ব মোসলেম" আন্দোলনের খুঁদে সংস্করণ এই 'নিখিল ভারত মোসলেম' আন্দোলনকে আবার কৃত্রিম উপায়ে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা হচ্ছে। জাতির অগ্রগতিকে এ বাধা দিচ্ছে এবং সমস্ত ভবিষ্যৎকে এই "পাকস্তান" আন্দোলন ব্যহত করে দেবে। তবু সংস্কারমুক্ত ও বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি নিয়ে আজ তরুণ মুসলমান সমাজ ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে মাথা তুলছে, এ সত্যকেও অস্বীকার করতে পারছিনে। আমাদের আশা আছে মোস্‌লেম তরুণ সমাজ ভারতে গণ-আন্দোলনকে গড়ে তুলে এই পাকস্তান-মনোবৃত্তিকে প্রতিরোধ করবে।

গান্ধীজী ও য়ুরোপীয় রাজনীতি।

পৃথিবীতে আজ যুদ্ধ-ভীতি যেমন বেড়েছে, যুদ্ধের সম্ভাবনাও তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে। একদিকে মানুষ যুদ্ধের নাম শুনে বলছে "না, না, না"; অন্যদিকে কিসের সূক্ষ্ম আকর্ষণে তিলে তিলে এগিয়ে চলেছে অনিবার্য্য যুদ্ধের দিকে। যুদ্ধ মানুষ চায় না একথা ঠিক কিন্তু যুদ্ধ ছাড়া মানুষের চলেও না! অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত চলেনি। বিজ্ঞান মানুষের হাতে প্রবল অস্ত্র দিয়েছে। একে সংকার্য্যেও যেমন লাগানো চলে, তেমনি ব্যবহার করাও চলে চরম মারাত্মক উদ্দেশ্যে। আজকে বিজ্ঞান হয়ে দাড়িয়েছে মানুষের ভয়ের কারণ। কারণ মানুষকে মারবার কাজে একে নিয়োগ করা হয়েছে ব্যাপক ও সংঘবদ্ধভাবে। বিজ্ঞানকে তাই পণ্ডিতেরা আজ সন্দেহ করতে সুরু করেছেন। মানবজাতির চিত্তশুদ্ধি না হলে মানুষের কল্যাণ নেই। বিজ্ঞান দিয়েছে শক্তি এবং আরো দেবে ভবিষ্যতে। কিন্তু এই শক্তিকে ব্যবহার করছে যে মানুষ তার চিত্তে জমেছে তামসিক স্বার্থান্ধতা এবং উন্মাদ ভোগলিপ্সা। সভ্যতা আজ বিপন্ন। মানুষের বুদ্ধিও হয়েছে বিভ্রান্ত। শুভ বুদ্ধির উদয় না হলে সভ্যতা বাঁচবে না, ধ্বংসের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে। মানুষের শুভ বুদ্ধিকে জাগাবার জন্য আজ তাই পণ্ডিত মহলে সাড়া পড়েছে। মানুষের চিত্ত শুদ্ধির নানা পন্থা প্রচারিত হচ্ছে।

গান্ধীজী বিংশশতকে একটা অভিনব আবির্ভাব। মানবের চিত্তশুদ্ধির জন্য তিনি যে অহিংসা-মন্ত্র প্রচার করছেন তা' একেবারে নূতন নয়। স্বরূপে নূতন না হলেও' এ মন্ত্র প্রয়োগে একেবারে ষোল আনা নূতন। আন্তর্জ্জাতিক সমস্যাগুলির সমাধান তিনি করতে চান "active non-violence" বা সক্রিয় অহিংসার তপোবলে। বিশাল আকারে সঙ্ঘবদ্ধ, সক্রিয় অহিংসা অবলম্বন করলে জগতে যুদ্ধের প্রয়োজন থাকবে না। যুযুৎসুরা যদি পরস্পরের প্রতি এই

অস্ত্র প্রয়োগ করেন তবে বিনা রক্তপাতে জগতের সকল দ্বন্দ্বের সমাধান হয়ে যাবে। কিছু-দিন আগে তিনি চেক জাতিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন অসহযোগ নীতি অবলম্বন করতে। তাতে কেউ হেসেছিলেন, কেউবা দুঃখিত হয়েছিলেন। কিন্তু সমালোচনা করেছিলেন সবাই। আজ কিছুদিন আগে তিনি আবার ইহুদীদের পরামর্শ দিয়েছেন 'সক্রিয় অহিংসা'র সহায়ে জার্ম্মাণী ও প্যালেষ্টাইনে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করতে। তাঁর এই পরামর্শ জার্ম্মাণীতে তুমুল বিক্ষোভ তুলেছে। "Nachtsgaube" নামক জার্ম্মাণ কাগজে গান্ধীজীর ও ভারতীয়দের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে।

গত ৯ই ডিসেম্বরের "Statesman" (Delhi) কাগজে গান্ধীজী "Nachtsgaube"র উক্ত প্রবন্ধের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলিয়াছেন যে য়ুরোপীয় রাজনীতির বিস্তৃত খবর না রেখেও এটুকু বলা চলে যে জার্ম্মাণীতে ইহুদীদের উপরে অমানুষিক অত্যাচার হয়েছে। "The main facts about the atrocities are beyond dispute."। এ অত্যাচারের প্রতিবাদ রক্তপাত ও অস্ত্রশস্ত্রে হবে না। এর আসল প্রতিবাদ হবে জার্ম্মাণ জাতির অন্তঃকরণকে ভালো-বাসায় ও মৈত্রীতে দ্রব করে দেওয়া। গান্ধীজীর বিশ্বাস আছে দুঃখ সহ্য করার তপস্যায় বৈরীর হৃদয়কেও গলানো যায়। যাকে তিনি বলেছেন "the beauty of suffering without retaliation" তার মাহাত্ম্য অপরিসীম। তিনি বলেন, ইহুদীরা যদি 'সক্রিয় অহিংসার' সংগ্রাম চালাতে পারে, তবে জার্ম্মাণদের পাথরহৃদয়ও অভিভূত হবে, "I am as certain...that the stoniest German heart would melt."

বর্ত্তমান জগতে গান্ধীজীর নীতি আজো গ্রাহ্য হয়নি। আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিতে এ অহিংসা মন্ত্র এখনো অচল। আজো পশুশক্তি বা "Force"এর রাজত্ব চলেছে পূর্ব্ব পশ্চিমে সর্ব্বত্র। গান্ধীজীর নীতির ভবিষ্যৎ কি, আজো তা' অজ্ঞাত। কিন্তু একথা বলা যেতে পারে যে জগতে এক সময়ে যুদ্ধ-বিরতির দিনকে আসতেই হবে। অন্ততঃ মানব-সভ্যতার সাধনা হবে সেইদিনকে আনবার। মানুষের মধ্যে পশু-শক্তি যতদিন কাজ করবে, ততদিন গান্ধীজীর নীতি কার্য্যকর হবে না। কোনোদিন মানবসমাজ থেকে পশুশক্তির অন্তর্ধান হবে কিনা, জানিনে। সভ্যতার ইতিহাসের হিসাব নিলে দেখা যায় প্রতি যুগে ইতিহাসের বেশীরভাগ জুড়ে আছে যুদ্ধ বিগ্রহ: শান্তি ও মৈত্রীর যুগ পৃথিবীতে কোনোদিনই আসেনি। হোয়াইটহেড বলছেন সভ্যতার অগ্রগতি হচ্চে coercion থেকে persuation-এর দিকে। পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারে মানুষ যতো বলপ্রয়োগ ছেড়ে শান্ত যুক্তিমত্তার আশ্রয় নেবে ততো মানুষ সভ্য হবে। কিন্তু বিংশশতকের তৃতীয় দশকেও persuation বা যুক্তিমত্তার কোনো স্থানই নেই তথাকথিত সভ্যজাতিগুলোর মধ্যে। ব্যায়োনেট ও বন্দুকের একচ্ছত্র রাজত্ব রয়েছে মানুষের হৃদয়ে, মানুষ জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতীয় ক্ষেত্রে যাকিছু করছে, যাকিছু বলছে সবই উদ্যত সঙ্গীন ও কামানের ভয়ে। গান্ধীজী চাচ্ছেন মানুষকে সেই ভয় থেকে মুক্ত করে "সভ্যতা"র ঊর্দ্ধলোকে উত্তীর্ণ করে দিতে।

কিন্তু মানুষকে "সভ্য" করবার যে নীতি গান্ধীজী প্রচার করছেন তাকে তিনি সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বকালিক নীতি বলে গণ্য করেন। এখানে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। জগতের কোনো নীতিই সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বজনীন হতে পারে বলে বিশ্বাস হয় না। অবিমিশ্র কোনো কিছু পৃথিবীতে নেই। এমন যে শুভ্র ও শুদ্ধ সূর্য্যের আলো তাতেও রয়েছে সাতটা রঙের মিশাল। নিছক ভালো যেমন নেই, নিছক মন্দও তেমনি নেই। দেহ যতদিন মানুষের রয়েছে, দৈহিক শক্তির প্রয়োজনও ততদিন আছে। অন্নময় কোষকে পরিত্যাগ ক'রে নিরালম্ব প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ কোনটাই বেঁচে থাকতে পারে না। মানুষের জীবনের মানসিক বা আত্মিক স্তর যেমন আছে, তেমনি আছে একটা দৈহিক স্তর। এই স্তরে মানুষ পশুজীবনের সমধর্ম্মা।

কাজেই মানুষকে যতোদিন দেহকে বহন করে চলতে হবে, ততোদিন তাকে দৈহিক শক্তি বা পশুশক্তিকে (Brute Force) নিয়েও কারবার করতে হবে। মানুষের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সঙ্গে দৈহিকতারও (physicality) একটা মিশ্রন বরাবরই থেকে যাবে। অবিমিশ্র আধ্যাত্মিকতার পরিকল্পনা ইহজীবনে অবাস্তব। তবে দৈহিককে নিয়ন্ত্রিত করবে আত্মিক, মানুষের ভবিষ্যৎ সমাজে এ আদর্শ বাস্তব হতে পারে। অন্নময় কোষকে পরিচালনা করবে উর্দ্ধতর কোষগুলি, যেমন প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় ও আনন্দময় কোষ।

এই কারণে ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে কিনা সন্দেহ যেদিন পশুশক্তির কোনোই স্থান থাকবে না। Persuationএর সঙ্গে Coercionএরও প্রয়োজন চিরদিনই থাকবে মনে হয়। তবে বর্ত্তমান জগতের ব্যায়োনেট বন্দুকের যুক্তিহীন প্রভুত্ব লুপ্ত হবে নিঃসন্দেহ। মানুষ যতো অগ্রগত হবে, ততো তার সকল ব্যক্তিগত ও সমাজগত ব্যবস্থায় Persuationএর বাহুল্য ঘটবে, কিন্তু Coercion বা পশুশক্তির একটা খাদ মিশানো থাকবেই সর্ব্বত্র। সংসার হচ্ছে দ্বন্দ্বময়; ভালো ও মন্দ, good ও evil, সু ও কু,—এই দ্বৈতশক্তি জড়াজড়ি করে রয়েছে সমস্ত সত্ত্বার মধ্যে। কাজেই evilকে বাদ দিয়ে goodকে প্রতিষ্ঠা করবো, "কু"কে তাড়িয়ে দিয়ে কেবলি "সু"কে রাখবো, সংসারে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এ প্রস্তাব অযৌক্তিক।

গান্ধীজীর সঙ্গে এখানে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য রয়েছে। আমাদের মতে, মানুষের যতোদিন হুবহু পরিবর্ত্তন না হবে ততোদিন দৈহিক শক্তির স্থান সমাজে থাকবেই। অর্থাৎ coercion কিছুটা প্রয়োজন হবেই। যেমন প্রয়োজন থাকবে পুলিশ, পল্টন ও আইন আদালতের, জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতীয় উভয়ক্ষেত্রে। তবে coercionর অংশ সমাজ থেকে দিনে দিনে কমতে থাকবে সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে। দৈহিক শক্তিকে শাসন ও পরিচালন করবে আধ্যাত্মিক আদর্শ। গান্ধীজীর সঙ্গে আদর্শের দিক দিয়ে আমাদের কোনই পার্থক্য নেই, কারণ আমরাও চাই যুদ্ধবিরতি ও চাই coercion থেকে persuation এর দিকে সমাজকে উন্নীত করতে। তবে গান্ধীজীর পন্থা একটু আতিশয্য-দোষ-দুষ্ট। এই কারণে বর্ত্তমান জগতে গান্ধীজীর নীতি মহনীয় আদর্শ হলেও কার্য্যকর হতে পারবে না। যেদিন হবে সে দিন বহু সুদূর।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি-আন্দোলন।

গত অক্টোবর মাস থেকে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য আবার নূতন কোরে চেষ্টা সুরু হয়েছে। কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট দলের আমন্ত্রণে কলকাতায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ একত্র হয়ে বন্দীমুক্তির পন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। সেখানে স্থির হয় যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর মতামত এ সম্বন্ধে নেওয়া সমীচীন। অতঃপর বি, পি, সি, সি'র এক সভায় "নিখিল বঙ্গ রাজনৈতিক বন্দী-মুক্তি কমিটী" নামে একটী কমিটী গঠিত হয়েছে। এই কমিটীতে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলের ও মতবাদের প্রতিনিধিরা রয়েছেন। কমিটীর সভ্য-সংখ্যা ৪৭। এই কমিটীর ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে বাংলাদেশের সর্ব্বত্র একটা সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলবার। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ১২ই নভেম্বর সন্ধ্যায় এক জনসভায় এই আন্দোলনের সূত্রপাত করা হয়। ১৫ই নভেম্বর এই কমিটীর প্রথম অধিবেশনে সিদ্ধান্ত করা হয় বাংলার জেলা কংগ্রেস কমিটীগুলিকে প্রতিজেলায় একটা করে "জিলা বন্দীমুক্তি কমিটী" গঠন ক'রে আন্দোলন আরম্ভ করবার অনুরোধ করা হবে। অতঃপর বি, পি, সি, সি'র নির্দ্দেশ অনুসারে ২০শে নভেম্বর বাংলাদেশের সর্ব্বত্র "নিখিল বঙ্গ রাজনৈতিক বন্দী-দিবস" পালন করা হয়েছে। ঐ দিন বাংলাদেশের সর্ব্বত্র, শহরে ও গ্রামে, বন্দীদের মুক্তি দাবী ক'রে বহু সভাসমিতি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। বাংলার জনসাধারণের বন্দীমুক্তি সম্বন্ধে মনোভাব যে কী, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত ঘোষণা ঐ দিনের সভা সমিতিগুলি করেছে। গত ১লা ডিসেম্বর তারিখে "নিখিল বঙ্গ রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি কমিটী"র দ্বিতীয় মিটিং হয়েছে। এই মিটিংএ সর্ব্বত্র গ্রামে গ্রামে "প্রাইমারী বন্দীমুক্তি কমিটী" গঠন করবার এবং একদল প্রচারক প্রেরণ ক'রে আন্দোলনকে প্রবলতর করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে রাজনৈতিক বন্দীদের জীবনও কারাপ্রাচীরের অন্তরালে দিনে দিনে অধিকতর দুঃসহ হয়ে উঠেছে। জেলের নানা কঠোর ব্যবস্থা তাদের উপর কঠোরতর করে চাপানো হচ্চে; দৈনন্দিন জীবনে আত্মসম্মান বজায় রেখে মানুষের মতো সময় কাটাবার সুযোগ তাদের ক্রমশঃই কমে আসছে। নানাবিধ পীড়াজনক ব্যবস্থা বা অবস্থার বিরুদ্ধে তারা অসহিষ্ণু ও চঞ্চল হয়ে উঠছে। নভেম্বর মাসের প্রথমার্দ্ধে তারা তিনদিন ব্যাপী অনশন ধর্ম্মঘট করে জেল-কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ জানিয়েছে। আশা করা যায় তাদের সম্বন্ধে দেশবাসীরও যে কর্ত্তব্য রয়েছে সে সম্বন্ধে এই অনশনের ফলে দেশবাসীও সচেতন হবে। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রবল দাবী দেশের সকল দিক থেকে ওঠা চাই, তার জন্যে কমিটীকেও যেমন কর্ম্মতৎপর হোতে হবে, দেশবাসীকেও তেমনি কমিটীর সকল প্রচেষ্টাকে সহায়তা করতে হবে। আমাদের আশা আছে কমিটীর নেতৃত্বে এবার প্রবল আন্দোলন বাংলা দেশে উঠবে।

কংগ্রেসের নূতন সংগঠন।

কংগ্রেসকে গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার আদর্শ আজ সকলেই গ্রহণ করেছেন। গণ-সংগ্রাম ব্যতীত স্বাধীনতা লাভ হবে না এবং কংগ্রেস ব্যতীত ব্যাপক গণ-সংগ্রাম প্রবর্ত্তন করতে পারে এমন দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান ভারতে নেই, একথা সকল রকমের মতবাদীই স্বীকার করেন। এই নবকল্পিত আদর্শ অনুযায়ী রূপ কংগ্রেসকে দান করতে হলে গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসকে গণ-সাধারণের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এই গণ-সংযোগই হবে জাতীয় সংগ্রামের প্রাণ। এই গণ-সংযোগকে সত্যি সত্যি কার্য্যকর করবার জন্যই কংগ্রেসের নতুন গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাইমারী কংগ্রেস কমিটীগুলিই হবে সত্যিকার গণ-সংযোগের ভিত্তি। প্রাইমারী কমিটীগুলিকে জীবন্ত ও শক্তিমন্ত করে তুলতে পারলেই কংগ্রেস গণ-প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন সুখদুঃখ ও সংগ্রামের সঙ্গে কমিটীগুলির প্রাণের যোগ স্থাপন করতে হবে। তবেই কংগ্রেসের সঙ্গে দেশের নাড়ীর যোগ প্রতিষ্ঠিত হবে, কারণ সত্যিকার দেশ অবস্থান করছে গ্রামে, শহরে নয়।

এবার কংগ্রেসের নতুন সংগঠন অনুসারে সভ্যসংগ্রহ ও কংগ্রেসের প্রচার কার্য্য সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রত্যেক জেলাতেই সভ্য সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর থেকে অনেক বেড়েছে। কিন্তু সভ্য সংগ্রহ যেমন প্রয়োজনীয় কাজ, তেমনি প্রয়োজনীয় কাজ সভ্যদের সঙ্গে কংগ্রেসের আদর্শের স্থায়ী যোগ রক্ষা করা। এই কাজটী খুবই দুরূহ। গ্রামে কংগ্রেসের স্থায়ী সংগঠনমূলক কাজের ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা প্রাদেশিক কমিটী ও জেলা কমিটীগুলির অবিলম্বে করা দরকার। এ বিষয়ে কংগ্রেস-নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এ সম্পর্কে একটা কথা উল্লেখ করা দরকার। এক একটা ইউনিয়ান বোর্ডের এলাকায় এক একটা প্রাইমারী কংগ্রেস কমিটী স্থাপন করতে হবে বলে প্রাদেশিক কমিটী নির্দ্দেশ দিয়েছে। ইতিপূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে কমিটী করবার নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। সেই নীতি অনুসারে অনেক গ্রামে "গ্রাম কংগ্রেস কমিটি" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু বর্ত্তমান নীতি অনুসারে একটা ইউনিয়ানে মাত্র একটা প্রাইমারী কমিটী হতে পারবে। এবং যদি একাধিক গ্রামে একাধিক কমিটী একই ইউনিয়ানের অধীনে থেকে থাকে, তবে সবগুলোকে ভেঙ্গে একটামাত্র প্রাইমারী কমিটী সেই ইউনিয়ানে গঠন করতে হবে। এতে দুটো অসুবিধা হোতে পারে, প্রথমতঃ গ্রামে গ্রামে ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে. কারণ প্রত্যেক গ্রামই চাইবে তাদের গ্রামে "ইউনিয়ান কংগ্রেস প্রাইমারী কমিটী" রাখতে। দ্বিতীয়তঃ, একটা ইউনিয়ানের এলাকায় বহু গ্রাম অন্তর্ভুক্ত থাকায় সেখানে সাধারণ মিটিং করে সকল বিষয় মীমাংসা করা কার্য্যতঃ অসম্ভব হোয়ে দাঁড়াবে, কারণ সুদূর গ্রাম গ্রামান্তর থেকে সভ্যরা এসে মিলিত হয়ে পরামর্শ করবে এ আশা করা নিরর্থক। এসম্বন্ধে আমরা বি, পি, সি, সি,'র দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এ সম্বন্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

হায়দারাবাদে গণ-সংগ্রাম।

কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যের সংগ্রামে নেতৃত্ব গ্রহণ করবে না। এই নীতিকে আমরা কোনো দিনই সমর্থন করিনি। দেশীয় রাজ্যের জনসংঘ কংগ্রেসের সক্রিয় সহায়তায় বঞ্চিত হয়ে বাধ্য হোয়েই স্বতন্ত্রভাবে সংগ্রাম চালাতে আরম্ভ করেছে। সমস্ত দেশীয় রাজ্যে রাজন্যবর্গের জুলুম ও অবিচার দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। মানুষের সাধারণ নাগরিক অধিকার একটীও প্রজাদের আয়ত্তে নেই। রাজন্যবৃন্দ এবার শেষ চেষ্টায় আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন। উদীয়মান গণ-জাগরণের আসন্ন মূর্ত্তি দেখে তাঁদের আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি সজাগ হয়ে উঠেছে। তাঁরা তাঁদের অন্তিম সংগ্রাম সুরু করেছেন। হায়দারাবাদ শিক্ষায় ও সভ্যতায় অভিজাত রাজ্য। কিন্তু রাজ সরকারের সংকীর্ণ মনোভাব এখানে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তাতে সহজে যে সমস্যার মীমাংসা হবে তা মনে হয় না।

গত আগষ্ট মাসে এখানে 'হায়দারাবাদ ষ্টেট কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ ও আইন সঙ্গত উপায়ে স্বায়ত্বশাসন লাভ। যে কোনো ধর্ম্মের ও জাতির যে কোনো লোক এই "ষ্টেট কংগ্রেসে"র সভ্য হতে পারে। এই উদার আদর্শে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানটীও নিজাম সরকারের সহ্য হয়নি। নিরাপত্তা আইনের (Public Safety Regulation) সহায়তা নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে। দোহাই দেওয়া হয়েছে যে বাহ্য আদর্শ যা-ই থাকুক এ প্রতিষ্ঠান সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়েছে। মুসলীম লীগের একদল আবার এতে ইন্ধন যুগিয়ে বলছেন যে হায়দারাবাদ সরকারের পক্ষে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করা হউক।

এত বাধা সত্ত্বেও জনসাধারণ বা "ষ্টেট কংগ্রেস" পশ্চাৎপদ হয়নি। তারা স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ সুরু করেছেন এবং অনেক অত্যাচার সহ্য করেও অমিত উৎসাহে সংগ্রাম চালিয়েছেন। অগণিত লোক কারাগৃহে প্রেরিত হয়েছেন এবং দিনের পর দিন নিজাম সরকারের অত্যাচার বেড়েই যাচ্ছে। কোনো কোনো স্বার্থান্ধ দল সত্যাগ্রহের সমর্থকদের বিরুদ্ধে গুণ্ডা পর্য্যন্ত লাগিয়ে তাদের জব্দ করার চেষ্টায় আছেন। সাংবাদিক শ্রীযুক্ত নাইডু (C. S. Naidu) মহবুনগর গিয়েছিলেন সত্যাগ্রহ সম্পর্কে একটি ঘটনার তদন্ত করতে। তাঁর ওপরে আক্রমণ করবার চেষ্টা হয়েছে বারবার। গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা কতোদূর পর্য্যন্ত পৌছুতে পারে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ফিল্‌ম্ সংক্রান্ত ঘটনা থেকে। "ভক্ত তুকারাম" নামক ফিল্‌মে 'বন্দেমাতরম্' গানটী আছে বলে ওটী নিষিদ্ধ হয়েছে। "গৃহলক্ষ্মী" নামক ফিল্‌মে "গান্ধী কী জয়" ও "ভারত মাতা কী জয়" ইত্যাদি জয়ধ্বনি ও কংগ্রেসনেতাদের ছবি আছে এই কারণে এটীও নিষিদ্ধ হয়েছে। বন্দেমাতরম গানটী নিষিদ্ধ হয়েছে বলে প্রায় তিন হাজার ছাত্র স্কুলকলেজ বয়কট্ ক'রে বাইরে এসেছে। চারদিক থেকে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে হায়দারাবাদের সমগ্র জনসাধারণ সহনশীলতার শেষ সীমায় এসে পৌচেছে।

এই সঙ্কটপূর্ণ ক্ষণে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের কর্ত্তব্য হবে এই সত্যাগ্রহকে সকল রকমে সহায়তা করা। কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ কী করবেন, আমরা জানিনে। তবে একথা বলা চলে যে

হায়দারাবাদের এই সংগ্রাম সর্ব্বভারতীয় সংগ্রামেরই একটা অংশ এবং সেই দৃষ্টি নিয়েই এই সংগ্রামকে দেখ্‌তে হবে। আশা করি ভারতীয় কংগ্রেস এই স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে নিরপেক্ষ উদাসীনতায় দূরে থাকবে না।

আমাদের আশার সঞ্চার হয়েছে যে আর বেশী দিন কংগ্রেস এই দেশীয় রাজ্যের এই সংগ্রাম ও দুঃখময় জীবন থেকে দূরে থাক্‌তে পারবেনা। কারণ কিছুদিন থেকে দেখ্‌তে পাচ্ছি যে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল পর্য্যন্ত দেশীয় রাজ্যের দুঃখে বিচলিত হয়েছেন। সর্দ্দারজী গত ৬ই ডিসেম্বর (বোম্বের) এক সভায় বলেছেন: "This spontaneous demand for responsible Government had been met with severe repression in many cases. The Congress could not be expected to be an unconcerned spectator of the oppression going on in some of the states." কংগ্রেস রাজন্যবর্গের অত্যাচারকে মুখ বুজে সহ্য করবে না। এ ঘোষণায় আমরা আশ্বস্ত হয়েছি, সামন্ত-তন্ত্রের দিন শেষ হয়ে এসেছে। রাজন্যবর্গের শেষ দিনও আগতপ্রায়। এরা অন্তিম সীমায় দাঁড়িয়ে আজ শেষ আঘাত করছে জাগ্রত জনশক্তিকে। এ আঘাত গণজাগরণকে বিন্দুমাত্রও খর্ব্ব করতে পারবে না, একথা নিশ্চিত। কাজেই রাজন্যশক্তিকে আপ্যায়িত না করে তাদের অত্যাচারের প্রতিরোধ করলেই ইতিহাসের ইঙ্গিতানুযায়ী কাজ করা হবে। কাজেই সর্দ্দারজীর এই সবল ঘোষণায় দেশীয় রাজ্যের স্বাধীনতা সংগ্রাম শক্তিমান্ হবে। এদিকে রাজন্যবর্গের মধ্যেও 'সাজ সাজ' রব পড়েছে। তারাও দল বেঁধে স্বাধীনতার সংগ্রামকে নির্ম্মূল করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। বোম্বেতে সেদিন রাজন্যবৃন্দের সম্মেলনে জামসাহেব রাজন্যদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে পরামর্শ দিয়েছেন। কাথিয়াবাড়েও রাজন্যদের একটা "তালুকদার পরিষদ" (Kathiawar chamber of Talukdars) গঠন করবার জোর আয়োজন চলেছে; এর উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, শুধু নবজাগ্রত প্রজাবিদ্রোহকে দলন করা।

রাজন্যবর্গের এ প্রচেষ্টা খুব স্বাভাবিক। স্বার্থ ও ক্ষমতাকে সুরক্ষিত রাখবার জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে তাঁরা দ্বিধা করবেন না, একথা সবারই জানা আছে। জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে কংগ্রেসের সর্ব্বপ্রকার দ্বিধা বর্জ্জন করে এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিবৃন্দকে প্রতিরোধ করা কর্ত্তব্য। কংগ্রেস যে মুহূর্ত্তে এই সংগ্রামে অংশী হবে, সেই ক্ষণ থেকে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলন নতুন রূপে এবং নতুন শক্তিতে আত্ম প্রকাশ করবে।

আসামে কংগ্রেস-পন্থী-মন্ত্রীসভা।

কিছুদিন যাবং গোপীনাথ বারদোলাইর নেতৃত্বে আসাম মন্ত্রীসভা কাজ আরম্ভ করেছে। নূতন মন্ত্রীসভার দৃষ্টিভঙ্গী যে পূর্ব্ববর্ত্তী সাদুল্লা মন্ত্রীসভার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কতো পৃথক্, তা' ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। আদর্শহীন স্বার্থান্ধতার সঙ্গে আদর্শমূলক সংহতপ্রয়াসের যে পার্থক্য এই দুই মন্ত্রীসভার মধ্যে সেই পার্থক্য অতি স্পষ্ট। বারদোলাই মন্ত্রীসভা প্রথম থেকেই আদর্শানুরক্তির

পরিচয় দিয়েছেন। রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির জন্যে তারা সচেষ্ট ও সজাগ আছেন। তা'ছাড়া চাবাগানের অসহায় কুলীদের সুব্যবস্থা সম্বন্ধে এবং তার প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এঁরা তীব্রভাবে সচেতন। Assam Garden Labourers' Free Movement Billই এঁদের আন্তরিকতার পরিচয় এবং প্রমাণ। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল সমস্ত দল একত্র হয়ে এই মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, এদের কর্ত্তৃত্ব থেকে বিতাড়িত কর্ব্বার জন্য। এদেশে সমস্ত প্রগতির এরা শত্রু।

কিছুদিন থেকেই রটনা করা হচ্চে, সাদুল্লার নেতৃত্বে বিরোধী দল যে আয়োজন করেছে তাতে বারদোলোই-মন্ত্রীসভা অচিরে আসনচ্যুত হবে। আর সাদুল্লা ও ইউনাইটেড আসাম দলের নেতা আবদুল মতীনচৌধুরীর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। ইউরোপীয়ান দলের নেতা মিঃ হোকেনহুল। এরা বিশ্বাস করেছিলেন যে সংখ্যাধিক্য তাঁদের স্বপক্ষেই রয়েছে। গত ৮ই ডিসেম্বর সাড়ে চারটায় আসাম ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ মকবুল হুসেন বারদোলাই মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করেন। কিন্তু ৫৪-৭০ ভোটে বারদোলোই বিজয়ী হয়েছেন। সাদুল্লা-হোকেনহুল-মতীন ষড়যন্ত্র আদিতেই ব্যর্থ হোয়ে গেল এবং ফলে অন্যান্য অনাস্থা প্রস্তাব আনবার সাহস আর বিরোধীদলের হয়নি। সাদুল্লাদলের আশা চিরদিনের জন্য বিফল হয়েছে। আসামে জনশক্তির এই বিজয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের গণসংগ্রাম জয়যুক্ত হয়েছে। সাদুল্লা মন্ত্রীসভা বহুল বাক্‌বিস্তার সত্ত্বেও জনগণের সমর্থন পায়নি, তার কারণ স্বার্থবুদ্ধির সঙ্গে সেবাবুদ্ধির সঙ্গতি হোতে পারে না সাদুল্লা-মন্ত্রীসভা পরিচালিত হয়েছে স্বার্থবুদ্ধিদ্বারা। তাই জনসাধারণ আসামের সর্ব্বত্র সাদুল্লা মন্ত্রীসভার বিরোধী হয়ে তার পতন কামনা করেছে। সাদুল্লাদলের এই দুষ্ট মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে সিলেটের সাবরেজিষ্ট্রার ঘটিত মোকদ্দমায়। সাদুল্লা মন্ত্রীসভার মনোবৃত্তি হাইকোর্টের রায় থেকেই প্রমাণিত হয়েছে। এ কলঙ্ক যে কতো লজ্জাকর তা' হেণ্ডারসনের ভাষায়ই প্রকাশিত হয়েছে। "so serious as to amount to scandal'। কাজেই সাদুল্লা মন্ত্রী সভার পতন অনিবার্য্য হয়ে পড়েছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এখানে ইউরোপীয় দলের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। মিঃ হোকেনহুল যে জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন, বাংলা ছাড়া অন্য কোনো প্রদেশে ইউরোপীয়ন দল তেমন শোচনীয় পরিচয় দান করেন নি। ইউরোপীয়দল সর্ব্বত্রই বলেছেন, তাঁরা কোনো দল বিশেষের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন না, সর্ব্বদাই ন্যায়ের পক্ষে থাক্‌বেন। কিন্তু বাংলা দেশে, বিশেষ কোরে আসামে তারা এ নীতির অমর্য্যাদা করেছেন। তাঁরা আসামে প্রগতিবিরোধীদের সঙ্গে গভীর ও স্থায়ীযোগ স্থাপন ক'রে জাতীয় দলের শত্রুতা করেছেন। Hockenhull Circular নামক অধুনা কুখ্যাত কাগজপত্রগুলো এই শোচনীয় মনোভাবের লজ্জাকর স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাকবে চিরদিন।

আবার হিন্দু-মুসলীম চুক্তি।

এলাহাবাদে আবার নতুন কোরে হিন্দু-মুসলমান চুক্তির চেষ্টা চলেছে শুনে আমরা আশঙ্কিত হয়েছি। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে মুসলেমলীগের সভ্য নবাব ইসমাইলের দেখা-

জড়বাদ বলে, না মন নাই, চৈতন্য নাই। যাহা আছে, তাহা কতকগুলি স্থূল, জড়, cell মাত্র এবং চৈতন্য তাহাদেরই আনুষঙ্গিক প্রকাশ মাত্র। মন মস্তিষ্কের ছায়া, তাহার প্রতিক্রিয়ার আভা মাত্র। বাহিরের জগতের সহিত যখন সংস্পর্শ ঘটে, তখন মস্তিষ্কের কণিকাগুলিতে এক সূক্ষ্ম স্পন্দন সুরু হয়; এই মস্তিষ্ক কণিকার বিচিত্র নৃত্য হইতেই এক বিচিত্রতর প্রতিক্রিয়ার আলো চারিদিকে বিকীর্ণ হয় তাহাকেই আমরা বলি "চৈতন্য" বা "মন"। মস্তিষ্কের ক্রিয়াই মন, মস্তিষ্কের সৃজনই মন; এ আর কিছুই নয়, এ শুধুই epi-phenomenon; ১৯ শতকের বৈজ্ঞানিকের কাছে, "মন" তাই অতি সাধারণ ও একান্ত সহজ বস্তু বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু আজিকার বিজ্ঞান অন্য ভাষায় কথা সুরু করিয়াছে; Eddiington'র বিবৃতিতে পাই।

"I do not know if this view is still held to any extent in scientific circles, bnt I think it may be said, that it is entirely out of keeping with the recent changes of thought as to the Fundamental Principles of Physics. Its attractiveness belonged to a time when it was considered that the way to understand or explain a scientific phenomenon was to make a concrete mechanical model". (Science and the Unseen world).

সমস্যার গোড়ার দিকে আগান যাক্। "চিন্তা" মানুষের জীবনের একটা অকাট্য বস্তু, একটা নিঃসন্দেহ, অস্তিত্ব, indisputable fact. ইহার তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে কি পাওয়া যায়? Physics তাহার যন্ত্র-পাতি লইয়া আসিয়া অনুসন্ধান সুরু করিল। যাহা সে আবিষ্কার করিল তাহা কতগুলি atoms, electrons, fields of force—যাহা সব দেশে-কালে সাজানো আছে। অন্য যে কোন জড় বস্তুকে analyse করিলেও এই জিনিষগুলি এমনি পাওয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিক অন্যান্য physical characteristics গুলিকেও সন্ধান করিয়া বাহির করিয়া আনিতে পারিবে, যথা—energy, temperature ইত্যাদি। কিন্তু ইহার কোনটাই Thought নয়। Thoughtকে কোথাও পাওয়া যায় না। তবে? বৈজ্ঞানিক হয়তো বলিবে, Thought আর কিছুই নয়, illusion, মায়া।

কিন্তু কতকগুলি জড়, অসাড় atom একত্র হওয়া মাত্রই তাহারা চেতনাময়, চিন্তাশীল ও ভাবনা-পরায়ণ হইয়া দাঁড়ায় কী করিয়া ও কখন? Atomএর প্রকৃতি সম্বন্ধে যতটা জ্ঞান বিজ্ঞানের আছে, তাহাতে ইহা সম্ভবপর হয় না।

"How can this collection of ordinary atoms be a thinking machine? But what knowledge have we of the nature of atoms which renders it all incongruous that they should constitute a thinking object?"

ভিক্টোরীয়ান্ যুগের physicist atom, matter ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া আত্মতৃপ্তি বোধ করিত যে সব কিছু ব্যাখ্যা করা হইল; কিন্তু atom ইত্যাদির সঙ্গে consciousness,

beauty, humour ইত্যাদির যে বিপুল ব্যবধান ছিলো, তাহা আজো তেমনি বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে ; আজো এই নাম-রূপ-ময় দৃশ্য জগতের পিছনে সত্য স্বরূপটী যে কী, তাহা বিজ্ঞানের এলাকার বাহিরে।

"But now we realise that science has nothing to say as to the intrinsic nature of atoms". (Nature of the Physical world).

Physics এর সব কিছুর জ্ঞানই pointer-readingsএর অতীত কোন তত্ত্বকে ধরিতে পায় না। Atom নামে যাকে আখ্যাত করি তাহাও একটা schedule of pointer-readings বই আর কিছু নয়। আর এই scheduleএর পিছনে যে তত্ত্ব প্রসারিত হইয়া ইন্দ্রিয়াতীত সত্ত্বায় বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা স্থূল নয়, concrete নয়, জড় নয়। আমাদের চিন্তাজগতের সঙ্গে, চেতনাময় মনোলোকের সহিত তাহা সমধর্ম্মী, সদৃশ, এবং সম-তত্ত্ব। এক কথায় এই যে background তাহা spiritual, এবং তাহার বৃত্তি ও ধর্ম্মই চৈতন্য ও চিন্তাত্মকতা।

"The schedule is, we agree, attached to something of spiritual nature of which a prominent characteristic is "thought." (Nature of the Physical world, Ch XII.)

মানুষের brain এর কণিকা (atom) গুলির স্পন্দন বা নর্ত্তন সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চেতনার রাজ্যে অনুভূতি সাড়া দেয় কখন, কি রূপে ! এর আগেকার সমস্ত ব্যাপারগুলিই খুব স্পষ্ট। একটা টেবিল সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয় কেমনে আমরা জানি। Light-waves গুলি টেবিল হইতে চক্ষুতে বাহিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে রেটিনায় (retina) রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে এবং optic nervesএর ভিতর দিয়া যে ভাবেই হউক brain এর দিকে গতিপ্রবাহ চালিত হয়। ফলে মস্তিষ্কে atomic changes ঘটে। কিন্তু "Just where the final leap into consciousness occurs is not clear. We do not know the last stage of the message in the physical world before it became a sensation in consciousness." (Nature of the Physical World, Ch XII.)

এডিংটন আরো একটী প্রশ্ন উঠাইতেছেন। যদি আমরা স্বীকার করিয়া লই যে মনের প্রত্যেকটী চিন্তা মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ফল, প্রত্যেকটী চিন্তার পিছনে তাহা হইলে আছে এক একটী বিশেষ ধরণের atomic configuration. এক একটী চিন্তা এক এক রকমের configuration-এর ফল কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই এই সব configuration ঘটিয়া থাকে এবং atom গুলির ব্যবহার, ক্রিয়া, বা configuration সবই Natural law দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, মানুষের মনোজগতে ক্ষণে ক্ষণে যে অজস্র চিন্তারাশি উত্থিত হইতেছে, লীন হইতেছে, তাহারাও কোন্‌টার পরে কোন্‌টা, কি ক্রম অনুযায়ী উত্থিত ও লীন হইবে, তাহাও law of Nature দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায়, "৭ × ৯" এই চিন্তার পরে কাহারও মনে

"৬৩" এই চিন্তা না আসিয়া "৬৫" এই চিন্তা বা জ্ঞান উত্থিত হয়। ইহার কারণ কি? পূর্ব্বাপর সব processই প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী অব্যর্থ ক্রমানুসারে ঘটিয়াছে; তবে "৬৩" মনে না আসিয়া "৬৫" আসিল কেন?

"...then if natural law determines the way in which the configurations of atoms succeed one another, it will simultaneously determine the way in which thoughts succeed one another in the mind. Now the thought of 7 × 9 in a boy's mind is not seldom succeeded by the thought of "65". What has gone wrong? In the intervening moments of cogitation everything has proceeded by natural laws which are unbreakable." (Science and the Unseen World).

কোথাও কোনও একটা গণ্ডগোল ঘটিয়া গিয়াছে; কিন্তু কখন, কোথায়? Brain atom হইতে সর্ব্বশেষ jump যে কোথায়, কেমন করিয়া আসিয়া consciousness এ পৌঁছায়, সে তত্ত্ব বিজ্ঞানের তত্ত্বানুসন্ধানের বাহিরে। প্রাকৃতিক law'র গণ্ডীর ভিতরে এ বিচিত্র consciousness পদার্থটীর উৎপত্তি বা জন্ম-কাহিনী সম্পূর্ণরূপে পড়ে না। ইহার গোড়ার দিকটা প্রাকৃতিক আইনকানুনের এলাকার বাহিরে। আমরা যে symbol আবিষ্কার করি, তাহার পিছনে যে গূঢ় অগোচর জগৎ লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহার কোন নাগালই symbol গুলি পায় না।

"Natural law is not applicable to the unseen world behind symbols because it is unadapted to anything expect symbols and its perfection is a perfection of symbolic linkage. You cannot apply such a scheme to the parts of our personality which are not measureable by symbols any more than you can extract the square root of a sonnet. There is a kind of unity between the material and the spiritual worlds,—between symbols and their backgrounds but it is not the scheme of natural laws which will provide the cement." (Science and the Unseen World p. 33)

আমাদের জ্ঞান নিছক প্রতীক বই আর কিছু নয়। এই প্রতীকের (symbol) পশ্চাতে যে একটা background বা একটা unknown quantity রহিয়াছে, তাহা বিজ্ঞান আজ স্বচ্ছন্দে স্বীকার করে। এবং "It is to this background that our personality and consciousness belong" (Science and the Unseen World, p. 24); আমাদের যা কিছু আধ্যাত্মিক মননা, spiritual aspects, আমাদের যা কিছু গভীরতর ভাবনা, সে সব ঐ রাজ্যের —ঐ backgrondএর দেশের। সেই অব্যক্ত জগতে বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি পৌঁছায় না। "Phy-

sics most strongly insists that its methods do not penetrate behind symbolism." (Science and the Unseen World.—p. 23)

আমাদের সত্তার এমন একটা দিক্ আছে, যাহার বিস্তার ভিতরের দিকে :. ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ ও গণ্ডীর অতীতে যাহার স্থিতি।

"We recognise that other fibres of our being extend in directions away from sense impressions." (Nature of the Physical World. Ch XIII) এবং মানব-মনের ঐ সব অনুভূতিকে অনুসরণ করিয়া গেলে আমরা এমন একটা perspectiveএ আসিয়া উপস্থিত হইব, যেখানে,

"We see man not as a bundle of sensory impressions but conscious of purposes and responsibilites to which the external world is subordinate." (Nature of the Physical World Ch XIII).

মানুষ কেবল মাত্র কতকগুলি impressionsকে গ্রহণ ও বহন করিবার passive যন্ত্র নয়। মানুষ automaton নয়; হাজার লক্ষ sense-impressions এর পিছনে, মানুষের অন্তর্লোকে বাহিরের জগতের লক্ষকোটী বস্তু পলকে পলকে প্রবেশ করিয়া যে বিচিত্র তন্তুরাজি রচনা করিতেছে,— তাহাকে গাঁথিয়া গাঁথিয়া জাল বুনিয়া তুলিতেছে মানুষ,— যে মানুষ conscious, self-purposed, responsible; বাহিরের রূপ-রস ইত্যাদি তাহাকে যে sensationsএর নৈবেদ্য সাজায়, তাহা ছাড়াও মানুষের অন্তরে অন্তরে গভীরতর অনুভূতি, নিবিড়তর purposes and feelings নিয়ত উৎসারিত হইতেছে।

স্থূল জগতের পরপারে আছে এক সূক্ষ্ম জগৎ, "the absolute scheme underlying it," (Nature of the Physical World) "the back-ground of consciousness" (Ibid); আমাদের জীবনের গভীরতম আশা ও আকাঙ্ক্ষা, নিবিড়তম অনুভূতি ও উদ্দীপনা সব সেই গূঢ় জগতের বস্তু। Mystic অনুভূতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া Eddington বলিতেছেন,

"It cannot be said that the other part concerns us less than the physical entities. Feelings, purposes, values make up our consciousness as much as sense-impressions. We follow up the sense-impressions and find that they lead into an external world discussed by science; we follow up the other elements of our being and find that they lead—not into a world of space and time but surely somewhere. If you tell the view that the whole consciousness is reflected in the dance of electrous in the brain, and that each emotion is a separate figure of the dance, then all features of con-

sciousness alike lead into the external world. But I presume that you have followed me in rejecting this view and that you agree that consciousness as a whole is greater than those quasi-metrical aspect of it which are abstracted to compose the physical brain." (Nature of Physical World. Ch XV).

মানুষের ব্যক্তিত্বের আছে দুইটা দিক্, দুইটা ভাগ, দুইটা জগৎ। বাহিরের বস্তু বা "বিষয়" চিত্তে যে বিচিত্র ইন্দ্রিয়-অনুভূতির (sensations) মেলা মিলাইতেছে, তাহাদিগকে লইয়া তাহার একটী জগৎ। আবার ইহা ছাড়া রহিয়াছে আরো একটী জগৎ—যেখানে ভিতরের গুহাতল হইতে তাহার বিচিত্রতর অনুভূতির ফুলঝুরি অহরহ উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে। প্রথমটী মানুষের consciousness এর জগৎ—তাহার আর এক স্তর নীচে রহিয়াছে তাহার subconsciousএর জগৎ। সে আছে নিরালায় ঘুমাইয়া। সেখানে দিবালোকের প্রবেশ নাই। চেতনের নীচে যে অচেতন নিদ্রিত আছে, ইহা আজ ভালো করিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে বিশেষতঃ মনস্তত্ত্ববিদ্-দের মধ্যে। অবচেতন মানুষের conscious এরই আর এক পিঠ। একদিকে যাহা চেতন, অন্যদিকে তাহাই subconscious হইয়া লুকাইয়া রহিয়াছে।

কিন্তু এই চেতন, অবচেতনের ওপারে আরেকটা অতি সূক্ষ্ম, নিভৃত লোক আছে—যাহাকে বলা যায় superconscious—অরবিন্দের ভাষায়—supramental, বা পরা-চেতন স্তর : যেটী আরো গভীর, আরো সুদূর, আরো সূক্ষ্ম। সেই অতি সূক্ষ্ম, নিভৃত লোকে মানুষের সত্যিকার স্বরূপের আবাস।

যদি প্রথম জগতের, অর্থাৎ consciousnessএর জগতের, অনুভূতিগুলির পথ ধরিয়া চলা যায়, তবে দেখি তাহাদের সকল পথের সদর দরজার মুখ বাহিরের দিকে। Brainকে ধরিয়া nervous system ধরিয়া সে পথ আসিয়া পৌঁছিয়াছে—বাহিরের জগতে, কারণ 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু" ইত্যাদি। তারপরে অন্য অনুভূতিগুলিকে অনুসরণ করিলে দেখিব, তাহাদের মুখ অন্তরের দিকে—নিভৃতের দিকে। এই দুই জগতের এলাকা সম্পূর্ণ আলাদা ; একটী বুদ্ধির রাজ্য অন্যটী প্রজ্ঞার। একটীতে Scienceএর এক্তিয়ার—অপরটীর কারবার করে ধর্ম্ম, দর্শন। বিজ্ঞান এতদিন এই supramentalকে স্বীকার করে নাই—ব্যঙ্গ করিয়াছে। আজ আর সে standpoint নাই। যাকে বলে front change করা, বিজ্ঞান আজ তাহাই করিয়াছে। তাই বৈজ্ঞানিকের মুখে শুনি এমনতর কথা—

"Perhaps the most essential change is that we are no longer tempted to condemn the spiritual aspects of our nature as illusory because of their lack of concreteness." (Science and the Unseen World.-p. 21)

ধর্ম্মকে আজ আর হাসিয়া উড়াইবার উপায় নাই। ১৯ শতকের বিজ্ঞানের আত্মাভিমান নিঃশব্দে বিলীন হইয়া গিয়াছে; আজ বিংশ শতকের বৈজ্ঞানিক চিত্ত নতুন সুরে নতুন গান গাহিতেছে। সুদূর-প্রসারি যাদের চোখের দৃষ্টি. সুগভীর যাদের মানসিক অবলোকন তারা আজ জীবনের গভীরতর, অন্তরতর দিকটাকে তুচ্ছ বলিয়া সরাইয়া দিতে পারে না। William James একদিন বলিয়াছিলেন

"Religious melancholy is not disposed of by a simple flourish of the word insanity. The last things, the absolute things, the overlapping things are 'the truly philosophic concerns; all superior minds feel seriously about them, the mind with the shortest views is simply the mind of the more shallow man." (Pragmatism). বৈজ্ঞানিক Whiteheadও এই একই সুরে বলিতেছেন যে মানুষের আধ্যাত্মিক অনুভূতির দিকটাও জীবনে কম সত্য, কম নিত্য নয়। জীবনের এ এক গভীর, অমোঘ অনুভূতি, যাকে চক্ষু বুজিয়া এড়ানো মানে সত্যকে নির্ব্বাসনে দেওয়া।

"So far my point has been this: that religion is the expression of one type of fundamental experiences of mankind." (Science and the Modern World Ch XII).

আজকাল বিজ্ঞানের উপরে মানুষের আস্থা অগাধ। বিজ্ঞান যাহা বলে তাহাকে মানুষ সংশয় করিতে চায় না। এক কথায় মানুষ আজকাল science-minded; এবং সকলেরই ধারণা ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের যেখানেই বিরোধ সেখানেই বিজ্ঞানই অধিক বিশ্বাস্য, অধিক নির্ভরযোগ্য। কিন্তু একথা কি ঠিক? Whitehead তাই সাবধান করিতেছেন—

"All our ideas will be in wrong perspective if we think that this recurring perplexity was confined to contradictions between religion and science and that in these controversies religion was always wrong and that science was always right." (Science and the Modern World Ch XII).

ধর্ম্মের জগৎ স্বতন্ত্র জগৎ। সেখানে বিজ্ঞানের হস্তক্ষেপ করা encroachment বই আর কিছু নয়। আজ বৈজ্ঞানিকবুদ্ধি ধর্ম্মকে বিরুদ্ধ মনোভাব লইয়া আঘাত করিতে অস্বীকার করিতেছে। অপরিণত জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে এমন একদিন গিয়াছে যখন বিজ্ঞান ধর্ম্মকে শত্রু মনে করিত, বিরোধী মনে করিত, আজ বৈজ্ঞানিক সলজ্জ বিনয়ের সহিত স্বীকার করে"তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ"। সর্ব্বদা ধর্ম্ম ভুলপথের পথিক, আর বিজ্ঞান সত্যপথের দিশারী, একথা নহে নহে নহে। রোমাঁ রোলাঁ তাই দুঃখ করিয়া বলিতেছেন—

"The result is the futile spectacle of a systematic attempt to destroy religion on the part of men who do not perceive that they are attacking something which they do not understand."

কোথাকার জল কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা বোধ হয় কিছুটা বোঝা গিয়াছে! আজ সত্যি সত্যি কি বিজ্ঞানের এমন দিন আছে যে, Spencer সাহেবের মতন দরজা দেখাইয়া বলিবে, "এ সংসারে তোমার হুক্কা মিলিবে না, বাহিরে যাও"—? সেদিন যে বাসি হইয়া গিয়াছে, তাহা তো Eddington, Whitehead প্রমুখ বিজ্ঞান-রথীদের মুখেই শোনা গেলো। বিংশ শতকের বিজ্ঞান আজ ধর্ম্মকে মিত্র বলিয়া, অন্ততঃ প্রতিবেশী বলিয়া গ্রহণ করিতেছে না?

ধর্ম্ম আত্মার দৌর্ব্বল্য নয়। ধর্ম্ম জীবনের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি, ধর্ম্ম সমস্যার সঙ্গে লড়াই। ধর্ম্ম সৃষ্টির অতল রহস্য-সাগরে নিমজ্জন---মানুষের দুর্লভের আকাশে পাল তুলিয়া পাড়ি দেওয়া। Whitehead এর ভাষায়—

"The worship of God is not a rule of safety—it is an adventure of the spirit, a flight after the unattainable" (Science and the Modern World Ch XII)

জীবনের আশেপাশে, চারিদিকে আছে এমন একটা বিস্তৃতি, যাকে হাত দিয়া ধরা যায় না; অথচ সে আছে, এবং আমাদিগের সকল সত্তাকে উপর হইতে নীচে হইতে, ডাইনে হইতে বাঁয়ে হইতে জড়াইয়া, বেষ্টন করিয়া, ছড়াইয়া আছে সুদূরাৎ সুদূর পর্য্যন্ত। ধর্ম্ম সেই রহস্যময় unattainableকে আয়ত্ত করিবার প্রয়াস; তাহাকে জ্ঞানে, অনুভূতিতে বাঁধিবার সাধনা। জীবন আমাদের ঠাসা রহিয়াছে, ভর্ত্তি রহিয়াছে ঘটনার রাশিতে, বস্তুর স্তূপে এবং উপকরণের পুঞ্জে। কিন্তু এই বস্তুর স্তূপের অতীতে, এই factsএর অপর পারে রহিয়াছে যে সীমাহীন আভাময় লোক সেই জগতের ইঙ্গিত করে ধর্ম্ম। বস্তুর ওপারে আছে বস্তুর অতীত, দৃশ্যের অন্তরালে আছে দৃশ্যাতীত, এই তত্ত্ব জীবনে contribute করে ধর্ম্ম। Whitehead বলেন—

"That contribution is in the first place the recognition that our existence is more than a succession of bare facts." (Religion in the making).

জীবনের সব কিছুকে আয়ত্ত করিলেও এমন কিছু থাকিয়া যায় যাহা আয়ত্ত হয় নাই; সব facts জানিলেও, এমন কিছু অবশিষ্ট রহিয়া যায়, যাহা ধরা দেয় নাই; Whitehead এর ভাষায়,

"There is a quality of life which lies always beyond the mere fact of life." (Religion in the Making.)

জীবনের এই অনির্ব্বচনীয় পলাতককে ইসারায় গোচর করাইয়া দেয় ধর্ম্ম। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ধর্ম্ম হইল "Ceaseless adventure for the Endless Further", যাহা দেখি

যাহা শুনি, তাহাতেই মানুষের চরম নয়, মানুষের পরম নয়। এরও পরে আছে,—তারও পরে আছে এবং আরও পরে আছে। এই অফুরন্তের ধারণাই ধর্ম্ম, এই অন্তহীনের পিপাসাই ধর্ম্ম। রবীন্দ্রনাথের মতন করিয়া বলিতে হইলে, বলিব, এই "আরো", "আরো" এবং "আরোর" সাধনাই ধর্ম্ম।

এই আরোর সাধনাই মানুষকে বলায়—"কিমহং তেন কুর্য্যাম্" ইত্যাদি; এই আরোর সাধনাই মানুষকে বলায় "ভূমা"র কথা, বলায় "নাল্পে সুখমস্তি;" রবীন্দ্রনাথের বইতে আছে, তরুলতা অতি সহজেই তরুলতা, পশুপাখি অতি সহজেই পশুপাখি। কিন্তু মানুষ অতি দুঃখে তবে মানুষ।

এই আরোর সাধনা করিতে গিয়াই মানুষ দুঃখকে, বেদনাকে বরণ করিয়া লইল; বাজারে বাজারে মানুষ বেত্রাঘাত খাইল, মাথায় কাঁটার মুকুট পড়িয়া ক্রুশে বিদ্ধ হইল, অসপত্ন সাম্রাজ্য ছাড়িয়া, অপর্য্যাপ্ত ভোগ ছাড়িয়া বনে গেল, তপস্যা করিল—সে এই "আরোর" উপাসনায়, এই "Endless Further" এর সন্ধানে।

সেই জন্যেই তো এইখানে এত নিদারুণ দুঃখ এবং সে দুঃখের এমন অপরিসীম অবসান। সেই জন্যেই তো এইখানেই মৃত্যু এবং অমৃত সেই মৃত্যুর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া উৎসারিত হইতেছে।

এই নিদারুণ দুঃখ এবং এই নির্ম্মম মৃত্যুর মধ্য দিয়াই,—আমাদের এই দেশে বহু মানুষকে দেখিয়াছি—দুঃখের অপরিসীম অবসানকে লাভ করিতে। সেই সব "আরো"র উপাসক, চরমের সাধক মানুষদের কথা বলিতে গিয়াই Roamin Rolland বলিয়াছেন—

"It is my desire to bring the sound of the beating of that artery to the ears of fever-stricken Europe which has murdered sleep. I wish to wet its lips with the blood of Immortality."

রবীন্দ্রনাথও ইহাদের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"There is none who has the right to contradict this belief; for it is a matter of direct experience, and not of logic. It is widely known in India that there are individuals who have the power to attain temporarily the state of সমাধি the complete merging of the self in the Infinite, a state which is indescribable." (Religion of man).

ক্ষণিকের ওপারে আছে শাশ্বত; বর্ত্তমানকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে চিরকাল; এবং নিকটকে, দূরকে ছাইয়া রহিয়াছে অপরিসীম ব্যাপ্তি; সেই শাশ্বত, সেই চিরকালকে, সেই ব্যাপ্তিকে অন্তর্বোধের গোচর করে ধর্ম্ম। Whiteheadও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন,

"Religion is the vision of something which stands beyond, behind and within the passing flux of immediate things; something which is real and yet waiting to be realised: something which is remote possibility

and yet the greatest of present facts ; something that gives meaning to all that passes and yet eludes apprehension." (Science and the Modern World)

যুগে যুগে তাই মানুষ এই আরোর সাধনায় পাগল হইয়াছে,—দুঃখ সহিয়াছে—মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে। চরমকে ছুঁইতে গিয়া, পাইতে গিয়া, মানুষ রক্ত-মাংস-অস্থির বেড়াকে ডিঙ্গাইয়া ওপারে চলিয়া গিয়াছে,—অনেক দূরে, অনেক সুদূরে। মানুষের কঙ্কাল তাহাকে যতবার ভয় দেখাইয়াছে, ব্যঙ্গ করিয়াছে,—

'একদা পশুর যেথা শেষ,
সেথায় তোমারো অন্ত, ভেদ নাহি লেশ।
তোমাকে প্রাণের সুরা ফুরাইলে পরে,
ভাঙ্গা পাত্র পড়ে রবে অমনি ধূলায় অনাদরে ॥"

—ততবার মানুষ বলিয়াছে—সহস্র দুঃখের মাঝে, লক্ষ বেদনার মাঝে, মরিতে মরিতে, পুড়িতে পুড়িতে—মানুষ বলিয়াছে,

মৃত্যু করিনা বিশ্বাস
তব শূন্যতার উপহাস।
মোর নহে শুধু মাত্র প্রাণ
সর্ব্ব বিত্ত রিক্ত করি যার হয় যাত্রা অবসান।
... .
যে আমার সত্য পরিচয়
মাংসে তার পরিমাপ নয়।

ঋষি

কুমার শ্রীনিখিলেশরুদ্র নারায়ণ সিংহ

প্রভাতের সাথে--
আনো মহাকাল মন্দিরার ধ্বনি, হে বিদ্রোহী! ঘন তমসা-মাঝে
যে মিথ্যা ছলনারে বিশ্ব নিয়াছে সুচির সত্য মানি'
ভেঙ্গে দিক্ সেই ভুল আজি শাশ্বত তব বজ্র বাণী ॥

তোমার আপন বিশ্ব সৃষ্টিছাড়া এই সৃষ্টিমাঝে
গড়িয়া তুলিতে হবে। মিথ্যা ক্লান্তি, তুচ্ছ ত্রাস, লাজে
শেখেনি তোমার চিত্ত পিছু যেতে ভীরুর মতোন,—
বিদ্রোহীর রুদ্র সুর বাজে যেথা নিত্য সর্ব্বক্ষণ
নটরাজে না করি' ডর।

সে যে হায় পেয়েছে সন্ধান
ঘুচাতে ঐতিহ্যের কালি,---দুর্নীতির মহা মৃত্যুবাণ!

'বিশ্বব্যাপী বিমূঢ় বুভুক্ষা'—বিশ্বত্রাস শত বিভীষিকা,—
তারি মাঝে যাত্রা তব সর্ব্বযুগে হইয়াছে লিখা
অর্থপূর্ণ 'স্মৃতির কঙ্কালে'।

তোমার সকল পরিচয়
ঘনায়ে তুলেচে সেথা এক মহা আতঙ্ক বিস্ময়!

তোমার সহায় তুমি। প্রভাতের তুমি অগ্রদূত!
লৌহযন্ত্র নগ্ন নিষ্পেষণে বিবর্ণ অম্বরতলে প্রচণ্ড অদ্ভুত
প্রলয়ের ধূমকেতু—ভূমণ্ডলে আবির্ভাব তব
রচিতে নবীন বিশ্ব। বিলাইয়া মুক্তমৃত্যুর বৈভব
তিলে তিলে দণ্ডে দণ্ডে, মহাবিদ্রোহী হে দধীচি,
জাগাও জাগ্রত আশা মৃত্যুরে না ভাবি মিছামিছি ॥

জড়জগৎ ও মানুষ

অধ্যাপক---প্রমথনাথ সেনগুপ্ত

জানিনা কোন্ অতীতযুগে, বিশ্বের এক সুদূর প্রান্তে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে ধাক্কা লেগে একটা খণ্ড-প্রলয় ঘটেছিল। প্রলয়ের সেই প্রবল অভিঘাতে একটি নক্ষত্রের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল পুঞ্জ পুঞ্জ অগ্নিবাষ্পের মেঘ; সেই নক্ষত্রের আকর্ষণ ও বাষ্পপুঞ্জের প্রক্ষিপ্ত হওয়ার বেগ, এই দুই সম্মিলিত শক্তির সামঞ্জস্য করে নিয়ে জ্বলন্ত বাষ্পের টুক্‌রোগুলো ঘুরতে সুরু করলো তাদের জন্মদাতারই চারদিকে। এরাই আমাদের গ্রহের দল, তেজ ছড়িয়ে দিয়ে জমে গিয়ে আস্তে আস্তে বর্ত্তমান গ্রহের আকার পেয়েছে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন প্রায় দু'শো কোটি বছর আগে এরূপ দুর্ঘটনার এলাকায় গিয়ে ধরা দেয় আমাদের সূর্য্য; অপঘাতের ধাক্কা সামলাতে গিয়ে নিজের তহবিল থেকে কিছু সম্বল তাকে ত্যাগ করতে হয়েছিল। তার এই ত্যাগের দানেই আজ গ্রহমণ্ডলীর খ্যাতি।

সৃষ্টির সুরু থেকে বহুকোটি বছর ধরে চলেছে পৃথিবীর উপর তেজের তাণ্ডব লীলা। এসব আকস্মিক উৎপাতের প্রচণ্ড আঘাতে বিভিন্ন অজৈব উলট পালট ও ভাঙা গড়ায় পাহাড়, পর্ব্বত নদী, সমুদ্রের সৃষ্টি ও পরিবর্ত্তন চলছিলো। তারপর জানিনা কখন, কোথা থেকে, কেমন করে দেখা দিল প্রাণ ও মন! অতি ক্ষুদ্র এক জীবকোষকে বাহন করে জড়ের বিপরীতধর্ম্মী জিনিষ আপনার প্রাণমন ও সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবস্থা নিয়ে বিশেষ একটা যুগে এলো পৃথিবীতে। পরম বিস্ময়কর এই প্রাণের প্রথম যে চিহ্ন দেখা গেছে সে হচ্ছে একজাতের শ্যাওলা, য়ুরোপীয় ভাষায় তাকে বলে অ্যাল্‌গে (Algae)। পাথরের ভিতরে পাওয়া গেছে এর ছাপ; বহুযুগ ধরে দুই টুক্‌রো পাথরের চাপে বন্দী থাকায় এই শ্যাওলা পরিণত হয়েছে পাথরে, সর্ব্বপ্রথম প্রাণের স্বাক্ষর রয়ে গেছে পাথরের চাপে। তারপর যে সব জীবের চিহ্ন পাওয়া যায় তা পোকা ও মাছের, প্রায় ৪০।৫০ কোটি বছর আগে এরা এসেছিল পৃথিবীতে। তারপর আস্তে আস্তে জমেছে গাছপালা, অবশেষে দেখা দিয়েছে অদ্ভুত আকারের সব জন্তু।

সৃষ্টির আরম্ভে প্রচুর হাড় মাংসের অপব্যয় করে প্রকৃতি যেন শিক্ষানবিসের ভাবে কতগুলো অতিকায় অসমর্থ জীব গড়েছিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে তারা বেঁচে থাকতে পারলো না, লোপ পেল এদের জাত। প্রথম জীবসৃষ্টির এসব অসমর্থ জন্তু লোপ পাওয়ার পর প্রায় দশলক্ষ বছর আগে বনমানুষ জাতীয় এক স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব দেখা যায়। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে কালক্রমে দেহের পরিবর্ত্তন হ'তে হ'তে এরাই আস্তে আস্তে মানুষে এসে দাঁড়িয়েছে। সেকালে মানুষের স্বভাব অনেকটা বন্যজন্তুর মতোই ছিল, পশু শিকার করে তারা আহার জোগাতো, থাকতো পাহাড়ের গুহায়। সে প্রায় লক্ষ বছরের কথা, বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে

সঙ্গে মানুষ পেল কথা বলার শক্তি ; এই উপায়ে পরস্পরের সঙ্গে জানাজানি হওয়াতে তার সভ্যতার পত্তন হোলো, শ্রেষ্ঠ বলে প্রাণিজগতে মানুষ তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করলো। যে-বনে তারা থাকতো সেখানে কতোবার গাছে গাছে ঘর্ষণ লেগে আগুন জ্বলেছে, তার থেকে তারা শিখেছে আগুন জ্বালাবার উপায়। এই আগুনে সেই শক্তি যে-শক্তি সমস্ত সৃষ্টির মূলে। এই আগুন মানুষের উন্নতির কাজে কতো লেগেছে তার সীমা নেই। এই আগুনের আশ্চর্য্য রহস্য, তার দীপ্তি, তার ভীষণতা এবং উপকারিতা দেখে মানুষ আগুনের মধ্যেই দেবতার উজ্জ্বল শক্তির প্রকাশ কল্পনা করে তার পূজা করেছে।

এই বিরাট বিশ্বের বস্তুপিণ্ডের তুলনায় সূর্য্যের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে ; তারও কোটিভাগের চেয়ে ক্ষুদ্রতর একটি বস্তুকণা আমাদের পৃথিবী। কিন্তু এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জড়পিণ্ডকে আশ্রয় করে যে প্রাণের উৎস দেখা দিল, অদৃশ্য একটি জীবকোষের কণাকে বাহন করে, তাকে তো ক্ষুদ্র বলে উপেক্ষা করা চলেনা। রবীন্দ্রনাথ "বিশ্বপরিচয়ে" বলেছেন,—"কী মহিমার ইতিহাস সে এনেছিল কত গোপনে। যোজনা করবার, শোধন করবার, অতি জটিল কর্ম্মতন্ত্র উদ্ভাবন ও চালনা করার বুদ্ধি প্রচ্ছন্নভাবে তাদের মধ্যে কোথায় আছে, কেমন করে তাদের ভিতর দিয়ে নিজেকে সক্রিয় করছে, উত্তরোত্তর অভিজ্ঞতা জমিয়ে তুলছে, ভেবে তাঁর কিনারা পাওয়া যায় না।" এ যেন একটা মায়ার পর্দ্দা প্রকৃতি খাটিয়ে দিয়েছে আমাদের ভুলিয়ে রাখতে ; সাধারণ অনুভূতির কাছে তার অন্তরের খবর গোপন করাই যেন উদ্দেশ্য। কিন্তু পারলো না ; বোধের চেয়ে মানুষের বুদ্ধির দৌড় অনেক বেশি, তারই জোরে প্রকৃতির লুকোনো খবর সে আদায় করে নিলো। বুদ্ধির বলে সে অজ্ঞাতের রুদ্ধদ্বার ভেঙে প্রকৃতির রহস্যভাণ্ডারে প্রবেশের অধিকার লাভ করেছে ; জীবনযাত্রায় অদ্ভুত দ্রুত গতিতে মানুষ উঁচু থেকে উঁচু স্তরে উঠছে।

ইন্দ্রিয়বোধের নির্দ্দিষ্ট সীমা ও তার বিশেষ প্রকৃতি দিয়ে দেখা বিশ্বজগতের নিতান্ত সাধারণ পরিচয়ে মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারলো না ; অপূর্ব্ব বুদ্ধির কৌশলে বোধের সীমা বাড়িয়ে অতি প্রকাণ্ড বড়ো অতি প্রকাণ্ড ছোটদের খবর জানতে সে বেরিয়ে পড়লো। আবরণ যখন অনেকটা সরে গেল, অত্যন্ত আশ্চর্য্য রহস্যময় হয়ে দেখা দিল এই বিশ্বের পরিচয় ; বোধশক্তির ভিতর দিয়ে পাওয়া বিশ্বের যে মোটামুটি চেহারা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় তার আসলরূপ যে একেবারে স্বতন্ত্র হতে পারে এ ধারণা তখন থেকেই মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে উঠলো। অতিছোটদের মিলিয়ে নিয়েই অতিবড়োরা বড়ো হয়েছে, অদেখারাই দিয়েছে দৃশ্যমান জগতের রূপ ; তাই অদেখাদের দলের সন্ধানে চললো অভিযান। গোটাকয়েক মূলমসলার (elements) যোগাযোগে পদার্থজগতের এই অভিনব বৈচিত্র্য, মানুষের মনে এ ধারণাই অনেকদিন প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এদের ন্যূনতম সংখ্যা নির্দ্ধারিত হয়েছিল বিরানব্বইটিতে, কিন্তু দেখা গেল এই

বিরানব্বুই সংখ্যা নিয়ে কারবার করলে আর সহজের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকা চলেনা। পরীক্ষায় জানা গেল যে এই মূলমসলাগুলোও আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদৃশ্য অণুকণার সমষ্টি। এই অণুকে ভাগ করে আরো ছোট কণা পাওয়া গেছে, তাদের নাম দেওয়া হয়েছে পরমাণু, য়ুরোপীয় ভাষায় বলে অ্যাটম (atom)। এই অ্যাটমনামধারীরাই জগতে কিছুকাল খ্যাতি পেয়েছিল পদার্থের ক্ষুদ্রতম মূল অংশ বলে। কিন্তু মানুষের সম্মিলিত অভিঘাতের বেগ তারা সইতে পারলো না, অভ্যন্তরে অত্যন্ত সঙ্গোপনে রেখেছিলো যে বিদ্যুৎকণা দুর্দ্দমনীয় বৈজ্ঞানিক শক্তির কাছে হার মেনে উজাড় করে দিতে হোলো তাদের। স্বাতন্ত্র্যের গৌরব আর তারা রক্ষা করতে পারলে না, সূক্ষ্মতর ভাগ বেরিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিতে হোলো মৌলিক পদার্থের পর্য্যায় থেকে। এই বিদ্যুৎকণাদের নাম হোলো ইলেক্ট্রন (electron)। এরা নিগেটিভ্ বিদ্যুৎকণিকা। এদের বিপরীতধর্ম্মী বিদ্যুৎকণাও বেশিদিন বিজ্ঞানীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়িয়ে আত্মগোপন করতে পারলো না; তাদের নাম হোলো প্রোটোন (proton), তারা পজিটিভ্ বিদ্যুৎকণিকা। ইলেক্ট্রন অত্যন্ত হাল্‌কা, কিন্তু প্রোটোনের ওজন ইলেক্ট্রনের প্রায় দু'হাজার গুণ বেশি।

ওজনের গুরুত্বে প্রোটোন তার আসন প্রতিষ্ঠা করেছে অ্যাটমের কেন্দ্রে। সৌরজগতের মাঝখানে আছে সূর্য্য আর তার চারদিকে লাটিমের মতো পাক খেতে খেতে ঘুরছে গ্রহের দল: তেমনি প্রত্যেক পরমাণুর মাঝখানে আছে এক বা একাধিক প্রোটোন আর তাকে কেন্দ্র করে পাক খেতে খেতে অদ্ভুত দ্রুতবেগে ঘোরে ইলেক্ট্রনের দল। সাধারণ বোধের ভিতর দিয়ে যেসব পদার্থকে বিভিন্ন পদার্থ বলে জানি তাদের মূলে রয়েছে এসব বিদ্যুৎকণা। সোনা, রূপা, সীসে এদের মূলগত কোনো পার্থক্য নেই, শুধু প্রোটোন ইলেক্ট্রনের সংখ্যার কমি বেশি ও দূরত্ব নিয়ে কোনোটা সোনা, কোনটা বা সীসে। একথা ভাবলে সত্যি বিস্মিত হতে হয়, যে-বইটা এখন পড়ছি তাকে দেখছি বটে কঠিন ও স্থির, কিন্তু তার অসংখ্য মূল উপাদান কঠিনও নয় স্থিরও নয়, তারা বহু-কোটি বিদ্যুৎমণ্ডলীর সমষ্টি, ভিতরকার তেজে সর্ব্বদাই চঞ্চল। সৌরজগতে সূর্য্য থেকে গ্রহের দল যেমন কোটি কোটি মাইল দূরে রয়েছে, এই পরমাণু জগতেও আয়তনের অনুপাতে ইলেক্ট্রন প্রোটোনের দূরত্ব তার চেয়ে কম নয়, বেশির ভাগ স্থানই ফাঁকা পড়ে আছে। অথচ এই ফাঁকা অদৃশ্য পরমাণুর দলকে মিলিয়ে নিয়েই অতিবড়োরা বড়ো হয়ে আমাদের চোখে ধরা দিয়েছে। খুব ছোটদেখার চোখ আমাদের নয় তাই পরমাণু মহলের প্রোটোন ইলেক্ট্রনের ঘূর্ণীনাচ আমাদের অদেখাই রয়ে গেল: জড়জগতের ভিতরকার যে লুকোনো অনুতম জগৎ, বোধের শক্তি দিয়ে তাকে যাচাই করা গেলনা, বুদ্ধি দিয়েই তাকে স্পষ্ট ধারণা করতে হোলো।

এই সূক্ষ্মতম বিদ্যুৎকণাদের এমন সব অদ্ভুত আচরণ পরিলক্ষিত হয়েছে যার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। জড়জগতের ঘটনাবলীর পিছনে রয়েছে তার কারণ, এই কারণটাই যখন মানুষের কাছে অজানা থেকে যায় তখন তাকে স্বীকার করা কঠিন হয়ে ওঠে। তাই আজ অনেকেই বলছেন যে প্রকৃতির ভিতর রয়েছে একটা অবাধ স্বাধীনতা; হয়তো তাই ইলেক্ট্রন

আপন চলার পথ বেছে নেয়, রেডিয়মের সেই পরমাণুটিই ভেঙে পড়ে খেয়ালবশে যে ভাঙনের এলাকায় এসে ধরা দেয়। বিজ্ঞানী Einstein কিন্তু ইলেকট্রনের এই স্বাধীনতার কথা স্বীকার করেন না। তাঁর মতে, মানুষের কাছে হয়তো ইলেকট্রনের চলার পথ বা রেডিয়ম পরমাণুর বেঁচে থাকার কাল অজানা থাকতে পারে, কিন্তু এসব নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এমন সূক্ষ্মতর নিয়ম মেনে যার খোঁজ পাওয়া আজও সম্ভব হয়নি। বিশ্বজগতের অসীম জ্ঞানের অতি সামান্যই মানুষ আয়ত্ত করতে পেরেছে, তাই বোধের জগতের ভিতরে বিশেষ কোনো পার্থক্য চোখে পড়েনা। কিন্তু এই সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে যখনই মানুষ তার মনের মধ্যে প্রকৃতির একটা সুস্পষ্টরূপ গড়ে তুলবার চেষ্টা করে তখনই বাধে বিরোধ, একই পদার্থ তখন আলাদা রূপ ধরে প্রকাশ পায়; প্রকৃতির আসল চেহারার সঙ্গে হয়তো তার এই মনগড়া চেহারার কোনো মিল নেই। ক্ষুদ্রবুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে বলে তার আসল চেহারাটাই থেকে যায় অজ্ঞেয়।

অতিবড়োদের সম্বন্ধেও এই দেখার ভুল যে কী পর্য্যন্ত পৌঁছয় তারই একটু আভাষ দিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করবো। কোটি কোটি নক্ষত্র রয়েছে আকাশে; দিনের পর দিন দেখছি এরা স্থির হয়ে আছে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে স্থির বলে মনে হলেও পণ্ডিতদের অন্তর্ভেদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এদের গতি ধরা পড়ে গেছে; জানা গেছে এরা প্রত্যেকেই অগ্নিবাষ্পের এক একটা বৃহদায়তন পিণ্ড, এদের গতির বেগ বন্দুকের গুলীকেও হার মানায়। সৌরজগতের চেয়ে কল্পনাতীত দূরে আছে বলে এদের আকার ও গতি চোখে দেখতে পাইনে। কিন্তু দৃষ্টির ভুল এখানেই শেষ হয়নি; কোনো কোনো নক্ষত্রের ভিতর এমন অনেক খবর লুকোনো আছে যা শুনলেও বিশ্বাস করা কঠিন। দেখে যাদের একটিমাত্র আলোর বিন্দু বলে মনে হয় তাদের মধ্যে অনেকগুলি আছে যাদের সঙ্গে দুই বা ততোধিক নক্ষত্র মিলেছে। এদের বলবো জুড়ি-নক্ষত্র, য়ুরোপীয় ভাষায় বলে Binary System। আকাশে Castor বলে একটি নক্ষত্র আছে, চোখে দেখলে মনে হয়না এর কোনো সঙ্গী আছে: কিন্তু বিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে অর্থাৎ দূরবীন দিয়ে দেখলে এর জুড়িটি সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে; তারপর এও জানা গেছে যে এই দু'টি নক্ষত্রই আবার জুড়ি-নক্ষত্র। এই শেষ কথা নয়—এদের সংখ্যাবৃদ্ধি করেছে আরো একটি নক্ষত্র যার খবর মিলেছে খুব বড়ো দূরবীনের সাহায্যে। পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীনের তীক্ষ্ণচোখে আবার এরও একটি সঙ্গী আত্মগোপন করতে পারলো না। যাকে দেখি একটিমাত্র আলোর বিন্দু, তারই ভিতর আত্মগোপন করে আছে ছয়টি নক্ষত্র, সম্পূর্ণ আলাদা তাদের গতি ও চলার পথ, কিন্তু সবাই দলবদ্ধ হয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে এক অজ্ঞাত লক্ষ্যের দিকে।

বহুকোটি নক্ষত্র মিলে সৃষ্টি হয়েছে একটি নীহারিকা, যার নাম দেওয়া যেতে পারে নক্ষত্রজগৎ। চোখে এদের দেখা যায়না বল্লেই চলে, শুধু দুই একটি আবছা ধোঁয়ার মতো মনে হয়। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে বহু দূরে দূরে রয়েছে লক্ষ লক্ষ নীহারিকা; মানুষের দৃষ্টিকে এরা ফাঁকি দিলেও দূরবীনের সঙ্গে লাগানো ক্যামেরার প্লেটে রেখে গেছে নিজেদের ছাপ। এদের

দূরত্ব কল্পনা করতে গেলেও বুদ্ধি হার মানবে। এই নীহারিকার দলও আবার স্থির হয়ে নেই, এক অজানা লক্ষ্যের দিকে তাদের গতি। শুনলে চমক লাগে কোনো কোনো নীহারিকার বেগ সেকেণ্ডে ২৪।২৫ হাজার মাইল। এতো প্রকাণ্ড সব বাষ্পপিণ্ডের এই অসম্ভব দ্রুতগতি বিজ্ঞানীদের মনে সন্দেহের ছায়াপাত করেছে। পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীন তৈরি হলে এই জটিল সমস্যার হয়তো একটা মীমাংসা হতে পারে। কিন্তু নীহারিকার এই প্রচণ্ড গতি যদি সত্যি বলেই প্রমাণ হয়ে যায় তাহলে বিশ্বের বর্ত্তমান ধারণা আমাদের আমূল পরিবর্ত্তন করতে হবে। আকাশরূপী এই বিশ্বগোলককে তখন বলতে হবে সীমাহীন, আর পরস্পর আকর্ষণে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে একটা সাম্যস্থিতি আছে বলে যে ধারণা এতকাল চলে আসছে তা যাবে একেবারে নিরর্থক হয়ে। তখন ভাবতে হবে এই অনন্ত মহাশূন্যের অনির্দ্দিষ্ট পথে এরা সব পরস্পর সম্বন্ধবিহীন একক যাত্রী। মানুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে আত্মগোপন করে কোন্ লক্ষ্যে পৌঁছুতে এদের এই মহাদৌড়ের পাল্লা চলেছে তা কল্পনা করবো সে বুদ্ধি আমাদের কোথায়!

সঙ্ঘাত

প্রভাত দেব সরকার

বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটি রঙ্গমঞ্চ হিসাবে নেহাৎ ক্ষুদ্র নয়; এবং এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে প্রতিনিয়ত যে সকল খণ্ড-ক্ষুদ্র নাটিকার মহলা চলিতেছে, তাহাদের প্রযোজক বিধাতা পুরুষটিও বোধ করি, নিতান্ত অপটু বেরসিক নহেন। তাঁহার-ই চাতুর্য্যে এই বৃহদায়তন রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য-সজ্জা এবং নাট্যলিখিত চরিত্র-চিত্রণ কখন সহজ, কখন বা জটিল—খেই-হারান ক্ষুদ্র কুণ্ডলীবৎ। যাহা হইতে পারে বা পরিণতির পথে অগ্রসর, তাহারই মাঝপথে তিনি পদক্ষেপ করেন; আবার যে সকল নাটিকা পরস্পর বিরোধী, তাহারা তাঁহারই কূটকৌশলে মুখোমুখী হইয়া এক-ই কেন্দ্রীভূত হয়।...

তাহা না হইলে আমাদের ধনপতির সহিত বিখ্যাত রায় বংশের একমাত্র সন্তান শ্রীমান রমানাথের সাক্ষাৎ হইবে কেন,—তাহাও আবার বৃহস্পতিবার বেলা নয়টা চুয়ান্ন মিনিটে? সৃষ্টি রহস্য এবং পুরুষকার তত্ত্ব অনুযায়ী পুরানো বন্ধুদ্বয়ের এবম্বিধ সাক্ষাৎকার এমন কিছু বিস্ময়ের নয়; কিন্তু দুই বিধর্ম্মী উদ্দেশ্যের এহেন মিতালি কিছু পরিমাণে বিস্ময়ের বৈকি! সংসারে প্রতিমুহূর্ত্তে কত সহস্র কোটি উদ্দেশ্যের নবজন্ম হইতেছে,—তাহাদের সব কয়টিকে জলবিম্ববৎ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি না, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই যে ক্ষণিকের এ কথা অস্বীকার করিবার উপায়ও নাই। কেননা, অন্যথায় আমাদের স্বীকার করিতে হয় যে, এই বসুন্ধরা উদ্দেশ্য সিদ্ধির বস্তু-তান্ত্রিক কারখানা এবং আমাদের জীবনটাও একটা দুর্ব্বিসহ বোঝা। আমাদের সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে শ্রীশ্রী৺গজাননের গদিটী কিঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে এবং আমরা স্বয়ংসিদ্ধ মহাপুরুষ হইয়া সৃষ্টি রহস্যের নাড়িভুঁড়ি টানিয়া বাহির করিতে কৃতসংকল্প হই আর কি!

* * * * *

(১)

রমানাথ বিস্ময়ে হাঁকিয়া উঠিল, তুমি! আরে, ধনপতি যে!! এ পাড়ায় কী মনে ক'রে?

ছাতাটি মুড়িয়া সুস্থির হইয়া ধনপতি কহিল, হ্যাঁ আমিই। চিন্‌তে পার তা' হ'লে!

স্বরে কিঞ্চিৎ শ্লেষ ছিল। রমানাথ কহিল, চিন্‌তে পারবো না মানে?

ধীরে ধীরে পকেট হইতে জাপানী ফুলপাতা-কাটা বিড়ির কৌটাটি বাহির করিয়া নির্লিপ্ত কণ্ঠে ধনপতি কহিল, মানেটা এমন কিছু নয়, সম্ভব অসম্ভব ব'লে একটা কথা আছে তো! সমং সমেন যোজয়েৎ। আমি কোথায় নতুন ক'রে চিন্‌তে যাচ্ছিলুম, তা' নয় তুমিই—যাক্ বিড়ি খাও?

রমানাথ কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়া কহিল, No, thanks!

বিড়ির সম্মুখ ভাগটা মুখে পুরিয়া ফুঁ দিতে ধনপতি কহিল বড় ভুল হ'য়ে গিয়েছিল ভাই—আমার বেয়াদপি ক্ষমা কর ভাই—কিন্তু দেখলে আমার কাছে একটিও সিগ্রেট নেই।

রমানাথ ব্যস্ত হইয়া কহিল, তা'তে কী! কিন্তু তুমি ওসব কি বল্‌ছো? বেশ শ্লেষ করে' কথা ব'লতে শিখেচো তো! কথা কইবার যদি ইচ্ছে না-ই ছিল, দাঁড়ালে কেন?

বিড়িতে কসিয়া টান দিয়া ধনপতি কহিল, গরজে! তুমি দেখ্‌ছি এখনো সেই রকমই আছ। কিন্তু শ্লেষ দেখলে কোনখানটায়?—তোমাদের বিড়ি offer করা স্পর্দ্ধার নয় কি?

রমানাথ চটিয়া উঠিল; বন্ধুত্বের কাছে স্পর্দ্ধার কোনো কথা নেই,—বরং আমার না-নেওয়া—তাই স্পর্দ্ধার—সংসারে সব জিনিষ অমন বিদ্রূপাত্মক দেখো না হে ঠক্‌বে।

ধনপতি কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, ঠক্‌তে কী বাকি আছে কিছু? এটুকু জেনো বিদ্রূপের জন্ম তোমাদের ঐ 'ঠকান' কথায়। আমাদের জীবনটা কী একটা প্রকাণ্ড বিদ্রূপ নয়?

রমানাথ কহিল, অত 'ফিলজপি' বুঝি না। কী ক'রবো বল। আর তো পাত্তাই পাওয়া যায় না।—এম্‌-এ পড়লে না কেন?

বিড়িতে শেষ টান দিয়া ধনপতি কহিল, উত্তরটা কি আমার মুখে লেখা নেই! নতুন ক'রে শুনতে চাও? কিন্তু শুনে বিশেষ লাভ হবে না।

রমানাথ দেখিল ধনপতি কিছুতে সোজাপথ ধরিবেনা। অন্যকথা পাড়িবার চেষ্টা করিল; Article তো কই আর লিখছো না! কী ক'রবে এখন?

বিড়িটা ফেলিয়া দিয়া কোঁচার খুঁটে মুখ মুছিয়া ঈষৎ হাসিয়া ধনপতি কহিল, পেট ভরে না! হঠাৎ রমানাথের বাঁহাত ঝাঁকানি দিয়া কহিল, Excuse me—বড্ড বদ্ অভ্যেস্ হ'য়ে গেচে—পুঁজি কিছু নেই রে ভাই! বলিতে বলিতে কাঁপিতে লাগিল।

রমানাথ ব্যস্ত হইয়া কহিল, অতো বিচলিত হ'লে কেন? সব বুঝ্‌তে পার কি—Wait and hope!

ধনপতির একবার ইচ্ছা হইল, এই ফাঁকে বলিয়া ফেলে এ পাড়ায় তাহার আগমনের হেতুটা;—বলিয়া ফেলে, প্রাত্যহিক জীবনের আত্ম-অপমানকর সংগ্রামের কথা;—বলিয়া ফেলে, জীবনের মহৎ লক্ষ্য আজ তাহার লক্ষ্যভ্রষ্ট; পূর্ণ-কৈশোরের স্বপ্ন আজ যৌবনের সূচনাতেই মরীচিকা প্রায়।—কিন্তু এ কাঙালীপনা তাহার মনঃপূত হইল না। সমবয়সীর কাছে এ ভিক্ষা আর যাহাই হউক্ না কেন, কোনো মতেই গৌরবের নয়। দরকার কী আপনাকে নগ্ন করিয়া? নগ্নতাকে ভালভাবে প্রকট করিয়াই তো উপভোগ করিতে হয়! তাহাকে পুনরাবৃত করিয়া কে কবে সমাজের স্বাধীনতা বজায় রাখিতে চাহিয়াছে?

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া রমানাথ কহিল, কী হে চুপ ক'রে রইলে যে বড়! উত্তর দিলে না তো, কেন এ পাড়ায় এলে? আমার ওপর নিশ্চয়ই কোনো পুরানো ঝাল মিটাতে আসনি!

ধনপতি কহিল না হে না, তোমার সঙ্গে বিশেষ দরকার আছে।

রমানাথ তাহাকে নরম হইতে দেখিয়া হাসিয়া কহিল, বাঁচ্‌লুম! তবে চল না হে আমাদের বাড়ী ঐ তো কাছে-ই।—যাক্ ভাল-ই হ'লো তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল, আমারও তোমার সঙ্গে Private কথা আছে। ঠিকানা জানতুম না তোমার, বড় মুস্কিলে পড়েছিলুম যা' হ'ক।

(২)

মস্ত বড় বাড়ী। ইতিপূর্ব্বে বছর চারেক আগে ধনপতি এ বাড়ীতে বহুবার আসিয়াছে গিয়াছে, এমন কি এ বাটীর পরিবার বর্গের সহিত কিছু কিছু আলাপ পরিচয় ছিল তখন। কিন্তু আজ প্রথম দর্শনে এ বাড়ীটিকে ঠিক যেন চিনিতে পারিতেছিল না। নূতন সংস্কারের ফলে বাড়ীটা যেন আর পাঁচটা বাড়ীকে দেখাইয়া দেখাইয়া হাসিতেছিল। তাহার উপর, দোতলার উপর প্রশস্ত তেতলা উঠিয়াছে।

ধনপতি চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া করিয়া কহিল, এ কোথায় নিয়ে এলে হে? তোমাদের তো দোতলা বাড়ী ছিল! আরে, এ যে আবার বিয়ে বাড়ী!! ছাদে মেরাপ উঠেছে, গেটের ওপর নহবৎ বসে'চে দেখ্‌চি। আমার কী দিক্‌ভ্রম হ'লো নাকি?

রমানাথ সতৃপ্ত হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া কহিল, না হে না— দিক্‌ভ্রম নয়। তেতলা উঠেচে সম্প্রতি, বাবার খেয়াল!

ধনপতি তবুও বিস্ময়ের স্বরে কহিল, আর সানাই বাজে কেন? তোমার সেই নোরা বোনের বিয়ে নাকি? নোরা এরি মধ্যে এতো বড় হ'য়ে উঠেচে? বেশীদূর তা' হ'লে পড়ালে না! তোমাদেরও দেখ্‌ছি 'প্রেজুডিস্' আছে তা' হ'লে।

রমানাথ তাহাকে বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করাইয়া কহিল, এস, বস—ব'লছি সব পরে। তারপর অন্দরমহলের দিকের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া ড্রয়ার হইতে সিগারেট বাহির করিয়া কহিল, নাও, ধরাও।—তারপর কেমন লাগচে? অনেকদিন পরে কিন্তু আবার দু'জনে এই ঘরে বসচি। আই-এ পরীক্ষার কথা মনে পড়ে? দু'জনে সারারাত চা আর কোকোর শ্রাদ্ধ করে'ছি। তোমার পাল্লায় পড়ে যা'হক তবু পাশ ক'রলুম।—উঃ কী সাংঘাতিক পড়া!—ওকি, তুমি যে বড় গম্ভীর হ'লে?

সিগারেটের ছাই ঝাড়িতে ঝাড়িতে ধনপতি অন্যমনস্কের মত উত্তর দিল, ভাব্‌চি সেই দিনগুলো যদি আবার ফিরে পাই! কত নিশ্চিন্ত ছিল তারা!—ভাল কথা নোরা তা' হ'লে পড়চে?

রমানাথ আগ্রহ-কণ্ঠে কহিল, ডাকবো তাকে? সে তো তোমার প্রায়ই খোঁজ করে। এই আজও তো ব'লছিল, ধনদা'র ঠিকানা জান দাদা? এ উৎসবে তিনি বাদ প'ড়লে তোমার কিন্তু ভাঁরি অন্যায় হ'বে।—আমার পরম ভাগ্য যে তোমার হঠাৎ দেখা পেয়ে গেলুম।

ধনপতি তেমনি নিরুৎসুক কণ্ঠে কহিল, উৎসবটা তা'হলে তোমাকে নিয়েই! খুব সুখের কথা। এর বহু আগে কিন্তু তোমাদের বিয়ে করা উচিত ছিল। আই কন্‌গ্রাচুলেট ইয়োর এনটারপ্রাইজ!

রমানাথ ঠোঁট বেকাইয়া হাসিয়া কহিল, বড় যে উপদেশ-বাগীশ হ'য়েচো দেখ্‌চি!—তোমরা বুঝি সব চিরকুমার থাকবার মতলব ক'রেচো?

ধনপতি কহিল, তা বলচি না। ওয়ারম্‌ বেড্‌ এ্যাফোর্ড' করবার যাদের 'মিন্‌স্‌' আছে।

রমানাথ দেখিল ধনপতি পূর্ব্বপথ অবলম্বন করিয়াছে। প্রসঙ্গটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে কহিল, বস, ভেতরে চায়ের কথা বলে' আসি।

রমানাথ উঠিয়া যাইতে ধনপতির কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা. কেমনতর সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। এতবড় একখানা সুসজ্জিত কক্ষে তাহাকে যেন নেহাৎ-ই বেমানান দেখাইতেছে,—তাহার একক অবস্থিতি যেন ঘরের অনেকখানি জৌলুস্‌ ম্লান করিয়া দিয়াছে, তাহার আড়ষ্ট ভাবটাও যেন ঘরখানিকে অনেকখানি আড়ষ্ট করিয়া দিয়াছে,—চেয়ারের স্প্রীংগুলোও যেন তাহাকে স্বচ্ছন্দে বসিতে সম্মতি দিতেছে না, তাহারাও যেন তাহার অনভ্যস্ত উপবেশনকে বিদ্রূপ করিতেছে।

ধনপতির হঠাৎ মনে হইল: এ বাড়ীর কোনো আত্মীয় যদি সহসা আসিয়া পড়িয়া তাহাকে এমতাবস্থায় দেখে! হয়তো সহজেই ভাবিবে, এব্যক্তি অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে;—ভাবিবে কোনও প্রার্থী ভুল করিয়া চেয়ারে বসিয়া দাতার সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে চাহিয়াছে—যাহার উপযুক্ত আসন বাহির দ্বারপ্রান্তের ঐ ছারপোকা-সঙ্কুল কেওড়া কাঠের বেঞ্চ। তাহার এবম্বিধ স্পর্দ্ধার কথা ভাবিয়া আগন্তুক মনে মনে কতনা হাসা-হাসি করিবে!...বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় ধনপতি নড়িয়া উঠিল। নিজেকে সক্রিয় এবং মানানসই করিতে মনের মধ্যে সে একটা প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করিল। এ বাটির কায়দা-মাফিক সগর্ব্ব ভঙ্গিমার চেয়ার এবং টেবিল দু'টাকে সায়েস্তা করিবার নিমিত্ত সজোরে ঝাঁকানি দিয়া পা দুইটাকে টেবিলের উপর তুলিয়া দিল। একটু আত্মপ্রসাদও যেন লাভ করিল তাহাতে। কিন্তু পর মুহূর্ত্তে পদদ্বয়ের জুতা দুইটার ক্ষয়িষ্ণু দীন বেশ তাহার এই সাময়িক উত্তেজনাপ্রসূত ঔদ্ধত্যকে রীতিমত বিদ্রূপ করিল। ধনপতি পা নামাইয়া পূর্ব্ববৎ আড়ষ্ট হইয়া বসিল। কিন্তু এ কি? কিছুতে স্বস্তি নাই,—আলো বাতাস খোলা প্রশস্ত ঘরে বসিয়া সহসা দম আটকাইয়া আসে কেন? কেন, মনে হয় এ ঘরের দেয়াল টেবিল চেয়ার সকলেই যেন একজোটে ভীষণ একটা ষড়যন্ত্র করিতেছে—যে কোন মুহূর্ত্তে গলা টিপিয়া দিলেও দিতে পারে!

ধনপতির হাঁক ছাড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে ইচ্ছা হইল। তর্জ্জনী মধ্যমার মধ্যস্থিত সিগারেটের আগুন অঙ্গুলী স্পর্শ করিতে তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। ছি ছি, এ কি করিতেছে সে? হঠাৎ একি ব্যাধি আসিয়া জুটিল? একি ব্যাধি সঙ্গোপনে প্রবেশ করিয়া তাহাকে জীর্ণ করিতেছে? না না এ অসহ্য! কিসে সে ছোট? বিদ্যায়? বুদ্ধিতে? কিছুতেই নয়!! তবে কেন মনের এ পঙ্গুতা? ধনপতি ভাবিতে চেষ্টা করিল...

কিন্তু ভুলিয়া গেল, জগৎসংসার ঔদ্ধত্যের এবং হটকারিতার প্রত্যাশা করে সকলের ব্যবহারে—তা আকারে, ইঙ্গিতে, কার্য্যে, বাক্যে, যে কোনো প্রকারে-ই হোক না কেন। তাহারা আপনাকে প্রকাশ করিবার স্পর্দ্ধা তোমাকে সব দিবে। কি চাও তুমি?—প্রভাব? প্রতিপত্তি? সামাজিকতা? সব। সবার সমক্ষে প্রকাশ কর আমি আছি,—আমি সবিশেষণে বিশেষ ব্যক্তি। বল, আমায় অবহেলা করা সহজ নয়। সবার চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দাও, চিনাইয়া দাও তোমার প্রকাণ্ড অস্তিত্ব। গুম্ফে পিটুলীর প্রলেপ লাগাইয়া বল, ঘন দুগ্ধে অরুচি জন্মাইয়াছে। জগৎ-জঠরে তোমার এবম্বিধ প্রকাণ্ড এবং প্রচণ্ড সত্তা তাহাকে ফাঁপাইয়া ফুলাইয়া তুলিবে। তবে না তুমি! ইহাই নিয়ম।...

ধনপতি কাঁদিতে চায়। একি করিলে বিধাতা! দারিদ্র্য যদি মানুষকে এত পঙ্গু, এত অপ্রতিভ, এত বীতশ্রদ্ধ করিয়া ফেলে,—তাহাকে আপন চক্ষে এত হীন, হেয় প্রতিপন্ন করে, তবে তাহার মাধুর্য্য কোথায়? তবে কেন দারিদ্র্যবরণে এত কবির এত আস্ফালন! ইহা কি বিলাসিতা? ধরিয়া লওয়া গেল, ইহার দুঃখজনিত নিজস্ব গৌরব আছে;—মানিয়া লইলাম, মনুষ্যত্ব মাপের ইহাই প্রকৃষ্ট তুলাদণ্ড;—স্বীকার করা গেল, মানবতা এবং মহত্ত্বের ইহা সোহাগ স্বরূপ। কিন্তু তাহাতে কী! মানবতা-মহত্ত্ব-মনুষ্যত্ব খাটো হইয়া সহজলভ্য হইয়া পড়ে নাকি তাহা হইলে?...

স্বভাব-দারিদ্র্যে গৌরব কোথায়? করুণার পাত্র যাহারা তাহারা কি কখন মহত্তের দৃষ্টান্তস্থল? উপযাচিত দরিদ্রতায় হয়তো কিছু মহিমা আছে, কিন্তু তাহা তাহার নিজস্ব নয়—তাহা গ্রহীতারই উদারতার পরিচায়ক। যে দরিদ্র ভিক্ষা মাগে, আর যে রাজসজ্জা ছাড়িয়া ভিখারীর জীর্ণ কন্থা মাগিয়া অঙ্গ ঢাকে,—এ দু'য়ে কি আকাশ পাতাল তফাৎ নয়?

ধনপতি সপ্রতিভ হইয়া উঠিয়া বসিল। আপনার চারিপাশে কাঠিন্যের আবরণ আনিতে চেষ্টা করিল, যেন জীবনযুদ্ধে সে আর কাটা সৈনিক নয়, দস্তুর মত জেনারেল। তাহার মনোবৃত্তির এ উন্নয়নের প্রথম উত্তাপ গিয়া পড়িল বেচারা স্প্রীংচেয়ারের উপর আচম্বিতে। সিগারেট কেস হইতে পুনর্ব্বার সগর্ব্বে সিগারেট বাহির করিয়া অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে দেশলাই-এর কাঠি ঠুকিল, তারপর হস্তের লঘু আন্দোলনে নিবাইয়া দিল। না কিছুতেই সে ফুঁ দিবে না! কেন দিবে? ফুঁ কি সস্তা! যখন তখন মুখ ফুলাইলেই হইল আর কি! আরে ছোঃ! ঊর্দ্ধে কড়ি কাঠের দিকে শিবচক্ষু করিয়া প্রচুর আলস্যে ধোঁয়ার রিং ছুড়িতে লাগল। ধনপতি

বিদ্রোহীও হইতে জানে,—সে মুড়ি নয়—রীতিমত এয়ার টাইট করা ব্রিটেনিয়ার ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট !!

(৩)

দ্বার-প্রান্তে পদশব্দ হইতে ধনপতির ঘোর কাটিল। তাড়াতাড়ি পা দুইটা নামাইয়া জ্বলন্ত সিগারেটটি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চেয়ারের একপ্রান্তে জড়সড় হইয়া চোরের মত বসিল।—যেন চুরি করিতে আসিয়া বামালশুদ্ধ ধরা পড়িয়া গিয়াছে। বুকে যেন তাহার হাতুড়ী পিটীতে লাগিল। ওঃ সে কি শব্দ, কৃচ্ছসাধ্য সমস্ত সাহস, বড়মানুষীর সমস্ত মুখোস্ খসিয়া গিয়া এখন চিরাচরিত ধনপতি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। রাজ্যের লজ্জা গ্লানি আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিতেছে যেন। সে কোনো প্রকারে পালাইয়া সামলাইতে পারিলে যেন এখনকার মত বাঁচিয়া যায়।

কিন্তু ভয়ের কোন কারণ নাই। দ্বারদেশের আগন্তুক্ আর কেহ নহে, স্বয়ং রমানাথ মাতা এবং ভগ্নী সমভিব্যহারে। তাহারা ঘরে প্রবেশ করিতেই ধনপতি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া ত্রস্তপদে আগাইয়া গিয়া রমানাথের মাতার পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল। নোরা হাত তুলিয়া ছোট্ট একটি নমস্কার করিয়া অভিমানের সুরে কহিল, পথ ভুলে বুঝি ? সেই যে ডুব দিলেন, আর—

মা হাসিয়া কহিলেন, তারপর সব ভাল তো বাবা ? মা, বাবা, সুধা ?

ধনপতি ঘাড় চুলকাইতে চুলকাইতে জবাব দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তোমাকে পেয়ে আমরা কত খুসী হলুম্। রমার বিয়ে তোমরা সব আসবে, এ আমরা আশা করতুম। বিয়ের কটা দিন কিন্তু আসা চাই, বাবা.

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ধনপতি কহিল, আজ্ঞে হাঁ, আসব বইকি :—

সদর্প কণ্ঠে নোরা কহিল, আমি জানি, উনি আসবেন না। যিনি চার বছর ভুলে থাক্‌তে পারেন, তাঁর পক্ষে এ'কটা দিন ভোলা এমন কিছু শক্ত নয়।

—হ্যাঁ বাবা, তাই নাকি ?

বিচলিত হইয়া ধনপতি কহিল, আজ্ঞে না নিশ্চয়ই আসবো।

নোরা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। মাও যেন উৎসুক হইয়া রহিলেন।

এ হাসির অর্থ ধনপতি বোঝে। জানে উহাতে আন্তরিকতা নাই ; আছে নিছক সামাজিক সৌজন্য। বিয়ে বাড়ীতে তাহার আসা, না-আসা এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়, যাহাতে নোরার অভিমানের এবং এবাটির চিত্তোৎদ্বেগের কারণ হইতে পারে।

সে শুধু অভিভূতের মত মা ও মেয়েকে দেখে। আত্মতৃপ্তিতে ঐ দু'খানি মুখ কত উজ্জ্বল ! দীন দর্শকের মত ধনপতি চাহিয়া ভাবে : সাগরমন্থনে যেন এইমাত্র লক্ষ্মী আর উর্ব্বশীর উদ্ভব হইল ! সেই ফ্রক পরা নোরা আজ আপন মহিমায় আপনি রহস্য বিমণ্ডিতা। তাহার যৌবনের

শতদল বিকাশের বিলম্ব হয়তো অনেক আছে ; কিন্তু তাহারই পূর্ব্বে কৃত্রিমতার উপকরণে স্বভাব যৌবন-শ্রী যেন তাহার অঙ্গে ধরা পড়িয়াছে। সারা অঙ্গে তাহার সাবলীল লীলাভঙ্গি, চোখে-মুখে গণ্ডবাহী চূর্ণ কুন্তলে বিলোল হিল্লোল—ফ্যান্সী শাড়ীর খসে-পড়া প্রান্তদেশ নবযৌবনের কেতন! —বক্ষস্পন্দনে আভাষ পাওয়া যায় কামদেবের প্রশান্ত প্রশস্তি।...মায়ের মূর্ত্তিও অপরূপ মাধুর্য্যে সমুজ্জ্বল। সে রূপে করুণা আছে কিনা জানি না, কিন্তু মুগ্ধ করিবার, অভিভূত করিবার শক্তি আছে। বাঙ্‌লার দীন মাতৃমূর্ত্তির সঙ্গে তাহার তুলনাই চলে না। উহারা ভিন্ন শ্রেণীর—প্রাচুর্য্যের মাঝে জন্ম উহাদের।

অভিভূত ধনপতির চোখের উপর আরো দুইটী রূপ ভাসিয়া উঠিয়া ইহাদের পার্শ্বে আসন লইবার বৃথা চেষ্টা করে। ধনপতি স্পষ্টই দেখিতে পাইল, নোরার ঐ মূল্যবান ফ্যান্সী সাড়ীর পশ্চাতে একখানি আধময়লা অগোছাল সাড়ী বৃথাই সলজ্জ কুণ্ঠিত উঁকি মারিতেছে।...নোরার ঐ মুখখানার পাশে একখানি আবছা ম্লান মুখ ভাসিয়া উঠিল। রুক্ষ চুলগুলি তাহার পশ্চাৎ হইতে টান করিয়া বাঁধা, কপোলে দুর্ভাবন স্বেদ বিন্দু, ললাটে দুশ্চিন্তার কুঞ্চণ। নোরার ঐ চটুল চাহনির তুলনায় সেই চোখের চাহনি কত নিষ্প্রভ! দু'খানি মুখের তুলনায়ও কত খানি বৈসাদৃশ্য! একটি আত্ম-গরিমায়, ব্যক্তিত্বে তৃপ্তিতে দৃপ্ত ; আর একটি আত্মগ্লানিতে এবং বিষাদে ম্লান!...আর তৃপ্তিতে ঐ মাতৃমূর্ত্তির পার্শ্বে আর একটি মাতৃমূর্ত্তির বৈষম্যও কি নিদারুণ!—একটি স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্য্যে এবং আত্ম-প্রসাদে পরিপূর্ণ ; আর একটি রোগে, শোকে, অনাহারে কুদর্শন।...

—কি ভাবচেন? আস্‌বেন কি না! বলিয়া নোরা ভ্রূভঙ্গি করিল।

ধনপতি চকিত কণ্ঠে উত্তর দিল, না না, নিশ্চয়ই আসবো মা!

—কিন্তু আপনারা কাজের লোক! না-ও আসা সম্ভব হ'তে পারে, কি বলেন? নোরা ঠোঁট উল্টাইয়া বলে!

মা কহিলেন, তুই থাম্ না,—আমরা উঠি তা'হলে এসো কিন্তু বাবা। ধনপতি আর এক দফা পায়ের ধুলা লইয়া কহিল, আপনি বার বার বলে' আমায় লজ্জা দেবেন না, আমি আস্‌বোই।

সাড়ীর স্খলিত আঁচলটিকে কাঁধের উপর দিয়া ঘুরাইয়া লইতে লইতে নোরা কহিল, যদি কাজ থাকে ভুলে যাবেন নাকি!

রমানাথ তাড়া দিয়া কহিল, হঁ্যা, ভুলে যাবে—তুই যা দেখি এখন।

(৪)

মা ও মেয়ে চলিয়া গেলে রমানাথ ভিতরের দরজাটা ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিল। ধনপতি বিমূঢ়ের মত বসিয়া ভাবিতেছিল ঃ রমানাথ মা ও বোনকে আনিয়া ভাল করে নাই। তাহাদের এ আন্তরিকতার প্রয়াস সহজেই ধরা পড়ে। তাহাদের কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গি কত সীমাবদ্ধ, কত সংক্ষিপ্ত!—তাহা আত্মীয়তার অবান্তর আলাপে উচ্চকিত মুখর নয়।

ধনপতি ভাবে, ইহাদের কাছে জীবনের গতি কত সচ্ছন্দ, কত সাবলীল। জীবনকে ইহারা উপভোগ করে, তাহা হইতে সকল সুখ নিঙড়াইয়া বাহির করিয়া লয়। আর তাহাদের জীবন? বেতালা, বেসুরা, বেয়াড়া—গতিভঙ্গী তাহার পদে পদে ব্যাহত। বন্ধুর পথের উপর দিয়া তাহার সূচনা, আবার বন্ধুর পথেই তাহার সমাপ্তি! পথচলার ক্লেশ তাহাদের, কিন্তু পথ চলার সুখ উহাদের! রমানাথ গাহে জীবনের জয়গান, আর সে গাহিবে কি? কিছু না—এলিজি!

রমানাথ এদিক ওদিক চাহিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহে, তারপর কি জানো ভাই হ্যাঁ,—এই, এই দ্যাখ্‌ ভাই যদিও—ধর, বিয়ে করছি—বুঝতেই পা'র—এ সম্বন্ধে কোন, এই যাকে বলে—অভিজ্ঞতা নেই—মুস্কিল!

ধনপতি সহজ উত্তর দেয়, কেন? তোমাদের সমাজে পূর্ব্বরাগটা ত অপ্রতুল নয়!

—তুমি যা ভাবছ তা নয়। বাবা নেহাৎই সেকেলে! তাই বলছিলুম কি—দ্যাখ দিকি ফ্যাসাদ!—কিছু জানি না শুনি না, বিয়ে!! কি মুস্কিল বল দেখি!

—সত্যি তো! তা কি জানতে চাও?

রমানাথ উৎফুল্ল হইয়া উত্তর দেয়, সেই জন্যেইতো বলা। শুনেচি, তুমি এসম্বন্ধে প্রচুর পড়াশোনা করেচো!

ধনপতি সহজ কণ্ঠে কহিল, কী সম্বন্ধে?

—এই এই, তোমার 'সেক্সোলজি,—কি মুস্কিলে পড়েচি! কিচুটি জানা নেই....সায়েন্স তো বটে!—

ধনপতি কহিল, ঘোড়া হ'লে চাবুকের অভাব হ'বে না ভাই 'সেক্সোলজিটা' আর্ট, হাতে কলমে শিখতে হয় ঠিক-ই শিখে নেবে'খন, কোন ভাবনা নেই!

রমানাথ নখের উপর সিগারেট ঝাড়িতে ঝাড়িতে কহিল, নাঃ তবুও—খানদুই, ও সম্বন্ধে—এই তোমার থাকে বলে—বুঝতেই পারচো—

—কিছু না, 'থিওরী'তে কোনো কাজ চলে না হে!—নিশ্চিত হও বন্ধু।

—আঃ, আমি যা' ব'লচি তুমি ঠিক বুঝতে পারলে না! নাম করে' দাও না দু'একখানার, —এই যাকে বলে—

—কিন্তু তাতে যে তোমার বিশেষ সুবিধে হবে, এমন আশা করা যায় না! তোমার ইপ্সিত বস্তুর সন্ধান তাদের কোনোটাতেই পাবে না। সব 'থিওরী'রে ভাই।

রমানাথ দমিয়া গিয়া কহিল, তাহ'লে এখন উপায়! কি মুস্কিলেই যে পড়লুম!

ধনপতি ম্লান হাসিয়া কহিল, যার ভাবনা তাকেই ছেড়ে দাও,—মিছে কেন আর—

ব্যগ্রকণ্ঠে রমানাথ কহিল, সত্যি, ওসম্বন্ধে কোনো বই নেই! কী হ'বে?

—না না, ভাল কথা মনে পড়েচে, কি 'সাম্ আয়ারের' একখানা বই আছে—বইটা শুনেচি পুরোদস্তুর 'প্রাক্টিক্যাল'।

রমানাথ উৎসুক-কণ্ঠে কহিল, নামটা মনে পড়চে না? চেষ্টা কর না—

ধনপতি নির্লিপ্ত কণ্ঠে কহিল, কই না। বরং বই-এর দোকানে খোঁজ নিও।

—পাব তো?

—নিশ্চয় পাবে। বইটার শুনেচি অনেকগুলো 'এডিসন' হ'য়েচে—

—ধন্যবাদ ভাই! ওই যা! কথায় কথায় তোমার চা আনাতে ভুলে গেচি একেবারে,—বস না একটু—

ছাতা লইয়া উঠিয়া পড়িয়া ধনপতি মাথা নাড়িয়া কহিল, থাক্ থাক্—এত বেলায় আর কাজ নেই। তোমার দাম্পত্য জীবন সুখের হ'ক!

বলিয়া ম্লান হাসিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

পিছন হইতে রমানাথ কহিল, আসবে তো? we may expect you then!

—চেষ্টা ক'রবো। ধন্যবাদ!

(৫)

রাস্তায় নামিয়া ধনপতি খুব খানিকটা হাসিয়া লইল। বাঃ, মজা সে করিল মন্দ নয়! তাহার অত্যাবশ্যক প্রয়োজন ইহাদের 'প্রাইভেট' দরকারে একেবারে চাপা পড়িয়া গেল। সাধ্য কি ছিল ধনপতির ইহাদের সমক্ষে আপনার একান্ত প্রয়োজনকে, গ্রাসাচ্ছাদনের বিরক্তকর এক ঘেয়ে সমস্যাকে ব্যক্ত করে বলে, বলে আমরা খেতে পাইনে—খ্যাপা কুকুরের মত এদিক ওদিক চক্রাকারে ঘুরিয়া বেড়াই,—মায়ের মাথা ধরে; বাপের বাত; বোনের অনূঢ়া অবস্থার আত্মগ্লানি; ভাই পায়না পড়তে বই অভাবে; দুবেলা হাঁড়ি চড়ে না চালের অভাবে! ছি ছি, কত তুচ্ছ ঐ সকল অভাব এই ইহাদের আত্মতৃপ্তি, পরিপুর্ণ স্বাস্থ্য—সৌন্দর্য্যে'র সমক্ষে! ভালই হইল সে কিছু বলিতে পারে নাই;—ভালই হইল সে বাঁচিয়া গেল আত্ম-অবমাননা হইতে! তবু তো সে বাঁচিয়া গেল!! এই উৎসব মুখরিত গৃহে তবু তো সে দীন প্রার্থী নয়! বন্ধুত্বের মর্য্যাদা তো আজ তাহার ক্ষুন্ন হইল না!—তাহা তো অক্ষুন্নই রহিল তবু!!

কিন্তু?—

ধনপতি ভাবুক। এই অবসরে আমরা গল্পটা করিয়া ফেলি। দিন দুই পূর্ব্বে ধনপতি কলিকাতা গেজেটে দেখিয়াছিল যে, রমানাথের পিতা রায় বাহাদুর শিবশঙ্কর রায় সহসা এ্যাকাউন-ট্যাণ্ট জেনারেল পদে উন্নীত হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে নাকি কোন বাঙ্গালীর ভাগ্যে অত বড় সম্মান লাভ হয় নাই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কাগজে কাগজে শিবশঙ্কর রায়ের ফটো বাহির হইল,—সকলেই একবাক্যে তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিল, এবং সরকার যে যথার্থ গুণী ব্যক্তিকে সমাদর

করিয়াছেন তাহার নিমিত্তও একদফা প্রশংসা তাহারা শব্দহীন বিশাল তারস্বরে ঘোষণা করিল,—বাঙ্গলাদেশ যে আজ যথার্থ গৌরবান্বিত, এ কথাও ব্যক্ত করিল।

কিন্তু ধনপতি ভাবিল অন্যরূপ। সে মনশ্চক্ষে স্পষ্টই দেখিতে পাইল, রমানাথের প্ররোচনায় এবং রায় বাহাদুরের সুপারিশে চাকুরী পাইয়া গেছে,—মায়ের মাথা-ধরা সারিয়াছে; বাবার বাত ভাল হইয়াছে; বোনের মুখে হাসি ফুটিয়াছে; ভায়াও 'স্কোয়াররুট' কসিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে; ঘুরিতে ফিরিতে আবার বলিতেছে, দাদা, 'Sweet are the uses of adversity' essayটা একটু বলে দাও না!—আচ্ছা, 'To keep wolf from door' মানে কি?

বোন বলিতেছে, টুক-টুকে বৌদি চাই—রাঙ্গা মাথার চিরুণী।

মা-বাবা পরামর্শ করেন আগন্তুক কয়েক জনের সঙ্গে। এমনি নাকি হয়। তাই——।

ধনপতি আশায় বুক বাঁধিয়া রমানাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল এবং তাহার পর যে ব্যাপার ঘটিয়া গেল, তাহা আপনারা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এখন বলুনতো দেখি Sexকে বাঁচান অপেক্ষা Sexology চর্চ্চার অধিক প্রয়োজন আছে কি না? পাশা-পাশি দুটো সমস্যার সমাধান করুন তো দেখি?

* * * * *

ধনপতি আবার ফিরিল হন্ হন্ করিয়া রমানাথের বাড়ীর দোর গোড়ায় আসিল। খানিক থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল। তারপর ঝড়ের বেগে ঘরে প্রবেশ করিল। রমানাথ তখন কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া কি যেন রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটনে সমাধিস্থ ছিল। তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া কহিল কি হে, ফিরলে যে বড়!

কোনো দিকে না তাকাইয়া ধনপতি গড় গড় করিয়া বলিয়া গেল: আমার কথাটা মনে রেখো—তোমার বাবাকে বলে' একটা চাকরি—পঁচিশ, তিরিশ, যা' হয়,—মায়ের মাথা ধরে রোজ; বাবা বাতে পঙ্গু; বোনের বিয়ে হচ্ছে না; ভাইকে স্কুল ছাড়িয়ে দিয়েছি;—বুঝতেই পারচো বড় অভাব! না, না, চেষ্টা ক'রলে বুঝতে পারবে—তোমরা কী আর অবুঝ।

বলিয়া তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া এক প্রকার দৌড় দিল—যেন, ভয়ানক অপবাধ করিয়া ফেলিয়াছে! ছি, ছি!...

পিছন হইতে রমানাথ তখনও বলিতেছে, ভট্‌চায্-গুপ্তোর দোকানে বইটা পাব তো হে।

ধনপতি তখন মাঝপথে আসিয়া পড়িয়াছে।

ভ্রান্তি

অমরগোপাল নন্দী

ঝড়ের বিধ্বস্ত দেশে, দীপ্তিহীন মেঘলোক মাঝে,
নিরুপায় রাত্রি যেথা সুপ্তিহারা নয়নে বিরাজে,
অসম্বৃতা প্রকৃতির অঞ্চলের প্রান্ত ধরে টানি,
পাগল বাতাস যেথা শঙ্কিত জগতে চলে হানি',
প্রাণের গোপন রসে শাখায় ফোটান ফুলদলে
নিঠুর কঠিন ঝঞ্ঝা বারে বারে ফেলে ধরাতলে ;
তাহারি ওপারে যেথা অনির্ব্বাণ আলোকের দেশে,
অচেনা আকাশতলে অপরূপ অচেনার বেশে,—
মায়ামুগ্ধ প্রকৃতির নির্ণিমেষ নয়নের তলে,
বাতাসে বহিয়া আসা অলকার সঙ্গীত কল্লোলে,
প্রশান্ত সুন্দর একা, শুভ্র তাঁরি সিংহাসন পানে
দুর্গম উঠেছে পন্থ, প্রস্তরের সোপানে সোপানে।
সহসা মানবস্রোত সুদুর্গম সেই পথপানে,
ছুটেছে বন্যার ধারা পাথরের বাধা নাহি মানে।

লক্ষ হিয়া শুনিল কি সুন্দরের সুদূর আহ্বান ?
পলকে ছাপিল বিশ্ব দ্যুলোকের জয়ধ্বনি গান ?
মুহূর্ত্তে মানুষ হ'ল শিব আর সত্যের পূজারী,
ধরার কলুষপঙ্ক বাসনার প্রাচীর বিদারি' ?

ব্যথিত ঝরিল অশ্রু, পান্থদলে দেখিনু বহুরে,
সোপান ডেকেছে শুধু, ডাকে নাই পথের ঠাকুরে।

ভারতের রাজস্বনীতি

অধ্যাপক অনাথগোপাল সেন

ভূমিকা

ভারতের সরকারী আয়-ব্যয় বা রাজস্বনীতি আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদের, প্রথমেই এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ নহে। A subject nation has no politics—পরাধীন জাতির আবার রাজনীতি কি ?—এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ততোধিক সত্য কথা হইতেছে, a subject nation has no finance. পররাজ্য জয় ও শাসনের সঙ্গে দস্যুবৃত্তির পার্থক্য কোনখানে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আমাদিগকে বিশ্ববিজয়ী বীর সেকেন্দর সাহের সহিত জনৈক দস্যুর সরস ও প্রাণ খোলা কথোপকথনের ঐতিহাসিক গল্পটি স্মরণ করিতে হইবে। অবশ্য অতীত ও বর্ত্তমানের কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বৈসাদৃশ্য দেখা যাইতে পারে ; কিন্তু তাহা কাল ধর্ম্মের দরুণ। কারণ বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগ হইতেছে বেদনাহীন দন্তোৎপাটনের (painless extraction এর) যুগ। সেই জন্যই প্রক্রিয়া রোগীর নিকট অনেক সময়েই অগোচর ও অপ্রকাশিত থাকে। এই সব কারণে আমরা যদি প্রত্যাশা করি যে আমাদের দেশের রাজস্বনীতি সর্ব্বদা জনহিতকর পথে পরিচালিত হইবে তাহা হইলে গোড়াতেই ভুল করা হইবে। স্বাধীন দেশের অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে সেখানে পর্য্যন্ত আমরা দেখতে পাই যে, শাসক শ্রেণী নিজের স্বজাতির উপর শাসনের নামে শোষণ চালাইয়া আসিয়াছেন। বহু সংগ্রাম, বিদ্রোহ ও রক্তপাতের পর দেশের প্রজাসাধারণ এই শোষণের হাত হইতে আংশিক রক্ষা পাইয়াছে এবং "no taxation without representation" গণ-তন্ত্রের এই মূল নীতি প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছে। যেখানে স্বজাতির উপর স্বজাতি, দেশবাসীর উপর স্বদেশবাসী অর্থলোভে এরূপ অত্যাচার করিতে পারিয়াছে—সেখানে বিদেশী শাসক শ্রেণীর নিকট স্বায়ত্তশাসনহীন ভারতবাসী আদর্শ রাজস্বনীতি কিরূপে প্রত্যাশা করিতে পারে ? তাই আমাদের দেশে, "No taxation without representation," করনীতির এই প্রথম ও মূল সূত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত নীতি—taxation without representation—ইংরেজ শাসনের প্রায় দুইশত বৎসর পরে আজও চলিয়া আসিয়াছে। শাসকের রাজদণ্ড যেখানে জনমতের কোনরূপ অপেক্ষা রাখে না, রাখিবার প্রয়োজন বোধ করে না, ক্ষমতা যেখানে অপ্রতিহত, সেখানে আমাদের স্বার্থ পদে পদে ক্ষুণ্ণ হইবে, আমাদের শিল ও আমাদের নোড়ায় আমাদেরই দাঁতের গোড়া ভাঙ্গা যাইবে, তাহা আর বিচিত্র কি ! কারণ রাজনৈতিক পরাধীনতার সহিত অর্থনৈতিক দাসত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা নিজ বাসভূমে যাহারা পরবাসী, তাহারা নিজগৃহের আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ,

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনের জন্য আর্থিক ব্যবস্থা নিজের ইচ্ছানুরূপ করিতে পারিবে ইহা প্রত্যাশা করা যায় না।

কোম্পানীর শাসনের প্রথম ৬০।৭০ বৎসরের কথা আলোচনা না করাই ভাল ; আমরা তাহা করিবও না। কোন জাতির ভাগ্যেই এমন ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিন যেন ভগবান কখনও না লিখেন। নগ্ন অরাজকতার মধ্যে সে এক শোষণ, লুণ্ঠন, উৎপীড়নের ভয়ঙ্কর দিন গিয়াছে। ১৮৫৭ সালে, সিপাহী বিদ্রোহের পর, বিলাতের পার্লামেণ্ট মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে ভারতের শাসনভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে নিজ হস্তে গ্রহণ করেন এবং সেই সময় হইতে এই দেশের আয় ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের কর্ত্তৃত্বভার ভারত-সচিবের উপর ন্যস্ত হয় এবং সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে ইহাই নির্দ্ধারিত হয়। সাত সহস্র মাইল দূরে বসিয়া, জনমতের বহু ঊর্দ্ধে থাকিয়া, একচ্ছত্র 'জার' এর ন্যায় তিনি ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার ফল এই দাঁড়াইল যে, ইংলণ্ডের শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক স্বার্থের নিকট একপ্রকার প্রকাশ্যরূপে ভারতের স্বার্থ বিসর্জ্জিত হইতে লাগিল। এই অবস্থা একটানা চলিয়া আসিয়াছে ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের সময়ে ইংরেজ জাতির সমূহ বিপদ উপস্থিত হইলে দরিদ্র ভারতবাসী অকাতরে ধন ও জন দ্বারা তাহাদিগকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে এবং আশা পোষণ করে যে, যুদ্ধাবসানে ইংরেজের নিকট হইতে নিজ দেশ শাসন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ লাভ করিবে। আমাদের ইংরেজ প্রভুরাও আমাদের হৃদয়ে এই আশা সঞ্চারের পক্ষে অনেক মিষ্ট মধুর বাক্যজাল রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে ১৯১৯ সালের মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার মূলে ভারতবাসীর ভাগ্যের অতি সামান্য পরিবর্ত্তনই ঘটিল! লাভ হইল—রাজস্ব ও আর্থিক-নীতি নিয়ন্ত্রণের ভার ভারত সচিবের স্থলে বড় লাটের উপর অর্পিত হইল। বলা বাহুল্য, ব্যবস্থা পরিষদের ভারতীয় প্রতিনিধিগণের মত গ্রহণ করিতে বা তদনুযায়ী কার্য্য করিতে আইনতঃ বাধ্য না থাকায় ভারতীয়দের ভাগ্য পরিবর্ত্তন ফলতঃ কিছুই হইল না। ১৯৩৫ সালে বৃটিশ পার্লামেণ্ট ভারত শাসন আইনের যে নূতন সংস্করণটি ভারতবর্ষকে উপঢৌকন দিয়াছেন তাহা দ্বারা এক হাতে যেমন প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া হইয়াছে, অন্য হাতে প্রাদেশিক লাটগণের ক্ষমতা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি করিয়া দিয়া তাহার পূর্ণ বিকাশকে প্রতিরোধ করা হইয়াছে। সর্ব্বোপরি সকল শক্তির উৎস কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের উপর দেশবাসীর বিশেষ কোন ক্ষমতাই দেওয়া হয় নাই। অধিকন্তু আর্থিক-নীতি নিয়ন্ত্রণের যে একটি অলেখিত অধিকার (fiscal autonomy convention) সম্প্রতি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল তাহা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন মূলে পরিষ্কারভাবে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। যাহা অস্পষ্ট এবং অপ্রকাশিত ছিল তাহা রূঢ় বাস্তবরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ভারতের কৃষি,

কোম্পানী যুগের অরাজকতা—সিপাহী বিদ্রোহ তৎপর ভারত-সচিবের সার্ব্বভৌমত্ব।

১৯১৯ ও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন সংস্কার আইন ও তন্মূলে প্রধান পরিবর্ত্তনের স্বরূপ।

শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য, জাহাজ পরিচালনা ইত্যাদি কোন বিষয়ে ভারতের স্বার্থের জন্য ইংরেজ জাতির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা চলিবে না, ইহা বর্ত্তমান আইনে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, প্রাদেশিক লাটগণের কখনও যে সব ক্ষমতা ছিল না, অত্যন্ত ব্যাপকভাবে তাহাদের হস্তে সে সব ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং ভারতবাসীর লাট পদে নিযুক্ত হইবার যে দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে আমাদের দু' চার বার দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল তাহা আর ঘটিতেছে না। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন (dominion self-govt. or status) বাক্যটি পর্য্যন্ত নূতন শাসন আইনের কোথাও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনারূপেও উল্লিখিত হয় নাই,— যদিও পূর্ব্বে এইরূপ শাসনের প্রতিশ্রুতি আমরা বহুবার বহু বড় কর্ত্তার মুখে শুনিয়াছি। কাহারও বুকের উপর কেহ চাপিয়া বসিয়া থাকিলে তাহাকে উঠিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে হইলে বুকের উপর উপবিষ্ট ব্যক্তিটিকে নামাইবার চেষ্টা করা ভিন্ন তাহার আর কি উপায় থাকিতে পারে? কিন্তু সেই চেষ্টা করিতে গেলেই বুকের উপর উপবিষ্ট ব্যক্তির কিঞ্চিৎ অসুবিধা অনিবার্য্য। তাই পতিত ব্যক্তিকে স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া গেলেও বুকের বোঝা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার অধিকার দেওয়া যাইবে কি প্রকারে?

যদিও আমাদের দেশে কেবল মাত্র ১৮৯২ সাল হইতে ব্যবস্থা পরিষদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই পরিষদে জন সংখ্যার তুলনায় মুষ্টিমেয় ভারতবাসী গুটিকয়েক প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার লাভ করিয়াছে, তথাপি দেশে আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে এই সব প্রতিনিধিগণকে কার্য্যতঃ কোনরূপ ক্ষমতাই দেওয়া হয় নাই। বক্তৃতার দ্বারা সরকারী কার্য্যের সমালোচনা এবং গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন থাকিলে তাহার অনুগ্রহে দু' চারিটি নির্দ্দোষ বে-সরকারী আইন প্রণয়ন করা ভিন্ন ব্যবস্থা পরিষদের প্রতিনিধিগণের আর কোন ক্ষমতাই ছিল না। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের রাজস্বনীতি যথাক্রমে সপারিষদ বড় লাট ও প্রাদেশিক লাটগণের উপর নির্ভর করিত। অন্যান্য প্রায় সকল বিষয়ের ন্যায় আয়-ব্যয় নির্দ্ধারণ ব্যাপারে ব্যবস্থা পরিষদের কোন হাত ছিল না।

ব্যবস্থা-পরিষদ ও নির্ব্বাচিত গণপ্রতিনিধিগণের শক্তিহীনতা।

১৯১৯ সালে মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড কৃত শাসন সংস্কার আইনমূলে এই অবস্থার বাহ্যতঃ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া থাকিলেও কার্য্যতঃ সরকারী আয়-ব্যয়ের উপর ব্যবস্থা পরিষদের প্রতিনিধিগণের উল্লেখযোগ্য কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের বরাদ্দ ব্যয়ের শতকরা ৮০ ভাগই পরিষদের সদস্যগণের ভোটাধিকারের বহির্ভূত ছিল। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের ক্ষেত্রে ভোটের বহির্ভূত ব্যয়ের ভাগ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের তুলনায় কিঞ্চিৎ কম ছিল বটে; কিন্তু যে সব ব্যয় সম্পর্কে সদস্যগণের ভোট দিবার অধিকার ছিল সেই সম্পর্কেও তাহাদের ভোট অনুযায়ী কার্য্য হওয়া-না-হওয়া বড়লাট ও প্রাদেশিক লাটের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিত। অসঙ্গত ও বাহুল্য হিসাবে কোন ব্যয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ না-মঞ্জুর করিলে কিম্বা হ্রাস করিলে বড়লাট কিম্বা প্রাদেশিক লাট তাহা অনায়াসে অগ্রাহ্য করিয়া সম্পূর্ণ ব্যয় পাস করিয়া লইতে পারিতেন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন মূলে এই অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলা যায় না। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের বেলায় এখনও শতকরা ৮০ ভাগ ব্যয় পারিষদের সদস্যগণের ভোটের অধিকারের বহির্ভূত রাখা হইয়াছে। এবং বড় লাট ব্যবস্থা প্রয়োগ বা আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন। সদস্যগণের অধিকারের অন্তর্গত যে সব ব্যয় তদ্বিষয়েও বড় লাটের অভিপ্রায় সদস্যদের বিরুদ্ধ মত ও ভোটের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের বেলায় সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিভাগের পার্থক্য ১৯৩৫ সালের আইনে তুলিয়া দেওয়া হইলেও লাট সাহেবের বেতন ও ভাড়া, তাঁহার আফিস সংক্রান্ত অন্যান্য খরচ, সরকারি ঋণ ও তাহার সুদ, মন্ত্রী, এড্‌ভোকেট জেনারেল, হাইকোর্টের জজ প্রভৃতির বেতন ও ভাতা, শ্বেতাঙ্গদের (including Anglo-Indians) শিক্ষা ব্যয় এবং আইন বহির্ভূত এলাকার (included areas) ব্যয় এখনো ব্যবস্থা পরিষদের প্রতিনিধিগণের অধিকারের বহির্ভূত রহিয়াছে। অন্যান্য প্রাদেশিক ব্যয় সম্বন্ধে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের ভোটাধিকার থাকিলেও তাহাদের ভোটের মূল্য দেওয়া-না-দেওয়া প্রাদেশিক লাটের ইচ্ছার উপর অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভর করিবে। ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ একমত হইলেও লাটের অমতে বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে জনহিতকর কোন ব্যয়ও করা চলিবে না। পক্ষান্তরে প্রাদেশিক লাট দেশের প্রতিবাদ ও জনপ্রতিনিধিদের আপত্তি সত্ত্বেও যে কোন প্রকার ব্যয় মঞ্জুর করিয়া লইতে পারিবেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ভারতবাসীর স্বায়ত্ত-শাসন লাভের আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন সময়ে শাসন সংক্রান্ত আইনের বহিরাকৃতি অদলবদল ও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকিলেও, প্রকৃত ক্ষমতার ভার-কেন্দ্র হেলিয়া তুলিয়া প্রায় এক জায়গাতেই থাকিয়া যাইতেছে। খুঁটা ঠিকই আছে ঘাস খাইবার রজ্জু কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইয়াছে মাত্র।

এক্ষণে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয়ের সহিত বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের প্রথম দিকে তাহাদের শাসিত বিভিন্ন প্রদেশগুলি স্ব স্ব প্রধান ছিল ও আর্থিক ব্যাপারে একের সহিত অন্যের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না। সুতরাং আয়-ব্যয় সম্পর্কেও নিজেদের এলাকা মধ্যে তাহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। যাতায়াত ও সংবাদ আদান প্রদানের অসুবিধা, শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃত্বের অভাব, এই সব কারণেই কোম্পানী শাসিত তৎকালীন প্রদেশ সমূহের আয়-ব্যয়ের উপর কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের প্রভাব ও কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু বৃটিশ পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং এ্যাক্ট আমলে আসার পর হইতে এ অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত প্রাদেশিক কর্ত্তৃপক্ষের কোন প্রকার অর্থ-ব্যয় করা একেবারে নিষিদ্ধ হয়। ইহার ফলে আয়-ব্যয় সম্বন্ধে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের মধ্যে রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয় সম্পর্কে অনবধানতা, অনাচার ও অপব্যয়ের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যে প্রায় একশত বৎসর পরে

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের মধ্যে আয়-ব্যয় সম্পর্কে কর্ম্ম-বিভাগ ও আয়-বণ্টন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেয়ো কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের মধ্যে আয়-ব্যয় কি ভাবে ভাগ হইবে তদ্বিষয়ে একটি নিয়ম প্রণয়ন করেন। তাহার ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুলিস; জেলখানা রেজিষ্ট্রেশন এবং রাস্তা ও ইমারত বিভাগের আর্থিক দায়িত্ব প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের উপর অর্পিত হয় এবং এই সব বিভাগ হইতে উৎপন্ন আয় ব্যতীত কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে একটি নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক বৃত্তি (contribution) দিবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের প্রয়োজন অনুযায়ী এই ব্যবস্থা না হওয়ায় উল্লিখিত হস্তান্তরিত বিভাগগুলির পরিচালনায় অর্থাভাব ও আনুসঙ্গিক বিশৃঙ্খলা ঘটিতে থাকে। ১৮৭৭ সালে লর্ড লিটনের শাসন কালে এই অবস্থার প্রতিকার কল্পে নিম্ন-লিখিত বিভাগগুলির পরিচালনার ভারও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের উপর অর্পণ করা হয়। যথা, ভূমি-রাজস্ব, আবগারী, ষ্ট্যাম্প, আইন ও বিচার এবং সাধারণ শাসন বিভাগ। পূর্ব্বের বার্ষিক বৃত্তি বজায় রাখিয়া বাণিজ্য ও উৎপাদন শুল্ক, ষ্ট্যাম্প, আইন ও বিচার বিভাগ এবং লাইসেন্স ট্যাক্স হইতে আয়ের একটা অংশও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে দেওয়া হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লর্ড রিপণ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয়ের পৃথকীকরণ সম্পর্কে আরও খানিকটা অগ্রসর হন। বার্ষিক বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিয়া তিনি সাকুল্য আয়কে তিন ভাগে বিভক্ত করেন অহিফেন, লবণ, আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক এবং সরকারী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির আয় সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। অন্য কতকগুলি আয়, যথা— দেওয়ানী ও প্রাদেশিক পূর্ত্ত ও পাবলিক ওয়ার্কস্ বিভাগের আয় এবং প্রাদেশিক রেইটস, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হয়। আবকারি, ষ্ট্যাম্প, বন, রেজিষ্ট্রেশন ও ট্যাক্সের আয় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট একটা নির্দ্দিষ্ট হারে ভাগাভাগি করিয়া লওয়া স্থির হয়। ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জ্জন এই ব্যবস্থাকে একপ্রকারে পাকাভাবে স্বীকার করিয়া লন এবং প্রদেশগুলিকে প্রয়োজন অনুযায়ী 'ডোল' বা বৃত্তি দিবার নিয়মও পুনঃ প্রবর্ত্তিত করেন। ১৯১৯ সালে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড বিধানে উল্লিখিত নীতিকে পুনরায় ঢালিয়া সাজা হয়। ইহার ফলে উপরি উল্লিখিত তিনটি ভাগের পরিবর্ত্তে ভারতীয় রাজস্বকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তন্মধ্যে আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক, আয়কর, লবণ কর, অহিফেন, রেলওয়ে, পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফস্ ও সৈন্য বিভাগের আয় সম্পূর্ণ ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য এবং ভূমি-রাজস্ব, ষ্ট্যাম্প, রেজিষ্ট্রেশন, আবকারি, পূর্ত্ত ও বন বিভাগের আয় প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্যরূপে স্থির হয়।

জাতি গঠন মূলক কর্ত্তব্যের ভার প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের উপর রহিল; কিন্তু এই গুরু কর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য তাহার হাতে যে অর্থ তুলিয়া দেওয়া হইল তাহা নিতান্তই অপ্রচুর। অন্যদিকে মোট রাজস্বের সারাংশই কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ভারত রক্ষার নামে ব্যয়বহুল সৈন্য বিভাগের জন্য নিজে গ্রহণ করিলেন। ১৯১৩ সাল হইতে ১৯২৯ সালের মধ্যে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের অনুমিত আয় শতকরা মাত্র ৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ এই সময় মধ্যে প্রাদেশিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ২২ ভাগ। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের অধিকাংশ অর্থ

ব্যয়িত হইয়াছে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ব্যয়বহুল শাসন বিভাগের জন্য। ফলে ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলির মোট বাজেটে ঘাটতি দাঁড়াইয়াছে ২৩ কোটী টাকার উর্দ্ধে এবং অর্থাভাবে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ও হিতকর কার্য্যের সূচনা সুদূর পরাহত রহিয়া গিয়াছে। অন্যদিকে ভারত গভর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৩৩ সালে ১০ কোটী টাকা উদ্বৃত্ত দাঁড়াইয়াছে। একমাত্র আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক হইতে ভারত গভর্ণমেণ্টের আয় ৩৪।০ কোটী টাকা (১৯২১-২২ সাল) হইতে ৫৩ কোটী টাকায় (১৯৩৫-৩৬ সাল) দাঁড়াইয়াছে। ঐ সময় মধ্যে লবণ-করের আয়ও ৬।০ কোটী টাকা হইতে ৮ কোটী টাকায় দাঁড়াইয়াছে। আয়কর হইতেও ভারত গভর্ণমেণ্ট তিন কোটী টাকা বেশী পাইয়াছেন। একদিকে ভারত গভর্ণমেণ্টের এরূপ আপেক্ষিক আর্থিক স্বচ্ছলতা ও আনুষঙ্গিক অপব্যয়, অন্যদিকে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের একটানা অর্থাভাব ও চারিদিকে দেশবাসীর অসহায় অবস্থা।

রাজস্বের সারাংশ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের গ্রহণ—প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের অসচ্ছলতা—জাতি গঠনে অর্থাভাব

তারপর আসিয়াছে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বাণী লইয়া ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন সংস্কার আইন। এই আইনমূলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের মধ্যে আর্থিক বিধিব্যবস্থা কিরূপে করা সঙ্গত হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার ভার অর্পিত হয় স্যার অটো নিমেয়ার নামক জনৈক ইংরেজ বিশেষজ্ঞের উপর। তিনি যে রায় প্রদান করিয়াছেন তাহার ফলে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের ভাগ্যে যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিবে তাহার সম্ভাবনা অন্ততঃ অদূর ভবিষ্যতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। নিমেয়ার রিপোর্টের সার কথা : সিন্ধুপ্রদেশ, আসাম, উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশের বাজেট-ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য ইহাদিগকে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করিবেন ; পাটের রপ্তানি শুল্ক যাহার সম্পূর্ণ অংশ ভারত গভর্ণমেণ্ট এতকাল পাট উৎপাদনকারী প্রদেশসমূহের ন্যায্য আপত্তি উপেক্ষা করিয়া নিজে গ্রহণ করিতেছিলেন তাহার শতকরা ৬২।০ ভাগ এখন হইতে ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে দিবেন ; এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পর আয়-কর হইতে একটা অংশ ভারত গভর্ণমেণ্ট এমনভাবে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলিকে বিতরণ করিবেন যাহাতে দশবৎসর পরে ইহারা উর্দ্ধকল্পে মোট আয়-করের অর্দ্ধেক পাইতে পারে।

বিগত দেড়শতাধিক বৎসরের মধ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আর্থিক বিলিব্যবস্থার যেসব পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আজ পর্য্যন্ত প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলির উপর কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট তাহার আর্থিক প্রভুত্ব সামান্যই শিথিল হইতে দিয়াছেন। জনসাধারণের প্রতি তাহাদের নিতান্ত প্রাথমিক ও মৌলিক কর্ত্তব্যগুলি পালন করিতে অক্ষম হইয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলির মধ্যে আর্থিক ও অন্যবিধ ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দিবার নীতি (policy of decentralisation) স্বীকার করিয়া লইলেও এই সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে যেসব রদবদল হইয়াছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর

ফকিরের ভিক্ষা বলিলেও চলে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনমূলে নূতন প্রদেশ সৃষ্টি ও তাহাদের জন্য ব্যয়বহুল নূতন শাসন ব্যবস্থা ইত্যাদিতে একদিকে ব্যয় যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অন্যদিকে অধিক সংখ্যক প্রদেশের মধ্যে বিভক্ত হইয়া আয়ের পরিমাণও হ্রাস পাইয়াছে। নিমেয়ারের নির্দ্দেশানুযায়ী ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রদেশগুলিকে যে টাকা দিবেন তাহার দ্বারা অতিরিক্ত শাসন ব্যয়ের বাজেট-ঘাটতিই শুধু পূরণ হইবে এবং উচ্চ বেতনভোগী আমলাতন্ত্রেরই পেট ভরিবে; দেশহিতকর কর্ম্মানুষ্ঠানের সুবিধা অতি সামান্যই তাহা হইতে পাওয়া যাইবে।

অবশ্য এগার বার বৎসর পরে স্যার অটো নিমেয়ারের রিপোর্টানুযায়ী আয়-কর হইতে ৩॥০—৪ কোটী টাকা প্রদেশগুলির পাইবার সম্ভাবনা। পাট-শুল্ক বাবদ যে ৩॥০ কোটী টাকা পাওয়া যায় তাহা হইতে পাট উৎপাদনকারী প্রদেশগুলির (বঙ্গ, বিহার ও আসাম) ভাগ্যে ২২।২৩ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইতে পারে। এগারটি প্রদেশের মধ্যে এই টাকা ভাগ করিয়া দিলে প্রত্যেকের ভাগে যাহা পড়িবে তাহার পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই সামান্য এবং তাহাও পাইতে বিলম্ব আছে। এদিকে সমস্ত জাতি স্বাস্থ্যহীন, শিক্ষাহীন, মনুষ্যত্বের সর্ব্বপ্রকার সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়া একটা বিরাট নিঃস্বতার শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অথচ অন্যদিকে আমাদের চোখের সম্মুখে এক একটা জাতি অটুট সঙ্কল্প ও অমিত বিক্রমে যুগের পথ যেন এক এক পলে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে।

ক্রমশঃ

চিঠি

(Y. Lebedinsky)

অনুবাদক—গোপাল ভৌমিক বি-এ

প্রিয় কম্‌রেড্ ক্লিমিন্,

আমি এখন N-skএর ষ্টেশনে। বাহনের খোঁজে ৎবেভের চলে যাবার পর চারটি ঘণ্টা অতীত হ'ল। ষ্টেশনটি ছোট্ট—আর আমি সম্পূর্ণ একা। যুদ্ধের পূর্বের বিজ্ঞাপন আর ঘোষণা-গুলি পড়্‌লাম—আজকের দিনের সঙ্গে তাদের কত অসামঞ্জস্য। অদ্ভুত একটা ট্র্যান্স্‌পোর্ট পোষ্টারের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম। তারপর আমি স্থানীয় চেকা বিভাগে গেলুম—সেখানে দোয়াত কলম দেখে, আমার মনে এখন যে সব চিন্তা জাগ্‌ছে, তা' তোমাকে খুলে' লিখ্‌বার লোভ সংবরণ করতে পার্‌লুম না। তোমাকেই কেন যে এ চিঠি লিখ্‌তে মনস্থ করলুম, আশা করি কম্‌রেড্ ক্লিমিন্, তুমি সে কথা বুঝ্‌বে। তোমার বোধ হয় মনে আছে যে N-sky divisionএর রাজনৈতিক বিভাগে তুমি প্রথম যেদিন আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ব'কেছিলে, তখন তুমি দলের একজন পুরাতন সভ্য এবং ডিভিসনের কম্যাণ্ডার। আর আমি? আমি তখন অপক্ক একটি বাচাল যুবক। তুমি ধীরভাবে আমার অদ্ভুত সব যুক্তি শুনে' গেলে—তারপর ধীরে ধীরে আমার মিথ্যা-যুক্তির ভিত্তি ভেঙ্গে দিয়ে, আমাকে মার্কসিজ্‌মের (Marxism) দিকে টেনে নিলে। তুমি ধীরভাবে আমাকে শ্রেণীসংগ্রাম ও সোস্যালিজ্‌মের ক খ গ শিখিয়ে দিলে। তার অনেক পরে আমি যখন সৈন্যদলে, তখন অবশ্য আমি তোমাদের পার্টিতে ঢুকি—তবু আমার কম্যুনিষ্ট হওয়ার প্রথম হাতে খড়ি তোমার কাছে! তোমার উপদেশেই আমি পাকা বিপ্লবী কম্যুনিষ্ট হ'তে পেরেছিলাম। সেই জন্যই মা বা অন্যান্য বন্ধু যারা আমায় ভালবেসে এসেছে চিরকাল, তাদের কাছে চিঠি না লিখে, তোমার কাছেই এ চিঠি লিখ্‌চি। তুমি যে আমার দীক্ষাগুরু!

আমি যদি মরি তবেই তুমি এ চিঠি পাবে। মৃত্যুবিষয়ে আজ আর আমার অনিশ্চয়তা নেই। আমার পক্ষে মরাই ভাল—জীবনে আর আমার প্রয়োজন নেই—আমি আর মানুষ নই—মানুষের খোলস মাত্র। আমার আত্মা এখন সম্পূর্ণ শূন্য। আমার মৃত্যুতেও কম্যুনিজ্‌মের অন্তত কিছু উপকার হোক্। তুমি যাতে আমায় বুঝ্‌তে পারো, সেজন্য তোমায় সব কথা খুলে' বল্‌ব।

গত বছর যখন চতুর্দিকে ষড়যন্ত্র ধরা প'ড়ে গেল, তখন আমরা পাঁচজন 'হোয়াইট্' কর্মচারীকে গুলি করতে নিয়ে যাচ্ছিলাম।

সে রাতটি ছিল কুয়াশায় ভরা—কুয়াশার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল মোহন চাঁদকে—তার চতুর্দিকে ছিল একটা আংটি। চন্দ্রালোকিত বড় রাস্তার উপর দিয়ে আমাদের 'লরি'

যাচ্ছিল। লেজাভিন্ ছিল আমাদের সাথে। নরহত্যা জীবনে সে এই প্রথম দেখ্তে যাচ্ছিল—অস্বাভাবিক একপ্রকার প্রফুল্লতা দিয়ে কোনরকমে সে নিজের স্নায়বিক দৌর্বল্যকে দাবিয়ে রাখ্ছিল। সে উৎসাহের সঙ্গে প্রথম তোমার সঙ্গে কথা বল্লে, তারপর কথা বল্তে লাগ্ল আমার সঙ্গে। তুমি দৃঢ় এবং ব্যবসায়ী সুলভ কণ্ঠে তার কথার উত্তর দিচ্ছিলে—তোমার কথার ভাবে মনে হচ্ছিল যেন তুমি বল্ছ ঃ "ভাণ ক'রো না হে ছোক্রা, তুমি ত' আর তোমাতে নেই !" আমি তাকে এক একটি কথায় জবাব দিচ্ছিলাম, আমার কথা বলার ইচ্ছা ছিল না মোটেই সারাদিনের খাটুনির পর রাত্রির সেই নীল প্রশান্তিতে আমি ধীরে নিঃশব্দে বিশ্রাম করছিলাম। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে' দেখ্ছিলাম 'ওয়াগন'টার মধ্যে ওদের বিষণ্ণ মুখ ; ছোক্রাদের বিবর্ণ মুখ দেখে আমার মনে প'ড়ে যাচ্ছিল কোথায় আমরা চ'লেছি ! ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছিলুম ; তবু এমন জিনিসের অভিজ্ঞতা সেই ত' আমার প্রথম নয়।

একটা মঠের চারিদিক ঘেরা একটা জঙ্গলে আমাদের 'লরি' ঢুক্ল—কুয়াশায় জঙ্গলের গাছগুলি ম্যাজিকের মত, মৃত্যুর ছায়ার মত চোখের সাম্নে নাচ্তে লাগ্ল। মাঝে মাঝে এক একটা জায়গা ফাঁকা—সবুজ ঘাসে ঢাকা। আমরা একটা সরু পথ ধরে একটা ফাঁকা জায়গায় পৌছালুম। সেখানে দেখ্লাম ভাঙ্গা একটি পাথরের খনির শূন্য গর্ত—বরফ ঢাকা কিন্তু গভীর।

কারো মুখে কথা নেই মৃত্যুর সম্মুখীন হ'য়েও বন্দীদের মনে ভয় ছিল না। আমি ওদের মনের শেষ কথা চিন্তা করার চেষ্টাও করিনি'। শীঘ্রই সব শেষ হ'য়ে যাবে বন্দুকের গুলিতে, নিকটের বার্চের গাছ থেকে তুষার ঝ'রে ঝ'রে প'ড়্বে আর পাঁচটি বন্দীর মৃতদেহ ঢ'লে প'ড়বে খনির গভীর গর্তে। আর আমরা আবার রাত্রির অপার্থিব নীরবতা ভেদ ক'রে ফির্ব।

কিন্তু যেমন ভেবেছিলাম, তেমনটিত' ঘট্ল না। নীচু গলায় তুমি বল্লে : "পোষাক খোল, বন্ধুগণ !" বন্দীদের পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টিবিনিময় হ'ল। একজন ফার জ্যাকেট্ খুলে' দূরে ফেল্ল। অন্যরাও তাই কর্ল।

"না সব পোষাক খোল" তুমি বল্লে ঃ আর আমাদের জানানোর জন্যই যেন যোগ দিলে "উলঙ্গ ক'রে তোমাদের গুলি করা হ'বে।"

ভয়ঙ্কর নীরবতার মধ্যে কম্রেড্রা স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল—তাদের নীরবতা দেখে মনে হচ্ছিল যে তোমার সঙ্গে তারা একমত—উলঙ্গ বন্দিদের দেহে গুলি করতে তারা রাজী আছে। চতুর্দিক মৃত্যুর মত নীরব—কেবল দূরে রাস্তার মধ্যে আমাদের 'লরির' মৃদুগুঞ্জন ধ্বনি ! বন্দীরা প্রতিবাদ করতে সুরু কর্ল—তাদের প্রতিবাদ তোমার মনে আছে বোধ হয়। তাদের একজন বল্ছিল যে মৃত্যুযন্ত্রণা কমানোই তোমার উচিত—আর একজন বল্ছিল, যে আমরা তাদের দুর্ভাগ্যকে উপহাস করছিলাম মাত্র। আর সেই "Black hundred" এর বুড়ো স্কুলমাষ্টার—কাঁচাপাকা দাড়ি আর ঢালু যার কাঁধ দুটি—সে ত কাঁদতেই সুরু করলে। সে বল্লে যে তার

ইনফ্লুয়েঞ্জা—তার উপর তাকে জামা খোলার আদেশ করা সত্যই অন্যায়। আমি জান্‌তাম যে ও পুলিশের গুপ্তচর ছিল—ছেলেদের উপর গোয়েন্দাগিরি করত; জান্‌তাম ও আমাদের ঘৃণার চোখে দেখ্‌ত—তবু আমার নিজের শরীর কাঁপতে সুরু কর্‌ল যেন আমার উপরই পোষাক-খোলার হুকুম হ'য়েছে। আবার লেজাভিনের কম্পমান গলা তোমাকে বল্‌ছিল, "কম্‌রেড্ ক্রিমিন্, তোমার এ কাজ করা উচিত নয়। ওদের নিয়ে ঠাট্টা করা কি তোমার উচিত? কেন এমন করছ?"—ওর গলায় অশ্রু-বাষ্প! একজন কম্‌রেড্ রেগে লেজাভিন্‌কে গালি দিতে সুরু করলে। তুমি বল্‌লে "পোষাকের অপব্যয় আমি সহ্য করতে পারি না। ওগুলি রিপাব্লিকের জন্য ব্যবহৃত হ'বে। এক মুহূর্ত্ত পরে ত আর ওদের পোষাকের কোন দরকার হ'বে না"—এবং লেজাভিনের দিকে ফিরে তুমি ধীরে ধীরে বল্‌লে: অবাধ্যতার প্রশ্রয় দিও না। তুমি 'লরি'তে গিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা কর। বন্দীরা তখন বুঝ্‌তে পার্‌ল যে পোষাক ত্যাগ ছাড়া আর উপায় নেই। গাছের গুঁড়ির উপর ব'সে তারা বুট্, পায়জামা প্রভৃতি সব পোষাক খুলে ফেল্‌ল। উজ্জ্বল বৃক্ষছায়ায় ওদের অনাবৃত দেহ অদ্ভুত দেখাচ্ছিল—সবুজ আর হলুদ রঙের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। চন্দ্রালোকে অপর সকলকে দেখাচ্ছিল আনীল-শ্বেত...উঃ কি দুর্ব্বোধ নীরবতা, অদ্ভুত, দুঃস্বপ্নের মত।

আমি গ্রীষ্মকালে বহুবার এই জায়গায় গিয়েছি। দ্বিধা-বিভক্ত বৃদ্ধ পাইনগাছটা, যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, সেটা আমি চিনি—আমি তার প্রতিটি পল্লব চিনি। সে গাছটার গোড়ায় কুঠারের গভীর ক্ষতচিহ্ন গুলিও আমি চিনি।...

আমি এই পাইনটাকে ভালবাস্‌তুম...তবু কেমন ক'রে যেন এটাকে আমার অদ্ভুত এবং বিরোধী ব'লে মনে হত। আমার মায়ের বিষয়ে দুঃস্বপ্ন এই অদ্ভুত বিরোধিতার সঙ্গে মিশে থাক্‌ত—সেই মুহূর্ত্ত, যে মুহূর্ত্তে মা এসে দাঁড়িয়েছেন আমার পাশে—নিষ্ঠুর, নির্লিপ্ত—আর আমার হাত বাড়ানো—সাহায্যের জন্য করুণ প্রার্থনা চোখে মুখে। কুয়াশায় বন্দীদের পোষাক খোলার সেই দৃশ্য আমার মনে পড়লে ভেসে উঠ্‌ত উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে হ্রদের তীরে স্নান করার দৃশ্যের কথা! অদ্ভুত সংমিশ্রণ সন্দেহ নেই—কিন্তু আমার সন্দেহ হয় আমার চিন্তাগুলো এলোমেলো হ'য়ে যেত। আর প্রতিধ্বনিত উপত্যকা যে চিরতরে কল্পনাকে নির্ব্বাসন দিয়েছে, সে ভালই হ'য়েছে।

এই হত্যাকাণ্ডের পূর্ব্বের আমাকে কি তোমার মনে আছে? চেকায় আমার কাজের উৎসাহের কথা কি তোমার মনে আছে? Enquiry Register-এ হালকা মনে কত কয়েদ ফর্মে আমি স্বাক্ষর করতাম—কতজনের মৃত্যুর ওয়ারেণ্ট আমি নির্ভীকভাবে জারী করেছি, কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং এখনও আছে যে যে-ভীতি আজ জগতের লোকের জীবনে রাজত্ব করছে তার হাত থেকে মুক্তি পাবার রক্ত-মাখা এই একমাত্র পথ! আমি বন্দীদের করুণা করতাম, তাদের দুঃখে দুঃখিত হতাম কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কম্যুনিজমকে সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে হলে বিপ্লবের বিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল লোকদের হত্যা করা ছাড়া আর উপায়

জাগে তার অপূর্ব্ব উল্লাস। শেফালির বৃন্ত সম
অরুণ কপোলে তার জীবনের আভা মনোরম ;
মৃদু ধমনীতে তার মহাশক্তি চলিছে বহিয়া।
কালো আঁখি চেয়ে থাকে অনন্ত জিজ্ঞাসা-বাণী নিয়া
রাত্রির আকাশ সম,—যেন কোন্ প্রভাতের লাগি'
স্তিমিত তারকাগুলি সুদূর শূন্যের পারে জাগি'।
সে প্রভাত আসে। বালিকা যুবতী হয়। তেজস্বিনী
শক্তিময়ী দৃপ্তমূর্ত্তি নারী অই। চিনি তারে চিনি।
কণ্ঠের বাণীতে তার শুনিয়াছি বজ্রের নির্ঘোষ,
দৃঢ় তার পদক্ষেপে কাঁপিয়াছে সকল সন্তোষ
ক্ষুদ্র গৃহ-কোণে। এ বাংলার সংকীর্ণ জীবনপথে
চলিবে যে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলি' নবীন মুক্তির রথে
নব নব আদর্শের জয়স্তম্ভ রচি' দিকে দিকে,
সমাজের অঙ্গে অঙ্গে সুগভীর চক্র-লেখা লিখে
জয়তু সে চিরন্তনী অনাগতা নারী।

যে বছর চলে' গেল তার দিকে ফিরে চাইলে দু'টো ছবি চোখের সামনে স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে ওঠে। একটা হ'চ্ছে কতকগুলো জল্লাদে মিলে ষড়যন্ত্র করে' পৃথিবীটাকে একটা কসাইখানা বানিয়েছে, সেখানে আত্মসম্মান জ্ঞান নেই, বুদ্ধি নেই, বিবেক নেই, যুক্তি নেই, আছে শুধু পশুবলের আস্ফালন আর বর্ব্বরতার বড়াই। মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্দ্ধমান যাত্রাপথে বিজ্ঞান যে শঙ্খধ্বনি করে' তাকে আশীর্ব্বাদ করে' এগিয়ে চলে, তা এইসব জল্লাদের দল বিশ্বাস করেনা। বিজ্ঞানের শুভ আহ্বানে বর্ত্তমান যুগে মানব সমাজের যে অবশ্যম্ভাবী রূপান্তর ঘটবে তার কথা চিন্তা করলেও এরা আতঙ্কে শিউরে ওঠে। সমাজের সেই আসন্ন নবরূপ নাইট্‌মেয়ারের মত এদের ঘাড়ে সব সময় চেপে রয়েছে। বহুদিন ধরে' যত্ন করে' গড়া ধনতন্ত্রের সৌধ ধূলিসাৎ হ'য়ে যাবে এই হ'ল এদের আক্ষেপ। শোষণ করা পুঁজির উপর গদিয়ান হ'য়ে বসে' শোষিতদের সামনে রক্তচক্ষু কপালে তুলে আর কালাপাহাড়ী তাল ঠোকা চ'লবেনা এই হ'ল এদের দুঃখ। এরা ভাবে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হ'চ্ছে টর্পেডো-বোট্, সাব্‌মেরিন, এ্যারোপ্লেন আর মেসিনগান্ আবিষ্কার করে' গোপনে, অতর্কিতে, হাজার হাজার মানুষকে একসঙ্গে কি ভাবে পৃথিবীর কোল থেকে বিলুপ্ত করা যায় তারই পথ বাতলানো, যন্ত্রপাতি যা' তা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মেদস্ফীতির জন্য। তাই আজ বৈজ্ঞানিকেরা পর্য্যন্ত ঘুঁষ খেয়ে এইসব কসাইদের প্রাচীন, অমর, অব্যয় ধর্ম্মের স্তবগান গাইতে সুরু করেছে, বস্তুর মধ্যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের খেঁই হারিয়ে ফেলে এরা আবার সেই অন্ধকার যুগের কুয়াশাপুঞ্জ সৃষ্টি করে' মানুষকে বলছে ওর বাইরে আর চেওনা, কিছু নেই, ফাঁকা। এই জল্লাদ-গোষ্ঠীর মন্ত্র হ'চ্ছে ফ্যাশিজম্। ফ্যাশিজম্ আর সাম্রাজ্যবাদ একই গাছের দু'টো ডাল, গাছ হ'চ্ছে ধনিকবাদ, আর সেই গাছের মূল হ'চ্ছে স্তরবিন্যস্ত সমাজ। এই সব ফ্যাশিস্ত কসাইয়েরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে সংহার কৌশল আয়ত্ত ক'রছে। এর পাশে আর একটা ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হ'চ্ছে যুগের পট পরিবর্ত্তনে সমাজের সেই অবশ্যম্ভাবী রূপান্তর দেখবার জন্য মানুষের আগ্রহ বেড়ে গেছে শতগুণ, তাদের অনুপ্রেরণা, উৎসাহ,

বিশ্বাস, ধৈর্য্য ও শক্তি বেড়ে গেছে হাজারগুণ, তাদের প্রতিজ্ঞা লক্ষগুণ দৃঢ় হ'য়েছে। তাই তারা শুভেচ্ছু, বিজ্ঞানধর্ম্মি, প্রগতিকামী সমস্ত মানুষকে বৃহত্তম সংখ্যার অর্থাৎ জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য আহ্বান ক'রছে। দেশে দেশে সমস্ত মানুষকে একসাথে মিলিত হ'য়ে মোহড়া গড়ে' ফ্যাশিস্তদের সামনে নির্ভীকভাবে দাঁড়াবার জন্য তাগিদ এসেছে। আজ বিশ্বের বুকে ফ্যাশিস্তদের ক্রুর চক্রান্তে যে ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি হ'য়েছে তাকে প্রতিরোধ ক'রবার জন্য চারিদিকে জনগণের মিলন আহ্বানের বজ্রগম্ভীর প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। পুরোহিতের আংরাখার পিছনে যে পিশাচ আত্মগোপন ক'রে ছিল, এখনও রয়েছে, আজ তাকে টুঁটি টিপে মারবার জন্য সকলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ঘুঁষখোর বৈজ্ঞানিকের সস্তার কারসাজি তারা বুঝতে পেরেছে। তারা বল্‌ছে মানুষের ন্যায্য অধিকার নিয়ে আর ছিনিমিনি খেলা চ'লবেনা. তাদের অর্থনৈতিক-সাম্য, রাজনৈতিক সমাধিকার শুধু মুখের দাবী নয়, বিজ্ঞানের স্বীকৃতি, ইতিহাসের অবিচলিত বিচার, তাদের সমবেত কণ্ঠ হ'তে আজ তাই খরমূর্চ্ছনায় উৎসারিত হ'চ্ছে :

"Oh. Subterranean fires, break out !
Tornadoes, pity not
The petty bourgeois of the soul,
The middleman of God !
Who ruins farm and factory
To keep a private mansion
Is a bad land-lord, he shall get
No honourable mention." (C. Day Lewis)

১৯৩৯ সালে পা দিয়ে ১৯৩৮ সালের দিকে ফিরে চাইলে যে দু'টো ছবি পাশাপাশি সুস্পষ্ট হ'য়ে ভেসে ওঠে এই হ'ল তার ফ্যাকসিমিলি। এইবার একে একটু পরিবর্দ্ধিত করে' বিশ্লেষণ করা যাক।

যে বীর রমণী দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন "Better to die on one's feet than live on one's knees"—তিনি লা প্যাশিওনারিয়া নামে পরিচিত এবং তিনি একথা রণক্লান্ত স্পেনের জনগণকে আহ্বান করে' বলেছেন। ১৯৩৬ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত তিনি কি ভাবে স্পেনের রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ফ্যাশিস্ত-আক্রান্ত স্পেনকে অনুপ্রাণিত ক'রে আসছেন তা কারও অজানা নেই। গত ১৬ই অক্টোবর, মাত্র আড়াই মাস আগে আন্তর্জ্জাতিক সৈন্যবাহিনী স্পেনের রণক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়েছে এবং স্পেনের পিপ্‌ল্‌স্ আর্ম্মির পক্ষ থেকে ভালেডর তাদের বলেছেন "Tell your country men that when a people is determined to be free no power on earth can enslave them. Spain will never be Fascist while there is an anti-Fascist left in Spain." আন্তর্জ্জাতিক সৈন্যবাহিনীর একমাত্র ভারতীয় সৈনিক গোপাল মুকুন্দ হুদ্দার গত

১৭ই ডিসেম্বর ভারতবর্ষে পৌঁছেচেন এবং তার মুখে আমরা শুনেছি ভালেডরের কথা কতখানি সত্যি। আড়াই বছর ধরে' স্পেন অক্লান্ত সংগ্রাম করছে শুধু ফ্যাশিস্ত ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে নয়, ইতালী, জার্ম্মাণি, ব্রিটেন সকলের বিরুদ্ধে। ফ্রাঙ্কোর দল আর কিছু না পারলেও বাইরের সঙ্গে গণতান্ত্রিক স্পেনের সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্যের যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে, নিদারুণ শীতের মধ্যে স্পেনের গণতান্ত্রিক সৈন্যবাহিনীকে অনাহারে সংগ্রাম করতে হয়েছে। এত কষ্ট ও অসুবিধার মাঝখানেও তারা একটুও দমে নি। আজ এই আড়াই বছর সংগ্রামের জমা-খরচ করলে জমার দিকে তাকিয়ে ফ্রাঙ্কোর অহঙ্কার করার কিছু নেই, কিন্তু গণতান্ত্রিক স্পেনের আশান্বিত হবার কারণ রয়েছে যথেষ্ট। নানা রণাঙ্গনে তারা যে রণকুশলতার পরিচয় দিয়েছে তা বিশ্বের ইতিহাসে সত্যিই বিরল। বিশেষ

লা প্যাসিওনারিয়া

করে রণাঙ্গনে গণতন্ত্রীদের অসীম ধৈর্য্য ও শক্তির পরিচয় পেয়ে ফ্রাঙ্কোকে নিরাশ ত' হতে হয়েছিলই। এমনকি তার সমবেদনাতুর সখারা পর্য্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। তা ছাড়া সমস্ত সমদক্ষেরা বিশ্বাস করেন যে এই বছর গ্রীষ্মের মধ্যে সরকার পক্ষের সামরিক শক্তি আশাতীত পরিমাণে বেড়ে যাবে। 'যাবেই'; কারণ ক্যাম্পো মিনোর মত কৃষকেরাও আজ সেনাধ্যক্ষ, মাঠের চাষীরা আজ সমরক্ষেত্রে নির্ভীক সৈনিক। তাই ইংরেজ কূটনীতিকরা মুসোলিনীর সঙ্গে একটা কিছু বোঝাপড়া করে' স্পেনে শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য ভীষণ উতলা হয়ে উঠেছিলেন কিছুদিন আগে। কিন্তু রিপাবলিকান পররাষ্ট্রসচিব সেনর দেল ভেয়ো বেতার বক্তৃতায় স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে স্পেন চেকোশ্লোভাকিয়ার পথ অনুসরণ করবে না। চেম্বারলেন সাহেব আর একদফা মিউনিক অভিনয়ের আশা করে তার চেলা লর্ড হ্যালিফাক্সের সঙ্গে প্যারিস যাত্রা করেন। এর পূর্ব্বে লর্ডস্ সভায় মুসোলিনীর থিসিস গ্রহণ ও ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তি বলবৎ করার সময় হ্যালিফাক্সের বক্তৃতা থেকে ইংরেজের মনোভাব স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল। ফ্রাঙ্কোকে সমররত জাতির অধিকার দিতে ফরাসী মন্ত্রীসভা রাজী হয় নি, কারণ ফ্রান্সের আত্মরক্ষার এতটুকু ছিদ্রও আর কোনোদিকে থাকে না তা হ'ল, এবং আন্তর্জ্জাতিক শান্তিকামীদের সভায় নিয়োনব্লুম এই জঘন্য প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করেন। বার্সেলোনাতে গণতান্ত্রিক পপুলার ফ্রণ্টের ১৪টি পোলিটিকাল পার্টি এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার জারী করে সে তাদের আড়ালে স্পেন সম্বন্ধে বৃহৎ

রাষ্ট্রগুলির কোন মীমাংসাকেই তারা স্বীকার করে নেবে না এবং স্পেন সমস্যা সম্বন্ধে মিউনিকীয় বিচার আদৌ চলবে না। এই হল গণতান্ত্রিক স্পেনের বর্ত্তমান মনোভাব। হিসেবনিকেশ করার সময় আজও আসেনি তবু গত বছরে বেশ স্পষ্টই বোঝা গেছে যে স্পেনে ফ্যাশিজম্ কায়েম করা সহজসাধ্য নয়, সম্ভবও নয় কারণ স্পেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে ফ্যাশিস্তবিরোধী একজন লোকও যতদিন স্পেনে বেঁচে থাকবে ততদিন স্পেন সংগ্রাম করবে, বশ্যতা স্বীকার করবে না।

মিঃ হুদার

সাম্রাজ্যবাদের এই প্রচণ্ড ধ্বংসলীলার প্রতিধ্বনিতে অনেক কবির কল্পনার সিংহাসন কেঁপে উঠেছে, তাঁরা আজ মাটিতে নেমে এসে, বিপন্ন জনসাধারণের পাশে দাঁড়িয়েছেন। শিল্পীর কাছে, কবির কাছে আমরা তাই প্রত্যাশা করি, সে জীবনের উপর তাঁরা তুলির আঁচড় টানেন, বা ছন্দ রচনা করেন, সে জীবন বাস্তব হোক্ আমাদের আশা, আনন্দ, বেদনা তার মধ্যে ফুটে উঠুক এই আমাদের আজকার চাহিদা, কিন্তু এমন অনেক কবি ও শিল্পীর আমদানি হয়েছে আজকাল, যাঁরা ঐ পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিকের মত কবির মুখোস পরে জীবনের কদর্য্য ব্যাখ্যা ক'রেছেন। তাঁদের মতে এই অত্যাচার এই নৃশংসতা মঙ্গলের জন্য, সভ্যতার জীবনরক্ষার জন্য। তাঁরা বলেন মানুষের রক্তস্রোতে সব পঙ্কিলতা দূর হ'য়ে যাচ্ছে, সভ্যতার ভিত্তিভূমি গড়া হচ্ছে সমরক্ষেত্রে গলিত মৃতদেহের স্তূপের উপর। এই শ্রেণীর একজন উল্লেখযোগ্য কবি হ'চ্ছেন ইয়োন নোগুচি। জাপান যে চীনকে গ্রাস করবার জন্য যুদ্ধ করছে সে আর কিছু নয় এশিয়াবাসীদের আয়ত্তে আনবার জন্য, বৃহৎ এশিয়াতিক সভ্যতার প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য। বর্ত্তমান চীন-জাপান যুদ্ধের সমস্ত দায়িত্ব চিয়াং কাইসেকের, কারণ মিথ্যে ঝগড়া দ্বন্দ্ব না করে জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেই এই অত্যাচারের প্রয়োজন হত না এবং তাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে এশিয়াতিক নোগুচীয় সভ্যতার সৌধ গড়া সহজ হ'ত। কিছুদিন আগে নোগুচি যে সব পত্রক্ষেপ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর কাছে তার সার মর্ম্ম হ'ল এই। রবীন্দ্রনাথের উত্তরে তাঁর শিল্পীসুলভ মনোভাবেরই

পরিচয় পাওয়া যায়। আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ করে' চীনের সহরে, গ্রামে, ঘরে ঘরে যে আগুন জ্বালান হচ্ছে, সে আগুন আর যাই হোক্ সভ্যতার জ্যোতির্ম্ময় আলোক নয়, তা বর্ব্বরতারই দাবানল। কিন্তু চীনের উপর এই দাবানল জ্বালিয়ে সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করা অত সহজ হবে না যা কবি নোগুচি তাঁর বিকৃত কল্পনায় ভাবছেন। অবশ্য ক্যাণ্টন্ ও হ্যাঙ্কাও পতনের পর চীনের অনেকগুলি সহর জাপানীদের আয়ত্তে এসেছে, কিন্তু তাতে হতাশ হবার কিছু নেই। কারণ ক্যাণ্টন্ ও হ্যাঙ্কাও পতন একটা বিস্ময়কর ঘটনা। অন্যান্য সময়ে চীনেরা যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যে ভাবে সংগ্রাম ক'রেছে, এ-সময় তা একেবারেই করে নি। গত ২১শে অক্টোবর জাপানীরা ক্যাণ্টনে প্রবেশ ক'রলে চীনেরা তাদের কোন বাধা না দিয়েই সহরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে চলে যায়। এতে সকলে একটু অবাক্ হয় এবং অবাক্ হবারই কথা। কিন্তু ঠিক চারদিন পরে যখন জাপানীরা হ্যাঙ্কাও নিলে তখন সকলে ভাবলে এইবার চীন নিশ্চয়ই জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রছে। কিন্তু ২৪শে অক্টোবর লণ্ডনস্থ চীনারাজদূত কুওতাই-চাই এবং ২৮শে অক্টোবর চিয়াং কাইসেকের ঘোষণা থেকে এ-ধারণা যে ভুল ও অমূলক তা' প্রমাণিত হল। তাঁরা জানিয়ে দিলেন চীনের এখনও যা অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ সঞ্চিত আছে তাতে সে আরও বহুদিন সংগ্রাম করতে পারবে, তা' ছাড়া হ্যাঙ্কাও দখল করে জাপানীদের অসুবিধাই হবে বেশী, কারণ তাদের সৈন্যদের চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। এ-কথা আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি এই জন্য যে সম্মুখ-সমর চীনাদের রনকৌশল নয়। গরিলা কৌশলে শত্রুপক্ষের সৈন্য ছত্রভঙ্গ হলেই তাদের সুবিধা। এই কারণেই জাপান চীনের কাছে গত জানুয়ারী মাস থেকে অনেকবার পরাজিত হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে হিট্‌লার অষ্ট্রিয়া আক্রমণ করলে যখন আমাদের সকলের দৃষ্টি য়ুরোপে গিয়ে পড়ল, তখন শোনা গেল যে দূর প্রাচ্যে জাপানের ভীষণ হার হয়েছে। তারচোয়াং-এ (দক্ষিণ শাণ্টং) জাপানী সৈন্য এত বেশী সংখ্যায় নিহত হয়েছিল যে তাদের চালানী সৈন্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয় এবং বহুদিন পর্য্যন্ত প্রতি-আক্রমণ করার মত শক্তি সঞ্চয় করতে তারা পারেনি। এই ধরণের জাপানীদের পরাজয়ের ঘটনাবলীর এটা মাত্র একটা দৃষ্টান্ত। এর প্রধান কারণ হচ্ছে দুটো প্রথম কারণ হচ্ছে যে চীন একটা বৃহৎ দেশ এবং তার অফুরন্ত নরশক্তি; দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে চীনাদের গরিলা রণকৌশল। এই সম্বন্ধে আমি গত মে মাসের "দি সোশ্যালিষ্ট ভ্যানগার্ড" পত্রিকা থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করছি ঃ

চিয়াং কাইসেক

1. The vastness of China and the prolific population represent a source of power with which Japan had not reckoned adequately. Those who followed the military tactics of Japan......must have observed that the largescale offensive on one front could be only maintained by remaining on the defensive on all other fronts.

2. More important is the spread of the practice of guerrilla warfare by the Chinese. Not only did masses of the people often come to the assistance of the regular troops, which provided some compensation for the inferior arms they wielded. But it also meant that Japan retained as a base only a few important towns and railway lines, whereas nearly the whole of the countryside remained unconquered in the hands of the chinese. It is also clear that China can muster far greater moral force to its aid as a victim State, than can Japan as the aggressor. And the strength of this moral force has shown itself again and again by the action of Chinese troops, students and workers. The success of guerrilla warfare, which demanded a great readiness to sacrifice, is a further proof of this. ("China Strikes Back" By Lee Chiang)

চীনের অষ্টম রুট্ আর্ম্মি ও অন্যান্য সৈন্যবাহিনীর রণকুশলতা দেখে বিশ্বাস হয় না যে তারা সহজে আত্ম সমর্পণ ক'রবে জাপানীদের কাছে। চীনেরা গরিলা সৈন্যদের কৃতিত্বের কথাও সকলে জানেন। আজ চীনের জনগণ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সাহস করে' ও ধৈর্য্য ধরে' দাঁড়াবার মত শিক্ষা পেয়েছে। মিস্ স্মেড্‌লে বলেছেন জাপানের পক্ষে চীনকে ধ্বংস করা কখনই সম্ভব নয়। তিনি অষ্টম রুট্ আর্ম্মি সম্বন্ধে বলেছেন :

"The 8th Route Army has its own methods of fighting, and these do not resemble those adopted in the Yangtse Valley and, up to now, in North China above the Yellow River. The 8th Route Army often gives up towns to the enemy. When they retreat from a town the entire population goes with them, carrying all the food from the place. In many such places the 8th Route Army forces are small, but they are the leaders of the 'partisans' and the entire people. They all go to the hills and surround the City. The Japanese enter an empty town or city. When they go out to get food they are attacked from all sides and driven back." (Manchester Guardian, February 10th, 1938).

সুতরাং ক্যান্টন্ ও হ্যাঙ্কাও পতনের পর টোকিও সহরে যে আনন্দের সোরগোল্ উঠেছিল তার জন্য আমাদের হতাশ হবার কিছু নেই। জাপানের সরকারী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে চীনের হতাহতের সংখ্যা হচ্ছে ১০০০,০০০ এবং জাপানীদের ৩৬১০৯। চীন সরকারের রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে যে জাপানী সৈন্যের হতাহতের সংখ্যা হ'চ্ছে ৫০০,০০০। মিথ্যা সংবাদ প্রচারে ও গুজব রটাতে জাপ-সরকার কি রকম পটু তা' আমরা সকলেই জানি। তা' ছাড়া চীনের কৃষক মজুর শুধু নয়, চীনের মেয়েরাও আজ সোৎসাহে সামরিক শিক্ষা নিচ্ছে এবং গত ২০ শে ডিসেম্বর রয়েটারের মারফত ম্যাদাম চিয়াং কাইসেক ঘোষণা করেছেন যে কোয়াংসির রাজধানী কুইলিন্-এ

মেয়েরা সামরিক শিক্ষা নিচ্ছে এবং সাধারণ সৈন্যদের মত জীবন যাপন ক'রছে। তাই বলছিলাম যে নোগুচির সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার আদর্শ চীনের মাটিতে রূপান্তরিত করা কাব্যিক স্বপ্নই থেকে যাবে।

হের হিট্‌লার তাঁর "Mein Kamf" এর মধ্যে লিখেছেন: Whoever really desire the victory of pacifist thought must give his whole-hearted support to the German conquest of the world. Therefore war first, afterwards perhaps pacifisin"—এবং তাঁর এই বিশ্বজয়ের যাত্রাপথে যে শান্তির অবতারের একমাত্র আন্তরিক সহানুভূতি আছে তিনি হ'চ্ছেন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন সাহেব। গত ফেব্রুয়ারী মাসে অস্ট্রিয়াকে কেন্দ্র করে' যে দুর্য্যোগ য়ুরোপে ঘনিয়ে ওঠে তা' নির্ব্বিবাদে কেটে যায় ১৩ই মার্চ্চ। অস্ট্রিয়া হিট্‌লারের কাছে আত্ম সমর্পণ করে এবং ১৬ই এপ্রিলের গণভোট প্রায় পুরোপুরি সমস্ত ভোটই পেয়ে হিট্‌লার ঘোষণা করেন; "It is the greatest achievment of my life". অস্ট্রিয়ান্ চ্যান্সেলার ডাঃ শুশ্‌নিগের অস্ট্রিয়ার গণতন্ত্র রক্ষার যে প্রতিশ্রুতি তা' পালন করা সম্ভব, হ'ল না নিগাসের মত তিনিও ট্র্যাজিক্ হিরোর ভূমিকা শেষ করে য়ুরোপের রাজনীতিক মঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন। তারপর চেকোশ্লোভাকিয়া। এইবার দুর্য্যোগ একটু বেশ ভালভাবেই ঘনিয়ে উঠ্‌ল, একটু আধটু মেঘের শব্দও শোনা গেল। সুদেতেন জার্ম্মানদের তৃতীয় রাইকের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য হিট্‌লার তাঁর চরম দাবী পেশ করলেন। ২০শে মে চারিদিকে সৈন্য সামন্তের সাজগোজ পড়ে' গেল। ২রা আগষ্ট রান্সিম্যান্ প্রাগ যাত্রা করলেন এই ব্যাপারে মধ্যস্থতা করিবার জন্য। ১৩ই সেপ্টেম্বর সুদেতেনরা উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করলে, তারা জানিয়ে দিলে যেন ছ' ঘণ্টার মধ্যে সুদেতেন এলাকা থেকে সমস্ত জরুরী আইন তুলে নেওয়া হয়। ব্যাপার গুরুতর দেখে শান্তিকামী চেম্বারলেন

ম্যাদাম চিয়াং কাইসেক

ডাঃ শুশ্‌নিগ

সাহেবের টনক্ নড়ে উঠ্‌ল, তিনি ১৫ই সেপ্টেম্বর জার্ম্মানীতে উড়ে গেলেন। ফিরে এসে ১৮ই সেপ্টেম্বর দালাদিয়ের সাথে দেখা করে' একটা খস্‌ড়া করে' ফেল্লেন। যার ভাগ্য নিয়ে পাশাখেলা চলছে সেই চেকোশ্লোভাকিয়া অন্তরালেই রইল। ২২ শে সেপ্টেম্বর তিনি আর একবার গেলেন, কিন্তু এইবার হিট্‌লারের হুম্‌কিতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মাস্ক প্যারেড্ আরম্ভ করে' দিলেন স্বদেশে। এতেও সুবিধা হ'ল না। ৩০শে সেপ্টেম্বর মিউনিকে হিট্‌লার মুসোলিনীর সাথে চেম্বারলেন দালাদিয়ে মিলিত হ'য়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার গণতান্ত্রিক সত্বা বিনাশের রায় দিলেন। হিট্‌লার বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর এর পর আর কোন দাবী নেই এবং চেম্বারলেন দালাদিয়ে তাই-ই বুঝে এলেন। এদিকে পার্লামেণ্টে চেম্বারলেন সাহেব গোঁজামিল দিয়ে তাঁর শান্তির ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে করতেই হিট্‌লারের দাবীর বহর ছুট্‌ল। ইঙ্গ-জার্ম্মান চুক্তি কাগজেই রইল, হিট্‌লার মেমেল্, উক্রেইন ও তাঁর হৃত উপনিবেশের পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। অস্ট্রিয়া দখলের পর গত ১৮ই মে জার্ম্মান ঔপনিবেশিক সঙ্ঘের প্রচার কর্ত্তা হের উইনিগ্ ঘোষণা করেছিলেন : "Now that Austria is incorporated in Greater Germany our need for colonies is of the most vital importance"; সেই ঘোষণা চারিদিকে আবার সশব্দে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ল। লিথুয়ানিয়া নাৎসীদের কাছে মাথা হেঁট ক'রলে পোল্যাণ্ড সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল উক্রেনাইন্‌দের মধ্যে নাৎসীদের সৃষ্টি দেখে। পলিশ্-সোভিয়েট চুক্তি বলবৎ করা হ'ল পুনরায়। বল্‌ক্যান্ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব য়ুরোপ ছাড়িয়ে অদূর ও মধ্য প্রাচ্য পর্য্যন্ত হিট্‌লারের পরিষ্কার দৃষ্টি প্রসারিত হ'ল। দক্ষিণ আফ্রিকার মন্ত্রী পীরো নাৎসীদের পথ সুগম করবার জন্য পোর্ত্তুগাল ও লণ্ডনে গোড়াপত্তন করতে লাগলেন। টাঙ্গানিকার পথে পথে সেখানকার অধিবাসীরা নাৎসীদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে বেড়াতে লাগল। এদিকে বৃটেনের রক্ষণশীলদল হঠাৎ চেম্বারলেনের উপর খাপ্পা হ'য়ে উঠলেন। ডাফ্ কুপার পদত্যাগ করলেন, ইডেন্ সাহেব চেম্বারলেন-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে লাগলেন। মুসোলিনী মধ্য য়ুরোপে জার্ম্মানির কৃতিত্ব দেখে টিউনিস ও কার্সিকার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লেন। ফ্রান্সে দালাদিয়ের ফ্যাসিস্ত বশ্যতার বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্টরা তীব্র অভিযোগ জানালে এবং দালাদিয়ে তাঁর ফ্যাসিস্ত নীতির প্রশস্তি গাইতে গিয়ে মার্সাই-এ কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে এক কড়া বক্তৃতা দিলেন। তারপরই দেখা গেল তিনি ফ্রান্সের ধনিক গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন। রেণোঁ শ্রমিক-স্বার্থ বিরোধী এক ব্যবস্থা করলেন, গণমত ও গণবিক্ষোভকে দাবিয়ে রাখবার জন্য দালাদিয়ের নির্য্যাতন চল্‌তে লাগল। ষ্ট্রাইকের সাড়া পড়ল এবং এই ষ্ট্রাইক বিফল করিবার জন্য দালাদিয়ের সুস্পষ্ট ফ্যাসিস্ত মূর্ত্তি ধারণ করলেন। কিন্তু ঠিক সত্য কাহিনী এ নয়। ব্যাপারটা আরও একটু তলিয়ে দেখা দরকার।

ব্রিটেনে ইডেন্, ডাফকুপার প্রমুখ রাষ্ট্রনেতারা চেম্বারলেন-নীতিকে প্রতিবাদ করে' যে জাতীয় ঐক্যের কথা বলছেন তার পিছনে একটা গূঢ় ইঙ্গিত আছে। ইঙ্গিত হচ্ছে এই যে এই সব

প্রতিবাদকারী রক্ষণশীল নেতারা ফ্যাসিজম্ বিরোধীতা করে' শ্রেণী নির্ব্বিশেষে জাতীয় ঐক্যের কথা বল্লেও তারা "playing objectively a progressive role" কারণ এতে সত্যকার প্রগতিপন্থী পার্টিগুলির কাজ উদ্ধার করবার একটী মস্ত সুবিধা আছে। আজ যদি ব্রিটিশ লেবার পার্টি নেতৃত্ব লোভ বর্জ্জন করে' অন্যান্য প্রগতিপন্থী দলগুলির সাথে যোগ দিয়ে ফ্যাশিস্ত-অভিমুখী ন্যাশানাল্ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে 'ইউনাইটেড্ ফ্রণ্ট' গড়তে চায়, এই হ'ল তার সুবর্ণ সুযোগ। অবশ্য মনে রাখতে হবে এই সঙ্গে যে এই রক্ষণশীল জাতীয় ঐক্যবাদীদের প্রোগ্রাম আর তাদের প্রোগ্রাম এক নয়। ব্রিটেনে ফ্যাশিস্তদের বিরুদ্ধে মিলিত দলসমষ্টি গঠনের এই হল মাহেন্দ্রক্ষণ। আর এদিকে ফ্রান্সেও নিরাশ হবার কিছু নেই। ফ্রান্সের 'পপুলার ফ্রণ্ট' গবর্ণমেণ্ট' নিপাত গেছে বলে চারিদিকে যে রব উঠেছে তা অর্থহীন। আসলে তার কোন হেতুই নেই। কারণ ফ্রান্সের সোশ্যালিষ্টরা পপুলার ফ্রণ্টের কার্য্যকারীতা দেখে বুঝেছে যে কম্যুনিষ্ট পার্টি ও অন্যান্য প্রগতিপন্থী দল গুলির সঙ্গে ঘরোয়া বিবাদ করে' কোন লাভ নেই বরং ক্ষতিই বেশী। গত ১০ই ডিসেম্বর দালাদিয়ে গবর্ণমেণ্ট ৭৪ ভোটে জয়ী হয়েছিল শুধু মধ্যবিত্তদের দোটানা মনোভাবের জন্য। মধ্যবিত্তরা দক্ষিণপন্থীদের সাহায্য করেছিল। সোশ্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্টরা একসাথে দালাদিয়ের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। দালাদিয়ে গবর্ণমেণ্টের এই সাময়িক বিজয়ে উতলা হবার এমন কিছু নেই বা এমনও বিশ্বাস করার কিছু প্রয়োজন হয় না যে ফ্রান্সে ফ্যাশিস্ত গবর্ণমেণ্ট কায়েম হল, 'পপুলার ফ্রণ্ট' গবর্ণমেণ্টের পতন হল। রেডিক্যাল্ পার্টির সভ্যেরা দালাদিয়ের প্রতি নিছক ব্যক্তিগত সহানুভূতির বশে ভোট দিয়েছে তাতে কারও সন্দেহ নেই। আরও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে ২৯ জন রেডিক্যাল পার্টির সভ্য অনুপস্থিত ছিল এবং তিনজন দালাদিয়ের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। তা' ছাড়া মিউনিক্ চুক্তির পর থেকে ফ্রান্সের সোশ্যালিষ্ট পার্টির মধ্যে দালাদিয়ে-নীতি সম্বন্ধে যে মতবিবাদ চলছিল তার জন্য গত ২৬শে ডিসেম্বর পার্টির একটি সভা হয়। সভায় লিওন ব্লুমের সম্মিলিত নিরাপত্তা, ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট্ চুক্তির কার্য্যকারীতা প্রভৃতি সম্বন্ধে সমস্ত প্রস্তাবগুলি ১৮ ভোটে গৃহীত হয় এবং প্যাসিফিষ্ট সোশ্যালিষ্ট মঃ পল্ ফয়ার ৭ ভোটে পরাজিত হন। সোভিয়েটের সাথে ফ্রান্সের মৈত্রীবন্ধন যে আজও অটুট রয়েছে এ কথা ব্লুম্ খুব জোর দিয়ে ঘোষণা করেন।

ডাফ্ কুপার

ব্রিটেনের সঙ্গে ফ্রান্স বন্ধুত্ব বজায় রাখতে প্রস্তুত, কিন্তু তাই বলে তার নির্দ্দেশ অনুযায়ী নিজের নিরাপত্তা ও পদমর্য্যাদাকে ক্ষুন্ন করে' ফ্রান্স অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির সাথে তার যে সব চুক্তি রয়েছে তা' ছিঁড়ে ফেলতে রাজী নয়। সোশ্যালিষ্ট পার্টির এই ফয়ারিষ্টদের পরাজয়ের ফলে ফ্রান্সের নূতন 'পপুলার ফ্রণ্ট' গবর্ণমেণ্ট গড়ার পথ আরও পরিষ্কার হয়েছে এবং ব্লুমের আন্তরিকতার সাহায্যে ফ্রান্সের সোশ্যালিষ্ট পার্টি সেখানকার কম্যুনিষ্ট পার্টির ও অন্যান্য প্রগতিপন্থী পার্টির সাহায্যে অচিরে যে দালাদিয়ে-বোনে-রেঁানো প্রমুখ ফ্যাশিস্ত গোষ্ঠীকে বিতাড়িত করে আবার নূতন করে 'পপুলার ফ্রণ্ট' গবর্ণমেণ্টের ভিত্তি গড়বে তাতে কোন সন্দেহ নেই। রেডিক্যাল পার্টির সভ্যেরাও যে এতে যোগ দেবে তাতেও কোন সন্দেহ নেই, কারণ তাদের দোটানা মনোভাব কেটে যাবে। সুতরাং ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার তা আমি বলতে চাই না, তবে ফ্যাশিস্তদের রীতি অনুসারে দালাদিয়ে-বোনে গোষ্ঠী যদি ফিনান্স-ক্যাপিটালের সাহায্য নিয়ে জোরে নিষ্পেষণ সুরু করে তা হলে স্পেনের মত সেখানেও অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি হওয়া এমন কিছু অস্বাভাবিক নয় এবং গত বছর শেষভাগটা এই আবহাওয়ার মধ্যেই কেটেছে।

মঃ ব্লুম

ফ্যাশিজম্‌এর এই প্রভাব ও তার বিরুদ্ধে যে ঘনায়মান সংগ্রাম তা' শুধু য়ুরোপে, প্রাচ্যে ও সুদূর প্রাচ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ল্যাটিন আমেরিকার রিপাব্লিক্‌গুলির মধ্যেও তার কঠিন স্পর্শে জাগরণের সাড়া পড়েছে। গত বছরের গোড়াতে ইতালীর Corriere Diplomatico e consulare অহঙ্কার করে' বলেছিলেন যে "seven Latin American countries are proceeding decisively towards stabilisation upon the principles laid down by Premier Mussolini's Fascism." ল্যাটিন আমেরিক্যান্ গবর্ণমেণ্টগুলিকে ফ্যাশিস্ত মন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য সেখানে নানারকম প্রচার কার্য্যের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। মুসোলিনীর অনুচরেরা ল্যাটিন্ আমেরিকায় ইতালী ও জার্ম্মাণীর স্তুতি গেয়ে গ্রেট্‌ব্রিটেন্ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা করছে। চাইল্, আর্জেণ্টিনা, ব্রেজিল প্রভৃতি জায়গায় ইতালীর বিমানপোত খুব আনন্দের সঙ্গে সকলে কেনে। মুসোলিনী এদের ধর্ম্মত্রাতা। গত ডিসেম্বর মাসে ইতালী মেসিন গান্ ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র জাহাজ বোঝাই করে' পেরুতে ও ভেনেজুয়েলাতে পাঠিয়েছে। ইউনাইটেড

ষ্টেট্স্এ পেরুভিয়ান্ কনসাল্ জেনারেল্ বলেছেন যে ইতালীর বিমানশক্তি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সুতরাং ইতালীর জিনিষপত্তর আমাদের কেনা ত উচিতই, ইতালীর ইন্‌ষ্ট্রক্টারদের কাছে আমাদের পাইলট্‌দের শিক্ষা নেওয়াও কর্ত্তব্য। ইতালীর প্রভাব ব্রেজিল, আর্জেণ্টিনা ও অন্যান্য স্থানে ত আছেই, তা ছাড়া পেরুতে তার আধিপত্য সবচেয়ে বেশী। কিউবা, মেক্সিকো ও প্যানামা ছাড়া ল্যাটিন্ আমেরিকার অন্যান্য দেশগুলিতে আমেরিকান্‌দের চাইতে জার্ম্মানদের সংখ্যা বেশী। আর্জেণ্টিনাতে প্রায় ১০০০,০০০ জার্ম্মান বাস করে। চাইলের একজন লেখক দুঃখ করে' বলেছেন চাইল্ আজ দ্বিখণ্ডিত ; একখণ্ডে ক্লাব, এসোসিয়েসন্ নিয়ে শুধু জার্ম্মানদের একচেটিয়া। ল্যাটিন আমেরিকায় জার্ম্মানরা ক্রমে ক্রমে বেশ একটা ব্যবসা-কেন্দ্র করে' তুলেছে। মেক্সিকো, পেরু, ব্রেজিলে জার্ম্মানদের টেক্সটাইল ফ্যাক্টরী আছে, চাইলে ক্রুপস্ অস্ত্রশস্ত্রের একটি কারখানা তৈরী ক'রেছে। ল্যাটিন আমেরিকায় নাৎসিজম্ প্রচারের জন্য যে German News Agency আছে তার নাম হচ্ছে "Transocean"—এর সাহায্যে সেখানে নানারকম প্রচার কার্য্য চালান হয় গ্রেট ব্রিটেন্ ও ইউ, এস্, এ-র বিরুদ্ধে। ল্যাটিন্ আমেরিকায় জার্ম্মানির ব্যবসা বাণিজ্যের আধিপত্য ও উন্নতি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এ ছাড়া সারা ল্যাটিন্ আমেরিকা জুড়ে জাপানী নাপিত আর জেলেতে ভর্ত্তি। ল্যাটিন আমেরিকায় মাছের ব্যবসায় জাপানীদের একচ্ছত্র প্রতিপত্তি। ল্যাটিন্ আমেরিকার সমস্ত দ্বীপ, বন্দর, ক্যারিথিয়ান্ তীর পর্য্যন্ত জাপানী মৎসব্যবসায়ীরা জুড়ে বসেছে। আর মজা হচ্ছে যে এরা সকলেই গোয়েন্দা। নাপিত চুলকাটা, দাড়ি কামানোর মধ্যে গোয়েন্দাগিরির কথা ভোলে না। মোট ল্যাটিন্ আমেরিকায় প্রায় ৩৫০,০০০ জাপানী আছে। জাপান, ইতালী ও জার্ম্মানির এই ষড়যন্ত্র থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়, যে ল্যাটিন্ আমেরিকায় ফ্যাশিজম্-এর সংগ্রাম—ঘনিয়ে উঠবে ও উঠছে। গত ডিসেম্বর মাসে লিমায় প্যান্ আমেরিকান্ কন্‌ফারেন্সের বৈঠক হয়ে গেছে। সেখানে আমরা "Common Defence Scheme" ও "American court of International Justice" গঠনের সার্থকতা সম্বন্ধে অনেক বড় বড় বক্তৃতা শুনলাম। কর্ডেল হালের নূতন রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের পরিকল্পনা মন্দ নয়। কিন্তু ল্যাটিন্ আমেরিকার যা সমস্যা তা আমেরিকার সঙ্গে মিলিত হয়ে শুধু ফ্যাশিজম-এর বিরুদ্ধে নূতন রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন করলেই চুকে যাবে না। সেখানকার সমস্যা শুধু ফ্যাশিজম এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা নয়, তার সঙ্গে পাশাপাশি তাদের পুরাতন চিরশত্রু ব্রিটিশ ও মার্কিণ ধনিকবাদের বিরুদ্ধেও লড়তে হবে এবং সে সংগ্রামের সুযোগও বর্ত্তমানে ল্যাটিন আমেরিকার এসেছে। কারণ ফ্যাশিজম সম্বন্ধে মার্কিণ ধনিকগোষ্ঠীর যথেষ্ট আতঙ্ক আছে এবং নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যই এখন আর উইল্‌সন-নীতি অবলম্বন করবে না বা ভেরা-ক্রুজের কাহিণীর পুনরাবৃত্তি করবেনা। আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাও আমেরিকার সহানুভূতি ভিন্ন একা কিছু করতে সাহস পাবে না। এই অবস্থার পরিপূর্ণ সুযোগটুকু উপলব্ধি করেই মেক্সিকোর প্রেসিডেণ্ট কার্ডেনাস্ মেক্সিকোর সংগ্রাম ঠিকপথে চালিয়েছেন। আজ মেক্সিকোর ব্যবসাবাণিজ্য রাষ্ট্রীকরণের জন্য কার্ডেনাস্ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন এবং মার্কিণ

ও ব্রিটিশ ধনিকগোষ্ঠীকে তাঁরচরম জবাব দিয়ে দিয়েছেন। আর পেরু, ইকুয়েডর, ভেনেজুয়েলা প্রভৃতি দেশগুলির একমাত্র কর্তব্য হ'চ্ছে কার্ডেনাসের পথ অনুসরণ করা, সমস্ত গোলযোগের মূল যেখানে সেই মূলকে উৎপাটিত করার চেষ্টা করা। নূতন রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহৎ আদর্শের উজ্জ্বল আলেয়ার পিছু পিছু গিয়ে পথভ্রান্ত হ'লে তাদের সমূহ ক্ষতি!

কার্ডেনাস

গত বছর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজেও ভীষণ গোলযোগ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা হ'য়ে গেছে। গত জুলাই মাসে একটি রয়েল কমিশন নিযুক্ত করা হয় এই সব দ্বীপগুলি এবং বৃটিশ গুাইয়ানা ও বৃটিশ হণ্ডুরাসের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যা সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য। ট্রিনিডাড রিপোর্টের বিবৃতি থেকে এই সব দ্বীপের যে শোচনীয় অবস্থার কথা জানা যায় তাতে প্রতিবাদ হিসেবে সেখানকার অধিবাসীরা যে ভয়াবহ অশান্তির সৃষ্টি করবে সেটা এমন কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়। এ হ'চ্ছে অপ্রচলিত ম্যাণ্ডেটী শাসন ও ঔপনিবেশিক নীতির বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোভ। তবু ত বৃটিশের উদাসীনতার জন্য তারা আজ অশিক্ষিত, স্বাস্থ্যহীন, নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে সংগ্রামের ফলে তাদের জীবনীশক্তি নেই। তাহ'লেও "West Indian History is surely beginning" এবং "The most crucial need of the moment is to find room and place for these by making the Island constitutions more democratic." ("Warning From The West Indies" By W. M. Macmillan. P. 174)। জামাইকা, ট্রিনিডাড, ডোমিনিকা, বারবাডস্ প্রভৃতি স্থানগুলিতে ম্যাণ্ডেটি ও ঔপনিবেশিক নীতির বিরুদ্ধে জনগণের যে প্রতিবাদ শোনা যাচ্ছে তা আরও ভীষণভাবে প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে প্যালেষ্টাইন, টাঙ্গানিকা প্রমুখ উপনিবেশ ও ম্যাণ্ডেটী দেশগুলিতে। গত বছর প্যালেষ্টাইনের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে, উডহেড কমিশনের রিপোর্টে তার কিছুই উপশম হয়নি, হতে পারেও না। কারণ কমিশনের সভ্যেরাই স্বীকার করেছেন যে—এই জাতীয় ভাগবাঁটোয়ারা সুবিধাজনক নয়। এককথায় বৃটিশ ফিনান্স-ক্যাপিটালের 'divide and rule' পলিসি প্যালেষ্টাইনে আর চলবে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্যালেষ্টাইনের শাসন ব্যবস্থা সামরিক বিভাগের হাতে দিয়ে সেখানে যতই অমানুষিক

অরাজকতার সৃষ্টি করুক না কেন, প্যালেষ্টাইনের জনগণ নির্ভয়ে তার প্রতিরোধ করবেই। প্যালেষ্টাইনের দাবী পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা এবং সে-দাবী তার যতদিন না পূরণ হবে ততদিন তার সংগ্রামও শেষ হবে না। বৃটিশ ফিনান্স ক্যাপিটালের জিওনিষ্ট অংশীদারদের বিরোধীতাকে তারা হাসিমুখে উপেক্ষা করে' অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করবে। আর টাঙ্গানিকা বা অন্যান্য উপনিবেশগুলির যে সমস্যা গত বছরের শেষদিকে যেভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তাতে হস্তান্তরের কোন প্রশ্নই আসে না। অর্থাৎ এরা বৃটিশের কবল থেকে জার্ম্মাণীর কবলে, বা জার্ম্মাণীর কবল থেকে ইতালীর কবলে যাবে কিনা সে সমস্যা নয়। এক কসাইয়ের আস্তাবল থেকে আর এক কসাইয়ের আস্তাবলে স্থানান্তরিত করার কোন অর্থ হয়না। এই সব উপনিবেশগুলির গণতন্ত্রের যে ন্যায্য দাবী সেই দাবী আজ মেটাতে হবে। উপনিবেশ ও ম্যাণ্ডেটি সমস্যার এ ভিন্ন কোন সমাধান নেই।

গত বছর নভেম্বর মাসে এক বিকলচিত্ত বুভুক্ষু ইহুদী বালক প্যারিসে জার্ম্মান কর্ম্মচারীকে হত্যা করে' এতদিন যে আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা ইউরোপে ধূমায়িত হ'চ্ছিল তাকে প্রজ্জ্বলিত করেছে। ফলে হিটলার গোয়েবেল্‌স্-গোষ্ঠী ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ইহুদীদের উপর এমন নির্ম্মম অত্যাচার সুরু করলেন যার সমদৃষ্টান্ত বিশ্বের ইতিহাসে মেলে না। পথের উপর টেনে এনে অত্যাচার করে, দলে দলে হাজার হাজার ইহুদী নরনারীকে বন্দী করে, ঘরবাড়ী দোকানপত্তর ভেঙে চুরে ফেলেও নাৎসীদের ইহুদী আক্রোশ মিটছে না। ইহুদীদের কাছে এক মিলিয়ার্ড মার্ক ক্ষতিপূরণ দাবী করা হয়েছে এবং এই জরিমানা যাবতীয় ইহুদী নরনারী ও শিশুদের ভাগ করে দিলেও—এক একজনকে ১৩৬ পাউণ্ড ষ্টার্লিং করে দিতে হয়। কমন্স সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে নোয়েল বেকার জার্ম্মাণীর এই ইহুদী বিরোধী মনোভাব ও তাদের উপর পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন এবং মার্কিণ রাষ্ট্রের সহযোগিতায় এই ইহুদী সমস্যা সমাধানের জন্য তৎপর হতে বলেন। সমস্ত জাতির ঐকান্তিক সহানুভূতি ভিন্ন এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। ইহুদী সমস্যা বহুদিনের জটিল সমস্যা এবং এই সমস্যা গত বছরের শেষ দিকে যে ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করেছে, আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতায় তার একটি সুচিন্তিত সমাধানের জন্য আমরা সকলে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি।

ফ্যাশিস্তদের এই বর্ব্বরতা ও সংঘবদ্ধ ক্রুর চক্রান্তের মাঝখানে দুটো বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ পর্ব্বতপ্রমাণ প্রতিবন্ধকের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া। হিটলারের নাৎসী ব্যাভিচার সুরু হবার পর থেকে গত বছর মিউনিকে চতুঃশক্তির নিন্দনীয় প্ল্যান তৈরী করা পর্য্যন্ত একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়াই সুতীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে সুস্থির ভাষায়, ধ্বংসমান ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তার জন্য তাদের সাহস দিয়েছে, আক্রান্ত দেশগুলির গণতান্ত্রিক প্রাণরক্ষার জন্য অস্ত্র ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছে, শান্তি ও যুদ্ধবিরোধী সমস্ত চুক্তির মর্য্যাদা নিষ্কলঙ্ক রেখেছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপারে ফ্রান্স যখন বিশ্বাসঘাতকতা করলে তখন লিট্‌ভিনফ্ জানিয়ে দিয়েছিলেন যে সোভিয়েট রাশিয়ার সাথে ফ্রান্সের বন্ধুত্ব বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। ফ্যাশিস্তদের এই সম্মিলিত চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমাদের একটি আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনের প্রয়োজন আছে। সম্মেলনের

দাবী দিয়েছেন লিটভিনফ্ ও রুজভেল্ট। এমন একটি আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন আমরা চাই যার মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ ও অন্যান্য ফ্যাশিস্ত বিরোধী রাষ্ট্রগুলি সমানভাবে অংশ পেতে পারে। এইজন্য লিট্ভিনফ রাষ্ট্রসঙ্ঘকে বৈঠক আহ্বান করার জন্য অনুরোধ করেছেন। আমরাও লিট্ভিনফের কথার প্রতিধ্বনি করছি এবং আমরাও বিশ্বাস করি ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ ও সোভিয়েট রাশিয়া জগতের এই দুটি বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের উপর ভবিষ্যতের অনেক কিছু নির্ভর করে। গত ১৬ই নভেম্বর ওয়াশিংটন্ ও মস্কোর ডিপ্লোম্যাটিক যোগাযোগ স্থাপনের পঞ্চম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে 'ইজভেস্তা, পত্রিকা রুজভেল্টকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে। তাতে লেখা হয়েছে যে ব্রিটেন যখন প্রত্যক্ষভাবে ফ্যাশিস্ত গোষ্ঠীতে যোগ দিল তখন পৃথিবীর শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্ত দায়িত্ব পড়ল সোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকার উপর। সুতরাং এই দুই রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র থাকা একান্ত আবশ্যক। 'ইজভেস্তা' 'লিখিয়াছেন "The United States must choose the route for her future foreign policy. The U. S. S. R. continues resolutely to move along the route of active defence and peace consistent with the struggle against agression. on this route the two countries can meet." আমরা আশা করি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এ-সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হবেন। কমরেড ষ্ট্যালিন্ ঘোষণা করেছিলেন যে শান্তি স্থাপন করা সোভিয়েট রাশিয়ার মহৎ উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু ফ্যাশিস্ত আক্রমণকারীদের বর্ব্বরতা প্রতিরোধ করার জন্য রাশিয়া অস্ত্র ধরতেও প্রস্তুত। বিশ্বশান্তির জন্য হয়ত এরও প্রয়োজন হতে পারে এবং ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের তার জন্য যথেষ্ট সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। ইতিমধ্যে, কম্যুনিষ্ট ইন্টারন্যাশানালের সাধারণ সম্পাদক জর্জ্জ ডিমিট্রফ গত কমিনটার্ণের অধিবেশনে এবং সম্প্রতি মিউনিক চুক্তির পরে ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বর্ত্তমান কৌশল হিসেবে যে "ইউনাইটেড ফ্রন্ট" গঠনের কথা বলেছেন, সমস্ত দেশে দেশে সেই কৌশল অবলম্বনের চেষ্টা করতে হবে। দেশে দেশে সমস্ত ফ্যাশিস্ত বিরোধী প্রগতিপন্থী দলগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে একত্রীভূত দলসমষ্টি গঠনের চেষ্টা করতে হবে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে এবং সাময়িক ব্যর্থতার জন্য নিরাশ হলে

ষ্টালিন

চলবে না কারণ ডিমিট্রফের ভাষায় "The future belongs not to rotten, declining capitalism and its poisnous, foul-smelling cesspool—Fascism, but to ascending Socialism, towards which are turned the eyes of all working people, of the whole of mankind." (The Daily Worker).

বিশ্বাবর্ত্তের এই ঘূর্ণিস্রোত ভারতবর্ষেও এসে প্রচণ্ডভাবে আঘাত ক'রেছে এবং ভারতবর্ষও তার জাতীয় অভ্যুত্থানের সংগ্রামের পথে বিশ্বকে এড়িয়ে যেতে পারে নি। প্রকৃতপক্ষে পারেও না, কারণ বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনীতিক অদৃষ্টের খুব ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে। গত বছর ভারতবর্ষের ঘোরতর সংগ্রামের কলরবের মাঝখানে কেটেছে। জিন্নাসাহেব, গান্ধীজী, জওহরলাল নেহরু ও সুভাষ বসুর সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করে' বা কথাবার্ত্তা বলে বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারেন নি। শিশুর আকাশের চাঁদ চাওয়ার মত তিনি যে দাবী পেশ করলেন তা কংগ্রেসের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হ'ল না। সম্প্রতি কংগ্রেস হিন্দুসভা ও মুস্লীম্ লীগকে 'বেআইনী' ঘোষণা করেছে এবং কংগ্রেসের এ-বিচার ভারতের জনগণ খুব সন্তুষ্ট চিত্তে সমর্থন করেছে, কারণ সাভারকার ও জিন্নাসাহেব ভারতের রাজনীতিক আকাশে দু'টি দুষ্টগ্রহ ভিন্ন আর কিছু নয়। ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর, ধেনকানল, রাজকোট প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যগুলিতে জনগণের যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে এবং সেখানে সামন্ত-নরপতিদের যে নৃশংস চণ্ডনীতির বহর চলেছে তাতে ভারতের প্রত্যেক শুভাকাঙ্খীই যথেষ্ট চিন্তিত হয়েছেন। এ ব্যাপারে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের উদাসীনতা আজও যায় নি এবং যতদিন না যাবে ততদিন ভারতের সাম্রাজ্যবিরোধী আন্দোলন পঙ্গু হ'য়ে থাকবে। য়ুরোপের ফ্যাশিস্তদের রীতি অনুযায়ী এই যে 'non-intervention policy' এ সর্ব্বাগ্রে বর্জ্জন করতে হবে। কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে আমরা এর একটা সুচিন্তিত মীমাংসার আশা করছি। কংগ্রেসের মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত যা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখলে যে-কোন সাবধানীর মনেও সন্দেহ জাগতে পারে যে সত্যিই এঁরা জনগণের মন্ত্রী অর্থাৎ কল্যাণকামী কিনা। উদাহরণ স্বরূপ কানপুরের ধর্ম্মঘট ও বোম্বে শ্রমিক-বিলের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন দাবিয়ে রাখার জন্য এঁরা অত্যাচার ত' করছেনই, তা ছাড়া এমন সব আইন পাশ করছেন যা যে-কোন ফ্যাশিস্ত আইনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তার জন্য ভারতের সাম্রাজ্য-বিরোধী সংগ্রাম বাধাপেলেও, এগিয়ে চলেছে শুধু সোশ্যালিষ্ট, কম্যুনিষ্ট ও অন্যান্য প্রগতিপন্থীদলগুলির অক্লান্ত চেষ্টায়। ভারতের কৃষক আন্দোলন গত বছরে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে এবং স্বামী সহজানন্দের নেতৃত্বে দিন দিন নিখিল ভারত কৃষক সভা বেশ শক্তিশালী হ'য়ে উঠছে। তবে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি আজও বেআইনী রয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে গত বৎসর ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে ও সংগ্রাম করেও বিশেষ কিছু ফল হয় নি। কম্যুনিষ্টদের যাঁরা আজও নৈরাজ্যবাদী মনে করেন, বা কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে দেশে যাঁদের আজও বর্গীর আতঙ্ক আছে, তাঁদের অবিবেচক বলাই উচিত। অন্যান্য দেশে কম্যুনিষ্টদের কার্য্যকলাপ দেখে কোন চিন্তাশীল রাজনীতিকই

তাদের সম্বন্ধে এ-সব আজগুবি ধারণা আজ পোষণ করবেন না। তা' ছাড়া কম্যুনিষ্টরা আজ টেবিলের উপর তাদের সমস্ত কার্ড ফেলে রেখে সংগ্রাম করছে, বর্ত্তমানে ভারতের সাম্রাজ্য-বিরোধী সংগ্রামকে শক্তিশালী করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সেখানে তাদের সঙ্গে হাতে হাত মেলাতে কারও আপত্তি থাকা সঙ্গত নয়। লাহোরে ভারতের সমাজতন্ত্রীদলের গত অধিবেশনে সভাপতি কমরেড্ মাসানি ক্যাপিটালিজমের বিরুদ্ধে বক্তৃতা না দিয়ে শুধু কম্যুনিষ্টদের দোষত্রুটি দেখিয়েছেন। দেশের এই নিদারুণ সঙ্কটের দিনে ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রগতিপন্থীদলের একজন বিশিষ্ট নেতার কাছ থেকে এই প্রকার মনোভাব আমরা প্রত্যাশা করি নি। আমরা আশা করি যে সি, এস, পি এই মনোভাব বর্জ্জন করবে এবং ভারতের কৃষক শ্রমিক ও অন্যান্য প্রগতিপন্থীদলগুলির সহযোগিতায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে 'ইউনাইটেড্ ফ্রন্ট্' গঠন করে' ঘোরতর সংগ্রাম করবে। কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে হ'লে দেশের গণশক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করা বিশেষ প্রয়োজন, এবং গণশক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে হ'লে ভারতের সমস্ত বামপন্থীদলগুলির ঐক্য একান্ত প্রয়োজনীয়। ফেডারেশন সম্বন্ধে ভারতের দক্ষিণপন্থী নেতাদের মনোভাব আজ আর আমাদের জানতে বাকি নেই মাদ্রাজের সত্যমূর্ত্তি মহাশয় যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার একটু ছাটকাট্ করে' চালিয়ে নিতে রাজি। ভুলাভাই দেশাইও প্রায় তাই। আর গান্ধীজী ত' অহিংসার লৌহস্তম্ভের উপর জোর দিয়ে বলেছেনই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রাম না করেই আমরা জয়ী হব, সুতরাং রফারও সম্ভাবনা আছে। ফ্যাশিস্তদের উদাহরণ থেকে আমরা রফার দৌড় কতদূর তা জানি এবং তার পরিণামই বা কি তাও জানি।

সুভাষ চন্দ্র

যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একমাত্র রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের উক্তিই প্রশংসনীয়। সম্প্রতি তিনি বলেছেন যে ছ' মাস পরে কংগ্রেস আবার আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করবে পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। রাষ্ট্রপতির এই উক্তি কংগ্রেসের সভাবৃন্দ সমূহ আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন কারণ ওয়ার্কিং কমিটির 'পাশকাটানো' মনোভাব দেখে তাঁরা সকলেই ভীত হয়েছিলেন। কিন্তু পরে রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে এটা তাঁর ব্যক্তিগত মত। আমাদেরও ঠিক ভয় ওখানে। সুভাষচন্দ্র জনসাধারণের নির্ব্বাচিত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি। সুতরাং আমরা চাই তাঁর উক্তি ব্যক্তিগত না হ'য়ে জনসাধারণের মতই হোক।

বিনয় ঘোষ

রামমালা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার

আজ যার কথা লিখ্‌ছি সে আমার বোন। আমার মার বড় আদরের মেয়ে। আমার মাকে মা বল্‌তে আনন্দে তার চোখ দিয়ে জল আস্‌ত। পরে মার কাছে শুনেছি মার কাপড়ের আঁচল ধরে ধরে মার সাথে হাঁটতো। দিনরাত শুধু মা মা করে মার পেছন পেছন চলাই ছিল তার অভ্যাস। মা এক এক সময় বিরক্ত হয়ে যদি বলতেন "যা যা—বিরক্ত করিসনে.." —অমনি সে মাকে আরও আঁকড়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠত আর মার অলক্ষিতে মার চোখের দিকে তাকাতো। মা অমনি বলে উঠতেন "মেয়ের আহ্লাদ দেখ. কিছু বলতে না বলতেই কেঁদে একেবারে হয়রান......যা যা কাঁদতে হবে না চল আমি তো যাচ্ছি।" এমনি যে আমার আদরের বোন সে আজ পাগল হোয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। আজ যে সে কোথায় আছে তা বল্‌তে পারিনে। বহুদিন ধরে দেশে নেই। তার খবর তো পাইনা। কেউ খবর দেওয়ার দরকার আছে বলে মনে করে না। কিন্তু আমার বোন মনের নিভৃত কোণে এমন একটি স্থান করে নিয়েছে যে ভুলতে চাইলেও তাকে ভুলতে পারি না।

আমার বোনের নাম রামমালা। বাড়ী তার সাঁওতাল পরগণায়। আমার জন্মের আগেই সে একটি ছোট শিশু কোলে করে আমাদের বাড়ীর দরজায় এসে উপস্থিত হয়। তারপর হ'তেই সে আমাদের বাড়ীতে রয়ে গেল। আমাদের বাড়ীর নানারকম কাজ সে করত। আমাদের বাড়ীর সাথে লাগান একটি বাড়ীতে সে শিশু ছেলেটিকে নিয়ে থাক্‌ত। তার বাড়ীটির উপর এমন একটি অধিকার জন্মেছিল যে আজও আমরা বাড়ীটিকে রামমালার বাড়ী বলি।

বাড়ীটিকে কিন্তু আমি ছাড়া অবস্থায়ই দেখেছি। ছোটবেলায় সেই বাড়ীর বুকে অনেক লুকোচুরি খেলেছি। বাড়ীতে কিছু অন্যায় করলেই মার খাবার ভয়ে রামমালার বাড়ীতে এসে লুকিয়ে থাক্‌তাম। বাড়ীটি আশ্চর্য্য রকম ঠাণ্ডা। কোথাও কোন শব্দ নাই। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে চোখ আপনা আপনি বুজে আস্‌ত আর মনে হ'ত বাড়ীটা যেন চোখের চারদিকে ঘুরছে। সব সময়েই যেন বাড়ীটার গায়ে কার নিশ্বাস শুনতে পেতাম।

একটা পাতা ছিঁড়লেও যেন কে কেঁদে উঠত, সাথে সাথেই ঘুমন্ত পাখী ডানা ঝাপটিয়ে আবহাওয়াকে আরও নিবিড় করে তুলত। ভয়ে কাঠ হয়ে যেতাম, চোখ মুখ নীচু করে ছোট ছোট সুপুরি গাছের গায়ে চিম্‌টি কেটে সময় কাটাতে থাক্‌তাম। পুকুর পাড়ে বাড়ীর কর্ত্তাকে দেখবার আশায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তাম। লোক দেখতে পেলেই যেন ঘাম দিয়ে সমস্ত শরীরটা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যেত। আস্তে আস্তে অন্যদিকে চেয়ে বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিতাম। বাড়ীর কাছটায় এসে ভুতুরে আমগাছটার গোড়ায় দাঁড়িয়ে সাহসে ভর্ করে চোখ টেঁরে টেঁরে রামমালার বাড়ীটার দিকে তাকাতাম আর আর আস্তে আস্তে বল্‌তাম—কি

করবে তোমাকে ভয় করি না, এই দেখ বুড়ো আঙ্গুল, বলেই আঙ্গুলটী বাড়ীটার দিকে তুলে ধরতাম। কিন্তু একটুতেই যেন অবসাদ এসে যেতো। রামমালার বাড়ীর সব ছোটখাট জিনিষ-গুলো চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ত। বাঁকা কাঁঠাল গাছতলায় ভাঙ্গা কলস দুটো—মনে ভাব্‌তাম রামমালার জল আনবার কলস দুটো বুঝি। রাক্ষুসে আমগাছটার কথা—আমের খোসাগুলো কি মোটা বাপরে—যেন রামমালার চোখের পাতার মতো। গাছের বাকলগুলো যেন বয়সের সাথে সাথে মুস্‌ড়িয়ে গ্যাছে।

রামমালার বাড়ীটার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটা লেবুগাছ ছিল। গাছটা আশ্চর্য্য রকম লাজুক বলেই আমার মনে হ'ত। সব সময়েই গাছটি মাথা নুয়ে থাক্‌ত, গাছের পাতা মোটেই নড়্‌ত না। এ যেন বাড়ীর এক কোণে দাঁড়িয়ে বাড়ীর সব কিছু অন্ধকারকে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করত।

আমাদের একটি কালো গাই ছিল। আমাদের আলসে চাকর দীনু রোজ রোজই গাইটাকে লেবু গাছটার গোড়ায় বেঁধে রাখত। গাইটাকে সব সময়েই দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখতাম। একে কখনও কিছু খেতে দেখিনি। লেবু গাছটার উপরে নাক ঢুকিয়ে কি ভেবে যেন মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আস্‌ত কোন দিন লেবুগাছের একটি পাতা পর্য্যন্ত চিবোতে দেখিনি।

যখন আমার বয়স বছর দশেক তখনকার একটি ছোট ঘটনা ভবিষ্যৎ জীবনে এ ছাড়া বাড়ীর বিষয়ে আমাকে অনেক খবর দিয়েছিল। এক রবিবারে আমি আম কুড়াতে ঐ ছাড়া বাড়ীটার দিকে ছুটছিলাম। মা আমাকে ছুটতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন "যাস্ কোথায় রে?" আমি বললাম "রামমালার বাড়ীতে আম কুড়াতে যাই" মায়ের মুখখানা যেন একেবারে কালো হয়ে গেল. চোখে জল দেখ্‌তে পেলাম। কিছুদিন পরে লক্ষ্য করলাম আমাদের বাড়ীর মা হ'তে আরম্ভ করে কোন মেয়েলোক রামমালার বাড়ীর আম খান না। আম সাধলে এ কথা সে কথা বলে কথা কেটে যান।

বয়সে একটু বড় হলাম। আস্তে আস্তে রামমালার বাড়ী ও রামমালার সম্বন্ধে অনেক কথাই জান্‌তে লাগলাম। রামমালা যে মার আদুরে ছিল তাও বুঝলাম আর রামমালা যে আমাদের অনাদরেই পাগল হল তাও জানলাম। আমাদের বাড়ীতে লোক ধরে না, বাড়ী বড় করতে হবে। তার থাকবার বাড়ীটা আমাদের দরকার হবে—হিজি-বিজি অনেক কারণে রামমালাকে উঠে যেতে হল। কিন্তু আমাদের বাড়ী আর সেবার বড় হলনা শুধু রামমালাই উঠে গেল। রামমালা আমাদের গ্রাম ছেড়ে ছোট ছেলেটিকে নিয়ে সহরে উঠে আস্‌ল।

শুনেছি রামমালা যাওয়ার পরই আমার মার ভয়ানক এক অসুখ হয় এবং তার কিছুদিন পরে আমার একটি ছোট ভাই হয়েছিল কিন্তু সে পৃথিবীর আলো আর দেখে যেতে পারেনি। ডাক্তাররা নাকি বলেছিলেন বিশেষ দুঃখ পাওয়ার ফলেই শিশুটী পৃথিবীতে আসবার পূর্ব্বেই চলে যাবার জন্য তৈরী হয়েছিল।

আমাদের বাড়ী হতে চলে গিয়ে রামমালা আমাদের দেশের সহরেই এসে উঠল। কয়েক-দিনের মধ্যেই ছেলেটি তার মায়া কেটে চলে গেল। এ দুঃখ রামমালা সইতে না পেরে পাগল হয়ে গেল, পাগল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

এরপর রামমালকে দেখবার আমার সুযোগ এল। একদিন বাবার সাথে সহরে বেড়াতে গেছি। ষ্টেশনের কাছে দেখি একখানা ছেঁড়া কাপড় পরা একটি মেয়েলোক—সেওলা-ফুলের বাট চিবোচ্ছে। বাবাকে দেখতে পেয়ে সে যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে গেল। তারপর জড়সড় ভাবে বাবাকে অনেক কথা বলতে লাগল। কথাবার্ত্তার মধ্যে অধিকাংশ কথাই মাকে নিয়ে। কথা বলছে আর মিট্ মিট্ করে আমাকে দেখ্‌ছে। শেষে আমাকে দেখিয়ে বল্লে "এটী কে ?" বাবা বল্লে "তোমার ভাই"। বলতেই আমার চোখের উপর তার চোখ দুটো এমন ভাবে ধরল যে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আমাদের মধ্যে ভাই বোনের সম্পর্ক হয়ে গেল। রামমালাকে এই আমার প্রথম দেখা। রাম-মালাকে দেখবার পর হতেই আমার সহর দেখার আনন্দ চলে গেল। শুধু রামমালার কথা মনে আসতে লাগল। কবে আবার তাকে দেখব এই সব চিন্তায় সব সময়টা কেটে গেল।

তারপর রামমালার খবর আর কিছুদিন পেলাম না। আমি যখন ম্যাট্রিকুলেন ক্লাসে উঠলাম তখন শুনতে পেলাম রামমালা আবার আমাদের দেশের সহরে এসেছে। রামমালার সাথে প্রায়ই দেখা হতে লাগল। মাথায় একটি ভাঙ্গা থালা নিয়ে ইটের টুকরো চিবোতে চিবোতে রেলরাস্তার উপর দিয়ে ঘুরে বেড়াত আর বিড় বিড় করত। আমাকে দেখতে পেলেই তার আনন্দ হত। আমার সাথে নানা কথা বলত। মা কেমন আছেন। মার চোখের অসুখ সারল কিনা। আমাদের বাড়ীর কার কোথায় বিয়ে হল। রাঙ্গা বৌদির ছেলে হল কিনা। পিসিমার ছোট ছেলে কি করে, ইত্যাদি। আমি কোন রকমে এদিক ওদিক চেয়ে জবাব দিয়ে ফিরতাম।

একদিন কিছু টাকা আনবার জন্য আমি বাবার একখানা চেক নিয়ে সহরে গেছি। ব্যাঙ্ক থেকে ফেরবার মুখে দেখি রামমালা দাঁড়িয়ে। আমার দেখেই মনে হল রামমালা আমার জন্যই অপেক্ষা করছে। হাতে কিসের যেন একটা ঠোঙ্গা। আসতেই ঠোঙ্গাটি আমার হাতে দিয়ে বলল "তোর মাকে দিস্।" আসতে আসতে শুধু ভাবতে লাগলাম রামমালা মাকে কি দিতে পারে। খুলে দেখ্‌বার ইচ্ছা হল। খুলে দেখি হিন্দুস্থানী দোকানের ছোলা ভাজা আর চানাচুরে ভরতি। কেমন জানি হতভম্ব হয়ে গেলাম। ঠোঙ্গাটি ফস্কে যেতে না যেতেই ধরে ফেললাম। মুখ উঠিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে এর অর্থ খুঁজতে লাগলাম।

মনে পড়ে গেল মা এ সব তেলে ভাজা জিনিষ ছোটকালে খেতে বড় ভালবাসতেন। বিয়ের পরেও মা লুকিয়ে লুকিয়ে সহর থেকে আনিয়ে খেতেন।...

রামমালা সব ভুলেছে। তার ছেলের কথা ভুলেছে। বাড়ীর কথা ভুলেছে। ভোলে নাই শুধু দেখলাম মার জীবনের ছোট-খাট জিনিষ গুলো।

কারণটা কি?

ক্ষিতীশচন্দ্র রায়

অনেক কথাই
জানেন মশাই
সাচ্চা হলেও বলতে মোদের ভয়।
কারণটা কি, জানেন না তাই?
বলছি তবে শুনুন মশাই।

বড়ো সাহেব যখন
দাঁত খিঁচিয়ে
খুব চেঁচিয়ে
মধুর ভাষায় করেন সম্ভাষণ
ভালো হলেও তখন
অনেক কথাই,
জানেন মশাই,
গলাতে যায় বেধে;
সরস্বতীর পাইনে সাড়া সেধে।
ডিগ্রি আছে তবু
এ কথাটা ভুলবেন না কভু।

গিন্নি যখন বসেন বেঁকে
তখন কি আর কিছুই টেঁকে
যুক্তি তর্ক ছাই।
প্রেমের কথাও মিষ্টি করে'
একটা দুটো বলব যে ভাই
তাও কি মনে পড়ে!

শ্যালক যখন ঘাড়ে চড়ে'
আমার তিরিশ টাকার' পরে
বেশ চালাবেন দুইটি বেলাই ;
তার ওপরে
বায়োস্কোপের পয়সাটাও চাই
তখন মশাই
সত্যকথা মিষ্টি করেও বলতে যদি যাই
তবেই গোল-যোগ—
দেখা দেবে বেজায় কঠিন হিষ্টিরিয়া রোগ।

তাইতো নেহাৎ চুপটি করেই থাকি
কারণটা কি,
জানেন মহাশয় ?
হাড়্‌ভাঙা এই খাট্‌নি করে'
তার ওপরে
ঘরে এসে হাঙ্গামা কি কারো ধাতে সয়।

বাড়িওলার টাকা কিছু ধারি।
বেটা মশায় হতচ্ছাড়া ভারি।
আফিসেতে
আসতে যেতে
দুইটি বেলাই
ঝেড়ে ঝুলি
শোনায় মিঠে কড়াবুলি ;

কিন্তু মশায়
আমারো যে মোটে
একটিও না জোটে
তেমন কথা নয়,
তবে কিনা বলতে লাগে ভয়।

কারণটা কি
বলব তা' কি ?
দেয় যদি তাড়িয়ে
কোথায় দাঁড়াই,
বলুন মশাই,
ছেলে মেয়ে ঘর সংসার নিয়ে।

ট্রট্স্কি ও ষ্টালিন

অতীন্দ্রনাথ বসু

"Revolution devours its own children"—Carlyleএর এই প্রবচন ইতিহাস যে কতবার আবৃত্তি করেছে তার হিসেব নেই। Cronusএর মতো বিপ্লব-রাক্ষসী তার সন্তানদের একে একে গ্রাস করে চলেছে এ চিত্র বিপ্লবীর কাছে মনোমুগ্ধকর নয়। কিন্তু বাস্তবকে এড়াবে কে? যা করতে পারা যায় সে শুধু সজ্জ ও সতর্ক হয়ে থাকা।

অক্টোবর বিপ্লবের পর রুষদেশে প্রবর্তিত হলো সামরিক সামাতন্ত্র—war communism। লেনিন মারা গেলেন ভাঙ্গার পালা শেষ করে গড়ার পালায় দেশকে রেখে,—NEP নামক মধ্যপন্থী কার্যসূচী অবলম্বন করে। এখান থেকে সুরু হলো 'বিপ্লবের সন্তান'দের মধ্যে মতভেদ, দ্বন্দ্ব, তারপর মৃত্যুপণ সংগ্রাম। তার মধ্যে একদল এতদিনে প্রায় নিঃশেষে ধ্বংস হয়েছে। একদল কায়েমীভাবে সরকারী ও বেসরকারী শক্তি করায়ত্ত করেছে।

রুষের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় আমাদের পক্ষে কঠিন। বিদেশী সমালোচকদের বিচারেও যথেষ্ট অনৈক্য রয়েছে। একদিকে Victor Serge ও Bernard Shawর তীব্র সন্দিগ্ধ সমালোচনা—অন্যদিকে Webb-দম্পতির এবং Lion Feuchtwangerএর প্রায় নির্বিচার সমর্থন—মাঝখানে Andre Gide. Walter Citrine প্রমুখ প্রত্যক্ষদ্রষ্টার জিজ্ঞাসু বিশ্লেষণ,—এ সব বিরুদ্ধ উপকরণ থেকে সত্য উদ্ধার সহজ নয়। সব বিষয়ে সরকারি কার্য-তালিকাও প্রকাশিত হয় না। যা হয় প্রতিপক্ষের মতে তাও মিথ্যে। বিদেশী সমর্থকদের কলম ছাড়া প্রতিপক্ষের মত প্রকাশের কোন বাহন নেই। যাও তাঁরা বলতে পারেন সরকারী মতে তাও মিথ্যে।

ট্রট্স্কি ও ষ্টালিনের সংঘর্ষের পেছনে ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও প্রকৃতিগত বিরোধ কত গভীর—তা উভয়ের কথা ও লেখার মধ্য থেকেই বোঝা যায়। ট্রট্স্কি অতুলনীয় বক্তা, লেখক এবং রণ-নায়ক —ম্যাট্সিনি ও গ্যারিবল্ডির সমন্বয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছাড়া রুষ বিপ্লব সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। তাঁর কণ্ঠ যেমন রুষের গণশক্তিকে জাগরিত করেছিলো,—আবার তেমনি ব্রেষ্ট্-লিটভ্স্কএর গ্লানিকর সন্ধির আসরকে বিপ্লবের শ্রুতিবাসরে পরিণত করেছিলো। ষ্টালিন বিপ্লবের যুদ্ধে যে রণ-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন তার চেয়ে বেশী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন তাঁর ধীর স্থির সংগঠন-শক্তি দিয়ে। জারিজিন্-এর রক্ষাকর্তার চেয়ে পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পের প্রবর্তককেই রুষ ও মানুষ বেশীদিন স্মরণ করবে।

কিন্তু ভাঙ্গার কাজে যোগ্য বিপ্লবী ট্রট্স্কির প্রয়োজন ছিলো,—আজ গড়ার দিনে তাঁর কাজ ফুরিয়ে গেছে এবং এ কাজের অভ্রান্ত উপযুক্ত পাত্র ষ্টালিন—এ সরাসরি সিদ্ধান্ত সমিচীন হবে না।

লেনিন তাঁর শেষ চিঠিতে নাকি লিখে গিয়েছিলেন—"Trotsky's non-Bolshevist past is no accident"। তাঁর সঙ্গে ট্রট্স্কির মতভেদ যেমন হয়েছে— তাঁর প্রয়াসকে জয়যুক্ত করতে ট্রট্স্কির মত সহায়তাও আর কেউ করেছে কিনা সন্দেহ। আর অতীত জীবনের বুর্জোয়া-কর্মধারাই যদি বিচারের মানদণ্ড হয় তবে বহুদেশের বহু সাম্যবাদী নেতাকেই আত্মচিন্তা করতে হবে। এ ছাড়া অতি মাত্রায় অনমনীয় বলে এক সময় লেনিনই কি ষ্টালিনের পদচ্যুতি দাবী করেন নি—এবং তাঁকে এই বলে সম্ভাষণ করেন নি যে তিনি পশুর মত নিষ্ঠুর— "too cruel, too brutal"?

আদর্শ ও কার্যসূচীতে দুজনার মধ্যে যে অনৈক্য, প্রফেসর Laskyর কথায় বলতে গেলে তা গতিমুখের (direction) পার্থক্য নয়, গতিবেগের (pace) পার্থক্য। ষ্টালিনের সমর্থকদের মতে এঁরা practical, objectivistic,— অর্থাৎ অনতিক্রমা পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বিপ্লবের যতটুকু বাঁচিয়ে রাখা যায় ততটুকু বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট ও সক্ষম:—আর ট্রট্স্কি utopist, doctrinaire, আদর্শবাদী। ট্রট্স্কির দল বলেন বিপ্লবের এই সঙ্কোচন শাসকসম্প্রদায়ের (bureaucracy) প্রতিক্রিয় ও সময়সেবী মনোবৃত্তির পরিচায়ক,—বার বার ঠেকে শেষে তারা প্রতিপক্ষের নীতিই অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে,— এবং আগে থেকে এগুলো গ্রহণ করলে অনেক অপচয় লাঘব হতো।

কিন্তু বিপ্লবী কর্মধারার গতিবেগ বা tempoর পার্থক্য থেকেও অন্তর্নীতি ও বহির্নীতিতে অনেক বিভেদ এসে পড়ে। এ ছাড়া প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংগ্রামে যে কলাকৌশল অনুসরণ করা হয় তা নিয়েও বিতর্ক চলে। গত কয়েক বৎসরে সোভিয়েট রুষ যে দ্রুতগতি বহুমুখী আর্থিক উন্নতির পথে ছুটে চলেছে ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া ভার,— কিন্তু তার মধ্যে স্থানে স্থানে প্রশ্ন ও দ্বিধার অবসর আছে। প্রতিপক্ষের গুরুতর অভিযোগগুলিকে সোভিয়েটের অন্ধ স্তাবকরা প্রায়ই এড়িয়ে যান— কিন্তু এই অভিযোগের পিছনে যদি কোন সত্যকার গলদ থাকে তবে তার আলোচনা হওয়া সব দেশের বিপ্লবীর পক্ষে অনিবার্য প্রয়োজন এবং সোভিয়েটেরও অকল্যাণকর নয়। রাষ্ট্রদ্রোহের রোমাঞ্চকর বিচারগুলি যদি সোভিয়েটকে দুনিয়ার কাছে একটুও খাটো করতে না পেরে থাকে তবে আমাদের সহানুভূতিসম্পন্ন সত্যানুসন্ধানও করবে না।

ফ্যাসিস্তুতন্ত্রের আর্থিক ইমারৎএর চেয়ে সোভিয়েটতন্ত্রের আর্থিক ইমারৎ অনেক পাকা বনিয়াদের উপর গড়া, —কিন্তু এ সত্বেও ভুললে চলবে না যে

১। ধনতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে এখানে উৎপাদনের খরচ অনেক বেশী পড়ে

২। উন্নত শিল্পযন্ত্রের সঙ্গে শ্রমের উৎপাদন শক্তি তাল রেখে চলতে পারছে না (—যার ফলে Stakhanovist ও sweated labour এর শরণ নিতে হয়েছে)

৩। যন্ত্রপাতি এবং দ্রব্য এখনও অনেক নীচু দরের

৪। কতগুলো শিল্প যেমন তুমুল বাড়ছে—কতগুলো আবার পেছিয়ে পড়ে আছে।

৫। মাথা পিছু উৎপন্ন দ্রব্য ধনিক দেশগুলো থেকে অনেক অল্প।

১৯২৯ সালের আগে পর্যন্ত রাষ্ট্রের অধিনায়করা চাষীদের ব্যক্তিগত প্রয়াসকে মানিয়ে চলেছেন, বড় বড় শিল্প পরিকল্পনাকে আমল দিতে ভরসা পান নি। ফলে কুলাক ও চাষীরা যখন বেড়ে উঠে শস্য আটকে রাখলো,—সহরে শ্রমিকদের মধ্যে অন্নসঙ্কট দেখা দিলো,—রাষ্ট্রনায়কদের টনক নড়লো তখন। ১৯২৯ সালে পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্প নিয়ে তাঁরা অত্যধিক ব্যস্ততার সঙ্গে চাষীদের সঞ্চিত শস্য আত্মসাৎ করতে এবং কুলাক শ্রেণীর উচ্ছেদ করতে তৎপর হলেন,—ব্যক্তিস্বত্ব ভেঙ্গে দিয়ে যৌথ চাষবাড়ি গড়তে লাগলেন। কুলাকরা শিল্পযন্ত্র ভেঙ্গে,—চাষীরা গরুঘোড়া, বীজ, যন্ত্রপাতি সব নষ্ট করে পাল্টা জবাব দিলো। ফলে উৎপাদিকা শক্তি ব্যাহত হয়ে রইলো বহুদিনের মতন।

১৮৭৫ সালে মার্ক্স লিখেছিলেন যে সাম্যতান্ত্রিক সমাজের প্রথম পর্যায়ে বুর্জোয়া আইন না মেনে গত্যন্তর নেই। লেনিন টিকায় বলেছিলেন যে বুর্জোয়া আইনের সঙ্গে এসে পড়ে বুর্জোয়া রাষ্ট্র—ভোগ্য বস্তুর ভাগ-বাঁটোয়ারায় বুর্জোয়া পদ্ধতি নিয়ে। উৎপাদনে সাম্যপন্থা, বণ্টনে বুর্জোয়া পন্থা, —শিশু সমাজতন্ত্রের এই দ্বৈতমূর্তির মধ্যে বল্‌শেভিক কর্মধারা ও বর্তমান সোভিয়েট বাস্তবের বৈষম্য ধরা পড়ে। "সশস্ত্র শ্রমিক" না হয় রক্ষা করবে সামাজিক সম্পত্তি— কিন্তু বুর্জোয়া আইন চালাবে কে? এজন্যে চাই বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান— পুলিশ, Gendarme।

কমুনিষ্ট ইন্টারন্যাশনেল-এর সপ্তম কংগ্রেসের (২০ আগষ্ট, ১৯৩৫) থিসিসে বলা হয়েছে যে সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের এবার পাকাপাকি প্রতিষ্ঠা হলো এবং "State of Proletarian Dictatorship" সব দিক দিয়ে শক্তিশালী হয়েছে। যদি শ্রেণিহীন, দ্বন্দহীন সমাজই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে তবে "Proletarian Dictatorship" এর মানে কি? "State" এরই বা আবশ্যক কি? লেনিন বলেছেন—proletariatদের জন্য রাষ্ট্র চাই বই কি;—কিন্তু সে হবে মৃত্যুমুখী রাষ্ট্র—"a state constructed in such a way that it immediately begins to die away and cannot help dying away" (State and Revolution)। সোভিয়েট রাষ্ট্রযন্ত্র ক্ষয়ের দিকে না গিয়ে বৃদ্ধির দিকেই চলেছে।

"একদেশী সমাজতন্ত্র-বাদ" এর আবিষ্কর্তা George Volmar প্রমুখ জার্মান সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা,—মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্ নয়। তাঁদের উদ্ভাবিত "ধনতন্ত্রের অসম বিকাশ" (Law of Unevenness of Capitalist Development) এর সূত্রটিকে ধরে লেনিন প্রতিপাদন করেছিলেন যে প্রথমে একটা বা কয়েকটা দেশে শ্রমিক বিপ্লব সম্ভব হতে পারে;—"এ রকম দেশের বিজয়ী শ্রমিক মালিকশ্রেণীকে উৎখাত করে স্বদেশে সমাজতন্ত্রী উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করে ধনতন্ত্রী জগতের সম্মুখীন হবে; অপর দেশের নিপীড়িত শ্রেণীকে আহ্বান করবে এবং দরকার হলে অন্যান্য দেশের শোষক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে বেরিয়ে আসবে" (United States of Europe)। লেনিনের এই নির্দেশের মধ্যে নিহিত রয়েছে আজকের যুধ্যমান মতবাদ দুটো—

"Socialism in One country" এবং "Permanent Revolution,"—একদেশী সমাজতন্ত্র ও 'চিরন্তন বিপ্লব'। যেমন বুর্জোয়া গণতন্ত্র ধীরে সুস্থে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে পরিণত হতে পারে না—তেমন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র-চক্রের মধ্যে শান্তিতে বাস করতে পারে না;—একথা লেনিন অস্বীকার করেন নি। ট্রট্স্কির বক্তব্য এই যে ইতিহাসের দুর্নিবার তাগিদে আজ সমাজতন্ত্র আসছে শান্তির পথে নয়, দীর্ঘ, ধারাবাহিক, বিশ্ব-বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে—যুদ্ধ ও বিপ্লবের মধ্য দিয়ে—"On the historic order of the day stands not the peaceful socialist development but a long series of world disturbances : wars and revolutions" (The Revolution Betrayed)

বহির্দেশে বিধ্বস্ত গণ-আন্দোলন ও জয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদ ষ্টালিনের মতকে পোষণ করেছে। বুলগেরিয়ায় সশস্ত্র বিপ্লব ও জার্মান শ্রমিকদল পরাস্ত হলো ১৯২৩ সালে। পরের বছর এস্তোনীয়দের বিদ্রোহ-প্রয়াস ব্যর্থ হলো, ইংলণ্ডে সাধারণ ধর্মঘট বিশ্বাসঘাতকতা করে ভেঙ্গে দেওয়া হলো। পোলাণ্ডে ১৯২৬ সালে পিল্‌সুড্স্কির অভ্যুত্থান এবং শ্রমিকদলের আত্মসমর্পণ, ১৯২৭ সালে চীনে চ্যাং-কাই-সেকএর কম্যুনিষ্ট দলন, তারপর জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ায় শ্রমিক শক্তির উচ্ছেদ এবং সবশেষে সোভিয়েট কর্তৃক জাপ সরকারকে প্রাচ্য চীন রেলপথের স্বত্ব সমর্পণ— সব মিলে রুষ জনগণের মধ্যে বিশ্ববিপ্লবের ভরসা কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু পররাষ্ট্রনীতিতে সোভিয়েট সরকারের এই নিরবচ্ছিন্ন পরাভবের কারণ শুধু শত্রুপক্ষের শক্তিমত্তাই নয়—কতকাংশে নিজেদের অবিবেচনাও বটে। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে—যেমন চীনে, ট্রট্স্কি সরকারি নীতিকে বাধাই দিয়েছিলেন—ও তাঁরই যুক্তির সারবত্তা পরে প্রমাণিত হয়েছে।

ইউরোপ ও এশিয়ায় স্থিতাবস্থার সংরক্ষণ চুক্তিতে যোগ দিয়ে সোভিয়েট সরকার নিজ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিহিত করেছে। স্থিতাবস্থার (status quo) সংরক্ষণ স্থিতস্বার্থের (vested interests) সংরক্ষণের নামান্তর মাত্র। League of Nationsএর লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদীদলের স্বার্থরক্ষা—Communist Internationaleএর লক্ষ্য বিশ্বময় সাম্য ও স্বাধীনতার আন্দোলন পরিচালনা করা। উভয়ের মিতালিতে কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনেল বা সোভিয়েট কি খুব বেশী লাভবান হয়েছে?

ইতিপূর্বে সোভিয়েট ইউনিয়নের সাম্য ছিল নিঃস্বের সাম্য। এবার আর্থিক প্রগতির ফলে স্বার্থবৈশিষ্ট্য (privilege) সম্ভব হয়েছে। রাষ্ট্রীয় কর্মচারী ও বৃত্তিভোগীদের মধ্যে স্বাচ্ছল্য এবং নিম্ন গণসাধারণের মধ্যে অভাব অনটন পাশাপাশি বিরাজ করছে—রাষ্ট্রবিত্তের মধ্যে পর্যন্ত speculation ও ব্যক্তিগত প্রয়াস বিস্তার লাভ করছে। বেতনের অসাম্য এবং দক্ষ শ্রমিকদের (Stakhanovist) প্রশ্রয়ের ফলে proletariatদের মধ্যে ভেদ দেখা দিচ্ছে। যৌথ প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যেও এই বৈষম্য সমানভাবে ক্রিয়া করছে। ফলে যেখানে সমাজতন্ত্রের মার্ক্সিষ্ট মন্ত্র

ছিলো"—সামর্থ্য অনুসারে কাজ, প্রয়োজন অনুসারে ভোগ," সেখানে নব্য রাষ্ট্রবিধানে (ধারা—১) ব্যবস্থা হয়েছে—"সামর্থ্য অনুসারে কাজ, কাজ অনুসারে ভোগ।"

এই স্বার্থ বৈষম্যের মধ্যে শাসক সম্প্রদায় আজ উর্ধ্বতন স্থান অধিকার করে আছে। সরকারি হিসেব অনুযায়ী এঁদের গড়পড়তা মাসিক বেতন ১০০০ রুব্‌ল্ (যান বাহন, personal staff ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা বাদে) আর শ্রমিকদের ১২৫ রুব্‌ল্। অবশ্য ভোগদখল এখনও বংশানুক্রমিক হয় নি। কিন্তু বিদেশী সাম্যবাদী দ্রষ্টাদের অনেকের মতে সে আশঙ্কা নেই এমন কথা বলা যায় না। Andre Gide বলছেন—"বেতনের অসাম্যের আমি প্রতিবাদ করি না—মানলাম এর প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু অবস্থার অসাম্য দূর করার উপায় আছে; আমার ভয় হয় যে এই তফাৎগুলি কমার পরিবর্তে বেড়েই চলেছে। আমার আশঙ্কা যে শীঘ্রই এক নতুন এবং সন্তুষ্ট (সুতরাং রক্ষণশীল) শ্রমিক-বুর্জোয়ার উথান হতে পারে—যার সঙ্গে আমাদের অধস্তন বুর্জোয়ার খুব নিকট সাদৃশ্য থাক্‌বে।"—"I fear that a new and satisfied workers' bourgeoisie may soon arise (satisfied and therefore of course conservative) which will come to resemble all too closely our own petty bourgeoisie' (Back from the U. S. S. R)।

এই পশ্চাদ্বর্তন নীতির সাথে সাথে ঘটছে গণসেনার (militia) ক্রমবিলয় এবং তার স্থানে স্থায়ী বাহিনী (regular army) ও অফিসার বিভাগের (officers ranks) প্রত্যাবর্তন। ট্রট্স্কির মতে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হবে বিপ্লব। সোভিয়েট অন্তর্বিপ্লবের ফলে যদি যুদ্ধ এড়ানো না যায় তবে যুদ্ধ ডেকে আনবে বিপ্লবকে—"If the revolution does not prevent war, the war will help the revolution" (The Rovolution Betrayed)। কেন? কারণ যুদ্ধের দুর্দিনে রাষ্ট্রকে বর্তমান ব্যক্তিস্বত্বের মুখ চাইতে ও তাকে প্রশ্রয় দিতে হবে, বিদেশী মিত্র শক্তির মূলধন নিতে এবং তার সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যের একাধিপত্য (monopoly) খোয়াতে হবে, trust গুলির ওপর রাষ্ট্রের মুঠি শিথিল করে দিতে হবে (The Fourth Internationale and War, 1934)। এই প্রতিক্রিয়া ধারাগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়াবে সমাজ-বিপ্লবের শক্তি যা জীবিত রয়েছে বিত্তের বৈষম্যের মধ্যে—শ্রমিক সাধারণের চেতনার মধ্যে।

যুদ্ধে সোভিয়েটের সুনিশ্চিত পরাজয় ও তার পূর্বে অথবা পরে সুনিশ্চিত বিপ্লব সম্বন্ধে ট্রট্স্কির নিঃসংশয় সুদৃঢ় ভবিষ্যদ্বাণী সোভিয়েট সরকারের পক্ষে বিপজ্জনক ও তাই অসহনীয়। সোভিয়েট সরকারের আর্থিক ও সামরিক শক্তিও অতো অপ্রচুর বলে মনে হয় না এবং সোভিয়েট অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈষম্যও এত তীব্র হয়নি যাতে অতো বড় একটা বিপ্লব ঘট্‌তে পারে।

ট্রট্স্কির ত্রুটি এইখানে। তাঁর অভিযোগগুলির মধ্যে অতিরঞ্জন আছে, পরাহত যোদ্ধার উষ্মা আছে। শিল্পোন্নয়নের কাজে পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পের অনুপম সাফল্য এবং সোভিয়েটের রণ-সম্ভার তাঁর দৃষ্টির বাইরে পড়ে আছে। লেনিন তাঁর এক বিখ্যাত ইস্তাহারে অত্যুগ্র সাম্যবাদীদের

যে 'infantile malady'র উল্লেখ করেছিলেন, ট্রট্স্কির মধ্যে কখনও কখনও সেই রোগের লক্ষণ দেখা গেছে। ট্রট্স্কি তাঁর আত্মজীবন ভূমিকায় বলেছেন—"I am not in the habit of contemplating historical perspectives from the angle of personal destiny. To recognise the fixed laws of events and to find ones place in them is the first duty of the Revolutionary, and the highest personal satisfaction which can be experienced by a man who does not confine his task to the day."। কিন্তু ঠিক এই ভুলই ট্রট্স্কি করেছেন। তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টিকে আত্মচেতনা কোন কোন সময়ে আচ্ছন্ন করেছে।

অন্যদিকে এও দেখতে হবে যে ট্রট্স্কির সঙ্গে সংঘর্ষে ষ্টালিনের দল সর্বদা ন্যায়যুদ্ধের কানুন মেনে চলেন নি। সরকারী অভিধানে ট্রট্স্কাইট বলে যাঁদের নাম আছে তাঁরা সবাই ট্রট্স্কির অনুবর্তী নন। সরকারী নীতির সঙ্গে ভিন্নমত ও বিরুদ্ধচারী সকলেই ট্রট্স্কাইট,—যতকিছু সরকার-বিরোধী আন্দোলন ও চক্রান্ত সমস্তের দায়িত্ব চাপানো হয় ট্রটস্কির ওপর। ট্রট্স্কি যে বুখারিন প্রভৃতি ডানপন্থীদের ষ্টালিনের চেয়েও বিষাক্ত বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছেন একথা মনে রাখা উচিত। ব্যক্তিগত দুর্ব্যবহারও ট্রটস্কির ওপর হয়েছে (যেমন Ioffeতে)। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে দ্বৈরথ সমরে পার্লামেণ্টি কৌশল ও বৈপ্লবিক কৌশল এক হয় না।

এখানেই প্রশ্ন এসে পড়ে—সোভিয়েট রুষে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কতটুকু আছে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রথম অবস্থায় এখানে চলতে পারে নি। কিন্তু আজ স্থিতস্বার্থ শ্রেণী উচ্ছন্ন হয়েছে। এখন সমাজতন্ত্রের ধারা পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে মতভেদকে রাষ্ট্রদ্রোহ আখ্যা দিলে চলবে কেন? দ্বন্দ্বহীন একমত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস মার্ক্সীয় ডায়লেকটিক্স-এ আস্থার পরিচয় দেয় না। অথচ এই একমত প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ চেষ্টাই শাসনের মূলনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নব্য গণতান্ত্রিক শাসনবিধি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যাবতীয় প্রতিপক্ষদলের ধ্বংসস্তূপের ওপর। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় অধিনায়করা যে সব প্রার্থীকে খাড়া করেন শুধু তাঁদের ভেতর থেকে ভোটদাতাদের প্রতিনিধি বেছে নিতে হয়।* সরকারি মতে এই হচ্ছে দুনিয়ার সেরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, আর নির্বাচিত সদস্যরা না কি দলীয় ও অ-দলীয় ব্যক্তিদের মধ্যে সন্ধির প্রমাণ ("an alliance between

* ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বরে যে প্রথম নির্বাচন হয় তাতে নিম্নোক্ত প্রার্থীদের নাম কোন কারণ না দেখিয়ে নাকচ করা হয়েছিলো ;—

Mezhlauk— Vice-President of the Council of Peoples' Commissars ; General Alksnis—Vice-Commissar for Defence ; General Baukis—Director of Mechanisation of the Red Army ; Mezis— Member of Military Council for the White Russian Command ; Ozolin—Army Commissar ; General Velikanof—G. O. C. Baikal region.

the Bolshevik party and the non-party people")। কিন্তু প্রথম নির্বাচনে দেখা যাচ্ছে সুপ্রীম কাউন্সিলের শতকরা ৭৫ জন কম্যুনিষ্ট দলের সভ্য। সদস্যদের মধ্যে যে কেউ "ঠিক রাস্তা" থেকে বিচ্যুত হলে ভোটদাতারা তাঁকে কাউন্সিলের মেয়াদ ফুরাবার আগেই ফিরিয়ে ডেকে নিতে পারবে। ("—right to recall their deputies before their tenure expires, if the latter should swerve from the correct path"—Stalin in Daily Worker, 14th December, 1937)।

নির্বাচনের প্রাক্কালে ষ্টালিন বক্তৃতায় বলেছিলেন—"I cannot say with complete assurance that among the candidates for deputy (I very much apologise to them, of course) and among our public men there are not such who remind one rather of political philistines, who by their character, by their physiognomy, remind one of the people of the type about whom the saying goes : 'Neither a candle for God nor a poker for the Devil'।" নির্বাচনের তিনদিন পরে এই ভয়ঙ্কর সতর্কবাণী Pravdaয় আবার ঘোষিত হয়েছিলো। নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে বিশিষ্ট কর্মচারীদের প্রাণদণ্ড হচ্ছিলো। রাষ্ট্রদ্রোহীর গোটা পরিবার অপরাধ সম্বন্ধে অজ্ঞ হলেও ভোটাধিকার হারাবে এবং সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হবে। এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সোভিয়েট গণতন্ত্রে স্বাধীন মত প্রকাশের অবকাশ কতটুকু তা বুঝতে হবে। নব্য রাষ্ট্রবিধিতে কার্যত কম্যুনিষ্ট দলই (ট্রট্স্কির মতে ষ্টালিনের উপদল) বলবান হলো এবং শাসনযন্ত্রে একমাত্র কায়েমী দল বলে স্বীকৃত হলো।

এঙ্গেলস্ ও লেনিন বলেছিলেন যে রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন করবে আগন্তুক মানবজাতি,—অর্থাৎ আজকের যুবশক্তি। এই তারুণ্যশক্তির মধ্যে ষ্টালিনদলের কার্যপন্থা সম্বন্ধে সামান্যমাত্র জিজ্ঞাসু বৃত্তি দেখা দিয়েছিলো। তার ফলে ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে 'যুব কম্যুনিষ্ট সঙ্ঘ' (Komsomol)কে রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে নিষেধ করা হলো। এখন তাদের কাজ হয়েছে কম্যুনিষ্টদলের আজ্ঞাবহ হয়ে প্রচার কাজে আত্মনিয়োগ করা। এবিষয়ে কর্তৃপক্ষের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"we have no need of any second party।" আমরা দ্বিতীয় দল চাই না। তারুণ্যশক্তির মধ্যে একটা দ্বিতীয় দল কি মাথা তুলছিলো?

Komsomolএর বহু কর্মী ও নেতা শোধনক্রিয়ার (purge) হিড়িকে পড়েছেন। সরকারি নীতিতে সন্দেহবাদ কতদূর প্রসার লাভ করেছিলো বিচারে দণ্ডিতদের সংখ্যা ছাড়া তা ধারণা করবার অন্য কোন উপাদান নেই। কিরভ-হত্যার পর প্রাণদণ্ড হয় ১১৭ জনের (১৯৩৫ সাল)। তারপর জিনোভিভ, কামেনেভ, স্মির্ণভ প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় কম্যুনিষ্টদের বিচারে প্রাণ দিতে হলো। এর পর রাডেক, প্যাটাকভ্, সকলনিকভ্ মুরালভ্ ইত্যাদি ১৭ জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী অভিযুক্ত হলেন ও ১৩ জনের মৃত্যু-ব্যবস্থা হলো। টুখাচেভ্স্কি প্রমুখ সামরিক অধিনায়করা ৮ জন এঁদের

ভাগ্য অনুসরণ করলেন। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত অন্যূন ১৬৭ জনের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে (Daily Herald, 10th July, 1937)। তারপর সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সাড়ে এগারো সপ্তাহের মধ্যে প্রাণ দিয়েছে কমপক্ষে ৫০১ জন (Walter Citrine,—I search for truth in Russia)। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সমসময়ে ১১টি ফেডারেল রিপ্লাবিকের প্রত্যেকটির প্রেসিডেণ্টকে হয় পদচ্যুত না হয় গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো।

এই কি গণতন্ত্র—"the only correct democracy"? আর এই গণতন্ত্রের কর্ণধার যে কম্যুনিষ্ট পার্টি তার বিরুদ্ধেও ট্রট্স্কির নালিশ একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সঙ্ঘের ভেতর থেকে "Democratic centralism"এর নীতি তুলে দেওয়া হয়েছে। ষ্টালিনদলের প্রাধান্যকে ট্রট্স্কি নাম দিয়েছেন "Bureaucratic centralism।" সঙ্ঘের কর্মপন্থায় ও আদর্শে একনিষ্ঠ বিশ্বাস যে কার আছে কার নেই তা বোঝা অসাধ্য। ষ্টলিনের নিকটতম পার্শ্বচর G. P. U.র কর্তা যাগোদা,—যাঁকে ট্রট্স্কি ষ্টালিনের পাশে দাঁড় করিয়ে বহুবার গালি দিয়েছেন,—তাঁকেও গ্রেপ্তার হতে হয়েছে। লেনিনের সময়ে কম্যুনিষ্ট পার্টির কার্যকরী সভা—পলিট্‌ব্যুরো'র সভ্য যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে ট্রট্স্কি, জিনোভিভ, কামেনেভ্, রাইকভ্, বুখারিন, টম্স্কি সবাই অপসারিত হয়েছেন,—আছেন একা ষ্টালিন। বর্তমান পলিট্‌ব্যুরো'র সভ্যরা অধিকাংশই নব্য যুগের লোক—যাঁরা বলেশেভিক দলের বৈপ্লবিক ইতিহাসের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত নয়, এবং যাঁরা ষ্টালিনের আদর্শে রাষ্ট্রগঠনকার্য্যে শিক্ষা পেয়েছেন।

প্রতিপক্ষের কাজ এবং মুখ যখন বাধা পায় তখন দেখা দেয় গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসপন্থা—একথা অন্তত ভারতীয়দের অজানা নয়।

ট্রট্স্কির ভাষায় এই হচ্ছে Soviet Thermidor, Bureaucratic Dictatorship, Stalin-State। ষ্টালিনের দল ট্রট্স্কির নামকরণ করেছেন—প্রথমে Deviationist, তারপর Conter-Revolutionary, এখন Traitor। এই পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েট রাষ্ট্র বিচারগুলি অতঃপর আমাদের আলোচনা করতে হবে।
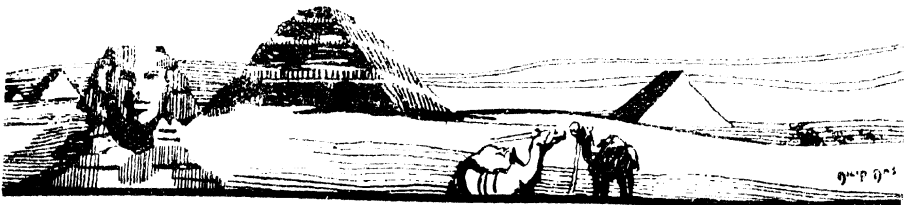
বন্দীর মন

ভুপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়

প্রত্যেক কাজের ইচ্ছা প্রয়োজনের তাগিদে, অভাবের তাড়নায়, অতএব বেদনার অস্তিত্বে। তাই প্রকৃতির নিশ্চয় এ-নির্দ্দেশ যে, জীবমাত্রই বেদনার কবলে যেতে বাধ্য। কিন্তু এর পেছনে যখন উদ্দেশ্য থাকে না, যখন প্রয়োজন মিটে গিয়ে আকাঙ্ক্ষারও অর্থ থাকে না—তখন আসে শূন্যতা, আসে অবসাদ। জীবন যেন ঘড়ির পেণ্ডুলাম, ডাইনে থেকে বাঁয়ে দুলচে সে—অর্থাৎ বেদনা থেকে অবসাদে এবং অবসাদ থেকে বেদনায় তার গতি; মোটের উপর বেদনা আর অবসাদই জীবন আলোকের পজিটিভ ও নিগেটিভ তার।

শোপেনহাওয়ারের দর্শন মূলত এই। তাই ওকে বলা হয় 'নির্ব্বেদবাদী' বা 'নৈরাশ্যবাদী।' শোপেনহাওয়ার-তত্ত্ব আমি না মানলে কী হয়?—আমার 'সেলটা' যে ওকে মেনে বোসেচে!... এ-সেলটার জীবন বস্তুতই শুধু দুঃখে আর অবসাদে ঘুরেফিরে আসাযাওয়া—ওর জীবনের কোনো অর্থ নেই, নেহাৎ শূন্যতার বোঝায় ও কুব্জ।

একটা বস্তু আমি নিবিড় কোরে বিশ্বাস করি।.. জড় বোলে কোনো কিছু নেই—সব কিছুই চেতন, প্রাণ আচে সবার-ই।

বলা হবে হয়তো—মনের প্রাচুর্য্যতায় জড়কে চেতন করা চলে, মেঘকে দৌত্য কার্য্যে প্রেরণ, পাষাণপুরীর কণ্ঠে ঝঙ্কার তোলন বা surlei পাথর-স্তূপে জরথুষ্ট্রের বাণী শ্রবণ সম্ভবপর হোতে পারে—কিন্তু তা বোলো জড় আর চেতন নয়, জড় জড়ই।

আমি বোলবো—তা নয়, তা নয়। মনের যে-প্রাচুর্য্যে জড়কে চেতন বোলে জানা যায় সে-প্রাচুর্য্য স্বাস্থ্যকর নয় মোটেই। সত্য কথা, যথার্থ কথা হোলো এই যে, জড় বোলে কোন বস্তুই নেই—আদতেই ওরা চেতন। আমাদের নিজস্ব জড়তার জন্যে ওদের চৈতন্যকে জানতে পারিনে। আমাদর জড়তা ঘুচলে দেখি, ওরাও 'জড়' নয়।

কাজেই যাঁরা সত্যিকারের প্রাচুর্য্যে জড়কে চেতন দেখলেন তাঁরা চেতনকেই চেতন রূপে জানলেন—জড়কে চেতন মনে কোরে মিথ্যের মোহে পড়েন নি। বৈজ্ঞানিক জানেন পৃথিবী ঘুরচে, আর মাথা ঘুরচে যার সে—ও জানবে পৃথিবী ঘূর্ণায়মান। এই উভয়বিধ জানায় যে-তফাৎ বর্ত্তমান, সে-তফাৎকে স্মরণ রাখলেই আমার বক্তব্য সহজ হোয়ে ধরা পড়বে।

অতএব যে-হেতু জড় বোলে কোনো পদার্থই নেই সে-হেতু আমার সেল্‌ও চেতন—এবং যে-হেতু আমার সেল্ চেতন সে-হেতু শোপেনহাওয়ার দর্শন তার তরেও প্রযোজ্য হতে পারে।

হাঁ এইযে আমার সচেতন সেল্—বাস্তবিকই এর পথচক্র ঐ বেদনা থেকে অবসাদে এবং অবসাদ থেকে বেদনায়। বিরাট ওর শূন্যতায় আমি হাঁপিয়ে উঠেচি। আমার নিজস্ব কোনো

অভাব বোধে নয়, এ cell-টার আপন অভাবকে দেখে আমি হাঁপিয়ে উঠেচি ; এবং, সঙ্গে সঙ্গে বাধ্য হয়েচি কিছুটা মেনেনিতে এই শোপেনহাওয়ার-তত্ত্ব।

পেশোয়ার জেল
১২-৬-৩৪

"হায়রে রূপকার,
না হয় কারো করোনি উপকার,
আপন দায়ে কোরেছ তুমি নিজেরে অবসান,
সে লাগি কভু চেয়ো না প্রতিদান।
পাঁজর-ভাঙা কঠোর বেদনার
অংশ নেবে শকতি হেন বাসনা হেন কার ?"

মনে পড়ে বীটোভেনের কথা। অতবড় স্রষ্টা পৃথিবীর ইতিহাসে হয়তো দু-চারজন জন্মেচেন কিন্তু জীবদ্দশায় বীটোভেনকে কেউ বুঝলো না। তাঁর সব চেয়ে নিকৃষ্ট-রচনা 'Battle Symphony'ই সমাদর পেলো তৎকালে। কিন্তু 'নবম 'সিম্ফনি' বা 'Last Quartets'—যা বীটোভেনের পরিচয়—তা কেউ ভুলেও শোনেনি তখন।

দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত বধির, একক বীটোভেন্ পথেপথে ঘুরে বেড়িয়েচেন—কেউ ছিল না তাঁর ব্যথার সাথী, কেউ ছিল-না তাঁর গুণের সমঝদার। অথচ, যথার্থ-শিল্পীর জিজ্ঞাসা ছিল তাঁর অন্তরে—পরাতত্ত্বের গভীর-স্পর্শ চোখে পরিয়েছিল নীলাঞ্জন—তাই বিশ্বকে উপেক্ষা কোরে বিশ্বাতীতের কল্পনায়ই জমেছিল তাঁর বেসাতি। হয়তো তিনি সে-বাণীই উপলব্ধি কোরেছিলেন যা সঙ্গীত কণ্ঠে বেজে হোয়ে বাঙলারউঠেচে আজ—

"হায়গো রূপকার,
ভরিয়া দিয়ো জীবন-উপহার :
চুকিয়ে দিয়ো তোমার দেয়,
রিক্ত হাতে চলিয়া যেয়ো,
কোরো-না দাবী ফলের অধিকার।
মনে জানিয়ো চির জীবন সহায়হীন কাজে
একটি সাথী আছেন হিয়া মাঝে,
তাপস তিনি, তিনিও সদা একা,
তাঁহার কাজ ধ্যানের রূপ বাহিরে মেলে দেখা।"

Sullivan তাইতো লিখেচেন বীটোভেন্ সম্পর্কে—"His latest productions convince us that he had finally effected a synthesis of his whole experience. In these moments of illumination Beethoven had reached that state of consciousness that only the great mystics have ever reached, where there is no more discord."

বীটোভেনের জীবনটা খুলে ধরলে দুঃখে-বেদনায় সহানুভূতিতে ও শ্রদ্ধায় মন ওঁকে বরণ কোরে নেয়। অন্তস্তলের সিংহাসনে এ-শিল্পীর তরে আসন একান্ত সহজেই নির্দ্দেশিত হয়ে যায়।

আজ রবীন্দ্রনাথের "রূপকার" পড়ে বারেবারেই মনে পড়চে আমার বীটোভেনের কথা।... কেন?—কে জানে?...

পেশোয়ার জেল
৫-৭-৩৪

দু'টি পাকুড়, একটি শিরীষ—সমবয়সী তিনটি তরুণীর মতো গা ছুঁয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আচে।

পাদদেশের ভূমিতে তৃণগাছেরও অস্তিত্ব নেই—কিন্তু ওদের শীর্ষ-ত্রয়ের সম্মিলনে ছোট্ট একখানি ঘনঅরণ্য। সবুজ-তকতকে নিটোল অরণ্য।

বেবিলোনের শূন্যোদ্যান এ নয়—কিন্তু শূন্যে পুঞ্জিত সবুজ-ঘণিমা একে যদি বলি, ভুল বলা হবে না।

জ্যোৎস্না ওঠে। ঘন-পাতার ফাঁকে ফাঁকে ছিটেফোঁটা রূপালী-টুকরো তার ঝলমল্ করে কাফ্রী আয়াগুলোর বুকে গোরাদের ছেলেমেয়েগুলোর মতো...আবার নিথর অন্ধকারে সমস্ত ফাঁকগুলো ঢেকে দিয়ে জমাট একখানি আঁধারের সৃষ্টি হয় ঐ ছোট্ট অরণ্যের দীর্ঘশ্বাসে তাতে মর্ম্মন্তুদ বেদনা, তাতে মাতৃত্বের খুশীতে যাদেরকে একদা লালন কোরেছিল কাফ্রী-বালা তাদেরকে কোনো এক ভবিষ্যতে আপন না ভাবতে পারার দুঃখ, অভিমান ও আত্মগ্লানির ম্লানিমা!...

আমি সেল্-এর ফাঁক দিয়ে পরম আনন্দে এ-ছবিটুকু দিনমান দেখে যাই আর রাত্তিরে বুনি ও নিয়ে কল্পনার জাল।

পেশোয়ার জেল
১২-৬-৩৫

ছোট্ট ঘরখানা। উত্তরমুখী তার জানলা। জানলার ও-প্রান্তে মাঠ। মাঠ পেরিয়ে শালের বন। আমরা সন্ধ্যা ঘনাবার পূর্ব্বে গিয়েছি মাঠে, বেড়াবার জন্যে। মিষ্টি আওয়াজ এল। ছোট্ট জানলা-পথে ভেসে-আসে সে-আওয়াজ। জেলার বাজাচ্ছিলেন এস্রাজ। গানের সুর মনের সুরকে দিলো ডাক। সান্ধ্য-ভ্রমণ ভুলে দাঁড়ালাম এসে জেলার্-এর ঘরের সুমুখে। ঘর ছিল তাঁর শূন্য। এস্রাজ বাজাচ্ছেন ভদ্রলোক একান্ত একেলায়, মনের নিভৃত-আনন্দে। কাছে এগিয়ে বোল্লাম—বাজান দিকি ছোট্ট এক টুকরো কিছু।....বিনা আড়ম্বরে এস্রাজের তারে ঝণ্‌ঝণিয়ে উঠলো ছড়টা। আমি বোসে পড়লাম জানলার সুমুখে। এস্রাজ বেজে চলেছে মধুস্নান ছড়িয়ে।

'সুদূর' উধাও হয়ে গেছে উদাসী-আঁখি তুলে মাঠ পেরিয়ে, শাল-বনের মাথা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে। সুর ঝঙ্কার তারি ইশারায় ভেসে ভেসে চলেছে অস্তম্লান আকাশের দিগন্তমুখী হয়ে। আমি সেই রূপাচ্ছন্ন অরূপ-আবহে স্তব্ধ হোয়ে আছি, আর তাময়তাঘন মনের গহিনে ডুবে-ডুবে সুর-সৃষ্টি কোরে যাচ্ছেন আমাদের জেলার বাবু। কি আনন্দস্তব্ধ তাঁর ধেয়ান, কী আত্মবিস্মৃত তাঁর সঙ্গীত-সৃষ্টির মমতা। অন্তস্তল-নিহিত কতো-যুগ-সঞ্চয়-নিঙড়ানো এ সুরজাল—এর রূপায়ণে কত অজানা চেষ্টার পরিচিতি! আমি সাঁঝের এ-স্নিগ্ধ আপ্যায়নে গাহন কোরে উঠলাম। ও যেন কবিতাময়ী ধরিত্রীর উষ্ণ-বক্ষের মিঠে দুরু-দুরু। ও যেন লীলা-চঞ্চল বিশ্বের অতন্দ্র-গুঞ্জন।...

আজকের এ-সন্ধ্যায় জেলার্ বাবুর আর্টিষ্ট-মনকে আমি চিনে ফেলেচি। সে মনের তপস্যাশ্রিত রূপবিকাশ-ক্ষণে তাঁর মনের মানুষ তাঁর জেলার্-জীবনকে স্বল্পকালের জন্যে হোলেও হত্যা কোরেচে। তাই-না ও-মুহূর্ত্তটুকু বন্দী-জীবনের পক্ষে হোলো পরম-মুহূর্ত্ত, এবং ও-মুহূর্ত্তের জেলার হোলেন সত্য শ্রদ্ধেয়।

১৩-১-৩৮

জেলের দেয়ালটা কুৎসিত বস্তু। কতোবার কতো জায়গায় তা বলেছি। তবু ওর কদর্য্যতার সঠিক পরিচয় দিতে পারিনি। যাক্, হেন প্রাচীরকে-ও আমি কখনো ভালবেসে ফেলি। এ-প্রাচীর যেন শিলাখণ্ডের বাধা— এর গায়ে ধাক্কা খায় বহির্জগৎ তার অসীম রূপশোভা ধারণ কোরে। সেই সংঘাতে সৃষ্টি হয় রসনির্ঝর। আমি মানস-চোখে সে-রসনির্ঝরকে দেখতে পাই। তার নাচুনি ছন্দে মনের ছান্দসী-যাত্রা রচনা করি।

হিজলী জেল

৩-৩-৩৮

গোচারণ-ভূমি এবার প্রশস্ততর হয়েচে। বাইরে— জেল্ গেটের বাইরে— খানিকটা মাঠ তারকাঁটার বেড়া দিয়ে ঘিরে আমাদের জন্যে তৈরী হয়েছে খেলাঘর। খেলা শুরু হয় নি। তবে সন্ধ্যায় ওখানে বেড়াবার অধিকার পাওয়া গেচে।...

সন্ধ্যা ঘনায়। মাঠে-মাঠে তার কৃষ্ণাভিসার। সমগ্র শালবন তাতে দেয় ডুব। মাথার উপরে আকাশোর্ম্মিমালী ; নীচে ধরিত্রী-সায়র ; আর উভয়কে স্পর্শ কোরে আচে স্তব্ধতার সমুদ্র। এই সাগরত্রয়ের মন্থনে উঠে আসে মানস-লক্ষ্মী, যাঁর সোনার ঝাঁপি থেকে স্বপন চুরি কোরে সারাটা নিশি কাটে আমার কম্প্র-সুখে।

হিজলী জেল

৩-৩-৩৮

জয়িনীর বেশে ঘুরে বেড়ায় সে। ভারি খুসী আমি ও-জেনে। কতো কাল তাকে দেখিনে। কতো যুগ গেল পেরিয়ে তার ভাষা আমি শুনি নি, তার আঁচলের স্পর্শ আমি পাই নি. তার চুলের গন্ধে আমি মাতি নি। আজ শুনি তার জয়যাত্রার সংবাদ. শুনি তার গৌরব-গাথা। আমায় মনে সে করে-না হয়তো। ভুলে আমায় যেতে সে চায়-নি, কিন্তু ভুলে সে গেচে হয়তো। দুঃখ তাতে কিছুমাত্র নেই। আমার জানার ভাণ্ডারে মস্ত একটি জানা রয়েচে, যার আশ্রয়ে আমি বিত্তশালী। আমি জানি, খসে পড়ায়-ও আচে আনন্দ। কেউ যদি ভুলে-ই যায় তবে তার ভুল না ভাঙানয় খুশী বড় কম নয়। সেই খুশীকে ভালবেসে আমার দিন কাটান চলে। তাই বিজয়িনীর বিজয়-বার্ত্তা জেলে জেনে যে-খুশীকে পাবো, তার পরিধি বিজয়িনীর ভুল না-ভাঙানর খুশী দিয়ে বিপুল কোরে, অপরিমিত খুশীর আনন্দে হবো আমি বিভোর।

হে বিজয়িনী, তোমার ভুলে-যাওয়া মনের কাছে এই তো আমার মৌন-লিপি। এর পাঠোদ্ধার তুমি না-করো, তাতে আমার ক্ষতি নেই।

হিজলী জেল

১০-৩-৩৮

মাঠের বুনো একটা লতায় ফুটেছে লাল ফুল একটি। নাম তার জানিনে। কী প্রয়োজন তার নাম জেনে ? যে বস্তু স্থান-কাল নির্ব্বিশেষে সমগ্র মানব-চিত্তের তরে-ই সুন্দর, তার নাম দেয়ায় সঙ্কীর্ণতা-দোষ। তাই নাম না-দিয়ে-ই তাকে তোমার মনের দরবারে পেশ কোরচি, হে মোর জয়িনী। তুমি তাকে সস্নেহে আঁচল-প্রান্তে জড়িয়ে রেখো। তারপর মনের

ভুলে পড়ুক-না সে ধুলোয় গড়িয়ে, যাক-না তার অস্তিত্ব তোমার বিজয়-রথের চাকার তলায় পিষ্ট হোয়ে।...

১০-৩-৩৮

তারুণ্যোচ্ছল-দীপ্তি ছড়িয়ে তরুণ-কুমারের পথ-যাত্রা। আকাশ-পথে পৃথিবী-পরিক্রমণ তার অভিরুচি। প্রান্ত হোতে প্রান্ত অবধি ভ্রাম্যমাণের পথ-লিখন আচে লিখিত হোয়ে। সে লিখনরেখায় কনক-তীর্থের কল্পনা। কনক-বসন-পরিহিত কনক-বরণ-তরুণ, কনক-কিরীট মাথায় চলেচে পথ-তীর্থের স্বর্ণ-পথরেণু উড়িয়ে। সান্ধ্য-প্রদোষ-ক্ষণে দিগন্তে এসে দাঁড়াল 'তরুণ' স্নিগ্ধ-নয়ন তুলে পৃথিবীর পানে। ক্লান্ত সে-নয়ন-উৎসারিত মধুচ্ছটা ঝরে-ঝরে পড়ে আকাশ-পৃথিবীর অঙ্গে-অঙ্গে। মেঘ-তিরস্করণী পশ্চিম-গগনের প্রান্ত জুড়ে ছিল ঝোলান — তরুণ-পথিক শ্রান্ত-চরণে নিল তারি আড়ালে আশ্রয়। পৃথিবীর সাথে বিরহ-কল্পনা হঠাৎ মন-তলে তার দিল নাড়া। কনক-কুমার তিরস্করণীর ফাঁকে রাগোজ্জ্বল আঁখি মেলে তাকায় তরুণী-ধরণীর মুখ পানে। মেঘে-মেঘে লাগে রঙের হোলি-গান। আকাশে বাজে রাঙা রুনুঝুনু। ধরিত্রীর সারা তনু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় রাতুল-স্পর্শ।

সপ্তপদী-যাত্রার আনন্দ-চেতনায় বেরিয়েছিল অনাদি-কুমার শাশ্বত-কুমারীর হাত ধোরে। চিরকালের কৌমার্য্য-নির্দ্দেশ চিরন্তন দু'টি তরুণ-হিয়ার অঞ্চলে গাঁট-ছড়ার বন্ধনকে দিল-না সত্য হোতে। মিলন-গৌরবে যে-পথচলার হোলো শুরু, বিরহ-সন্ধ্যায় তাকে ক্ষান্ত কোরে দেবার বিধান আসে মর্ম্মান্ত কোরে। বিরহ-ব্যাথায় কাঁদে তরুণ—রক্ত-চরণে লুকিয়ে যায় পথচারী সে-কুমার, পৃথিবীর বুকে-মাথায় শেষ-চুম্বন চিহ্নিত কোরে। বিরহ ব্যথায় কাঁদে পৃথিবী— শোকাচ্ছন্ন আঁধার-শয্যায় শায়িতা সে-কুমারীর অন্তর্দাহ, শ্বসিয়ে ওঠে দীর্ঘশ্বাসে।

স্তব্ধ-মৃত্যুর কালো-অভিসার নাবে নিঃশেষে। মৃত্যুর সে-একান্ত-অভিসারের তীরে বোসে ভাবি আমি— এ বিরহ-সায়রের অনন্ত কল্লোলোচ্ছ্বাসে বিন্দুতম অবদান কি আমারো নয় ?...

মর্ম্মরিয়ে বেজে যায় শুক্‌নো পাতা। আক্ষেপে গুমরে মরে শালের বন। বেদনায়, থরোথরো কাঁপে পদতলের তৃণদল ! অশ্রু-স্নাত অন্তরে আমার বাজে তাদেরি প্রতিধ্বনি ! হায়রে তাদেরি প্রতিধ্বনি !...

হিজলী জেল
১১-৩-৩৮

সদা সত্য কথা

(বা কাব্য সমালোচনা ।)

অমলেন্দু দাশ গুপ্ত—

শাস্ত্রে আছে,—সদা সত্যকথা কহিবে। বাল্যশিক্ষাতেও আছে। জীবনের সিঁড়ির গোড়ায় বালককালে মন যখন শিশু থাকে, তখন যে উপদেশটী দেওয়া হয়, তাহাই আবার বাকী সিঁড়ির শেষ ধাপে প্রৌঢ়কালে মন যখন দ্বিতীয়বার শিশু হয় তখন আবৃত্তি করা হয়; প্রৌঢ়ে ও বালকে যে সাদৃশ্য আছে, বাল্যশিক্ষায় ও শাস্ত্রেও সেই সাদৃশ্য। এতে কিন্তু শাস্ত্রকে অশ্রদ্ধা করা হইল না, এ যেন আপনাদের খেয়াল থাকে। বাল্যশিক্ষাকে আমি সেই সম্মান দেই যে সম্মান নদী তার জন্মগুহাকে দেয়, কিম্বা ইঞ্জিনীয়ার বাড়া গড়িতে গিয়া ভিত্তিকে দেয়। এই সূত্রে শাস্ত্রের মর্য্যাদাও ইঙ্গিত করা হইল, বুঝিয়া নিতে হইবে।

অতএব—সদা সত্য কথা কহিবে। মানে, একান্তই যদি মুখ বুজিয়া না থাকিতে পার তবে যে কথা কহিবে, তা যেন সত্য কথাই হয়, নইলে বোবা থাকিয়া যে শোভা ছিল, সেই 'তাবচ্চ' আর থাকিবেনা। মূর্খ বলিয়া ধরা পড়িয়া যাইতে হইবে।

তাই বলিয়া কেহ যেন আপনারা মনে না করেন যে, আমি বলিতে চাহিতেছি যে, সত্য কথা বলে বোকারই! আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, নিতান্তই যদি মুখ বুজিয়া না থাকিতে পার তবে সত্য কথাই কহিও। এখন কথাটা একটু সংশোধন করিয়া কহিতে চাই,—বলার যদি কিছু না থাকে তবে আর কি করিবে, সত্য কথাই কহিও—ঠেকা কাজ চালাইতে হইবে তো! খেলায় ছুটিতে না পারিলে বুঁড়ি ছুঁইয়া ফেলা নিরাপদ: জীবনে বক্তব্য যদি না থাকে তবে বলা দিয়া সত্য বুড়িটাকে ছুইয়া থাকা নিরাপদ বই কি। আত্ম-প্রকাশ করিতে না পারিলেই আত্মহত্যা করার বিধি দিতে হইবে এ কোন কথা নয়। আত্মপ্রকাশ করার শক্তি যদি নাই থাকে, দুঃখ নাই, আত্মরক্ষার পথে সোজা পা বাড়াইয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। সত্য হইতেছে সব চেয়ে সুরক্ষিত দুর্গ অতএব, সদা সত্য কথা কহিবে।

সদা সত্য কথা কহিবে—শোনা মাত্রই কথাটা মনে ধরিয়া যায়। সত্য সম্বন্ধে মানুষের এ দুর্ব্বলতা আছে। কাজেই দুর্ব্বলের জন্য এ বাণী ও উপদেশ প্রচার করা হইয়াছে, এ সন্দেহ করা যাইতে পারে। মিথ্যার ধাক্কা বা ঝক্কি সামলান পোনের-আনা লোকের পক্ষেই অসম্ভব, তাই সত্যের দুয়ারটা খোলা রাখা হইয়াছে,—অত হাঙ্গামায় কাজ কি, জীবনের ঠেলাঠেলি হইতে মরিয়া নিশ্চিন্ত হইবার প্রশস্ত পথ যখন একটা আছেই।

পোনের-আনা বাদ গেলে থাকে এক আনা। তাহারা উপদেশ দেয়না-দেয়। শক্তিমান কখনও উপদেশ কোথাও গ্রহণ করিয়াছে, ইতিহাস এরকম কোন দুর্ঘটনার উল্লেখ করে নাই।

উপদেশে বড় দলের প্রকোপ পড়ে, দুধপানে ভুজঙ্গের বিষবর্দ্ধনের মত, তবু লাঠি ঔষধের মত উপদেশ ঐ একই ক্ষেত্রে বারবার প্রয়োগ হয়। এক আনার দল মানে সবল ব্যক্তি উপদেশ নেয়না, বড়জোর পরামর্শ করে।

এরা বলে,—সত্য বল আপত্তি নাই, কিন্তু খবরদার অপ্রিয় সত্য বলিওনা। এরা সত্যের খাতির করে না, প্রিয়কেই শুধু চাহে। প্রিয় যদি সত্য পোষাকে না আসে ক্ষতি নাই, তাকে মিথ্যায় সাজিয়া সুন্দর হইয়া আসিতে দেও। সত্য মিথ্যা কারু কোন রূপ নাই, প্রিয়ই তাকে রূপবান করে। এরা প্রিয়ের পূজারী, মন্দিরটা সত্যের সোনারই হৌক, কিম্বা, মিথ্যার মর্ম্মরে গঠিত হৌক এতে এদের কিছু যায় আসে না।

মিথ্যার দিকেই সুন্দরের আকর্ষণ, তাই মিথ্যাই প্রিয়ের আভরণ বা বাহন,—সত্যের সঙ্গে সুন্দরের সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে। কাজেই মিথ্যা, প্রিয় ও সুন্দর তুল্যার্থক। বিশ্বাস করিতে বেগ পাইতে হইবে না, কথাটার প্রমাণ দিতেছি।

ধারাবাহিক ভাবে এই সপ্তাহখানেক রবীন্দ্র সাহিত্যের সমালোচনা চলিতেছে, কাজেই কাব্য হইতে নজীর উদ্ধৃত করিতেছি।

বাল্যশিক্ষায় একটী কবিতা আছে—প্রভাত সম্বন্ধে। তাহা এই—

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল,
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।
গগনে উঠিল রবি লোহিত বরণ,
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন।

এর ভাষ্য—পাখীরা চেঁচাইতেছে, রাত্র ফুরাইয়া শেষ হইয়াছে, বাগানে সবগুলি কলিই ফুটিয়া ফুল হইয়াছে, আকাশে লাল রংয়ের সূর্য্য আসিয়াছে এবং রৌদ্র পাইয়া লোকেরা বেশ খুসী হইয়া উঠিয়াছে।—এর কোথাও বাহুল্য দোষ নাই, ফটোর মত একেবারে real ছবি, সত্যবাদীর খাঁটি কবিতা। কিন্তু কবিতার রস রূপ ইত্যাদি শত টীকা টীপ্পনীতেও এর মধ্যে তালাস করিলে মিলিবে না।

মিথ্যাবাদীর ভোরের বর্ণনা দিতেছি—

পূরবে মেঘমুখে পড়েছে রবিরেখা,
অরুণ রথচূড়া আধেক যায় দেখা।

ভাষ্য নিষ্প্রয়োজন। টিপ্পনীতে বক্তব্য এই যে, বর্ণনাটী আগাগোড়া মিথ্যা, একদম বানানো। প্রথম মিথ্যা—মেঘের মুখ, দ্বিতীয় মিথ্যা সূর্য্যের রথ ; তৃতীয় মিথ্যা সে রথের চূড়া।

চূড়ান্ত মিথ্যা—বিচারকের কাছে ধরা পড়িবে। কিন্তু বিচারক বলিবেন, কারণ তিনি এ মিথ্যায় মুগ্ধ হইতে বাধ্য,—মিথ্যা বটে, কিন্তু রূপময়, কাজেই প্রিয়। সত্যবাদীর জোর চোখের দেখায়, মিথ্যাবাদীর জোর মনের রূপে। চোখে যে ছায়া পড়ে তা ছায়াই শুধু—কিন্তু মনে যে ছায়া পড়ে তা মায়া। অতএব রায় দিতে হয় যে, মিথ্যাটাই সৃষ্টি, মিথ্যাটাই রূপ এবং মিথ্যাটাই প্রিয়। সত্যের দিকে 'অস্তি' আর 'জাতি' থাকিতে পারে, কিন্তু 'প্রিয়টা' পড়িয়াছে এ 'নাম' ও 'রূপের' দিকে অর্থাৎ মিথ্যার দিকে।

"আহা, কি সুন্দর নিশি চন্দ্রমা-উদয়"—জ্যোছনারাত্রের কবিতা। মিথ্যালেশ মাত্র নাই—কাজেই কবিতারও কণা মাত্র নাই। এই জ্যোছনারাত্রকেই মিথ্যার চোক দিয়া অর্থাৎ রসের ও রূপের চোখে দেখিলে কি হয় উদ্ধৃত করিতেছি—

"শুক্লা একাদশীর রাতে
নিদ্রাহারা শশি,
স্বপন পারাবারের খেয়া
একলা চালায় বসি।"

এর মধ্যে মিথ্যা ছাড়া কিছু নাই। কাজেই এ নিখুঁত সৃষ্টি হইয়াছে, কবিতা হইয়াছে।

আপনারা বলেন, সূর্য্য পশ্চিমে অস্ত যাইতেছে। এ অতি সত্য কথা,—সূর্য্য ঐ দিকেই সন্ধ্যার আগে অস্ত যায়। কিন্তু এ কথায় সত্যই কি রূপসৃষ্টি বা রসসৃষ্টি হয়? কিন্তু সৃষ্টির নমুনা দেখুন, মিথ্যার আশ্রয় নিয়া তবে কবি কবিতা রচনা করেন,—"ঐ যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা।" সত্যকে সত্য জানায় বলায় কোন কৃতিত্ব মানুষের নাই, সেখানে সৃষ্টির অবকাশ নাই। কল্পনার অবসর যদি না থাকে তবে, রচনা হইবে কোন বা কিসের পটভূমিকায়? কল্পনাই সৃষ্টির প্রথম ও শেষ কথা। মিথ্যার অন্য নামই কল্পনা।

এই কল্পনাই যাদুমন্ত্র, যার সাহায্যে মানুষ স্রষ্টা হয়, সত্যকে সত্য বলার কোন অর্থ নাই, তাকে কল্পনার মিথ্যা রূপ ও রং দিয়া মানুষ প্রকাশ করে; সত্যের এ ছাড়া প্রকাশে বা রূপে আসিবার অন্য পন্থা নাই। কাজেই স্রষ্টা যারা, গুণী যারা,—তারা মিথ্যাবাদী, তারা কেউ সত্যবাদী নয়।

আমাদের দর্শনশাস্ত্রে আছে,—জগৎ নাকি মিথ্যা, কেবল ব্রহ্মাই সত্য। এর সরল অর্থ,—স্রষ্টাই সত্য, সৃষ্টি মিথ্যা। ব্রহ্ম, যিনিই একমাত্র সত্য, তিনি আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতে অক্ষম। তাই মিথ্যা জগতটার মানে সৃষ্টির রূপময় মায়াযবনিকাটাকে মুখাবরণ করিয়া তবে তিনি আত্মপ্রকাশক বা স্রষ্টা হইয়াছেন। মিথ্যার আশ্রয় ছিল তাই ব্রহ্মের অস্তিত্ব নিজের প্রকাশ খুঁজিয়া পাইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশ করিতে যাইয়া কেবল মিথ্যাটাই প্রকাশ করিতেছেন, মায়ার পর্দ্দায় বিচিত্র সৃষ্টির মিথ্যা রূপ আঁকিয়া যাইতেছেন।

এই জন্যই এই অঘটন ঘটাইতে পটীয়সী মায়া ব্রহ্মের এত সোহাগিনী। ব্রহ্মের যাহা মায়া বা সৃষ্টি, মানুষের তাহাই কল্পনা বা রূপসৃষ্টি। তাই মানুষ কল্পনাপ্রিয় মানে কল্পনা মানুষের প্রিয়া। যার কল্পনা নাই, সে একক নিঃশব্দ, তার প্রেমের আশ্রয়ভূমি নাই। কল্পনা বা মিথ্যাই মানুষের প্রেমপাত্রী বা প্রেমের আধার। মানুষ মিথ্যাকে এই কারণেই ভালোবাসে। মিথ্যা ব্যতীত মানুষের ভালোবাসার অন্য কিছু নাই, কারণ অন্য কিছু তাকে সৃষ্টির সুযোগ দেয় না, স্রষ্টা হইবার আনন্দ দেয় না। স্রষ্টার সৃষ্টিক্ষুধা ধারণ করিতে, তৃপ্ত করিতে মিথ্যাই সক্ষম। মিথ্যাকে যদি শক্তি বলা যায়, তবে মানুষকে বলা চলে সেখানে শিব বা পুরুষ। শক্তি বরাবরই পুরুষের একমাত্র প্রিয়।

মিথ্যা যে কত প্রিয়, তার নমুনা দেই।—

আপনার চোখ খালি, মেয়েরা তাতে একটু মিথ্যা কাজল মাখিয়া লয়; খোলা চোখ নগ্ন, তার রূপ নাই, তাই কাজলের মিথ্যাটুকু দিয়া মেয়েরা চোখকে যেন চোখ আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেয়।

আপনার হাত নগ্ন, খোলা; মেয়েরা সেখানে সোনার কাঁকণ পরিয়া খানিকটা মিথ্যা রিণিঝিনি ছল করিয়া বাজায়—মানে বাহু যে প্রকাশের বস্তু এ আনন্দ সম্বাদ প্রকাশ করিয়া দেয়। (ভাবটা রবীন্দ্রনাথ হইতে সজ্ঞানে ধার করা।) সূর্য্যকে দেখা কষ্টকর, সে নিজেকে দেখায় না যতটা সে অন্যকে দেখাইয়া দেয় সূর্য্যের সত্যদৃষ্টিতে চোখ অন্ধ হয়, অর্থাৎ সে দেখার নহে। আর— চাঁদ—নিজের মুখে অনর্থক কলঙ্কের কালো দাগ লাগাইয়া সবার চেয়ে দেখার বস্তু হইয়া রহিয়াছে। কালো দাগটুকু যে কত বড় ছলনা কবি মাত্রেই জানেন।

এক তরুণ কবির কবিতা মনে পড়িল—

> "ভোর হোল ভেবে কাক-জ্যোৎস্নায় ফুকারিয়া উঠে পাখী
> নারী নব অবগুণ্ঠনতলে ছলনারে রাখে ঢাকি।"

প্রকাশের ধর্ম্মই এই, সুন্দরের স্বভাবই এই যে, ছলনা, অবগুণ্ঠন মিথ্যা মায়া ইত্যাদি তার শক্তি, নতুবা নিঃসঙ্গ এক শূন্যের নামান্তর শুধু হইয়া পড়ে।

কথা দিয়াছিলাম, রবীন্দ্রকাব্য সমালোচনা করিব। কথা রাখিলাম না, আশা করি এতে আপনারা সুখী হইয়াছেন, কারণ হওয়া উচিৎ।—রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এত পড়িয়াছেন, এত শুনিয়াছেন যে, যা একটু কম হইলে ক্ষতি ছিল না। তার চেয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা একটু পড়িলে কাজ দিত। রবীন্দ্রনাথকে যদি নিজেরা উপভোগ না করিয়া থাকেন, কারু সাধ্য নাই আপনাদের সাহায্য করিতে পারে। অন্ততঃ আমি মনে করি যে, কাব্য এমন বস্তু যেখানে পরের মুখে ঝাল খাওয়ার পথ নাই। সমালোচকের কোন মূল্য আছে এ আমি স্বীকার করিতে রাজী নহি, মানে রবীন্দ্রকে বুঝাইবার দায়িত্ব আপনাদের খুসী হইলে আপনারা লইতে পারেন, আমি ওর মধ্যে নাই।

কবি, গুণী, শিল্পী—এদের সৃষ্টি রসবস্তু। রস ভোগের বস্তু। সমালোচনা যদিই বা রস হয়, তবে সে রস উপভোগের নয়—দুর্ভোগের বস্তু।

জীবন বিধাতার সৃষ্টি। কাজেই এখানে আসা মানে রসের নিমন্ত্রণে আসা। জীবন ভোগের বস্তু—আনন্দরস নিত্য বণ্টন হইতেছে। ভালোমন্দ খুঁটিনাটি বাছবিচার করিয়া দুর্ভোগ ভুগিবার দুর্বুদ্ধি ছাড়ুন। জীবন পাইয়াছেন, পূর্ণভাবে ভোগ করুন, তবেই সত্য ও সার্থক বাঁচা হইবে।

কিন্তু সাবধান হইতে হইবে। সৃষ্টি যেমন সহজ নয়, ভোগও তেমন সহজ নয়। সত্যিকার স্রষ্টা হওয়া কঠিন, সত্যিকার ভোগী হওয়া তার চেয়েও কঠিন। স্রষ্টাকে নিরাসক্ত হইতে হয়, মুক্ত থাকিতে হয়;—ভোগীকেও সৃষ্টিভোগ বিষয়ে ঐ একই নিয়ম ও শাসন মানিতে হয়। সৃষ্টির একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া যাকে স্রষ্টারূপে পাওয়া যায়, অপরপার্শ্বে তাকেই আবার ভোক্তারূপে পাওয়া যায়। সৃষ্টির আদিতে যিনি স্রষ্টা—সৃষ্টির অন্তে তিনিই ভোক্তা। এ সত্য বিস্মৃত হইলে ভোগী হইবার অধিকার আয়ত্তে আসে না। তখন সুখদুঃখ ইত্যাদির মধ্যেই দোল খাইতে হয়, আনন্দের অমৃতরসের সন্ধান কখনও মেলেনা।

সত্যটী আমাদের মনে রাখিতে হইবে,—সৃষ্টিতে স্রষ্টাই গৃহী বা দেহী এবং তিনি ত্যাগ করেন কারণ সৃষ্টিকে তিনি ভোগ করেন,—ভোগের একমাত্র ও সত্য উপায় এই ত্যাগপদ্ধতি।

অবশেষে রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনাইয়া সমাপ্ত করি—

"সবার হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়েনে থাকতে দিনের আলো,—
বলেনে ভাই, এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো, এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্নাহাসির গঙ্গা যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
এই ভালোরে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
পুণ্যধরার ধূলোমাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।
এই ভালোরে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়,
তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে পড়া নূতন প্রাতের আশায়।

রবীন্দ্রনাথকে আপনাদের সঙ্গে আমিও নমস্কার নিবেদন করি। ইতি— *

* বকসা বন্দীশিবির সাহিত্যসভায় পঠিত—২০শে ডিসেম্বর ১৯৩১।

কে তুমি ?

বিনয়েন্দ্রনাথ রায়

কে তুমি ?
শ্রমক্লান্ত দেহখানি,
নিদ্রার শীতল ক্রোড় নিল যবে টানি ;
জাগাও আমায় ?
অতি সঙ্গোপনে,
স্নিগ্ধ পরশণে ?

হেমন্তের হিমবায়,
আবেশ মাখিয়া দেয় শিরায় শিরায় ;
ঢুলু ঢুলু আঁখি মোর তাই
ঘুরিয়া বেড়ায়,
তোমারি সন্ধানে,
শুধু অকারণে ।

আচম্বিতে শুনি,
নূপুর নিক্কণ-ধ্বনি,
বিরহীর ব্যথাসম কাঁদে গুমরিয়া,
তাই আঁখি ছুটে,
তৃষিত চাতকসম সন্ধানে তোমার,
অবশ হইয়া শুধু ফিরে বার বার ।
উতলা বাতাস আসি কাণে কাণে বলে,
ওরে ও পাগল, কেন মরিস্ অকালে ?
মৃগ-তৃষ্ণিকার পিছে বিফলে ঘুরিয়া
অন্ধ পথিকসম ।

সহসা পড়ে গো আঁখি,
চেয়ে থাকি
বসি মোর হৃদয়-সাগর তীরে,
পঞ্চম সুরে
তুমি সেথা গাহিতেছ গান,
তারি তান
স্নিগ্ধ করিল মোর প্রাণ।
যখনি তৃষিত আঁখি তব পানে চায়,
নিষ্ঠুর ব্যাধের মতো অতি দ্রুত পায়
দিগন্তে লুকাও।

চকিতে লুকাও কেন, হে নিঠুর পরাণ প্রেয়সী ?
মুগ্ধ নয়ন
তোমার চলার পথ হ'তে ফিরে ফিরে আসে ;
ভাবি বসে
এ তুমি কেমন ?

গ্রন্থ-পরিচয়

The Truth About the Peace Treaties, Vols I, II.

By David Llyod George. Gollancez, 18s each. 1938.

সাম্রাজ্যবাদ, ফাসিজম, নাৎসীজম্ প্রভৃতির মূলে যদিও বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে, তবু ভার্সাইয়ের 'Carthegenian Treaty' যে সেজন্য মুখ্যত দায়ী তাহা আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি মহলে প্রায় সর্ব্বজন স্বীকার্য্য। War-guilt এবং Vindication নিয়ে বহু পুস্তক, প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় দপ্তরের দলিলপত্র, সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনা, জীবনচরিত ও অন্যান্য বহু তথ্য এ উপলক্ষে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়েছে। লেখক বা রাষ্ট্রবিদের দৃষ্টিভঙ্গী ও উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার উপর প্রতিপাদ্য বিষয়ের লক্ষ্যবস্তু বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। বৈজ্ঞানিকের নির্লিপ্ত মনোভাব নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব, বিশেষ করে যেখানে জাতিপ্রেম ও স্বদেশপ্রীতি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিকে মোহাচ্ছন্ন করার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। লয়েড্ জর্জ্জের পক্ষে সে প্রচেষ্টা আরো নিরর্থক। যদিও তিনি নিভৃত গ্রাম্য জীবন যাপনের জন্য শেষ বয়সে রাজনীতি হতে কিছুটা দূরে আছেন, তবু তিনি এবিষয়ে নির্লিপ্ত একথা বলা যায় না। 'War-memoirs' এর মত সুবৃহৎ গ্রন্থরাজি প্রণয়নের পরই আবার ৭৫ বৎসর বয়সে The Truth about the Peace Treaties' লেখা রাজনৈতিক প্রয়োজনেই সম্ভব হয়েছে। বার্দ্ধক্যে এরূপ বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন বর্ত্তমানে আরো অনেকে করেছেন। ওয়েব্ দম্পতীর 'সোভিয়েট কমিউনিসম' তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কিন্তু ইহাদের ভিতর উদ্দেশ্যের কত ব্যবধান। লয়েড্ জর্জ্জ ভার্সাইয়ের সন্ধি পত্রকে উপলক্ষ করে আত্মদোষ ক্ষালনের চেষ্টাই পূর্ব্বাপর করেছেন। আর ওয়েব্ দম্পতী করেছেন 'a world to gain— a new subjet to investigate: a circle of stimulating acquaintances with whom to discuss entirely new topics and above all, a daily joint occupation, in intimate companionship, to interest, amuse and even excite us in the last stage of life's journey'.

বর্ত্তমান ইউরোপের রাজনৈতিক সংঘাত ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের মূলে ভার্সায়ের সন্ধি। স্বার্থান্ধ কতিপয় কূট রাষ্ট্র ধুরন্ধরের দূর এবং দার্শনিক দৃষ্টির অভাবে ভার্সাইয়ের পরিণতি এমন ব্যর্থতায়

পর্য্যবসিত হয়েছে। লয়েড্ জর্জ্জ সেজন্য Big Fourদের দায়ী করেন না। পরবর্ত্তীকালে যাঁরা সন্ধির চুক্তি এবং নৈতিক নিয়ম ভঙ্গ করেছেন তাঁরাই দায়ী।

'It is not the Treaties that should be blamed. The fault lies with those who repudiated their own solemn contracts and pledges by taking a discreditable advantage of their temporary superiority to deny justice to those who, for the time being, were helpless to exact it'. ইহা লেখার সময় নিশ্চয়ই তাঁর মনে ছিল না নিজের 'Solemn pledge' ভঙ্গ করার কথা, যাহা তিনি তুরস্ককে দিয়েছিলেন।

Mr. Keynes ভার্সাইয়ের সন্ধি ব্যর্থ হওয়ার জন্য দায়ী করেন Treaty-makersদের। 'To what a different future Europe might have looked forward, if either Mr. Ld. George or Mr. Wilson had apprehended that the most serious of the problems which claimed their attention were not political or territorial but financial and economic and that the perils of the future lay not in frontiers or Sovereignties but in food, coal and transport'. —Economic Consequences of Peace. লয়েড্ জর্জ্জ যদিও 'intentions of the Treaty-makers and their pains taking and honest efforts to carry them out' অসাধারণ বাক্‌চাতুর্য্য ও সুনিপুণ প্রকাশ ভঙ্গীর সাহায্যে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু Keynesএর উপরোক্ত বাস্তব, কঠিন সত্যের সম্মুখে এরূপ কথা একান্তই 'sliding scale of diplomatic language' বলে মনে হয়।

ভার্সাইয়ের সন্ধি ব্যর্থ হওয়ার জন্য Treaty-makersগণ ব্যক্তি ও সমষ্টিগত ভাবে দায়ী। Keynes তার অন্তঃস্পর্শী দৃষ্টি ও সুনিপুণ দক্ষতায় প্রত্যেকের যে চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন তা পড়লে সন্ধি বিফলতার কারণ অন্যত্র খুঁজতে হয় না।

'According to Clemenceau European history is to be a perpetual prize-fight...... This is the policy of an old man, where most vivid impressions and most lively imagination are of the past and not of the future. He sees the issue in terms of France and Germany, not of humanity and of European civilisation struggling forwards to a new order'.—Ibid.

'Wilson lacked that dominating intellectual equipment which would have been necessary to cope with the subtle and dangerous spell-binders whom a tremendous class of forces and personaliti s had brought to the top as triumphant masters in the swift game of give and take, face to face in council—a game of which he had no experience at all !'

'What chance could such a man have against Mr. Ld. Georges' unerring, almost medium-like, sensibility to every one immediately round him ?'

'To see the British Prime Minister watching the company, with six or seven senses not available to ordinary men, judging character, motive and sub-conscious impulse, perceiving what each was thinking and even what each was going to say next, and compounding with telepathic instinct the argument or appeal best suited to the vanity, weakness or self-interest of his immediate auditor, was to realise that the poor President would be playing blind man's buff in that party. Never could a man have stepped into the parlor a more perfect and predestined victim to the finished accomplishments of the prime minister'. —Ibid.

কাজেই 'Seated indeed amid the theatrical trappings of French saloons of state, one could wonder, if the extraordinary visages of Wilson and Clemenceau, with their fixed hue and unchanging characterisation, were really faces at all and not the tragic-comic masks of some strange dramaor puppet-show'. —Ibid.

শান্তি-সংস্থাপয়িতাদের বড় উদ্দেশ্য ছিল নিজ নিজ জাতির স্বার্থ সিদ্ধি করা। জার্ম্মেনীকে শুধু পরাজিত বা পদানত করে মিত্রশক্তি সন্তুষ্ট ছিল না। তাকে নিরস্ত্র করে ক্ষতিপূরণ বাবদ বহু কোটি মার্ক দাবী করা হয়। বিধ্বস্ত কেন্দ্রগুলি যাতে ভবিষ্যতে আর সমৃদ্ধ না হতে পারে তার ব্যবস্থাও সন্ধিতে ছিল। আবার সাম্যবাদের অভ্যুত্থান প্রতিরোধ করার জন্য জার্ম্মেনীকে পূরাপূরি নিরস্ত্র করার বাধা ছিল। কারণ সামরিক শক্তি সম্পূর্ণ অপসারিত হলে জার্ম্মেনী কমিউনিষ্ট ষ্টেটে পরিণত হবে এবং তাহা ভবিষ্যৎ ফ্রান্সের পক্ষে একান্ত বিপদজনক। জার্ম্মানীর পুনরুত্থানের আতঙ্ক, বলসেভিক ভীতি এবং বিজয়ী রাষ্ট্র নিয়ন্তাদের স্বার্থ সংঘাত এবং বিজিত জাতিসমূহের উদ্‌বুদ্ধ আত্ম অভিমান ও অর্থ নৈতিক সঙ্কটের জন্য ভার্সায়ের সন্ধির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে।

লয়েড্ জর্জ্জ Clemenceauকে সতর্ক করতে গিয়ে ব্যর্থতার কারণ আপন কথায় প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন।

'When nations are exhausted by wars in which they have put forth all their strength and which leave them tired. bleeding, and broken, it is difficult to patch a peace that may last until the generation which experienced the horrors of the war has passed away. Pictures of heroism and triumph only tempt those who know nothing of the sufferings and terrors of war. It is therefore comparatively easy to patch up a peace which will last for 30 years. What is different, however, is to draw up peace which will not provoke a fresh struggle when those who have had practical experience of what war means have passed away.......You may strip Germany of her colonies, reduce her armaments to a mere police force and her navy to that of a

fifth-rate Power ; all the same in the end, if she feels that she has been unjustly treated in the peace of 1919, she will find means of exacting retribution from her conquerors. The impression, the deep impression, made upon the human heart by four years of unexampled slaughter will disappear with the years upon which it has been marked by the terrible sword of the great war. The maintenance of peace will therefore depend upon their being causes of exasperation constantly stirring up the spirit of patriotism of justice or fairplay'.

এই নীতি সফল করতে হলে লয়েড্ জর্জ্জের ধারণা ছিল তাদের সর্ত্তগুলি অক্টোপাসের মত কঠিন ও শোষণ পরায়ণ হলেও প্রয়োগ এমন ভাবে করা দরকার যেন বিজিত জাতি সমূহ বিশেষ করে জার্ম্মেনী এদের স্বরূপ ও ব্যাপকত্ব বুঝ্‌তে না পারে। 'Our terms may be severe, they may be stern and even ruthless, but at the same time they can be so just that the country on which they are imposed will feel in its heart that it has no right to complain'.

কিন্তু একটি সুসভ্য পাশ্চাত্য জাতিকে এরূপ 'moral bluff' দেওয়া বিংশ শতাব্দীতে কতদূর সম্ভব তা তিনি বিবেচনা করে দেখেন নি।

এজন্য তাঁর বৃহৎ গ্রন্থের মহতী চেষ্টা সর্ব্বভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তবে তার ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য চিরকাল থাক্‌বে। এমন লিপি স্বাচ্ছন্দ্য,—বর্ণনা কৌশল এবং অপরূপ প্রকাশ ভঙ্গী শুধু 'Wizard of the Downing Street'এর পক্ষেই সম্ভব। জাতিগত স্বার্থ এবং রাজনৈতিক আবেষ্টন ছেড়ে তিনি যখনই উঠেছেন তখনই তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এ গ্রন্থের বহু passage পরবর্ত্তী কালের ইংরেজী সাহিত্য হিসাবে classic হয়ে থাক্‌বে। রসজ্ঞ পাঠক নিজেই পড়ে তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

'In each human heart terror survives
The ruin it has gorged : the loftiest fear
All that they would disdain to think were true :
Hypocracy and custom make their minds.
The tanes of many a worship, now out worn

বর্ত্তমান ইউরোপের এ মানসিক অবস্থা শুধু Peace Treatyর সাহিত্যিক উৎকর্ষতা ও লিপি চাতুর্য্য দ্বারা দূরীভূত হবে না, বলা নিষ্প্রয়োজন।

শৈলেশ রায়

সম্পাদকীয়

কংগ্রেস মহিলা সম্মেলন

স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী সমাজ আজ পর্য্যন্ত বহু ত্যাগ ও দুঃখ বরণ করে আপনাদের আদর্শানুরাগ ও কর্ম্মশক্তির পরিচয় দিয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী কর্ম্মীর আবির্ভাব ও সহযোগিতা ইতিহাসে নূতন নয়। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবে আমরা প্রথম উদ্‌বুদ্ধ নারীজাতির গৌরব উজ্জ্বল কর্ম্ম প্রচেষ্টা দেখ্‌তে পাই। সেই চেতনা ও কর্ম্মশক্তি সহস্র প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আপন সত্তা ও সম্ভাবনা পরিবর্দ্ধিত করে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রগতি আন্দোলনে (Franchise movement) গভীর ব্যাপকত্ব লাভ করে। মহা যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে এ আন্দোলন চিন্তা-রাজ্যে, সমাজ ও রাষ্ট্র ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং নারীশক্তিকে মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত ও সংহত করে সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি সাধনের পথে চালিত করে। বিপ্লবাত্মক সংগ্রামেও নারীজাতি পশ্চাৎপদ নয়। রুষ বিপ্লবে নারী কর্ম্মীর আত্মদান ও অগ্রগামিতা পৃথিবীর ইতিহাসে এক গৌরবময় 'শাশ্বত অধ্যায়'। বর্ত্তমান স্পেন ও চীনের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীজাতির আত্মনিয়োগ ও অবিচলিত কর্ম্মনিষ্ঠা চিরকাল পরবর্ত্তীদের পথরেখা প্রোজ্জ্বল করে ধরবে।

আমাদের দেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী জাগরণের প্রথম উন্মেষ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে দেখি। তারপর সেই নবীন চেতনা ও কর্ম্মশক্তি নানা ত্যাগ ও দুঃখ দহনের ভিতর দিয়ে প্রবল দেশাত্ম-বোধে অভিব্যক্ত হয়। অসহযোগ আন্দোলনে, সত্যাগ্রহ সংগ্রামে ইহা আরো নবভাবে জাগ্রত ও নবপ্রাণে সজীব হয়ে পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। ১৯৩০-৩২এ দেশমাতৃকার আহ্বানে ভারতের নারী সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে যে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও কর্ম্মশক্তির পরিচয় দিয়েছে তা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অতুলনীয়।

১৯৩০ সাল হতে কয়েক বছর দেশব্যাপী যে নির্য্যাতন ও স্বৈরাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে নারী সমাজের কর্ম্মপ্রেরণাকে দ্বিধা, দুর্ব্বলতা বা আকস্মিকতার দিকে টেনে নেয় নি। ইহা উত্তর উত্তর বর্দ্ধিত ও সংহত হয়ে জাতীয় সংগ্রামের প্রতীক স্বরূপ কংগ্রেসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

দেশে সর্ব্বত্রই সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী করার চেষ্টা চল্‌ছে। এ সময়ে কংগ্রেসপন্থী মহিলা সমিতি সমূহকে নিয়ে প্রাদেশিক ভিত্তিতে মহিলাসঙ্ঘ গঠন ও বিচ্ছিন্ন মহিলা কর্ম্মীদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন কল্লে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস মহিলা সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন শুধু আনন্দের নয়, আশাজনকও বটে। যাদের কর্ম্মশক্তি কংগ্রেসের অনুগামী হয়েও অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে গ্রথিত ছিল না বরং কিছুটা বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ছিল, তাদের কংগ্রেস আদর্শ ও কর্ম্মপন্থাকে কার্য্যকরী করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া শুধু বর্ত্তমানে প্রয়োজনের নয়, ভবিষ্যতে বৃহৎ কর্ম্মের আয়োজনেও ইহা অত্যাবশ্যক। সভানেত্রীর সারগর্ভ অভিভাষণে পূর্ব্বাপর একথাই আছে। প্রস্তাবাবলীতে বিপ্লবাত্মক প্রগতিশীল চিন্তা ও কর্ম্মানুরাগ সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

নারীশক্তি শুধু জাতীয় স্বাধীনতা অর্জ্জনের কর্ম্মভূমিতেই সীমাবদ্ধ নয়, জীবনের উদার বিস্তীর্ণ লীলাভূমিতে আপনার পথ গভীর ও প্রশস্ত করে নিক ইহাই আমরা চাই।

নিখিল ভারত প্রগতি-লেখক সম্মেলন

"আমরা,—ভারতের লেখকবৃন্দ, যারা এমন একটী যুগে জন্মেছি যে যুগ দেখেছে ধনতন্ত্রের পতন এবং যে যুগে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের নির্য্যাতনে বার বার হয়েছে আমাদের দেশবাসীর আশাভঙ্গ,—ষ্টিকে জনায়ত্ত করতে হলে এবং ঘরে বাইরে প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে গণতন্ত্রের আদর্শকে বাঁচাতে লে আমাদের কর্ত্তব্য ব্যক্তিগত পার্থক্য ভুলে এক হওয়া। আজকের এই সাংস্কৃতিক সঙ্কটের ম্মুখীন হবার জন্য এবং আমাদের ঈপ্সিত প্রতিষ্ঠানের ওপর গভীর বিশ্বাস রেখে সমাজসংস্থান নতুন রে গড়বার জন্য অবিচল ঐক্যের বন্ধনে এক কর্ম্মপন্থা নিয়ে আমাদের চলতে হবে।"

নিখিল ভারত প্রগতি-লেখক সঙ্ঘের দ্বিতীয় অধিবেশনে ডাক্তার মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ এই বলে ভারতের মনীষীদের ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন।

বিশ্বময় জাগ্রত গণচেতনা আজ সাহিত্যের শিল্পকে প্রজাপতির পাখা ও রামধনুর রং থেকে নামিয়ে এনেছে পৃথিবীর জলমাটিতে। ভাববিলাসীর আকাশচারী কল্পনায় রসের উৎস নেই, আছে প্রয়াসবহুল বাস্তব জীবনপ্রবাহের মধ্যে—যেখানে মানুষ লড়ছে প্রকৃতির সঙ্গে, শ্রেণী লড়ছে শ্রেণীর সঙ্গে,—সুখের বিষয় আমাদের শিল্পী ও সুধীরা এই রসতত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন। তাই এই সম্মেলনে শুনতে পেলাম—"ঐতিহ্যের রক্ষণ ও প্রগতির নির্দ্দেশ ভাবুক বুদ্ধিজীবিদের হাতে নেই, আছে সহনশীল গণসাধারণের হাতে। পরীক্ষামোদীর কৃতীত্ব যত বড়োই হোক, জনসাধারণের কাজে লাগবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হাতে না পারলে তার সযত্নসৃষ্ট তথ্যগুলি হবে জ্বরাগ্রস্তের স্বপ্ন এবং তার বিঘোষিত সত্যগুলি হবে দুর্ব্বলের কল্পনা।"

সাহিত্য জগতের আরো একটি সমস্যা প্রতিফলিত হয়েছে এই সুধীচক্রের আসরে। "ফ্যাসিস্ত দেশগুলিতে বুদ্ধির দাসত্ব এবং কুসংস্কার, মোহাচ্ছন্নতা ও রক্তলালসার পুনরাবির্ভাব আমাদের বীভৎসভাবে জানিয়ে দিচ্ছে সংস্কৃতির আজ কী দুর্দিন।" প্রফেসার হীরেন মুখার্জি নাৎসি নাট্যকার Johstএর উল্লেখ করেছেন—যিনি রাষ্ট্রপ্রভু গোয়েরিং এর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলেছিলেন—"বিশ্ব সংস্কৃতির নাম শুনলে আমার পিস্তলের ঘোড়ার ওপর আঙুল চলে আসে" আরো আধুনিক ও উপযুক্ত উদাহরণ হবে জাপানের কবি নোগুচি। শিল্পের আভিজাত্য, অন্তত স্বাধীনতা রাখতে হলেও আজ চিন্তাবীর ও রসদক্ষদের আত্মসম্বদ্ধ হয়ে থাকবার যো নেই, মানব গোষ্ঠির মুক্তি সংগ্রামে অনিচ্ছায় হলেও তাকে নেমে আসতেই হবে।

শিল্পের সংজ্ঞা স্থির হলো, শিল্পীর দায়ও বোঝা গেলো। কিন্তু শুধু কি এতেই শিল্প তৈরী হবে? উর্দূ সাহিত্যে অতি আধুনিক বিপ্লবী কবিতার সমালোচনা করতে গিয়ে সাজ্জাদ জাহির দেখিয়েছেন ফাঁক কোথায়। মধ্যবিত্ত কবিরা শ্রমিক সংগ্রামের পক্ষে কলম ধরেছেন পরোপকার বৃত্তি নিয়ে। "সমাজকে বুঝতে হলে এবং তার পরিবর্তন করতে হলে যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দরকার তা কবি লাভ করবেন একমাত্র সাক্ষাৎভাবে গণআন্দোলনে যোগ দিলেই।" সামাজিক ঘটনাপরম্পরা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে তিনি যদি আমাদের আবেগ অনুভূতিগুলি উদ্দিষ্ট প্রণালীতে চালিত করতে পারেন তবেই তাঁর বৈপ্লবিক প্রয়াস সার্থক হবে।

সম্মেলনের প্রথম দিনে যে চারটী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তার মর্মার্থ—১। ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তির জন্য যুধ্যমান যাবতীয় শক্তির ওপর একটা মহান্ কর্তব্য চেপে আছে, ২। পৃথিবীর লেখক যাঁরা সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিজম্ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়ছেন ভারতের প্রগতির লেখকরা তাঁদের সমধর্মী, ৩। এদেশে প্রগতিমূলক সাহিত্যের প্রবেশ বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত সরকারি নিষেধাজ্ঞা ও শুল্কের ব্যবস্থা আছে সেগুলি ঘোর সংস্কৃতি-বিরোধী, ৪। প্রাদেশিক সরকারদের পরিকল্পিত শিক্ষাপ্রণালী থেকে সাম্প্রদায়িকতা এবং সব রকম সঙ্কীর্ণতা বর্জনীয়।

সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের শোষণক্লিষ্ট দেশে যদি শিল্পীসমাজের ভাষা রাষ্ট্রসমাজের ভাষার মতো শোনায় তাতে বিস্মিত না হয়ে আশান্বিত হবারই কথা, নবযুগের প্রগতিপন্থী শিল্পীদের আমরা সম্বর্ধনা জানাচ্ছি এবং আশা করি তাঁরা স্মরণ রাখবেন যে শিল্পের যদি কোন মারাত্মক বিপদ থাকে সে গোঁড়ামী। অন্ধ বিশ্বাস ও আইনকানুনের বাঁধাবাঁধির মধ্যে যে শিল্প আটকা পড়ে যায় তার মৃত্যু অনিবার্য। আজকের লক্ষ্য স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে এটুকু ভবিষ্যৎ ভেবে রাখা মন্দ হবে না।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাঃ জ্ঞান চন্দ্র ঘোষের সুচিন্তিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ অনেকাংশে অসাধারণ, কারণ ইহা শুধু শিক্ষায়তনে

বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোচনায় সীমাবদ্ধ নয়। নিরন্ন ভারতের দুঃখ-দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা ও উন্নততর জীবন যাত্রা কিরূপে সম্ভব ; শাসক ও ধনিক সম্প্রদায়ের এ বিষয়ে স্বার্থান্ধ উদাসীনতা এবং এর ভাবী সঙ্কটময় ফল কি ইত্যাদি সবই তাঁর অভিভাষণের বিষয় বস্তু ছিল। তাঁর মতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যাপক ভাবে শিল্প সংগঠন ও শিল্পোন্নয়ন না হলে জাতির মৌলিক সমস্যার কোন সমাধান হবে না।

ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর বিদেশ হতে বিশেষজ্ঞ আমদানী করে এসব 'veritable mountain in labour'এর সুব্যবস্থার জন্য দরিদ্র জন সাধারণের অর্থ অকাতরে ব্যয় করেন। কিন্তু দেশের শিল্পোন্নয়ন প্রায় মধ্যযুগীয় অবস্থায় আছে। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'I should not be misunderstood. I have no complaint against the personnel but against only the step-motherly treatment meted out to industrial research in this country.' বৈজ্ঞানিক ভাবে জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা ও উন্নয়ন না করলে ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষ ও গণশক্তির সম্মুখে সাম্রাজ্যবাদ ও ধনিক সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ কিরূপ তমসাচ্ছন্ন তার ইঙ্গিতও অভিভাষণে দিয়েছেন। 'Indeed for any one who has followed the recent happenings in this world, with any attention, this industrial planning for India would seem to be long overdue. Now, more than ever, a planning on all points would seem an urgent and immediate necessity. The lesson of the crumbling empires and rapid rise of countries organised in deadly earnest is patent to all but the oblivious utopian.'

ভারতবর্ষে কেন 'over-due' সত্ত্বেও শিল্পোন্নয়ন হচ্ছে না অধ্যাপক ঘোষ মহাশয় বোধ হয় নিশ্চয়ই জানেন। বিদেশী গবর্ণমেণ্ট যেখানে শুধু 'step-motherly' নয়, vampire, সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যাপকভাবে জাতীয় শিল্প সংগঠন ও সংরক্ষণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে অকাতরে অর্থদান সম্ভব নয়।

বিশ বছর বৈজ্ঞানিক শক্তি প্রভাবে শিল্পোন্নতি করে রাশিয়া সমাজে, রাষ্ট্রে সম্পূর্ণভাবে আধুনিক হয়েছে। অধ্যাপক মেঘনাথ সাহা তাই বলেন 'what has been accomplished in Russia can be done in this country, provided there is a will to work'। সে সদিচ্ছা ও মহানুভবতার উপর নির্ভর করলে ভারতে কোন দিন শিল্পোন্নতি হবে না নিঃসন্দেহ।

শুধু শিল্পোন্নতি হলেই দেশের দারিদ্র্য ও অন্নসমস্যা বিদূরিত হবেনা। সাম্যবাদের আদর্শে যতদিন ধন উৎপাদন ও বণ্টন সম্ভব নয় ততদিন এ সমস্যা মানব জাতিতে থাকিবেই। আমেরিকা, ইংলণ্ড শিল্পপ্রধান। এসব দেশে এ সমস্যা কেন এমন উদগ্র মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাচ্ছে ? কেন, সুযোগ্য সভাপতি অভিভাষণে নিজেই বল্‌ছেন—'The paradox of poverty amidst

plenty mocks us in the face. In one part of the world wheat and cotton are being burnt and milk thrown into streams, while in another part half-naked people are starving. It is not difficult to get at the root of this evil'. বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থা ধারণ ও পোষণ করেছে এ 'paradox'. অর্থনৈতিক বৈষম্য, শাসক শোষিতের সম্বন্ধ সমাজ হতে লোপ না পেলে এ 'paradox' আমাদের ব্যঙ্গ করবেই করবে।

'The chaos of modern world is calling out to every man of good will and understanding to join in a great educative effort with a view to making the minds of men more flexible and adaptable, with a view to removing those narrow prejudices which are choking the paths of progress ?'

মানবজাতীর কল্যাণ সাধন যাদের জীবনের ব্রত তারা সভাপতির আন্তরিক আহ্বান সানন্দে গ্রহণ করবে।

নিখিল ভারত অর্থ নৈতিক সম্মেলন

নাগপুরে ডাঃ জ্ঞান চাঁদের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত অর্থনৈতিক সম্মেলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন হয়েছে। অভিভাষণটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এমন সুচিন্তিত, সারগর্ভ, সম্পূর্ণ যুগোপযোগী এবং জাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত অভিভাষণ আমরা খুব কম সভাপতির নিকট পেয়েছি। বর্ত্তমান জগৎ এক ভীষণ সঙ্কটস্থলে উপস্থিত। এ সঙ্কটের মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক বৈষম্য-জাত নানা স্বার্থের সংঘাত। ইহাতে শুধু বর্ত্তমানই বিনষ্ট হবে না, মানব সমাজের ভবিষ্যৎও বিপন্ন। 'What is at stake is not only rationality of the economic system but the future of mankind.'

বর্ত্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে সর্ব্বপ্রকার চিন্তাধারার, বিশেষ করে অর্থনৈতিক চিন্তাধারার আদর্শ পরিবর্ত্তনের দরকার। দুটি সংগ্রামরত পরস্পর বিরোধী আদর্শ বিশ্বব্যাপী বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। 'We should change our whole economic outlook, take into account the actual background of economic theory...... and in its light revise its premises...we are living in an atmosphere laden with conflict and the dangers of worse conflict to come'.

আপনাদের দৃষ্টি ও মনন ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন করতে হলে অর্থনীতিকদের দুটি বিরুদ্ধ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। বর্ত্তমানে দুটি বিরুদ্ধ আদর্শবাদের ফলে চিন্তারাজ্যেও মানুষ যুধ্যমান

শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। এ সংগ্রামের জন্য সবাকেই প্রস্তুত হতে হবে। নিরাপত্তার পরিমণ্ডলে 'থাকা কারও পক্ষে আর এখন সম্ভব নয়। 'The economist, whether he likes it or not, has to take his place in the struggle and make his contributions to its coming to a climax.'

বর্ত্তমানে বিরোধ-বিপ্লবের ফলে সারা বিশ্ব বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত। দুইটি আদর্শবাদকে কেন্দ্র করে এ বিরোধ ক্রমেই চরম পরিণতির দিকে যাচ্ছে। সমাজতন্ত্রবাদ ও ফাসিজম দুইএর ভিতর একটিকে গ্রহণ করতেই হবে। নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করা আত্মপ্রতারণারই নামান্তর।

'The ecnomist has to realise the tragic necessity of choice between these values. Refusal to make choice not only implies a superstitious love of abstractions, but is incompatible with intellectual integrity.'

বর্ত্তমান পুঁজিবাদী বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করতে হলে কি ভাবে করা উচিত? মহাত্মার অহিংস নীতির নৈতিক মূল্য যতই থাক ইহা বাস্তব ক্ষেত্রে পশুশক্তির সাথে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারবে কি না সে বিষয়ে সকলে একমত নন। অভিভাষণে তাই সভাপতি বল্‌ছেন 'The fundamental problem of means to ends has also to be faced. That violence breeds violence is the lesson of history, of contemporary experience and inspired teachers of all countries and nations. But unfortunately non-violence as a technique of social change has to reckon with the brutal realities of to-day; and though the latter enhance its value, they also make it exceedinly difficult even for the most non-violent of men to pin there faith on it.'

আদর্শ বৈষম্যে জগৎ আজ যে প্রকার বিক্ষুব্ধ তাতে মানব জীবন বড় সমস্যা-সঙ্কুল হয়েছে। ভারতের সমস্যাও বিরাট। সংগ্রামের ভিতর দিয়ে সে সমস্যা সমাধান করতে হবে। বর্ত্তমান জগতে সে চেষ্টাই চল্‌ছে। ভারতে তার অন্যথা সম্ভব নয়।

'India is also in the same (world) struggle. There are risks and dangers inherent in it. Disruption of the world economy and with it the Indian economy, is well on the cards. But the risks and dangers should stimulate us to new and much higher efforts of thought......we ecnomists have to line up......Parallel action of the likeminded men is urgently required. We have to get into step with the nation which is on the march and going with rapid strides towards its goal. If we cannot ourselves keep pace, let us at least keep the pace which the nation sets for us.'

আমরা দেশবাসীর বিশেষ করে ভারতীয় অর্থনীতিবিদদের সভাপতির এ আহ্বানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

জাতীয় শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা কমিটি

বিগত অক্টোবর মাসে কংগ্রেস শাসিত বিভিন্ন প্রদেশের শিল্প বিভাগের মন্ত্রিগণের দিল্লীতে এক সম্মেলন হয়। ভারতের শিল্পোন্নতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উপলব্ধি করে এ সম্মেলন একটি জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা কমিটি ও একটি নিখিল ভারত জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা করে। ব্যাপকভাবে যাতে শিল্পোন্নতি ও শিল্পপ্রসার হয় সেজন্য তথ্য সংগ্রহ ও তদন্ত করা পরিকল্পনা কমিটির কাজ। একাজ শেষ হলে ইহা নিখিল ভারত জাতীয় কমিশনের সাথে মিলিত হয়ে যাবে। মৌলিক শিল্প (Key Industries) অর্থাৎ যে শিল্পের উপর নির্ভর করে অন্যান্য শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত ও পরিবর্দ্ধিত হতে পারে ঐ শিল্প সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন ও সচেষ্ট করা জাতীয় সমৃদ্ধি লাভের প্রথম সোপান। এজন্য পরিকল্পনা কমিটি প্রথমেই সেদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। এ কমিটি দেশের শ্রমশিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য নানা জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বন্ধে একটি প্রশ্নমালা তৈরী করেছেন। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট, ভারতীয় ষ্টেট্, ব্যবসায়ী, কৃষি ও বাণিজ্য সঙ্ঘ এবং যারা দেশের অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন ও সত্যিকার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাঁদের নিকট ইহা পাঠান হয়েছে। বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান ছাড়াও ছোট ছোট শিল্পকেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা ভারতবর্ষে আছে। জাতীয় জীবনযাত্রার উন্নতি সাধন করতে হলে বৃহৎ শিল্প সংস্থাপন নিতান্ত দরকার; কিন্তু এতেই শুধু দেশে দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। এর জন্য কুটীর শিল্পের প্রসার ও উন্নতি বিশেষ প্রয়োজন। বৃহৎ শিল্পের উন্নতি সাধন করতে কুটীর শিল্প যদি ধ্বংস হয় তবে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার অশেষ ক্ষতি হবে। রাষ্ট্রপতি সুভাষ বসু ও পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি পণ্ডিত নেহেরু এ বিষয়ে সতর্কবাণী দিয়েছেন।

ভারতের সমস্যা বিরাট। এজন্য জাতীয় পরিকল্পনা কার্য্যকরী হতে হলে মূলধন সমস্যার সমাধান প্রথমই দরকার—কারণ পরিকল্পনার সাফল্য মূলধনের উপরই নির্ভর করে। আমরা সভাপতি ও তাঁর সহকর্ম্মীদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করছি।

নিখিল ভারত দর্শন সম্মেলন

মিঃ সি এফ্ এণ্ড্রুজের সভাপতিত্বে এলাহাবাদে নিখিল ভারত দর্শন সম্মেলনের অধিবেশন হয়। সভাপতি মহাত্মা গান্ধির অহিংস নীতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন, যুধ্যমান ইউরোপকে ধ্বংসের মুখ হতে রক্ষার জন্য অহিংস নীতিই কেবল সমর্থ। ইহার শ্রেষ্ঠত্ব ও নৈতিক বল তিনি অতীত

ও আধুনিক ঘটনার সাহায্যে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। ভারতবর্ষ অহিংসার সুন্দর দৃষ্টান্ত। ইহার সমর্থনের জন্য দার্শনিক হোয়াইট্ হেড্ প্রভৃতির মতবাদ উদ্ধৃত করেছেন। হোয়াইট হেডের মতে সভ্যতার অগ্রগতি হচ্ছে coercion থেকে persuasionএর দিকে। পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারে মানুষ যতো বল প্রয়োগ ছেড়ে শান্ত যুক্তিমত্তার আশ্রয় নেবে ততো মানুষ সভ্য হবে। ইউরোপের অতীত ও বর্ত্তমান দেখে কি বলা যায় যে ভবিষ্যতে coercion রূপান্তরিত হবে persuasionএ? আমরা সে সম্ভাবনা তেমন দেখিনা বরং তার বিপরীত দিকই দিন দিন আপন নগ্নতা প্রকাশ করছে। এ জন্য ইউরোপ অসভ্যতার নিম্নস্তরে নেমে যাচ্ছে একথা বোধ হয় হোয়াইট্ হেড্ নিজেও স্বীকার করবেন না। ঐতিহাসিক যুগ হতে আজ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ আলোচনা করে বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠ সমাজতত্ত্ববিদ্ সরকিন্ তাঁর 'Social and Cultural Dynamics'এ প্রমাণ করেছেন যে ইউরোপে যুদ্ধ বিগ্রহ পূর্ব্বাপর ছিল এবং ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হবে এরূপ অনুমান করার মূলে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। কাজেই অন্ততঃ ইউরোপ এবং পাশ্চাত্যভাবাপন্ন দেশগুলিকে অহিংস মন্ত্রের নৈতিক ব্যাখ্যা শুনাতে যাওয়া কতদূর কার্য্যকরী হবে আমরা জানি না। তবে 'ভারতবর্ষ অহিংসার দেশ' কি না ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে ইহা যত দিন সুপ্রতিষ্ঠিত না হবে ততদিন ইহা গ্রহণ বা বর্জ্জন, শুধু ব্যক্তিগত রুচি ও বিশ্বাসের উপরই নির্ভর করবে।

এ সম্মেলনের ভারতীয় দর্শন শাখার সভাপতি ডাঃ এস্ সি চাটার্জ্জির অভিভাষণ বেশ হৃদয়গ্রাহী ও সুচিন্তিত হয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের অনেক তুলনামূলক আলোচনা তিনি করেছেন। গ্রীক্ দর্শন সুরু হয় 'Spirit of wonder' হতে, ভারতীয় দর্শন 'Spirit of wonder and worship' হতে। গোড়াতে যাই থাক,দর্শন এখন চলে এসেছে বহুদূরে জীবন ও বাস্তবকে বিধৃত করে। এখন আর বলা চলে না 'it is not a wisdom of the world, but is knowledge of what is not of the world; it is not knowledge which concerns external mars, or empirical existence of life, but is knowledge of that which is eternal....'—Hegel. জীবনের উপল বন্ধুর পথ আলোকিত ও উদ্ভাসিত করতেই দর্শন। কাজেই জীবনের সাথে ইহা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত। জীবন হতে বিচ্ছিন্ন হলে দর্শনের কোন ভিন্ন সত্তা বা প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

'ফ্লাউড কমিশন'

বাংলার প্রজা-দরদী মন্ত্রীমণ্ডল বাংলার ভূমি-রাজস্ব-প্রথা তদন্ত করবার জন্য ভারত-গভর্ণমেণ্টের অনুকরণে বৈদেশিক 'বিশেষজ্ঞের' নেতৃত্বে যে 'কমিশন' নিযুক্ত করেছেন, তাঁরা কিছুদিন বাংলার জেলায় জেলায় সফর ক'রে সম্প্রতি মাদ্রাজের ভূমিবিষয়ক আইন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করবার জন্য সেখানে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

কমিশন নিয়োগের পর হতে কমিশনের উদ্দেশ্য ও ফলাফল সম্বন্ধে যে গভীর উদ্বেগ ও আশঙ্কা বাংলার জনসাধারণ প্রকাশ করেছে তাহা কমিশনের কার্য্যকলাপে দূর না হয়ে আরও ঘনীভূত হোচ্ছে।

অধিক সংখ্যক জমিদার-সভ্য নিয়ে গঠিত এই কমিশন ইতিমধ্যেই এক সুদীর্ঘ (৯২ দফা) প্রশ্নপত্র প্রকাশ করে জমিদার সভাগুলিকে উত্তর দেবার জন্য আমন্ত্রণ করেছেন। ভূমি-সংক্রান্ত আইনের অপপ্রয়োগে যারা আজ জর্জ্জরিত এবং যাদের অভাব দূর করবার সাধু উদ্দেশ্যে মন্ত্রীমণ্ডল মুখর হয়ে উঠেছিলেন—যতদূর জানা যায় তাদের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে আহ্বান করা হয় নাই। যদিও এই ৯২ দফা প্রশ্ন জটিল এবং এদের উত্তর দেওয়া সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ তথাপি কমিশন এক মাসের মধ্যেই এই দীর্ঘ প্রশ্নমালার জবাব চেয়েছেন। মজা এই যে গত একশ বছরের মধ্যে বাঙ্গালার ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কে যে সমস্ত আলোচনা হোয়েছে তাতে নূতন কোন প্রশ্নের অথবা তার সমাধানের অবকাশ নাই। প্রজার হিতসাধনার্থে এ কমিশন নিযুক্ত হয় নাই। কাজেই ইহা "Veritable mountain in labour" এ পরিণত হবে আমরা নিঃসন্দেহ। কিন্তু সেজন্য নিষ্ক্রিয়ভাবে কমিশন বয়কট্ করা প্রজাস্বার্থের বিরোধী হবে। গত census কমিশন বয়কট করবার ফলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা পাকাপাকি করবার অনেক নজির উপরওয়ালারা পেয়েছে। কাজেই শুধু বয়কট করে কমিশনের প্রকৃত উদ্দেশ্য পণ্ড করা যাবে না। ইহাকে ব্যর্থ করতে হলে উপযুক্ত তথ্যের সাহায্যে প্রপাগাণ্ডা এবং সক্রিয় আন্দোলন চালাতে হবে। আমরা প্রাদেশিক কংগ্রেস ও দেশকর্ম্মীদের সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কংগ্রেস ও হিন্দু-মুসলমান সমস্যার পুনরাবৃত্তি

ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা,—বিশেষভাবে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা যে স্বার্থ বুদ্ধি প্রণোদিত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্তদের সমস্যা এ কথা বহুবার বহু নেতা বলেছেন। স্বার্থের অভিন্নতা প্রমাণ করে উভয় উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণকে একত্র করবার যে নীতি—তা কংগ্রেস গ্রহণ কোরেছে জহরলালজীর গণ-সংযোগ নীতির মধ্যে। বার বার সাম্প্রদায়িক নেতাদের সাথে কংগ্রেসের নেতাদের আলাপ আলোচনা ও হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানের ব্যর্থচেষ্টা জাতিকে বিভ্রান্ত করছে। অনেকের মনেই উঠেছে যে কংগ্রেসের নেতারা কি সত্যই গণ-সংযোগ নীতিতে আস্থা হারিয়েছেন? বসু-জিন্না আলোচনা ব্যর্থ হবার পর এবং মুসলিম লীগের বিগত পাটনা অধিবেশনে সাম্প্রদায়িকতার নগ্নরূপ প্রকাশ, নেতাদের কংগ্রেস সম্পর্কে অগ্নি-উদ্গিরণ এবং গান্ধীজী সম্পর্কে শীলতার মাত্রা-ছাড়ান উক্তির পর দেশ আশা করেছিল কংগ্রেস দ্বিগুণ

উৎসাহে গণ-সংযোগ নীতির ভিতর দিয়ে এই সমস্যার সমাধানের দিকে যাবে। কিন্তু সম্প্রতি 'হরিজনে' যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং বারদৌলী থেকে যে সংবাদ এসেছে তাতে আমাদের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হতে চলেছে মনে হয়। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সংখ্যালঘিষ্ঠদের সুশাসনের জন্য কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে নিয়মাবলী গান্ধীজী উপস্থিত করেছেন বলে প্রকাশ—তাহাই আমাদের বর্ত্তমান আশঙ্কার কারণ। ভারতবর্ষের দুইটি সম্প্রদায় মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হবে এতে কারোও আপত্তি করবার নেই। কিন্তু কংগ্রেসের কর্ম্মকর্ত্তারা আজ যে নূতনভাবে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তা কি সত্যই মৈত্রীর সহায়ক হবে? যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অভিযান, প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিভিন্ন দফায় সেই সম্প্রদায়িকতাকেই স্বীকার করে নেওয়া হয় নাই কি? কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে নিয়মতান্ত্রিক মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে অনেকেরই বিশ্বাস সাম্প্রদায়িক মীমাংসা সম্বন্ধে এই নূতন ব্যবস্থা তারই সমর্থক। গণ-স্বার্থের ভিত্তিতে যে জাতীয় ঐক্য ও মৈত্রী গড়ে উঠে স্থিত স্বার্থের ভিত্তিকে আঘাত দেবে, সেই প্রবল গণ-আন্দোলনের বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য না করে, কংগ্রেসের মনোভাব সাম্প্রদায়িক বিভেদ অচল প্রতিষ্ঠ করবে। কংগ্রেসের এই নূতন অস্ত্র গণ-সংযোগ নীতিকে ব্যাহত করে জাতীয় ঐক্যের পথ দুর্গম করে তুলবে।

রাজকোটে প্রজা-আন্দোলনের সাফল্য

তিনমাস অবিশ্রান্ত সংগ্রামের পর রাজকোটের প্রজা-আন্দোলন জয়যুক্ত হলো। সর্দার বল্লবভাই প্যাটেল ও ঠাকুর সাহেবের মধ্যে আলোচনার ফলে স্থির হয়েছে যে প্রজা ও রাজকর্মচারীদের নিয়ে (প্রজা-প্রতিনিধি ৭ জন, রাজ-প্রতিনিধি ৩ জন) একটী তদন্ত কমিটি হবে এবং এই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে দায়ীত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হবে। রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তি পাবে এবং আন্দোলন দমন করবার জন্যে যে সমস্ত জরুরী আইন চালান হয়েছিলো সেগুলি প্রত্যাহার করা হবে। মনিবেন প্যাটেল, মৃদুলা সারাভাই প্রভৃতি যশস্বিনী কংগ্রেস কর্মী এই সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেছিলেন। প্যাটেলের সমর্থনও এ আন্দোলন পেয়েছিলো। ক্ষুদ্র রাজ্যে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এ জয়লাভে খুব বেশী আশান্বিত হওয়া যায় না যখন ত্রিবাঙ্কুর, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, ঢেনকানল আবার মধ্যযুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রাজকোটের রফাতেও একটা সর্তে প্রতিক্রিয়শক্তির কাছে হার স্বীকার করতে হ'য়েছে—রাজস্বের এক দশমাংশ নাকি ঠাকুর সাহেবের ব্যক্তিগত খরচের জন্যে নির্ধারিত থাকবে।

রণপুরের দুর্ঘটনা

উড়িষ্যার পলিটিক্যাল এজেন্ট মেজর বাজ্জালজেট্ ক্ষিপ্ত জনতার আক্রমণে প্রাণ দিয়েছেন। ২রা জানুয়ারি রণপুর রাজ্যে প্রজামণ্ডলকে বে-আইনি বলে ঘোষণা করা হয়। পরদিন প্রজামণ্ডলের অফিসগুলিতে তালাচাবি পড়ে এবং অনেক কর্মী গ্রেপ্তার হন। এই সংবাদে প্রজারা বিক্ষুব্ধ হয়ে নেতাদের মুক্তি দাবী করে। মেজর সাহেব রণপুরের রাজাকে পরামর্শ দিতে আসেন এবং ক্ষিপ্ত জনতাকে শান্ত কিংবা সংযত করবার জন্যে ঘটনাস্থলে যান। কি কারণে জানা যায় না—"সম্ভবত আত্মরক্ষায়," তিনি পিস্তল চালান এবং তাতে তিন জনের মৃত্যু হয়। জনতা তখন তাঁকে আক্রমণ করে এবং আঘাতে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

মোটামুটি এই খবর। কোন সরকারী বা বে-সরকারি বিবৃতি এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। প্রজা-আন্দোলন, দমননীতি, মেজর সাহেবের গুলি এবং তাঁর মৃত্যু—এ থেকে ঘটনার একটা স্বাভাবিক ধারাবাহিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। মেজর সাহেবের মৃত্যু শোচনীয় এবং এতে প্রজা আন্দোলনের কিছুমাত্র উপকার হবে না এ দুইই সত্যি— বরঞ্চ যে দুজন প্রজার আগে মৃত্যু হয়েছে তাদের প্রাণদানেই আন্দোলন পুষ্ট হবে। কিন্তু এই উপলক্ষে প্রজাদের ও প্রজা-আন্দোলনকে গালাগালি দিয়ে কংগ্রেস নেতারা গণমনস্তত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। মেজর সাহেবের জন্য শোকাশ্রু বর্ষণ করবার অবসরে নিহত প্রজা দুজনের কথা তাঁদের কারো একবারও মনে হলো না।

সমস্ত ঘটনার একটা তদন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য বিবৃতি না পাওয়া পর্য্যন্ত গণশক্তিকে সহনশীল ও শৃঙ্খলাপরায়ণ হবার উপদেশ দিলেই যথেষ্ট হতো। মানুষ উত্তেজনার অতীত নয়—বিশেষ করে দুর্গত, বঞ্চিত গণশক্তি। সত্যাগ্রহের নিয়মকানুন শিখতে তাদের যদি কিছুদিন সময় লাগে তাতে নেতাদের অধৈর্য্য নির্মম উক্তি সমর্থনযোগ্য হয় না।

ফ্রান্স ও রোম-সাম্রাজ্যের ভূমধ্য অভিযান

গত ১৭ই ডিসেম্বর ইতালীয় সরকার কাউন্ট কিয়ানোর হাত দিয়ে রোমের ফরাসী রাষ্ট্রদূতের কাছে ১৯৩৫ সালের ফ্রাঙ্কো-ইতালীয় চুক্তি বর্জন করে এক পত্র দিয়েছেন। ফরাসী মন্ত্রী পিয়ের লাভাল আবিসিনিয় যুদ্ধের পূর্বাহ্নে মুসোলিনির সঙ্গে এই গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং এই চুক্তির নাম করেই ইতালির ওপর আন্তর্জাতিক শাস্তি ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে আদ্দিস আবাবায় ফ্যাসিস্ত পতাকা ওড়াতে সাহায্য করেছিলেন। এই চুক্তির সর্তে ইতালী পায় আদ্দিস আবাবা রেলপথের ২,৫০০ সেয়ার, ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডের কিছু জায়গা এবং টিউনিসের ইতালীয় অধিবাসীদের জন্যে বিশেষ সুবিধা। ইতালীয় সরকারের মতে এ সর্তগুলি বর্তমান সময়ের

অনুপযোগী—অর্থাৎ বর্ধিষ্ণু ইতালীয় সাম্রাজ্যের দাবী মেটাতে ফ্রান্সের আরো বেশী করে ত্যাগ স্বীকার করা উচিত।

আইন সভায় টলায়মান সরকারি শক্তি টি কিয়ে রাখবার জন্যে পররাষ্ট্র সচিব এম্ বনে'কে এই ভয়ানক সত্য অস্বীকার করে বলতে হয়েছে ফ্রাঙ্কো-ইতালীয় সম্পর্কে উদ্বেগের কিছু নেই। কিন্তু ফরাসীরা এবং বিশ্ববাসী বিশেষ করেই উদ্বিগ্ন— কারণ শান্তির দেবদূত নেভিল চেম্বারলেন মধ্যস্থতা করতে বেরিয়েছেন। এম্ বনে অবশ্য বলেছেন মধ্যস্থালী অনাবশ্যক— কারণ ফ্রান্স সূচাগ্র ভূমিও ছেড়ে দেবে না,— তবুও চেম্বারলেন পেছোন নি, তিনি রোমে এসেছেন। কারণ 'ছোটো খাটো সুযোগ-সুবিধা' দিয়ে ত' মুসোলিনিকে ঠাণ্ডা করা যেতে পারে।

এই 'minor concessions'এর নামে হয় ত' ইতালীকে দিতে হতে পারে জিবুতি রেলপথের কর্তৃত্ব, জিবুতি বন্দর স্বাধীন বাণিজ্যের জন্যে খুলে দেওয়া, সুয়েজ খালে ফরাসী-ইংরাজের সঙ্গে সমান অধিকার, টিউনিসে ইতালীয় ঔপনিবেশিকদের অধিক সংখ্যায় প্রবেশাধিকার এবং তাদের স্বার্থের জন্যে রক্ষাকবচ তৈরী। এই ন্যূনতম দাবীই হবে বিশালতর দাবীর সূত্রপাত,—টিউনিসিয়া, করসিকা, ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড, সুয়েজ একে একে গ্রাস ক'রে মুসোলিনি ভূমধ্যসাগরে অখণ্ড ফ্যাসিস্ত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন।

লাভাল ও দালাদিয়ে'র বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত এখানেই শেষ হবে না। মেমেলের ব্যাপারটা মিটিয়েই হিট্‌লার আলসেস্-লোরেন সমস্যা হাতে নেবেন। সেদিন এ চক্রান্তের ফল শুধু ধনিক ও সাম্রাজ্যবাদীরা ভুগবে না, ভুগবে ফ্রান্সের অগণিত গণসাধারণ।

রেণো ডিক্রীর ওপর সেদিন চেম্বার অফ্ ডেপুটিস্-এ যে ভাগ হয় তাতে দালাদিয়ে'র গভর্ণমেণ্ট মাত্র সাত ভোটে জিতে আত্মরক্ষা করেছেন। ফ্রান্সের 'পপুলার ফ্রন্ট' পুনরুজ্জীবিত হওয়ার ওপরে বিশ্ববাসীর ভাগ্য আজ অনেকখানি নির্ভর করছে।

রুজভেল্টের সতর্কবাণী

রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ফ্যাসিস্ত অভিযানের বিরুদ্ধে গভীর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন এবং পৃথিবীর যাবতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে আহ্বান করেছেন এই দুর্বার বিজয়াভিযানকে সম্মিলিত হয়ে বাধা দেওয়ার জন্য। পূর্ব গোলার্ধের ভাগ্যবিপর্যয়ের দিকে না তাকিয়ে মার্কিণ রাষ্ট্রগুলি যে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরকন্না করতে পারে না—এই মর্মে লিমা সম্মেলন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এবার রুজভেল্ট স্বয়ং বলছেন—"আমাদের এমন কাজ অথবা নিষ্ক্রি বর্জন করতে হবে যাতে আক্রমণকারীর সহায়তা হয়। আমাদের নিরপেক্ষতা আইনগুলি এমন

মুসোলিনী চেম্বারলেন সাক্ষাৎকার

ভূমধ্যসাগরের শান্তি, স্পেনের ভাগ্য নির্ণয়, ফ্রান্সের নিকট হতে টিউনিস দাবী—প্রধানতঃ এই তিনটিই ইঙ্গ-ইতালীয় আলোচনার বিষয় ছিল। মিঃ চেম্বারলেনের লণ্ডন প্রত্যাগমনের দুই দিন পূর্ব্বেই সরকারী আলোচনা শেষ হয়ে যাওয়াতে রাজনীতিকমহলের ধারণা যে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর রোম পরিদর্শন ব্যর্থ হয়েছে। ভূমধ্যসাগর ও মধ্য ইউরোপের ব্যাপক শান্তিরক্ষার ব্যাপারের কথা একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে মনে করলেও আপত্তি নাই। টিউনিস দাবীর কথা যদিও ইতালীয় পক্ষ হতে সুস্পষ্ট ভাবে জানানো হয় নাই তথাপি ফ্রাঙ্কোকে সমর্থনের নীতি এবং ইতালীর "স্বাভাবিক আকাঙ্খা" সম্বন্ধে কোন মতের পরিবর্ত্তন হয়েছে ব'লে মনে হয় না। তবে ইতালীর দিক থেকেও বোধ হয় এতটা আশা করা অন্যায় হবে যে শান্তিরক্ষার খাতিরে মিঃ চেম্বারলেন মিউনিকের পুনরাবৃত্তি করবেন এবং অচির ভবিষ্যতে টিউনিসের প্রাসাদ শীর্ষে ইতালীয় পতাকা উড্ডীন হবে। এই সম্পর্কে এ কথাও বলা অসমীচীন হবে না যে ফ্রান্স ও ইতালীর পরস্পর স্বার্থ-সম্পর্কিত বিরোধ মিটমাটের নিমিত্ত যে চতুঃশক্তি সম্মেলনের জন্য ইতালী সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল তার ক্ষীণতম সম্ভাবনাও আর রইলো না।

স্পেন সম্বন্ধে ইতালীর খাঁই যে এতটুকু কমে নাই তা ফ্রাঙ্কোকে যুদ্ধরত জাতির অধিকার প্রদানের দাবী থেকেই স্পষ্ট বুঝা যায়। ভূমধ্যসাগরের শান্তি রক্ষার ব্যাপারে ইহা নাকি অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন। তার এই দাবীর পাল্টা সর্ত্ত রূপে তিনি স্পেন হতে ইতালীয় স্বেচ্ছা-সেবক অপসারণের কথা ভেবে দেখতে পারেন। যাহোক, বৈঠক যে পরিদর্শন ও আনুষ্ঠানিক এবং সামাজিক আদানপ্রদানের অধিক অগ্রসর হয় নাই এদের শূন্যগর্ভ ইস্তাহারই তার প্রমাণ :

"১৯৩৮ সালের ১৬ই এপ্রিল তারিখে যে চুক্তি হইয়াছে তাহাকে ভিত্তি করিয়া এই দুইটী রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক যাহাতে আরও দৃঢ়তর হয় তজ্জন্য উভয় পক্ষই তাঁহাদের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে যে, ঐ চুক্তির বিধান অনুযায়ী তাঁহারা যথা সম্ভব দ্রুততার সহিত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। শান্তিরক্ষার যে নীতি এই দুইটি রাষ্ট্র অনুসরণ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে সেই নীতি অক্ষুন্ন রাখিবার দৃঢ় সংকল্প আলোচনার সময় উভয় পক্ষই পুনরায় ব্যক্ত করিয়াছেন।"

সপ্তম বর্ষ | ফাল্গুন | নবম সংখ্যা

বৈজ্ঞানিকের জগৎ

অনিলচন্দ্র রায়

মানুষ চক্ষু মেলিয়াই যে জগৎটাকে দেখে তার সম্বন্ধে তাহার বিস্ময়ের অবধি নাই। দেখিতে দেখিতে কেবল মুগ্ধ হয় তাহা নয়; মানুষ অশান্তও হইয়া উঠে। এই অশান্তির বীজ রহিয়াছে তার অন্তরে, কারণ মানুষের বুদ্ধিলোকে রহিয়াছে অনন্ত জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসাকে এড়াইয়া মানুষ নির্দ্বন্দ্ব ক্ষান্তির রাজ্যে পলাতক হইতে পারে না। প্রাণীজগতের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ এই খানে। প্রাণীজগৎ বাঁচে তাহার ভুক্ত-রোমন্থনের দ্বারা, মানুষ বাঁচে নিত্য নব মননের দ্বারা। মানুষের মনে চলিয়াছে অনাদিকালের বহ্নি-দাহন। এই দাহনের জ্বালায় মানুষ জ্বালাইয়াছে নিজের জীবন এবং বহির্জ্জগৎকে রাঙাইয়াছে আপন চিত্তাগ্নির পিঙ্গল আভায়। প্রশ্নের আঘাতে আঘাতে সৌরলোককে করিয়াছে জর্জ্জর, জলস্থল-আকাশকে ছিঁড়িয়া করিয়াছে টুক্‌রা টুক্‌রা। এই অনির্ব্বাণ শান্তিহীন চাঞ্চল্যই মানুষকে একান্তভাবে পৃথক করিয়াছে পশু হইতে। চিন্তায় ও মননে মানুষ স্বতন্ত্র ও একক, একথা হেগেল ঘোষণা করিয়াছিলেন নিঃসংশয় ভাষায়। তাই দর্শনশাস্ত্র তাহার বর্ণনায় হইয়াছে 'thinking study of things,' কারণ জিজ্ঞাসু মানব চোখের উপরে যে বিশ্বজগৎ রহিয়াছে তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করে মননার দ্বারা 'thinkingly.'

এই জিজ্ঞাসা ও মননা হইতে যেমন জন্ম নিয়াছে দর্শন-শাস্ত্র, তেমনি জাত হইয়াছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান দর্শনেরই সহোদর। এদের দুইয়ের বিচরণ-ক্ষেত্র এক, আদর্শ এক; বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের পরিধি সংকীর্ণ, তার গণ্ডী নির্দ্দিষ্ট। দর্শনের ক্ষেত্র ব্যাপক, সাম্রাজ্য সীমাতীত। জীবন ও জগতের বিশেষ একটা খণ্ডকে নিয়া কারবার করে বিজ্ঞান; দর্শনের কারবার অখণ্ড বিশ্বসংসারকে লইয়া।

ইহা ছাড়া দর্শন ও বিজ্ঞানের পদ্ধতিতেও পার্থক্য রহিয়াছে। পর্য্যবেক্ষণের সঙ্গে পরীক্ষণ, ইহাই বৈজ্ঞানিক রীতির বৈশিষ্ট্য। দর্শনশাস্ত্র সরাসরি পরীক্ষণের (experiment) ঝঞ্চাটে যায় না। বিজ্ঞানের পরীক্ষালব্ধ তথ্যগুলিকে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া, সাজাইয়া ও সামঞ্জস্য করিয়া চরম ও ব্যাপক সত্যের দিকে বুদ্ধিকে প্রসারিত করিয়া ধরে দর্শন। কিন্তু এ পার্থক্যটুকু সত্ত্বেও বিজ্ঞান ও দর্শনের লক্ষ্য এক এবং ইহাদের প্রকৃতিতেও সাদৃশ্য রহিয়াছে। কি দর্শন, কি বিজ্ঞান, উভয়েই চায় সৃষ্টিরাজ্যের দুর্গম রহস্যকে ভেদ করিতে ; চক্ষুর উপরে যে বিশ্বজগৎ একটা অমীমাংসিত প্রশ্নের মত ঝুলিতেছে, তাহার মর্ম্মমূলে কী আছে জানিতে হইবে। এই প্রজ্বলন্ত প্রশ্ন যুগান্ত ধরিয়া মানুষকে লুব্ধ করিয়াছে, মুগ্ধ করিয়াছে, কিন্তু জবাব মিলে নাই। জবাব দিতে গিয়াই মানুষ সৃষ্টি করিয়াছে দর্শন, সৃষ্টি করিয়াছে বিজ্ঞান। যে সীমাহীন অস্তিত্ব চারিদিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে, স্তরের পর স্তর যাহার দিক্‌হীন, চিহ্নহীন ব্যাপ্তি—সেই অনন্ত-প্রসারি অস্তিত্বকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিতে হইবে, ইহার স্বরূপই বা কী, স্বধর্ম্মই বা কী। এই অনুসন্ধানে বিজ্ঞান ও দর্শন পরস্পরের সহায়ক ; পরস্পরের পরিপন্থী নয়, পরিপূরক। বিশেষ করিয়া বিংশ শতকে দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের মিতালী প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, কারণ দর্শনই যে কেবল বিজ্ঞান-ভিত্তিক হইয়াছে, তাহা নয়, বিজ্ঞানও আজ দর্শনমূলক হইয়া উঠিয়াছে। দার্শনিকরা যেমন হইতেছেন 'বৈজ্ঞানিক চিত্তবৃত্তি'র অনুগামী, বৈজ্ঞানিকও আজিকার জগতে হইয়া উঠিয়াছেন দার্শনিক। বিজ্ঞান আজ এমন এক জগতে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে যেখানে দার্শনিক উর্দ্ধলোকের উদার তোরণদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিককে আজ দার্শনিকের রাজ্যে পদক্ষেপ করিতে হইতেছে। ইহাতে কেহ আশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন, কেহ বিরক্ত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু নব নব পরিণতি বিজ্ঞানকে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর পথে যে বিচিত্রলোকে আনিয়া উপনীত করিয়াছে তাহাতে বিজ্ঞানকে দর্শন-ঘেঁষা না হইয়া আর উপায় নাই। তাই আজ বৈজ্ঞানিকরা দর্শনের ভাষায় কথা বলিতেছেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। যে সকল সমস্যা চিরকাল দার্শনিক সমাজকে বিচলিত ও চিন্তিত করিয়া আসিয়াছে, আজ বৈজ্ঞানিকের সম্মুখেও সেই সব সমস্যা ভীড় করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাই আজ বিজ্ঞানের মুখে তত্ত্বকথার দুর্ব্বোধ্য বাণী শুনিয়া অনেকেই চমৎকৃত হইতেছেন।

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানুষ চোখের উপরে জগৎটাকে দেখে, স্পর্শ করে, অনুভব করে। পথে ঘাটে চলিতে চলিতে মানুষ পদে পদে এই কঠিন, বাস্তব জগতের অস্তিত্বের প্রমাণ পায়। প্রাত্যহিক জীবনের সকল কাজে, উঠিতে-বসিতে সর্ব্বাঙ্গে এই নিরেট পৃথিবীর স্থুল হস্তের স্পর্শ তাহাকে আঘাত করে। তার সকল ইন্দ্রিয়ে দিনেরাত্রে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের মিশ্র সঙ্গীত বাজিয়া উঠে অশ্রান্ত কলরোলে। তাই সাধারণ মানুষের মনে এই পৃথিবী সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহ নাই, স্বল্প মাত্রও অবিশ্বাস নাই। পৃথিবীর অস্তিত্ব লইয়া তাহার মনে কোন অস্বস্তি নাই, পৃথিবীর স্বরূপ লইয়া কোন সংশয় নাই। এই ইট-কাঠ-পাথরের কঠিন পৃথিবীকে, এই জলস্থল-আকাশকে, এই অগণিত গ্রহতারকা-ছায়াপথকে সে অচল-প্রতিষ্ঠ শাশ্বত সত্য বলিয়া ধরিয়া লয়। বৎসরের পর

বৎসর মাথার উপরে আকাশ দুই পাখা ছড়াইয়া রহিয়াছে ; দিনের পর দিন একই সূর্য্য আকাশকে পরিক্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে : রাত্রির পর রাত্রি রাশিচক্রের উপর দিয়া দলে দলে নক্ষত্র-তারকারা ভীড় করিয়া পথ চলিয়াছে ; ঋতুর পর ঋতু বহিয়া চলিয়াছে, বর্ষার মেঘে, বসন্তের পুষ্পসম্ভারে ; গ্রীষ্মের প্রাখর্য্যে আর শীতের তীক্ষ্ণতায় ; যুগের পর যুগ আসিতেছে অব্যর্থ নিয়মে ; শুক্লা রাত্রির পরে কৃষ্ণা তিথির আগমনে ; দিবালোকের পরে রাত্রির অন্ধকারে। এই পৃথিবী তাহার অসন্দিগ্ধ চেতনার উপরে বিপুল ভারের মতন চাপিয়া আছে, ইহাকে সে অস্বীকার করিবে কী করিয়া ? তাহার অস্তিত্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই স্থূল পৃথিবী প্রবেশ করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে কঠিন আঘাত করিতেছে ; সে আঘাতের সহিত অহরহ তাহার মর্ম্মের পরিচয় ঘটিতেছে, ইহাকে সে উড়াইয়া দিতে পারে না। দেয়ালে মাথা ঠুকিলে সে ব্যথা পায়, গায়ে আগুন লাগিলে সে দহন-জ্বালা অনুভব করে : তাহার সকল ইন্দ্রিয় একযোগে সাক্ষ্য দেয় এই সুখদুঃখময় স্থূল পৃথিবীর নিত্য অস্তিত্বের। প্রাকৃত মানবের কাছে জগৎ অকাট্য সত্য। প্রাকৃত মন বিচার করে সরল বুদ্ধির দ্বারা ; ইন্দ্রিয়ের সহজ অনুভূতির দ্বারা। ইন্দ্রিয় তাহাকে যাহা বোঝায় তাহাতেই সে বিশ্বাসী ; চক্ষুতে যাহা দেখে, কানে যাহা শোনে, তাহা তাহার কাছে অমোঘ ও অকাট্য। ইন্দ্রিয়ানুভূতির জগৎ-ই হইল সাধারণ মানুষের জগৎ, যাহাকে পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন 'প্রাকৃত বুদ্ধির জগৎ', 'common sense world.'

বৈজ্ঞানিক সর্ব্বপ্রথমে এই সাধারণ বুদ্ধির জগৎকে লইয়াই শুরু করিয়াছিল। এই নিরেট স্থূল পৃথিবীকেই অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া বিজ্ঞান তাহার পরীক্ষণ আরম্ভ করিয়াছিল। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, শক্ত, ভরাট পৃথিবীকে ছাড়া অপর কোন অদৃশ্য জগতের সত্ত্বা বিজ্ঞান কোনদিন মানে নাই। তাহার কারবার প্রত্যক্ষকে লইয়া ; কাজেই স্থূল বস্তু ও প্রত্যক্ষ দ্রব্যের স্বধর্ম্মকে আবিষ্কার করা বই বিজ্ঞানের অন্য কাজ নাই। ইন্দ্রিয় যাহা দেখায়, শোনায় ও বোঝায়, তাহাতে সংশয়ের কোন কারণ নাই। ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বার ; বাহিরের জগৎ এই দ্বারপথে যে সংবাদ পাঠাইতেছে, তাহা মিথ্যা নয়, ভুয়া নয়। ইন্দ্রিয় নির্ভরযোগ্য বন্ধুর মতন কাজ করে, তার রিপোর্ট সরকারি রিপোর্টেরই মত নিখুঁত ও নির্দ্দোষ। তবে ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য কম এবং তাহার এক্তিয়ার অতি সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে আবদ্ধ। কাজেই তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে, তাহার শক্তিকে প্রখরতর করিবার জন্য সহায়ক যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিতে হইবে। তাহা হইলেই ইন্দ্রিয়জ্ঞান গভীরতম সত্যকে উদ্ঘাটিত করিতে পারিবে, বস্তুর স্বরূপকে উন্মোচন করিয়া চোখের সম্মুখে ধরিতে পারিবে। দেখিতে দেখিতে পরমাশ্চর্য্য যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইল ; সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, ও সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ ও বিলোকন যাহাতে সম্ভব হয় তাহার জন্য নিত্য নূতন ব্যবস্থা হইতে লাগিল। সুদূরকে কাছে আনিবার জন্য আসিল দূরবীক্ষণ ; ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করিবার জন্য আসিল অনুবীক্ষণ। স্থূল জগৎকে ভাল করিয়া জানিবার ও বুঝিবার পথ উন্মুক্ত হইল ; স্থূল জগৎ কিন্তু অকাট্য সত্য হইয়াই বৈজ্ঞানিকের চিত্তে আসন পাতিয়া রহিল। সে আসনের নড়চড় হওয়ার সম্ভাবনা কেউ ভাবে নাই : সারা ১৯ শতক ভরিয়া বৈজ্ঞানিকের মনোলোকে

জড়জগৎ নিশ্চিন্ত আধিপত্য করিয়াছে। এইকালে বৈজ্ঞানিকের বিশ্বে এবং প্রাকৃতজনের বিশ্বে কোন পার্থক্য ছিল না, সাধারণ লোকের আটপৌড়ে পৃথিবীকেই বিজ্ঞান সাজাইয়া গোজাইয়া ও গুছাইয়া লইয়া সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে ; বৈজ্ঞানিকের জগৎ সে যুগে ছিল আমাদেরই দৈনন্দিন জগতের একটা উন্নত সংস্করণ মাত্র।

কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষদিক হইতে বিজ্ঞানের চক্ষুতে নতুন দৃষ্টি বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল্। বিজ্ঞানের রাজ্যে মুহুর্মুহু ভূমিকম্প ঘটিয়া পুরাতন কল্পনা ও ধারণা ভূমিসাৎ হইয়া যাইতে লাগিল। সূক্ষ্মতম যন্ত্রপাতি মানুষের দৃষ্টিকে লইয়া গেল গভীর হইতে গভীরতর লোকে। নতুন পদার্থ-বিজ্ঞান ইতিমধ্যে যে বিপ্লব ঘটাইয়াছিল, তাহার প্রভাবে এই সাধারণ প্রাকৃত পৃথিবীর বুকের মধ্যে নব নব জগৎ আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্মদৃষ্টির সমুখে উদ্ঘাটিত হইল অপ্রত্যাশিত লোক-লোকান্তর। ফলে বৈজ্ঞানিকের মনে সংশয় ছায়াপাত করিল। এত-দিনের নিঃসংশয় নিরেট পৃথিবী সম্বন্ধে নানা গভীর জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠিল। ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য যে কতদূর সত্য সে সম্বন্ধে সন্দেহ উচ্চকিত হইয়া উঠিল। এই যে কঠিন পৃথিবী এর সত্যিকার রূপ কী ? যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, ছুঁইতেছি, তাহা কি সত্য, না, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল ? যেমনটী দেখি, শুনি বা অনুভব করি, আমাদের জগৎ কি ঠিক তেমনটীই ? চোখের সমুখে যে রূপের মেলা মিলে, তাহাই কি শেষ ও চরম ? না, এই রূপের পরপারে আছে কোন নিত্যকালের অরূপ ? জ্ঞানের ওপারে কি অজ্ঞাত বাস করে ? দৃশ্য-বৈচিত্র্যের পরপারে কি অদৃশ্য সত্যের শাশ্বত আবাস আছে ? যাহা ইন্দ্রিয়ের গোচর তাহা কি মিথ্যা মায়া ?

বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রশ্ন প্রবল হইয়া উঠিল। পদার্থবিজ্ঞান ও শারীর বিজ্ঞান (physiology) অনুভূতিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে তাহাতে বৈজ্ঞানিকের পুরাণ জগৎ অতীতের অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। তাহার বদলে উদ্ভব হইল বৈজ্ঞানিকের নবকল্পিত জগৎ, পৃথিবীর নবতর ধ্যানমূর্ত্তি। এ এক অজ্ঞাত, অপরিচিত পৃথিবী! এই পরিচিত পৃথিবীর আড়ালে যে সত্যিকার পৃথিবী বাস করে তাহার সংবাদ বিজ্ঞান তাহার যন্ত্রপাতির মারফতে আমাদের কাছে বহন করিয়া আনিল। আজো এ জগৎকে আমরা জানিনা, বুঝিনা। শুধু আভাসে ইহাকে বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে ; কল্পনায় ইহার ছবি আঁকিবার সাধনা করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাকে ধরা ছোঁয়া যায় না, ইহাকে ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিতে আটকাইয়া রাখা যায় না। এ জগৎ অভিনব, অপরূপ ও স্বতন্ত্র। সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা এ জগতের কোনো ঠিকানা পাওয়া যায় না ; কারণ সাধারণ বুদ্ধির (common sense) অতীত এই জগৎ। সাধারণ বুদ্ধির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পার্থক্য প্রবল হইয়া উঠিয়াছে ; এ জগৎকে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও পরীক্ষায় ধরা যায় কিন্তু প্রাকৃত বুদ্ধির নাগালের বাহিরে এই জগৎ।

সাধারণ বুদ্ধি বলে, বহির্জগতে আছে দ্রব্য (substances) এবং দ্রব্যগুলির আছে কতকগুলি গুণ (qualities)। এই দ্রব্যগুলি বাইরের জগতে আছে এবং ইহাদের অস্তিত্ব

আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপরে নির্ভর করে না। ইহারা স্বয়ংসিদ্ধ ও স্বাধীন। আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে এই দ্রব্যজাত (substances) তা'দের স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করে; ইন্দ্রিয়ের মধ্যদিয়া আমরা বস্তুর সত্যিকার স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। ইন্দ্রিয় যে জ্ঞান আমাদের দেয় তাহা ভুল জ্ঞান নয়। যাহা দেখি, যাহা শুনি, সবই সত্য এবং বাস্তব। কিন্তু বিজ্ঞান বলে, সাধারণ বুদ্ধি (common sense) কখনো সত্যকে ধরিতে পারিবে না। ইন্দ্রিয়গুলি অতি সাধারণ, অতি স্থূল কতকগুলি ব্যাপারকে মাত্র ধরিতে পারে; তাহাও আবার খুব ভাসাভাসা ভাবে ও নিতান্ত অসম্পূর্ণরূপে। ইন্দ্রিয় যাহা বলে তাহা মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নয়; ইন্দ্রিয় যাহা বহন করিয়া আনে তাহা পুরাপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। ইন্দ্রিয় মানুষকে ঠকায়, মানুষের চেতনাতে এমন সব ইন্দ্রজাল রচনা করে যাহার দ্বারা মানুষ বিভ্রান্ত হয়। ইন্দ্রিয় জ্ঞানের চাইতে অজ্ঞানই উৎপাদন করে বেশী, কাজেই সত্যকে পাইতে হইলে ইন্দ্রিয়জ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে, অতি সাবধানে ইন্দ্রিয়-জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, কতটুকু খাঁটী, কতটুকু ভেজাল। ইন্দ্রিয়গুলি যে আমাদের বিভ্রান্ত করে তাহা একটু আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে।

বাহিরের জগতের জিনিষগুলি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয় কিরূপে? পাঁচটা ইন্দ্রিয় হইল আমাদের চেতনালোকের পাঁচটা বাতায়ন; সেই বাতায়ন-পথে জগতের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুগুলি আমাদিগকে ছুঁইয়া যায়। বস্তুজগতের সেই স্পর্শ কতগুলি বিশেষ নাড়ীর (nerve) দ্বারা বাহিত হইয়া মস্তিষ্কে পৌঁছায়। ইহার পরেই আমরা বস্তুগুলির পরিচয় পাই। কিন্তু এই পরিচয় সত্যিকার পরিচয় নয়। এই যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় ইহার মধ্যে অনেক অবান্তর মালমশলা মিশ্রিত হইয়া পড়িতেছে। মানুষের চেতনা যদি পরিষ্কার আরসীর মত একখানা অক্রিয় ফলকমাত্র হইত, তবে বাইরের বস্তুটীর অবিকল প্রতিচ্ছবি উহার উপরে প্রতিফলিত হইত। তাহা হইলে আমাদের জ্ঞান হইত বহির্জগতের অবিকৃত একখানা ছবি। কিন্তু আসলে তাহা হয় না। আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া নির্ভর করে আরো কতকগুলি জিনিষের উপরে, যথা আলো, হাওয়া ইত্যাদির পরিস্থিতি, আমাদের ইন্দ্রিয়ের তদানীন্তন অবস্থা এবং জ্ঞাতার নিজের অবস্থিতি। যেমন ধরুন, টেবিলের উপরে আমরা একটা টাকা দেখিতেছি। টাকাটাকে উপর দিক হইতে যদি দেখি তবে গোল একটা চাক্‌তির মত দেখাইবে। নীচের দিক হইতে দেখিলেও ঠিক গোল দেখাইবে। কিন্তু যদি পাশে দাঁড়াইয়া দেখি তবে গোল চাক্‌তির মত কখনই দেখিব না; দেখিব একটা বৃত্তাভাসের (elliptical) আকৃতি। তাহাছাড়া এই বৃত্তাভাসটীও (ellipse) যে কতটুকু পুরু বা পাত্‌লা দেখিব তাহা নির্ভর করিবে যে দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিব তাহার উপরে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে টাকাটার আকৃতি কেমন তাহা নির্ভর করিতেছে দর্শকের অবস্থানের উপরে। এখন প্রশ্ন হইবে, কোন্ আকৃতিটী টাকার প্রকৃত আকৃতি? কোন একটী বিশেষ অবস্থান হইতে যে রূপটী দেখি তাহাই যে সত্যিকার রূপ একথা জোর করিয়া বলা চলে না। বলিলেও তাহার পিছনে কোন যুক্তি নাই।

ধরুণ, একটা ঘরের ভিতরে একটা লালরঙের গোলাপ ফুল রাখা হইয়াছে। কিন্তু যদি ঘরটীকে নীলরঙের আলোর দ্বারা প্লাবিত করিয়া রাখা হয় এবং তারপর একজন লোক সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, তবে আগন্তুক দেখিবে, টেবিলের উপরে একটা কালো রঙের গোলাপ আছে। তাহাকে হাজার তর্কের দ্বারাও একথা বিশ্বাস করানো যাইবে না যে গোলাপটা লাল। কারণ তাহার প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-জ্ঞান তাহাকে বলিতেছে, গোলাপটী কালো। বিজ্ঞান এই কারণেই বলে যে রঙ জিনিষটা আগাগোড়াই আলোক-প্রতিফলনের কারসাজি। বস্তুর নিজস্ব কোন রঙই নাই: যে ধরণের আলোক-তরঙ্গের সঙ্গে আমাদের চক্ষুর সংযোগ ঘটে সেই ধরণের অনুভূতি আমাদের হয়। সেই অনুযায়ী আমরা বস্তুটীকে সাদা, নীল বা লাল দেখি।

সকলেই জানেন জলের ভিতরে যদি একটা লাঠীর কিয়দংশ ঢুকাইয়া দেওয়া হয় তবে লাঠীটা বাঁকা দেখাইয়া থাকে। লাঠীটা কি সত্যি সত্যি বাঁকা? না, সোজা? সবাই বলিবেন, লাঠী সোজা, কিন্তু চক্ষু আমাদিগকে ধোকা দিতেছে, ধান্ধা সৃষ্টি করিয়া ইন্দ্রিয় আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিতেছে। এই ধান্ধার কারণ হইল আলোর একটা বিশেষ রকমের তির্য্যকসম্পাত। লাঠী যদি উপরে থাকে, তবে সোজা দেখায়। যদি জলে থাকে, তবে দুই রকম মধ্যবর্ত্তী উপাদানের (medium) ভিতর দিয়া আলোর বক্র সঞ্চারণের ফলে লাঠীটা বাঁকা দেখায়। লাঠীর প্রকৃত রূপ কোন্‌টা? বেশীক্ষণ সময় জমির উপর থাকে বলিয়া লাঠীটা সচরাচর সোজা দেখি আমরা। আসলে এর নিজস্ব রূপ বা আকৃতিটা আমাদের জানিবার উপায় নাই। এক এক অবস্থায় চক্ষু আমাদিগকে এক এক রকমের অনুভূতি জন্মাইতেছে; সত্যিকার বস্তুটীকে ইন্দ্রিয় কখনোই আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিতেছে না।

মনুমেন্টকে দূর হইতে ছোট দেখায়, কাছে আসিয়া দেখিলে বড় দেখায়। কোন্‌টী ইহার আসল আকার (size)? কাছে থেকে যে রূপটা দেখি তাহাকেই বিশেষ মূল্য ও স্থান দিবার কোনই যুক্তি নাই। ইন্দ্রিয় স্থানবিশেষ হইতে আমাদিগের কাছে বিশেষ বিশেষ রূপকে প্রকট করিয়া ধরে, ইহাদের কোনটীই সত্যিকার স্বরূপ নয়। পনীরের মধ্যে যে কীটাণু আছে সে অতি ক্ষুদ্র। এই কীটাণুর পা'গুলি এত ছোট যে সাদা চোখে দেখাই যায় না, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দরকার হয়। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই না বলিয়া কি কীটাণু নিজেও নিজের পা' দেখিতে পায় না? পায়, বরং কীটাণুর চক্ষুর কাছে তাহার নিজের পা' খুবই বড় মনে হয়, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কাজেই দেখা যাইতেছে পনীর-কীটাণুর পা' এর আকার (size) দর্শকের বা জ্ঞাতার ইন্দ্রিয়ের শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। বিভিন্ন ধরণের ইন্দ্রিয়ের অনুযায়ী পা' এর বিভিন্ন রকমের আকার অনুভূত হয়। পনীর-কীটের পা'এর আকার আমরা এক রকম দেখি, পনীর-কীট নিজে একরকম দেখে। কিন্তু পনীর-কীটাণুর একই সঙ্গে দুই রকমের আকার (size) তো সম্ভব নয়! কাজেই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে পনীর-কীটাণুর পায়ের সত্যিকার নিজস্ব আকার কিছু আছে কিনা সন্দেহ। যদিও বা থাকে তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই, যখনই আমরা জানিবার চেষ্টা করিব, তখনই ইন্দ্রিয়ের

মারফৎ জানিতে হইবে। অথচ দেখা গিয়াছে যে ইন্দ্রিয় আমাদিগকে সত্য প্রতীতি কখনই দেয় না।

কাম্‌লা রোগে (jaundice) একজন লোক ভুগিতেছে। তাহাকে সাদা দেয়াল বা সাদা কাগজ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করুন, কাগজ বা দেয়াল কোন্ রঙের ; সে নিঃসন্দেহে বলিবে, কাগজ হল্‌দে, দেয়ালও হল্‌দে। তাহার ইন্দ্রিয় তাহাকে হল্‌দে রঙ্ দেখাইতেছে, সে কী করিবে? তাহাকে খুন করিয়া ফেলিলেও সে কস্মিন্ কালেও বলিবে না, কাগজ সাদা। এই রকম, জিহ্বা আমাদের আস্বাদ গ্রহণের যন্ত্র। জিহ্বার ক্রিয়াশক্তির কোনো বিকৃতি হইলে, মিষ্টি জিনিষ চিনিও তিক্ত্ বোধ হইতে পারে, এ কথা সবাই জানে। কাজেই স্বাদ জিনিষটী আমার জিহ্বার গুণ ও জিহ্বার অনুভূতি : চিনি নামক বস্তুর গুণ নয়। জিহ্বার এক এক অবস্থায় বস্তুর স্বাদ অনুভূতিতে এক এক ধরণের বলিয়া মনে হয়। আসলে স্বাদ বা রঙ কোনটীই বস্তুর গুণ নয়, এরা হইল ইন্দ্রিয়ের গুণ, জিহ্বা ও চক্ষুর মাহাত্ম্য।

টেবিলে অঙ্গুলীদ্বারা চাপিয়া ধরিলে মনে হয় টেবিলটী শক্ত। আবার রবারের উপর চাপ দিলে অনুভূতি হয় রবারটী নরম। এই যে 'শক্ত' বা 'নরম' এর অনুভূতি, ইহাও স্পর্শেন্দ্রিয়ের মায়া বই আর কিছুই নয়। আমার অঙ্গুলীর প্রান্তে যে নাড়ী-কোষ (nerve cells) আছে তাহার উপরে একটা বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ (repulsion) বা চাপ লাগার ফলেই আমার মনে হইতেছে যে একটা শক্ত জিনিষ আমাকে ঠেলিতেছে। টেবিলটা কতকগুলি বিদ্যুৎ-কণার সমষ্টি মাত্র। এই শক্ত টেবিলের অনুভূতিটী বিনা টেবিলেও উৎপাদন করা চলে। আমার নাড়ীসংস্থিতির (nervous system) মধ্যে ঠিক ঠিক নাড়ীটীকে উদ্দীপিত করিয়া (stimulate) লইতে পারিলে কৃত্রিমভাবে টেবিলের অনুভূতি সৃজন করা যাইতে পারে। যদি ত্বক্-ইন্দ্রিয় কাহারও অবশ ও অসাড় হইয়া যায়, তবে তাহার আঙ্গুলে হাতুড়ী মারিলেও তাহার শক্ত কোন জিনিষের অনুভূতি হইবে না। এই রকম শ্রবণ ও ঘ্রাণ সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। কানে বিশেষ আকারের তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিলে কর্কশ বা মিষ্টি শব্দ আমরা শুনিয়া থাকি। তেমনি নাসিকায়ও বিশেষ ধরণের যোগাযোগের ফলে আমাদের মৃদু বা তীব্র, মিষ্টি বা উৎকট গন্ধের অনুভূতি হয়।

আর একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক্। আকাশে এমন তারা আছে যাহার নিঃসৃত আলো পৃথিবীতে আসিয়া পৌছিতে এক বৎসর লাগে। এমনই কোনো একটী তারা হইতে ১৯৩৭ সনের ১লা জানুয়ারী যদি এক ঝলক আলো বাহির হইয়া আসে, তবে সে আলো আমাদের চক্ষুতে আসিয়া আঘাত করিবে ১৯৩৮ সালের ১লা জানুয়ারী। আমার চক্ষুতে আলো-কণিকাগুলি আসিয়া স্পর্শ না করা পর্য্যন্ত আমি উক্ত তারকাটীকে দেখিতে পারিব না। আলোর সঙ্গে চক্ষুর সঙ্গতি হওয়া মাত্র আমি বলিলাম যে আমি তারাটীকে দেখিলাম। কিন্তু আলোকণিকাগুলি নিঃসৃত হইবার পরে হইতে এক বৎসর কাল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে ; ইতিমধ্যে যদি উক্ত তারকাটী বিনষ্টও হইয়া গিয়া থাকে, তবুও ১৯৩৮ সালের ১লা জানুয়ারীর দিন আমার চোখে উক্ত তারকার অস্তিত্বের

অনুভূতি হইবেই। ব্যাপার দাঁড়াইল এই যে আমার ইন্দ্রিয় আমাকে এমন একটী বস্তুর অনুভূতি দান করিতেছে যাহার অস্তিত্ব মোটেই নাই।

ইহাতে এই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য আমাদিগকে বহির্জ্জগতের সম্বন্ধে অবিকৃত জ্ঞান দান করে না। ইন্দ্রিয় যাহা উপস্থিত করে, তাহা নানা বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া আমাদের চেতনার দ্বারে উপস্থিত হইতেছে। ইন্দ্রিয়পথে যাহাই বাহির হইয়া আসিতেছে তাহাই বিকৃত হইয়া আসিতেছে। অথচ এই ইন্দ্রিয়কে বর্জ্জন করিয়া মানুষের জ্ঞানের আর পথ নাই। বহির্জ্জগতের দ্রব্যগুলির যে সব গুণ আছে বলিয়া আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে ধরিয়া লই, আসলে দ্রব্যগুলির মধ্যেই সে সব গুণ অধিষ্ঠান করে না। গুণগুলি আমাদের অনুভূতি মাত্র; তাদের অস্তিত্ব বাহিরে নাই, আছে আমাদেরই ইন্দ্রিয়ে, আমাদেরই চেতনায়। যে প্রকৃতিকে আমরা দেখি, সে প্রকৃতি যেমন দেখি ঠিক তেমন নয়। তাহার রূপ অন্য প্রকার, তাহার স্বধর্ম্ম অন্যবিধ। আমরা যেন রঙ্গীণ চশমা আঁটিয়া বসিয়া আছি। বহির্জ্জগৎকে সেই চশমা দিয়া দেখিয়া মনে করি, যাহা দেখিলাম তাহা বাস্তব সত্য ও নিশ্চিত সত্ত্বমান। কিন্তু চশমা যে আমাদের সকল জ্ঞানকে রাঙ্গাইয়া অপরূপ মায়া সৃজন করিতেছে তাহা আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না।

ক্রমশঃ

ভারতের রাজস্বনীতি

অধ্যাপক অনাথ গোপাল সেন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা ভারতের করনীতি ও সরকারী আয়-ব্যয় সম্পর্কে বৈদেশিক শাসক সম্প্রদায়ের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব, দেশীয় জনমতের অক্ষমতা, ব্যয়বহুল শাসন ব্যবস্থা, জাতিগঠনমূলক কার্য্যে উপেক্ষা ও অবহেলা ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে আমরা আয়-ব্যয়ের হিসাব আপনাদের সম্মুখে ক্রমে ক্রমে উপস্থিত করিয়া আমাদের উক্তি সমর্থন করিবার প্রয়াস পাইব।

প্রথমে আয়ের দিকটা ধরা যাক্। আমরা অপর পৃষ্ঠায় আয়ের যে হিসাব দিতেছি তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আয় হইয়া থাকে পণ্যশুল্ক (Customs) হইতে। ১৯২২ সালে ইহার পরিমাণ ছিল মোট আয়ের শতকরা ১৮.৫ ভাগ; ১৯৩৬ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ২৫.৭ ভাগে দাঁড়ায়। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই খাতে আমাদের আয় অতি সামান্য ছিল, এমন কি নগণ্য বলিলেও হয়। নিম্নে আমরা তাহার একটি সংক্ষিপ্ত হিসাব দিতেছি:

পণ্যশুল্ক

১৮৮২ সাল—২,৫৩,৯৬,১২০্ টাকা
১৯০২ সাল—৫,৭৪,৯৫,২৮৫্ টাকা
১৯১২ সাল—৯,৭০,২৮,৪৯৯্ টাকা

প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯১২ সালের পর পণ্যশুল্ক হইতে ভারতের আয় আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার কারণ বেশ রহস্যজনক মনে হইতে পারে। কিন্তু গূঢ় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিসন্ধিই ইহার প্রকৃত কারণ। ১৮৯৪ সাল পর্য্যন্ত নিজেদের শিল্প-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ ভারতে অবাধ বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করেন। ইহার ফলে বিলাতী পণ্য বিনা শুল্কে ভারতে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া আমাদের কুটীর-শিল্পের ধ্বংস সাধন ও তাহার বাজার দখল করিতে সক্ষম হয়। শুধু তাহাই নহে, ভারতীয় কলে প্রস্তুত নূতন বস্ত্র-শিল্প ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৯৬ সালে তাহার উপর উৎপাদন শুল্ক (excise duty) ধার্য্য করা হয়। আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুণ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কোন কোন ক্ষেত্রে অতি নিম্ন হারে আমদানী শুল্ক প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছিল সত্য; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বব্যাপী লড়াই উপস্থিত হইবার পর তৎসংক্রান্ত ব্যয়-সঙ্কুলনের জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন হইলে কর্ত্তৃপক্ষ বিদেশী পণ্যের উপর শতকরা ৭৷৷০ টাকা পর্য্যন্ত আমদানী শুল্ক নির্দ্ধারণ করিতে বাধ্য হন। তখন চা এবং পাটের উপর রপ্তানী শুল্কও নির্দ্ধারিত হয়। ১৯১৭-১৮ সালের বাজেটে আমদানী ও রপ্তানী শুল্কের হার কোন কোন

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের আয়

	১৯২১-২২		মোট আয়ের অংশ (শতকরা)	১৯৩৫-৩৬		মোট আয়ের অংশ (শতকরা)
	কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট	প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট		কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট	প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট	
পণ্য শুল্ক (কাষ্টমস্)	৩৪,৪১ লক্ষ	×	১৮'৫	৫৪,১১ লক্ষ	×	২৫'৭
আয়-কর	১৮,৭৪ ,,	৩,৪৩ লক্ষ	১১'৯	১৭,০৭ ,,	২ লক্ষ	৮'১
লবণ-শুল্ক	৬,৩৪ ,,	×	৩'৪	৮,৪৩ ,,	৩ ,,	৫'০
অহিফেন	৩,০৭ ,,	×	১'৬	৭১ ,,	×	'২
ভূমি-রাজস্ব	৩৩ ,,	৩৪,৩৯ ,,	১৮'৭	২৮ ,,	৩১,৯১ লক্ষ	১৫'৩
আবগারী	৫৪ ,,	১৬,৬৫ ,,	৯'২	৩৯ ,,	১৪,৮৭ ,,	৭'২
ষ্ট্যাম্পস্	২৫ ,,	১০,১৩ ,,	৫'৮	৩৯ ,,	১১,৪৪ ,,	৫'৬
বন-বিভাগ	১০ ,,	৫,৬৪ ,,	৩'১	১৬ ,,	৪,১৫ ,,	২'০
রেজিষ্ট্রেশন	২ ,,	১,১২ ,,	'৬	১ ,,	১,[illegible] ,,	'৫
দেশীয় রাজ্যের কর	৮৭ ,,	×	'৪	৭২ ,,	×	'৩
সিডিউল ট্যাক্স	×	×	×	×	৪৬ ,,	'২
রেল বিভাগ	১৫,২১ ,,	২ ,,	৮'২	৩১,৯৮ ,,	১¼ ,,	১৫'২
সেচ-বিভাগ	৬ ,,	৫,৭২ ,,	৩'১	৩০॥ হাজার	৯,৪৪ ,,	৪'৪
পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ	৫৬ ,,	×	'৩	৭৯ লক্ষ	×	'৩
সুদ	১,১১ ,,	১,০৮ ,,	১'১	৮৬ ,,	২,০২ ,,	১'৩
দেওয়ানী বিচার বিভাগ	৭৭ ,,	২,৭৩ ,,	১'৯	১,০০ ,,	৫,৬৬ ,,	৩'১
মুদ্রা ও টাকশাল	৪,৩৭ ,,	×	২'৩	১,১৭ ,,	×	'৫
সিভিল ওয়াকস্	২১ ,,	৬২ ,,	'৩	৩০ ,,	১,৫৫ ,,	'৮
বিবিধ	৭,১৮ ,,	১,৩৮ ,,	৪'৬	৬৪ ,,	১,৯৪ ,,	১'২
সৈন্য বিভাগ	৮,০৭ ,,	×	৪'৩	৫,২১ ,,	×	২'৪
প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের চাঁদা	+১২,৯৯ ,,	−১২,৯৯ ,,	×	−৩,০৬ ,,	৩,০৬ ,,	×
অপ্রত্যাশিত।	×	×	×	২। হাজার	১,২৭ ,,	'৬
মোট আয়	১,১৫,২১ লক্ষ	৭০,৪৩ লক্ষ		১,২১,০৭ লক্ষ	৮৯,০২ লক্ষ	

ক্ষেত্রে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করা হয়। তৎপর এরূপ শুল্কের হার ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। এই জন্যই ১৯১১ সালের ও ১৯২২ সালের পণ্যশুল্ক আয়ের মধ্যে এতটা আকস্মিক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় এবং এই বৈষম্য তৎপরবর্ত্তী কালে ক্রমান্বয়ে বাড়িয়াই চলিয়াছে। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট নিতান্ত দায়ে পড়িয়া যুদ্ধের পর হইতে রীতিমত আমদানী শুল্ক ধার্য্য করিতে সুরু করেন এবং তাহারই ফলে এই খাতে বহু কোটী টাকা আয় বৃদ্ধি পায়। গভর্ণমেণ্ট যদি পূর্ব্ব হইতে এই নীতি অবলম্বন করিতেন তাহা হইলে এই প্রভূত আয়ের সাহায্যে একদিকে যেমন ভারতের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি জাতিগঠনমূলক কার্য্যের জন্য চিরস্থায়ী অর্থাভাব অনেকটা দূর হইত, অন্যদিকে তেমনি বিলাতী পণ্য অবারিত দ্বার পাইয়া অব্যাহত গতিতে আমাদের দেশের শিল্প এভাবে ধ্বংস করিতে পারিত না। এক্ষণে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট বিদেশী পণ্যের উপর যে সংরক্ষণ শুল্ক আরোপ করিতেছেন তাহার মধ্যে নিজেদের স্বার্থও বেশ খানিকটা রহিয়াছে। প্রথমতঃ যুদ্ধের পর প্রভূত বিলাতী মূলধন দ্বারা ইংরেজগণ এদেশে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে; সুতরাং সংরক্ষণ শুল্কের সুবিধা ইংরেজ বণিকগণেরও সমভাবে প্রাপ্য। দ্বিতীয়তঃ, বিলাতী পণ্যের উপর যে হারে শুল্ক ধার্য্য করা হইয়াছে তদপেক্ষা অনেক উচ্চ হারে শুল্ক নির্দ্ধারিত হইয়াছে অন্যান্য দেশ হইতে আনীত পণ্যের উপর। এইভাবে শাখের করাতের মত উভয় দিকে ইংরেজদের সুবিধা অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে, এ কথা বলা বোধ হয় অন্যায় হইবে না। কিন্তু এইরূপ নীতির ফল আমাদের পক্ষে মোটেই শুভ হয় নাই। আমদানী শুল্ক ও অটোয়া চুক্তি দ্বারা এইরূপ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনের ফলে অন্যান্য দেশের নিকট আমরা বিরাগভাজন হইয়া পড়িয়াছি এবং ইহারা পূর্ব্বে আমাদের দেশ হইতে যে পরিমাণ পণ্য ক্রয় করিত তাহা বহু পরিমাণে হ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। অথচ ভারতের মোট রপ্তানির বেশীর ভাগই গ্রহণ করে এই সব দেশ। ইংলণ্ড গ্রহণ করে তাহার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। ইংরেজকে আমরা যে বিশেষ সুবিধা দান করিতেছি তদ্বিনিময়ে তাহারা যদি আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন তাহা হইলেও একটা সান্ত্বনার কারণ থাকিত। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সে সুবিধালাভ আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। ১৯৩২ সালে অটোয়া চুক্তি সংসাধিত হইবার পর চারি বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে বিলাতী পণ্যের আমদানি শতকরা ৩৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়; কিন্তু ইংলণ্ডে ভারতীয় পণ্যের আমদানি বৃদ্ধি পায় মাত্র শতকরা দশ ভাগ!

আমদানী শুল্ক রাজস্বের ঘাট্‌তি পূরণের জন্যই প্রধানতঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ফলে দরিদ্র ভারতবাসীকে পণ্যশুল্করূপ পরোক্ষ করের দরুণ অধিক মূল্য দিয়া বিদেশী, প্রধানতঃ বিলাতী পণ্য ক্রয় করিতে হইয়াছে; অথচ ইহার বিনিময়ে দেশীয় শিল্পের উন্নতিলাভেরও বিশেষ সহায়তা হয় নাই। অবশ্য ১৯২৪ সালের পর ইস্পাত, শর্করা, দেয়াশলাই, কার্পাসবস্ত্র প্রভৃতি কতকগুলি শিল্পের সংরক্ষণার্থ আমদানী শুল্ক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহার ফল ভারতবাসীদের পক্ষে ভোগ করা খুব সহজসাধ্য

হইতেছে না। কারণ বিগত যুদ্ধের পর হইতে এত অধিক পরিমাণে বিদেশী ও বিলাতী মূলধন ভারতে নানাবিধ শিল্পে নিয়োজিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে যে ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করা কঠিন হইয়া পড়িতেছে। লিভার ব্রাদার্স, ইম্পিরিয়্যাল কেমিক্যাল্স্, বাটা, সুইডিস ম্যাচ ফ্যাক্টরী, ডানলপ কোম্পানীর ন্যায় বিরাট প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এই প্রতিযোগিতার অসমতা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। উপরন্তু সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত নীতির ফলে বিলাতী পণ্যের উপর শুল্কের হার হ্রাস করিয়া দেওয়ায় দেশীয় শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারলাভ আরও কঠিন হইয়াছে। মোটের উপর, আমদানী শুল্ক পরোক্ষ কর হিসাবে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দিয়া দরিদ্র দেশবাসীর যতটা কর ভার বৃদ্ধি করিয়াছে, দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে ততটা সাহায্য করে নাই। অধিকন্তু আমদানী শুল্ক হইতে যে বিরাট রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে তাহার অতি সামান্য অংশই দেশের ধনোৎপাদনে বা জনহিতকর কর্ম্মে ব্যয়িত হয়। ব্যয় সম্পর্কে আমরা যখন বিস্তারিত আলোচনা করিব তখন ইহার পরিচয় আরও ভালরূপে পাওয়া যাইবে।

১৯৩৫-৩৬ সালে পণ্যশুল্ক হইতে আমাদের যে মোট আয় হইয়াছে তাহার শতকরা ৬৮ ভাগ আমদানী শুল্ক, ৭ ভাগ রপ্তানী শুল্ক এবং অবশিষ্ট ২৫ ভাগ উৎপাদন শুল্ক হইতে। বেশীর ভাগ আমদানী শুল্ক নিম্ন লিখিত পণ্যগুলি হইতে আদায় হইয়াছে—যথা, স্পিরিট, মদ, তামাক, কেরোসিন, সাইকেল, মোটরগাড়ী, লরী, যন্ত্রপাতি, ধাতুদ্রব্য সূতা, সৌখিন ছিট, চিনি, ও কৃত্রিম রেশম। দেশীয় স্পিরিট, কেরোসিন, রৌপ্য, চিনি, দেশলাই, লৌহ ও ইস্পাতের উপর নির্দ্ধারিত উৎপাদন শুল্ক হইতে প্রাপ্ত আয়কেও কাষ্টম্‌স্-এর মধ্যে ধরা হইয়াছে।

ভূমি-রাজস্ব

পণ্যশুল্কের পরই ভূমি-রাজস্ব হইতে ভারত গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আয় হইয়া থাকে এই আয় ক্রমশঃ কি প্রকার বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত হিসাব হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে ঃ

১৮৬০-৬১—২১ কোটী টাকা
১৯০০-০১—২৬ ,, ,,
১৯২০-২১—৩২ ,, ,,
১৯৩৫-৩৬—৩২ ,, ,,

এই ভূমি-রাজস্বের অধিকাংশই দরিদ্র ও ক্ষুদ্র কৃষিজীবীদের নিকট হইতে আদায় হইয়া থাকে। ভারতের এই কৃষক সম্প্রদায়ের ন্যায় নিঃসহায় ও সর্ব্বপ্রকারে বঞ্চিত মানবগোষ্ঠী জগতে আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। দীনতা ও মূঢ়তার এমনি শেষ সীমান্তে ইহারা বাস করে যে আধুনিক কালোপযোগী সুখস্বচ্ছন্দতার মুখদর্শন ত দূরের কথা, মনুষ্যজনোচিত জীবনযাত্রা

কাহাকে বলে তাহা ইহারা জানে না। সর্ব্বাঙ্গীন রিক্ততার মাঝে কোনপ্রকারে জীবনটাকে বহিয়া বেড়ান এবং কোন একটা মহামারীর আগমনে নীরবে চিরনিদ্রার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়া ইহাদের বিধিলিপি। সম্বল ইহাদের প্রত্যেকের ভাগে সামান্য ২।৪ বিঘা জমি, তুহাজার বৎসসের পুরাতন একটি লাঙ্গল বা সামান্য কাষ্ঠ ফলাকা ও এক জোড়া কৃশকায় বৃষ। চির-সাথী ইহাদের ঋণ। তদুপরি প্রকৃতির শুভদৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও বন্যা। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাদের উপরই কর ভার পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এ দেশের অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায়ও ইহাদের প্রতি অধিকতর অবিচার করা হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আয়-কর (income tax) এর কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভূমি-আয় ভিন্ন অন্যান্য সর্ব্ব প্রকার আয়ের উপর এই আয়-কর নির্দ্ধারণের সময় বার্ষিক দুই হাজার টাকার ন্যূন * আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে এই কর আদৌ দিতে হয় না। দু'হাজার টাকার উর্দ্ধে যাহাদের আয় তাহাদের মধ্যে যাহার আয় যত অধিক তাহাকে তত উচ্চহারে কর দিতে হয় কিন্তু ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে দরিদ্র কৃষককে তাহার দুই বিঘা জমির ২০৲। ২৫৲ টাকা আয়ের জন্যও বার্ষিক ৪৲। ৫৲ টাকা খাজনা বা ভূমিকর দিতে হয়। নিরিখের বেলায় এক হাজার বিঘা জমির মালিককে যে হারে খাজানা দিতে হয়, দুই বিঘাব জমির মালিককেও এক প্রকার জমির জন্য সেই এক হারেই খাজানা দিতে হয়। চাকুরী বা ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে কোন ৎসর দুই হাজার টাকার ন্যূন আয় হইলে আমরা আয়-করের হাত হইতে রেহাই পাইতে পারি; কিন্তু কৃষকের একমাত্র সম্বল দুই বিঘা জমির ফসল নষ্ট হইয়া তাহার সকল আশা নির্ম্মূল হইলেও রাজস্ব বা খাজানার হাত হইতে রেহাই পাইবার উপায় নাই। ইহার দৃষ্টান্ত চম্পারণ ও বারদৌলির ইতিহাসের এক করুণ অধ্যায়ে চির-স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ১৯২৯ সালের পর যে বিষম মন্দা উপস্থিত হইয়াছে তাহার ফলে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য প্রায় অর্দ্ধেক হ্রাস পাইয়াছে। দেবতা যখন এ ভাবে বিমুখ তখনও আমরা দেখিতে পাই যে ভূমি রাজস্ব হইতে সরকারী আয় অতি সামান্যই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে; বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে এই অবস্থায়ও খাজনা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কে আমাদের আর একটি লক্ষ্য করিবার আছে। তাহা এই যে, জমিদার, তালুকদার কিম্বা মাল গুজারদারগণ সরকারী রাজস্ব ও সরঞ্জামী খরচবাদে কৃষকের নিকট হইতে প্রাপ্য খাজনার দরুণ যে প্রচুর টাকা মুনাফা পাইয়া থাকেন তাহার জন্য তাহাদিগকে কোনরূপ কর দিতে হয় না। দু'চার হাজার হইতে লক্ষাধিক টাকার নিট লাভ এভাবে আয়-কর বা সর্ব্বপ্রকার কর হইতে রেহাই পাইয়া যাইতেছে—অথচ এই বিপুল আয় অনেকটা অনুপার্জ্জিত ও অনায়াসলব্ধ। ইহা অনুমান করিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে, গভর্ণমেণ্ট সম্ভবতঃ নিজেদের স্বার্থ ও প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্যই ভারতবর্ষে † এইরূপ একটি অনুগৃহীত, পোষ্য, ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়ের

* নূতন আয়-কর অনুযায়ী দেড় হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

† বাংলা, বিহার, যুক্ত-প্রদেশ, মধ্য-প্রদেশ, মাদ্রাজ এবং আরও কতকগুলি স্থানে।

সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাংলা দেশের জমিদারগণ বার্ষিক চার কোটী টাকা রাজস্ব দিয়া প্রায় আঠার কোটী টাকা দরিদ্র কৃষককুল হইতে খাজানা বাবদ পাইয়া থাকেন। ইংরেজ শাসনের প্রাথমিক অবস্থায় এইরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা যতই থাকুক না কেন, কালের ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে এইরূপ বৈষম্য ও পক্ষপাতিত্ব নিজেদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াও সমর্থন করা সুকঠিন। তবে ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, বাংলার প্রজা-আন্দোলন সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি দ্বারা বিশেষভাবে দূষিত। অবশ্য ইহার মধ্যে উদার মতাবলম্বী আদর্শবাদী একটি বিশিষ্ট শ্রেণী রহিয়াছেন সত্য, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহারা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কুকার্য্যে অজ্ঞাতে ইন্ধনই যোগাইতেছেন। বাংলার ভূমি-বন্দোবস্ত সমস্যার পুনর্বিচারে যেরূপ ধীরতা, স্থিরতা ও বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির আবশ্যকতা রহিয়াছে, সকল দিক হইতেই তাহার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়।

আয়-কর

আয়-কর (Income tax) ভূমি-করের ন্যায় প্রত্যক্ষ-কর (Direct tax)-এর অন্যতম দৃষ্টান্ত। কিন্তু আমাদের দেশের ভূমি-কর পশ্চাদগামী ও প্রতিক্রিয়াশীল (Regressive) এবং কর-নীতির আধুনিক সিদ্ধান্তের প্রতিকূল। কারণ, আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, কৃষকের অবস্থার তারতম্য অনুযায়ী খাজানার হারের কোনরূপ পার্থক্য করা হয় না—বড় ও ছোট, ধনী ও দরিদ্র সকল কৃষককে এক শ্রেণীর জমির জন্য একই হারে খাজানা দিতে হয়। আয়করের বেলা অবশ্য অগ্রগামী নীতি (principle of progressive taxation) অনুসরণ করা হইয়া থাকে এবং আয়ের তারতম্য অনুযায়ী করের হার কম-বেশী হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও উচ্চতর আয়ের জন্য করের হার যতটা বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় ততটা বেশী নহে। সেইজন্যই এইরূপ বিরাট দেশ হইতে আয়-কর বাবদ যে টাকা পাওয়া আমাদের সঙ্গত, তাহা আমরা পাই না এবং এই বাবদ আমাদের আয় মোট রাজস্বের শতকরা আটভাগ মাত্র।

১৮৬০ সালে সিপাহী বিদ্রোহের ক্ষতিপূরণ উদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রথম পাঁচ বৎসরের জন্য আয়-কর প্রবর্ত্তিত হয়। তৎপর ব্যবসায়ী ও চাকুর্যাদের উপর লাইসেন্স ট্যাক্স, সার্টিফিকেট ট্যাক্স প্রভৃতি নামে আয়-কর জাতীয় একপ্রকার কর ধার্য্য হয় এবং মাঝে মাঝে তাহা পরিত্যক্তও হয়। যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ব্যয় সঙ্কুলনের জন্যই প্রধানতঃ এই করের আশ্রয় লওয়া হইত। ১৮৬২ হইতে ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত আয়-কর হইতে নিম্ন পক্ষে দুই কোটী ও ঊর্দ্ধ পক্ষে তিন কোটী টাকা পাওয়া গিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের পর অতিরিক্ত লাভের উপর সুপার ট্যাক্স ও সারচার্জ্জ ধার্য্য করার ফলে ১৯২২ সালে এই বাবদে ভারত গবর্ণমেণ্টের আয় একেবারে বাইশ কোটীতে আসিয়া দাঁড়ায়! তৎপর ইহা পুনরায় হ্রাস পাইয়া বিগত দশ বৎসর যাবৎ সতের কোটী টাকার কাছাকাছি দাঁড়াইয়াছে।

এই সম্পর্কে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ইংলণ্ড ও অন্যান্য ধনী দেশের তুলনায় আয়-করের হার এ দেশে কম হইলেও, ঐ সব দেশের মাথা পিছু আয়ের সহিত আমাদের আয়ের তুলনা করিলে আমাদের করের হার মোটেই কম নহে। তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে ধনীদের উচ্চতর আয়ের বেলায় আমাদের হার বিদেশের হারের তুলনায় অনেক কম। ফলে এ দেশে ধনীর তুলনায় নির্ধনের উপর করের চাপ বেশী পড়িতেছে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে আয়-কর সংশোধনমূলক যে নূতন আইনটী সম্প্রতি পাস হইয়াছে তাহার দ্বারা এই অবস্থার কিঞ্চিৎ প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নূতন আইন মূলে যাহাদের বার্ষিক আয় আট হাজার টাকার অনধিক তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত কম আয়-কর দিতে হইবে; যাহাদের আয় আট হইতে চব্বিশ হাজারের মধ্যে তাহাদের কতককে বেশী ও কতককে কম আয়-কর দিতে হইবে। চব্বিশ হাজারের উর্দ্ধে সকলকেই উচ্চতর হারে আয়-কর দিতে হইবে। ইহার ফলে এক দিকে প্রায় আড়াই লক্ষ লোকের আয়-কর হ্রাস পাইবে, অন্য দিকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ধনীব্যক্তির কর বৃদ্ধি পাইবে এবং মোটের উপর ভারত সরকারের আয় এই বাবদে আরো দুই কোটী টাকার মত বেশী হইবে।

কিন্তু অতীতের একটি গুরুতর অন্যায়ের প্রতিকার বর্ত্তমানের সংশোধন আইন দ্বারাও কিছুতেই সম্ভবপর হইল না। যে সব ব্রিটিশ কোম্পানী ভারতবর্ষে ব্যবসা করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে তাহাদিগকে আয়-কর দিতে হয় না—নিজ দেশে শুধু তাহাদের কর দিলেই চলে। ইহার ফলে প্রতি বৎসর গড়ে এক কোটী ত্রিশ লক্ষ টাকা ভারতের ক্ষতি হইয়া থাকে। এই ব্যবস্থার অনুকূলে অবশ্য ইহা বলা যাইতে পারে যে, ভারতীয় কোম্পানীও যদি ইংলণ্ডে ব্যবসা করিয়া লাভবান হয় তবে তাহারাও বিলাতী আইন অনুসারে কিছু কর রেহাই পাইয়া থাকে। তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, ইংলণ্ডে বা ইউরোপে যাইয়া দেশের অর্থ ব্যয় করা ভিন্ন সেখান হইতে অর্থ উপায় করিয়া আনা কার্য্যতঃ কতটা ঘটিয়া থাকে তাহা কাহারো অবিদিত নহে। ভারতীয় ব্যবসায়িগণ বিলাতে কাজকর্ম্ম করিয়া কর বাবদ যে অনুগ্রহ লাভ করিয়া থাকেন তাহার পরিমাণ বার্ষিক তিন চারি লক্ষ টাকা মাত্র। এই সামান্য টাকা বাঁচাইবার জন্য প্রতি বৎসর গড় পরতা এক কোটী ত্রিশ লক্ষ টাকার ক্ষতি স্বীকার করা ভারতের দিক দিয়া কত বড় ক্ষতি তাহা সহজেই অনুমেয়। এই টাকাটা পাওয়া গেলে স্যার অটো নিমেয়ারের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রদেশগুলি ইহার একটা প্রধান অংশ লাভ করিতে পারিত এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির চিরন্তন আর্থিক সমস্যার সমাধানের একটা সুরাহা হইতে পারিত।

এই সম্পর্কে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। ইংরেজ বণিকগণ ভারতে যে সুবিধা লাভ করিয়া থাকেন, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউ জিল্যাণ্ড ভিন্ন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আর কোন দেশে তাহারা এই সুবিধা পান না। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড বিরল-বসতি ইংরেজ উপনিবেশ—বৃটিশ মূলধনের উপর নির্ভর না করিয়া চলিবার উপায় তাহাদের একেবারেই নাই। সুতরাং তাহাদের সহিত ভারতের তুলনা এই ক্ষেত্রে চলিতে পারে না।

অধিকন্তু প্রত্যক্ষ আর্থিক ক্ষতিই আমাদের একমাত্র ক্ষতি নহে। ইহার আরো একটা গুরুতর দিক রহিয়াছে। ভারতীয় শিশু শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি তাহাদের লাভের উপর উচ্চহারে ইনকাম-ট্যাক্স ও সুপারট্যাক্স ইত্যাদি দিতে হয়, আর ভারতে অবস্থিত বিদেশী কিংবা বৃটিশ কোম্পানীগুলি তাহা হইতে রেহাই পায়, তাহা হইলে উহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলির টিকিয়া থাকা স্বতঃই বহুগুণ কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। আমরা প্রতি বৎসর এই বাবদ যে দেড় প্রায় কোটী টাকা ক্ষতি দিয়া থাকি তাহা প্রকারান্তরে বিদেশী কোম্পানীকে সাহায্য বা বৃত্তি দান হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে! শিল্প-প্রয়াসে নূতন ব্রতী ভারতীয়দের পক্ষে ইহা অদৃষ্টের পরিহাস বলিয়া মনে হওয়া বিচিত্র নয়। বিদেশীরা তাহাদের মূলধন দ্বারা এই দেশে ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া যদি ভারতীয় কোম্পানী আইনের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিতে স্বীকৃত হইত কিংবা ভারতীয় কারবারে কেবল সুদে টাকা খাটাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিত তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা ছিল। ইচ্ছা করিলে তাহারা এখনো তাহাদের স্বদেশে রেজিষ্টারীকৃত ব্যবসার জন্য এদেশে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট লইতে পারে। কিন্তু তাহা হইবার উপায় নাই, কারণ তাহারা দুধও খাইবে, তামাকও খাইবে। তাই নূতন আইন হইতে এই সম্পর্কীয় ৫৩ ধারাটী তুলিয়া দিবার জন্য ভারতীয় জনমত ও পরিষদের সদস্যগণ সমস্বরে আপত্তি উত্থাপন করিলেও তাহা টিকে নাই—বড় লাট সাহেব তাঁহার বিশেষ ক্ষমতার বলে এইরূপ সংশোধন প্রস্তাব ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত করিবার অনুমতিই প্রদান করেন নাই! আত্ম-কল্যাণ নিয়ন্ত্রণে দেশবাসী আজ পর্য্যন্ত কতটুকু আত্ম-কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছে ইহা তাহারই আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আবগারী

দেশী ও বিলাতী মদ ও স্পিরিট, তাড়ি, আফিম, গাঁজা, চরস ও ভাঙ্গ প্রভৃতির উপর নির্দ্ধারিত শুল্ক এবং তাহা প্রস্তুত ও বিক্রয়ের লাইসেন্স ফি হইতে এই টাকা আদায় হয়। গভর্ণমেণ্ট যে সব মাদকদ্রব্য নিজেদের ভাটি বা কারখানায় প্রস্তুত করিয়া থাকেন তাহার লাভও এই আয়ের অন্তর্গত। এই আয় এখন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য। ইহার প্রধান অংশ দেশীয় মদ ও স্পিরিট হইতে আসে। বিদেশী মদ ও স্পিরিট হইতে প্রাপ্ত আয়ের অংশ বেশী নহে। আবগারী আয় কিরূপ নিয়মিতভাবে বৎসরের পর বৎসর বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত হিসাব দৃষ্টে বুঝিতে পারা যাইবে।

১৮৬১-৬২ সালে—১,৭৮,৬১,৫৭০৲ টাকা
১৮৮১-৮২ সালে—৩,৪১,৭২,৭৪০৲ টাকা
১৯০১-০২ সালে—৬,১১,৫০,২১৫৲ টাকা
১৯২১-২২ সালে—১৭,১৮,৬১,৯১৪৲ টাকা
১৯৩৫-৩৬ সালে—১৫,২৬,২৪,৩৮০৲ টাকা

এই বৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে আমদানী ও উৎপাদন শুল্কের অত্যধিক বৃদ্ধি এবং ইহা আদায় সম্পর্কে সাতিশয় সতর্কতা। এই দ্রুত বর্দ্ধমান আবগারী কর নেশাসেবীদিগকেই বহন করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে আবার অধিকাংশই দরিদ্র। সুতরাং পরোক্ষ কর হিসাবে ইহার চাপ প্রধানতঃ দরিদ্র ভারতবাসীর উপর যাইয়াই পড়ে। অবশ্য ইহার সমর্থনে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, শুল্কের হার এই ভাবে বৃদ্ধি করিয়া না দিলে দেশের মধ্যে পানদোষ ও অন্যান্য নেশার অভ্যাস অধিকতর প্রসার লাভ করিত এবং দেশের অধিকতর নৈতিক স্বাস্থ্যহানি ঘটিত। এই যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করা যায় না। তবে দুঃখের বিষয় এই যে উচ্চ শুল্ক সত্ত্বেও দেশে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার বিশেষ হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। ভারতের দরিদ্র অধিবাসীরা উচ্চ শুল্ক দিয়াও গভর্ণমেণ্টের এই আয় যোগাইতেছে। ইহার জন্য দেশের আর্থিক দুরবস্থা, জীবনের স্বার্থকতা সম্বন্ধে দেশবাসীর অজ্ঞতা ও নৈরাশ্য এবং সাধারণ নৈতিক আবহাওয়া কম দায়ী নহে। কিন্তু এইরূপ অবস্থার দরুণ গভর্ণমেণ্টের দায়িত্বকেও অস্বীকার করা যায় না।

লবণ-শুল্ক

১৯২২-১৯৩৬ সালের মধ্যে লবণ-শুল্ক বাবদ ভারত গভর্ণমেণ্টের আয় বার্ষিক ৬॥ কোটী হইতে ১০ কোটী টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছে। ১৮৮৮ সাল হইতে ১৯০৩ সাল পর্য্যন্ত লবণের উপর শুল্কের হার মণ করা ২॥০ টাকা ছিল। তৎপর বিগত ৩৫ বৎসরের মধ্যে এই হার কখন বাড়িয়া কখন কমিয়া ১৲ টাকা ও ২।০ টাকার মধ্যে উঠানামা করিয়াছে। এই বিভাগের আয় প্রধানতঃ দেশীয় ও বিদেশীয় লবণের উপর নির্দ্ধারিত উৎপাদন ও আমদানী শুল্ক ও গভর্ণমেণ্টের তৈয়ারী লবণ বিক্রয়ের লাভ হইতে হইয়া থাকে। ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত দেশী ও বিদেশী লবণের উপর শুল্কের হার এক প্রকার ছিল। কিন্তু তাহার পর বিদেশী লবণের উপর শুল্কের হার মণ করা ।৶ আনা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৩৮ সালের এপ্রিল হইতে এডেনের আমদানী লবণের উপর হইতে এই অতিরিক্ত শুল্ক অপসারিত করা হইয়াছে। ১৯৩১ সালে পৃথিবীব্যাপী অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইলে ভারত সরকারের অর্থাভাব আংশিক পূরণ করিবার জন্যই এই অতিরিক্ত শুল্ক নির্দ্ধারিত হইয়াছিল,—ভারতের লবণের ব্যবসার উপকারার্থ করা হয় নাই। সেইজন্যই ১৯৩৮ সালে ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে এই অতিরিক্ত আমদানী শুল্ক তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

লবণের ব্যাপারে ভারতবাসী দুইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। শুল্কের বিষয় পরে আলোচনা করিব; প্রথমতঃ লবণব্যবসার কথা ধরা যাক্। অতীতে ভারতবাসী লবণ সম্পর্কে স্বপ্রতিষ্ঠ ছিল। ভারতবর্ষের তিন দিকেই সমুদ্র। বাংলাও সমুদ্রকে কোলাকুলি করিয়া রহিয়াছে। সমুদ্রের মধ্য

হইতেই দক্ষিণ বা নিম্ন বঙ্গের উদ্ভব। অতীত কালে বালাশোরের পশ্চিম হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বাংলার তিনশত মাইল ব্যাপী সমুদ্র উপকূলে প্রায় সাত হাজার বর্গ মাইলের মধ্যে বহু লবণের গোলা ছিল। যাহা হইতে ৩০।৩৫ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হইত। লবণ শিল্প হইতে যে রাজস্ব আদায় হইত পূর্ব্বেতাহা বাংলার জমিদারগণের প্রাপ্য ছিল। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহা নিজে গ্রহণ করিয়া একচেটিয়া ব্যবসা করিতে প্রবৃত্ত হন। ফলে ১৮৭৩ সালের মধ্যে বাংলার লবণ উৎপাদন একেবারে লুপ্ত হয় এবং কোম্পানীর দৌরাত্ম্যে যে সব জেলায় ও অঞ্চলে লবণ তৈরী হইত সে সব স্থান জনশূন্য হইয়া পড়ে। তাই আজ আমরা লবণাম্বুরাশি-পরিবেষ্টিত হইয়াও পরমুখাপেক্ষী। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলার অবস্থাই অত্যন্ত শোচনীয়। ১৯৩১ সালে বিদেশী লবণের উপর অতিরিক্ত হারে আমদানী শুল্ক নির্দ্ধারণের ফলে অন্যান্য প্রদেশ লবণ প্রস্তুত বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছে; কিন্তু বাংলা যে তিমিরে সেই তিমিরে পড়িয়া রহিয়াছে।

১৯৩৬-৩৭ সালে ১৪৪ লক্ষ মণ লবণ বাংলায় আমদানী হয়। তন্মধ্যে ৭৫ লক্ষ মণ বিদেশ হইতে এবং অবশিষ্ট পরিমাণ অন্যান্য প্রদেশ হইতে আসে। সেই বৎসর ভারতে বিদেশী লবণের মোট আমদানী হইয়াছিল এক কোটী তিন লক্ষ মণের উপর। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে বিদেশী লবণের শত করা ৭৩ ভাগই বাংলায় আসিয়াছে এবং বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশ তাহাদের নিজ প্রয়োজন মিটাইয়াও তাহাদের উৎপন্ন লবণের কতকাংশ বাংলায় পাঠাইতেছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে ৯৮½ লক্ষ মণ লবণ এডেন ও অন্যান্য দেশ হইতে এবং ৪৯ লক্ষ মণ লবণ অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাংলায় আমদানী হইয়াছিল। এই লবণের মূল্য গড়ে প্রতিমণ সোয়া দুই টাকা ধরিলে প্রায় ৩।।০ কোটী টাকা প্রতি বৎসর বাংলার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে!

ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্ম দেশ পৃথক হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশেও এডেনের লবণকে অতিরিক্ত আমদানী শুল্ক হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পৃথক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মদেশে এডেন হইতে আমদানী লবণের উপর অতিরিক্ত হারে শুল্ক ধার্য্য করা হইয়াছে এবং লবণ শিল্পের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য এমন কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে যাহার ফলে দেড় বৎসরের মধ্যে লবণের উৎপাদন আশাতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে ব্রহ্মদেশও শীঘ্রই লবণ সম্পর্কে স্বাবলম্বী হইতে পারিবে আশা করা যায়। কিন্তু বাংলা কোথায়?

এক্ষণে আমরা লবণের উপর আরোপিত শুল্কের ফলাফল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এই লবণ করের বিরুদ্ধে ভারতের নেতৃবর্গ ব্যবস্থা পরিষদের ভিতরে ও বাহিরে চিরদিন তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া আসিয়াছেন এই কারণে যে, ইহা গরীব ভারতবাসীর তুচ্ছ আহার্য্যবস্তুর অপরিহার্য্য শেষ উপাদানটুকু পর্য্যন্ত তাহাদের নিকট দুর্লভ করিয়া তুলিবে। এই আশঙ্কা যে অমূলক নহে তাহা প্রমাণ করা কঠিন নহে। লবণের উপর শুল্ক যখনই বৃদ্ধি করা হইয়াছে তখনই ইহার ন্যায় অপরিহার্য্য জিনিষের কাটতিও বিশেষ ভাবে হ্রাস প্রাপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে। পক্ষান্তরে শুল্কের হার হ্রাস করা হইলে ইহার চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৯০৩ ও ১৯০৮ সালের

মধ্যে শুল্কের হার হ্রাস করিয়া দেওয়া হইলে লবণের ব্যবহার শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দরিদ্রসাধারণের নূন-ভাত ও স্বাস্থ্যের উপর এই করের প্রভাব কতখানি ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। এক মণ লবণের মূল্য শুল্ক বাদ দিলে চার-ছয় আনার বেশী নহে; কিন্তু তাহারই উপর আমাদিগকে ২৷৷০ টাকা পর্য্যন্ত শুল্ক দিতে হয়। 'বোঝার উপর শাকের আটি' এতকাল ইহাই শুনিয়া আসা গিয়াছে; এক্ষণে 'শাকের আটির উপর বোঝা' কি জিনিষ ইহা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

ক্রমশঃ

পাগল

বিনয়েন্দ্রনাথ রায়

পথে যখন বেড়াই আমি সবাই মোরে দেখে হাসে,
পাগল বলে কেউ কখনো আদর করে নেয় না পাশে,
ছেলের দলে হাত্‌তালি দেয়, বুড়োর দলে দেয় গালি,
আপন মনে পথ বেয়ে যাই কোন কথাই নাহি বলি।
নিজের সুরে গান গেয়ে যাই অকারণেই হেসে উঠি,
কোথায় যেন দেখি কারে অম্‌নি তারে ধরতে ছুটি।
থম্‌কে দাঁড়াই কেঁদে উঠি কি জানি হায়, কিসের লাগি,
দৃষ্টি আসে ঝাপ্‌সা হয়ে শূণ্য পানে চেয়ে থাকি।
ভুলে যে যাই চল্‌তে পথে, কে যে আমায় পিছন টানে,
চম্‌কে উঠি, কার পরশে ঝঙ্কারিল মর্ম্ম-বীণে।
কার মূরতি দেখতে থাকি, কইতে কথা ভুলি কত,
কোন্‌ সুদূরে বসে সে যে ডাক্‌ছে আমায় অবিরত।
মনে পড়ে, অম্‌নি আবার গান গেয়ে পথ চলতে থাকি,
যাত্রা আমার অচিনদেশে, পথ যে আরো অনেক বাকী।

মিস্ কেতকী মিত্র

ইন্দ্রাণী রায়

বন্ধু মহলে উদয় কবি বলিয়া পরিচিত। লেখার ধাঁচ তার 'আলট্রামডার্ণ'। বাড়ির অবস্থা ওর ভালই, কলিকাতায় নিজেদের তিন খানা বাড়ি। ওরা থাকে গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ীতে।

প্রেসিডেন্সী কলেজের ফোর্থ ইয়ারের ছেলে উদয়—বরাবর রুটিন ধরিয়া পড়া তো দূরের কথা,—পরীক্ষার সময় পিতার রীতিমত দৃষ্টি রাখিতে হয় সময় মত সে ঘরে ফিরিল কিনা। উপর্য্যুপরি দুইবার ফেল করিয়া উদয় কলেজ ছাড়িয়া দিল. পিতা কিন্তু পুনরায় ভর্তি করাইয়া দিলেন। দিনকাল ভাল নয়, বাউণ্ডলে হইয়া ঘুরিয়া বেড়ানো অনুচিত।

গ্রীষ্মের ছুটিটাকে উপলক্ষ্য করিয়া উদয়ের মা বাবা, দাদা বৌদি সব হাওয়া বদলাইতে চলিয়া গেল পশ্চিমে। বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ এবং পড়াশুনার অজুহাত লইয়া উদয় থাকিয়া গেল কলিকাতায়। আসল কথা, ও একবার স্বাধীন ভাবে বাস করিতে চায়।

দেখা গেল সকালে বিকালে উদয়ের ঘরে বন্ধুদের আড্ডা বেশ ঘন হইয়াই জমে। ভৃত্য নিতাই চরণ দিন দশেকের মধ্যেই হিম্‌সিম খাইয়া উঠিল। হুকুমের উপর হুকুম বিরাম নাই।—'যা ছুটে যা আইসক্রীম,—লিমোনেড পাঁচটা।—আরে এইযে দাঁড়া সিগারেট—আর সখারামের দোকান থেকে সিঙারা'।—বহুকালের ভৃত্য, এবাড়ির সকল কায়দা কানুনে অভ্যস্ত, তাই চুপ করিয়া সহিয়া যায়। কিন্তু শেষ কালে অসহনীয় হইয়া উঠিল—উদয়ের নিজেরই কবি সে কলিকাতার মেঘলা দিনকে কেন্দ্র করিয়া যে রচনা করে 'নবমেঘদূত'—ধূসর সন্ধ্যা যাকে টানিয়া লইয়া যায় অদেখা পল্লীর হেমন্ত সন্ধ্যার উদাসী প্রান্তরে,—এ কয়দিন বন্ধুদের কলরবে, খাওয়ার আড়ম্বরে, খেলার চীৎকারে সত্যিই যেন ও ভাঙ্গিয়া পড়িল। সমস্ত দিন রাত্রির ব্যাপারগুলো মিটাইয়া ও যখন প্রবেশ করে শোবার ঘরে,—প্রায় দিনই দেখা যায় ঘড়িতে তখন বারটা রাত। এমনই এক রাত্রিতে ও লিখিবার টেবিলে গিয়া বসে। "পূরবী" অফিস হইতে তাগিদ আসিয়াছে—তারা একটা লেখা চায় এক সপ্তাহের মধ্যেই। ওদিকে "পথের বাঁশী" সম্পাদককে কথা দেওয়া হইয়াছে,—অথচ সুবিধা জনক লেখা যে হাতে একটিও নাই! চোখ বুজিয়া ভাবিতে লাগিল উদয়—কী নিয়া সে সুরু করিবে আজিকার লেখা। ফুল, চাঁদ আর নারী প্রেম লইয়া বহু লেখা লিখিয়াছে, এবার লিখিবে সমুদ্র নিয়া। ও একবার পুরীতে বেড়াইতে গিয়াছিল, আজ চোখ বন্ধ করিয়া মানস্ কল্পনার অদৃশ্য রথে চড়িয়া সমুদ্র সৈকতে গিয়া দেহ মেলিয়া দিল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ ফেনায়িত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—কিন্তু কী আশ্চর্য্য কাণ্ড—গর্জ্জনের পরিবর্ত্তে ও শুনিতে লাগিল—সিনেমার বাজনা, বন্ধু কুমুদের ঘর ফাটা হাসি, অজিতের তবলার সঙ্গে নিখিলের গজল গান—আঃ মাথার ভিতরটা ওর একেবারে ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিল।

হাতের কলমটা খাতার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া উদয় চক্ষু মেলিয়া ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখে বারটা চল্লিশ। চতুর্দ্দিকে রাত্রির নিঃসঙ্গতা কেবল ওরই ফাঁকে শুনা যাইতেছে নিতাই চরণ ঘর নিকাইতেছে ঘস্ ঘস্ করিয়া। আর ঠিক এমনি ভাবেই পনেরো ষোলদিন কাটিল—আশ্চর্য্য! শেষকালে উদয়ের প্রতিভা এভাবে নষ্ট হইয়া যাইবে নাকি। হঠাৎ রাগটা গিয়া পড়িল নিতাইয়ের উপর। এবং সেই মুহূর্ত্তে নিতাইকে হাজির হইতে হইল দুয়ার সন্মুখে। উদয় প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া গেল—এত রাত অবধি লাইট জ্বলে কেন, পিতার রাখিয়া যাওয়া টাকা জলের মত খরচ হইতেছে কেন,—নিতাইয়ের কি কাণ্ডজ্ঞান নাই,—এ বাড়িতে কাজ করিয়া সে বুড়া হইয়া গেল—ইত্যাদি। বিরক্ত কুঞ্চিত মুখের উপর হাসি টানিবার চেষ্টা করিয়া কহিল নিতাই—হিসেব দেখবেন—খোকাবাবু? সোডা, লিমোনেড, আইসক্রীম, আর ডাব, এ তো রোজই চলছে। তারপর ফার্পো থেকে বিলিতি মিষ্টি—

—আরে থাম্ থাম্—অত শুনতে চাইনে আমি। এই বলে দিলুম তোকে, কাল থেকে বাইরের বাবুরা কেউ এলে বলে দিবি—বাবু তার মাসী বাড়ি হাওড়ায় গেছে, সেখানে অসুখ, ডিউটি খাটে,—বুঝলি? এ কয়দিন উদয়ের বেসামাল ভাব দেখিয়া মনে মনে দারুণ শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল নিতাইচরণ। এখন হঠাৎ খোকাবাবুর মত পরিবর্ত্তনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বিপুল উৎসাহে কহিয়া ফেলিল—ওই যে তোমার মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে এ্যাদ্দিন এতগুলো ছোক্‌রা খেলে,...রীতিমত চাঁদা ধরে তুলে নিও। সত্যি কথাই বলে দিও, বাপের রোজকারের টাকা, তুমি দেবে কোত্থেকে—

—ভারি ইয়ে হয়েচিস্—না? টেবিলের উপর প্রচণ্ড চাপড় মারিয়া উদয় ঘুরিয়া বসিতেই নিতাই আড়ালে চলিয়া গেল।

সকাল আটটার মত। ইতিমধ্যে দুই বন্ধু আসিয়া হাওড়ার নাম শুনিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেছে। উদয় সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ হইবার জন্য নীচ তলা ছাড়িয়া উপরে তার বৌদির ঘরে আশ্রয় লইয়াছে। বেশ নিরিবিলি, লেখা জমিবে ভাল। এ ঘরের দক্ষিণ খোলা না হইলেও পূবের আকাশ সম্পূর্ণভাবেই উদারতার পরিচয় দেয়। বাতায়ন পথে আকাশ পানে চাহিয়াছিল উদয়। ঝক্‌ঝকে ফিট্‌ফাট্ রৌদ্রভরা আকাশ—এতটুকু মেদুরতার চিহ্ন নাই;—দূর দূরান্তরে দৃষ্টি চলে না,—বাড়ির পরে বাড়ি ঘেঁসাঘেঁসি, আড়াআড়ি হইয়া আছে। উদয়ের মন উষ্ণ হইয়া উঠিতেই একটা সিগারেট ধরাইয়া চোখ মুদিয়া ভাবিতে বসিল এমন সময় নিতাই আসিয়া কাসির শব্দ করিয়া দুয়ার সম্মুখে দাঁড়াইল। চোখ মেলিয়া আধ পোড়া সিগারেটটা ফেলিয়া দিয়া উদয় প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে ভৃত্যের পানে চাহিল। বিনীতস্বরে নিতাই কহিল—চাঁদার জন্যে ও বাড়ি থেকে—

—নাঃ—অসহ্য! তুই এলি আবার ঘ্যান্ ঘ্যান্ কর্ত্তে। বলি আমার মাথাটা কি সবাই কিনে রেখেছিস? চাঁদা—চাঁদা—ইঃ—স্ কী ঝকমারিই হয়েছে একা বাড়ি থেকে, সবই যেন—

উদয়ের কথা শেষ না হইতেই—পিছনের দিকে ইঙ্গিত করিয়া নিতাই সরিয়া গেল, আর পর্দ্দা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল একটি তরুণী। উদয় উঠিয়া দাঁড়াইল কিন্তু ভড়কাইয়া গেল রীতিমত। মেয়েটিকে বসিতে বলিবার ভদ্রতাবোধ হঠাৎ ও হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু মেয়েটি অপেক্ষা করিল না, এরই মধ্যে একটা চেয়ার টানিয়া সে বসিয়া পড়িয়াছে এবং স্নিগ্ধ হাসিয়া উদয়ের পানে চাহিয়া কহিল—দাঁড়িয়ে কেন, বসুন না! কথা আছে আপনার সঙ্গে। উদয় বসিতেই মেয়েটি কহিল—অমিতাদি' মানে—আপনার বৌদির কাছে এসেছিলেম, উপরে এসে নিতাইয়ের কাছে শুনলুম বাড়ি খালি—শুধু আপনি আছেন তাই বাধ্য হয়েই আসতে হ'ল আপনার কাছে।

লজ্জায় উদয় ঘামিয়া উঠিল। ইঃ—স্—চাঁদার কথাটা শুনিয়া ফেলে নাই তো! আমতা আমতা করিয়া কহিল উদয়—জানেন না, একা থাকার কী যে ঝক্কি,—চাকরের সঙ্গে ভোর থেকেই বকাবকি না করে উপায় নেই—।

হাসিয়া মেয়েটি কহিল সে তো সত্যি কথাই, আমি এসে আবার তার মধ্যে ডিসটার্ব করলুম। অমিতাদির কাছে অমন আমি মাঝে মাঝে এসে থাকি। আজ বিশেষ প্রয়োজনেই আপনার কাছে—

—আমার বৌদির বান্ধবী আপনি।—ডিসটার্ববেন্সের কথা বলছেন—কিছু নিয়েই এমন ব্যস্ত ছিলুম না যে আপনি আসতে তা বন্ধ হয়ে গেছে। চাঁদা সম্বন্ধে মেয়েটি এইবার কথা সুরু করিল। সুন্দর সাবলীল ভাষায় ও যখন বক্তব্য শেষ করিল, উদয় তখনও মুগ্ধ নেত্রে মেয়েটির অনুপম মুখখানির পানে চাহিয়া। হঠাৎ ওরই চোখের উপর মেয়েটির দৃষ্টি পড়ায় লজ্জিত হইয়া উদয় খোলা জানালার পানে চাহিয়া কহিল—অশিক্ষিত দীন মজুরের জন্য নাইট স্কুল করতে চান সেতো খুব ভালো আইডিয়া। তবে কি জানেন, আমার মত বেকার না ধরে, চাকুরে—মানে মোটা মাইনে যাদের, সে সব শ্রেণীর দশ বিশ জনকে ধরলেই আপনাদের কার্য্য-সিদ্ধি। মুখখানি নত করিয়া সুন্দর ভঙ্গীতে হাসিয়া মেয়েটি কহিল—ভুল ধারণা আপনার। যাদের আমরা খেতাবের পরিবর্ত্তে জানাবো অন্তরের কৃতজ্ঞতা কী লাভ হবে তাদের! আর নিজের বেকারত্বের কথা বলছেন,—আমি বলছি, চাকরী যাদের জীবনে অপ্রয়োজনীয় তাদের বেকার বলা চলে না। তারা যদি মুরব্বির জোরে আর পাঁচজন অভুক্ত বেকারের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় প্রকারান্তরে দেশের ক্ষতিই তারা করে থাকে।

উদয়ের মুখ লাল হইয়া উঠিল, ঢোক গিলিয়া কহিল—বাপের টাকা নাড়াচাড়া করছি, এ টাকা দেওয়ার মধ্যে—গৌরব নেই।

—গৌরব আছে, মেয়েটি কহিল। আপনার বাবা রায় বাহাদুর, প্রকাশ্য সাহায্যে—তাঁর আপত্তি থাকতে পারে, কিন্তু আপনার সে সব বালাই নেই, আর ইয়ং বেঙ্গল যে আপনাদের নিয়েই গড়ে উঠেছে—! উদয় বিনা প্রতিবাদে উঠিয়া দাঁড়াইল,—শুধু রূপে নয়,—কথাবার্ত্তায়

মেয়েটি ওকে—উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া—তুলিয়াছে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে। ড্রয়ার টানিয়া খুলিতেই—উদয়ের চোখে পড়িল দুইখানা নোট। ভাবিয়া দেখিবার মত উদয়ের তখন আর কিছু ছিল না দুইখানা নোটই তুলিয়া ধরিয়া দিল মেয়েটির হাতে। চাঁদার খাতায় নাম লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া মেয়েটি কৃতজ্ঞ চোখে চাহিল উদয়ের পানে। উদয় নাম লেখা সারিতেই খাতাখানা হাতে তুলিয়া মেয়েটি কহিল—আচ্ছা, চলি এখন—অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। অমিতাদি এলে আবার আসবো,—এক হোষ্টেলেই ছিলুম কিনা--স্কুল জীবনে ..। হাসিয়া মেয়েটি টক্ টক্ করিয়া সিড়ি বাহিয়া নীচে কয়েক ধাপ নামিয়াই আবার ফিরিয়া আসিয়া কহিল---ডোনারের কাছে নাম গোপন করতে নেই, ঠকিয়ে কত লোক পালিয়ে যায়।---নাম আমার কেতকী মিত্র। মেয়েটি নামিয়া গেল—উদয় কাণ পাতিয়া শুনিল ক্রমশঃ তার—জুতার শব্দ অস্পষ্ট হইয়া মিলিয়া গেল!

—কেতকী—কেতকী মিত্র,—অকস্মাৎ মধুর সঙ্গীত ধ্বনির মত মেয়েটির ক্ষণিক সাহচর্য্য উদয়ের কবি চিত্তকে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিল। শুনিয়াছিল বটে উদয় তার বৌদির কাছে অনেকদিন আগে, রূপসী কেতকী মিত্র—শুধু রূপে নয়—সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার জন্য নামের খ্যাতি তার প্রভূত। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়াছে সে মেয়ে—আজীবন কৌমার্য্য ব্রতই পালন করিয়া যাইবে, ললাটে আঁকিবেনা সে বিবাহের ছাপ, মন্ত্র আওড়াইয়া সংসারের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা পড়িবেনা কোনদিন...। সেই বিদ্রোহিনী মেয়ে—বিদ্রোহিনীই বটে,—সমাজকে যে মানিতে চায় না—নিয়ম শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে যে দাঁড়ায়—সেতো—বিপ্লবীরই সামিল! অর্থের জন্য সে মেয়ে আসিয়া হাত পাতিল উদয়ের কাছে, এ যেন বিশ্বাসযোগ্য নয় এমনি অসম্ভব বলিয়া মনে হইল উদয়ের। নারীসাহচর্য্য উদয়ের জীবনে এই প্রথম নয়,—তবু কী যে নব উন্মাদনা জাগাইয়া দিয়া গেল কেতকী মিত্র—আহারে, বিহারে, সেই একখানি মুখ। এবং সেই মুখখানাকে কেন্দ্র করিয়া উদয় প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া যায়—তুমি কি সত্যই প্রতিজ্ঞা করিয়াছ কোনকালে বিবাহ করিবে না? তুমি নাইট স্কুল করিবার কথার মুখে, সোস্যালিজমের বুলি আওড়াইয়া গেলে,—'মার্কস্'এর মূলনীতিকে হয়ত তুমি আদর্শ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছ—। কিন্তু কত কবি, গুণী, শিল্পী, রসজ্ঞ—তোমার পাণি-প্রার্থী হইয়া ফিরিয়া যাইবে, তাহাদের সেই ব্যর্থতা কি এতটুকু চঞ্চলও করিবে না তোমায়? ভুল—ভুল পথে চলিয়াছ কেতকী।...ঘণ্টাখানেকের মধ্যে উদয় এক চতুর্দ্দশী কবিতা লিখিয়া খাড়া করিল, বিষয় বস্তু নিয়া আজ আর ভাবিতে হইল না, কবিতার নাম দেওয়া হইল —"ক্ষণিকা"---।

গাঢ় মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন, বৃষ্টি আসন্ন প্রায়। উদয় নিজেই বাহির হইয়া পড়িল মোটর নিয়া—হয়ত সিনেমার উদ্দেশে। গলির মোড় ঘুরিতেই উঠিল প্রবল হাওয়া, সঙ্গে বৃষ্টিও অজস্র ধারায়। ব্যস্ত-উদ্বিগ্ন বাড়িমুখো দুই চারিজন পথিক আসিয়া পড়িল মোটরের সম্মুখে,—বাধ্য হইল উদয় ব্রেক কষিতে। অকস্মাৎ এক ঝলক বিজলী বিকাশের মত পথের উপর দেখা গেল

কেতকীকে। ব্যস্ত-ব্যাকুল হইয়া মুখ বাড়াইয়া কহিল উদয়—আপত্তি না থাকে তো আসুন মিস্ মিত্র, পৌঁছে দিচ্ছি আপনার ঠিকানায়।

চমকিয়া কেতকী চাহিল উদয়ের পানে—হঠাৎ যেন চিনিতে পারিল না। পর মুহূর্ত্তেই মৃদু হাসিয়া ধন্যবাদ জানাইয়া কহিল—দরকার নেই—ওই তো কাছেই মিনিট পাঁচেকের পথ। উঃ এই দুর্য্যোগের মধ্যে বেড়িয়েছেন মোটর নিয়ে, খুব কাজ বুঝি!

—নাঃ, আমার মত লোকের আবার কাজ! সময় কাটে না তাই—কাজ থাকলে তো রক্ষা পেতাম। কিন্তু আপনি একেবারে নেয়ে উঠেছেন মিস্ মিত্র,—উঠে আসুন গাড়ীতে শিলা-বৃষ্টি সুরু হয়েছে যে! এইবার কেতকী গাড়ীতে উঠিয়া বসে. পরিধেয় শাড়ী ভিজিয়া একেবারে জবজবে।

শাড়ীর আঁচলটা ভাল করিয়া নিঙড়াইয়া—কেতকী কহিল—আপনি অলস সময় কাটেনা বলে বেড়িয়েছেন—আর আমাকে দেখুন কাজের তাড়ায়—এ দুর্য্যোগ আসবে জেনেও বেরুতে হয়েছিল—শেষকালে কিছুতেই আর পাবা গেলনা ফিরতেই হল।

ষ্টিয়ারিং হুইল ঘুরাইয়া উদয় কহিল—আবার বুঝি বেরুচ্ছিলেন চাঁদার জন্যে—

হাসিয়া কেতকী কহিল—চাঁদা ছাড়া কি আর কোন কাজ থাকতে পারে না! অসহিষ্ণু হইয়া উঠে উদয়—। একটু ঝাঁজের সঙ্গেই কহিল—আচ্ছা এই যে আপনি এত ছুটোছুটি করে মরছেন,—কী হবে—কতটুকু—

—এই যে রাখুন—রাখুন—।

উদয় গাড়ী থামাইয়া দরজা খুলিয়া দিল। কেতকী নামিয়া দাঁড়াইল,—মুগ্ধ চোখে উদয় চাহিয়া দেখিল—এ যেন শ্রাবণ ধারায় প্রস্ফুটিত—সদ্য-বিকশিত কেতকী কুসুম।—একটা নিঃশ্বাস চাপিয়া ও কহিল—আমাদের বাড়ির এত কাছে আছেন—এতদিন বৌদির মুখেও শুনিনি—

—আমি দিন দশ বারো হল এখানে এসেছি। আপনাদের বাড়ি আরও যে দু' একবার গেছি—সে ভবানীপুরের ওদিক থেকে—। কেতকী কড়া নাড়িতেই একটি হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক আসিয়া সদর দরজা খুলিয়া দিল। উদয় গাড়ীতে ষ্টার্ট দিতে অগ্রসর হইল।

—আসবেন একটু আমার বাড়ি? কাজ নেই বলে দুঃখ করছিলেন দেখা যাবে পরখ করে সত্যিই আপনাকে কাজে লাগানো যেতে পারে কিনা।

এমন সময় কিছু দূরেই আর একখানা মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। কেতকী মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া দেখিল, তারপর উদয়ের একটু কাছে আগাইয়া কহিল—অতিথি এসেছে,—কিছু মনে করবেন না, আগামী কাল বিকেল পাঁচটায় আপনার অপেক্ষায় থাকবো—আসবেন তো?

উদয় গম্ভীরমুখে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

* * * পুলিশভীতির চেয়েও আজ উদয়ের মনে পিতার ভয়টাই বড় করিয়া দেখা দিয়াছে। কেতকী নানাস্থানে বেড়াইতেছে বক্তৃতা দিয়া—গোপনে নয়, জনসভায়—প্রকাশ্য

দিবালোকে। পুলিশের নজর তাকে ভাল করিয়াই পাহারা দেয় এবং উদয়ের কেতকীর বাড়ি ঘনঘন গতায়াত—সে বিষয়ে পুলিশ নিশ্চয়ই চোখ বুজিয়া নাই,—আর নাই বলিয়াই তো যত চিন্তা...পিতার দেওয়া শাস্তি শুধু চোখ রাঙানিতেই ক্ষান্ত হইবেনা, উদয় ইহা নিশ্চিত জানে।

কিন্তু উদয় আজ বেপরোয়া। জীবন পণ করিয়াছে সে মনে মনে, জয় করিবে সে দুর্লভ কেতকী মিত্রকে। আজ চায়ের টেবিলে বসিয়া উদয়কে সে যত বড় আদর্শের কথাই শোনাক,—উদয়ের বিশ্বাস তার আত্মনিবেদনের পুরস্কার কেতকী একদিন না দিয়া পারিবে না। আজ দেড়মাস যাবং উদয় না করিতেছে কি! যে উদয় এতকাল লিখিয়াছে প্রেমের চুটকী কবিতা,—ফুল, চাঁদ আর পাখীর গান নিয়া যাহার কল্পনা উৎসারিত হইয়াছে,—কেতকীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কবিতায় আনিয়াছে সে নূতন সুর। কেতকী যখন উজ্জ্বল সুন্দর মুখখানি তুলিয়া চাহে কবির পানে, দীপ্ত কণ্ঠে যখন কহে—এই তো চাই। এতদিন বৃথা সময় নষ্ট করেছেন। এতকাল মাসিকে, সাপ্তাহিকে যে ভাবধারা পরিবেশন করেছেন,—কী পেয়েছে দেশের লোক তার থেকে—কিছুই না, বরং অনেকের মাথায় দুর্ব্বল চিন্তা বাসা বাঁধবার পেয়েছে পথ। জানেন তো জাতীয় কবিতা, গান, সাহিত্য যে জাগরণ আনে দেশের বুকে, শত শত বক্তৃতায় তার অর্দ্ধেক কাজও হয় না।

সার্থক আনন্দে উদয়ের বুক ভরিয়া উঠে। পূর্ব্বের কবিতাগুলিকে নিয়া বন্ধুদের সেই বাহবা...আজ ভাবিতে কেমন যেন লজ্জা আসে। আজ ও জয় করিতে চলিয়াছে—নিজকে সর্ব্বপ্রকার অভিযানের উপযোগী করিয়া তুলিতে চায় ও।

এক সন্ধ্যায় কেতকী তার ঝিয়ের মারফত ডাকিয়া পাঠাইল উদয়কে। বন্ধু কুমুদ আর অজিত তখন গুলজার হইয়া বসিয়াছে উদয়ের ঘরে। নিতাইচরণ চা দিতে আসিয়া একটুকরা চিঠি দিয়া গেল উদয়ের হাতে। মুহূর্ত্তকাল চিঠির পানে চাহিয়া টুকড়া টুকড়া করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া গম্ভীরমুখে কহিল উদয়—নাঃ বরাতে সুখ না থাকলে এমনই হয়। দিন পনেরো বাদে সারা ছুটিটা খালি হাওড়া ঘুরে মরছি। টাইফয়েড কেস—

—লিখেছে কি? আবার যাচ্ছিস্ বুঝি! কুমুদ চায়ের পেয়ালা হইতে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করে।

বাইরের পানে উদাস দৃষ্টি মেলিয়া জবাব দিল উদয়—তা ছাড়া আর কি!

অধৈর্য্য হইয়া অজিত কহিল—আঃ—কী যে এক ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে বসেছিস্, নাঃ—উঠ্‌তেই হচ্চে আমাদের।

চা খাইয়া দুই বন্ধু বিদায় হইয়া গেল।

উদয় ভিতর বাড়িতে গিয়া কেতকীর ঝিকে কহিল—তুমি যাও, আমি যাচ্ছি মিনিট দশেকের মধ্যেই। শিস্ দিতে দিতে উদয় দোতলায় উঠিয়া গেল।

কেতকীর বাড়ি পৌঁছিয়াই প্রতীক্ষমানা কেতকীর আশায় উদয় বারান্দার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখা গেল আধ-আলো-অন্ধকারে কেতকীদের সার্ব্বজনীন 'দাদামশাই' একটা লম্বা আরাম কেদারায় স্থূল দেহ বিস্তার করিয়া গড়গড়ায় তামাক টানিতেছেন। উদয়ের পদশব্দে প্রৌঢ় প্রশ্ন করিলেন—চারুশীলা এরই মধ্যে ফিরে এলে ?

—আমি উদয়—

—ওঃ তাই তো! কেতকী তার ঘরেই আছে, ওই তো আলো দেখা যাচ্ছে—যাও। উদয় গিয়া প্রবেশ করিল কেতকীর ঘরে। একখানা চিঠি পড়িতেছিল কেতকী ; পড়া শেষ হইতে কহিল—বড় বিপন্ন হয়ে পড়েছি উদয়বাবু, সে জন্যেই আপনাকে ডাকা—।

উদ্বিগ্ন মুখে কহিল উদয়—পুলিশের ব্যাপার ট্যাপার নয় তো ?

কেতকী প্রতিবাদ করিয়া হাসিতে থাকে। প্রথম পরিচয়ের দিনটি হইতে এ ধারার হাসি কেতকীর মুখে উদয় বহুবার দেখিয়াছে। আশ্চর্য্য হইয়া ও ভাবিয়াছে কতদিন—কেমন করিয়া প্রাণের কোন্ গহন তলে আনন্দের কল্পতরু জীয়াইয়া রাখিয়াছে এ মেয়েটি। আনন্দের উজ্জ্বল শ্রীটুকু সারামুখে লাগিয়াই আছে—এমন অমূল্য সম্পদ কেমন করিয়া সঞ্চয় করিল কেতকী !

উষ্ণ হইয়া কহিল উদয়—আপনি এ ভাবে হাসবেন না বলছি। কী ব্যাপার—কতটুকু সাহায্য আমাকে দিয়ে হতে পারে—

কেতকী টেবিলের ড্রয়ার টানিয়া একরাশ কাগজপত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে গম্ভীরমুখে বলে—আচ্ছা ধরুন, আজ রাতেই যদি আমাকে কলকাতা ছেড়ে যেতে হয়—আর কিছু জরুরী কাগজপত্র নিরাপদ করবার জন্য আপনার কাছে দিয়ে যাই...পুলিশ সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।—

উদয় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। ক্ষণকাল সে কথা কহিতে পারিল না। মনের মধ্যে একটা যুক্তিই তীব্র হইয়া উঠিল—কেতকীকে রক্ষা করা চাই, সে যেমন করিয়াই হোক্। ও যে কোনদিন কল্পনাও করে নাই—কেতকী মিত্র সাহায্য প্রার্থিনী হইবে ওরই কাছে!

আবেগ-চঞ্চলকণ্ঠে কহিল উদয়—আমি প্রস্তুত, আপনার জন্য যে কোন দায়িত্ব...কিন্তু আবার কবে আপনি ফিরে আসবেন—কবে আপনাকে দেখবো ?

চমকিয়া কেতকী গভীর দৃষ্টিপাত করে উদয়ের মুখের উপর। তারপর ধীর শান্তকণ্ঠে কহিল—আমার ফিরে আসা না আসা নিয়ে তো প্রশ্ন নয়,—ফিরে আসতেই হবে তার কোন মানে নেই—না-ও আসতে পারি আবার এমন হতে পারে আসতেও পারি।

দুশ্চিন্তায় উদয়ের উৎকণ্ঠা বাড়িয়া যায়, অধীরকণ্ঠে ও বলে—সেকি—জীবনটার কি কোন মানেই নেই আপনার কাছে ?

কেতকীর ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা। সহজকণ্ঠে ও কহিল—মানে? এই তো জীবনের মানে। কিন্তু আপনি এত অধীর হয়ে উঠ্‌লেন কেন উদয়বাবু। জীবনে এ একটা ঘটনা বৈ আর কিছু নয়।

—আপনার কাছে হতে পারে একটা ঘটনা মাত্র...কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি কোন দিন—একটা মাত্র উদ্দেশ্যকেই জীবনের পরম ধন জ্ঞান করে ছুটে চলাটাই বড়ো কথা নয়। মানুষের কাছে আপনাদের বাহবা থাকতে পারে, কিন্তু অন্তরকে মস্ত বড়ো ফাঁকি দিয়েছেন আপনারা।

মুহূর্ত্তকালের জন্য কেতকীর মুখ রাঙা হইয়া উঠে। পরক্ষণেই সে জবাবে কহিল—সকলের মত ও পথ এক নয়। অন্তরকে ফাঁকি দিচ্ছি কি ভরিয়ে তুলছি—সে ভাবনা কোনদিন ছিল না—আজও নেই। সে যাক্—এখন কথা হচ্চে যে ভারটুকু আপনাকে দিতে চাইছিলাম—

—আপনার জন্যে আমি সব পারি, উদয় গাঢ়স্বরে কহিল।

—আমার জন্যে? কেবলমাত্র আমারই জন্যে! কিন্তু কাজের মধ্যে দিয়েই যে আমার অস্তিত্ব উদয়বাবু। কাজকে বাদ দিলে কেতকী মিত্র বলে কিছু থাকে না।

কাজের মধ্য দিয়ে তো দেখিনি আপনাকে কোনদিন। আমার জগতে কেতকী ছাড়া আজ কেউ নেই—সে ভালো কি মন্দ জানিনে।

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে উদয়ের পানে চাহিয়া মিনতি করিয়া কেতকী কহিল—আমি আপনাকে অনুরোধ করছি উদয়বাবু, আমার কাজের সঙ্গেই থাক্ আপনার পরিচয়—আপনি নেমে আসুন সকলের মাঝে। বৃহত্তর জগতের সঙ্গে হোক আপনার পরিচয়—তখন দেখবেন সেই বৃহত্তর জগতে কত নগন্য এই কেতকী মিত্র।

উদয় কহিল—অনেক বড়ো বড়ো কথা জানেন আপনি। কিন্তু সে বড়োর মধ্যে নিজকে সঁপে দেওয়ার্ ক্ষমতা সত্যিই আমার নেই। আজ যে কাজের জন্য আপনি অনায়াসে জীবন পণ করছেন—সে রকম তীব্র অন্ধ আকুলতায় আমিও আজ পারি নিজের জীবনটাকে ঢেলে দিতে কিন্তু তাতে দশের বাহবা থাকবেনা—কারণ সে শুধু আমার ব্যক্তিগত ভালোবাসা আপনাকে কেন্দ্র করে।

হঠাৎ কেতকী জবাব দিতে পারে না। স্তব্ধ হইয়া টেবিলের উপরকার কাগজপত্রগুলা অনাবশ্যক ভাঁজ করিতে থাকে। তারপর হঠাৎ এক সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উদয়ের পানে চাহিয়া কহিল—আপনার ভালোবাসা কেবলমাত্র আমার এ দেহটাকে কেন্দ্র করেই! আপনার কাছে এর চেয়ে আর কী-ই বা আশা করতে পারি! অতি আরামে বিজলী আলোর নীচে বসে এতকাল তো শুধু মেয়েদের রূপ যৌবন নিয়ে কবিতার শ্রাদ্ধ করেছেন—নূতন আবহাওয়া সইবে কেন!

আহতস্বরে উদয় কহিল—দেহের উপর ভালোবাসা? হাঁ তা সত্যি কথা; দেহকে বাদ দিয়ে ভালোবাসা চলে না। একটা স্বরূপ চাই,—দেখেন না ভক্তরা ভগবানের মূর্ত্তি বানিয়ে সাধন পথে অগ্রসর হয়!

আশ্চর্য্য বিস্ময়ে কেতকী চমকিয়া উদয়ের পানে চাহিয়া দেখে—দুই চোখ তার অশ্রু ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

গভীর সহানুভূতির সহিত ধীরে ধীরে কেতকী কহিল—আপনার আদর্শ তা যেমনই হোক্—তার অবমাননা আমি করবো না। কিন্তু আপনি তো জানেন উদয়বাবু আগুনের লেলিহান শিখা দূর থেকে ভয়ঙ্কর সুন্দর দেখায়, কিন্তু কাছে গেলে পুড়ে মরতে হয়। মানুষের জীবনের চরম কথা মৃত্যু। সে মৃত্যুরও একটা সার্থকতা থাকা চাই। তারপর আরেকটা কথা কি জানেন উদয়বাবু—যে পথে আমি চলেছি—সে পথ যত দুর্গম ভয়সঙ্কুলই মনে হোক আপনাদের কাছে,—সে পথের শেষ যে কত আনন্দ মধুর, মানুষের বুকের রক্ত নিঙড়ানো পরম ধন—আঃ—পৌছানোর পথটাও যে তীব্র নেশার মত আকর্ষণ করে টানতে থাকে। এ বুঝানো যায় না—এ বাইরের ডাক উদয়বাবু, আমি সে বাইরের ডাকে বেড়িয়ে পড়েছি—

খোলা বাতায়ন পথে দেখা যায় একটু কড়া বিবর্ণ আকাশ দুই চারিটি নক্ষত্র লইয়া স্তব্ধ হইয়া আছে। কেতকীর কথা থামিয়া গেল। নিঃশব্দতার মধ্য দিয়া মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত চলিল। বাতায়নের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া কি একটা কথা বলিতে উদয় চাহিল কেতকীর মুখ পানে। আজ এ মুখ সম্পূর্ণ নূতন, এ মুখের সঙ্গে উদয়ের পরিচয় নাই। মানুষের মুখে যে বেদনার ছবি এমন জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে উদয়ের দেখা ছিল না। শ্বেতপাথরে খোদাই করা যেন কেতকীর মুখ, টানা চোখের আনত পল্লবে আত্মসমাহিত ভাব, সমস্ত দেহ ঘেরিয়া একটা সংসার-ছাড়া বিবাগী রেখা—। উদয় কথা হারাইয়া ফেলিল, মূঢ়ের মত কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া, নীরবে নিঃশব্দে কেতকীর উদ্দেশে নমস্কার করিয়া ধীরে কক্ষ ছাড়িয়া গেল।

পথে নামিয়া উদয় ট্যাক্সি ধরিল। মাইল মাইল অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ঘোরার পর ড্রাইভার সন্দেহাকুল হইয়া গাড়ী থামাইয়া উদয়কে তার বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে। 'তাইতো অনেক রাত হয়ে গেছে'—বলিয়া উদয় নিজ বাড়ির ঠিকানায় নামিয়া গাড়ী বিদায় দেয়। মাথার মধ্যে এতক্ষণ যেন কিছু ছিল না—এমন চিন্তাশূন্য হইয়া এতক্ষণ কিসের ঝোঁকে ঘুরিয়া মরিল ও! আশ্চর্য্য—ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া উঠিল উদয়। আজ সন্ধ্যা রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিতেছিল ও—ওঃ সে তো স্বপ্ন নয়—স্বপ্ন নয়, সত্য—চরম সত্যের পথ নির্দ্দেশের কথা বলিয়াছে কেতকী। তাকে যে রক্ষা করিতে হইবে...কোথায় সে কাগজ পত্র—উদয় যে একেবারে শূন্য হাতে বাড়ি আসিয়াছে! ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখে রাত এগারটা। ও বাহির হইয়া পড়িল কেতকীর ঠিকানায়।

ডাকাডাকিতে 'দাদামশাই' আসিয়া উদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করিলেন। উদয় কহিল—আমার অনেক কাজ, ডেকে দিন একটু কেতকীকে।

বিস্মিত হইয়া দাদামশাই কহিলেন—সেকি সন্ধ্যা বেলায় তো তুমি আমাদের এখানেই! সে যে যাবে—তাকি জানতে না? সে চলে গেছে নটার গাড়ীতে।

—চলে গেল—এর মধ্যে! এত শীগ্‌গির! বেদনা-বিস্ময়ে উদয়ের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল কষ্টে সামলাইয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে দাদামশাইকে জিজ্ঞাসা করিল....তাঁর ঠিকানাটা...আমার কাজ যে রয়ে গেল অসমাপ্ত।

প্রশান্ত, মৃদু হাসি দাদামশাইর মুখে, সহজকণ্ঠেই তিনি কহিলেন—তাঁর ঠিকানা! সে ইচ্ছে করে না জানালে—কেমন করে বলবো সে কথা!

স্খলিত পদে উদয় আবার আসিয়া পথে দাঁড়াইল,—এবার আর গাড়ী নয়, পায়ে হাঁটিয়া সে পথ চলা সুরু করিল।

প্রতীক্ষা

অরুণা সিংহ

কি জানি কে মোরে ক'য়েছিলো দ্বারে
অপেখিতে তব লাগি'
উতলা হৃদয়ে তাই বহুদিন,
ছিনু বাতায়নে জাগি' ;
জাগিয়াছিলাম, মধু ও মাধবে,
শ্রাবণ প্লাবনে শারদোৎসবে,
চিত্ত কমল উঠেছে বিকশি'
নিত্য দরশ মাগি'
নিভৃত দ্বারে, বাতায়ন পথে,
ছিনু বিনিদ্র জাগি ।

নিভৃতে অতিথি ক্লান্ত চরণে,
দুয়ারে দাঁড়ালে থামি,
শ্রান্ত নয়ন ধুলিম্লান কেশ,
ক্ষণিক শান্তিকামী,
আনো নি সুরভি রজনীগন্ধা,
মধুর গীতির অলকানন্দা,
এনেছো প্রলয় বেদনা তিমির
ব্যর্থতা পথগামী,
উৎসবহীন অমারাত্রিতে,
নীরবে দাঁড়ালে থামি ।

তবু দূরশ্রুত-রাগিণীর রেশ,
হিয়ায় স্পন্দমান,
জীবনেশ্বর আনি' দিলে যেন,
জীবনের সমাধান।
সেদিনের সেই উদার আকাশ,
স্তব্ধ প্রহর অসহ উদাস,
আজও ক্ষণে ক্ষণে আমার হিয়ায়
করিতেছে অভিযান,
অশ্রুতরাগিনী, জীবনবীণায়—
আজিও স্পন্দমান।

অনাদি পথের নাহি অবসান,
আঁখি প্রতীক্ষারত,
কখন হেরিব তোমার উদয়
সন্ধ্যাতারার মত ?
শিশির সিক্ত হৃদিউৎপল,
তব তরে বহে পূজা অবিচল,
আঁধার রাতের শেষ মূর্চ্ছনা,
জীবনে তন্দ্রাহত,
অনাদি পথের নাহি অবসান,
রহি প্রতীক্ষারত !

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে পতিতা*

নিমেষ রায়

দৃশ্য জগতের বাস্তব আবরণের আড়ালে স্তরে স্তরে যে নিঃশব্দবাহী বেদনার স্রোত নিয়ত তরঙ্গিত হচ্ছে—প্রকাশভীরু উচ্ছ্বসিত যে বেদনা মানুষের নিত্য অনুভূতির গোচর হয়েও অজ্ঞাত অথবা অবজ্ঞাত হয়ে ফিরে যায়—সেই অব্যক্ত বেদনাকে কল্লোলিত করে তার প্লাবনবন্যায় শরৎচন্দ্র সাহিত্যের ক্ষেত্র ভাসিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্টির কল্পনা ব্যাপক ও গভীর—তাই যেখানে যা কিছু অন্যায় ও কুরূপের অপবাদে লাঞ্ছিত হয়ে পড়েছিলো তাই তিনি তাঁর অমৃতস্পর্শে মহিমান্বিত করে তুলেছেন। সাহিত্যধর্ম ও মানবধর্মকে তিনি তাঁর প্রশস্ত দৃষ্টিতে পৃথক্ করে দেখেন নি—তাই তাঁর সৃজনপ্রতিভায় মূক মুখর হয়েছে—অশ্লীল অস্পৃশ্য গরীয়ান হয়েছে। আমাদের দেশ যখন নারীকে তার প্রাপ্যসম্মান দিতে শেখেনি তখন তিনি করেছেন নারীকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখবার ও বোঝবার প্রয়াস।

শরৎ প্রতিভার দান শুধু কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী নয়। সাহিত্যের রুদ্ধ আগল ভেঙ্গে বাণীমন্দিরে অস্পৃশ্যা পতিতাশ্রেণীকে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন তিনিই প্রথম। যেখানে আমরা শুধু আয়েষা ও ভ্রমরকে পেতাম—সেখানে চন্দ্রমুখী ও পিয়ারী বাইজীকে এনে দিয়েছেন। সাহিত্যের দরবারে তাদের আবির্ভাব এই প্রথম হলেও ভাববিলাসীর কল্পনায় তাদের জন্ম নয়। দৈনন্দিন বিক্ষোভ ও দ্বন্দ্ব, শতসহস্র ত্রুটী বিচ্যুতির মধ্য দিয়ে যে স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণতি তাকেই শরৎচন্দ্র ছন্দে বর্ণে রূপায়িত করেছেন। সেখানে মোক্ষদা ও কামিনী বৈষ্ণবী যে সাজসজ্জায় দেখা দিয়েছে—সে বেশেই চন্দ্রমুখী, বিজলী ও পিয়ারী বাইজীর সাথে আমাদের প্রথম পরিচয়।

সত্যেন্দ্র যখন বারজীবিনী বিজলীর ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করে চলে আসে তখন বিজলী বলেছিলো—"সকলের দেহতেই ভগবান বাস করেন এবং আমরণ দেহটা তিনি ছেড়ে চলে যান না। সব মন্দিরেই দেবতার পুজা হয় না বটে, তবুও তিনি দেবতা, তাঁকে দেখে মাথা নোয়াতে না পার, কিন্তু তাঁকে মাড়িয়েও যেতে পার না।" ইন্দ্রিয় সেবার বিল্বদল পেষণ নারীত্বকে আচ্ছন্ন করে রাখে মাত্র—একদিন সহসা ভূকম্পনে সে গুরুভার ভেঙ্গে গেলে প্রেমের দেবতা তার বহুকালের সুপ্তি ঝেড়ে জেগে ওঠেন। তখন দেখা যায় আয়তনের মালিন্য বিগ্রহকে স্পর্শ করেনি বরং সে বিগ্রহের স্পর্শ থেকে গোটা মন্দির সোনা হয়ে গেছে।

---

* এ আলোচনায় 'শ্রীকান্ত—চতুর্থ পর্ব্ব' আমি বাদ দিয়েছি। কারণ, তৃতীয় পর্ব্বের পর পট আর না তুললেই যেন ভালো হতো বলে মনে হয়।—লেখক

প্রেমের অক্ষত স্বরূপে তার পরিচয়—সতীর বুকে বা পতিতার বুকে যেখানে সে বাসা বাঁধুক তার মর্য্যাদা তাতে তিলমাত্র ক্ষুন্ন হয় না। পাত্র দিয়ে আধেয়র বিচার চলে না। শিল্পরসের দিক দিয়ে শরৎচন্দ্রের পতিতা চরিত্রের ইঙ্গিত। এই ভালবাসার ছাড়পত্র নিয়ে পতিতা সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করেছে।

পুরুষ যেখানে দুর্বল—সে তার সম্ভ্রম। নারীর জন্যে সে সব দিতে পারে—সম্ভ্রম দিতে পারে না। দেবদাসের মত অসংযমীও তা পারে নি। আর নারী সেই সম্ভ্রমই সবার আগে পুরুষের হাতে তুলে দেয়। প্রেমের পরীক্ষায় জয়ী হয়েও সে সমাজের নিম্নতম স্তরে নেমে যায়।

শরৎসাহিত্যে যে কয়টী নারী অগ্নিশুদ্ধ হয়ে তাদের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছে তাদের টাইপ হিসেবে রাজলক্ষ্মী ও সাবিত্রীকে ধরা যেতে পারে। অতীত কলঙ্কের গ্লানি আর প্রেমের দুর্জয় অভিমান উভয়ের সংঘাতের মধ্যে তারা সার্থকতা খুঁজলো ত্যাগে, বৈরাগ্যে। সাবিত্রীকে সতীশ যখন বিয়ে করতে চায় সে বলেছিলো—"এই দেহ দিয়ে যে আমি ইচ্ছে করে অনেকের মন ভুলিয়েছি, এ ত' আমি কোন মতেই ভুলতে পারব না। এ দিয়ে আর যারই সেবা চলুক, তোমার পূজো ত' কিছুতেই হতে পারে না। ওগো এত ভাল যদি না বাসতুম, হয় ত' এমন ক'রে তোমাকে আজ আমায় ছেড়ে যেতে হ'ত না।" সমস্ত জ্বালা ও বেদনা বুকে ধ'রে সতীশকে সে নিষ্ঠুর কল্যাণচেষ্টায় রক্ষা করেছে—তার তৃষ্ণাই শুধু মন্ত্রাহত সর্পের মতো অভিভূত হয়ে যায় নি, তার প্রেমও মিলনের মধ্যে পরিণতি খুঁজলো না। এমন না হ'লে তাকে ফিরে পাওয়ার কোন উপায়ই আমাদের ছিলো না। সাবিত্রী যে তার যৌবনের প্রলোভন ও রক্তের কামনাকেই প্রাণপণ শক্তিতে জয় করে নি, তার এক মুহূর্তের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রেমের সহজ অধিকার থেকেও নিজেকে বঞ্চিত করেছিলো—এই ছিল ধর্মবীর উপেন্দ্রের বোন হবার পক্ষে তার একমাত্র যোগ্যতা। সতীশের রোগশয্যার পাশে এসে উপেন্দ্র তাকে বলেছিলো—"আমাকে আসতে ব'লে নিজের সুখদুঃখ, ভালমন্দ যে আপনি কতখানি তুচ্ছ করেছিলেন, মনে করবেন না সে আমি বুঝি নি। এই ত' চাই, এই ত' নিজের পরিচয়।" এই পরিচয়টুকু না দিলে সাবিত্রীর আসন অন্যত্র হতো।

জীবনে একবার ভুল করার ব্যথা, তার জ্বালাতপ্ত স্মৃতি এই একটা পথই দেখিয়ে দিলো রাজলক্ষ্মী আর সাবিত্রীকে—নারীর সহবাস কামনা, নারীর মাতৃত্বপিপাসা সব নিঃশেষে উৎসর্গ করে তারা সন্ন্যাসিনী হলো—তাই তারা আমাদের কাছে শ্রীমন্ত, সুষমান্বিত।

মানুষের বাহ্য রূপটা দেখে তাকে ভালমন্দ ন্যায় অন্যায় প্রভৃতি কতগুলি বাঁধা ধরা বিশেষণে অভিহিত করে আমরা এক কথায় তার রায় দিয়ে দিই—তার অন্তরের খোঁজ নেওয়ার মনোবৃত্তি আমাদের নেই। তাই তথাকথিত পতিতাকে নিয়ে যেখানে আলোচনা—সেখানে পার্বতীকে আমাদের বাদ দিয়ে যেতে হবে। পার্বতী দেবদাসকে ভালবাসতো। গভীর রাতে গৃহত্যাগ করে কুমারী পার্বতী তরুণ দেবদাসকে নিভৃতে প্রেম নিবেদন করেছিলো—সেদিন অন্যের চোখে

পড়লে সে হয়ত সাবিত্রীর মতোই কুলভ্রষ্টা হতো। আর পার্বতীর যে রূপটী আমাদের প্রাণ সবচেয়ে নিবিড় করে স্পর্শ করে—সে তার বিচ্ছেদ-বরণ নয়, তার অনাসক্ত স্বামীধর্মপালনও নয়—সে তার কৈশোরের জাগ্রত স্মৃতি। সে পুরনারী একথা মুহূর্ত্তে ভুলে গিয়ে সে যে উদ্‌ভ্রান্তের মতো তার হতভাগ্য দেবদা'র দেহাবশেষ দেখতে ছুটে গিয়েছিলো—তাতে সে সতীধর্মের পরিচয় দেয় নি—কিন্তু এই অসতীত্বটুকু না থাকলে আজ পার্বতী কোন অন্ধকারে তলিয়ে যেতো ?

এদের চেয়ে বিচিত্র রচনা কিরন্ময়ী। তার পতন সাবিত্রীর উত্থানের contrast। সাবিত্রীর বুকে সঞ্চিত অশ্রুর জলঘন মেঘ আপনার ভারে ভেঙ্গে পড়লো—বেদনার স্নিগ্ধ ধারাপাতে তাকে শুচিস্নাত করে দিলো। বর্ষণান্তে সে দেখা দিলো ধৌত, পূত হয়ে, সৃষ্টির শ্যামল সুষমায় সমৃদ্ধ হয়ে। আর কিরন্ময়ী এলো কোন মরুর বুকজোড়া তৃষ্ণা নিয়ে! পথভ্রান্ত মরুচারীর মত তার আর্ত মিনতি এক ফোঁটা জলের জন্যে আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে খুঁজে ফিরলো—আর সে মরণ-জ্বালায় তার চরিত্রের সমস্ত ঐশ্বর্য—বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, তেজ—সব পুড়ে ছাই হয়ে গেলো।

কিরন্ময়ী হীনচরিত্রের রমণী নয়—সে দুর্বলচিত্তও নয়, উচ্ছৃঙ্খলও নয়। উপেন্দ্র নিজেও বুঝেছিলো—কিরন্ময়ী সেই প্রকৃতির রমণী যার কাছে পুরুষের অভ্রভেদী শির আপনি নুয়ে পড়ে। যেদিন সদ্যবিধবার বেশে সে প্রাপ্তযৌবন দিবাকরকে নিজের বাসায় রাখতে চেয়েছিলো—সেদিনের সে দাবীও উপেন্দ্রের কাছে স্পর্দ্ধা বা দুঃসাহস বলে মনে হয় নি। তবে তার এ দুর্দশা হলো কেন ?

স্বামীর ঔদাসীন্য ও শাশুরীর স্বার্থপরতার মধ্যে বিশ্বের একান্ত অজ্ঞাতে কিরণময়ীর রূপযৌবন পাত্র ছেপে উঠেছে—আর তার সঙ্গে ফেনায়িত হয়েছে অতৃপ্ত প্রেমলিপ্সা। শুধু ভালবেসে সুখী হবার মতো ধাতুতে সে গঠিত নয়—ভালবাসা ফিরে পাবার পিপাসাও তার সমান প্রবল। তাই তার উপেক্ষিত প্রেম তাকে পাঁকের ভিতর টেনে নামালো।

কিরন্ময়ী উপেন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলো—"ভালবাসা সত্যই কি অন্ধ ?" উপেন্দ্র বলেছিলো—সত্য বই কি! কিরন্ময়ী আবার জিজ্ঞাসা করে—"তা যদি হয়, কানা খানায় পড়লে লোকে ছুটে এসে তাকে তুলে দেয়, তার জন্য দুঃখ করে, যার যেমন সাধ্য তার ভালর চেষ্টা করে। কিন্তু ভালবাসায় অন্ধ হয়ে সে যখন গর্ত্তে পড়ে, কেউ ত তুলে ধরতে ছুটে আসে না, বরং আরও তার হাত-পা ভেঙ্গে দিয়ে সেই গর্ত্তের মাটী চাপা দিতে চায়। যে সত্য মানুষ নিজেই প্রচার করে, প্রয়োজনের সময় সে সত্যের কোন মর্য্যাদাই রাখে না।" এ অভিযোগের যাথার্থ প্রমাণ করেছিলো উপেন্দ্র নিজে—যেদিন কিরন্ময়ীর সহিষ্ণুতার শেষ বাঁধটুকু সে কঠোর আঘাতে ভেঙ্গে দিয়ে গেলো।

'চরিত্রহীনে'র এই প্রশ্নটাই কানে বাজতে থাকে—"কে দায়ী ?" ভালবাসার দাম যতো বেশীই হোক, প্রতিদানে তার কোন বিধিবদ্ধ দাবী নেই। কিন্তু অভিমানী প্রেম যদি অপমান বা অবজ্ঞা না সইতে পারে তাতেই বা কি বলবার আছে ?

ব্যর্থ ভালবাসার এই পঙ্কিল পরিণতি ছাড়াও কিরণময়ীর চরিত্রের আর একটা রূপ আছে। সে বিদ্রোহিনীর রূপ। শাণিত ইস্পাতের মতো তার খরোজ্জ্বল বিচারবুদ্ধি; বিদ্যুতের মতো খরদীপ্ত তার সাহস। তার মন থেকে সমস্ত সংস্কার, জ্ঞান ও স্বাধীন চিন্তার অবলেপনে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তার সত্তা সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, চন্দ্রমুখীর চেয়ে অনেক গভীর, অনেক জটিল। তার বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির ঘাত প্রতিঘাত অনেক বেশী তাই তার পথ অতটা সরল হয়ে ওঠে নি। শরৎচন্দ্রের নারীজগতে সে যেন একটা কক্ষভ্রষ্ট জ্যোতিষ্ক। এত বড়ো সজীব সতেজ মনের পতন মর্মান্তিক গরিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—সুরবালার অবোধ বিশ্বাসপরায়ণতার পাশে চিত্রিত হয়ে।

কিরণময়ী একদিন দিবাকরকে বলেছিলো—"যা সত্য তাকেই সকল সময় সকল অবস্থায় গ্রহণ করতে চেষ্টা করবে—তাতে বেদই মিথ্যা হোক আর শাস্ত্রই মিথ্যা হয়ে যাক্। সত্যের চেয়ে এরা বড় নয়, সত্যের তুলনায় এদের কোন মূল্য নেই। জিদের বলে হোক, সুদীর্ঘ দিনের সংস্কারে হোক চোখ বুজে অসত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করায় কিছুমাত্র পৌরুষ নেই।"

এমনি ধরণের কথা এর চেয়েও স্পষ্ট করে একদিন শুনেছি অভয়ার মুখে—"সংসারে সব নারীই এক ছাঁচে তৈরী নয়, তাদের স্বার্থক হবার পথও জীবনে শুধু একটা নয়। তাদের শিক্ষা, তাদের প্রবৃত্তি, তাদের মনের গতি কেবল একটা দিক দিয়েই চালিয়ে তাদের সফল করা যায় না।...একটা রাত্রির বিবাহ অনুষ্ঠান যা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কাছেই স্বপ্নের মতো মিথ্যা হয়ে গেছে, তাহাই জোর করে সারাজীবন সত্য বলে খাড়া রাখবার জন্যে এই এতবড় ভালবাসাটা একেবারে ব্যর্থ করে দেব? যে বিধাতা ভালবাসা দিয়েছেন—তিনি কি তাতেই সুখী হবেন?...আমাদের নিষ্পাপ ভালবাসার সন্তানেরা মানুষ হিসাবে জগতে কারো চেয়ে ছোট হবে না...তাদের দিয়ে যাবার মত জিনিষ তাদের বাপ-মায়ের হয়ত' কিছুই থাকবে না; কিন্তু তাদের মা তাদের এই বিশ্বাসটুকু দিয়ে যাবে যে তারা সত্যের মধ্যে জন্মেছে, সত্যের বড় সম্বল সংসারে আর তাদের কিছু নেই, এ বস্তু থেকে ভ্রষ্ট হওয়া তাদের কিছুতে চলবে না। তা হ'লে তারা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর হয়ে যাবে।"

প্রেমকে এক সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বন্দী করে রাখবার যে অন্ধ সংস্কার তার আরও গোড়ায় ঘা দিয়ে কমলও এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছে—"কেবলমাত্র বিশ্বাসের জোরে কোন কিছু কখনও সত্যি হ'য়ে ওঠেনা, ত্যাগের জোরেও নয়, মৃত্যুবরণ করার জোরেও নয়...তাতে জিদের জোরকেই সপ্রমাণ করে.. চিন্তার সত্যকে প্রমাণিত করে না।"

সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে কিরণময়ীর ব্যবধান কোথায় এবং কতখানি তা আরও বুঝি কিরণময়ীর কথায় "আমরা যথার্থ অন্যায় তখনই করি যখন কাহাকেও তার ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত করি।...নিজের উপরেও নিজের একটা সত্য অধিকার আছে। নিজের বলিয়া সে কাহারও চেয়ে হীন নয়। সে অধিকারেও বাহিরের কাহারও হস্তক্ষেপ সহ্য করা নিজের উপর অন্যায়

করা।...আমি বিধবা, আমার উপরে কাহারও ন্যায় সঙ্গত দাবী নেই। তুমিও অবিবাহিত—তোমার হৃদয়ের উপরেও কাহারও অধিকার নেই। অতএব আমাকে ভালবেসে—তুমি যে অন্যায় কিছু কর নি এ কথাটা বোঝা ত শক্ত নয়।" দিবাকর বল্‌লো "অবৈধ প্রণয় (অর্থাৎ, সমাজশাসিত প্রণয়) যদি অন্যায় নয়, তবে সংসারে আর অন্যায় আছে কোথায় ?" কিরণময়ী বল্‌লো—"যাহাকে অবৈধ বলে মনে করছ সে তোমার সংস্কার—যুক্তি নয়। সমাজ উদ্ধত হয়ে যখন তাহার সেই সত্যিকারের সীমাটী লঙ্ঘন করে, তখন তাহাকে আঘাত করতেই হয়।" দিবাকর বিদ্রূপ করলো—"দেখা যাক আমাদের আঘাতে কতখানি দর্প আর কতখানি মোহ সমাজের ছোটে।" কিরণময়ী জবাব দিলো—"আমরা আঘাত করলাম কৈ ঠাকুরপো ? ভয়ে পালিয়ে যাওয়া আর দাঁড়িয়ে ঘা দেওয়া কি এক জিনিষ যে এতে সমাজের দর্প চূর্ণ হবে ? এতে দর্প ত' বেড়েই যাবে।"

এই কঠিন আঘাতে সমাজের দর্প চূর্ণ করতেই কি কিরণময়ী 'শেষপ্রশ্নে' জন্মান্তর গ্রহণ করলো ?

অভয়া, কিরণময়ী, কমল—তিন জনেই বিদ্রোহী। কিন্তু অভয়া যেন তার সৌন্দর্যগরিমায় আমাদের রুচির সঙ্গে একটা আপোষ করে নিলো। আমরা গত্যন্তর না দেখে বল্লাম - ঠিকই করেছ অভয়া, তোমার আর পথ কৈ ? কিরণময়ীর চরিত্রের বিস্তার তার চেয়ে বেশী। সে আমাদের পুরুষানুক্রমিক সংস্কার আর রুচিবোধের দুয়ারে মাথা খুঁড়ে মরলো। সে যেন বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, তার মন্থনে উঠলো বিষ—তার ভাষা রুদ্ধ আক্রোশে গর্জে গুমরে থেমে গেলো—আমরা নতুনের একটু আভাস, একটু ইঙ্গিত মাত্র পেলাম।

যে প্রশ্ন শরৎসাহিত্যের আরম্ভ থেকে নারীর বুকে প্রকাশবেদনায় আবর্ত রচে মরছিলো তাকে সুস্পষ্ট রূপ দিয়ে ধরলো দুঃসাহসী কমল।

ন্যায় অন্যায়ের যে সহজাত সংস্কার বলে আমরা মানুষের বিচার করি তাতে প্রকৃতির সত্যকে হিসাবে ধরা হয় না। আমাদের বিচারশালা যুগ যুগ রচিত রুচির পাষাণভিত্তির ওপর গড়া—সেখানে একটুখানি ঘা পড়লে আমাদের সারা মন অনাচারীর ওপর বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে। কিরণময়ী আমাদের এই রুচির একেবারে মূলে আঘাত করে। সৃজনধর্মের সত্যটিকেও সে ছোট করে দেখতে পারেনি। যাকে অবলম্বন করে মানুষের প্রেম বিচিত্র বর্ণে, গন্ধে, মহিমায় বিকশিত হয়ে ওঠে সে জিনিষ কুশ্রী হতে পারে না। কিরণময়ী দিবাকরকে বলেছিলো—"জীবের প্রতি অণু, পরমাণ, প্রতি রক্তকণা নিজেকে উৎকৃষ্টতর পরিণতির মধ্যে বিকাশ করবার লোভ কোন মতেই সংবরণ করতে পারে না। যে দেহে তার জন্ম, সেই দেহের মধ্যে যখন তার পরিণতির সীমা শেষ হয়ে যায় তখন সেই তার যৌবন। তখনই শুধু সে অন্য দেহ সংযোগে অধিকতর সার্থক হবার জন্য শিরায় উপশিরায় যে বিপ্লবের তাণ্ডব সৃষ্টি করে—তাকেই পণ্ডিতদের নীতিশাস্ত্রে পাশবিক বলে গ্লানি করা হয়। এর তাৎপর্য বুঝতে না পেরেই হতবুদ্ধি বিজ্ঞের দল একে ঘৃণিত বলে, বীভৎস বলে

সান্ত্বনা লাভ করে। কিন্তু...এত বড় আকর্ষণ কোন মতেই অমন হেয়, অমন ছোট হতে পারে না। এ সত্য। সূর্য্যের আলোর মত সত্য। ব্রহ্মাণ্ডের আকর্ষণের মত সত্য। কোন প্রেমই কোন দিন ঘৃণার বস্তু হতে পারে না।"

এরও প্রতিধ্বনি কমলের কণ্ঠে শুনেছি—"ওর (কামের) আসল সত্তা ত' বাইরের ভোগের মধ্যে নেই—উৎস এর জীবনের মূলে, ঐখান থেকে ও নিত্যকাল জীবনের আশা, আনন্দ ও রসের জোগান দেয়। শাস্ত্রের ধিক্কার ব্যর্থ হয়ে দরজায় পড়ে থাকে, তাকে স্পর্শ করতেও পারে না।...রিপু বলে গালি দিলেই সে ছোট হয়ে যাবে না। প্রকৃতির পাকা দলিলে সে দখলদার—তাদের কোন স্বত্বটা কে কবে শুধু বিদ্রোহ করেই সংসারে ওড়াতে পেরেছে? দুঃখের জ্বালায় আত্মহত্যা করাই ত' দুঃখকে জয় করা নয়। অথচ ঐ ধরণের যুক্তির জোরেই মানুষ অকল্যাণের সিংহদ্বারে শান্তির পথ হাতড়ে বেড়ায়। শান্তিও মেলে না—স্বস্তিও ঘোচে।"

শরৎ-সাহিত্যের পতিতা চরিত্র কয়টী এক অবিচ্ছিন্ন ভাবধারার মধ্য দিয়ে একটা Trilogy বা ত্রিপর্বের আকার নিয়েছে। প্রথমে এলো চন্দ্রমুখী, রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী। চারিদিকের কড়া পাহাড়া এড়িয়ে কোন রকমে এরা মানুষের ভাবসাম্রাজ্যে প্রবেশ করলো। অভয়া আর কিরণময়ী দাঁড়াল সন্ধিস্থলে—cross road-এর ওপর! আর এই ভাবপ্রবাহের climax হয়ে এলো কমল।

'শেষ প্রশ্ন'র আগের সমস্ত লেখার মধ্যেই অক্ষুণ্ণ সতীত্বের মহিমায় একটা বিরাট শ্রদ্ধা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সেখানে আমরা এই এক ইসারাই পাই—পাপ যেখানে মানুষের জন্মগত সহচর, ক্ষমায় সেখানে মানুষের অপরিহার্য্য দাবী আছে। অক্ষমতাকে অপরাধ বলে ভুল করে সংসারকে আমরা দুঃসহ করে তুলি। এই ক্ষমাসুন্দর রূপ তিনি ফুটিয়েছেন 'স্বামী' আর 'গৃহদাহে'।

কিন্তু কমল ভিক্ষাপাত্র নিয়ে আসে নি—সে এসেছে স্বাধীন নির্মুক্ত বুদ্ধির অহঙ্কারে তার প্রাপ্য দাবী নিয়ে। সে অচলা, রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রীর জাত নয়। সে কলঙ্কভারে সন্ত্রস্ত, সঙ্কুচিত হয়ে সমাজের মধ্যে একটুখানি ঠাঁই খুঁজে নিতে আসে নি। আর একজন তার জীবনকে ফাঁকি দিয়েছে বলে সে নিজের জীবনকে ফাঁকি দিতে কোন মতেই সম্মত নয়। সংযম যখন মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে জীবনের আনন্দকে ম্লান করে তখন তাকে কিছুমাত্র মূল্য সে দেয় না। একনিষ্ঠ প্রেম তার কাছে জড়ের ধর্ম আর তাকে ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভেতর দিয়ে সার্থক করবার চেষ্টাও জড়ত্বের উপাসনা। যৌবনের ধর্ম তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশে ও তার স্বাধীন, সাবলীল গতিভঙ্গীমায়—তার ভিতরই মানুষের প্রেমের স্বাভাবিক ও পরম উৎকর্ষ।

কমল বহুভর্তৃকা—সমাজের চোখে গণিকা, কিন্তু একদিকে সংযম, ঔদাসীন্য, নির্বিশঙ্ক তিতিক্ষার, অন্যদিকে প্রখর বিচারশক্তি ও আত্মমর্য্যাদাবোধের অগ্নিময় বর্ম পরিয়ে শরৎচন্দ্র তাকে পাঠালেন কেন? পুরুষের ভোগের বস্তু যারা, কমল তাদের জাত নয়। চরিত্রের স্পর্দ্ধায় একদিন সে ব্রহ্মচারী হরেনকে বলেছিলো—"নির্জ্জন গৃহে অনাত্মীয় নর-নারীর একটী মাত্র সম্বন্ধই আপনি জানেন—পুরুষের কাছে মেয়ে মানুষ যে শুধু মেয়ে মানুষ এর বেশী খবর আপনার কাছে আজও পৌঁছায় নি।" শরৎচন্দ্র কি আমাদের রুচিকে ভয় করে এটুকু কন্‌সেসন্ দিলেন?

তা নয়। কিরণ, অভয়া, কমল এরা সমাজের নৈতিক আদর্শের বিরুদ্ধে অভিযান করেছে—তাদের দিয়ে শরৎচন্দ্র তার চিরাচরিত ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠানের ওপর খড়্গ হেনেছেন—কিন্তু কোথাও তার আভ্যন্তরিন সত্যকে পঙ্গু হতে দেন নি। সতীত্ব ও অসতীত্বের বাইরেও যে মর্যালিটির একটা মাপকাঠি থাকতে পারে—প্রেমের রাজ্যে সতী বলেই যে কারও কোন আভিজাত্য নেই—এই তিনি ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন। তা নইলে কমল ও শিবনাথে কোন প্রভেদ থাকতো না। কমল যা নিয়েছে তার মধ্যে ফাঁকি নেই—চরিত্র ও বিচারবুদ্ধির বলে পূর্ণ করে নিয়েছে। মানুষের নিন্দা-সুখ্যাতিকে অবজ্ঞা করবার সাহস সে পেয়েছে সেইখানেই। তাই তার মুখে আমরা আর পতিতার নিজের কথা শুনি না—শুনি বিশ্বমানবের কথা—নরনারীর যৌন সম্বন্ধের গোড়ার প্রশ্ন।

কমল সমাজের বিকৃত বিধিব্যবস্থার nemesis বা অদৃষ্টপ্রেরিত বজ্র। এ দিক দিয়ে তার মধ্যে শরৎচন্দ্রের নারীচিত্রণ সার্থক হয়েছে—ঠিক যেমন আর এক দিক দিয়ে হয়েছে অন্নদাদিদির মধ্যে। সাবিত্রীর আত্মজয়, অভয়ার সাহস, কিরণময়ীর বিচারশক্তি অন্নদাদিদির সতীত্বগর্ব্বের কাছে নিষ্প্রভ হয়ে যেতো, কিন্তু কমল অসতীত্বের গ্লানি অতিক্রম করে তার পাশে দাঁড়িয়েছে।

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে অশ্লীলকে সমর্থন করেছেন—বেছে বেছে অসুন্দরের অবতারণা করে কূট শিল্পচাতুর্যে তাকে শোভনীয় ও চিত্তাকর্ষক করতে প্রয়াস পেয়েছেন—রুচীবাগিশের এ মতবাদ আজ জীর্ণ হয়ে গেছে। মন্দকে শরৎচন্দ্র মন্দই বলেছেন—কোথাও তার জয়গান গান নি। তার কথায় নতুনত্ব এইটুকু যে যা আমরা মন্দ বলে জানি তা সবই মন্দ নয়, আর যা একান্তই মন্দ, তার প্রতিকার আর যাই হোক শাস্তি ও গালাগালি নয়।

জীবনের যাত্রাপথ বেয়ে আমাদের চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে কতো বিজলী, অভয়া, চন্দ্রমুখী, অচলা, সাবিত্রী, কিরণ, রাজলক্ষ্মী। বড় বড় বিশ্বাসের গ্রন্থি আঁকড়ে আমরা নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে বিশ্রাম করছিলাম। আমাদের চিন্তার রাজ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অফুরন্ত বীজ ছড়িয়ে এরা চলে গেলো। রোহিণীকে আমরা ঘৃণা করেছি, কিরণকে করতে পারি নি। শুধু 'শেষ প্রশ্ন' নয়, রাজলক্ষ্মী থেকে কমল সব এক একটী মূর্ত্তিমতী প্রশ্নচিহ্ন। শরৎচন্দ্র প্রশ্ন দিয়েছেন—উত্তরের দায়ীত্ব রেখে গেছেন উত্তরকালের জন্যে।

শিল্পীর ও সমাজতাত্ত্বিকের সমস্যা এখানে অভিন্ন। সমাজনীতিক শরৎচন্দ্র 'নারীর মূল্যে' বলেছেন—"একদিকে পুরুষ যেমন দারিদ্র্য ও উৎপীড়নে নারীর স্বাভাবিক শুভবুদ্ধিকে বিকৃত করিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে তাহাকে আবিষ্ট করিয়া তোলে, অন্যদিকে তেমনি তাহাকেই আপাতমধুর সুখের প্রলোভনে প্রতারিত করিয়া ঘরের বাহির করিয়া আনে। পুরুষের ভয় নাই, সে যদিচ্ছা সুখ ভোগ করিয়া ফিরিয়া যাইতে পারে"—আর "যে কারণেই হোক, যে নারী একটীবার মাত্র ভুল করিয়াছে, হিন্দু তার সহিত কোন সংস্রব রাখে না। ক্রমশঃ ভুল তখন তার পাপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, দিন দিন করিয়া যখন তাহার সমস্ত নারীত্ব নিংড়াইয়া বাহির হইয়া যায়—যখন সে বেশ্যা—তখন আবার তাহার অভাবে হিন্দুর স্বর্গও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। এই সকল হইতেই বুঝিতে পারা যায়, স্বার্থপরতা ও চরিত্রগত পাপবুদ্ধি নরনারী কাহার অধিক।"

সমাজের এই পক্ষপাতদুষ্ট শাসন, এই নির্ম্মম অসাম্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে সাবিত্রীর পাশে ভুবন মুখুয্যেকে দেখে, সরযূর পিতা রাখাল ভট্টাচার্যকে দেখে, অভয়ার স্বামীকে দেখে। নারী একবার নিরাশ্রয় হলে অথবা শুচিতার নিয়মিত গণ্ডী পেরুলে কেমন করে নরপশুর দল কসাইখানার কুকুরের মত কামনার জিহ্বা বিস্তৃত করে তাকে ঘিরে ধরে সে কথা ছেড়ে দিলেও দেখা যায়—সমাজের প্রত্যেকটী নীতি, প্রত্যেকটী আচরণ তার চারপাশে আকাশস্পর্শী প্রাচীর তুলে দিয়ে একটী পথই শুধু খোলা রাখে—সে বারবৃত্তি। যেদিন উপেন্দ্র ও সুরবালা সতীশের বাসায় সাবিত্রীকে ঘোমটা টানতে দেখে ঘৃণায় দ্বার হতে ফিরে এসেছিলো, সেদিন সাবিত্রীকে এই এক চেতনা নির্যাতিত করেছিলো যে সহস্র পুরুষের দৃষ্টির সামনেও আর তার লজ্জা করবার অধিকার নেই। তাই সে অস্পৃশ্য কুলটাজ্ঞানে নিজেকে সতীশের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

সাবিত্রীর, অভয়ার স্বামীর পাশে শরৎচন্দ্র এঁকেছেন সৌদামিনীর, অচলার স্বামীকে। ব্যভিচারী, অপদার্থ পুরুষ যেমন সুমহিম নারীকে কলঙ্কিত করেছে, তেমনি পুরুষ প্রশান্ত ক্ষমায় বিপথচারিণী পত্নীকে কল্যাণের পথে উদ্ধার করে এনেছে—এ দুইই তিনি দেখিয়েছেন। কিন্তু বাস্তব এবং তাঁরই বাস্তব সাহিত্য দেখিয়ে দিচ্ছে যে দু'য়ের মধ্যে ভার-সাম্য নেই।

যে সমাজে আমরা বাস করছি সেখানে পুরুষের ভালবাসা শুধু ভালবাসাই নয়, বন্ধনও বটে। পুরুষ যেদিন নারীর কণ্ঠে, পায়ে, মণিবন্ধে অলঙ্কার পরিয়ে দিলো—নারী বোঝে নি এ তার শৃঙ্খল। গৃহের গণ্ডীতে যেদিন নারীর সীমা নির্দ্দিষ্ট হলো, নারী তুষ্ট হলো বিনিময়ে পুরুষের কাছে একটা অদ্ভুত স্তুতি ও ভাবোচ্ছ্বাস পেয়ে, পাশ্চাত্য ভাষায় যাকে বলে chivalry বা gallantry। সেই থেকে পুরুষ যেমন তার প্রিয়ার জন্যে সোনার হরিণ ধরতে ছুটেছে, তেমনি তিলমাত্র সন্দেহে সেই প্রিয়াকে অগ্নিকুণ্ডে কিম্বা বনবাসে পাঠিয়েছে। দেবতার প্রসাদলাভের জন্যে মানুষ যেমন দেশের পর দেশ উচ্ছন্ন করে দিয়েছে, কত ঘর, কত রাজ্য তেমনি ছাড়খার হয়েছে নারীর প্রসন্ন হাসির মোহে।

নারী অবলা—এ বিশ্বাস ও ব্যবস্থা কায়েমী করেই এসেছিল chivalryর psychosis। ব্যভিচারীর হাতে নারীর নিজের সর্ব্বনাশ হয়েছে—পূজারীর হাতে নারী অন্যের সর্বনাশের কারণ হয়েছে। নারীর শক্তি ও কল্যাণচেষ্টা কোনটাই রুখতে পারে নি।

তাই আজ নারীও বুঝছে, সমাজও বুঝছে যে প্রেম যত বড়ই হোক, তাকেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মানতে হবে। আর আর্থিক স্বাধীনতা না থাকলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পরিহাসে দাঁড়ায়। বিলাসী প্রেমিকের উচ্ছ্বাসের পাত্রী না হয়ে যেদিন নারী প্রকৃতির রাজ্যে পুরুষের জয়যাত্রায় সমান সামর্থ্য অর্জন করবে সেদিনই হবে সে যথার্থ জীবনসঙ্গিনী, সেদিনই হবে সে কল্যাণী শক্তিময়ী, সেদিন ব্যর্থ লাঞ্ছিত প্রেমের প্রায়শ্চিত্ত পতিতাবৃত্তি করে করতে হবে না, আর পুরুষের ব্যভিচার ও সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে নিষ্ফল নালিশ তুলবারও দরকার হবে না।

Realist শরৎচন্দ্রের পর এই realismএর ছবি আঁকবে কে? কমলকে প্রতিভার অবাস্তব সৃষ্টি থেকে ঘরোয়া জীবনের ধরাছোঁয়ার মধ্যে এনে দেবে কোন মনস্বী রূপকার?

নূতন ও পুরাতন

অমরগোপাল নন্দী

চেতনার চন্দ্রলোকে গ্রহণের ঢাকে অন্ধকার,
আপন বেদনাছায়া ফেলে যেন পৃথিবী তাহার।
নিঃসঙ্গ একেলা সেথা বসি
চাহি যদি, ওঠে চোখে ভাসি
লুপ্তবার্ত্তা অতীতের অবাঞ্ছিত মোহের বিস্তার,
স্পন্দহীন, মূক যেন, প্রত্নতত্ত্ব-গবেষণাগার।—

অতীতের জীর্ণচীরে আবরিত মিশরীয় মামি,
বর্ব্বর যুগের স্মৃতি শত শত সহস্র অনামী
মাংসভুক 'টাইরানোসর্'
কঙ্কাল সে মহাভয়ঙ্কর,
অর্থহীন শিলা কত, ছিল যাহা এককালে দামী।
জীবনের বিলুপ্ত শৈশব সেই চোখে আসে নামি।

অতীতের কুক্ষিগত অন্ধকার হতে যাই ছুটে,
মহাকাল-বৃন্তদেশে বর্ত্তমান আছে যেথা ফুটে,
তৃপ্তিহীন প্রতিভা খেয়ালী
জ্বলিয়াছে আলোর দেয়ালি,
আলোকিত রহস্যের প্রাণধারা নিয়ে যেথা লুটে,
নবসৃষ্টি অবিরাম কর্ম্মমুখে উচ্ছ্বসিয়া ওঠে।

ক্ষণতরে মনে হয় এ জগৎ নূতনেই ভরা,
জ্ঞানের অমৃতমন্ত্রে মানবের দূরীভূত জরা,
শৈত্যের ভাঙ্গিয়া মোহপাশ
ফাল্গুনের দুরন্ত নিঃশ্বাস
বৃক্ষশির-পক্ককেশ উপাড়ি করিছে যেন ঝরা।
দিগন্ত শিশিরস্নিগ্ধ শেফালির সজীবতা ভরা।

ওগো মোর জননী, বসুধে, সত্য তুমি আনন্দময়ী ?
প্রত্যুষের নবসাজ নবযুগে লভেছ, মৃন্ময়ি ?
আজ তবে কেন আসে কাণে
বাণবিদ্ধ হতাশার গানে
দুঃখাহত মানুষের রক্তাক্ত ইঙ্গিতখানি বহি,
ব্যথাতুর আর্ত্তধ্বনি সকরুণ, বল মোরে অয়ি !

বসুধাত হয়নি নূতন সে যে নিজে মামি-সমা।
অচেতনা স্থবিরা সে, জীর্ণবস্ত্রা নহে নিরুপমা।
মহাকায় 'টাইরানোসর'
রেখে গেছে হেথা বংশধর
লক্ষজনে শোষি সে যে প্রচারিছে আপন মহিমা।
ধরণী রঙ্গীন কাঁচ প্রতিভাত অতীতের সমা।

অপাবরণ

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

আমাদের এই বন্দীশিবিরের এ সভাটী ছিল সাহিত্যের—এখানে রস বিতরণ চলিত। এখন সভা হইতে সাহিত্য বাদ পড়িয়াছে, আসিয়াছে রাজনীতি। সাহিত্যে আমাদের রুচি আছে,—হয়তো আসক্তিও আছে, কিন্তু রাজনীতি আমাদের স্বভাবের জিনিষ। স্বভাব বরাবরই বলবান, তাই সাহিত্য রাজনীতিকে স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে,—সাহিত্যসভা অবশেষে রাজনীতি সভা হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা বিভিন্নদলের লোক, বিভিন্ন মতবাদ নিয়া কাজ করিয়া আসিতেছি এবং করিব। সাহিত্যসভার উদ্দেশ্য ছিল যে, এমন একটী স্থান ও আবহাওয়া সৃষ্টি করা যেখানে সকল মতবাদ ও দলের লোক আসিয়া মিলিতে পারে, বিরোধ ও সংগ্রাম যেখানে স্বভাবতই নিষিদ্ধ থাকিবে। সে উদ্দেশ্য আমরা রক্ষা করিতে পারি নাই। আমাদের দল ও মতগত বিরোধ এখানেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাব নিয়া আমরা এখানে আসিতেছি। দুঃখ করিবনা, নিজের দল ও মতকেই দেশে একদিন জয়ী ও একমাত্র করিতে হইবে, দৈনন্দিন কাজে ও চিন্তায় পর্য্যন্ত সংগ্রামকে শ্লথ হইতে দেওয়া নাই—এতে চরিত্রের দৃঢ়তা ও আদর্শে নিষ্ঠাই সূচিত হয়। কিন্তু সাহিত্য সভায় এ কলহ টানিয়া না আনিলেই ভালো হইত।

গত কয়েকটী অধিবেশনে বিভিন্ন মতবাদ নিয়া আলোচনা হইয়াছে। আলোচনা শেষ হয় নাই আরও চলিবে শুনিতেছি। কিন্তু ইতিমধ্যেই আলোচনার ফলে যে উৎসাহ দেখা দিয়াছে, তার সবটাই উৎসাহ নয়, উত্তেজনার একটা বড় অংশ তাতে মিশ্রিত আছে। এবং উত্তেজিত হওয়ার ফলে আমাদের মধ্যে কিছু মনান্তর ও তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছে। ক্যাম্পের আবহাওয়া এখন সুস্থ ও সহজ নাই।

মতবাদ জিনিষটী এমনই যে, তাহা বিসম্বাদে পরিণত হয়। মতবাদ একার উপলব্ধিতে সীমাবদ্ধ থাকে না, বহুর মধ্যে প্রসার লাভ করা তাহার প্রকৃতি। প্রসার বা প্রচার লাভের পথেই বিসম্বাদ দেখা দেয়, অপরাপর মতবাদের সংঘর্ষে তাকে আসিতে হয়। প্রত্যেক মতবাদই সাম্রাজ্য লিপ্সু, মানুষের মনোজগতে আধিপত্য নিয়া এদের নিত্যবিরোধ। ধর্ম্মমত, তার ইতিহাসও তেমন গৌরবজনক নহে ; মানুষের কম রক্ত ধর্ম্মের জন্য ব্যয় হয় নাই।

প্রশ্ন আসে, কেন এমন হয় ? যাহা সত্য বলিয়া বুঝি, তাহাকে সত্য বলিয়া বুঝাইতে গেলে এমন ভয়াবহ পরিণাম কেন দেখা দেয় ? উত্তরে মনে হয়, আমাদের চরিত্রের ত্রুটিবশতই এমন হয়।

সত্যকে সত্য বলিয়া জানাই শেষ নয়, তাকে ব্যবহারের বস্তু করিতে হয়, এবং সমস্যা এইখানেই দেখা দেয়। মনের যে অবস্থায় সত্যপ্রকাশ পায়—সে শান্ত ও নিরাসক্ত অবস্থা। কিন্তু যে অবস্থায় তাকে ব্যবহারোপযোগী করিতে হয়—সে আমাদের সাধারণ অবস্থা, বুদ্ধির স্থৈর্য্যের সেখানে একান্ত অভাব, আশাকামনা ইত্যাদি সেখানে আমাদের জীবনের চালক, চঞ্চল অস্থির বুদ্ধি সেখানে আজ্ঞাবহ মাত্র। সত্যকে জানার অধিকার স্বল্প সংখ্যকের, সত্যকে জীবনে ব্যবহারযোগ্য করিবার অধিকার তার চেয়েও কম সংখ্যকের। অথচ যারা সব চেয়ে বড় সংখ্যা, সেই সাধারণই সংসারে সত্যের বাহন হয়। সত্যকে জানার স্থানে সত্যকে মানিয়াই তারা কাজ সংক্ষেপ করে। ফলে সত্য বিকৃত হয়; বিকৃত সত্য ব্যবহারে আরও ভয়াবহভাবে বিকৃতিতে গিয়া দাঁড়ায়। আদিতে যাহা অমৃত থাকে, বিকৃতিতে তাহা মদে রূপান্তরিত হয়। জ্ঞান যে সত্য ধরা দেয়, ব্যবহারে সেই সত্যই এমন ভাবে একদিন ক্ষতি ও সর্ব্বনাশকারক হয়।

মতবাদের যে আলোচনা এখানে হইয়াছে তাতে অবশ্য প্রমাণ হইয়াছে যে, লেখকগণ বিস্তর পড়াশুনা করিয়াছেন, তথ্যে ও তত্ত্বে প্রায় প্রত্যেকেরই প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত। তবু বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, কোন প্রবন্ধই তেমন তৃপ্তি দিতে পারে নাই। সত্য কি, reality কি—এ প্রশ্নের জন্য যত মনীষি চিন্তা করিয়াছেন, ভাবিয়াছেন, তাদের সমাধান সমূহের সঙ্গে লেখকগণ আমাদের পরিচয় করাইয়াছেন; সেগুলির সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিও শুনিয়াছি সত্য। কিন্তু আমার সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে যে, লেখকগণ কেহই প্রশ্নকে ঠিক জিজ্ঞাসু ও অন্বেষু মন নিয়া দেখেন নাই। তাদের পাণ্ডিত্য আছে, বহুমতবাদের সঙ্গে পরিচয় আছে, কিন্তু এদের মধ্যে সে জিজ্ঞাসু মনকে পাই নাই। যে নিজে জিজ্ঞাসু নয়, জিজ্ঞাসা ও তার উত্তর নিয়া গবেষণা সে করিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিকে তৃপ্ত করা তার শক্তির আয়ত্তে নাই। তাহারা বড় জোর critic.

জানি, প্রশ্ন স্বভাবতঃই আসিবে যে, প্রবন্ধ লেখার আগে আমি আমার অধিকারের কথা ভাবিয়া দেখিয়াছি কিনা। দেখিয়াছি:—এ সৃষ্টি আমার কাছে রহস্যময়, একটী অনন্ত জিজ্ঞাসার মত আমার অস্তিত্বের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত এ আলোড়ন তুলিয়াছে। আমার বুদ্ধি ও মন এ প্রশ্নকে দেখিয়াছে,—আমি নিজেই নিজের কাছে প্রশ্ন হইয়া আছি। প্রশ্নটা আমি কি ভাবে দেখিয়াছি তা বলিবার অধিকার আমার আছে। এ অহঙ্কারের কথা নয়। প্রশ্ন যার মনে জাগে তার শান্তি নষ্ট হয়, তার ভিতরে নিত্য দাহনোৎসব চলে—এ নিয়া অহঙ্কারের অবকাশ কোথায়! শুধু সজাগ থাকিতে হয় যে, মস্তিষ্ক-বিকৃতি বা উন্মাদরোগ দেখা না দেয়।

এই কয়দিনের আলোচনার মধ্য হইতে পরস্পর বিরুদ্ধ দুটী মতবাদই প্রধানভাবে দেখা দিয়াছে। একটী পথকে Idealism আখ্যা দেওয়া যায়,—অপরটীকে materialism.

সৃষ্টিকে বিশ্লেষণ করিয়া ৩টী বিভিন্ন বস্তুর সম্মুখে আসিয়া থামিতে হয়—একটী জড়, অপরটী চেতন। কিন্তু reality এক, সত্য এক—স্বভাব তাহার যাহাই হৌক না কেন। এই জড় ও চেতনের গঠিত realityকে একপক্ষ এইভাবে মীমাংসা করেন যে,—এই বিচিত্র সৃষ্টি ও বস্তুপুঞ্জের

আড়ালে যে চেতনা আছে তাহাই আদিম মূলধাতু, তাহাই সৃষ্টিকে তার বস্তুকে ও ঘটনাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, এই স্থান ও কালের সীমায় যাহা প্রকাশ পাইতেছে পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং লোপ পাইতেছে, তাহা চৈতন্যের প্রকাশ বা তাহার মুখাবরণমাত্র।

অপর পক্ষ ইহার ঠিক বিপরীত মত পোষণ করেন। চেতনাকে দিয়া realityকে ব্যাখ্যা ইহারা করেন না। ইহারা বলেন,—matter,—যে নামই তার হোক না কেন, তাহাই সৃষ্টির মূল ও একমাত্র উপাদান। বস্তু ও শক্তি তুল্যার্থক। এদের প্রকাশপথে মন-চিন্তা-চেতনা আসে এবং যায়। মন বা চেতনা স্থায়ী সত্য নহে—বিরাট অন্তহীন matter এর মাঝে এক বিশেষ অবস্থার সাময়িক বুদ্‌বুদমাত্র ; জড়ের অসীম আকাশে চেতনা ক্ষণিক রামধনুর রং শুধু।

কোন মতবাদ সত্য—এ প্রশ্ন অবান্তর। কারণ, মতবাদ সত্য নয়, সত্যের বুদ্ধিগম্য ব্যাখ্যা কেবল। দ্বিতীয়তঃ, কোনটী সত্যের সত্যব্যাখ্যা তা কে ঠিক করিবে? দুটীরই ভিত্তি বুদ্ধি ও যুক্তিতর্কের উপর। বুদ্ধিকে বিচার করিবে যে, সে কে? কাজেই Idealism ও Materialism এর ঝগড়া আমার নিকট পণ্ডশ্রম মনে হয়।

সত্য কি, reality কি—এ প্রশ্ন আদপে মিথ্যা, এ বলিলে মীমাংসা হয় বটে ; কিন্তু এ যে মিথ্যা তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। যদি বলি যে, মিথ্যার প্রমাণ দরকার করে না, মিথ্যা মানেই তাই যা সত্য নয়। তখন আসে সত্যের সংজ্ঞানির্দ্দেশের দায়িত্ব। তখন যদি বলি, সত্য স্বয়ংসিদ্ধ, তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, তবে সত্যমিথ্যা যে জড়াইয়া এক হইয়া যায়, বৃথা অন্বেষণে তখন বুদ্ধির ঘুরিয়া মরিতে হয়।

প্রশ্ন যখন জাগিয়াছে, তখন স্বীকৃত হইয়া যায় যে, কিছু আছে। কিন্তু তা কি, কিইবা তার স্বভাব ও প্রকৃতি, এর উত্তরের প্রশ্ন থাকিবেই।

যা আছে ও ঘটিতেছে, তাহা মানুষের মনে প্রশ্ন জাগাইল, এবং ইহাই পরম আশ্চর্য্যের বিষয়। চোখে দেখিয়া মানুষ শান্ত হয় না : চোখ রূপের কাছে বন্দী, পথ পায় না যে রূপের অন্তরালে বা বাহিরে যাইবে। তাই চোখে দেখার পরেও প্রশ্ন করে—এ কী? অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও এমনই ভাবে নিজ নিজ বিষয়ের কাছে আবদ্ধ, সেখানেও অশান্ত প্রশ্ন থাকে এ কী?

ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মীমাংসা যদি প্রাপ্য না হয়, তবে এই দাঁড়ায়—যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, ছুঁইতেছি তাহার মধ্যে সত্যের পরিচয় নাই ; থাকিলে তাহা আমরা দেখিয়া শুনিয়া ছুঁইয়াই পাইতাম, প্রশ্ন করিতাম না। কাজেই বাহিরে অনুসন্ধান ত্যাগ করিতে হয়। তার মানে বিজ্ঞানের মত কোন সাহায্য আমাদের কাজে লাগিবে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতই বিজ্ঞানের ক্ষেত্র, নিয়মে ও শৃঙ্খলায় তাকে সুসংবদ্ধ করাই বিজ্ঞানের কাজ। ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে উপস্থাপিত জগৎ হইতে উত্তর অলব্ধ থাকে, কাজেই বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের জগৎ হইতে অন্যত্র প্রশ্নের মীমাংসা অন্বেষণ করিতে হইবে।

বহির্জ্জগৎ পরিত্যক্ত হইলে অন্য কোন ক্ষেত্র থাকে যেখানে অনুসন্ধান চলিতে পারে ? পরিশ্রম ও চেষ্টা সংক্ষেপ করিয়া আনিলে, এই দাঁড়াইবে—কে প্রশ্ন করে, কে বুঝিতে ও জানিতে চায় ? প্রশ্নের কারণটা অবশ্য বাহিরে, অর্থাৎ বাহিরটাই প্রশ্ন। কিন্তু কার কাছে বা কোথায় ? এর উত্তর যেখান হইতে আসিবে, প্রশ্নও সেখানে জন্ম নেয়—এই অনুমানে অগ্রসর হইলে বুদ্ধিকে পাওয়া যায়।

সমস্ত বহির্জ্জগৎ নিশ্চুপ বোবা—বুদ্ধিই প্রশ্নকর্ত্তা ও উত্তরপ্রার্থী। এখন সমস্যা দুটী। বুদ্ধি বস্তুটীকে কে বুঝিবে ? এবং বুদ্ধি নিজেও মূল প্রশ্নের অঙ্গীভূত কিনা ? যদি ধরিয়া নেওয়া যায় যে, বুদ্ধিই সমস্ত পরিস্কার ও বোধগম্য করিবে, তবে অবস্থা এই দাঁড়ায়—বুদ্ধি নিজে প্রশ্নকর্ত্তা, উত্তর-দাতা ও প্রশ্ন, তিনই একাধারে। অন্য ভাষায়—প্রশ্ন নিজেই নিজের কাছে প্রশ্ন ও মীমাংসাকর্ত্তা।

একটী চেতনা নিজেই নিজের কাছে প্রশ্ন ও উত্তরকর্ত্তা হইয়া আছে,—এ ব্যাপারটা বুদ্ধি সত্যই বোধায়ত্ত করিতে সক্ষম হয় কি—শুধু এই বোধই কি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আসিবে না যে,—এ রহস্য এ বোধগম্য নয়, এ প্রকাশ্য নয় ? অথচ রহস্য নিত্য সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছে। তবে কি বলিতে হইবে,—ফেলেছ কোন্ ফাঁদে ?

বুদ্ধির ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, তার শক্তিও অসীম নয়। নিজের উপর আলো ফেলিয়া নিজেকে দেখিয়া লইবার সমস্যা যখন উপস্থিত হয়, তখন বুদ্ধি স্থির হইয়া আসে। এই অসম্ভব চেষ্টার ফলে বুদ্ধির স্বভাবে মস্ত পরিবর্ত্তন ঘটে। নিজেকে দেখা তার সম্ভব হয় না ; নিজের অন্তরালে বা গভীরে কি আছে তাও সে জানিতে পারে না,—যে বস্তু তাকে ধরিয়া রাখিয়াছে, অথচ সম্মুখে ধরা দেয় না, যার সম্বন্ধে প্রতীতি জন্মে অথচ অভিজ্ঞতা জন্মে না।

বুদ্ধির স্বভাব জানা। জানার বস্তু আছে—অথচ তাকে জানিতে পারে না, কারণ তা তার শক্তির বাহিরে,—এ প্রত্যয় ও বোধ বুদ্ধিকে শান্ত ও সংযত করে ; বুদ্ধির শক্তিকেও কেন্দ্রস্থ ও বলবান করে। জানার বস্তুকে জানার চেষ্টায় নিজের শক্তির সীমা বুদ্ধি জানিতে পারে, ঔদ্ধত্য ও মিথ্যাবোধ হইতে বুদ্ধি তখন মুক্তি পায়। বুদ্ধির জ্ঞানের সীমায় যাহা থাকে, তাহার উপর বুদ্ধির এখন যে আলো পড়ে, তা নতুন আলো ; বস্তুর বাধা অতিক্রম করিয়া বহির্জ্জগতের অভ্যন্তরে পর্য্যন্ত বুদ্ধির এ আলো প্রবেশ করে, নতুনরূপ ও অর্থ তখন প্রকাশ পায়। এতদিনের জানা ও পরিচিত জগৎ হইতেও আচ্ছাদন সরিয়া যায়,—কারণ, বুদ্ধির উপরকার আবরণই বহির্জগতকে অস্পষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। এবং যা কিছু দেখে শোনে স্পর্শ করে, তারপর একটী অনির্ব্বচনীয় রহস্যের স্পর্শ বুদ্ধি পাইতে থাকে। যে বুদ্ধি প্রশ্ন করিয়াছিল, জানিতে চাহিয়াছিল এবং বুঝাইতে চাহিয়াছিল, সে বুদ্ধি প্রশ্ন ইত্যাদি হইতে মার্জ্জিত ও মুক্ত হয়। কেবল একটী রহস্য, অসীমত্ব ও অপূর্ব্বত্বের বোধ বুদ্ধির রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশ্রিত থাকে ; যাহা বুদ্ধি এখন স্পর্শ করে তাহাতেই এই রহস্যের স্পর্শ লাগে। দেখিতে পায় নিজেতে যে রহস্য রহিয়াছে, তাহাই

সমস্ত কিছুকে ধরিয়া ও আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, অথবা সমস্ত কিছুই এই রহস্যের মধ্যেই মুক্ত হইয়া আছে ও অর্থ পাইয়াছে।

আমার বন্ধুগণ নানাদিক দিয়া realityকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু লক্ষ্য করেন নাই যে, বুদ্ধিকে অনন্তকাল বসিয়া সম্মুখে বিস্তারিত করা চলে। তবু সম্মুখে অসীম থাকিয়াই যায়, চিন্তা-যুক্তি-ইচ্ছা এই পথে বুদ্ধি যত অগ্রসর হয় পথও তত বাড়িতে থাকিবে, কোন শেষ পাওয়া যায় না, কারণ শেষ নাই। বহির্জগৎ, হইতে যদি নিজের দিকে বুদ্ধিকে ফিরানো যায়, তবে সেখানেও বুদ্ধি নিজের কেন্দ্রে আসিয়া লগ্ন হয়: একটী অসীম রহস্যের উপর কেন্দ্রটী কোনমতে ধুক্ ধুক্ করিতে থাকে,—তা অতিক্রম করিয়া চ্যুত হইলে সেখানেও অশেষের মধ্যে পড়িতে। বুদ্ধির সম্মুখেও যেমন অসীম, বুদ্ধির পশ্চাতেও তেমনি অসীম।

বুদ্ধির সম্মুখগতির পরিণাম আমার বন্ধুগণ লক্ষ্য করেন নাই—অন্তর্মুখী গতির কথা নাইবা তুলিলাম; বুদ্ধিকে তারা ভালো করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করে নাই; বুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়াছেন, বুদ্ধিকে চালনা করেন নাই। তাই, চিন্তা, যুক্তি, তর্ক ইত্যাদি জড় করিয়া এক একটী মতবাদ খাড়া করিয়া realityকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একে আমি পণ্ডশ্রম মনে করি। তারা শ্বাস-প্রশ্বাসের মত স্বাভাবিক কাজ করিয়াছেন,—চোখ দিয়া রূপ দেখার মত বুদ্ধি দিয়া চিন্তা করিয়াছেন মাত্র।

দুটী বিষয়ে একটু আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ আমি শেষ করিতে চাই,—একটী বাহিরের এ জগৎ, অপরটী মানুষ।

—শুনিতে পাই, এ পৃথিবী আদিতে এরূপে ছিল না। অতি স্বাভাবিক কথা। বস্তুর ব্যাপ্তি স্থান ও কালকে নিয়া। স্থানের ধর্ম্ম কি সঠিক জানি না; বোধ হয় প্রকাশের জন্য যে অবকাশের প্রয়োজন সেই পটভূমিকার নামান্তরই স্থান। কালের অন্য নাম পরিবর্ত্তন। এই কাল ও স্থানের মতই পটভূমিকার অঙ্গীভূত। নিরন্তন পরিবর্ত্তন কালের ধর্ম্ম। যাহা স্থান ও কালে প্রকাশ পাইবে, স্থান-কালের ধর্ম্ম তাকে মানিতে হয়, ব্যাপ্তি ও পরিবর্ত্তন তার থাকিবেই। পৃথিবীর আদিম রূপের চিহ্ন বর্ত্তমানের মধ্যে, কাজেই, খুঁজিয়া না পাওয়া স্বাভাবিক।

একদা পৃথিবী নাকি সূর্য্যের বহ্নি-বাষ্পের মধ্যে একাকার হইয়াছিল। সে ইতিহাস অনুমানের 'পর নির্ভর করে। ছবিটী বোধ হয় এইরূপ হইবে,—অসীম space রূপহীন কায়াহীন ধূ-ধূ বিস্তৃতি শুধু। এই অনন্ত বিস্তৃতির মধ্যে ধূমময় নীহারিকাপুঞ্জের আবির্ভাব—তাও ধাববান। কোথা হইতে এ আসিল, কেন আকাশপথে পাগলের মত ধাইয়া চলিতে লাগিয়া গেল—এ প্রশ্নের উত্তর মিলিবে না। কার্য্যকারণ দিয়াও বোঝা যাইবে না, কারণ কার্য্যকারণ সে অসীম spaceএ অনুপস্থিত। তবে কি ঐ অসীম অবকাশই বিনা কারণে একদিন এই ধূমময় বহ্নিবাষ্পে বুদ্বুদের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল? যেখানে অস্তিত্ব ছিল না, চেতনা ছিল না, সে রূপহীন কায়াশূন্য space

কি কারণে ও কোনপথে সীমায় ও রূপে দেখা দিল—এ প্রশ্নের উত্তরদাতা কেহ নাই। শুধু বলিতে হয়, অসীমে সীমা আসিল—অরূপে রূপ দেখা দিল ও অনস্তিত্বে অস্তিত্ব জাগিল।—তাহা হইলে আমরা যে একটী রহস্যের সম্মুখে আসিয়া পড়ি। এবং রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন অপেক্ষায় অনন্তকাল বৃথা অনুনয় করিতে হয়,—'হে আকাশ, খোল খোল তব নীল যবনিকা!'

এই আকাশচারী ধাবমান নীহারিকাপুঞ্জ চলিতে চলিতে এক সময়ে দানা বাঁধিল, কিন্তু চলা তার চলিতে লাগিল। গতিপথে খানিকটা অংশ চ্যুত হইয়া অদৃশ্যসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া মূল অংশটীকে বেষ্টন করিয়া আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। মূলের গাত্রস্খলিতাই আমাদের এ ধরিত্রী। বহ্নিবাষ্পময় আদিম পৃথিবী কোটি কোটি বৎসরের আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনে ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আসে এবং প্রথম প্রাণের বাসোপযোগী হইয়া জীবধাত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করে।

এই মহাশূন্যে নাকি অনেক সৌরজগৎ আলোক-বিন্দুর মত ভাসিতেছে। সমস্তের তুলনায় আমাদের নিজস্ব সৌরমণ্ডল বালুকণার চেয়েও ক্ষুদ্রতর, এবং পৃথিবীগ্রহটীর অস্তিত্ব সেখানে নাই বলিলেই চলে। মহাশূন্যে অনন্তবিস্তৃতি—অথচ আমাদের পৃথিবীর জন্য সূচ্যগ্রের চেয়েও কম স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

অণু হইতে ক্ষুদ্র এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে একদিন প্রাণ দেখা দিল। বৈজ্ঞানিক বলেন—"We do not know how life began on earth." পাহাড় পর্ব্বতের গায়ে শৈবালচিহ্নে প্রাণের প্রথম কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে! সেই-প্রাণ-প্রবাহ কত যুগযুগান্ত অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান মানুষের ঘাটে আসিয়াছে।

সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চে মানুষকে আনিবার জন্য কত লক্ষ কোটী বৎসর আয়োজনে ব্যয় হইয়াছে, কি বিপুল ধৈর্য্য ও প্রতীক্ষার প্রয়োজন হইয়াছে—ভাবিতে গিয়া প্রশ্ন আসে, মানুষের এমন কি মহিমা আছে যার জন্য অসীম সময় ও অসীম শক্তি ব্যয় করিয়া এই অণু হইতে অণুপৃথিবীতে তাকে আনা হইল? এ কি অপব্যয় কিম্বা অর্থহীন খেয়াল মাত্র?

শুনিতে পাই, মানুষ আসায় সৃষ্টি সম্পূর্ণ হইয়াছে, অর্থ পাইয়াছে। পূর্ব্বে যাহা ছিল কবন্ধ, মহাশূন্যে ইতস্ততঃ ছড়ানো ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—তাহাই সমগ্রতা লাভ করিয়া একটী একে জীবন্ত হইয়াছে। মানুষকে সরাইয়া নিলে সৃষ্টি নিষ্প্রভ হয়, মুছিয়া যায়, অসীম space ও time নিজের ভারেই সমস্ত কিছু নিয়া মহাপ্রলয়ে গিয়া অবসান লাভ করে। মানুষের মহিমা ও অর্থ যে এই,—মানুষ নিজেই তা বিশ্বাস করিতে সাহস পায় না।

সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চে এই অত্যাশ্চর্য্য আগন্তুক ও একক অভিনেতা এ মানুষ কে ও কি—এই আমাদের প্রথম ও শেষ প্রশ্ন। এর উত্তর হইবে এই সর্ত্তে আমরা আসিয়াছি। কিন্তু উত্তর বোধ হয় মিলিতেছে না। যত মানুষ আসিতেছে সবাইকেই ঠেলিয়া সরাইয়া দেওয়া হইতেছে, নূতন মানুষ আনিয়া নিত্য কেবল পরীক্ষাই চলিতেছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ এক একজন মানুষ

আসেন, যাঁরা বলিয়া বসেন, 'আমি জানিয়াছি, আমি উত্তর পাইয়াছি'। ইহারা বলেন, 'বাহিরে যে সত্য খুঁজিতেছ, সে সত্য তোমাতেই রহিয়াছে; নিজেকে জান, যাবতীয়কেই জানা হইয়া যাইবে।' কিন্তু তাহারাও সরিয়া যান, কারণ সৃষ্টিতে স্থিতি নাই। ফলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ঠিক পূর্ব্বের মতই চলিতে থাকে।

মানুষ প্রশ্ন করিয়াছে, উত্তর তাকেই দিতে হইবে। এ মানুষের পরিচয় লওয়াই প্রত্যেক জিজ্ঞাসুর কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়।

আমার জন্মের দ্রষ্টা আমি নয়, আমার আদি বা আরম্ভ দেখার সুযোগ আমার হয় না। তাই জিজ্ঞাসা করিতে হয়, 'কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?'—

মাতৃগর্ভের অন্ধকারে একটানা দশ মাসের ঘুম ঘুমাইয়া শিশুমানুষ পৃথিবীতে নামে। সামান্য রক্তকণা ভ্রূণে বসিয়া জীবনের জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত ও পুষ্ট হয়। এখন জানিতে হইবে,—ঐ রক্তকণায় প্রাণ কেন, কোনপথে ও কেমনে আশ্রয় নিল? সেখানে দৃষ্টি কোথায় ছিল যে, বাহিরে আসিয়া বাহিরকে রূপময় দেখিতে হয়? সামান্য রক্ত-ফোঁটায় শ্রবণ কোথায় গুপ্ত ছিল যে, পৃথিবীতে নামার সঙ্গে সঙ্গেই জগৎ ধ্বনিময় হইয়া উঠে? যে রক্তকণাকে বিশ্লেষণ করিলে জল, বাতাস ইত্যাদির ক্ষণিক ষড়যন্ত্র বলিয়া ধরা পড়ে, সেখানে কে মনকে রাখিয়া গেল, যাতে জগৎসংসার মনোময় হইতে পারে?—এযে মস্ত রহস্য, একটু ভাবিলেই বোঝা যায়, এজন্য বেশী চিন্তার আবশ্যক করে না।

সব পথই অবশেষে রহস্যের সম্মুখে আসিয়া থামে, দেখিতে পাই। মানুষের আদিতেও অন্তহীন রহস্য—অন্তেও সেই একই রহস্য। কিন্তু জন্ম-মৃত্যুর সীমায় খণ্ডিত এই যে মধ্য অবস্থা মানুষের,—তা কি পূর্ব্বোক্ত রহস্য হইতে মুক্ত? না—তা মুক্ত নয়। যে কারণে আদি ও অন্ত রহস্যে আবৃত, ঠিক সেই কারণটাই মধ্যভাগে সমান অনুস্যূত রহিয়াছে। মধ্যভাগ মানে প্রকাশিত ভাগ দুর্ব্বোধ্য ছিল বলিয়াই তো আদি ও অন্ত জানার প্রয়োজন হইয়াছিল। মানুষ এক রহস্যের জন্মগুহা হইতে আসিয়া তেমনি আর এক রহস্যের মৃত্যুমোহানায় মিশিয়া যাইতেছে।

সমাপ্ত করিবার আগে জীবনের ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইতে চাই। জীবন প্রতিনিয়ত ক্ষয়ের দিকে যাইতেছে, সময় থাকিতে এমনভাবে তাকে চালনা করা উচিৎ যাতে পূর্ণভাবে বাঁচা সম্ভব হয়।

এ জন্য দুটী মাত্র পথ আছে। একটী, মহাজনদের পথ অনুসরণ করা। দ্বিতীয়, পথটী কঠিন পথ, কতিপয়ের পক্ষেই প্রযুজ্য। সে হইল—স্বভাবের পথ; নিজের স্বভাব ও স্বধর্ম্ম জানিয়া নিয়া সে নির্দ্দিষ্ট পথে জীবনকে চালিত করা।

দেশের ভালোমন্দের সঙ্গে নিজেদের এবারকার জীবন আপনারা মিশাইয়া লইয়াছেন। গুরু দায়িত্ব আপনাদের। আপনাদের মধ্যে বুদ্ধির অভাব নাই, চরিত্রে আপনারা অনেকেই নির্ভীক

ও স্বার্থবোধশূন্য। আপনাদের মধ্যে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এখন একমাত্র প্রয়োজন, যাতে নূতন ইতিহাস রচিত হইতে পারে। মৃত্যুকে যারা ভয় করে না, ইতিহাস সৃষ্টি করিবার অধিকার তারাই অর্জ্জন করে, সে অধিকার আপনাদের মধ্যে অনেকেরই আছে। শুধু দরকার—strength of conviction, এই রকম দৃঢ় বিশ্বাস যার সম্মুখে পাহাড় পর্য্যন্ত টলিয়া যায়।

—সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও বিশ্বাস আমাদের মধ্যে যার থাকিবে, এবারকার জীবনযুদ্ধের নেতৃত্বের ভার তারই উপর, সে কঠিন দায়িত্ব তাকেই বহন করিতে হইবে। আপনাদের মধ্যে সে ভাগ্যবান আছেন কিনা এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই।*

*বক্‌সা বন্দীশিবির সাহিত্য সভার পঠিত।

উড়োপাখী

প্রভাতদেব সরকার

শুভ সংবাদ নিয়ে দেশে ফিরছি...

চিরকেলে-মুখ্খু দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ জমিদার বংশের (বৃহৎ নিরন্ন মানব গোষ্ঠির বাপ-মা) এক মাত্র সন্তান আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানী গ্রাজুয়েট! এতো বড় শুভ সংবাদ এর আগে ওবংশে কেউ দেয়নি। মামলায় জিতে' লাঠির ঘায়ে শত শত উলুখাগড়ার মাথা ফাটিয়ে, কোন বর্দ্ধিষ্ণু প্রজার বুকে সদ্য বাঁশ-গাড়ি করে'ও নয়। এ সংবাদ প্রাপ্তে পিতামাতা থেকে আরম্ভ করে আশ্রিত আত্মীয় মণ্ডলী আনন্দ লাভের সঙ্গে যে কতদূর গর্ব্ব অনুভব করবে আর সেই সঙ্গে আমার সম্মানটা যে কত উচ্চে নির্দ্দিষ্ট হ'বে ভেবে' এক প্রকার উড়ে' ষ্টেশনে এসে হাজির হলুম...

ট্রেনের দেরি তখনও প্রায় আধ-ঘণ্টা। সকালে টেলিগ্রাম করে' দিয়েছি--তবু তর সয় না। এতো ছোট লাইনে 'টাইম টেবিল' দরকার করে না, ট্রেণের গতিবিধির খবর মুখে মুখে। দেওয়ালে-মারা টাইম টেবলটা বার বার দেখ্তে লাগলুম্ আর প্ল্যাটফরমের এদিক ওদিক পাইচারি করতে রইলুম্ সময় যেন কাটে না! একবার বেকে বসি, একবার উঠে দাঁড়াই—একবার জোরে জোরে পাইচারি করি, খবরটা যেন পেয়ে বসেছে, যথাস্থানে পৌঁছে না দিলে আমায় ছাড়বে না।... সাম্নের লাইনগুলোর ওপর রদ্দুর পড়ে' চিক্ চিক্ করচে,—পাশের লাইনের ওপর বিবর্ণ মাল গাড়ীটা ঠায় দাঁড়িয়ে তাতছে--খুব ঠাহর করলে দেখতে পাওয়া যায় যে তার থেকে আগুনের হল্কা ওপরে উঠচে। যে কজন যাত্রী আছে, তারাও নিঝুম মেরে বসে আছে। মাঝে মাঝে খাঁকি সার্ট, খাঁকি জুতো পরা টিনের স্যুটকেশ হাতে দু' একটা ক্যানভাসার, 'যদি কোন ভদ্দর লোকের আবশ্যক থাকে বল্বেন মশাই!—আশ্চর্য্য মলম্! বাত-বেদনা কাটা ঘা পোড়া ঘা, নালিঘা মাথা-ধরা চোখ-ওঠা, পেটের পীড়া, অজীর্ণ, অম্বল, শূল-এর অব্যর্থ মহৌষধ—আশ্চর্য্য মলম! যদি কোন ভদ্দর লোকের আবশ্যক থাকে, বল্বেন মশাই!' বলে' চীৎকার করচে। গত দু' বছরই ধরে' আশ্চর্য্য মলম তার আশ্চর্য্য গুণ সাধারণ্যে প্রকাশ করে' একেবারে দেউলে হ'য়ে গেচে—তাই ওতে আর কারো আগ্রহ নেই। আর থাকলেও, পয়সা খরচা করতে কেউ রাজী নয় মিনি-পয়সায় যখন পরখ করা যায়!

কই, এদিকে একবার আসুন না দেখি কি রকম আশ্চর্য্য মলম্! কপালটা বড্ড ধরেচে, লাগিয়ে দিন দেখি একটু আরাম হয়তো বুঝি।

এটা রসিকতা না-হলেও বক্তা একবার সকলের মুখের দিকে চেয়ে দাঁতবার করে' হেসে উঠলো। আর পাঁচজনও তার দেখাদেখি মাড়িটা একটু বার করলে। দূর থেকে দাঁড়িয়ে মজা

দেখবার বিষয় ! একজন ক্রমাগত উদবান্নের জন্য চীৎকার করে' গলা ফাটায়, আর পাঁচ জনে মজা দেখে। দুনিয়ার এইতো রীতি !

আজ নিজের এতো বড় সৌভাগ্য কেন জানি না, সবারই ওপর একটা দরদ অনুভব করচি। মনে হলো, ভদ্র চেহারার ঐ ফিরিওয়ালা গুলোর এক সময় জীবনের উদ্দেশ্যও ছিল না আর এ ধরণের উপজীবিকা ওদের মানায় না। হয়তো ওরা আমারই মতো বয়সে অনেক কিছুই আশা করেছিল, সুযোগ পেলে সফল কামও হয়তো হ'তে পারতো।...ওরা যে চীৎকার ক'রচে তাতে যেন ব্যর্থতার একটা সুর আছে, বাধ্য বাধ্যকতার একটা তাগিদ আছে। সংসারের প্রাচুর্য্যের দিকটাই এতোদিন দেখে এসেচি, তার অপ্রতুলতার অনটনের দিকটায় নজর পড়েনি (পড়বার মত কোন চেষ্টাও করিনি কোনদিন) তার রূপটা যে এতো করুণ, কোনদিন ভাবতে পারিনি। আজ এই সব ফিরিওয়ালাদের সামনে দেখে' মনে হ'লো, সংসারে সুখের চেয়ে দুঃখটাই অধিক মাত্রায় প্রকট। মন টন্ টন্ করে' উঠলো। ইচ্ছে হ'লো, ওদের সব জিনিষগুলো দ্বিগুণ মূল্য দিয়ে কিনে নিই— ওদের ঐ ব্যর্থ করুণ সুরটাকে টাকা দিয়ে চাপা দিই।...ভেতর থেকে কে যেন বল্‌লে, পাগলামী ! আজ হয়তো ওরা কিছু লাভ করবে, কিন্তু মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ওদের দুঃখ কী দিয়ে ঠেকিয়ে রাখবে ?

সত্যি, কি দিয়ে ঠেকিয়ে রাখবো ! এমন কী উপায় আমরা বড়লোকেরা ওদের জন্যে ক'রেচি ? টিকেট নেবার ঘণ্টা পড়লো।

সামনে এগিয়ে চ'লেচি, আট ন'বছরের একটা ছেলে এসে মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়াল। মুখটাকে কাঁচুমাচু করে' শীর্ণহস্ত দুটোকে বাড়িয়ে বল্‌লে, বাবু, একটা পয়সা !

আজ মনের যে অবস্থা, তাতে অন্য ভিখিরী হ'লে একটা পয়সা দিয়ে নিজের কাজে যেতুম। কিন্তু এ ছেলেটীর মুখে চোখে এমন একটা ভাব আছে, কাকুতির এমন একটা স্পষ্ট অভিব্যক্তি আছে, যাকে সহজে ঠেলে এগিয়ে যাওয়া যায় না। মুখটা দেখলেই মায়া হয়, মনটা কেমন-কেমন করে' ওঠে, কাজে বাধা পেয়েও বিরক্তি আসেনা, বরং কাজ ফেলে তার সবটুকু পরিচয় জেনে নিতে মন ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে।

জিগ্যেস করলুম, পয়সা কী করবিরে ?

মাটির দিকে চেয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌লে, বড্ড খিদে পেয়েচে।

খিদে পাবার কষ্ট জানিয়ে কতদিন কত লোক-ইতো অভাব জানিয়েছে, কিন্তু মন সাড়া দেয়নি, বা খিদে পাওয়াটা আদিম অভ্যাস বলে' মুখ ফিরে তাকাইনি। কিন্তু এ ছেলেটীর স্বরে আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কাঁটা দিয়ে উঠলো ওর খিদে পাওয়ার কষ্টটা আমাকেই বাজলো। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতটা ধরে' খাবারের দোকানে নিয়ে গেলুম্। বল্‌লুম্, তোর যা ইচ্ছে, তাই নে।

খাবারের ঠোঙা হাতে ধরে' ও আমার মুখের দিকে চাইলে। মনে হলো, আমার আদেশ চায়, কিংবা এতো আতিথ্য ওর বিশ্বাস হ'চ্ছে না। হেসে বল্‌লুম্, খানারে চেয়ে রইলি যে ?

ইত্যবসরে টিকেট কেটে আন্‌লুম্। ট্রেণের দেরি তখন প্রায় পাঁচ সাত মিনিট। পাশে বসে জিগ্যেস্ করলুম, তোর নাম কিরে?

এতক্ষণে ছেলেটীর মুখে হাসি ফুটেচে। সামনের ছোট ছোট দাঁতগুলো বার করে বল্‌লে, চণ্ডীচরণ।

বেশ, বেশ চণ্ডী তুই কাদের ছেলেরে? বাড়ী কোথায়?

বল্‌লে, বেলেঘাটায়। কাদের ছেলে, তা বলতে পারলে না—চুপ করে' রইল।

বল্‌লুম, এখানে এলি কী করে'? তোর বাপ মা তোকে খুব খুঁজচে।

চণ্ডী আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আমার কথা বোধ করি, বুঝ্‌তে পারে নি।

পাশে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন, দয়া করে' জানিয়ে দিলেন,—ওদের আবার বাপ মা আছে নাকি! ওরা ঐরকম—দিন কতক পরে চোর হ'বে।

চণ্ডী চোর হ'বে কী সাধু হবে তা' নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। ওর সঠিক ঠিকানা জানাবার জন্যে প্রাণটা আকুলি বিকুলি করে' উঠলো। কিন্তু চণ্ডীকে উল্টেপাল্টে জিগ্যেস্ করে'ও কিছু জানতে পারলুম না। ও কেবল বলে: নাম, চণ্ডীচরণ;—বাড়ী, বেলেঘাটা ইষ্টিশানের ধারে।

ডিষ্ট্যাণ্ট সিগ্‌নাল ছাড়িয়ে ট্রেণ এসে গেচে। চণ্ডী ঠোঙার ভিতর মুখ ঢুকিয়ে আছে। কী জানি কেন, ওকে ছেড়ে কিছুতে উঠতে পারছিলুম না,—বল্‌লুম চণ্ডী আমার সঙ্গে যাবি?

চণ্ডী আড়ে আড়ে চেয়ে পিট্‌পিট্ করে' হেসে বললে—তোমাদের বাড়ী কদ্দ্‌র?...কেউ মারবে না?

পাশের ভদ্দর লোক বলে' উঠলেন, মিথ্যে খরচ করবেন মশাই! ওরা কী আর কোথাও টিকে থাকতে পারে—পাতচাটা! দু'পাঁচ দিন থেকে পালিয়ে আসবে—দেখে নিবেন মশাই?

ভদ্দর লোকের কথায় কান না দিয়ে বললুম,—নারে না, কেউ তোকে মারবে না তুই আমার কাছে থাকবি কেমন?

চণ্ডী হাতের ঠোঙাটা ফেলে দিয়ে, ইজেরে হাত মুঁছে নিল। এতক্ষণ লক্ষ্য ক'রিনি, দেখলুম, চণ্ডী যা পরে আছে, তাকে ইজের কোন মতেই বলা চলে না—একটা ছেঁড়া পাঞ্জাবীকে ইজেরের মত করে' পরেচে,—এলো গা।

ট্রেণে ওঠবার আগে চণ্ডী আর একবার জিগ্যেস্ করলে,—আমায় মারবে না ত'? তার হাতটা ধ'রে গাড়ীর ভেতরে তুলে নিয়ে বল্‌লুম,—না রে না, কী ভীতু রে তুই!

দু'পাঁচ মিনিটে চণ্ডী একেবারে আপনার হ'য়ে উঠলো। ওর মুখও ফুটল। গাড়ীর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কাদের উদ্দেশ্য করে' অনর্গল বক্‌তে লাগল—মাঝে মাঝে হাতছানি দেয়,—মুখ ভেঙায়, কখন বা ঘুসি পাকিয়ে বিড় বিড় করে' উঠে। মুখ বাড়িয়ে দেখলুম, রেল

লাইনের ধারে ধারে যে সব ছোট ছোট কুঁড়ে আছে, তাদেরই সংলগ্ন প'ড়ো জমিতে কতকগুলো উলঙ্গ ছেলে চু-কপাটী খেল্‌চে। তারা রেলগাড়ী দেখে খেলা থামিয়ে তারস্বরে চীৎকার ক'রচে। তাদের ভাষা বোঝা যায় না, একটা হৈ-হৈ শব্দ কাণে এসে পৌঁছয়। বুঝলুম, চণ্ডীচরণ তাদেরই লক্ষ্য করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনে বিশেষ যত্নবান।

হঠাৎ চণ্ডী জিগ্যেস্ করলে,—তুমি আমায় জামা কাপড় দিবে ?

আমি হ্যাঁ বলে' একটু বিমনা হ'য়ে পড়েছিলুম্। চণ্ডী ঠেলা দিয়ে বল্‌লে,—কতগুলো দেবে ? তারপর হাত দু'টোকে যতদূর সাধ্য পাশের দিকে বিস্তার করে' খিল খিল করে' হেসে বল্‌লে,—এই এতো গুলো !

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জিগ্যেস করলুম,—চণ্ডী, আমি তোর কি হই রে ?

চণ্ডী নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিলে,—বাবা।

বুঝলুম, চণ্ডী, আর যে ঘরের ছেলে হউক না কেন, ভদ্র গৃহস্থ ঘরের ছেলে নয়। ও যে ঘরের ছেলে, সেখানে কেবল বাবার মত লোকই আদর করে,—তাই ওর ধারণা হ'য়েচে, যে আদর করে' সে বাবা শ্রেণীর লোক। হেসে বললুম্,—দূর পাগলা : বাবা কীরে দাদা হই যে। চণ্ডী মাথা নেড়ে সুর করে' বল্‌লে,—দাদা, তুমি আমায় মারবেনা তো ! মারলে কিন্তু আমিও...হুঁ—বলে' আবার হেসে উঠলো।

সহসা লক্ষ্য করলুম্, চণ্ডীর দু'পায়ের গোড়ালীতে কাল্‌শিটে দাগ। আঁচ করলুম, একটা কিছু ওখানে অনেকদিন ধ'রে বাঁধা ছিল। জিগ্যেস করলুম, হাঁ রে চণ্ডী, ও কিসের দাগ ?

চণ্ডী নির্লিপ্তের মত বল্‌লে, খারাপ মা শাস্তি করে'ছিল...দেখ দাদা, এই এতো মোটা বেড়ি পায়ে বেঁধে রাখতো...কেবল মারতো ভারি বজ্জাত ! তারপর হেসে উঠলো হি-হি করে'। কেন যে হাস্‌লে ! হয়তো মুক্তির আনন্দে। কিন্তু আমার বুকে হাতুড়ী পিটলো। খারাপ মার শাস্তি করার পক্ষে চণ্ডীর আচরণ যতই অনুকূল হোক না কেন, লৌহবলয়ের ব্যবস্থা কোনমতে বরদাস্ত করতে পারলুম না। দুনিয়ার কোনও মায়ে এতটুকু ছেলের ওপর যে এত রূঢ় ব্যবহার করতে পারে, এ ধারণা আগে ছিল না। মনে মনে সেই মাতৃমূর্ত্তির কল্পনা করে' শিউরে উঠলুম—অভিশাপ করলুম। জিগ্যেস্ করলুম,—হাঁ রে চণ্ডী, খারাপ মা কেরে ?

চণ্ডী হাত মুখ নেড়ে বুঝিয়ে দিলে, তিনি সৎমা। তবু রক্ষা !

বল্‌লুম,—তোর বাবা কী করে রে ?

চণ্ডী খুব আগ্রহের সঙ্গে বল্‌লে,—বাবা কলে চাক্‌রি করে'...খুব ভোরে চলে যায়...কী চালাক ! রোজ বলে, তোর জন্যে এতো খাবার আনবো, জামা আনবো—তোর মার সঙ্গে ঝগড়া *করিস্‌নি কিন্তু !...বয়ে গেছে আমার ! খালি মিথ্যে কথা—*

দু'হাতে বুড়ো আঙ্গুল দুটো জড় করে' দেখালে।...

রেল লাইনের লাগোয়া যে পাকা রাস্তা চলে গেচে, তার ওপর দিয়ে লোকজন দল বেঁধে' মাথায়, কাঁধে, ঘাড়ে মোট নিয়ে হাট ফিরতি বাড়ীমুখো চ'লেচে।...নবপরিণীতা গৌরিরা বাপের বাড়ীতে এসে ধিঙ্গী হ'য়েচে বলে' ছোট ভাই-এর হাত ধরে' প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে চ'লেচে। মাথার বোঝাটা কখন নামিয়ে রেখে' ছোট ছোট খাদের পাশে চুনোপুঁটীর আশায় যে সব বক ধর্ম্মসাধনায় গভীর মন দিয়েছে, তাদের লক্ষ্য করে' ঢিল ছুঁড়চে; কখনবা হাততালি দিয়ে সামনের বটগাছের উপর শকুন সমাজের জরুরী সভার ব্যাঘাত ঘটাচ্চে। গাড়ী দেখে তারা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ডাগর ডাগর চোখগুলোকে গাড়ীর অভ্যন্তরের যাত্রীদের মুখের উপর মেলে ধরে' রইল। বিস্ময়ের আর সীমা পরিসীমা নেই—গাড়ীচড়া এদের কাছে এমনি জিনিস্!

চণ্ডী নিজের গৌরবে আত্মহারা। ক্রমাগত হাতছানি দিয়ে ওদের ডাকে—ইচ্ছেটা, ওদের হাত বাড়িয়ে তুলে নিবে। তাদের এক যায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে' বিড়বিড় করে—বুড়ো আঙ্গুল দেখায়।

বিস্মিত ছেলেমেয়েগুলোকে আরো বিস্মিত করে' গাড়ী এগিয়ে চলেছে। আশপাশের শব্দ দৃশ্যে আজ আমার মন কিছুতে বস্‌চে না। বাঁ-হাতের নেড়া মাঠটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছি, আর চণ্ডীর কথা ভাবচি।

চোখ মুঁছে মুঁছে আর পারি না—কেবলি চোখ বাষ্পাকুল হ'য়ে আসে।...চোখের সামনে দেখতে পাই ঐ ফুটিফাটা মাঠটার ওপর দাঁড়িয়ে রোদ্দুরে কাঠ-ফাটা হয়ে আট ন' বছরের অনেকগুলো ছেলে যেন এক সঙ্গে হাত বাড়িয়ে আছে।—তাদের মুখে রা নেই, চোখে বয়সোচিত জ্যোতি নেই, মুখে বালকসুলভ চপলতার কোন চিহ্নই নেই। সব কটাই ধুঁকচে। হঠাৎ দেখি,—তাদের গায়ের মাংস আর ছালগুলো কোথায় উড়ে গেছে—শুধু অস্থিগুলো হাতধরা-ধবি করে' নাচ্‌চে—কখন বা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠচে। কী ভাব তাদের মনে জাগলো কে জানে, আস্তে তারা মাঠ পেরিয়ে রাস্তার উপর উঠে এল, তারপর সবাই একসঙ্গে ছুটে চলন্ত গাড়ীটার পা-দানির ওপর ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের কান্নায় জড় নবগ্রহও যেন মুখরিত হ'য়ে উঠলো।

চণ্ডীর গা-ঠেলার চোটে মনের আচ্ছন্ন ভাব কেটে গেল। আমার দিকে চেয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে চণ্ডী বল্‌লে,—দেখ না দাদা, টিকিটবাবু নেবে যেতে বলচে! তাড়াতাড়ি টিকেটবাবুকে দু'খানা টিকেট দেখিয়ে দিলুম্। তিনি এরকমটা আশা করেন নি। সই করতে করতে গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লেন,—কেন মশায় মিথ্যে নিয়ে যাচ্চেন! উড়ো পাখী কী খাঁচায় ধরে রাখতে পারেন, না, ও আপনার কোন কাজে আসবে? দিন কতক থাকবে'খন—পেটমোটা হ'লে আবার উড়বে মশায়!

টিকেট দু'টো পকেটে পুরতে পুরতে চণ্ডীর দিকে চেয়ে বল্‌লুম্—দেখা যাক না চেষ্টা করে—পথে শেষটা প্রাণ হারাবে!

ভদ্দর লোক আগ্রহ সহকারে বল্লেন,—পথে ঘোরাইতো ওদের অভ্যেস্ মশায়!—পথে-পড়া ছাড়া ওদের যে আর গতি নেই।

বেশী বাক্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন বোধ করলুম না। চণ্ডীর মত ছেলেদের যারা পথ থেকে কুড়িয়ে এনে কাজে লাগাতে পারে না তারা যে সেই পথিক-শিশুদের পরিনতি পথে পড়ে'-মরা, এছাড়া আর কী নির্দ্দেশ করবে!

হেসে চণ্ডীকে জিগ্যেস করলুম,—কিরে চণ্ডী পালাবি নাকি? টিকেট বাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় চণ্ডী কী বুঝেছিল সেই জানে, তাঁর দিকে ফিরে একগাল হেসে' কলা দেখিয়ে বল্লে,—কচু!

টিকেটবাবু গজ গজ করতে করতে নেবে গেলেনঃ—দেখ্‌বেন মশায়, গরীবের কথা বাসি হ'লে ফলবে! ওরা কখন বশ হয়, না, কোনো কাজে আসে?—ভোগ আছে, কোরে নিন!—

চণ্ডী হঠাৎ কী ভেবে বল্লে,—বাবার মতো ইজের দিলে নোবো।

তার পরিহিত ছেঁড়া পাঞ্জাবীটা দেখিয়ে বল্লুম, কী, ঐ রকম নিবি—বেশ সুন্দর তো! তোর বাবা দিয়েচে? চণ্ডী নাক মুখ সিঁটকে বল্লে,—হুঁ তার আর বলতে হয় না মশাই—বাবা দিয়েচে! এর চেয়ে সুন্দর সুন্দর এনে দেয়।

বল্লুম,—দেয় তো পরিস্‌নি কেন? মিথ্যুক কোথাকার!

কাঁচুমাচু হ'য়ে বল্লে,—খারাপ-মা যে পরতে দেয় না! বলে, কী হ'বে ওকে দিয়ে—আঁক কুটে-ছিঁড়ে ফেলবে!

ছেলেকে ভাল কাপড় জামা পরাবার ইচ্ছে যে সব মায়ের আছে, তারা ছেলের আঁককুটে পনার দিকে নজর রাখে কিনা, আমার জানা ছিল না। মনে মনে ব্যাপারটাকে আন্দাজ করে' চুপ করে' রইলুম।.........

* * * *

সন্ধ্যে হয়-হয় দেশের ষ্টেশনে গাড়ী এসে থামলো। চণ্ডী ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঠেলা দিতে আঁ আঁ করে' উঠলো। চোখের জড়তা তখন কাটেনি, আমার দিকে চেয়ে কাঁদতে লাগলোঃ—ওগো বাবাগো! আমি আর কোরবো না গো—তোমার দু'টী পায়ে পড়ি! জোরে ঠেলা দিয়ে বল্লুম,—চণ্ডী আমিরে আমি! চোখ দু'টোকে দু'হাত দিয়ে ক'চলে নিয়ে ফিক করে' হেসে উঠলো. জিগ্যেস্ করলুম,—অমন কোরছিলি কেন রে?

—খারাপ-মা লাগিয়েচে, তাইতে বাবা মারছিলযে!—

হাত ধরে' গাড়ী থেকে নামাতে বল্লুম,—দূর বোকা কোথাকার! তোর বাবা এখানে কোথায়?

বোকামি ধরা পড়েচে দেখে' চণ্ডী মাথা নিচু করে' আমার পেছন পেছন চলল।

ভাবছিলুম, চণ্ডীর ওপর দিয়ে তার বাপের এবং তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের কতখানি প্রহার পরীক্ষা চলে ছিল, যার ফলে বেচারাকে পথের বার হ'তে হয়েচে? আরো ভাবছিলুম, খারাপ-মার মধ্যে

ও সবটুকুই খারাপ দেখতে পেয়েচে, কিন্তু বাপের মধ্যে ভালোটাকেই দেখতে পেয়েচে। শিশু প্রকৃতির ভাল-মন্দ বাদবিচার জ্ঞান অদ্ভুত !...

পথে চলতে চলতে পরিচিত অনেকের সঙ্গে দেখা হ'লো। সুখবর তারা অনেক আগেই পেয়েচে, বিশ্রী ভাবে একগাল হেসে জিগ্যেস করে,—খাওয়াচ্চেন কবে? হঠাৎ চণ্ডীর দিকে নজর পড়তে: সঙ্গের ওটী আবার কে? পরিচয় শুনে প্রথমটা আকাশ থেকে পড়বার যোগাড় করলে, তারপর লোলুপদৃষ্টিতে চণ্ডীকে দেখে নিয়ে বলে,—মন্দ কি! ফাইফরমাজটা খাটতে পারবে। তবে চোর না হয় !

আশ্চর্য্য! সবার মুখেই এক কথা। কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেটাকে খাটিয়ে নিতে চায় সবাই। কেউ কেউ আবার উপদেশও দেয়: খুব শাসনে রাখবেন্—আলগা দিলেই বিগড়বে। কথায় আছে, কুকুরকে নেই দিলে মাথায় ওঠে, ইত্যাদি।

এ সব কথার আর কী উত্তর দেব! এক ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসা ছাড়া অন্য উপায় নেই। ভাবি, এদের কী ছেলেপুলে নেই! এদের কারো মনে কী দয়ামায়ার ছিঁটে ফোঁটা নেই!...

নাঃ, চণ্ডীর সঙ্গে পেরে ওঠাই দায়! পথে খালি দাঁড়ায়—হাতের কাছে যা' পায় তাই দিয়ে ঘুঘু-বক ছাতা শালিককে উত্যক্ত করে' মারে। মাঝে মাঝে আবার পিছু ডেকে শোনান চাই উঃ, বক গেলো! একেবারে রগ ঘেঁসে—আর একটু হ'লে বাছাধনকে আর বাসায় ফিরতে হ'তো না।

বলি—ফিরলেও বাছাধন এতোক্ষণে বাসায় অক্কা পেয়েচে নিশ্চয়ই।

চণ্ডী ঠাট্টা বোঝে—কথার জবাব দেয় না। গৃহগতপ্রাণ পক্ষী শিকারে সে মহাব্যস্ত।

হঠাৎ পেছন ফিরে দেখি, চণ্ডী নেই। বুকটা ছ্যাঁৎ করে' উঠলো—কেমন যেন খালি খালি মনে হলো।

চণ্ডী আমার বুকের এতোখানি জুড়েছিল। বাইশ বছরের যুবকের পক্ষে এরকমটা অস্বাভাবিক কিন্তু ভুল্‌লে চলবে না, আমরা সবাই বাপ হবার ধাত নিয়ে যে জন্মেচি! চীৎকার করে' উঠলুম,—চণ্ডী—চণ্ডী—চণ্ডী! আশপাশের সন্ধ্যা-গম্ভীর আমবাগান, নারকেল বাগান, কাঁটা বঁইচবন প্রতিধ্বনিত হলো। তারাও যেন আমার মত সর্ব্বহারা কণ্ঠে বলে' উঠলো: চণ্ডী—চণ্ডী—চণ্ডী।

প্রায় মিনিট তিন কেটে গেল—কী করবো, না করবো ভেবে পাচ্ছি না। ডান দিকের চৌধুরী বাগানের ভেতর থেকে শব্দ এলো: ওরে ব্যস্—আর একটু হলেই—খুব বেঁচে গেচি! আস্তিক মুনির মাতা তুমি গো মনসাদেবী, তোমারে প্রণাম করি।

সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডী বেরিয়ে এলো—মাথায় তখন হাত ঠেকান আছে। রেগে জিগ্যেস করলুম: কোথায় গেছ্‌লি হতোভাগা? ডেকে ডেকে গলা ভেঙে গেল। কাছে আয় শিগ্‌গীর...ফের দাঁড়িয়ে রইলি!

আপনার স্বরে আপনি চমকে উঠলুম এত' বাইশ বছরের যুবকের স্বর নয়, এযে উদ্বিগ্ন ছেলের বাপের স্নেহমাখা শাসনের স্বর।

চণ্ডী দস্তুর মত ভয় পেয়ে গেচে। চোরের মতো গুটি গুটি এগিয়ে এলো। তার হাতটা ধরে নাড়া দিয়ে হাস্‌তে সেও ফিক কোরে হেসে ফেল্‌লে। তারপর পিঠে হাত বুলতে বুলতে জিগ্যেস্ করলুম, ও বাগানের ভিতর গেছলি কেন রে? চণ্ডী সোৎসাহে হাত পা নেড়ে' চোখমুখ ঘুরিয়ে বল্‌লে : শালা বকটা কী পাজি—ম'রেও মরে না। ইয়া এক ঢেলা পিঠে ঝাড়লুম—ঢপ করে' উঠলো—বেটা কাত্‌রাতে কাত্‌রাতে ঐ বাগানের দিকে দৌড় মারলে। ব্যস্, তারপরে আর দেখা নেই,—ওঃ আর একটু হ'লে লতায় কাটতো আর কি!

পাজি বকটাই বটে—মরেও মরে না, প্রাণ-ভয়ে পালায়। শুধু বল্‌লুম,—কী হতো বলদিকি সাপে যদি ছোবল দিতো? ফের সেই স্বর। কানে কেমন বেখাপ্পা লাগ্‌লো। তবু এড়াতে পারিনে, অজ্ঞাতে বেরিয়ে পড়ে।

চণ্ডী ঠোঁট উল্টে জবাব দিলে হুঁ; কামড়াতে আর হয় না। মা মনসাকে ব'লে দেবো—টেরটা পাবে তখন।

বল্‌লুম, তা'হোক, তুই আর ওবনে ঢুকিস্‌নি যেন।...ভূত আছে—এই এতো লম্বা তাদের হাত, ইয়া ইয়া মুলোর মত দাঁত।—কন্ধকাটা ভূত জানিস্? পুট করে' ঘাড় ভেঙে দেবে—খবরদার যাস্‌নি যেন!

চণ্ডী আমার কাছ ঘেঁসে সরে এল। বুঝলুম্, ভয় পেয়েচে। মনে মনে আরাম বোধ করলুম। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে সে একটা কথাও কইলে না। হঠাৎ একবার বলে' উঠলো : বেটা ঠিক ম'রেচে...এসান তাগ করে' ঝেড়েচি যে!—চল না দু'জনে দেখে আসি!

কোন রকম উৎসাহ প্রকাশ না করে' গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লুম,—কাল তার বাসা থেকে নিয়ে আসিস্। এই ভর সন্ধ্যে বেলায় কে ওখানে যায়? ভূত আছে না!

চণ্ডী চুপ করে' একেবারে কোলের ভেতর।...

সদর ঘরে বাবা বসেছিলেন। বোধ করি, আমার সম্বন্ধেই আলোচনা চল্‌ছিল। শুন্‌তে পেলুম,—নায়েব মশায়ের শ্বশুর শিবনাথ চাপা অথচ পরিষ্কারকণ্ঠে বল্‌চে : আর অমত করবেন না কর্ত্তা! এই আষাঢ়েই—। জষ্টিমাসে তো আর হ'তে পারে না, জেষ্ঠ ছেলে! আহা মেয়ে নয়, যেন দুগ্‌গি পিরতিমে—খাসা নাক চোখ! আর চুল! তাও কী কম, একেবারে হাঁটু পর্য্যন্ত—দু'হাত দিয়ে ধরা যায় না!...যেমনি আঁটসাঁট চেহারা, তেমনি রঙ্ যেন ফেটে পড়চে। কি হে মধুসূদন! তুমিও তো দেখেচ—বল না এতে বাড়িয়ে বলার কিছু আছে কী?...শিবনাথ সে শর্ম্মাই নয়!

মধুসূদন চোখ মুদে নিবিষ্টমনে তামাক টান্‌ছিল—চোখ না খুলেই জবাব দিলে : তা শিবু-খুড়ো যা ব'লেচে...আহা খাসা! যেন পটে আঁকা ছবি!

বাবা শুধু বল্‌লেন,—দেখি সে আসুক।—আজকালকার ছেলে, মতামত তো আছে!

হঠাৎ আমায় ঘরে প্রবেশ করতে দেখে শিবনাথের উদ্গত কথাটা মুখেই মিলিয়ে গেল। অন্য কথা পাড়ল: এই যে! আসুন আসুন, আপনার কথাই হচ্ছিল...খোকাবাবু আমাদের কম ছেলে! ঐ তোমার ওবাড়ীর খুড়ো, পাঁচ পাঁচবার একটা পাশ দিতে পারলে না, আর আমাদের খোকাবাবু কিনা—

আজ নিজের গৌরবের দিকে তত ঝোঁক নেই। এদের প্রশংসায় আমার কিছু যায় আসে না, যে ছেলেটী পাশে দাঁড়িয়ে, সে-ই আমার আমিত্বটুকু সব ছেয়ে ফেলেচে—ওকে বাদ দিয়ে আমার কিছু নেই। বাবাকে গড় করতে, চণ্ডীও দেখাদেখি গড় করলে।

বাবা জিগ্যেস করলেন,—এ'টি কে?

বল্লুম,—কুড়িয়ে পেয়েচি। ষ্টেশনে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছিল, তাই নিয়ে এলুম।

বাবা বল্‌লেন,—তা' বেশ করেচিস্।

শিবনাথ মুখিয়েছিল। চোখ কপালে তুলে' বল্‌লে,—বেশ কী কর্ত্তা? রামঃ, রামঃ ও সব জঞ্জাল ঘরে ঢোকাতে আছে! ডানা গজালেই ফুড়ৎ—

মধুসূদনের তামাক পুড়ে চোঁয়া গন্ধ বেরিয়েছে—তবুও তাতে সুখটান দিচ্ছিল। চোখ বুজিয়েই বল্‌লে,—কর্ত্তাকে সেই চাষী আর সাপের গল্পটা করনা হে—দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষলে, শেষ পর্য্যন্ত ফোঁস্ না করে!

বাবা বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লেন,—আহা, তোমরা থামো না হে!

নিজেকে আর সামলাতে পারছিলুম না। সবাই গায়ে পড়ে নাবালক ছেলেটীর অতীত বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উপদেশ দেয়। পথে-পড়া ছেলেটার সঙ্গে সাপের তুলনা করে,—মানুষ হ'য়ে মানুষকে এতো ছোট করে' দেখে কী করে'? একটা কথা বার বার মনে হচ্ছিল: এরা সবাই আপনাপন খোলোমীকে ঢাকবার জন্যে এই শিশুটার সম্বন্ধে এতো উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেচে। রাগে সর্ব্বশরীর রী রী করে' উঠল,—ইচ্ছে করছিল, সবাইকে চাব্‌কে ঘরের বার করে' দেই।

চণ্ডী চোরের মত পাশ ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল! বোধ হয়, এদের সব কথা-ই বুঝ্‌তে পেরেচে,—তাই, নির্ব্বাক বিস্ময়ে এদের মুখের দিকে চেয়ে আছে। হাত ধরে বল্লুম,—আয়, ভেতরে আয়। যেতে যেতে শুনলুম, শিবনাথ হে-হে করে' বল্‌চে: খোকাবাবু আমাদের যেমন পাগল!

মা তো পরিচয় শুনে আঁৎকে উঠ্‌লেন: আহা বাছারে, মরে' যাই!— আচ্ছা বাপ-মা!! বলে' চণ্ডীর হাত ধরে কোলের কাছে টেনে নিলেন— আস্তে আস্তে মাথায় গায়ে হাত বুলতে লাগলেন। দেখি, মুখর চণ্ডী বোবা হ'য়ে গেচে...বিস্ময়ভরা চোখে তার জল এসে গেচে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। তার দেখা দেখি আমারও চোখটা ভিজে গেল।

এতক্ষণে এই প্রথম স্নেহ-সম্ভাষণ শুনে' চণ্ডী লজ্জায় ঘাড় তুল্‌তে পারছিল না। মা জোর করে' তার চিবুক ধরে' তুলে চোখ মুছিয়ে দিলেন। তবু চণ্ডীর ঘাড় ঠিক থাকে না,—নুয়ে পড়ে। স্নেহের ভার এমনি জিনিস্, মাথা তুলে যাচাই করে' নিতে হয় না—এতটুকু দুধের ছেলেটাও তার মাহাত্ম্য বোঝে।

সামনে সিন্দুর মাকে দেখতে পেয়ে মা বল্‌লেন,—ইলাকে ডেকে দাও তো। ইলা অর্থাৎ আমার পিস্‌তুতো বৌদি। বৌদি আস্‌তে মা বল্‌লেন,—দেখ দেখি, এর জন্যে কাপড় জামা কিছু পাও নাকি।

বৌদি ঠাক্‌রুণ নড়েন না—আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে হেসে বল্‌লে,—ছেলেটী কে মাসিমা ?

চণ্ডীর মাথায় হাত বুলতে বুলতে মা বল্‌লেন,— খোকা কুড়িয়ে এনেচে।...আহা, বাছার মুখ শুকিয়ে গেছে !— কিছু খাবারও এনো বৌমা।

বৌদি ত্বরিৎ পদে যেতে যেতে মুখ ফিরে বল্‌লে,—ঠাকুরপোর ছেলে ! ডুবে ডুবে—। —দেখ মা, ভাল হ'বে না বলচি ! ডুবে ডুবে কী, তাই বলনা।...তোমার আমি কী করি দেখনা—পিছু পিছু ছুট্‌লাম।...

ভাঁড়ার ঘরে বৌদি পান সাজ্‌ছিল। আমি তার মুখোমুখি হ'য়ে তক্তাপোষের ওপর বসে' গল্প করছিলুম। চণ্ডীচরণ পাশে আছে।

বৌদি বল্‌লে,— গাছে না উঠতে এক কাঁদি !

কথাটা বুঝতে না-পেরে বল্‌লুম, তার মানে ?

চণ্ডীকে দেখিয়ে বল্‌লে, ঐ। তারপর চণ্ডীকে জিগ্যেস্ করলে হ্যাঁরে, এ বাবু তোর কে রে ?

চণ্ডীচরণ অম্লান বদনে বল্‌লে,— বাবা।

লজ্জায় লাল হ'য়ে গেলুম। ধমক দিয়ে বল্‌লুম,— দূর হতভাগা ! বাবা নয়রে, দাদা, বার বার বলচি, তবু মনে থাকেনা তোর ! আচ্ছা বোকা তো তুই !

বৌদি ঠোঁট টিপে হাসি চেপে বল্‌লে,— আর চাপাচুপি কেন, বাবাকে কেউ কী কখন দাদা বল্‌তে পারে ? ছেলে তো আর ময়না নয়।

আচ্ছা করে' চুল টেনে ধরে' বল্‌লুম,— দেখ, গাড়োয়ানি ইয়ার্কি ক'রোনা বলচি !— চুল ছিঁড়ে দুর্ব্বাঘাস বানাব তা' হ'লে—

—উঁ হুঁ, ছাড় ছাড় ঠাকুরপো, বড্ড লাগচে !— বলে' হাত ছাড়াতে চেষ্টা করলে।

চণ্ডী মজা পেয়েচে—খিল খিল করে' হেসে উঠলো। বল্‌লে,—উনি-ই তো আমায় বাবা বল্‌তে শিখিয়ে দিয়েছিলেন !— বলে, জিগ্যেস্ করলে বলবি, বাবা।

ওঃ শয়তান!— আর বলবে?— জোর করে' চুল টেনে ধরলুম।

—না, না, না! ছাড় লক্ষ্মীটি।

ছাড়ান পেয়ে বল্‌লে,— আমি মামীমার কাছে যাচ্চি,— আমার গায়ে হাত দেওয়া তোমার বার কর'চি!— মানে আমি তোমার বড় নয়?

—কচু! যাও না মার কাছে। গুণের কথা বলবো'খন—

চণ্ডীচরণ সেই যে হাসি আরম্ভ ক'রেচে থামাতে চায় না। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ভঙ্গিমা করে' বলে উঠলো: একটা পান দাও না সোনা বৌদি!

বৌদি তাড়া দিয়ে বল্‌লে: পান দেবো—না, হাতি! পাজি—

চণ্ডী ছোট হ'লে কী হয়, তাড়ার মধ্যে কতটুকু ঝাঁজ আছে আন্দাজ করে' নেয়—মুখটিপে হাসে।

বল্‌লুম,— বৌদি, ওকে নাওনা— ছেলেপুলে নেই মানুষ কর না।

বৌদি নির্লিপ্তের ভান করে' বল্‌লে: না বাবা, কাজ কী পরের ধনে! সহসা গম্ভীর হ'য়ে: তার ওপর কী জাত, কে জানে!

চণ্ডীর জাতের কথা এক সময় উঠবে, তা আমার জানা ছিল। তাড়া দিয়ে উড়িয়ে দেবার ছলে বললুম,— দূর মুখ্‌খু! ছোট ছেলের আবার জাত আছে?...তা' ছাড়া তোমাদের এই বোস বংশে অমন সুন্দর একটা ছেলে বার কর দিকি!

খানিক নীরব থেকে মুখ তুলে বল্‌লে,— আমায় দেবে সত্যি?

দেখলুম, বৌদির চোখমুখ চক্‌চকে হ'য়ে উঠেচে— তাতে একটা স্বর্গীয় আভা—ভেজা ভেজা ভাব।

চণ্ডীকে বল্‌লুম,— বৌদির কাছে থাক্‌বি? তোর মা হ'বে।

মাথা নেড়ে চোখ পাকিয়ে চণ্ডী বল্‌লে,— খারাপ মা! পান দেয় না যে—

হাতের পানটা বাড়িয়ে দিয়ে বৌদি বল্‌লে,— এই নে পান—মা বল।

টপ করে' পানটাকে ছিনিয়ে নিয়ে গালে পুরে চণ্ডী বল্‌লে,—ম্‌-অ—আ-আ— বৌদি ঔৎসুক ভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

বৌদির মুখ দেখে চণ্ডীর খারাপ মার কথা মনে পড়ে গেল। —আমার মা-বৌদির সঙ্গে তার কী তফাৎ! মেয়েদের মধ্যে রাক্ষসী দেবীর কী বিচিত্র সমাবেশ!

সকালে এক হুলুস্থূল কাণ্ড! বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুন্‌তে পেলুম, একপাল ছেলে নামতা পড়ার মত সুর করে' চীৎকার ক'রচে:—

বিছানায় মুতোর ঘর কৈ?
তালগাছটা ঐ—ঐ—ঐ!

তাদের সুর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। হাততালি, নাচুনি-কুদনিও আছে। ব্যাপার দেখতে বারান্দায় বেরিয়ে এলুম। দেখি, পাড়ার ছোট-বড় মাঝারি যত ছেলে ছিল সব ঝেঁটিয়ে আমাদের উঠানে জড় হ'য়ে দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা ক'রেচে আর সেই ব্যূহের কেন্দ্রস্থিত ব্যক্তিটী আর কেউ নয়, আমারই চণ্ডীচরণ। বুঝলুম, চণ্ডীচরণকে লক্ষ্য ক'রেই উপরি উক্ত শ্লোক-বাণটি নিক্ষেপ করা হ'চ্চে। বেচারা চণ্ডী দাঁত খিঁচিয়ে, হাত-পা ছুঁড়ে, চাঁই ইট তুলে তাদের খেদাবার চেষ্টা করচে; ব্যূহ রচনাকারী বালকবৃন্দ কখন পিছিয়ে যায়, কখন জোরে হাততালি দিতে দিতে চণ্ডীর কোলের কাছে এগিয়ে আসে। চণ্ডীচরণ নিষ্ফল আক্রোশে গর্জ্জাতে থাকে: শালাদের এমনি ইট ফিঁকিয়ে ঝাড়বো! টেরটা পাবে, হুঁ—

হাতের ইট হাতেই থাকে, ছোঁড়া হয় না—কেবল মুখভঙ্গি বেড়ে যায়।

চণ্ডীচরণ রাতে বিছানায় অপকর্ম্ম করে' ফেলেছিল। এ খবরটা এত তাড়াতাড়ি যে কী করে' বালক-সমাজের মধ্যে প্রচারিত হ'য়েচে, ভেবে পেলুম না। আঁচ করলুম, বৌদি ঠাকরুণের কাজ।

চণ্ডীর অবস্থা ক্রমশঃ করুণ হ'য়ে আস্‌চে। হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়ে কেঁদে ফেল্‌লে— দেখ না, দাদা! এরা আমায় খ্যাপাচ্চে। ছেলের দল যে যার সরে পড়লো। চণ্ডীর মুখে হাসি ফুটেচে। এতো চেষ্টায় যাদের খ্যাদাতে পারে নি, কেবলমাত্র আমার এক চাহনিতেই তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে দেখে চণ্ডীর আনন্দের সীমা নেই। উঠানের ওপর দাঁড়িয়ে নাচতে সুরু করে দিল: দুয়ো, হেরে গেল কুকুরগুলো। আবার বাহাদুরি করে তাদের পেছন পেছন খানিকটা ছুটে গিয়ে খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে। শত্রু পরাস্ত করার আনন্দ এমনি।

বৌদি সবেমাত্র খিড়কীর ঘাট থেকে ভিজে কাপড়ে ফিরছিলেন। চণ্ডী তো তাঁকে দেখে পেছন পেছন ছুটে গেল। হাতটা বাড়িয়ে বলে: দিই ছুঁয়ে—এবার? হুঁ, আবার ওদের বলে দেওয়া হয়েচে!—দিলুম বলে!

বৌদি যথাসম্ভব স্পর্শ বাঁচিয়ে আড়ষ্ট হয়ে বল্‌লে,—আরে আমি কেন বল্‌তে যাবো? তুই তো আচ্ছা বোকা—লক্ষ্মীটি ছুঁস্‌নি—

চণ্ডী চোখ পাকিয়ে বলে উঠলো,—না, উনি আর বলেন নি! তবে ওরা জানলে কী করে? এই দিলুম ছুঁয়ে!

বৌদিঠাকরুণ আকাশ থেকে পড়বার যোগাড় করলেন: ওমা, কোথায় যাবো গো! আমি না বল্‌লে ওরা আর জান্‌তে পারে না?...নিশ্চয়ই সিতুর মা বলে দিয়েচে—

উঠানে আবার আর এক অভিনয় আরম্ভ হয়েছে।

বারান্দা থেকে হাস্‌তে হাস্‌তে চেঁচিয়ে বল্‌লুম, দেনা রে চণ্ডী ছুঁয়ে—উনিই বলে দিয়েছিলেন।

চণ্ডীও মজা করতে পারে—বৌদির মাথার কাছে হাত নিয়ে যায়, কিন্তু ছোঁয় না। বৌদি চালাকি করবার চেষ্টা করেঃ আচ্ছা, ডাক সিতুর মাকে,—সে যদি না বলে,—তখন তার কথা।

চণ্ডী মাথা নেড়ে বলে,—হুঁ, আমি ডাকতে যাই, আর উনি অমনি সরে পড়ুন! এই দিলুম বলে—

শেষে ওদের মধ্যে কী রফা হয়ে গেল, বৌদি ছাড়ান পেল, চণ্ডী তার পেছন পেছন চল্‌ল।

বারান্দাটা পূবদিকে। লাল-সূর্য্যের কিরণজালে আমার মুখ চোখ ভরে গেল। মুখ তুলে সেই কিরণ-জালের প্রখরতা উপলব্ধি করচি। সূর্য্যের কিরণে যে এমন একটা হাসি-সুখী করা ক্ষমতা আছে, এর আগে অনুভব করি নি। চেয়ে দেখলুম, সামনের নারকেল গাছের পাতায় রোদ্দুর পড়ে চিক্ চিক্ করচে; জামগাছের পাতাগুলোয় কে যেন রূপো গলিয়ে ঢেলে দিয়েচে। ও বাড়ীর নতুন বৌদি এলোচুলে ছাদে কাপড় মেলে দিচ্চে তার সারা অঙ্গে সূর্য্যকিরণ ঠিক্‌রে পড়েচে—মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখে-পিঠে-পড়া চুলের আগাগুলো চিক চিক্ করে উঠচে।

একদৃষ্টে এই আলোর মেলায় চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে কেমন যেন নেশা লেগে গেল। জানি না, আমার কী হলো,—স্পষ্ট দেখতে পেলুম: সেই কিরণমালার মধ্যে অগণিত শিশুমুখ—তারা সবাই হাস্‌চে। যে দিকে চাই, দেখি, শিশুমুখ—নারকেল গাছের মাথায়, জামগাছের পাতায় পাতায়, রবিকরোজ্জ্বল নভোমণ্ডলে, মাটির বুকে যেখানে সেখানে হাসিধরা মুখ তারা সবাই-ই ছোট ছোট হাত বাড়িয়ে কেবল ডাকে।

আলোর ঝরণায় হাসির মেলায় তন্ময় হয়ে আছি। এইসব দেবশিশুদের হাসি আমায় যেন ক্রমশঃ দেবলোকের ঊর্দ্ধে আর এক কোন লোকে নিয়ে যাচ্চে।

চণ্ডী কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েচে—হাত ধরে টানচে; এতো ডাকচি, শুনতে পাওনা বুঝি!—সোনা বৌদি খ্যাপায় যে—

—আচ্ছা, চল্‌তো দেখি—দিচ্চি ঢিট করে'।—

চণ্ডীচরণ মহা খুসী হ'য়ে পেছন পেছন চল্‌ল।

সৌরভ

নলিনী সেন

তুমি কি দেখেছ প্রিয় ভরা দুপুরে
ছায়াঘন আমবন কী খেলা করে!
সারাদিন ধরে তার কী কানাকানি—
চঞ্চল বাতাসে মরমরানি
মৌমাছি মধু লোভে ঘুরিয়া মরে—
গুঞ্জরে আলসে কেমন সুরে—
ভরা দুপুরে!

মায়াভরা—যেন কার অঞ্চল ছায়
স্নিগ্ধ সে পরশনে আঁখি মুদে যায়
বাজে মঞ্জীর কার চঞ্চল পায়
উন্মনা মনখানি কোথা নিয়ে যায়
ঝিল্লী ঝনকিত ভরা দুপুরে
কী সুর ঝরে!

আজো তো যাওনি প্রিয় সে কথা ভুলে
একপাশে দিঘীটির কাজল জলে
চঞ্চল সমীরণ কী ঢেউ তোলে!
সারাদিন ছল্‌ছল্‌ নৃত্যপরা,
সারাদিন কল্‌কল্‌ গীতি মুখরা,
সারাবেলা কম্পন কোন্‌ হরষে
প্রিয় পরশে!

তারি জলে দেখে মুখ পূর্ণশশী
শত চাঁদ হয়ে দোলে সারাটী নিশি
গোধূলি আঁকিয়া দেয় অরূপ লেখা
শেষ ছোঁওয়া রেখে যায় শুক্ তারকা
বনফুল সৌরভ লুটে আবেশে
সিক্ত ঘাসে !

এঁকে তো রেখেছ প্রিয় মনের পাতে
রাঙা পথখানি গেছে কোন্ দূরেতে !
রাখাল মাঠের সুরে বাজায়ে বাঁশী
ছড়াইয়া চলে যায় উছল হাসি,
দিগন্তে হয়েচে হারা যে পথ রেখা—
আছে তো আঁকা !

সেখানে দাঁড়ানু যবে দিনের শেষে
অসীমের ছোঁয়া লাগে এক নিমেষে !
আকাশ কহিল কোন্ গোপন কথা
অমৃত লোকের এল কোন্ বারতা,
বুঝিরে মিলাল চির কামনার ধন—
জীবন স্বপন !

ভারতীয় পাশ্চাত্য বাণিজ্যের একটি যুগ

সুরমা মিত্র

আমাদের দেশে প্রাচীন সময়ের ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতির কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। দর্শন সাহিত্য বিষয়ক পুস্তক অনেক বিনষ্ট হইলেও যাহা পাওয়া যায় তাহার সংখ্যা বড় কম নহে। তাহারা ভারতীয় জীবনের অধ্যাত্ম চিন্তা, জ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতির সাক্ষ্য দেয়, চাণক্য কৌটিল্য প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয়ের বিবরণও পাওয়া যায় কিন্তু প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য সম্পদ্ সম্বন্ধে কোনও গ্রন্থ পাই না। তবে বিদেশীয়ের লিখিত 'ভারতমহাসাগরে পরিভ্রমণ' (The Periplus of the Erythraen Sea) নামে গ্রন্থ হইতে এই বিষয়ের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এই জাতীয় Marcopolo, Columbus প্রভৃতির বিবরণ কিছু কিছু পাওয়া যায় বটে তবে সেগুলি ভারতসম্বন্ধীয় নহে। Periplus অর্থ পরিভ্রমণ বা ঘোরা, Erythraen Sea ভারত-মহাসাগরকে বুঝায় অতএব Periplus of the Erythraen Sea অর্থ ভারতমহাসাগর পরিভ্রমণ। সুতরাং ভারতবর্ষের উপকূলে ও আরবদেশে এবং আফ্রিকাতে কোন্ জাতীয় দ্রব্যের বা কিসের বাণিজ্য করিবার জন্য বিদেশীয় ও ভারতীয় বণিকদের মহাসাগরে যাতায়াত চলিত তাহার বিবরণ পাওয়া যায়। ভারতমহাসাগরকে কেন Erythraen sea বলা হয় সে বিষয়ে একটি পারসীক আখ্যান আছে। ইরিথ্রাস (Erythras) নামে একজন প্রবল পরাক্রম ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন। সমুদ্রের নিকটেই তিনি থাকিতেন ; তাঁহার গৃহের নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহ তখন অরণ্যসঙ্কুল ছিল। তিনি কখনও কখনও সমুদ্রের তীরে বেড়াইতে যাইতেন। একসময়ে কয়েকটি সিংহ তাঁহার ঘোটকীদের আক্রমণ করে, তাহাতে কয়েকটি নিহত হয় ও কয়েকটি সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়ে ও সম্মুখের দ্বীপে গিয়া উপস্থিত হয়। ইরিথ্রাসও তাহাদের সন্ধানে একটি কাঠের তক্তামাত্র সহায় করিয়া সেখানে উপস্থিত হন ও এই স্থানটি তাঁহার ভাল লাগাতে তিনি ক্রমে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেন ও নিকটস্থ অরণ্যসঙ্কুল স্থানগুলিকে তিনি সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন। সেইজন্য তাঁহার ক্রমানুসারে সেই বিস্তীর্ণ বিশাল সমুদ্রের নাম হয় ইরিথ্রিয়াস সমুদ্র এবং ইহাদ্বারা ভারতমহাসাগর হইতে লোহিতসাগর পর্য্যন্ত বুঝাইত। গ্রীকভাষায় ইরিথ্রাস শব্দের অর্থ লোহিতবর্ণ, ইহা হইতেই বোধ হয় লোহিত-সাগর (Red sea) এই বিশেষ আখ্যার প্রচলন হয়। গল্পটির ঐতিহাসিক সত্যতা যাহাই হউক না কেন পারস্য উপসাগরের নিকট হইতে আরবদেশে ও তাহার পশ্চিমে লোহিতসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত যে উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল এইটুকু অন্ততঃ গ্রহণ করা যায় ও লোহিতসাগরের জল লোহিতবর্ণ না হইয়াও কেন লোহিত আখ্যা পাইয়াছিল তাহারও একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

Periplus পুস্তকটি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে (60 A. D.) লেখা। ইহার বিবরণ হইতে মনে হয় লেখক জাতিতে গ্রীক ছিলেন ও ঈজিপ্টে বাস করিতেন ; এবং তিনি স্বয়ং ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতেন। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে অশোকের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তাঁহার রাজ্য সিরিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল সুতরাং স্থলপথে উত্তর পশ্চিম ভারতের বাণিজ্য যে বহুদূরে বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। পেরিপ্লাস হইতেও অনেক প্রাচীন সাহিত্যাদিবিষয়ক পুস্তক হইতে জানা যায় যে গ্রীক্ সভ্যতার সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও পারস্য, ঈজিপ্ট ও প্রাচীন ভারতে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হইয়াছিল।

প্রাচীন বণিকদিগের মধ্যে ফিনিসীয়েরা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেকে বলেন যে ফিনিসীয়দের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবর্ষ তাহাদের নিকট হইতে অনেক নূতন জিনিস শিখিয়াছিল। Buhler তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মীলিপি ফিনিসীয়দের নিকট হইতে গৃহীত লিপির বিবর্ত্ত মাত্র। তিনি আরও বলেন যে ফিনিসীয়েরা মিসর হইতে যে লিপি গ্রহণ করিয়াছিল গ্রীক্‌লিপিও তাহারই অনুকরণে আরব্ধ হইয়াছিল। কিন্তু মহেঞ্জোদাড়োর শিলমোহরের লিপি আবিষ্কৃত হওয়াতে এখন দেখা যাইতেছে যে ভারতবর্ষীয় লিপি ফিনিসীয় লিপি অপেক্ষা অনেক প্রচীন। অনেকে এমন কথাও বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে হয় ত ফিনিসীয় লিপি ভারতবর্ষীয় প্রাচীন লিপির বিবর্ত্ত মাত্র। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অনেকে এমন মনে করেন যে মহেঞ্জোদাড়োর শিল-মোহরের লিপি হইতেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মী লিপির আরম্ভ হইয়াছিল। পাণিণিতে যবনানী বলিয়া একটি শব্দের প্রয়োগ আছে। পাণিনির সময় যদি খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠশতক হয় (Goldstucker এর মতে) তবে ঐ সময় গ্রীক্‌দেশের সহিত এদেশের সংযোগ না থাকায় যবনানী শব্দের দ্বারা যে লিপির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা যে গ্রীক্ লিপিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে এরূপ বলা যায় না। যবন বা অশোক লিপির যোন শব্দে Ionian দিগকে বুঝাইত। কারণ শব্দের সংস্কৃত উচ্চারণ ইয়োন। ফিনিসিয়ায়েরা ইয়োন (Ionian) দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে প্রধানতঃ বাণিজ্য করিত। এইজন্য সম্ভবতঃ ফিনিসীয়দের লিপিকে ইয়োনলিপি বা যবনানী বলিয়া বলা হইত।

পাশ্চাত্য জলপথে ভারতীয় বাণিজ্য সম্বন্ধে বলিতে গেলে ফিনিসীয়দের বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। সম্ভবতঃ ফিনিসীয়েরাই আদিম কালে পূর্ব্ব ও পাশ্চাত্যের বাণিজ্যসূত্র স্থাপন করে। কিন্তু মাহেঞ্জোদাড়োর শিলমোহর হইতে জানা যায় যে, ফিনিসীয়দের ও পূর্ব্বতনকালে ভারতবর্ষের সহিত ব্যাবিলনের (Babylon) বাণিজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। কারণ যে শিলমোহর মহেঞ্জোদাড়োয় পাওয়া যায় তাহাই সুসা (Susa) নগরীর নিম্নতম স্তরে অর্থাৎ ব্যাবিলনের প্রাচীনতম ভিত্তিতে পাওয়া যায়। এমন কি ক্রীট্‌এর (Crete) সহিতও ঐ সময়ে ভারতবর্ষের বাণিজ্য ছিল ইহাও অনুমান করা যায়। ক্রীট্, ঈজিপ্ট, ক্যাল্‌ডিয়া, ব্যাবিলন ও ভারতবর্ষ এই স্থানগুলিকে ব্যাপ্ত করিয়া একটি বিরাট সভ্যতা বাণিজ্যের আদান প্রদানের মধ্য দিয়া আপনাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছিল। এই

প্রাচীন যুগের বাণিজ্যসূত্র পরম্পরাক্রমে বরাবর চলিয়া আসিতেছিল কিনা অথবা কোন সময়ে তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল কিনা, তাহা এখনও নির্ণয় করিয়া বলা যায় না। কিন্তু মধ্যপ্রাচীন যুগে ফিনিসীয়েরাই পূর্ব্ব ও পাশ্চাত্যে বাণিজ্যধারা প্রবর্ত্তিত করে।

অন্য জাতি হইতে ফিনিসীয়দিগের এই এক পার্থক্য ছিল যে, তাহারা কোনও দেশে আপনাদের আবদ্ধ করিতে চাহিত না! কাজেই ফিনিসীয় বলিলে কোন দেশবিদেশের অধিবাসী এরূপ বলা যায় না। ফিনিক্স (Phoenix) রক্তপাটল রঙ্ বুঝায় এবং অনেকে বলেন যে, লাল রঙ্-এর কারবার করিত বলিয়া একটি বিশিষ্ট জাতীয় লোকদিগকে ফিনিসীয় বলা হইত। আরব হইতে ফিনিসীয়েরা প্রথম খেজুর গ্রীক্‌দেশে লইয়া যায়, এই জন্য গ্রীকরা খেজুরকে ফিনিসীয় (Phoenician) বলে। প্রাচীন ফিনিসীয়দের সম্পূর্ণ ইতিহাস এখন বিলুপ্তপ্রায়। ফিনিসীয়েরা আরবদের স্বজাতীয় অর্থাৎ সেমিটিক্ (Semite) জাতীয় লোক ছিল। তাহারা অত্যন্ত পরিশ্রমী. বুদ্ধিমান ও কার্য্যকুশল ছিল। তাহারা প্রধানতঃ লেবানন পর্ব্বত ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্ত্তী দক্ষিণ সিরিয়ার উপকূলে বাস করিত।

পেরিপ্লাসের টীকাকার Schoff বলেন যে, মধ্যপ্রাচীন যুগে ভারতীয়েরা, পারস্য উপসাগরের কূলবর্ত্তী লোকেরা এবং বিভিন্নজাতীয় আরবেরা এবং পরবর্ত্তীকালে ফিনিসীয় নামে খ্যাত জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য করিত। এই বাণিজ্য একদিকে আফ্রিকার উপকূলের অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশসমূহে ও অপর দিকে ইউফ্রেট্‌স্ নদীর মধ্য দিয়া ব্যাবিলন, অ্যাসিরিয়া প্রভৃতি প্রদেশে চলিত। আরব বণিকেরা ভারতীয় বণিকদের আফ্রিকার বাণিজ্যের কোনও ব্যাঘাত করিত না, তাহারা প্রধানতঃ লোহিত সাগরের বাণিজ্য লইয়াই ব্যস্ত থাকিত। সাধারণতঃ তাহারা এডেন উপসাগরের মুখ হইতে ভারতীয়দের নিকট হইতে মস্‌লিন ও নানাবিধ মশলা ও অন্যান্য পণ্যজাত ক্রয় করিয়া লোহিত সাগরের পশ্চিম উপকূলে. নীল নদীর তটভূমিতে কিংবা থিব্‌স্ (Thebes) প্রভৃতি স্থানে বিক্রয় করিত। সময় সময় মিশরীয়েরাও লোহিত সাগরের বাণিজ্যে বাহির হইত। কিন্তু আরবেরা এই বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কেবলমাত্র নীল ও ইউফ্রেটসের তটভূমিতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া বাণিজ্যের নূতন পথ আবিষ্কারের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং আরবদিগের সমজাতীয় ফিনিসীয়েরা পারস্য উপসাগরের নিবাস পরিত্যাগ করিয়া ভূমধ্যসাগরের উপকূলে বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। পরবর্ত্তী ইতিহাসে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব উপকূলে আমরা ফিনিসীয়দিগকে দেখিতে পাই এবং ইহার কথাই আমি প্রথমে উল্লেখ করিয়াছি। ইতিমধ্যে অন্যান্য আরবেরা ভারতীয় বণিকদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া পূর্ব্বদিকে বাণিজ্য করিতে লাগিল। ইহারা আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে সোনা, রূপা, তেল, উটপাখীর পালক সংগ্রহ করিত। আরব সাগরের উপকূলে নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য উৎপন্ন হইত এবং ভারতবর্ষ হইতে বস্ত্র, মণিমুক্তা প্রভৃতি বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য, কাষ্ঠ, নানাপ্রকার মস্‌লা, দারুচিনি প্রভৃতি ভারতীয় পোতে রপ্তানী হইত। এই সমস্ত দ্রব্যের পরস্পর বিনিময় সোকোট্রা, গদ্রাফুই প্রভৃতি স্থান হইত, এবং সেখান হইতে আরবেরা

ভারতীয় পণ্যদ্রব্য লইয়া নীলনদের তীরে ও ভূমধ্যসাগরের উপকূলে বিক্রয় করিত। মিসরীয়েরা ইহাতে কোনও বাধা দিত না। পরবর্ত্তীকালে ভারতবর্ষে কচ্ছদেশের (Cutch) উপকূলে জল শুকাইয়া গিয়া অনেক বন্দর বিনষ্ট হওয়াতে ও সিন্ধুনদীর মুখ পশ্চিমদিকে সরিয়া যাওয়াতে এবং হূন শকাদির আক্রমণের জন্য ভারতের বাণিজ্য ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল।

ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য প্রায়শঃ বাণিজ্যবায়ুর (trade winds) অনুগতভাবে সম্পন্ন হইত। কোন্ সময় কোন্‌দিকে অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইবে সে বিষয়ে প্রাচীনদিগের বিশেষ জ্ঞান ছিল। ভারতবর্ষের সাহিত্যে বাণিজ্যবায়ু সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ আছে বলিয়া জানি না কিন্তু ভারতীয় বণিকেরা খ্রীষ্টপূর্ব্ব বহু শতাব্দী ধরিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাপ্রকার পোতে সমুদ্রে বিচরণ করিত। সাধারণতঃ ভারতীয়েরা পৌষ মাঘ মাসে আফ্রিকা, সোকোট্রা প্রভৃতি অঞ্চলে যাত্রা করিত ও আষাঢ় শ্রাবণ মাসে দেশের দিকে ফিরিয়া আসিত। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে খ্রীষ্টিয় প্রথম শতকে হিপোলাস্ প্রথম বাণিজ্যবায়ুর আবিষ্কার করেন, কিন্তু মহেঞ্জোদাড়ো প্রভৃতি অতি প্রাচীনকালের বাণিজ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও খ্রীষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতক পর্য্যন্ত ভারতীয় ও চীন বণিকেরা যে ব্যাবিলনের উপকূলে নিয়মিত বাণিজ্যযাত্রায় বাহির হইত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। (Kennedy's article J. R. A. S. 1898). বাণিজ্যবায়ু সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান না থাকিলে ভারতবর্ষ ও চীনের পক্ষে এরূপ নিয়ত বাণিজ্যযাত্রা সম্ভব হইত না। অনেক ভারতীয় বণিকেরা আরব, পূর্ব্ব আফ্রিকা, ব্যাবিলন ও চীন প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যের জন্য উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।

বৌদ্ধ জাতকের মধ্যে অনেক স্থলে প্রাচীন ভারতবর্ষের সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ আছে। দীর্ঘ নিকায়ের কেবদ্ধ সুত্তে লিখিত আছে যে অতি প্রাচীনকাল হইতে পোতে করিয়া ভারতীয় বণিকেরা সমুদ্রযাত্রায় বাহির হইত। ইহারা এক প্রকার পাখী সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত। এই পাখীগুলির এই প্রকার দূরদৃষ্টি ছিল যে তাহারা অতি দূর হইতে কোথায় তীর আছে তাহা বুঝিতে পারিত। যখন তাহাদের তরী পারহীন মহাসমুদ্রে ভাসিয়া চলিত তখন বণিকেরা এই পাখী ছাড়িয়া দিত। এই পাখী আকাশে উড়িয়া যদি কোনদিকে তীর দেখিতে পাইত তবে সেইদিকে উড়িয়া যাইত আর তীর দেখিতে না পাইলে ফিরিয়া আসিত। ইহারা যখন তীরের দিকে উড়িয়া যাইত তখন নাবিকেরা সেইদিকে তরী চালাইয়া যাইত। তীরদর্শী পাখীর সাহায্যে মহাসমুদ্রে নাবিকেরা যে তীরের সন্ধান পাইতেন ঋগ্‌বেদে এ কথার উল্লেখ আছে। "তীরদর্শী পাখীর সাহায্যে যে পথে মহাসমুদ্রে নাবিকেরা পোত চালিত করে, সেই পথ সম্বন্ধে যিনি অভিজ্ঞ সেই বরুণকে নমস্কার"। "হে অগ্নি, বিপথগামী পোত তীরভ্রষ্ট হইয়া যে গহনে ছুটিয়া যায়, আমাদের শত্রুকে সেই পথে পাঠাও এবং আমাদের পোতকে মহাসমুদ্রে কল্যাণের পথে পরিচালিত কর"। সংস্কৃত সাহিত্যে বহু স্থলে পোত ভঙ্গের কথার উল্লেখ আছে। মনুসংহিতাতেও সমুদ্রবাণিজ্য সম্বন্ধে স্মার্ত্ত নিয়মের কথা লিখিত আছে। রামায়ণে সীতার অন্বেষণে রামচন্দ্রের দূত প্রেরণের কথা লেখা আছে। Lieutenant

Speke লিখিয়াছেন যে নীলনদের আবিষ্কারের জন্য পুরাণের বর্ণনাতেই বেশী উপাদান পাইয়াছিলেন। (Asiatic Researches. Vol. III.). ইহাতে বর্ণিত আছে যে কৃষ্ণ কুশদ্বীপের মধ্য দিয়া চন্দ্রীস্থানে হ্রদের মধ্য দিয়া গিয়াছিলেন। এই বর্ণনায় যাহা লেখা আছে তাহা স্থানীয় (ঈজিপ্টের) বর্ণনার সহিত একান্তভাবে সুসঙ্গত, এবং ইহাও বুঝা যায় যে ভারতীয়েরাই প্রথম Lake Victorian Nyanza আবিষ্কার করে। Speke আরও বলেন— "All our previous information concerning the hydrographic descriptions of these regions originated with the ancient Hindus who told it to the priests of the Nile ; and all those busy Egyptian geographers who disseminated their knowledge with a view to be famous for their long-sightedness in solving the mystery which enshrouded the shores of the holy river were so many hypothetical humbugs. The Hindu traders had a firm basis to stand upon through their intercourse with the Abyssinians." হাবসীরা খ্রীষ্টীয় ৩৩০ অব্দে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। ইতিপূর্ব্বে তাহারা বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। Axum নগরীতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব বহু বৎসর ধরিয়া হাবসীরা বাস করিত। সেখানে একটি স্তম্ভ পাওয়া যায়। এই স্তম্ভের কারুকার্য্য হিন্দু শিল্পীর দ্বারা নির্ম্মিত ইহাতে অভিজ্ঞেরা একমত। Schoff বলেন যে বাণিজ্যগত প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায় যে উজ্জয়িনী, কচ্ছদেশ, Axum ও Alexandria খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, এবং এই সূত্রেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথম আফ্রিকাতে প্রবেশ করে।

প্রাচীন ভারতীয় বাণিজ্য সম্বন্ধে কয়েকটি স্তর বিভাগ করা যায়। মহেঞ্জোদারো ও বৈদিক যুগ, বৈদিক যুগ হইতে বৌদ্ধ, বৌদ্ধ হইতে শকযুগ ও শকযুগ হইতে গুপ্তযুগ পর্য্যন্ত।

এই কয়েকটি যুগের মধ্যে বর্ত্তমান প্রবন্ধে তৃতীয় যুগের বাণিজ্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে, এবং তাহাতে মনে হয় যে এইযুগে ভারতবর্ষের পাশ্চাত্য বাণিজ্য অতি সুপ্রশস্ত ছিল।

রুদ্র

কুমার নিখিলেশ রুদ্র নারায়ণ সিং

'মহাপ্রলয়ের বজ্র-ঝঞ্ঝা মহাআক্রোশে ফুঁসিচে
নটরাজের প্রলয় বিষাণ মহাক্রোধে ফুকারিচে
ঘনঘটায় মেঘ কোরেচে
সৃষ্টির লয় অবশ্যম্ভাবি।
রক্ত-নেশায়
খড়্গ হাতে
মুক্ত কেশি
চতুর্ভুজা
উন্মাদিনী মহাকালী বিরাট জিহ্বা লক্লক্ করে নাচাচ্চে !

মহাসিন্ধুর জলরাশি বিপুল বেগে গর্জে উঠ্চে
যুগের ঝঞ্ঝা
মহা-আনন্দে
প্রলয় বিষাণ ফুকারিচে ;
জগত মহাকবির বীণায় সুর জেগেচে
সর্বনাশার মাতাল গীতের ঃ
ডুক্‌রে কেঁদে বেড়াচ্চে পথে পথে
শ্রীভগবান !

ভীষণের রুদ্রলীলা
চারিদিকে মৃত্যু-তাণ্ডব-নৃত্য নাচিচে
ঠিকানা নেই !

এ দুর্যোগে—
কে মরে, কে বাঁচে ঃ
বিশ্বব্যাপী বিরাট অন্ধকার
বাতাসে ভেসে আসে শুধু কঠিন হাহাকার-(ধ্বনি !)

ঘরের মাঝে বন্দী কে আছিস্ ?
রুদ্ধশ্বাসে কে মরিস্ ধুঁকে ধুঁকে ?
শুন্‌চিস্ নাকি—
নোতুন মানুষ জন্ম নিয়েচে,
সর্বহারার মাটির বুকে !

কোন্ সুদূরে আজকে আগুন লাগে !
পাতালপুরে
ঘরছাড়ারা
মৃত্যু-হারা
আধেক ঘুমিয়ে
(তমিস্রার মাঝে)
ধড়্‌ফড়িয়ে জাগে

রে মরণ-ভোলা কবি
শুন্‌চিস্ না কী—
মৃত্যু যে নাই দূর
ধরো এবার মহাপ্রলয়ের সুর ।
আজ জেগেচিস্ শবের পাশে
মরণ ?
মরণ সে যে তোরে ভয় দেখায় অট্টহাসে...

প্রিয়ার কোমল বাহু
প্রিয়ার অধর সুধা
প্রিয়ার নধর চিবুক
ভুল কোরে
ভুলে যারে এইবার !

আজ্‌কে শুধু ছড়াও আগুন
আগুন
আগুন
আগুন
অফুরন্ত আগুন !

ডাকো মহারুদ্রে
রুদ্র বীণার বহ্নি-শিখার গানে।...
এ গান তোমার হোক্ অনন্তকালের
রুদ্র বীণার সুর হোক্ অনন্তকালের
তোমার আবাহন হোক্ অনন্তকালের।

মৃত্যুদূত

পুষ্পরাণী ঘোষ

ষ্টীমারে করে আমরা কন্‌স্‌ট্যান্‌টিনোপ্‌ল্‌ থেকে প্রিঙ্কিপো নামক দ্বীপে এসে নামলাম। যাত্রী সংখ্যা খুব সামান্যই—সপরিবারে এক পোল দেশীয় ভদ্র লোক—বাবা, মা, মেয়ে ও জামাই—তাছাড়া আমরা দুজন—আমি আর একজন গ্রীক্‌ দেশীয় যুবক। যুবকটির সঙ্গে যে সব সাজসরঞ্জাম ছিল, তা দেখে সহজেই অনুমান করে নেওয়া চলে যে সে একজন চিত্রকর। বড় বড় কোঁকড়াচুল তার কাঁধ পর্য্যন্ত নেমে এসেছে—মুখখানি ম্লান, পাণ্ডুর। নিবিড় কৃষ্ণ তীক্ষ্ণ চক্ষু দুটী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্থানীয় নানা বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা ও পরোপকার স্পৃহা দেখে প্রথমটা আমার তাকে বেশ ভালোই লেগেছিল। কিন্তু শেষে যখন দেখলাম সে অতিরিক্ত রকমের বাচাল, তার সঙ্গ ত্যাগ ক'রে দূরে সরে পড়লাম।

পোল দেশীয় ভদ্রলোকেরা কিন্তু সকলেই অতি চমৎকার লোক—বাবা মা দুজনেই সদাশয় ও মিষ্টভাষী, জামাইটিও অতিশয় সরল ও অমায়িক। মেয়েটি কিছুদিন ধরে অসুখে ভুগছে, তার স্বাস্থ্যলাভের জন্যই সকলে প্রিঙ্কিপোতে এসেছেন মাসখানেক থাকবেন বলে, মেয়েটী খুব সুন্দর, কিন্তু তাকে দেখলেই মনে হয়—হয় সে সবে কোন দুরারোগ্য ব্যাধির কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে, নয়ত শীঘ্রই কোন ভীষণ ব্যাধি তাকে আক্রমণ কোরবে, সে প্রায় সর্ব্বক্ষণই বসে থাকছে—মাঝে মাঝে স্বামীর কাঁধে ভর দিয়ে একটু একটু ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রায়ই একটা শুক্‌নো ঘুস্‌ঘুসে কাশি এসে তার কথায় বাধা দিচ্ছে, বেড়াতে যখনই তার কাশি আসছে তার স্বামী তখনই হাঁটা বন্ধ রেখে অত্যন্ত কোমল সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাচ্ছে, মেয়েটিও তার দিকে ফিরে তাকাচ্ছে, তার দৃষ্টি দেখে মনে হয় সে যেন বলতে চায়,—ও কিছু না "ও দিকে মন দিও না, আমার কোন কষ্ট নেই, আমি খুব সুখী",—তাদের দুজনেরই মন সুখে, আশায় ও নির্ভরতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠছিল।

গ্রীক্‌ যুবকটির কথা মত তারা পাহাড়ের উপরকার এক হোটেলে এসে উঠেছে। হোটেলের মালিক একজন ফরাসী ভদ্রলোক, সমস্ত বাড়ীটি ফরাসী রীতি অনুযায়ী বেশ সুন্দরভাবে সাজান গোছান।

আমরা সবাই একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করলাম, তারপর—রোদের তেজ একটু কমবা মাত্র পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পাইনবনে বসে বিশ্রাম কোরতে কোরতে চারিদিকের দৃশ্য দেখতে লাগলাম,

আমরা সবে যে যার পছন্দমত জায়গা বেছে নিয়ে বসেছি এমন সময় গ্রীক যুবকটিকে দেখতে পাওয়া গেল, সকালে জাহাজ থেকে নামবা মাত্র সে আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিল, এখন সে এগিয়ে এসে আমাদের কাছ থেকে অল্প একটু দূরেই একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লো ও ব্যাগ খুলে ছবি আঁকার সাজসরঞ্জাম বের করে আঁকতে আরম্ভ করলো। আমি বল্লাম, "আমার মনে হয় আমরা যাতে ওর ছবি না দেখতে পাই সেই জন্য ও ইচ্ছা করেই শিলাস্তূপের দিকে পিছন ফিরে বসেছে।"

পোল দেশীয় যুবকটি বললো—"আমরা দেখতে চাইও না—সম্প্রতি আমাদের সামনে দেখবার মতন যথেষ্ট জিনিষ রয়েছে।" একটু পরে সে আবার বললো—"আমার মনে হয় ওর চিত্রের পটভূমিকায় আমাদের ছবি এঁকে নিচ্ছে,—তা নিক্‌গে।"

সত্যই দেখবার জিনিষের আমাদের কোনই অভাব ছিল না—প্রিঙ্কিপোর মত অমন সুন্দর, মনোরম স্থান পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। আমি যদি জীবনের একমাসও এখানে থাকতে পেতাম তা' হলে বাকি দিনগুলো এর স্মৃতিস্বপ্নে বিভোর হ'য়ে কাটিয়ে দিতে পারতাম। এই একদিনের কথাই আমি জীবনে কখনও ভুলবো না।

সুখস্পর্শ মৃদু সমীরণ প্রবাহিত হচ্ছে—আমাদের মনও যেন বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে বহুদূরে ভেসে যাচ্ছে। সমুদ্রের পরপারে ডানদিকে এসিয়ার ধূসর পর্ব্বতশ্রেণী, আর বাঁদিকে ইউরোপের অত্যুন্নত নীলাভ সমুদ্রোপকূল। নিকটস্থ এক দ্বীপে বিষাদভরা স্বপ্নের মত সাইপ্রেস বনানী মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাঝে দেখা যাচ্ছে প্রকাণ্ড এক অট্টালিকা, মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের আশ্রম।

ঈষৎ বিক্ষুব্ধ মার্ম্মোরা সাগর উজ্জ্বল ওপেলের মত ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্র বর্ণে অনুরঞ্জিত হ'য়ে উঠছে,— বহুদূরে সাগর বারির বর্ণ দুগ্ধ শুভ্র, তারপর ঈষৎ আরক্ত, দ্বীপদ্বয়ের মাঝে উজ্জ্বল জবদবর্ণ, আর আমাদের পায়ের ঠিক নীচে স্বচ্ছ নীলার মত হরিতাভ নীল। আপন সৌন্দর্য্য প্রভায় দীপ্তিমান—সাগর সগর্ব্বে বিরাজ কোরছে, সমুদ্রবক্ষে একখানিও বড় জাহাজ নেই, খুব ছোট ছোট দুটী জাহাজ বৃটিশ পতাকা বহন করে চলেছে—প্রথমটা একটা ষ্টীম বোট, আর দ্বিতীয়টীকে বারজন দাঁড়িতে মিলে বেয়ে নিয়ে যাচ্ছে; যখন তাদের সকলের দাঁড় একসঙ্গে উঠছে আর পড়ছে মনে হচ্ছে যেন গলিত রজত ধারা ঝরে ঝরে পড়ছে। নির্ভরপরায়ণ শুশুকরা এক একবার ভেসে উঠেই আবার ডুবে যাচ্ছে। উপরে নীল আকাশের পথ বেয়ে সামুদ্রিক চিলগুলি শান্তভাবে দুই মহাদেশের মধ্যবর্ত্তী পথ অতিক্রম করে উড়ে বেড়াচ্ছে।

আমাদের পায়ের নীচে বিস্তীর্ণ পর্ব্বতসানুতে অসংখ্য গোলাপ ফুটে রয়েছে, তাদের সুগন্ধে বাতাস সুরভিত হয়ে উঠেছে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী কফি পানাগার থেকে মৃদু সঙ্গীতধ্বনি ভেসে আসছে। সব শুদ্ধ মিলে অতি চমৎকার একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, সেই স্বর্গীয় সুন্দর দৃশ্যের মাঝে

বসে আমরা সকলেই নীরবে আপন আপন বিশেষ চিন্তায় মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম। রুগ্না মেয়েটী স্বামীর কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল। তার কোমল ও পেলব মুখখানি ঈষৎ রক্তিম দেখাচ্ছিল। সহসা তার সুন্দর দুটী নীল নয়ন বেয়ে অশ্রুঝরে পড়তে লাগলো, স্বামী তার মনের ভাব বুঝতে পেরে নত হ'য়ে চুম্বনে চুম্বনে প্রতিটী অশ্রুকণা মুছে নিল—তার মাও কেঁদে ফেল্লেন; এমন কি আমারও মনে কেমন যেন একটী বেদনার সঞ্চার হল।

"এখানে শরীর ও মন দুই-ই সেরে উঠবে"। মেয়েটী চুপি চুপি বললো,—"কি চমৎকার দেশ এটা।"

মেয়েটীর বাবা কম্পিতস্বরে বললেন,—"ঈশ্বর জানেন পৃথিবীতে আমার কোন শত্রু নেই, কিন্তু যদিই কেহ থাকতো, এ রকম জায়গায় আমি তাকে ক্ষমা করতে পারতাম।"

আবার আমরা চুপ করে বসে রইলাম, প্রত্যেকেরই একটা অতি সুন্দর অনুভূতির উপলব্ধি হচ্ছিল। সব জিনিষই যেন অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যরসে সিঞ্চিত হয়ে উঠেছে—প্রত্যেকেরই আপনাকে পরম সুখী বলে মনে হচ্ছে আর ইচ্ছা হচ্ছে বিশ্বের সকল মানুষকেই সে সুখের ভাগ দিতে। সকলের মনোভাবই এক রকম হওয়ায় কথা বলে কেউ কারুর ধ্যানভঙ্গ কোরছে না, এমন কি সেই গ্রীক যুবকটী কখন যে তার সাজসরঞ্জাম নিয়ে উঠে গেছে—আমরা কেউ তা লক্ষ্যই করিনি—আমরা একভাবেই বসেছিলাম।

অবশেষে আরও কয়েক ঘণ্টা পরে যখন দূরে দিগ্বলয়রেখা ঘোর অন্ধকারে ঢেকে গেল, তখন আমরা উঠে পড়লাম এবং চিন্তালেশশূন্য সদানন্দ-প্রকৃতি ক্ষুদ্র শিশুর মত সহজ ও সাবলীল গতিতে চলতে লাগলাম। হোটেলে এসে সকলে মিলে সামনের বারান্দায় বসলাম। বসবার সঙ্গে সঙ্গে নীচে একটা ঝগড়াঝাঁটি ও হট্টগোল শুনতে পাওয়া গেল। সেই গ্রীক যুবকটীর সঙ্গে হোটেলওয়ালার খুব তর্কবিতর্ক চলছিল। মজা দেখবার জন্য আমরাও কৌতূহলী হয়ে শুনতে লাগলাম। কিন্তু আমোদটা বেশীক্ষণ উপভোগ করা গেল না। "যদি আমার আর কোন অতিথি না থাকতো"—এই ব'লে বক্ বক্ করতে করতে হোটেলওয়ালা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো।

পোল দেশীয় যুবকটী হোটেলওয়ালাকে জিজ্ঞাসা কোরলো—"মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি ওই লোকটী কে? ওর নাম কি?"

হোটেলওয়ালা বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে নীচের দিকে চেয়ে রাগতভাবে বললো—"কে জানে মশাই ওর নাম! আমরা ওকে বলি মৃত্যুদূত।"

"উনি কি একজন চিত্রকর?"

"হাঁ—তা বই কি, চিত্রকরই বটে, খুব ভালো ব্যবসা ওর,—ও খালি মৃতদেহ এঁকে বেড়ায়। কনস্ট্যান্টিনোপল্ অথবা এখানকার ধারে-কাছে যে দিনই কোন লোকের মৃত্যু হয়, ও সেই দিনই

তার এক সম্পূর্ণ ছবি এনে হাজির করে। ও লোকটা আগের থেকেই তাদের ছবি এঁকে রাখে, আর আশ্চর্য্য এই যে শকুনির মত ওরও কখনও এ বিষয়ে ভুল হয় না।

প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা হঠাৎ ভীতভাবে চীৎকার করে উঠলেন—তাঁর মেয়েটী তাঁর কোলের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

একলাফে মেয়েটীর স্বামী নীচে নেমে গেল। এক হাত দিয়ে সে গ্রীক যুবকটীকে ধরে ফেললো—ও অন্য হাত দিয়ে তার ব্যাগটী ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করলো—

আমরাও তার পিছনে পিছনে দৌড়ে গেলাম, দু'জনেই তখন বালির মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ব্যাগের জিনিষপত্র সব চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তার ভিতর একটা কাগজে পেন্‌সিল দিয়ে মেয়েটীর মুখ আঁকা,—তার চোখ দুটী বোঁজা,—কপালে একছড়া সাদা ফুলের মালা।

*Jan Neruda লিখিত "T e Vampire" নামক গল্পের অনুসরণে।

হের হিট্‌লার একবার পৃথিবীর একজন বিখ্যাত সাংবাদিক কার্ল ভন্ উইগোণ্ডকে বলেছিলেন ; "I have no programme. I have only objectives and goals. All the rest is tactics"—এবং ভন্ উইগোণ্ড মিউনিক সঙ্কট সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে ফুরহার "went to the ninety-nine and ninety-ninths point near war without any *thought of ever going the other tenth.*" ডিক্টেটরদের দস্তুরই হ'চ্ছে তাই। হামবড়া ভাব আর জুলুমবাজি হ'চ্ছে তাদের নীতির মূলমন্ত্র। তাই হামেশা তারা হুম্‌কি দিয়ে কাজ গুছিয়ে নিতে পটু। এই হুম্‌কির জোরেই অষ্ট্রিয়া গেছে আর গেছে চেকোশ্লোভাকিয়া। বাকি যে কটি রাষ্ট্র আছে তারাও কম্পমান। কানিয়া হাঙ্গেরীর পররাষ্ট্রসচিবের পদ পরিত্যাগ করবার পর কাউন্ট ষ্টিফ্যান্ সজাকি হাঙ্গেরীর পররাষ্ট্রসচিবের পদে নিযুক্ত হ'য়েছেন। কাউন্ট সজাকি রোম-বেলিন এ্যাক্সিস্-এর একজন গোঁড়া ভক্ত এবং গত ২০শে ডিসেম্বর বুদাপেস্তে এক ভোজ-সভায় কাউন্ট সিয়ানোকে তিনি রোম-বের্লিন এ্যাক্সিস্-এর প্রতি হাঙ্গেরীর আনুগত্য সম্বন্ধে আশ্বাস দিয়েছিলেন। গত ১৬ই জানুয়ারী তিনি হের হিট্‌লার কর্ত্তৃক মহাসমারোহে সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে বের্লিন প্রদক্ষিণ ক'রে ফিরে এসেছেন। লিট্‌ভিনফ্ হাঙ্গেরীর মন্ত্রীকে জানিয়ে দিয়েছেন যে সোভিয়েটের সঙ্গে হাঙ্গেরীর আর কোন যোগাযোগ থাকবে না ভবিষ্যতে, কারণ "Hungary is now a vassal of the Rome-Berlin Axis..." এবং প্রকাশ্যে সে কমিনটার্ণ-বিরোধী প্যাক্টে যোগ দিয়েছে। তারপর রাইকস্‌ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট (ডাঃ শাক্ট্-এর পদত্যাগের পর) ডাঃ ফুঙ্কের বেল্‌গ্রেড পরিভ্রমণের বহুপূর্ব্ব থেকেই ইতালী যুগোশ্লোভিয়ার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা করবার একটা বন্দোবস্ত করছে এবং যুগোশ্লোভিয়ার বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী ডাঃ ষ্টয়াডিনোভিচ্ রোম ঘুরে এসে মুসোলিনীকে ইতালীয় পণ্য বেচাকেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ডাঃ ফুঙ্কের বল্‌ক্যান্‌ পর্য্যটনের পর জার্ম্মানি যুগোশ্লোভিয়ার সঙ্গে বিনিময়ে ব্যবসা করবার সম্মতি পেয়েছে এবং যুগোশ্লোভিয়ার কৃষিজাত দ্রব্য যন্ত্রের বিনিময়ে জার্ম্মানি কিনছে। গত পাঁচ মাস যাবৎ ক্রোট-সমস্যা নিয়ে যুগোশ্লোভিয়া বিশেষ জড়িত রয়েছে। গত ১৫ই আগষ্ট ক্রোট্ নেতা ডাঃ মাচেক্ এবং সার্বিয়ান গণতান্ত্রিক বিরুদ্ধবাদীদের নেতৃবৃন্দ যুগোশ্লোভিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মর্ম্মে যে ইস্তাহার জারী করেছিলেন সম্প্রতি জাগ্রেবে ১০৩ জন ক্রোট্ ডেপুটী সেই একই মর্ম্মে অধুনা নির্ব্বাচিত পার্লামেণ্টকে বর্জ্জন ক'রে এক ইস্তাহার জারী করেছেন। যুগোশ্লোভিয়ার ৯৫,৫৫৮ বর্গ মাইলের প্রায় ১৬,৬০০ বর্গ মাইল ব্যাপী ক্রোট ও সার্বদের বাস এবং এরা সকলেই ষ্টয়াভিনোভিচ্ মন্ত্রিত্বের পতন ইচ্ছা করে। এই হ'ল যুগোশ্লোভিয়ার অবস্থা। একমাত্র রুমানিয়ার রাজা কেরল ফ্যাশিস্ত আন্দোলনের বিরুদ্ধে আজও নির্ভয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তারা যাতে কোন রকমে উস্কানি বা প্রশ্রয় না পায় তার জন্য তিনি বিশেষ যত্নবান। তা হ'লেও শোনা গেছে সেখানকার ফ্যাশিস্ত আইরণ গার্ডরা ষড়যন্ত্র ক'রে পেট্রল ও তেল দিয়ে বাড়ীঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে। সহরে সহরে একটা ভীষণ চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি হ'য়েছে। ওদিকে গোয়েবেল্‌স্ তাঁর "দার আাঙ্গ্রীফ্" পত্রিকার মারফত ফ্যাশিস্ত আইরণ গার্ড আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করবার জন্য রুমানিয়ার রাজাকে কটুভাষায় গালিগালাজ করছেন। সমস্ত মধ্য য়ুরোপীয় ও বল্‌ক্যান্ রাষ্ট্রগুলি যে হিট্‌লার ও মুসোলিনীর "realist foreign policy"-কে আকার দেবার চেষ্টা করছে সমবেতভাবে এ সংবাদ আর কারও অবিদিত নেই। ওদিকে লিথুয়ানিয়া মাথা হেঁট করেছে যখন, তখন বাদ থাকে শুধু পোল্যাণ্ড। সেখানেও উক্রেনাইনদের মধ্যে হিট্‌লার যে উস্কানি দেওয়া সুরু করেছেন তাতে ব্যাপারটা ক্রমেই জটীলতর হ'য়ে উঠেছে। আর উক্রেইন্‌ই যে হিট্‌লারের প্রধান লক্ষ্য এবং রাইকের বড় শীকার তা-ও আমরা জানি। উক্রেইন্ সমস্যা য়ুরোপের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

জার্ম্মানি ও ইতালির এই যে দুরন্ত অভিযান এর বিরুদ্ধে বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি, অর্থাৎ ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেন কি করছে? কিছুই না। পরোক্ষেই হোক্ আর অপরোক্ষেই হোক্ জার্ম্মানি ও ইতালীর কার্য্যোদ্ধারে সহায়তা করাই হ'চ্ছে এদের উদ্দেশ্য। কোন একজন ফরাসী সমালোচকের ভাষায় দালাদিয়ের ও বোনে "has a positively erotic passion for treachery" এবং চেম্বারলেন সাহেব রোম যাত্রার প্রাক্কালে ও পরে যে সব সাফাই গাইছেন তাও ধোপে টেঁকে না কারণ দুচে তাঁকে এমন কিছু উপহার দেন নি যাতে তিনি তাঁর লুপ্ত গৌরব ফিরে পাবেন বা সাধারণ নির্ব্বাচনে জয়ী হ'তে পারবেন। তাঁর শান্তিকামী মনোবৃত্তি সম্বন্ধে 'টাইম্‌স্' পত্রিকার সম্পাদককে দিয়ে তিনি ক'সে ঢাক পিটান তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই, তিনি কেন অতগুলি গুরুতর ঘটনার যুক্তিযুক্ত কৈফিয়ৎ দিতে আজও আম্‌তা আম্‌তা করছেন? হিট্‌লারের মোসাহেবি করতে যাবার সময় তিনি কেন পার্লামেণ্টের আণ্ডার সেক্রেটারীকে ও বৈদেশিক প্রচার বিভাগের কোন কর্ম্মচারীকে সঙ্গে নেন্ নি? হাজার অনুরোধ

সত্ত্বেও তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার নিন্দনীয় মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত পার্লামেন্টের অধিবেশনের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কেন? মিউনিক চুক্তি সম্বন্ধে সমালোচনা করবার জন্য তিনি বিরুদ্ধবাদীদের নেতাকে কেন বলেছিলেন "fouling his own nest" এবং কেন তিনি তাঁকে ফাশিস্ত রাষ্ট্রের উদাহরণ দেখিয়ে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ সম্বন্ধে সতর্ক করেছিলেন? কিন্তু এবারে চেকোশ্লোভাকিয়া নয়, স্পেন, এবং বৃটিশ বাণিজ্যপথের যে কোন মানচিত্রের দিকে চাইলেই নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির দিক থেকেই ইতালী, জার্ম্মানির হাত থেকে স্পেনকে রক্ষা করা বৃটেনের যে কতখানি আবশ্যক তা স্পষ্টই বোঝা যাবে। স্পেনে ফ্রাঙ্কোর জয় হলে অর্থাৎ ইতালী, জার্ম্মানি স্পেনে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হ'লে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায়, আফ্রিকায়, ভূমধ্যসাগরীয় রাষ্ট্রগুলিতে, ভারতবর্ষে, অষ্ট্রেলিয়ায় ও সুদূর প্রাচ্যে বৃটেনের বাণিজ্যপথ মোটামুটি বন্ধ হ'য়ে যাবে। সুতরাং সাফাই না গেয়ে আজ চেম্বারলেনের বোঝা উচিত যে তাঁর উপঢৌকন ও রফামূলক নীতির আমূল সংস্কার প্রয়োজন, তা না হ'লে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। World Review পত্রিকার সম্পাদক ভার্নন বার্লেট্ বলেছেন: "The immediate risks of a change of policy are obviously much greater than they were even six months ago, but without that change there must be war and there may be defeat." একমাত্র আশা হ'চ্ছে যে বৃটিশ জনসাধারণ শুধু নয়,—লেবার, লিবারাল এমন কি রক্ষণশীল দলের নেতারা পর্য্যন্ত আজ বুঝতে পেরেছেন যে স্পেনে যে ফাশিস্ত যুদ্ধ চলেছে তা বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধেরই একটা অংশ এবং স্পেনে ফ্রাঙ্কোর জয় হ'লে আফ্রিকার সঙ্গে ফ্রান্সের যোগাযোগ ত' বন্ধ হ'য়ে যাবেই, ভূমধ্যসাগরও ফ্যাশিস্ত হ্রদে পরিণত হবে। হিট্লারের ঔপনিবেশিক দাবী যদি মেনে নেওয়া হয় বা মধ্য য়ুরোপে তাঁর আধিপত্য বিস্তারে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, ভূমধ্যসাগরে মুসোলিনীর প্রতিপত্তি যদি বেড়ে যায়, তা হ'লে বৃটেন ও ফ্রান্সের যে বিপদ ঘনিয়ে আসবে তা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

বৃটেনের চেম্বারলেন-হ্যালিফ্যাক্স গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ আজ সুপরিস্ফুট। কিন্তু এই গণ-বিক্ষোভ প্রকাশের পথে অন্তরায় হচ্ছে একমাত্র বৃটিশ লেবার পার্টি। বৃটিশ লেবার পার্টির ন্যাশানাল এক্সিকিউটিভ ষ্টাফোর্ড ক্রীপস্‌কে বিতাড়িত করা স্থির করেছেন। ক্রীপ্‌সের অপরাধ হচ্ছে যে তিনি লেবার ও লিবারাল বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে' বর্ত্তমান ফ্যাসিস্ত-অভিমুখী ন্যাশানাল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে 'পপুলার ফ্রন্ট' গঠনের জন্য আন্দোলন করেছেন। আজ লেবার পার্টির উচিত পার্লামেণ্টারী আদব-কায়দা বর্জ্জন করে' ন্যাশানাল গবর্ণমেণ্টের পতনেচ্ছুক সমস্ত দলগুলির সহিত মিলিত হয়ে 'পপুলার ফ্রন্ট' গঠন করা, নচেৎ বৃটেনের গণতান্ত্রিক মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব নয়।

ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অবশ্য খুবই শোচনীয়, দালাদিয়ে-বোনে গোষ্ঠীর গবর্ণমেণ্ট টলায়মান। গত ১লা জানুয়ারী ১৯৩৯ সালের বাজেট্ বিল আলোচনার সময় দালাদিয়ে

গবর্ণমেণ্ট মাত্র ৭ ভোটে জয়ী হয়েছিল এবং ৩৪ জন নিরপেক্ষ ছিল। ফ্রান্সের পূর্ব্বের পপুলার ফ্রন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে সোশ্যালিষ্ট, কম্যুনিষ্ট ও রেডিক্যাল মিলিয়ে ৩৮০ জন সভ্য ছিলেন এবং রাইটিষ্ট ও সেন্ট্রিষ্ট্ মিলিয়ে ২০০ জন ছিলেন বিরুদ্ধবাদী। এখন দালাদিয়ের ভরসা দক্ষিণপন্থী সভ্যবৃন্দের উপর কারণ তাঁর নিজের রেডিক্যাল পার্টির সভ্যেরা 'en-bloc' তাঁকে ভোট দেন না। ৩৪ জন সভ্য যাঁরা নিরপেক্ষ ছিলেন তাঁরা সকলেই রেডিক্যাল পার্টির সভ্য। সুতরাং দালাদিয়ে গবর্ণমেণ্টের অবস্থা যে কি তা সহজেই অনুমেয়।

গণতান্ত্রিক বৃটেন ও ফ্রান্স য়ুরোপের গর্ব্ব ছিল, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির আশা ভরসা ছিল তারা। কিন্তু তাদের জঘন্য নপুংসক মনোবৃত্তির ফলে অষ্ট্রিয়া চেকোশ্লোভাকিয়ার কি পরিণতি তা দেখতেই পাচ্ছি। অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিও আজ ভয়ে বিনা প্রতিবাদে প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাশিস্ত শক্তির কাছে মাথা হেঁট করেছে ;— দুই প্রান্তের দু'টি অবশিষ্ট বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে ; একটি আমেরিকা, আর একটি সোভিয়েট্ রাশিয়া। আমেরিকার ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অর্গানাইজেশন্ ও লেবর ফেডারেশনের প্রায় ত্রিশ লক্ষ সভ্য রুজভেল্টের কাছে আবেদন করেছে স্পেনে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের নিষেধাজ্ঞা তুলে দেবার জন্য এবং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টও বলেছেন ফ্যাশিস্ত ও ফ্যাসিস্তপন্থী আক্রমণকারীদের কোন রকম সাহায্য করা হবে না। সম্প্রতি হাউস্ অফ্ রেপ্রেজেন্টেটিভ্স্ এ্যাপ্রোপ্রিয়েশনস্ কমিটির চেয়ারম্যান্ মিঃ টেইলরের অনুরোধে প্রেসিডেণ্ট্ রুজভেল্ট দেশের অস্ত্র ও সমরোপকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য হোয়াইট্ হাউসে একটি কন্ফারেন্স আহ্বান করেছিলেন। সিনর গেইডা "Giornale d' Italia"—তে লিখেছেন "If the United States frontiers extend to Rhine, Italy's must extend to the Panama Canal" এবং জার্ম্মান প্রেস বড় বড় হেড লাইনে "Hamburger Fremenblatt" অর্থাৎ পয়লা নম্বরের শান্তির শত্রু বলে' প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। উক্ত কন্ফারেন্সে মিঃ ষ্টিম্সন্ স্পেনে অস্ত্র প্রেরণের নিষেধাজ্ঞা তুলে' দেবার জন্য আবেদন করেছেন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, আমরা বিশ্বাস করি, শীঘ্রই একটা যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবেন এবং তা হ'লে স্পেনে ফ্রাঙ্কোর অগ্রাভিযান যে অনেকখানি প্রতিরুদ্ধ হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বার্সিলোনা পতনের পর সেনর নেগ্রিন যা বলেছেন তাতে অবশ্য আমাদের একেবারে হতাশ হওয়া উচিত নয়। নেগ্রিন্ বলেছেন যে যতদিন তিনি আশা দিতে পারেন নি ততদিন তিনি কিছু বলেন নি ; আজ তিনি যথেষ্ট নিশ্চয়তার সহিত আশ্বাস দিতে পারেন যে স্পেনের বিপদ কেটে গেছে। মাদ্রিদ ফ্রন্টের গণতন্ত্রীবাহিনীর দ্বিতীয় সেনাধ্যক্ষ জেনারেল ক্যাসাডো ঘোষণা করেছেন যে "war will last as long as it is necessary to make Spain safe for Spainiards." জেনারেল ক্যাসাডো, লা পাশিওনারিয়ার উদ্দীপক বাণীরই প্রতিধ্বনি করেছেন। স্পেনের সংগ্রাম হ'চ্ছে ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের সংগ্রাম এবং প্রাণপণ করে যে স্পেনের জনগণ সে সংগ্রামে যুঝবে তা আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু সমগ্র য়ুরোপের ক্রূর, ক্লিন্ন চক্রান্তের বিরুদ্ধে এখনও যদি স্পেনকে

নিঃসহায় অবস্থায় সংগ্রাম করতে হয় তা হ'লে অতিবড় আশাবাদীকেও স্পেনের তথা সমগ্র য়ুরোপের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তান্বিত হ'তে হবে। আজও যদি গণতন্ত্রকামী রাষ্ট্রগুলি নিরপেক্ষ নীতির অভিনয় ও ক্লীবত্বকে বর্জ্জন করে' স্পেনকে সাহায্য করে তা হ'লে স্পেনের "no passaran" গণবাণী সার্থক হবে বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে আগেই বলেছি। সুতরাং আমেরিকা ও সোভিয়েট্ রাশিয়া দুই পাশে এই দুই বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশকে স্তম্ভের মত দাঁড় করিয়ে বৃটেন ও ফ্রান্সে যদি পুনরায় পরিপূর্ণ গণতন্ত্রী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয় তা হ'লে য়ুরোপ তথা সমগ্র বিশ্বে আজ যে প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাশিস্ত আন্দোলন আতঙ্কের সৃষ্টি ক'রেছে তা সামান্য প্রয়াসেই মুহূর্ত্তেই বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে। সমগ্র বিশ্বে গণতন্ত্রের বিজয়কেতন উড়্‌বে সেদিন।

* * * * * * *

এ গেল য়ুরোপের কথা। সুদূর প্রাচ্যেও ফ্যাশিস্ত এ্যাক্সিস্-এর তৃতীয় সমর্থক জাপান গণতন্ত্রী চীনের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করছে সে সম্বন্ধে ওয়াল্টার লিপ্‌ম্যানের মত একজন বিশ্ববিখ্যাত রাজনৈতিক সমালোচক জাপানের পক্ষে যথেষ্ট আশা পোষণ করলেও, আমাদের কাছে জাপানের জয় সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হবার সঙ্গত কারণ রয়েছে। হ্যাঙ্কাও ও ক্যাণ্টন পতনের পর চীন এ ক'দিন বিশেষ 'news'-এর মধ্যে পড়ে নি।

হ্যাঙ্কের কয়েকমাইল দূরে দক্ষিণ ও পশ্চিমে জাপানের অগ্রগতি রুদ্ধ হ'য়ে গেছে। এমনকি গত নভেম্বর মাসে হুনানের রাজধানী চাংসা যে চীনেরা পুড়িয়ে দিয়েছিল আজও জাপান তা অধিকার ক'রতে পারে নি। চাঙ্কসার ১৫০ মাইল পূর্ব্বে নানচাং আজও চীনাদের অধীনেই রয়েছে। সুতরাং হ্যাঙ্কাও ক্যাণ্টন রেলপথ আজও চীনাসৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত: চাংসার ৬০ মাইল উত্তর থেকে ক্যাণ্টনের উত্তরে কয়েক মাইল পর্য্যন্ত অর্থাৎ হ্যাংচো ও নানচাং ঘুরে সিঙ্গাপুর থেকে চাংসা পর্য্যন্ত যে রেলপথ গেছে সেখানে চীনসৈন্যেরা আজও পাহারা দিচ্ছে। হ্যাঙ্কাও ছেড়ে যে চীনা সৈন্যবাহিনী পলায়ন করেছিল তারা আজও বিধ্বস্ত হয় নি। তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সমরোপকরণ কিছুই নষ্ট হয়নি এবং ক্যাণ্টন-হ্যাঙ্কাউ রেলপথের পশ্চিম অঞ্চল তারা এখনও আগলে রয়েছে। ক্যাণ্টন পতনের পর চীনের যে অসুবিধা হয়েছে সে-কথা অস্বীকার্য্য নয়, কারণ পশ্চিম থেকে হংকং ঘুরে তাদের যে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি হত তা বন্ধ হ'য়ে গেছে। কিন্তু তা হ'লেও সোভিয়েট রাশিয়া থেকে চীন এখনও যথেষ্ট সাহায্য পাচ্ছে এবং বর্ম্মা থেকে য়ুনান প্রদেশ পর্য্যন্ত যে পথ তৈরী হ'য়েছে তাতেও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করবার পক্ষে চীনের যথেষ্ট সুবিধাই হবে। যদিও এই পথের ১২০টি সাঁকো আজও খুব ভারী ওজনের মোটর লড়ী বইবার মত মজবুত হয় নি তা হ'লেও আমেরিকা ও গ্রেট বৃটেন থেকে যে অর্থ সাহায্য চীন পেয়েছে তাতে এ-পথ শীঘ্রই কার্য্যোপযোগী হ'য়ে যাবে। তারপর জাপানের অর্থনৈতিক অবস্থাও অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন। জাপান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল বটে কিন্তু দীর্ঘকালস্থায়ী যুদ্ধের জন্য নয়। তারা আশা করেছিল যে হয় ছ' মাস না হয় বড়জোর এক বছরের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হ'য়ে যাবে। কিন্তু

দেড় বছরের উপর যুদ্ধ চ'লেছে এবং চীনারা ঠিকভাবে আজও যুদ্ধ আরম্ভই করে নি। অথচ জাপানের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অবস্থা ভীষণ প্রকট মূর্ত্তি ধারণ করেছে। জাপানীদের দৈনন্দিন জীবনের স্তর এত নীচে নেমে গেছে যে জমি থেকে সেখানকার কৃষিজীবীদের ফসল পর্য্যন্ত উৎপাদন করাও দুঃসাধ্য হ'য়ে পড়েছে। গত বছর রপ্তানি ব্যবসায়ে জাপানের যথেষ্ট লোকসান হ'য়েছে। এই হ'ল জাপানের বর্ত্তমান পরিস্থিতি। জাপান একসাথে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক সঙ্কটের সম্মুখীন হ'য়েছে। এর কোনটার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া আদৌ সহজ হবে না।

য়ুরোপের প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিজমের সমদৃষ্টান্ত ভারতবর্ষেও রয়েছে। ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলির উপর সামন্তনৃপতিদের যে স্বেচ্ছাচারিতা অপ্রতিহতগতিতে চলেছে তাকে একমাত্র ফ্যাশিস্ত বর্ব্বরতার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এমন কি ফ্যাশিজমের অঙ্কুর আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ককেশ পরিচালক গোষ্ঠীর মধ্যেও যে নিহিত আছে তা বেশ স্পষ্টই বোঝা গেছে ত্রিপুরীর অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন ব্যাপারে। সুভাষবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী মৌলানা সাহেব ছিলেন, তারপর হঠাৎ তাঁর পরিবর্ত্তে এলেন পট্টভি সীতারামিয়া। সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটির দেও-দেশাই বল্লভ-শেঠ-বাবু-গোষ্ঠী শিষ্টতার সীমা লঙ্ঘন ক'রে অবিবেচকের মত বিবৃতি প্রকাশ ক'রে দেশব্যাপী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেন। তাঁদের অজ্ঞতা ও বুদ্ধিহীনতার পরিচয় পেয়ে আমরা প্রথমটা হতবাক্ই হ'য়েছিলাম, কিন্তু পরে আমাদের সঙ্কোচ হয়েছে এইজন্য যে এতদিন আমরা তাঁদেরই আমাদের নেতা ও দেশের পোক্ত কাণ্ডারী ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলাম। বিবৃতিটি প্রকাশ করেছিলেন বল্লভভাই প্যাটেল, জয়রামদাস দৌলতরাম, ভুলাভাই দেশাই, শঙ্কর রাও দেও, শেঠ যমুনালাল বাজাজ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও আচার্য্য কৃপালনী। বিবৃতির সারমর্ম্ম হ'চ্ছে এই যে, পট্টভিকে তাঁরা ভারতবর্ষের "রাজা" করতে চান কারণ, (১) কংগ্রেসের নীতি ও কার্য্যপদ্ধতি সমগ্র কংগ্রেস দ্বারা না হ'য়ে ওয়ার্কিং কমিটি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় এবং কংগ্রেসের সভাপতির মর্য্যাদা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অধীনে রাজার মর্য্যাদার অনুরূপ। পট্টভি ভারতমাতার কৃতী-সন্তান বলেই সেই পদের যোগ্যতম ব্যক্তি; (২) "বিশেষ কারণ" ব্যতীত একই ব্যক্তিকে দু'বার সভাপতিপদে নিযুক্ত করা ঠিক না: (৩) যথেষ্ট "বিবেচনা" ক'রে "তাঁরা" এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ'য়েছেন এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবে তাঁরা এই "দৃঢ় অভিমত" ব্যক্ত করছেন। অতএব বিজ্ঞগোষ্ঠীর বিচার মাথা হেঁট ক'রে না মেনে নিলে আমরা কংগ্রেসের নীতির বিরুদ্ধাচারী হব। কিন্তু আমরা প্রশ্ন ক'রছি 'ওয়ার্কিং কমিটি' বস্তুটি কি? ১৯৩৪ সালে কংগ্রেসের নূতন গঠনবিধি গৃহীত হবার পর থেকে আমরা যতদূর জানি কংগ্রেসের সভাপতি নিজেই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মনোনীত ক'রে থাকেন। পট্টভিরই লেখা "The History of the Congress" নামক পুস্তক থেকে আমি উদ্ধৃত করছি। ১৯৩৪ সালে অক্টোবর মাসে বোম্বে অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত হ'য়েছিল যে "...the President was to be a President in reality of Cabinet formed exclusively by himself."—(The History of The Congress

By Pattabhi Sitaramiya. P. 984)। তাই যদি হয়, তা হ'লে পট্টভির ভক্তবৃন্দ কংগ্রেস সভাপতিকে রাজতন্ত্রের অধীনে রাজার পদের সঙ্গে তুলনা ক'রে এবং ওয়ার্কিং কমিটির স্বতন্ত্র সত্তা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে কি নিজেদের সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন? তাঁদের এটুকু জ্ঞানও অন্ততঃ থাকা উচিত ছিল যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর পদের অনুরূপ. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের 'রাজার' পদের সঙ্গে তার তুলনা চলে না। তারপর আইনতঃ সুভাষবাবু যখন সভাপতির পদে আসীন রয়েছেন তখন তাঁদের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবে তাঁরই বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রকাশ করবার ক্ষমতা কোন্ রাজ্যের রাজনীতি থেকে তাঁরা পেয়েছেন? পট্টভিরই বইয়ের ৯৬৭-৯৬৮ পৃষ্ঠা খুললে তাঁরা দেখতে পাবেন সেখানে স্পষ্টাক্ষরে লেখা রয়েছে তাঁদের কি শাস্তি পাওয়া উচিত: "All Congressmen, whether they believe in the Congress programme and policies or not, are expected, and office-bearers and members of the Executive are in honour bound, to carry them out, and that office-bearers and members of the Executive who carry on propaganda or act against the Congress programme and policies are, in accordance with the rules made by the A. I. C. C., dated May 24, 1929, under Art XXXI of the constitution, clearly guilty of breach of discipline and liable to disciplinary action." ডাঃ খারের উপর যে জন্য "disciplinary action" নেওয়া হয়েছে, সত্যমূর্ত্তির উপর যে জন্য disciplinary action" নেওয়ার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা কি তার শতগুণ গুরুতর অপরাধ করেন নি? আর একটা কথা। কে তাঁদের বল্লে যে একই ব্যক্তি "বিশেষ কারণ" ব্যতীত সভাপতি পদে পুনঃনির্ব্বাচিত হ'তে পারেন না? কংগ্রেসের কর্ম্মি হিসাবে তাঁরা মাথার চুল পাকিয়ে ফেল্লেন অথচ কংগ্রেসের ইতিহাসও যে তাঁরা পড়েন নি একথা বিশ্বাস করতেও আমাদের ঘৃণা হয়। জওহারলাল নেহেরু কি দু'বার সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত হন নি? ফৈজপুর অধিবেশনের সময় পট্টভি কি তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁর শোচনীয় অবস্থার কথা মনে করে' শেষ পর্য্যন্ত withdraw করেন নি? তারপর তাঁরা যুক্তরাষ্ট্র-বিরোধিতা সম্বন্ধে যে বড় বড় কথা বলেছেন তাও মিথ্যা। কথা আর কাজ এক নয়। ভুলাভাই দেশাই, শঙ্কর রাও দেও প্রমুখ নেতৃবৃন্দের মনোভাব আজ আর কারও অবিদিত নেই। সত্যমূর্ত্তি তো ইচ্ছামত যুক্তরাষ্ট্র-পরিকল্পনাকে সমর্থন করে' তাকে সামান্য একটু ছাটকাট্ করে' গ্রহণ করবার জন্য নানা জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। সুতরাং কোন্ যুক্তি দিয়ে আমরা বিশ্বাস করব যে তাঁরা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিন্দনীয় যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ খারিজ করবেন? তাঁদের মনোভাব দেখলে সুভাষ বাবুর কথাই সত্য বলে' মেনে নিতে হয় যে: "It is widely believed that there is a prospect of a compromise on the Federal Scheme between the Right Wing of the Congress and the British

Government, during the coming year." সেইজন্যই সুভাষ বাবু বলেছিলেন যে তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতা থেকে সরে' দাঁড়াবেন যদি আচার্য্য নরেন্দ্র দেবের মত একজন সত্য যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা-বিরোধী বামপন্থী কংগ্রেসের প্রবীণ সভ্য এই পদের প্রার্থি হন। কিন্তু তা হয়নি, নির্ব্বাচনই হয়েছে। কংগ্রেসের তথা সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরা তাঁদের স্বাধীন বুদ্ধিতে ও বিচারে সুভাষ বাবুকেই কংগ্রেসের সভাপতি পদে এ বছরের জন্য পুনঃনির্ব্বাচিত করেছেন। সুভাষ বাবুর জয়লাভে আমরা আন্তরিক সুখী হয়েছি।

সুভাষ বাবুর জয় নির্দ্দিষ্টভাবে বামপন্থীদলেরই জয়। ভারতের বামপন্থী দলগুলির ঐক্যের সম্ভাব্যতা এই সভাপতি নির্ব্বাচনেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। আজ সুভাষ বাবুকে স্মরণ রাখতে হবে যে বামপন্থীরাই দেশের ভীষণতম সঙ্কটের কথা স্মরণ করে', সমস্ত পারিপার্শ্বিক ঘটনা বিশ্লেষণ করে', তাঁকে এ বছরের জন্য জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে পুনরায় নির্ব্বাচিত করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, তাঁদের ইচ্ছা পূরণ করা তাঁর নৈতিক কর্ত্তব্য। যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা আমাদের গলায় যাতে মৃত্যুফাঁস না পরিয়ে দেয় তার জন্য আইন অমান্য আন্দোলন করতে আমরা দ্বিগুণ উদ্যমে প্রস্তুত আছি। আর একটা ব্যাপার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কংগ্রেস সভাপতি নিজের রাজনৈতিক মতামতকে বিসর্জ্জন দিয়ে প্রত্যেক বছর কয়েকজন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকেই ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য নির্ব্বাচিত করেন। গত বছর সুভাষ বাবু তাই করেছেন এবং তাঁর পূর্ব্বে পণ্ডিত নেহেরুও তাই করেছেন। এই প্রথা না থাকাই একান্ত বাঞ্ছনীয়। এ বছর তাঁর কাছ থেকে কোন মতেই এই ব্যাপারের পুনর্ঘটন আমরা প্রত্যাশা করি না। তাঁর পিছনে যখন ভারতের গণমত রয়েছে তখন তাঁর আশঙ্কার কোন কারণ নেই। ভারতের এই নিদারুণ সঙ্কটের দিনে ভারতের জনগণ যেমন অক্লান্ত সংগ্রাম করে' তাঁকে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতার পদে পুনরায় নির্ব্বাচিত করেছেন, তখন তিনি উপযুক্ত গণনেতার মত নির্ভীকভাবে সংগ্রাম করবেন বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

বিনয় ঘোষ

৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯

কলিকাতা

গ্রন্থ-পরিচয়

Women and the Revolution

By Ethel Mannin, pp, 314

Secker & Warburg, 10-6d, 1938.

বিংশ শতকের প্রারম্ভে যে ক'টি আন্দোলন মানব সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি সাধনের পথে বিশেষ উৎসাহ, উদ্দীপনা ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছে তার ভিতর নারী প্রগতি (Suffragate) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নারী জাতির আত্মনিয়োগ ও অবিচলিত কর্ম্ম-নিষ্ঠার ফলে এ আন্দোলন উত্তর উত্তর সমাজ ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে গভীর ব্যাপকত্ব লাভ করেছে এবং ভাবরাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে জীবন সংগ্রামে প্রবল স্পষ্টতা লাভ করছে।

মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তীযুগে মানুষের চিন্তা ও কর্ম্মে নানা বিরোধ-বিপ্লব এসেছে। ফলে সমাজ-জীবন বড় সমস্যা সঙ্কুল ও কর্ম্ম-চঞ্চল হয়েছে। ইহার উদ্বেলিত ঘাত প্রতিঘাত স্ত্রী-পুরুষ সকলের অন্তরে নব নব প্রবর্ত্তন ও প্রচেষ্টা জাগাচ্ছে। এ সমাজ-বিবর্ত্তনের মধ্যে নারী শুধু কল্যাণময়ী গৃহলক্ষ্মী নয়, কর্ম্মসহচরী ও বটে। কাজেই জীবনের বহুমুখী ও বহুধা বিচ্ছিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে নারী আপনার কর্ত্তব্য সাধন করে আদর্শানুরাগ ও অগ্রগামিতার পরিচয় দিবে নিঃসন্দেহ।

বর্ত্তমান রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে বিপ্লবের নিষ্ঠুর প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। এ বিপ্লব আয়োজনে কর্ম্মীরূপে নারীর আবির্ভাব ও সহযোগিতা ঐতিহাসিক বিধির অভিব্যক্তি।

এথেল ম্যানিনের বইখানা বিপ্লবাত্মক সংগ্রামে নারীর দান ও কর্ত্তব্য কতটুক তার ধারাবাহিক বিবৃতি ও বিশ্লেষণ। বিপ্লব বল্‌তে সাধারণের একটা আতঙ্ক আছে। নারী কোমল হৃদয়া, কল্যাণময়ী। হিংস্র বীভৎসতা ও রক্তারক্তি তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। কাজেই বিপ্লব আন্দোলনে নারীর সহযোগিতা অবাঞ্ছনীয়। সেজন্য লেখিকা প্রথমেই বিপ্লবের অর্থ ব্যাপক ও কর্ম্মক্ষেত্র সমাজে বিস্তৃত করেছেন। তাই তিনি নারী বিপ্লবী এমা গল্ডম্যানের ভাষায় বিপ্লবের সংজ্ঞা দিয়েছেন।

'Social Revolution is a fundamental transvaluation of values. A transvaluation not only of social, but also of human values. The latter

are even pre-eminent for they are the basis of all social values. Our institutions and conditions rest upon deep-seated ideas. To change those conditions and at the same time leave the under-lying ideas and values intact means only a superficial transformation, one that can not be permanent or bring real betterment...... The ultimate end of all revolutionary social change is to establish the sanctity of human life, the dignity of man, the right of every human being to liberty and well-being—not mere external change 'but internal, basic, fundamental change'.

কাজেই এ সংজ্ঞানুসারে তার নিকট বিপ্লব শুধু ধ্বংসের জন্য নয়। নব সৃষ্টির প্রকাশোন্মুখ পরিণতির জন্য। 'of re-creation and new birth, not destruction and taking away'

তিনি নারী আন্দোলনকে শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করতে চান। বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নারীর উপর পুরুষের একাধিপত্য। সাম্যবাদের ভিত্তিতে সমাজ সংগঠন না হলে নারী পুরুষের ভোগ বিলাসের পণ্য হয়ে চিরকাল থাকবে। কাজেই সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করার জন্য নারীকে বিপ্লবাত্মক সংগ্রামে পুরুষের সহকর্ম্মীরূপে যোগ দিতে হবে।

আজকাল সমাজে বহু নারী আছেন যারা রাজনীতিতে মোটেই কোন উৎসাহ দেখান না। বরং ইহা হতে দূরে নিরাপত্তার পরিমণ্ডলে ভোগবিলাসময় জীবন যাত্রাই শ্রেয়ঃ মনে করেন। তার মতে জীবন সম্বন্ধেও এরা উৎসাহপরায়ণা নন।

'The woman who declares that she is 'not interested in politics' might as well declare that she is not interested in life, for today she can no more escape their implications than she can escape, this side of death, the ebb and flux of the world we live in'.

স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর সহযোগিতা ও আত্মদান বিভিন্ন জাতীয় বিপ্লবের ইতিহাস হতে তিনি সংগ্রহ করেছেন। এসকল নারীর গৌরব উজ্জ্বল কর্ম্ম প্রচেষ্টা, আদর্শ সিদ্ধির জন্য ত্যাগ ও দুঃখ বরণ পৃথিবীর ইতিহাসের এক অতুলনীয় অধ্যায়। ফরাসী বিপ্লবে, সাফ্রেগেট্ আন্দোলনে, গত মহাযুদ্ধে এবং বলসেভিক অভ্যুত্থানে ও স্পেনীয় যুদ্ধে নারী কর্ম্মীদের জীবন চরিত অতি সুনিপুণ হাতে এঁকেছেন। ভবিষ্যৎ বিপ্লবী নারী কর্ম্মীগণ এদের জীবনচরিত আলোচনায় অশেষভাবে উপকৃত ও অনুপ্রাণিত হবেন।

বর্ত্তমান নারী সমাজকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন 'The women of to-day must either ally themselves with freedom and life, or with oppression and

death ; either work for a brave new world, or surrender themselves and their children, to the doomed old world'.

বিপ্লবী নারী পৃথিবীর সকল সমাজে ও সকলদেশে আছে। তাদের নবভাবে ও নবপ্রাণে জাগ্‌তে হবে। পূর্ব্ববর্ত্তী নারী কর্ম্মীদের আলোকবর্ত্তিকা নিয়ে সংগ্রামের পথ প্রোজ্জ্বল করতে হবে।

There are such women, hidden in the ranks of women of all countries and all classes, women working for freedom and a better way of life for all, and awaiting the revolutionary situation which will call them into active service side by side with men, and in the company of the revolutionary women of the past ; and there are such women in the making, women not yet working, not yet aware, their eyes and hearts not yet opened ; some await awakening call, others a lead—but the material is there'.

The Conquest of Power : Liberalism, Anarchism, Syndicalism, Socialism, Fascism and Communism.

By Albert Weisbord. 2 Vols. Secker Warburg, 25s, 1938.

আদি যুগ হতে মানুষ সংঘবদ্ধ জীবনকে শক্তির উৎস বলে মনে করে আস্‌ছে। কাজেই মানব ইতিহাসের ক্রমাবর্ত্তনে সংহতি জীবন বিভিন্ন আদর্শবাদকে ভিত্তি করে নানা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। চিন্তা এবং পারিপার্শ্বিক জগতের সংঘাত ও সংযোগের ফলে সমাজ জীবন নানাভাবে উদ্বেলিত হয়। ইহার প্রতিক্রিয়া ও প্রতিফলনে রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে এবং অবস্থায় বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্ট হয়েছে। বর্ত্তমানকালে লিবারেলিজম্ হতে কমিউনিজম্ পর্য্যন্ত যাবতীয় 'ইজম্' রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশমান পরম্পরা।

Weisbord-এর সুবৃহৎ দু' খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থখানি বিভিন্ন চিন্তাধারাগুলিকে মার্কসীয় দৃষ্টি ও মনন ভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করে, বর্ত্তমান সামাজিক পরিবেশে লিবারেলিজম্, সিণ্ডিকেলিজম্ প্রভৃতি মতবাদের প্রয়োগক্ষেত্র কত সঙ্কীর্ণ ও প্রসারের পথ কত রুদ্ধ ইহা প্রমাণ করেছেন। শক্তির উৎস হয়েছে সংহতি। ইহা অর্জ্জন করতে হলে সংঘবদ্ধভাবে সমষ্টি জীবনের উন্নতি সাধন করতে হবে। যে রাজনৈতিক আদর্শ ও মতবাদ বাস্তবক্ষেত্রে মূর্ত্ত হয়েছে তাহাই শুধু সমষ্টি জীবনকে স্থায়ী ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কোন্ মতবাদ ও কার্য্যক্রমের সক্রিয় অনুসরণে ইহা সম্ভব বর্ত্তমানে ইহাই সকলের প্রশ্ন। কোন মতবাদই স্বয়ংসম্পূর্ণ বা সর্ব্ববাদীসম্মত নয়। প্রত্যেক মতবাদের

অসংখ্য সমর্থক ও পরিপোষক আছে এবং 'carry behind them the weight and momentum of enormous masses. These 'isms' have become powers and forces, that clash for the mastery of the world.' এই পুস্তকখানি রাজনৈতিক চিন্তা ও আদর্শবাদের একটি সুন্দর ধারাবাহিক ইতিহাস। ছয়টি আদর্শকে ভিন্নভাবে আলোচনা করে অতীত ও বর্ত্তমান পরিবেশে ইহাদের পরিবর্ত্তন ও গরিবর্দ্ধন বিশ্লেষণ করেছেন। বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার মর্ম্মকোষেই ধনতান্ত্রিকতার ধ্বংস নিহিত আছে। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে সমাজ হতে ইহা বিলুপ্ত হবে। এই বইখানি পুঁজিবাদ কিভাবে বিনষ্ট হবে মার্কসীয় বিশ্লেষণ দ্বারা তাহার নির্দ্দেশ দিয়েছে। এবং ইহা যে শুধু 'analysis of the evolution of revolutions' তা নয়, 'it is also a manual of insurrection.'

এ পুস্তকখানির ন্যায় বিপ্লব আন্দোলনের এমন ধারাবাহিক ও তথ্যপূর্ণ ইতিহাস খুব কম আছে। রাষ্ট্র ও সমাজে যারা বিপ্লব আনতে চান তারা এ বইখানা পড়ে বিশেষ উপকৃত হবেন নিঃসন্দেহ।

টাকার কথা

অধ্যাপক অনাথ গোপাল সেন।

মডার্ণ বুক এজেন্সী মূল্য ১॥০।

বহু বিদ্বজ্জন প্রশংসিত এবং একাধিক সংবাদপত্রে সমালোচিত 'টাকার কথা' নূতনভাবে আবার সমালোচনা করার প্রয়োজন বোধ হয় অনেকে মনে করেন না। কিন্তু যে পুস্তক ধন বিজ্ঞানের দুর্বোধ্য সূত্রগুলি শুধু সকলের বোধগম্য করে নাই, সাহিত্যের প্রাণরসে জীবন্ত করে তুলেছে, তার পুনরালোচনা এবং বহুল প্রচার কামনা কখনই বাহুল্য হতে পারে না। বিলাতে জটিল বিষয়কে সুখপাঠ্য ও সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর অনেক বই প্রকাশিত হয়। এদের প্রচার ও চাহিদা অসম্ভব রকম। আমাদের দেশে এরূপ সম্ভাবনা নেই, কিন্তু সাধারণকে জ্ঞানের পরিধির ভিতর আনতে হলে ইহা একান্ত দরকার। প্রচার দ্বারা সে সম্ভাবনার পথ কিছুটা সুগম করা যায়। কাজেই পুনরালোচনার খানিকটা প্রয়োজন সব সময়ই থাক্‌বে। বাংলা ভাষা এখনও তেমন সমৃদ্ধ নয়। পরিভাষার একান্ত অভাব। অনাথবাবু অর্থনৈতিক জটিল সমস্যাগুলিকে সরল চিত্তাকর্ষক ভাষায় আলোচনা করে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ করেছেন। এ প্রচেষ্টায় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের দানও কম নয়। রাসেলের Outline of philosophy-খানা পড়ে আমাদের শরৎচন্দ্র বলেছিলেন,—সাধারণ পাঠকের জন্য রাসেল সাহেবের কত দরদ এবং জটিল বস্তু সহজ-বোধ্য করার কতই প্রয়াস'। আমরাও অনাথবাবু সম্বন্ধে কিছুটা সেরূপ উক্তি করতে পারি।

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভার সভাপতিপদে সুভাষচন্দ্র পুনরায় নির্ব্বাচিত হোয়েচেন। নির্ব্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বীতার আরম্ভে মহাসভায় সংহত শক্তিগুলির মধ্যে যে বিরোধের সুচনা দেখা দিয়েছিল নির্ব্বাচনের পরে গণতন্ত্রের সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মানুযায়ী তার অবসান না হোয়ে বিরোধ ক্রমেই গভীর ও ব্যাপক হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে।

১৯৩৪ সালে বোম্বাই অধিবেশনে কংগ্রেসের শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তিত হ'বার পর কংগ্রেসের সভাপতিপদ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হোয়েছে। পরিবর্ত্তিত শাসনতন্ত্রে সভাপতি নির্ব্বাচনে সাধারণ সভ্যদের প্রত্যক্ষ প্রভাব স্পষ্টভাবে স্বীকার করা হোয়েছে—যদিও তাদের প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। নতুন শাসনতন্ত্রে কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি মনোনয়নের ভারও সম্পূর্ণরূপে সভাপতিকেই দেওয়া হোয়েছে। বর্ত্তমান আলোচনা ও বিতণ্ডায় আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থায় সভাপতিকে যথাসম্ভব গণ-প্রতিনিধি করা ও কংগ্রেসের নীতি এবং পদ্ধতি কার্য্যে পরিণত করবার অপ্রতিহত সুযোগ দেওয়া হোয়েছে। কংগ্রেসের শৈশবে এমন কি বর্ত্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্য্যন্ত কংগ্রেসের সভাপতিপদ যদিও দেশের অনেক কৃতী ও গুণী সন্তান অলঙ্কৃত করেছেন তবুও তাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন পরিচালনা করাই ছিল কংগ্রেস সভাপতির সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। বছরের বাকী সময়টুকু নিয়মের বাঁধারাস্তায় কাটিয়ে দিয়ে নতুন সভাপতির জন্য স্থান করে দিতেন। আজীবন স্বদেশসেবা ক'রে জীবন-সায়াহ্নে উপনীত হোলে দেশ তাদের স্বদেশ-সেবা স্বীকার ক'রে নিত এই গৌরবের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে। তখনকার দিনে সভাপতির পদটা ছিল আলঙ্কারিক—দেশের আশা-আকাঙ্খার প্রোজ্জ্বল প্রতীক্। কিন্তু বিগত আঠার বৎসরের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব যেভাবে বিস্তার লাভ করেছে বিশেষ ক'রে—বিগত আইন অমান্য আন্দোলনের পর কংগ্রেসের গতির দিকে দৃষ্টি রেখে বলা যেতে পারে যে বর্ত্তমানকালে কংগ্রেসের সভাপতিকে সভার অধিনায়কত্ব ছাড়াও সমগ্র দেশের অধিনায়কত্ব কোরতে হয়। তাই রাষ্ট্রবিহীন রাষ্ট্রেও অনাগতকালের রাষ্ট্রের কথা স্মরণ ক'রে বর্ত্তমানকালের সভাপতির গুরুদায়িত্ব বুঝাবার জন্যে সভাপতির চেয়ে রাষ্ট্রপতি আখ্যাটাই উপযোগী।

উপরিলিখিত পরিপ্রেক্ষিতে এ বছরকার রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন সমস্যার আলোচনা করব।

এ বছরকার নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে প্রথমে তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সুভাষচন্দ্র বসু ও ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া। মৌলানা আজাদের ডাঃ পট্টভির সপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হোতে সরে দাঁড়াবার পর জানা যায় যে ডাঃ পট্টভি শেষ মুহূর্ত্তে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে রাজী হোয়েছেন। সুভাষচন্দ্রের সহিত তাঁর সহকর্ম্মীদের আভ্যন্তরীণ কোন মতান্তর ছিল কিনা তা পূর্ব্বে প্রচ্ছন্ন এবং অস্পষ্ট থাকলেও মৌলানা আজাদের বিবৃতিতে ডাঃ পট্টভির পক্ষে ভোট দেবার ওকালতিতে বিরোধ সর্ব্বপ্রথম জনসমাজের গোচরে আসে। এ বছরের নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতা এবং বিরোধের মূলেই ছিল এই বিবৃতি। এই বিবৃতির বিরুদ্ধে অভিযোগ শুধু যে বিশেষ কোন রাজনৈতিক সংহতির তা নয়।

কংগ্রেসের মধ্যে সংহত বিভিন্ন মতাবলম্বী অনেকগুলি শক্তি বরাবরই কাজ ক'রে আসছে। এই বিভিন্ন শক্তিগুলির মধ্যে মতের ঐক্য না থাকলেও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রবার জন্য সকলেই বদ্ধপরিকর। বিগত আইন অমান্য আন্দোলনের পর শক্তিগুলির আদর্শের বিভিন্নতা সুস্পষ্ট রূপ নিলেও বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ করবার কথা কেউ কখনও বিস্মৃত হন নাই। যদিও বামপন্থী দলগুলির চরমনীতি অনেকক্ষেত্রেই দক্ষিণপন্থীদের মনঃপূত হয় নাই, তবুও তারা কখনও এমন অবস্থা সৃষ্টি করেন নি যা বিচ্ছেদ ডেকে আনবে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে মিলনের পথ প্রশস্ত ক'রবার দিকে দৃষ্টি বরাররই বামপন্থীরা দিয়ে এসেছে। পূর্ব্বেই বলেছি— সভাপতি নির্ব্বাচন উপলক্ষে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তার আশু কারণ মৌলানা সাহেবের বিবৃতি। বিবৃতিতে যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে সেটা অসঙ্গত ও অনিয়মতান্ত্রিক। এইপ্রকার মনোভাবের নজির আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। অন্যান্য বছর একাধিক ব্যক্তি নির্ব্বাচন প্রার্থী হোলে, অনিচ্ছুক প্রার্থীরা অনাড়ম্বরে নির্ব্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান, কিন্তু পট্টভির অনুকূলে ভোট দেবার অনুরোধ করে মৌলানা সাহেবের অপসরণ নিতান্তই তৃতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর নির্লজ্জ বিরুদ্ধতা। তিনজন প্রার্থীই যেখানে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য এবং তাদের মধ্যে একজন সভাপতি, সেখানে এই প্রকার ব্যবহার অশোভন ও রাষ্ট্রনৈতিক রুচি-বিগর্হিত। এই বিবৃতির উত্তরে সুভাষচন্দ্র যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে বিশেষ করে দক্ষিণ-পন্থী মনোভাব যে ভারত শাসন আইনের ফেডারেশন রদ-বদল করে গ্রহণ করবার অনুকূল সে কথাই বলেছেন ও পূরোপূরি ফেডারেশন বিরোধী কোন বামপন্থী নেতাকে সভাপতি নির্ব্বাচন ক'রলে তিনি প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়াবেন সে কথাই বলেছেন।

কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় একদল লোক কিছুদিন যাবৎ ফেডারেশনের অনুকূলে মতামত প্রকাশ করে দেশে একটা সংশয়ের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন। এ কথা আজ অস্বীকার করবার উপায় নাই। এ বিষয়ে মিঃ সত্যমূর্ত্তি ও মিঃ ভুলাভাই দেশাই-ই অগ্রণী। গত এক বছরের মধ্যে সময় এবং সুযোগ পেলেই সত্যমূর্ত্তি একবার ফেডারেশন গ্রহণ করবার উপযোগীতা প্রচার ক'রে

নিয়েছেন—অবশ্য কিছু ছাটকাট করে। ভুলাভাই দেশাই মহাশয় ইংলণ্ড প্রবাসের সময়ও এই প্রকার সংশয়ের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন—সে কুজ্ঝটিকা আজও দূর হয় নি। ওয়ার্কিং কমিটি (কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি) কিছুদিন আগে সত্যমূর্ত্তির এই অপপ্রচার দূর ক'রবার জন্য মনোযোগ দিয়েছেন কিন্তু ফেডারেশন সম্পর্কে যে সন্দেহ জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল হোয়েছে তা দূর করবার জন্য এ মনোযোগ নিতান্ত ক্ষীণ। যদি এক বছর আগে সত্যমূর্ত্তি প্রমুখ রথীদের বাক্‌সংযমের দিকে ওয়ার্কিং কমিটি মনোযোগ দিতেন তা হোলে বাম ও দক্ষিণ-পন্থী সঙ্কট এত শীঘ্র আমাদের সামনে উপস্থিত হ'ত না। এটা আর কারও অবিদিত নেই যে কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদের কংগ্রেসী নেতা ও উপনেতা কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী সাব-কমিটির সভাপতি ও দক্ষিণপন্থীদের মুখপাত্র বল্লভভাইয়ের নিকট দক্ষিণপন্থী মনোভাব প্রচারের উদ্দাপনা পেয়ে থাকেন। এমন কি সর্দ্দারজী নিজেও নির্ব্বাচন উপলক্ষে এক বিবৃতিতে বলেছেন —"আমি ওয়ার্কিং কমিটির এমন কোন সভ্যকে জানিনা যারা ভারত শাসন আইনের ফেডারেশন গ্রহণ করতে চায়।" কিন্তু এই বিবৃতির দ্বন্দ্বে কোথাও তিনি গণপরিষদের কথা উল্লেখ করেন নাই।

সুভাষবাবুর প্রথম বিবৃতির উত্তরে ওয়ার্কিং কমিটির সাতজন সদস্য যে বিবৃতি প্রচার করেছেন তা নিতান্তই অদ্ভুত ও কুযুক্তিপূর্ণ। সুভাষবাবুর পুনর্নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে কয়েকটী যুক্তি তাঁরা দিয়েছেন—(১) বিশেষ প্রয়োজন না হোলে পুনর্নির্ব্বাচন অপ্রয়োজনীয় (২) কংগ্রেসের সভাপতি শুধু সভারই অধিনায়কত্ব করেন (৩) যুক্তরাষ্ট্র (ফেডারেশন) সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির মতামত সুস্পষ্ট (৪) নির্ব্বাচন সর্ব্ববাদিসম্মত হয়।

পূর্ব্বেই বলেছি ১৯৩৪ সালের পরে কংগ্রেসের সভাপতি নতুন মর্য্যাদা লাভ করেছেন এবং তিনি শুধু সভারই অধিনায়কত্ব করেন না। জওহরলালজীও তাঁহার বিবৃতিতে বলেছেন সভাপতি শুধু 'speaker' নন। এখানে বলা যেতে পারে যে কংগ্রেসের গণসংযোগ নীতি একান্তই জওহরলালজীর সভাপতিত্বের দান। সেরূপ Industrial Planning Commission-এর পরিকল্পনাও সুভাষচন্দ্রের দান। দেশকে পরিচালনা করবার ভার তাঁরা নিয়েছিলেন—শুধু বাঁধা নিয়মের রাস্তায় তাঁরা চলেন নি। পুনর্নির্ব্বাচনের এত নজির রয়ে গেছে যে এ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা বাহুল্য। কংগ্রেসের এই ধুরন্ধরেরা কি প্রকারে এ রকম খেলো কথা বলতে পারেন সেটা বিস্ময়ের বিষয়।

জওহরলালজীর পুনর্নির্ব্বাচন সেদিনকার ব্যাপার যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে দক্ষিণপন্থী মনোভাব আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করেছি। দক্ষিণপন্থী নেতারা যদি সুভাষবাবুর বিবৃতি অনুযায়ী কোন বামপন্থী নেতাকে সভাপতি করতেন তা হোলেই জনসাধারণের যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে সংশয় দূর হত। ডাঃ পট্টভিকে নির্ব্বাচনে প্রার্থী করতে দক্ষিণপন্থী নেতারা যে কৌশল অবলম্বন করেছেন, এই রকম গর্হিত ব্যবস্থা সংশয় দূর না কোরে আরও ঘনীভূত ক'রেছে।

সভাপতি নির্ব্বাচনে প্রতিযোগিতাও নতুন না। ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের বিচ্ছেদ হয়। সেই বৎসর ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে তিলক প্রমুখ চরমপন্থী নেতাদল তাদের নির্ব্বাচিত কাউকে সভাপতি করতে চেষ্টিত হয়েছিলেন। ১৯২৯ সালের সভাপতি নির্ব্বাচনেও প্রতিযোগিতা হয়েছিল। সর্দ্দার বল্লবভাই, পণ্ডিত জওহরলাল ও গান্ধীজী—এই তিন জন ছিলেন প্রার্থী। অধিক সংখ্যক প্রদেশ গান্ধীজীকে নির্ব্বাচিত করে কিন্তু গান্ধীজী রাজী না হওয়ায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে জওহরলাল সভাপতি হন।

কংগ্রেসের নিয়মানুগত্য অস্বীকার করলে যে শাস্তি সভ্যদের প্রাপ্য, এই সপ্তর্ষিমণ্ডলেরও তাই প্রাপ্য। তারা সভাপতির মনোনীত সভ্য। সভাপতিরই অসাক্ষাতে এবং অন্যান্য সভ্যের মতামতের অপেক্ষা না রেখে তাঁরা যে ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিয়েছেন তা নিতান্ত শোচনীয়। নরীম্যানের ব্যাপারে বল্লবভাইয়ের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ শোনা গিয়েছে, খারের নির্ব্বাসনের সময় যে অভিযোগ দ্বিগুণিত হোয়েছে সভাপতি নির্ব্বাচনে সে অভিযোগ বাঁধ ভেঙ্গে সারা দেশ প্লাবিত কোরেছে। বল্লভাই কংগ্রেসের নামে যে একনায়কত্বের অভিনয় কোরেছিলেন জনসাধারণ এবার তার প্রতিকারের ব্যবস্থা কোরেছে সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্ব্বাচনে। কার্নাটিক, তামিল-নাড়, কেরালা শুধু সুভাষচন্দ্রের জয়ে সাহায্য করেনি, তারা বল্লবভাইয়ের ফ্যাসিষ্ট মনোবৃত্তিরও স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে।

নির্ব্বাচনে সুভাষচন্দ্র দুটী নীতির কথা উত্থাপন করেছিলেন (১) সভাপতি নির্ব্বাচনে সভ্যদের নিজ নিজ বিচার প্রয়োগ করবার অধিকার ও (২) যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধতা। সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচনে এই দুটি নীতিই স্বীকৃত হোয়েছে। সর্দ্দারগোষ্ঠীর হটকারিতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সভাপতিপদের মর্য্যাদা উন্নীত করে ত্রিপুরী অধিবেশনের সভ্যরা দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হোয়েছেন। সভাপতিকে বল্লবভাই গোষ্ঠী করতে চেয়েছিলেন উপদলের ক্রীড়নক। ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় তাঁকে শুধু নামে মাত্র 'সভাপতি' করাই ছিল এঁদের উদ্দেশ্য। সুভাষচন্দ্রের জয়ে সভাপতির পদ যুক্তরাষ্ট্রের (আমেরিকার) সভাপতির অনুরূপ হল। ভারতশাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে জওহরলালজী তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন—কংগ্রেসের মত সুস্পষ্ট। এ বিষয়ে আমরা জওহরলালজীর সঙ্গে একমত হোতে পারলাম না। এর কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলেছি। এ কথা আমরা স্বীকার করি যে নির্ব্বাচনের ফল যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার উপরই শুধু নির্ভর করে নাই। কিন্তু এটুকু নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে যে নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতার যে বাক্-বিতণ্ডার অবতারণা করা হোয়েছে তাতে যুক্তরাষ্ট্র-বিরুদ্ধ মনোভাব আরও সুস্পষ্ট হোয়েছে এবং নির্ব্বাচনের ফলও তারই ইঙ্গিত কোরেছে।

নির্ব্বাচনের আগে মহাত্মাজীর মতামত জানবার জন্যে দেশ উন্মুখ হোয়েছিল। মহাত্মাজী নির্ব্বাচনের আগে এ-সম্বন্ধে কোন প্রকার ইঙ্গিতও করেন নাই। কিন্তু নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পরে যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে দেশ বিক্ষুব্ধ ও স্তম্ভিত হোয়েছে। বিবৃতিতে যে যে বিষয়ের অবতারণা

করেছেন তা সংক্ষেপে এই—(১) তিনি বরাবরই সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচনের বিরোধী ছিলেন (২) পরাজয় ডাঃ পট্টভির নয়, গান্ধীজীর ব্যক্তিগত পরাজয়; কাজেই সভ্যগণ গান্ধীবাদের বিরোধী (৩) প্রয়োজন হোলে সংখ্যালঘিষ্ঠ গান্ধী-সম্প্রদায় কংগ্রেসের বাইরে আসবে।

গান্ধীজীর বিবৃতির আগাগোড়াই হতমান ব্যক্তির স্পর্দ্ধিত-চিত্তের রুদ্ধ বিক্ষোভে ভরা। মহাত্মার স্বভাবসুলভ নমনীয়তা যেন মুহূর্ত্তেই অপসারিত হোয়েছে। সাধারণ ব্যক্তির রুদ্ধ-রোষ সহনশীলতার মাত্রা ছাড়ালে যেমন অসংযত ভাবে আত্মপ্রকাশ করে, মহাত্মার বিবৃতিতে তারই যেন আভাস দেখতে পাই।

সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্ব্বাচনের তিনি বিরোধী ছিলেন কিন্তু কেন বিরোধী ছিলেন সে সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই। আপত্তির সঙ্গত কারণ থাকলে সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাতেই তার আলোচনা করে গান্ধীজীও ওয়ার্কিং কমিটির দ্বিতীয় ব্যক্তিকে মনোনীত করা উচিত ছিল। গণতন্ত্রে কোন প্রকার ষড়যন্ত্রের স্থান নাই। ষড়যন্ত্র ও স্বৈরাচার সহযাত্রী। বল্লবভাই সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্ব্বাচন সম্পর্কে কারণ না দেখিয়েই বলেছেন যে তাঁর নির্ব্বাচন "দেশের পক্ষে অমঙ্গলকর"। গান্ধীজী এই উক্তি যোগ্য বলেই মনে করেছেন কিন্তু সহকর্ম্মীদের সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের উক্তিকে বলেছেন "unjustified and unworthy"—অপ্রাসঙ্গিক ও অযোগ্য। গান্ধীজীর বিবৃতিতে কয়েকটী বিষয় আমরা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করি—(১) সুভাষচন্দ্রের জয়ে গান্ধীবাদ পরাজিত হোয়েছে—একথার যুক্তিসঙ্গত কারণ আমরা খুঁজে পাই না। নির্ব্বাচন বিতর্কের অবকাশে কোথাও গান্ধীবাদের কথা উঠে নাই। একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র সমস্যা ও বল্লভভাইয়ের ফ্যাসিষ্ট মনোভাবই নির্ব্বাচনের আসন্নকাল অবধি সভ্যদের মন আলোড়িত করেছে। তাঁহার নীতি ও আদর্শ এখন পর্য্যন্ত কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতি প্রভাবান্বিত করে। গান্ধীবাদের পরাজয়ের অহেতুক গ্লানি মহাত্মাজী বহন কোরে ভবিষ্যতের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন—তা সত্যই আমাদের বিহ্বল কোরেছে। (২) কংগ্রেসের ভূয়া সদস্য সম্বন্ধে গান্ধীজীর মত সুবিদিত। কিন্তু নির্ব্বাচন উপলক্ষে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করার পশ্চাতে যে ইঙ্গিত রয়েছে, তা অত্যন্ত অনুদার ও স্থূল। দক্ষিণপন্থীদের অসহযোগের যে ইঙ্গিত গান্ধীজী করেছেন তা সত্যই গণতন্ত্রবিরোধী। ভারতবর্ষে গান্ধীজীর প্রভাব অতুলনীয়। গান্ধীজী যদি দক্ষিণপন্থীদের কংগ্রেসের বাইরে নিয়ে আসেন তবে সেটা অসহযোগেরই নামান্তর হবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলির ঐক্য ও সংহতির উপরই গণতন্ত্রের সত্বা নির্ভর করে। গান্ধীজীর এই প্রচ্ছন্ন হুমকি কার্য্যে পরিণত হোলে বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের শক্তি শতধা হোয়ে পড়বে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন পঙ্গু হোয়ে পড়বে। কিন্তু এই বিচ্ছেদ যদি একান্তই আসে—সে বিভেদ সৃষ্টির দায়িত্ব থাকবে দক্ষিণ-পন্থীদের।

নির্ব্বাচনে যে অবস্থার সৃষ্টি হোয়েছে তাতে বামপন্থীদলগুলির সংহতি গড়ে উঠলে আমরা সুভাষ বাবুর নির্ব্বাচনে জয় সার্থক বলে মনে করব। গান্ধীজীর বিবৃতিতে যে অবস্থার উদ্ভব হোয়েছে, দক্ষিণ-পন্থীদের আচরণে যে মনোভাব প্রকাশিত হোয়েছে, তাতে এই সংহতি নিতান্তই

দরকার, কারণ যদি বিভেদ ও বিচ্ছেদ দক্ষিণ-পন্থীরা সৃষ্টি করেন, বামপন্থীদের সেই অবস্থার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় এসেছে। বামপন্থীরা দক্ষিণপন্থীদের অসহযোগ চান না, কিন্তু যদি তাঁরা অসহযোগ করেন—কংগ্রেস থেকে অবসর গ্রহণ করেন,— বামপন্থীরা নেতৃত্ব গ্রহণ করে কংগ্রেসকে অবিচলিতভাবে নতুন পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন—আমাদের আশা আছে।

প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ

জলপাইগুড়িতে এবারকার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন নানাদিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের পর এই সম্মেলনই বৃহত্তম রাজনৈতিক সম্মেলন—নির্ব্বাচনের প্রভাব এই সম্মেলনের উপর কি হয় পরীক্ষার জন্য বাঙ্গলার ও বাঙ্গলার বাইরের রাজনৈতিক মহলের কৌতূহল হওয়া বিচিত্র নয়। দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত উপস্থিতি এই সম্মেলনের গুরুত্ব আরো বাড়িয়েছে।

এবারকার সভাপতির অভিভাষণ ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কবর্জ্জিত সাধু সঙ্কল্প মাত্র নয়, ভারতের ও বাঙ্গলার বিশেষ সমস্যাগুলি সম্পর্কে দূরদর্শিতা ও দৃঢ়তার সহিত আলোচনা হোয়েছে এবং সমস্যা সমাধানের উপরও নির্দ্দেশ করা হোয়েছে। প্রথমতঃ সভাপতির অভিভাষণ আলোচনা করা যাক্। নির্ব্বাচনের ফলে কংগ্রেসের মধ্যে মতবিরোধ ও বিভেদের অশুভ ছায়া দেখে যাঁরা আতঙ্কিত হোয়ে উঠেছেন. শরৎ বাবুর এসম্পর্কে নিম্নোক্ত উক্তি তাঁদের আশ্বস্ত করবে।

"কংগ্রেস বহুবৎসর ধরিয়া বহু বিবেচনার পর প্রায় একবাক্যে যে নীতির অনুমোদন করিয়াছে, যে নীতি কংগ্রেসের মূল ধর্ম্মের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত......সেই নীতি সম্বন্ধে যদি কাহারও দ্বিধা থাকে তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে কংগ্রেসের মধ্যে থাকা দুরূহ হইতে পারে একথা আমি জানি। কিন্তু কার্য্যক্রমের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কংগ্রেসের অনুমোদিত নীতি কোন্ বিশেষ অবস্থায় কোন্ কৃত্যের ভিতর দিয়া আত্ম প্রকাশ করিবে, উহা নির্ভর করে প্রথমতঃ অবস্থার উপর, দ্বিতীয়তঃ অবস্থা বিবেচনা করিয়া কংগ্রেসের সভ্যবৃন্দ যে নির্দ্দেশ দিবেন তাহার উপর।"
মূল নীতির দিক দিয়ে কোন মতভেদ সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত উদ্দেশ্যকে লাভ করবার উপায় নিয়ে বিভেদ হওয়া উচিত নয়। সংগ্রামের কোন স্তরে কোন বিশেষ অস্ত্রটী প্রয়োগ করা হবে ও কোন্ ক্ষণ তার পক্ষে প্রকৃষ্টতম—তা বিচার কোরে নির্দ্ধারণ করবার দায়িত্ব কংগ্রেসের সভ্যদের—যদি সমষ্টিগত নির্দেশ সম্পর্কে ব্যক্তিবিশেষের দ্বিধা থাকে তবে—সে স্থলে উদ্দেশ্য লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন বিভেদ সৃষ্টি দ্বারা জাতীয় সংহতি ও ঐক্যকে দুর্ব্বল না কোরে, সমষ্টির নির্দ্দেশই মেনে নেওয়া উচিত। কারণ পূর্ণ স্বরাজ লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা একটী যুদ্ধমান জাতি—এবং যুদ্ধমান জাতির পক্ষে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি অপরিহার্য্য। একদিকে একথাটী [illegible] যেমন স্মরণ রাখা উচিত অন্যদিকে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি যাতে গতিশীলতাকে

রুদ্ধ না করে, সেদিকেও নেতা ও কর্মী উভয়েরই সচেতন হওয়া প্রয়োজন। অতীতে যাই হোক আধুনিক কালে কোন বিশেষ জাতির ভাগ্য আর সম্পূর্ণ তার নিজস্ব ভৌগলিক সীমার দ্বারা খণ্ডিত নয় বরং বিশ্বের অখণ্ড, উদার, জটিল পটভূমিতে জাতির ভাগ্য নির্দ্ধারণ ক্রমেই অনিবার্য্য হোয়ে উঠছে। বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার একমাত্র উপায়, চিন্তা ও কর্মের গতিশীলতা। এদিক দিয়ে সভাপতি মহাশয়ের মন্তব্য যুগোপযোগী হোয়েছে।

"বহির্জগৎ সম্বন্ধে জাগরুক থাকাও আমাদের পক্ষে আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছুকাল আগে পর্য্যন্তও আমাদের রাষ্ট্রীয় চেতনা ও কর্ম দেশের সীমার মধ্যে একান্ত ভাবে আবদ্ধ ছিল। সম্প্রতি অন্য ধারা বহিতে সুরু হইয়াছে। ...বর্ত্তমানযুগে সমগ্র মানব জাতি ঐক্যমুখীন, এই যুগে কোনও জাতির একক চেষ্টায় অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না।"

জগতের সকল স্বাধীনতাকামী সাম্যবাদীদের স্বৈরতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম ভারতের সংগ্রামকে তার সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে দেখতে হবে। অন্যান্য স্বাধীনতাকামী জাতিদের সহানুভূতি ও সহায়তা প্রত্যাশা আমরা যথার্থই করতে পারি। ভারতবর্ষের নিজের শক্তির উপরে প্রধানতঃ নির্ভর কোরতে হবে সত্যকথা, কিন্তু অন্যান্য জাতিগুলিকে একথা বোঝাবার দায়িত্বও ভারতের যে তার স্বার্থ ও জগতের স্বার্থ বিচ্ছিন্ন নয়, ভারতের মুক্তিতে ভারতেরই শুধু লাভ নয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতিদেরও অসীম শক্তি বৃদ্ধি হবে।

প্রাদেশিক ক্ষেত্রে মন্ত্রীমণ্ডলীকে স্থায়ী করাই কংগ্রেসের আদর্শ নয়—কংগ্রেসের আদর্শ পূর্ণ স্বরাজ লাভ এই মন্তব্য দ্বারা সভাপতি মহাশয় নিয়মতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সময়োপযোগী সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। কংগ্রেস যখন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের আওতায় মন্ত্রীত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হয় তখন তার উদ্দেশ্য ছিল নূতন শাসন তন্ত্রকে অচল প্রমাণ করা এবং যে সামান্য সুযোগ এতে পাওয়া যাবে তার দ্বারা বৃহত্তর সংগ্রামের জন্যে গণসাধারণকে প্রস্তুত করা। কোন ক্ষেত্রেই একে স্থায়ী করবার মনোভাব কংগ্রেস স্বীকার করেনি। কিন্তু মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পর বৎসরাধিক কাল অতীত হোয়েছে, এসময়ের মধ্যে সংগ্রামশীল মনোভাব নিশ্চিতভাবে হ্রাস হোয়ে "কূপ খননে ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার" যে যৎকিঞ্চিৎ সুযোগ এতে পাওয়া গেছে তাকেই চরম ও পরম বলে মনে করবার মনোভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এছাড়া বাঙ্গলার বিশেষ সমস্যার মধ্যে ভাষার ভিত্তিতে বাঙ্গলাদেশ গঠনের দাবী, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী ও বাংলায় কংগ্রেসপন্থী মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অভিভাষণে উল্লেখ আছে। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের যৌক্তিকতা ও নীতি কংগ্রেস যখন স্বীকার ও গ্রহণ করেছে তখন বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশকে এভাবে পূর্ণ গঠনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বাংলা ভাষাভাষী বিস্তৃত অঞ্চল বিহার ও আসামের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, বিহার ও আসাম উভয় স্থানেই কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব করছেন, যাতে বাংলার ন্যায্য দাবী স্বীকৃত হয় তার জন্য তাঁদেরও চেষ্টা

করা উচিত। তারপর রাজনৈতিক মুক্তি প্রশ্নর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীমণ্ডলের কথা ওঠে—প্রায় দু বছর হোতে চোল্ল নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হোয়েছে—কংগ্রেসী প্রদেশগুলিতে শাসন ভার গ্রহণ করবার পর সর্বত্র রাজনৈতিক বন্দীদিগের মুক্তি দেওয়া হোয়েছে এবং তার ফলে কোথাও কোন অঘটন ঘটবার সংবাদও আমরা পাইনি কিন্তু বাংলা সরকার এদিক দিয়ে বাংলার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। দুবছর পর এখনো বাংলার কারাগারে বন্দীরা অনশন করে দেশবাসীর দৃষ্টি তাদের বন্ধনের প্রতি আকৃষ্ট করবার জন্য, কিন্তু দেশবাসীর কোন চেষ্টাই আজ পর্য্যন্ত সফল হোলনা।

প্রাদেশিক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী আলোচনা করলে একটী বিষয় সুস্পষ্ট হয়, যে রাজনৈতিক প্রয়োজনের দিক্ দিয়ে দৃষ্টি রেখে এগুলি গঠিত ও গৃহীত হোয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত প্রস্তাব সম্মেলনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এবং বাংলার তরফ থেকে এই একটীমাত্র প্রস্তাব ত্রিপুরী কংগ্রেসের সম্মুখে উত্থাপিত করা হোয়েছে। প্রস্তাবটী তিনটী অংশে বিভক্ত, প্রথমাংশে বলা হোয়েছে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি ইউরোপে স্বীকৃত হোয়েছে এবং এই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রক্ষার জন্যই বৃটিশ জাতি মহাযুদ্ধে লিপ্ত হোয়েছিলেন বলে ঘোষণা করা সত্ত্বেও ভারতের বেলায় সে আত্মনিয়ন্ত্রণ দিতে স্বীকৃত নন, তার প্রমাণ ১৯৩৫এর ভারত শাসন আইন, যা পূর্ববর্ত্তী অনুরূপ আইন অপেক্ষাও প্রতিক্রিয়াশীল বলে গণ্য হয়। ২য় অংশে আছে জনসাধারণের অভিপ্রায় অনুযায়ী কংগ্রেসের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবী, ৩য় অংশে আছে এই দাবী অগ্রাহ্য হোলে কংগ্রেস এমন এক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করবে যাতে এই দাবী স্বীকৃত হয়।

এই প্রস্তাবের বিশেষত্ব যে এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেস ঘোষণা কোরেছে গণ-পরিষদই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র গঠন করবে। আলোচ্য প্রস্তাবে গণ-পরিষদের পরিবর্ত্তে কংগ্রেসের উপরই সে ভার দেওয়া হোয়েছে। কংগ্রেসের উপরে এ ভার দেবার সপক্ষে দুইটী যুক্তি দেওয়া হোয়েছে ১মতঃ কংগ্রেস সংগ্রাম কোরে যদি অধিকার অর্জনই করতে পারে তবে শাসনতন্ত্র গঠন করবার দায়িত্বও তার ২য়তঃ সংগ্রামের শেষ অবস্থায় শাসনতন্ত্র গঠন করবার অধিকার লাভ করবার পর—গণ-পরিষদ আহ্বান কোরে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সময়সাপেক্ষ এবং বাস্তবতার দিক্ দিয়ে সম্ভব নয় কাজেই কংগ্রেসেরই সে দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রয়োজন হবে। এ সম্পর্কে আমাদের মত, কংগ্রেস ভারতে বৃহত্তম গণ-প্রতিষ্ঠান এবং অদূর ভবিষ্যতে কংগ্রেস একমাত্র গণ-প্রতিষ্ঠান হবে বলে আমরা আশা করি এবং কংগ্রেস যখন জনসাধারণের মতগ্রহণ কোরে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে—তখন অস্থায়ী ভাবে শাসনতন্ত্র প্রণয়ণের দায়িত্ব কংগ্রেস নিজেই গ্রহণ করলে আপত্তি করবার বিশেষ কারণ আছে বলে মনে হয় না। অধিকন্তু, ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র অস্থায়ীভাবে কংগ্রেসই গঠন করবে বলে যদি গৃহীত হয় তবে অন্যান্য সম্প্রদায় ও প্রতিষ্ঠান, যারা কংগ্রেস থেকে দূরে থাকছে

তারাও কংগ্রেসের আওতায় আসা সমীচীন মনে করবে। এই প্রস্তাব গৃহীত হোলে তাদের উপর moral pressure পড়বে এবং জাতীয় ঐক্য তাতে নিকটতর হবে বলে মনে হয়।

দ্বিতীয় অংশের যেখানে ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে সন্ধির কথা আছে সেখানে অভিপ্রায় সুস্পষ্ট নয়—কারণ সন্ধি যদি আয়ার্লণ্ডের সহিত ইংলণ্ডের সন্ধির অনুরূপ হয়, তবে তাতে ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে যায় এবং ভারতের শাসনতন্ত্র ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রে পর্য্যবসিত হয়। এ সম্পর্কে আমাদের অভিমত যে ভারতবর্ষ ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র চায়না—সম্পুর্ণ আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে সম্পুর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ চায়, কাজেই আলোচ্য প্রস্তাবের অভিপ্রায় সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হওয়া প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের দাবী ছয় মাসের মধ্যে মেনে না নিলে সংগ্রাম ঘোষণার সঙ্কল্প অনেকে অযৌক্তিক ও অসময়োচিত হোয়েছে বলে মনে করেন—অনেকে বলেন এ দ্বারা কংগ্রেসের মধ্যে মতদ্বৈধতা সৃষ্টি হবে—ছয় মাস সময় উত্তরদানের পক্ষে যথেষ্ট নয়, এ আপত্তিও শোনা গেছে. আমাদের মত ভারতবর্ষ তার দাবী উত্থাপন করছে, দাবীর পেছনে শক্তি সঞ্চয় করতেই হবে—এবং তার জন্য সময় নির্দিষ্ট কোরে দেওয়া ঠিকই হোয়েছে, যদি সংগ্রামের কোন স্তরে নির্দ্ধারিত সময় বেশী বা কম মনে হয় প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা করবার পথে বাধা কোথায়? আর মতদ্বৈধতার আশঙ্কায় যদি স্থিতিশীলতাকে বরণ কোরে নেওয়া যায় তবে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এই প্রস্তাব যাতে ত্রিপুরীতে গৃহীত হয় তার জন্য বাঙ্গলার প্রতিনিধিদের বিশেষভাবে চেষ্টা করা উচিত।

উপরোক্ত প্রস্তাব ছাড়া ভূমিরাজস্ব সম্পর্কে রাজস্ব কমিশনের সম্মুখে বাঙ্গলার বঞ্চিত কৃষককুলের দাবী যাতে ভালোভাবে উপস্থিত করা হয় ও যুক্তিসঙ্গত ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথা রহিত করা হয় সে সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হোয়েছে। এছাড়া পাটঅর্ডিন্যান্স, রাজবন্দী মুক্তি, প্রভৃতি সম্পর্কে প্রস্তাবও গৃহীত হোয়েছে।

দেশীয় রাজ্যে সামন্ততন্ত্রের উৎপীড়ন

দেশীয় রাজ্যগুলি প্রজাদমন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণের কাজে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কোরে চলেছে। উড়িষ্যার ছোট ছোট রাজ্যগুলি কি দুঃসাহিসকতার সহিত তাদের সংগ্রাম চালিয়ে আসছে তা ঢেন্‌কানল ও তালচেরার বিষয় যাঁরা অবগত আছেন তাঁরা জানেন। উড়িষ্যার পালা শেষ হোতে না হোতে রাজকোট ও জয়পুরের সংবাদে ভারতবর্ষ চঞ্চল হোয়ে উঠেছে—এই সব আন্দোলনের লক্ষ্য দেশীয় রাজ্যে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা। সামন্ততন্ত্র ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ—কাজেই এই প্রজান্দোলন দমনে বৃটিশ সরকারের কৃতিত্বও কম নয়।

শেঠ জমুনালাল বাজাজ সম্প্রতি তাঁর মাতৃভূমি জয়পুরে প্রবেশ করতে উদ্যত হন কিন্তু জয়পুর ষ্টেশনে তাঁকে গ্রেপ্তার কোরে রাজ্যের সীমান্ত সেবাইমদপুরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ব্রিটিশ ভারতে

চলে যাবার প্রতিশ্রুতি চাওয়া হয়—তিনি প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করলে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে মথুরায় নিয়ে যাওয়া হয়। জয়পুর কর্তৃপক্ষ তাঁকে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রজামণ্ডলকে যে কোন উপায়ে হোক দমন কোর্‌তে বদ্ধপরিকর হোয়েছেন—এ ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের হাত কতখানি তা মহাত্মা গান্ধীর মন্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে—তিনি বল্‌ছেন 'জয়পুরের ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী, যে জয়পুর পরিষদের একজন সদস্য তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে তিনিই সর্বেসর্বা'।

তারপর রাজকোটে আবার সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়েছে, সর্দ্দার প্যাটেলের সঙ্গে ঠাকুর সাহেবের যে আপোষ-মীমাংসা হয়েছিল্ রাজকোট দরবার তার সর্ত্ত-সমূহ পালন করেনি। সাতজন প্রজা প্রতিনিধি ও কয়েকজন দরবার অনুমোদিত প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হবে এই স্থির ছিল। কিন্তু প্রজা-পরিষদের অনুমোদিত সাতজনের মধ্যে চারজনের নাম দরবার অগ্রাহ্য করেছে।

প্রকাশ পেয়েছে রাজকোটের শাসনকর্ত্তা ঠাকুর সাহেব নিজে প্রজাদের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হোতে অনিচ্ছুক, বরং ক্ষতি স্বীকার করেও প্রজাদের সংগ্রামে প্রতিনিবৃত্ত ক'রতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু রাজকোটে ভারত সরকার কোন ক্রমেই প্রজাপরিষদের ও ঠাকুর সাহেবের মধ্যে আপোষ হোতে দিতে রাজী নন্।

সমগ্র ভারতের দৃষ্টি আজ রাজকোটের উপর নিবদ্ধ। শ্রদ্ধাভাজন কস্তুরীবাই, মণিবেন প্যাটেল রাজকোটের সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেছেন। বল্লভভাইও এই সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত। গান্ধীজি বড়লাটের কাছ থেকে সহানুভূতিসূচক মনোভাবের পরিচয় না পেলে নিজেই দেশীয়রাজ্যে প্রজা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন বলে বিবৃতি দিয়েছেন। জওহরলালজীর মতে "বর্ত্তমানে দেশীর রাজ্যের সমস্যাই ভারতের একমাত্র সমস্যা।"

দেশীয় রাজ্যে গণআন্দোলন ক্রমেই বিপুল আকার ধারণ করছে, একদিকে সামন্ততন্ত্র ও তার পরিপোষক সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার, অন্যদিকে জাগ্রত গণশক্তি। এই শক্তিপরীক্ষায় গণশক্তির জয় যে অবশ্যম্ভাবী তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যের ব্যাপারে এতদিন হস্তক্ষেপ করে নি কিন্তু এখন সেই নীতি পরিবর্ত্তিত হবে এ আশা করা যায়—এ সম্পর্কে "হরিজন" পত্রিকায় মহাত্মাজীর মন্তব্য ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় পূর্ণ।

তিনি লিখ্‌ছেন 'যখন দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদের সর্বদিকে জাগরণ এবং তাহাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য দীর্ঘকাল দুঃখকষ্ট ভোগ করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প দেখা যাইতেছে, তখন পূর্বনীতি অক্ষুন্নরাখা কাপুরুষতা।'

আমরা আশাকরি আগামী ত্রিপুরী কংগ্রেস দেশীয়রাজ্য সম্বন্ধে একটী সুনির্দ্দিষ্ট নীতি অবলম্বন করবে এবং দেশীয় রাজ্যের প্রজা আন্দোলন ও বৃটিশ ভারতের গণ-আন্দোলন সম্মিলিত হোয়ে এমন

কংগ্রেসে আভ্যন্তরীণ গলদ

কংগ্রেসের মধ্যে নানা গলদের কথা আজকাল সর্বত্র শোনা যাচ্ছে। "হরিজন" পত্রিকায় "আভ্যন্তরীণ অবনতি" শীর্ষক প্রবন্ধ এদিক দিয়ে কংগ্রেস কর্মীদের দৃষ্টি আরো আকৃষ্ট কোরেছে। জাল ভোটার সংগ্রহ সম্পর্কে মহাত্মাজী মন্তব্য করেছেন "জাল টাকা বোঝাই বাক্সকে যদি মূল্যবান মনে করা যায় তবে এই সদস্য-তালিকাও মূল্যবান"। জাল টাকার যেমন বাজার দর নেই তেমনি স্বাধীনতা সংগ্রামে জাল সদস্যদের দামও শূন্য, জাল সংখ্যার উপর নির্ভর কোরে কোন সংগ্রাম চালানোও যায় না। আগামী ত্রিপুরী কংগ্রেসে জাল ভোটার সংগ্রহ যাতে বন্ধ হয় সেদিক দিয়ে সুনির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করবে এই আশা আমরা করছি। অদূর ভবিষ্যতে যে সংগ্রামের আভাস আমরা পাচ্ছি—অতীতের তুলনায় সবদিক্‌দিয়েই তা কঠিনতর হবে—তার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন—আর সেই প্রয়োজনের সবচেয়ে বড় অংশ স্বাধীনতা সংগ্রামের খাঁটি সৈনিক প্রস্তুত করা। স্বাধীনতাকামী সকল কংগ্রেসকর্মীর এবিষয়ে অবহিত হবার সময় এসেছে।

বাঙ্গালী-বিহারী সমস্যা

কিছুদিন যাবৎ বিহারী-বাঙ্গালীদের ন্যায্য অধিকার ভোগে নানা বিঘ্ন দেখা দিয়েছে এবং তারই ফলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে এ সম্পর্কে একটা রিপোর্ট দিতে অনুরোধ করেন। সম্প্রতি সেই রিপোর্ট কাগজে প্রকাশিত হোয়েছে, তাতে দেখা যায় বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালীদের, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ৪টী শ্রেণীতে বিভক্ত কোরেছেন। যথা—(১) বাঙ্গলার নিকটবর্ত্তী বাঙ্গলা-ভাষাভাষী বিহারের স্থায়ী অধিবাসী (২) তিন শত বৎসর পূর্বে প্রথম বিহারে বসবাস করতে আরম্ভ করে এমন ভাগলপুর অঞ্চলের রাঢ়ী পদবীধারী কতকগুলি বাঙ্গালী পরিবার—এরা বিহারী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হোয়ে গেছে এবং ভাষাও বিহারী (৩) কোন চাকরি অথবা ব্যবসায় উপলক্ষে প্রথম বিহারে এসে স্থায়ী বাসিন্দা হোয়ে গেছে (৪) এবং যারা চাকরি ও ব্যবসায়ের জন্য অস্থায়ীভাবে বিহারে আছে এরূপ বাঙ্গালী। এদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটী শ্রেণীকে তিনি যথার্থই "বাঙ্গলাভাষী বিহারী" আখ্যা দিয়েছেন এবং বিহারীদের সঙ্গে সমস্ত বিষয়ে অভিন্নরূপে দেখ্‌বার অনুরোধ জানিয়েছেন।

"ডোমিসাইল" প্রমাণ করবার জন্য সার্টিফিকেট প্রথা তুলে দেওয়ার প্রস্তাবও প্রশংসনীয়। কিন্তু ডোমিসাইল বলে গণ্য হবার জন্য, যে দশ বৎসরের সময় নির্দ্দিষ্ট করা হোয়েছে তা অতিদীর্ঘ হোয়েছে বলে আমাদের মনে হয়—শ্রীযুক্ত পি, আর, দাসের মতানুযায়ী এ সময় পাঁচ বৎসর করলেই ভাল হোত। এই রিপোর্টে যে সুপারিশ করা হোয়েছে এবং ওয়ার্কিং কমিটি যে নীতি অনুমোদন করেছেন বিহার সরকার সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করলে আর অসন্তোষের কারণ থাকবে না। বর্ত্তমান জগতে আপাত বৈষম্য সর্বত্র পরিস্ফুট হওয়া সত্ত্বেও, এ সত্যও ক্রমেই সুস্পষ্ট হোয়ে উঠছে যে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের স্বার্থ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ভবিষ্যৎভারতকে যাঁরা রূপ দিচ্ছেন বা দেবেন

খণ্ডিত স্বার্থের ঊর্দ্ধে মানবসমাজের নিগূঢ় ঐক্য ও অখণ্ডতা তাঁদের চিন্তা ও কার্য্যকে যত বেশী প্রভাবান্বিত করবে ততই মঙ্গল।

কংগ্রেস ও :র্কিং কমিটি ও হিন্দু মুসলমান সমস্যা

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে সম্প্রতি আলোচনা করেন এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত কংগ্রেসী প্রদেশের প্রধান মন্ত্রীদের নিকট পাঠানো হোয়েছে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যাতে সদ্ভাব রক্ষিত হয় তারজন্য কয়েকটী ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দ্দেশ দেওয়া হোয়েছে। আপোষ রফার মধ্য দিয়ে যাতে সকল সমস্যা মীমাংসা করা হয় তার উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হোয়েছে। এমন কি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বাতিল করবার চেষ্টাসম্পর্কেও পথ অবলম্বন করতে উপদেশ দেওয়া হোয়েছে। কিন্তু এদিক দিয়ে কতটা কাজ হবে সন্দেহের বিষয়---যাঁরা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা চান্ তাঁরা কোন যুক্তির অপেক্ষা রাখেন না---কংগ্রেস যদি বাঁটোয়ারা সম্পর্কে বর্ত্তমানের দুর্ব্বল নীতি পরিহার কোরে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বর্জন করেন এবং তার সপক্ষে জনমত গঠিত করতে চেষ্টা করেন, কেবলমাত্র তখনই এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া সম্ভব।

ব্রহ্মের ভারতীয় বিদ্বেষ

ব্রহ্ম বিচ্ছেদের পূর্বে Burma for Burmese নীতির সমর্থনে বিচ্ছেদের সপক্ষে, যে জোর প্রচার কার্য্য চালানো হোয়েছিল তার কুফল ফলতে আরম্ভ কোরেছে। সম্প্রতি ভারতীয়দের উপর সর্বত্র যে অত্যাচারের খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাতে ভারতবাসীর উদ্বিগ্ন হবার যথেষ্ঠ কারণ রয়েছে। যে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে তাতে প্রমাণ হয়, সরকার ভারতবাসীর জীবন নিরাপদ করতে পারছেন না। ভারত সরকারও এবিষয়ে কি করছেন জানতে আমরা উৎসুক। দাঙ্গার কারণ যাই হোক—তাকে সমর্থন কোন ক্রমেই করা যায় না—আর বর্ম্মীরা যদি মনে কোরে থাকেন যে ভারতবাসীদের উপস্থিতিই বর্ম্মার বেকার-সমস্যার কারণ, তবে কমিটির মন্তব্য 'ভারতীয়েরা যে সকল তুচ্ছ, অপ্রীতিকর এবং একঘেয়ে কাজে উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছে, বর্ম্মীরা সে সকল কাজ একেবারেই পছন্দ করে না।' লক্ষ্য করতে বলি। ভারত-বর্ম্মা চুক্তির কথাও বর্ম্মীদের স্মরণ রাখা উচিত, বর্ম্মার মাল ভারতবর্ষই সর্বাপেক্ষা বেশী ক্রয় কোরে থাকে। কাজেই ভারত বিদ্বেষে তাঁদের নিজেদেরও ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

যাতে একটী সন্তোষজনক মীমাংসা হয় তারজন্য ভারত ও বর্ম্মী সরকার উভয়েরই যথা সম্ভব শীঘ্র ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

রাজনৈতিক বন্দী—

সম্প্রতি দলদম জেল থেকে যে সংবাদ এসেছে তাতে প্রকাশ, ২৫ জন রাজনৈতিক বন্দী বিভিন্ন প্রকার [illegible] পীড়ায় ভুগছেন তাঁদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই চিকিৎসকের

অভাব, ঔষধ পথ্যেরও অভাব। ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন বন্দীর পক্ষে ভগ্নস্বাস্থ্য কি নিদারুণ পরীক্ষা।

১৯৩৭ সালের টিটাগড় মামলায় শ্রীমতী পারুল মুখার্জি তিন বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। সম্প্রতি তাঁকে মেদিনীপুর জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হোয়েছে, এতে আমরা গভীর আনন্দ প্রকাশ করছি, কিন্তু এখনো আরো পাঁচ জন নারী রাজনৈতিক বন্দিনী মেদিনীপুর জেলে আবদ্ধ আছেন—তাঁদের মধ্যে সকলেই নানারোগে ভুগ্‌ছেন সরকার তবু তাঁদের মুক্তি দিচ্ছেননা, এ তাঁদের জিদ্ ছাড়া আর কি ?

দেশের জনসাধারণ তাদের দাবীর জোরে কবে এঁদের মুক্ত কোরে আন্‌বে ?

কবি ইয়েট্‌স্

ইয়েট্‌সের মৃত্যুতে শুধু আইরিশগণ তাদের জাতীয় কবিকে হারিয়েছে তা নয়, কাব্য-জগৎও একজন বিশ্বকবিকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিয়েছে। তাঁর তিরোধানে বিশ্বসাহিত্যের যে ক্ষতি হল তা অদূর ভবিষ্যতে পূরণ হবে কিনা সন্দেহ। জাতীয় জীবনের স্রষ্টা হিসাবে তিনি আইরিশদিগের নিকট চিরকাল পূজিত হবেন। তাঁর রচিত 'ইন দি সেভেন উডস' 'দি ট্রেমরিং অব দি ভেইল্' 'প্লেজ ইন্ প্রোজ এ্যাণ্ড ভার্স' 'দি ডেথ অব সিনজ' কাব্য-সাহিত্যের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ১৯২৩ সালে ইয়েট্‌স্ সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। তিনি এবং রথেনষ্টাইনই সর্ব্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের কবিতা ইংরেজ সাহিত্যিক মহলে সুপরিচিত করেন এবং অনূদিত 'গীতাঞ্জলি'র ভূমিকা লিখে দেন। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন জড়বাদী। পরে উপলব্ধির গভীরতা ও অন্তর্দৃষ্টির সূক্ষ্মতার বৃদ্ধির সাথে অধ্যাত্মবাদের দিকে আকৃষ্ট হন। ভারতীয় উপনিষদ ও অধ্যাত্মবাদের প্রভাব তাঁর জীবনে অত্যন্ত বেশী। তাই জীবনের সায়াহ্নে পুরোহিত স্বামীর সহযোগে কয়েকখানা উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ভাবের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করে অনুবাদের ভাষা এমন স্বচ্ছ ও সাবলীল হতে পারে তা তাঁর এ বইগুলি না পড়লে বিশ্বেস হয় না।

তিনি আইরিশ জাতীয় সাহিত্যের স্রষ্টা। সাহিত্য, নাট্যকলা ও শিল্পবিদ্যার ভিতর জাতীয় জীবন ও ভাবধারাকে তিনি মূর্ত্ত করেছেন। পল্লী-প্রাণ উদ্‌বোধিত না হলে জাতীয় সাহিত্য কখনও সজীবতা লাভ করে না। এজন্য তিনি আইরিশ পল্লী-সাহিত্য, পল্লী-গাথাও সাধারণের কথ্য ভাষাকে নবভাবে রূপায়িত ও রসায়িত করে তুলেছেন।

তিনি শুধু কল্পভূমিতেই বিচরণ করেন নি, কর্ম্মভূমির প্রতিও তাঁর দুর্ব্বার আকর্ষণ ছিল। তাঁর আদর্শ বাস্তবতা লাভ করেছে তাঁর বহুমুখী প্রয়াসে ও বহুল কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরাও বলি, 'মৃত্যুর কঠিন স্পর্শে ইয়েট্‌সের স্মৃতি বিলুপ্ত হবে না। সাহিত্যের দরবারে তিনি সমুন্নত মহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।'

সপ্তম বর্ষ | চৈত্র—১৩৪৫ | দশম সংখ্যা

বৈজ্ঞানিকের জগৎ

অনিলচন্দ্র রায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমাদের দুই চোখে যে অনির্ব্বচনীয় মায়া লাগিয়া রহিয়াছে, সে তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা এতদিন তেমন সচেতন ছিলাম না। সাধারণ বুদ্ধিকে আমরা নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করিয়াছি এবং সাধারণ বুদ্ধি বিশ্বাস করিয়াছে ইন্দ্রিয়কে। এই দুইকে আশ্রয় করিয়াই আমরা গড়িয়া তুলিয়াছি আমাদের বিশ্বজগতের মানস ছবি, 'a simple and synoptic image of the world.' মানুষ যুগে যুগে এই ছবি আঁকিয়া চলিয়াছে, কিন্তু পরিপূর্ণ ছবিখানি আজও আঁকা হয় নাই। আদিম যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত মানুষের এই প্রয়াস একটানা চলিয়াছে।

এই প্রয়াসের ইতিহাসকে, বৈজ্ঞানিক জেম্‌স্‌ জিন্‌স্‌'-এর (Sir James Jeans) মতে, তিনটী স্তরে ভাগ করা চলে : যথা, সর্ব্বপ্রাণবাদী (animistic) যুগ, যান্ত্রিক (mechanistic) যুগ এবং গাণিতিক (Mathematical) যুগ। আদিম (animistic) যুগের মানুষ জড় প্রকৃতিকে মনে করিত জীবন্ত, কারণ সমস্ত বস্তুর বুকে বাস করে জীবন্ত অধিদেবতা। জড় জগতের সকল গতির মূলে রহিয়াছে এই সব দেবতাদের ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি; সমস্ত বস্তুই মানুষের মতো সুখে-দুঃখে সচেতন এবং আমাদেরই মতো ব্যক্তিত্বশীল। শিশু যেমন কল্পনার দৃষ্টি দিয়া দেখে, আদিম মানুষও তেমনি সহজ কল্পনায় জগৎকে দেখিয়াছে। নিজের মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব রহিয়াছে তাহাকে

বাহিরে নিক্ষাষণ করিয়া (Projecting) এবং আরোপ করিয়া মানুষ জগতের ছবি গড়িয়াছে। সেই ছবিই বহির্জ্জগতের প্রথম বৈজ্ঞানিক চিত্র।

তারপরে গ্রীক যুগের মানুষ প্রথম বুদ্ধির সাদা আলো ফেলিয়া জগৎকে দেখিতে শুরু করিল এবং সেই বুদ্ধি-উদ্ভাসিত যুগেই বিজ্ঞানের দ্বিতীয় যুগের অস্ফুট আভাস দেখা দিল। গ্রীক যুগেও চোখে কল্পনার মধুর ছোঁয়াচ লাগিয়াই রহিয়াছে; অস্পষ্ট রঙের স্পর্শ তখনো পৃথিবীর সকল বস্তুতে মাখানো আছে। ইহার পরে গ্যালিলিওর আবির্ভাব হইতেই বিজ্ঞানের সত্যিকার যান্ত্রিক (mechanistic) যুগ আরম্ভ হইল। চোখ হইতে তখন রঙের অঞ্জন মুছিয়া গিয়াছে; প্রখর দিনের আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে পৃথিবীর উপর। নিউটন (Newton)এর পরে এই যুগের যান্ত্রিকতা যোল্‌কলায় পূর্ণ হইয়াছে। বিজ্ঞানের সূর্য্য তখন পূর্ব্বাচল ছাড়িয়া মাথার উপরে আসিয়া জ্বলিতেছে। নূতন যন্ত্র-বিজ্ঞান (mechanics) এইকালের চরম বিজ্ঞান; যন্ত্র-বিজ্ঞান আসিয়া দেবতাদের যুদ্ধে আহ্বান করিল। দেবতারা হার মানিলেন এবং জড় প্রকৃতির সকল ক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন; পড়িয়া রহিল কেবল প্রাণহীন, স্থূল মাটী-পাথরের স্তূপ।

সমস্ত গতি ও পরিবর্ত্তনের পিছনে রহিয়াছে জড়বস্তুর স্বধর্ম্ম। এই স্বধর্ম্ম আর কিছুই নয়, কেবল পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করা। এই আকর্ষণ-বিকর্ষণের (Push and Pull) ফলেই বিশ্বসংসারে ভাঙ্গা-গড়ার অশ্রান্ত বিপ্লব চলিয়াছে। পেশী-শক্তির জোরে কোনো বস্তুকে টান মারো, সামনে আসিবে; ধাক্কা দাও, সরিয়া যাইবে। এই রকম সকল জড় বস্তুই একে অন্যকে প্রভাবিত করিতেছে। ইহাই গতি-তত্ত্ব এবং চেতন মানুষ ও মানুষের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা কোনো কিছুই এই তত্ত্বের বাহিরে যাইতে পারে না। একটা মানুষকে পাহাড়ের উপর হইতে ছাড়িয়া দাও, সে গড়াইয়া পড়িবে প্রাকৃতিক গতিতত্ত্বের অব্যর্থ আইন অনুসারে; যেমন গড়াইয়া পড়ে প্রাণহীন এক টুকরা পাথর। এই যান্ত্রিক যুগের দৃষ্টিতে বহির্জ্জগৎ শুধুই কতকগুলি স্থূল বস্তুপিণ্ডের সমষ্টি। এই বস্তুগুলি আছে বাহিরে, "out there,"—আমাদের দেহ, মন ও চিত্তের বাহিরে; আমাদের চেতনা-নিরপেক্ষ ইহাদের অস্তিত্ব, ইহারা আছে ইহাদেরই স্বতন্ত্র ও স্বকীয় অধিকারে।

এই যুগে পদার্থবিজ্ঞানের পরিকল্পিত জগৎও ছিল বস্তুময়, গুণময়, বৃত্তিপূর্ণ। ইহাকে চক্ষু দেখিতে পায়, কর্ণ শুনিতে পায়, স্পর্শেন্দ্রিয় ছুঁইতে পায়। সবার চাইতে বড়ো কথা হইল এই যে, ইন্দ্রিয়ের জালে জগৎটা সম্পূর্ণরূপে আট্‌কাইয়া পড়ে। এই যুগের সকল মানদণ্ড ছিল সুনির্দ্দিষ্ট, সকল চিন্তা ও ধারণা ছিল সুনিশ্চিত। পৃথিবীটাকে চূড়ান্তরূপে জানিয়া শেষ করা যায়, এ বিশ্বাস ছিলো তখন অটুট। ইন্দ্রিয় যে ছবি আঁকিয়া দেয়, বাস্তব জগৎ অবিকল তাহাই। আসলের সঙ্গে নকলের, মূলবস্তুর (model) সঙ্গে প্রতিচ্ছবির (representation) কোন অমিল নাই, ষোল আনা সাদৃশ্য বজায় থাকে। যন্ত্রপাতি ও মাপজোঁকের মধ্যে জগৎটাকে অবিকৃত

অবস্থায় ছাঁকিয়া তোলা যায়। ১৯ শতক পর্য্যন্ত এই যান্ত্রিক যুগ অব্যাহত ছিল। কী পদার্থ-বিজ্ঞানে, কী জীব-বিজ্ঞানে; সকল ক্ষেত্রেই বস্তুময়, গুণময় বাহ্যজগৎকে লইয়াই বৈজ্ঞানিকেরা কারবার করিয়াছে। "They described this as the 'common-sense' view of science; and defined science as 'organised common-sense'. (Jeans, New Background of Science, p. 45). তাঁহাদের ধারণায় বস্তুর গুণগুলিকে জানিলেই বস্তুকে জানা হইয়া গেল, কারণ গুণগুলি (qualities) বস্তুর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বস্তুর আত্ম-প্রকাশ হয় গুণের মধ্য দিয়া। গুণই বস্তুর স্বরূপ, গুণকে বাদ দিয়া বস্তুর অস্তিত্ব নাই। গুণগুলি এমনভাবে বস্তুর উপর আঁটিয়া বসিয়া আছে যে ইহাদের আলাদা করা অসম্ভব। বস্তুগুলি আবার বিদ্যমান রহিয়াছে দেশে ও কালে। দেশ (space) ও কালকে (Time) ছাড়াইয়া কোনো বস্তুই থাকিতে পারে না। চক্ষু মেলিলেই সামনে ধরা দেয় দিক-দিগন্তের অসীম বিস্তার। সমস্ত বিশ্বজগৎ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে অপার বিস্তৃতির মধ্যে। এই বিস্তৃতিরই নাম দেশ বা space. শিশু যেমন মায়ের বুকে স্তব্ধ হইয়া ঘুমাইয়া থাকে, তেমনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্তহীন দিক্-বিস্তৃতির (space) বুকে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে; অনাদিকাল হইতে যেন অচেতন হইয়া নিশ্চিন্ত ঘুম ঘুমাইতেছে। তেমনি কালও (time) ছাইয়া রহিয়াছে আমাদের গোচর-অগোচর সকল পৃথিবীকে। বায়স্কোপের ছবিগুলি যেমন একের পর এক চোখের সামনে দিয়া সরিয়া যায় তেমনি জগতের যত ঘটনা (events) ও বস্তু (things) আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখ দিয়া, আমাদের চেতনার সামনে দিয়া অপসৃত হইয়া যাইতেছে। যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমাদের চেতনায় এই অপসৃতির (passing away) জ্ঞান ভাসিয়া উঠে—তাহারই নাম কাল। সমস্ত বস্তুকে অনুবিদ্ধ করিয়া, ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে কাল। আমাদের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সব কিছু এই কালকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, 'সূত্রে মণিগণা ইব'। আমাদের সমস্ত অস্তিত্ব এই কালকে অবলম্বন করিয়া ঝুলিতেছে অনন্তকাল ধরিয়া। কালকে অতিক্রম করে, এমন সাধ্য চেতন অচেতন কাহারও নাই। ব্রহ্মাণ্ড এই দেশ-কালের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, এ যেন একখানা শাশ্বত লোহার ফ্রেম (frame) যাহার মধ্যে বহির্জ্জগৎকে আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে; এক তিল সরিয়া যাইবার উপায় নাই।

দেশে কালে বিধৃত এই বস্তুগুলি কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া নাই; তাহারা পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করিতেছে। এই প্রভাব কাজ করে আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্য দিয়া এবং ইহারই ফলে বস্তুতে পরিবর্ত্তন ঘটে। প্রত্যেকটী পরিবর্ত্তনের কারণ আছে; বিনা কারণে পাতাটীও নড়ে না। প্রত্যেক কারণের কার্য্য বা ক্রিয়াফল (effect) আছে; সংসারে পাতাটী নড়িলেও তাহা বিফলে যায় না। সমস্ত বিশ্ব বাঁধা আছে কার্য্য-কারণের শিকলে। দ্রব্য, গুণ, দেশ, কাল ও কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা—এই কয়টী জিনিষকে ভিত্তি করিয়াই যান্ত্রিক যুগ তাহার বিজ্ঞানকে গড়িয়াছিল. কারণ সাধারণ বুদ্ধির (common sense) কাছে প্রথমেই ইহারা ধরা

দেয়। যান্ত্রিক যুগের যে বিশ্ব-চিত্র (world picture), তাহাকে আঁকা হইয়াছিল এই কয়টী পদার্থের (category) মালমশলা দিয়া। এই বিশ্ব-চিত্রকে পরিকল্পনা করিতে গিয়া সে যুগের বিজ্ঞান কয়েকটী মূল সূত্রকে অবলম্বন করিয়াছিল। সেই মূলসূত্রগুলিকে সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করা চলে : (১) সাধারণ বুদ্ধি বিজ্ঞানের প্রধান ভিত্তি। (২) বস্তুগুলি ও গুণগুলিকে লইয়াই বহির্জ্জগৎ। (৩) বহির্জ্জগৎ সত্য এবং তাহার অস্তিত্ব আমাদের চেতনার উপর নির্ভর করে না (objective)। (৪) বহির্জ্জগৎকে নির্ভুলভাবে জানা যায় এবং আমাদের জ্ঞান জগতের অবিকৃত প্রতিচ্ছবি। এই ধারণাগুলি সম্বন্ধে সে যুগের সাধারণ মানুষ বা বৈজ্ঞানিক কাহারও সন্দেহ হয় নাই। প্রায় চার শত বৎসর ধরিয়া যান্ত্রিক যুগ এই ধারণাগুলির উপরে দাঁড়াইয়া বিজ্ঞান ও দর্শনকে রচনা করিয়াছে ; কিন্তু বেশীদিন এই নিশ্চিন্ত অবস্থা রহিল না, কারণ অচিরে এই শক্ত ভিত্তিতে ফাটল বাহির হইয়া পড়িল।

পদার্থ-বিজ্ঞান বেশীদিন যান্ত্রিক যুগে থামিয়া রহিল না। ধাপে ধাপে নিত্য নূতন পরিণতি বিজ্ঞানকে এক অপরিচিত ভূমিতে আনিয়া উপস্থিত করিল। দৈনন্দিন জীবনের প্রচলিত মাপকাঠিতে আর জগৎকে পরিমাপ করিবার উপায় রহিল না। "Then new refinements... shewed that the workings of nature could not be explained in terms of the familiar concepts of everyday life...the age of commonsense science had passed". (Jeans. Ibid.) ১৯ শতকের শেষ দিক হইতে তৃতীয় যুগ আরম্ভ হইয়াছে, যাহাকে বলা হইয়াছে "গাণিতিক যুগ"। পোয়াঁকারে (Poincare), আইনষ্টাইন (Einstein), হাইসেনবার্গ (Heisenberg) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের প্রতিভা এই যুগকে সৃজন করিয়াছে। এই যুগই আধুনিক যুগ। বৈজ্ঞানিক এ যুগে বহির্জ্জগতের যে ছবি আঁকিবে তাহা হওয়া চাই নিখুঁত। তাহার হিসাবকিতাব হইবে গণিত শাস্ত্রের মতো নির্ভুল, যুক্তিযুক্ত এবং অকাট্য। ("...scrupulous correctness and internal coherence, which only the language of mathematics can express."—Einstein) বিজ্ঞানকে যন্ত্র-বিজ্ঞানের (mechanics) ভাষা ছাড়িয়া এখন গণিত-বিজ্ঞানের ভাষায় কথা কহিতে হইবে। অন্য সবই 'বিপ্রলাপ', কেবল মাত্র গণিতই তত্ত্ববিদ্যার ভাণ্ডার। "যৎ কিঞ্চিদ্ বস্তু তৎসর্ব্বং গণিতেন বিনা ন হী" : পদার্থবিজ্ঞান আজ গণিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাই এ যুগের নাম 'গাণিতিক' (mathematical) যুগ।

আধুনিক বিজ্ঞান সর্ব্বপ্রথমেই আসিয়া সাধারণ বুদ্ধিকে (common sense) বর্জ্জন করিল। তাহার আপত্তি হইল এই যে, সাধারণ বুদ্ধির ত্রুটী অগণিত এবং এই সব ত্রুটী মারাত্মক বটে। ('cocksure, vague and self-contradictory'—Russell). সহজ বুদ্ধি গণ্ডুষমাত্র জলে দাঁড়াইবার জায়গা পায় : কিন্তু বিজ্ঞান আজ যে অগাধ সমুদ্রকে আবিষ্কার

করিয়াছে, সেখানে সহজ বুদ্ধি ঠাঁই পায় না। তাহা ছাড়া দ্রব্য, গুণ, দেশ, কাল ইত্যাদির যে ধারণায় এতদিন চলিয়াছে, তাহা এখন অচল হইয়াছে ; এই কয়টী বিচ্ছিন্ন সংজ্ঞার (category) সাহায্যে জগৎকে বোঝা চলিবে না। সামান্য কয়েকটী মামুলী রঙে তুলির ক'টা সামান্য আঁচড়েই জগতের চিত্র আঁকিবার দিন গত হইয়াছে। আলোছায়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম টানা বুনানিতে আজ যে জটীল চিত্র আঁকা হইবে তাহাতে পুরাণো দিনের রঙ ও তুলির ব্যবহার বৃথা।

"The special sciences have all grown up by the use of notions derived from common sense, such as things and their qualities, space, time and causation. Science itself has shown that none of these common-sense notions will quite serve for the explanation of the world." (Russell : An outline of Philosophy, p. 2)

নববিজ্ঞানের দ্বিতীয় প্রস্তাব হইল দ্রব্য ও গুণ সম্বন্ধে। 'দ্রব্য' বলিতে আমরা কি বুঝি ? সাধারণ বুদ্ধিতে দ্রব্য বলিতে কতকগুলি গুণের সমষ্টি বোঝায়। যে কোনদিন 'আম' দেখে নাই, তাহাকে আম কি তাহা বুঝাইতে হইলে আমের গুণগুলিই বর্ণনা করিয়া থাকি। তেমনি 'কমলা' বলিতেও কতকগুলি বিশেষ গুণকেই বুঝি। 'আমের' সঙ্গে 'কমলার' পার্থক্য গুণগত। গুণকে বাদ দিয়া আমরা কোন বস্তুর ধারণা করিতে পারি না। বস্তু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয় তখনই যখন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুর সংযোগ ঘটে। সংযোগের ফলে আমাদের মস্তিষ্কে কোনো রকম কিছু একটা ঘটনা ঘটে। তখনি আমাদের মনে ভাসিয়া ওঠে বস্তুটী সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধারণা। একটা চেয়ার দেখিয়া আমরা বলি, চেয়ার একটা জড় বস্তু ('a piece of matter')। কিন্তু এই জড়বস্তু বলিয়া আজ পদার্থবিজ্ঞানে কোন জিনিষ নাই। যাহা আছে তাহা কতকগুলি ঘটনা-পর্য্যায় ; এই ঘটনা-পুঞ্জ একটা বিশেষ কেন্দ্রের দিক হইতে বাহিরের দিকে উদ্গত হয়। এই কেন্দ্রে যে কী আছে, কিংবা বস্তুতঃই সেখানে কিছু আছে কিনা, তাহা পদার্থবিজ্ঞানের রাজ্যের বাহিরে। তবে সুবিধার জন্য সেখানে কিছু আছে বলিয়া কল্পনা করিয়া করিয়া লওয়া হয় এবং তাহাকে সুবিধা মতন ইলেকট্রন কি প্রোটোন আখ্যা দেওয়া হয়। জড়বস্তু বলিতে পদার্থবিজ্ঞান কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপরে যে অনুভূতিবিশেষ জন্মায় তাহাকেই বোঝায়। "We mean the 'effects' themselves" (Russell : Outline, p. 165.) আমরা আসল বস্তুটী দেখি না ; দেখি কেবল বস্তুটীর উপরে আলোক-পাত এবং অনুভব করি বিশেষ রকমের একটী ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের উদ্দীপন। এই বিশেষ রকমের উদ্দীপনাটী ঘটিলেই আমরা বলি যে, একটী বস্তু দেখিলাম। "The events that take the place of matter in the old sense are inferred from their effect on eyes, photographic plates, and other instru-

ments. What we know about them is not their intrinsic character, but their structure and their mathematical laws." (Russell, Ibid. p. 163) ইন্দ্রিয়ের উপরে বিশেষ ধরণের প্রভাবের ফলে আমরা বিচিত্র রূপের বিবিধ বস্তুকে অনুভূতিতে পাই। আমাদের চোখে রূপ দেখি, আমাদের কানে শব্দ শুনি, নাকে গন্ধ অনুভব করি, অঙ্গে স্পর্শ পাই,—এ সবই ইন্দ্রিয়ের বিশেষ ধরণের উত্তেজনা বই আর কিছু নয়। যে দেশে চোখ নাই, কান নাই, মস্তিষ্ক নাই. সে দেশে রঙ নাই, শব্দও নাই। চাঁদে বাতাস নাই; সেখানে কামান দাগিলেও কোন শব্দ হইবে না, চীৎকার করিয়া গলা ফাটাইলেও আফ্রিকার জঙ্গলের মতন নিঃস্তব্ধতা সেখানে চিরদিন অব্যাহত থাকিবে। ইহাতে বোঝা যায় যে রূপরসাদি গুণগুলি 'অস্মদ্-সংলগ্ন' (subjective)।

দার্শনিকেরা কিন্তু বহুদিন হইতেই দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া আসিয়াছেন। যান্ত্রিক যুগের দার্শনিকেরাও গুণগুলিকে দ্রব্যের অচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া মনে করিতেন। তবে জন্ লক্ (John Locke) গুণগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন—মৌলিক (Primary) এবং গৌণ (Secondary)। যে গুণগুলি ইন্দ্রিয়ানুভূতির সৃষ্টি সেগুলি গৌণ; যথা— রূপ, রঙ, গন্ধ, রস, শব্দ, স্পর্শ। এইগুলি অবস্থা ও জ্ঞাতার ইন্দ্রিয়ের উপরে নির্ভর করিতেছে এবং স্থানকাল ও পাত্র হিসাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মৌলিক গুণগুলি বস্তুর নিজস্ব স্বধর্ম্ম। আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপরে তাদের অস্তিত্ব মোটেই নির্ভর করে না। এই মৌলিকগুণ কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে? তাহারই নাম লক্ দিয়াছেন 'দ্রব্য' বা substance। নিরালম্ব হইয়া গুণগুলি শূন্যে ঝুলিতে পারে না। ইহাদের পিছনে একটা ভিত্তি বা পৃষ্ঠভূমি (substratum) নিশ্চয় আছে যাকে আশ্রয় করিয়া গুণগুলি টিঁকিয়া আছে। গুণগুলিকে উৎপাটিত করিয়া যদি আনা যাইত, তবে যে অবশিষ্ট পৃষ্ঠভূমি থাকে. তাহারই নাম দ্রব্য। লকের এই দ্রব্য নির্বিবশেষ ও নির্গুণ; কাজেই ইহাকে জানা যায় না। অনুমানে ইহার আভাস পাওয়া যায়। ইন্দ্রিয়দ্বারা ইহাকে স্বরূপে পাওয়া যায় না, কারণ ইন্দ্রিয় দেখিতে গেলেই ইহাকে গুণসমন্বিত দেখিবে। এই অবগত দ্রব্যকেই লক্ matter বা 'জড় ধাতু' আখ্যা দিয়াছেন। এই জড়ধাতুই তাঁর কাছে জগতের বাস্তব উপাদান। তাঁর দর্শনকে তাই বলা হয় বাস্তববাদ (Realism)। যান্ত্রিক যুগের দর্শনই ছিল এই বাস্তববাদ। জড়ধাতু (বা matter) ও তাহার অচ্ছেদ্য মৌলিকগুণগুলি হইল বাস্তব উপাদান যাহা হইতে নামরূপের পৃথিবী বিবর্ত্তিত হইয়াছে।

বার্কলী (Berkeley) ও পরবর্ত্তীয়েরা লকের এই মৌলিকগুণকে স্বীকার করেন নাই। মানুষের জ্ঞানের একমাত্র ও অদ্বিতীয় পথ যখন ইন্দ্রিয়-জ্ঞান, তখন মৌলিকগুণের জ্ঞানও ইন্দ্রিয়েরই সৃষ্টি। এদের জন্য ও ইন্দ্রিয়ের মায়াই দায়ী। গতি (motion), ব্যাপ্তি (extension), জড়মান (mass) যাদের জড়ধাতুর (matter) অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া বলা হইয়াছে, তারাও বাস্তব ও ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ

(objective) নয়। নব পদার্থবিজ্ঞানও মৌলিকগুণের পরিকল্পনাকে বিনষ্ট করিয়াছে। দার্শনিকরা যুক্তির পথে যেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, নববিজ্ঞান পরীক্ষণের (experiment) পথেও সেইখানেই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। একদিকে আপেক্ষিকবাদ (Relativity) এবং তরঙ্গবিজ্ঞান (Wave mechanics) 'দ্রব্য'কে ধ্বংস করিয়াছে। পূর্ব্বের 'দ্রব্য' নামক স্বতন্ত্র বস্তুটী আর নাই। "The old idea of matter was connected with the idea of 'substance' and this, in turn. with a view of time that the theory of relativity shows to be untenable." (Russell, Ibid. p. 164)। দ্রব্য নাই, আছে 'waves of probability'। অন্যদিকে মৌলিকগুণকেও আপেক্ষিকবাদ বিনষ্ট করিয়াছে। গতি কিংবা ব্যাপ্তি কিংবা জড়মান (mass), ইহাদের কোনটীই মৌলিকগুণ হইতে পারে না। দর্শকের অবস্থিতির উপরই এই সব তথাকথিত মৌলিকগুণ নির্ভর করে। কাজেই এরাও 'গৌণ' (secondary) একথা বলিলেই সত্য কথা বলা হয়। বস্তুর নিজস্বগুণ ইহারা নয়। "...Neither mass nor motion nor extension in space can qualify as true primary qualities." (Jeans : New Background, p. 15).

বস্তুর মৌলিকগুণ তবে কি আদপেই নাই ? একথার উত্তরে বলা চলে যে, বস্তুকে বিশ্লেষণ করিয়া ইলেক্‌ট্রন ইত্যাদিকে পাওয়া গিয়াছে এবং ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন রকমের সজ্জা (arrangement) হইতেই রকম-বেরকমের গুণ উদ্ভূত হয়। জল যে বৈদ্যুতিক পরমাণু দ্বারা তৈরী, তাহারা এমনভাবে সাজানো আছে যে তাহার ভিতর দিয়া আলোকরশ্মির গতি রুদ্ধ হয় না। এই কারণে জলের কোন রঙ নাই এবং জল স্বচ্ছ। তেমনি চীনা বাসনে আলো আঘাত করিয়া বাধা পায় এবং ফিরিয়া আমাদের চোখে আসিয়া লাগে বলিয়া চীনা বাসন সাদা রঙের মনে হয়। এই রকম সকল বস্তুকেই বিশ্লেষণ করিলে প্রমাণ হয় যে, যাহাকে আমরা মৌলিক গুণ বলি তাহা আর কিছুই নয়, কেবল ইলেক্‌ট্রন-প্রোটোনের সজ্জাবিশেষের ফল মাত্র।

ইহাতে এই ফল দাঁড়াইল যে পূর্ব্বতন বাস্তববাদ আর টিঁকিতে পারে না। বাস্তববাদের পরিকল্পনায় জগৎটা ছিলো বস্তু ও গুণের সমষ্টিমাত্র। সেই বস্তু ও গুণকে বিশ্লেষণ করিয়া অভূতপূর্ব্ব স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। সেখানে দাঁড়াইয়া দেখা যায়, গুণও নাই, বস্তুও নাই; আছে কেবল আলোক বিকীর্ণ করিবার কতকগুলি অনির্দ্দেশ্য কেন্দ্র। পুরাণো বাস্তববাদ সাধারণ লোকের ধারণার ও মতবাদের একটু উন্নত সংস্করণ মাত্র। সাধারণ লোক প্রত্যক্ষ বাস্তববাদী। ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য তাহার কাছে বেদবাক্য। ইন্দ্রিয়ের উপর ভর করিয়া জগৎটাকে যেমন দেখা যায়, তাহার চিত্রই প্রাকৃত লোকের সহজ চিত্র। প্রাকৃত জনের এই স্বাভাবিক বাস্তববাদকে বলা হয় 'naive realism' বা প্রাকৃত বাস্তববাদ। এই সহজ বাস্তববাদেরই (naive realism) অন্যতম চরমরূপ হইল জড়বাদ (materialism)। সাধারণ মানুষ যে বিশ্বাসকে

স্বাভাবিকভাবে সহজে পায়, সেই বিশ্বাসকেই জড়বাদী লাভ করে যুক্তিবিচার দ্বারা। সাধারণ মানুষ অজ্ঞ, জড়বাদী সচেতন, এইটুকুই পার্থক্য। লেনিনের কথায়, "The 'naive' belief of mankind is consciously taken by materialism as the basis of its Theory of Knowledge." (Materialism and Empirio-Criticism p. 47)। নিতান্ত পাগলাগারদের অধিবাসী ছাড়া পৃথিবীর সকল সুস্থ লোকই, এই মতে, "প্রাকৃত বাস্তববাদে" বিশ্বাস করিতে বাধ্য। কিন্তু এ সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে প্রাকৃত লোকের সহজবুদ্ধিকে অদ্যকার বিজ্ঞান অস্বীকার করে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি আজ যে গহনে প্রবেশ করিয়াছে সেখানে সহজ বুদ্ধি কোনোই পথ পায় না। আমরা পূর্ব্বেই প্রমাণ পাইয়াছি যে নব পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্র আজ সূক্ষ্ম নিভৃত লোকে প্রবেশ করিয়াছে। সেখানে সাধারণ, দৈনন্দিন ধারণা ও বিশ্বাসগুলি সব মুহূর্তে মুহূর্তে খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। বাস্তববাদের যে পুরাণো ভিত্তি তাহার উপরে আপেক্ষিক-বাদ ও তরঙ্গবিজ্ঞান (wave mechanics) কঠিন আঘাত করিয়াছে। এই কারণে আজ নব বাস্তববাদ (New Realism) নামক দার্শনিক মতবাদের প্রয়োজন হইয়াছে। নতুন বিজ্ঞানের আলোতে পৃথিবীকে দেখিতে হইবে। নতুন আবিষ্কার ও নানা নতুন পরিণতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নতুনভাবে বাস্তববাদকে সংস্কার ও সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। পুরাণো বাস্তববাদ আজ তাই দার্শনিক বাজারে বিকায় না। বাস্তববাদের নানা সম্প্রদায় নানা রকম বিশ্ব-চিত্র গড়িয়া তুলিতেছে। "বস্তু" নামক জিনিষটাই হেঁয়ালীর মতো দুর্ব্বোধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই "বাস্তবতা" নামক সংজ্ঞাটাও সংশয়ের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের দেশেও শত শত বৎসর পূর্ব্বে বাস্তববাদের জন্ম হইয়াছিল। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন য়ুরোপীয় আধুনিক বাস্তববাদেরই মত একটা বিশ্ব-চিত্র (World-picture) পরিকল্পনা করিয়া গিয়াছে। এই মতেও বহির্জ্জগতের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। আমাদের যে নানা বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান হইতেছে, সে জ্ঞানের মূল কারণ হইল বহির্জ্জগতের কতকগুলি বস্তু। এমন জ্ঞান বা অনুভূতি আমাদের কখনো হয় না যাহার পিছনে কোনো সত্যিকার বস্তু নাই। "ন চাবিষয়া কাচিৎ উপলব্ধিঃ"। যে সব বস্তু আমরা দেখি, তাহার পিছনে আছে কতকগুলি দ্রব্য (substance) এবং কতকগুলি গুণ। গুণগুলির স্বতন্ত্র সত্বা আছে। তাহা ছাড়া নয় রকম ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র দ্রব্য আছে ; এই দ্রব্যগুলিই জগতের উপাদান। পাঁচটা মৌলিক উপাদান বা ভূত ছাড়াও দেশ, কাল আত্মা ইত্যাদিকেও দ্রব্য বলিয়া মানা হয়। আবার রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ছাড়াও আরো ১৯টা স্বতন্ত্র গুণ আছে, ইহাদের মতে। গুণগুলি দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। গুণগুলি কিন্তু এই মতে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি নয়। "অস্মদীয়" (subjective) বলিয়া কোন গুণকে ইহারা স্বীকার করেন না। ইহাদের কাছে গুণগুলি সবই বাস্তব, ইন্দ্রিয়ের মায়া নয়। এমন কি যাহাকে আমরা 'গৌণ' বা secondary গুণ বলি সেই রূপ-রস-শব্দ ইত্যাদিকেও ইহাঁরা সত্যি সত্যি স্বতন্ত্র ও বাস্তব গুণ বলেন। ইহাদিগকে এঁরা "বিশেষগুণ" আখ্যা দিয়াছেন। দ্রব্যগুলি আবার কতকগুলি

পরমাণুর সমষ্টি। সব চাইতে ছোট দ্রব্য যাহা আমাদের চোখে দেখা যায় তাহা হইল সূর্য্যালোকে যে সব ধূলিকণা উড়িতে দেখা যায় তারা। "জালসূর্য্যমরীচিস্থম্ যৎ সূক্ষ্মতমং দৃশ্যতে তৎ সাবয়বম্ চাক্ষুস-দ্রব্যত্বাৎ"। এই ধূলিকণাকে বলা হয় 'ত্রণুক'। এই 'ত্রণুক'গুলিও সাবয়ব বা composite. এরা গঠিত হইয়াছে তিনটী "দ্ব্যণুক"এর সমবায়ে। এক একটী "দ্ব্যণুক" আবার গঠিত হইয়াছে তুইটী পরমাণু দিয়া। কাজেই "পরমাণু"-ই হইল ন্যায় বৈশেষিকের ক্ষুদ্রতম উপাদান। এক এক রকম দ্রব্যের এক এক রকমের পরমাণু রহিয়াছে। এই সব বিভিন্ন রকমের পরমাণু লইয়াই দৃশ্য জগৎ গঠিত হইয়াছে।

কাজেই ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন দৃশ্যজগৎকে বাস্তব বলিয়া স্বীকার করে এবং আমাদের জ্ঞানও মিথ্যা নয় বলিয়া মনে করে। কিন্তু আজিকার পদার্থ-বিজ্ঞান এই বাস্তববাদী দর্শনকেও অচল করিয়া তুলিয়াছে। দ্রব্য ও গুণ সম্বন্ধে এই প্রাচীন ধারণা ১৯ শতক পর্য্যন্তও চলিতে পারিত। কিন্তু মৌলিক ও গৌণ, সকল রকম গুণের ধারণাই বদলাইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরণের বাস্তববাদ অগ্রহণীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যান্ত্রিক যুগের যে পরিকল্পনা ছিল দৃশ্যজগৎ সম্বন্ধে, সে পরিকল্পনা আজ ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

ক্রমশঃ

নিঃশঙ্ক

মৈত্রেয়ী দেবী

শ্যামল মাধবী-বনে সুরভিত পুষ্প ফোটে শাখে
অজানা অলক্ষ্যপানে নিত্য তার অর্ঘ্য ধরে রাখে।
পল্লবের অন্তরালে বক্ষ দুরু দুরু
পেলব যূথিকা কাঁপে,
আজি তার অভিসার সুরু।
ভোরের শিশিরসিক্ত সুস্নিগ্ধ উষার আলো পড়ে
আপন অজানা তার বেপথু অন্তরে।
কি আছে সেখানে লুপ্ত,
কি আছে গোপন তার কথা ?
শুনে যে বারতা
দক্ষিণ সমীর আসে, আসে নিত্য প্রলুব্ধ ভ্রমর,
আনন্দের গোপন নির্ঝর
স্নিগ্ধ করি ক্ষুদ্রতম প্রাণ
প্রতিদিন কোথা চলে, কি তাহার চরম সন্ধান ?
আপন আবর্ত্তমাঝে নাচে গ্রহতারা
সে নক্ষত্রলোক হ'তে প্রাণময় ধারা
নিত্য উৎসরিত হয় বসন্তের বনে
গোপন বেদনাসিক্ত শত শত হৃদয় গহনে।
মৃত্তিকার অন্তরালে কাঁপে কীট,
তারও পূর্ণ প্রাণ ;
বিশ্বের ভাণ্ডারে সেও রেখে যাবে আপনার দান।
অশ্বত্থ-কোটর হ'তে বিহঙ্গের কলগান জাগে
প্রভাতের আলো পড়ে
নবোদ্‌গত কিশলয় রাগে।
সপ্তপর্ণ-বৃন্ত হ'তে স্বর্ণরেণু ঝরে
কম্পমান কুসুমের সলজ্জ অন্তরে,
প্রতিদিন এ নৃত্যলীলায়
সশঙ্ক হৃদয় হ'তে এতটুকু ব্যথা কে মিলায় ?

এ শৃঙ্খলে কে বেঁধেছে হায়
নিখিল আনন্দ মাঝে মানুষের প্রাণ-দেবতায় ?
কে টানিছে ঘন কালো বাস
আঁধার রাত্রির মত, ভুবনের আলো করি গ্রাস ।
মিথ্যা আপনার জালে
আপনারে নিত্য বেঁধে রাখা,
নিত্য কাটা আন্দোলিত পাখা,
দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর সম কেন গড়া মিথ্যা অভিমান ?
অর্থহীন খেলার সম্মান ?
দূরান্তরে চেয়ে দেখো প্রতিদিন ভেসে ভেসে আসে
বন্ধহীন প্রাণস্রোত পল্লবে পল্লবে ঘাসে ঘাসে,
সে স্রোতে ভাসাব নাকি আমাদের ভেলা
অজ্ঞাত যাত্রার পথে আনন্দের খেলা ,
গভীর আবর্ত মাঝে ক্ষুদ্রধ্বনি তার
বিশ্ব-দেবতার অর্ঘ্যে তুচ্ছ নয় সেই উপহার ।
কেন তবে চলে যাও
কেন তবে ফিরে নাও মুখ ?
গোপন বেদনা-আর্ত হৃদয়ে উন্মুখ
একবার নেমে এসো নাথ,
অনবগুণ্ঠিত মুখে
শঙ্কাহীন কর দৃষ্টিপাত ।

প্রগতি লেখকসঙ্ঘ *

শান্তিসুধা ঘোষ

বাঙ্গালাভাষায় 'প্রগতি' শব্দটির উদ্ভব খুব অধিক দিনের কথা নয়, সাহিত্যসমাজে এখনও ইহাকে অর্ব্বাচীন বলা চলে। হয়তো সেইজন্যই নানা জনে ইহাকে নানাভাবে ব্যক্ত করিয়া থাকেন, যেমন তরলমতি মানুষে বালক ক্ষেপাইতে ভালোবাসে। 'প্রগতি' শব্দটির প্রথম সূচনা যখন হয় (এবং এই নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে), তখন বালকসুলভ উচ্ছৃঙ্খলতা ইহার অনেক ছিল সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ ইহার প্রতি একটি তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার ভাব প্রবীণদের মনে কতকটা সেই কারণে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু তারপর বালক যখন একদিন যৌবনের মধ্যে তাহার রূপ বদলাইল, গভীর ও মহৎ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে আরম্ভ করিল, মানুষের মন হইতে ইহার বিরুদ্ধসংস্কার তখনও কাটিলনা। কাটাইবার চেষ্টাও অনেকে করেন নাই, কারণ অনেকেই মানুষকে ছোট বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেই সুখ পান। তাই আজ পর্য্যন্তও সেই শিশুপ্রগতি ও যুবাপ্রগতিকে এক মনে করিয়া গণ্ডগোল চলিতেছে এবং অনেকে শব্দটির জন্মকালীন 'প্রগতি' পত্রিকা ও বর্ত্তমানের 'প্রগতিলেখকসংঘ'কে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলিয়াই মনে করেন। ইহা ছাড়া, অন্য অনেকের মনে শব্দটির অর্থ সম্বন্ধেই কোনও স্পষ্ট ধারণা হয় নাই। যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহাদেরও অধিকাংশ আবার সাহিত্যবস্তুটিকে প্রগতির সীমার মধ্যে বদ্ধ করিয়া দেখিতে নারাজ। এত সন্দেহ ও অস্পষ্টতা যেখানে চলিতেছে, সেখানকার আবর্ত্তের মধ্যে অতর্কিতে পড়িয়া দিশাহারা হইতে বা অপরকে দিশাহারা করিতে আমরা অভিলাষী নই। তাই বিষয়টিকে আমরা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে ও বুঝাইতে চাই।

গতির অর্থ আমরা জানি, এবং নিজেদের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রত্যেকের জীবনে গতিকে স্বীকার করিয়া লইতেও হইতেছে, তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছি না। কারণ, 'নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ'—ব্যক্তিও নয়, ব্যক্তিসমষ্টি এই সমাজও নয়। কিন্তু মানুষের জীবনের প্রাণশক্তি যখন নিস্তেজ হইয়া আসে, তখন ভিতর হইতে গতির প্রেরণা বেশী পায় না, নিতান্ত যতটুকু না চলিলেই নয় ততটুকুই পদক্ষেপ করে, এবং জড়ধর্ম্মীর মত চলে—path of least resistanceএ। আমাদের সমাজেও এই অবস্থা বহুদিন যাবৎ চলিতেছে। গতিকে সম্পূর্ণ বাধা না দিতে পারিলেও তাহাকে বেশী প্রশ্রয় দিতেও চাহিনা, এবং সেই গতি যদি সম্মুখের দিকে হয়,

* প্রগতিলেখক-সংঘের বরিশাল শাখার প্রথম অধিবেশনে পঠিত।

তবে তো একেবারেই ঘাড় বাঁকাইয়া বসি। কারণ, পশ্চাৎগতি অথবা অধোগতি তুলনায় অনেকটা সহজ। সামনে চলার গতিতে খানিকটা উদ্যমের প্রয়োজন হয়। এই সামনে চলার গতিকেই আমরা বলি প্রগতি। ব্যক্তিভাবে বা সামাজিকভাবে আমরা যে যেখানে আছি, সেই স্থান ও কালের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি আমাদিগকে চিরকালের জন্য সেইখানেই আটকাইয়া না রাখে, অথবা পুরাতনের প্রতি সংস্কারের মোহ আরও পশ্চাতে টানিয়া লইতে না-থাকে, এই উদ্দেশ্যে সবল প্রাণশক্তিদ্বারা জীবনের মধ্যে সম্মুখের দিকে একটি বেগসঞ্চার করার নাম প্রগতি। আমাদের জাতীয় জীবন হইতে সামনে চলিবার প্রেরণা বহুদিন লুপ্ত হইয়া ছিল বলিয়াই বোধ হয় আমাদের সাহিত্যেও তদনুরূপ অর্থ প্রকাশ করিবার উপযোগী কোনও শব্দ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। নতুবা 'প্রগতি' শব্দটির অর্থ এমন জটিল কিছুই নয়। গাড়ীর চাকা যেপথ দিয়া সহস্রবার চলিয়া চলিয়া দুইপাশে খাদ কাটিয়া গিয়াছে, সেই পথে চলাই আমাদের রীতি। সে-পথ ছাড়া অন্যপথ আমরা চিনি না। কিন্তু সেই পথ ছাড়া অন্যপথ আবিষ্কার করা ও তাহাতে চলিবার সাহস, ইহাই প্রগতির মূলকথা। আমরা ছেলেবেলা হইতেই মুখে মুখে ছড়া কাটিতে শিখি—'আগে গেলে বাঘে খায়, পিছে গেলে সোণা পায়।' পিছে চলিয়া সোণা পাইবার এই হিসাবী বুদ্ধিটি আমাদের মজ্জাগত হইয়া আছে বলিয়াই 'প্রগতি' শব্দটি আমাদের জনসাধারণের কাছে এত অপরিচিত ও সংশয়জনক ঠেকে।

এখানে একটি সংশয় নিরাকরণ করা ভালো। মানুষের মধ্যে দুইটি সাধারণ শ্রেণী আছে, একশ্রেণী পুরাতনের প্রতি অসম্ভব প্রেমে আসক্ত হইয়া আছে, চিরাচরিত প্রথা ও সংস্কার ব্যতীত আর কোনও কিছুই বাঞ্ছনীয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না; অপরশ্রেণী নূতনের প্রতি অহৈতুক-ভাবে লোভাতুর, নূতন যাহাকিছু চোখে আসিয়া পড়ে, তাহাই তাহার চোখ ঝলসাইয়া দেয়, তাহাকেই নির্ব্বিচারে বরণীয় বলিয়া পিছনে ধাবিত হয়। এ দুইটির কোনটিই প্রগতির পরিচয়পত্র পাইতে পারে না,—যদিও অনেকে শেষেরটিকে প্রগতি বলিয়া ভুল করিয়া থাকেন। যখনই একটি অশ্রুতপূর্ব্ব বাণী কোথাও শোনা যায় এবং কেবলমাত্র নূতনত্বেরই উল্লাসে অনেকে তাহার ধুয়া ধরে এবং পিছন পিছন আরও অনেকে গড্ডলিকা-প্রবাহের মত দলে আসিয়া ভিড়িতে থাকে, তখনই ব্যাপারটিকে প্রগতিমুখী বলা চলেনা। নূতনত্ব ও প্রগতি ঠিক সমানার্থক নয়। যেদিকে দলভারী (তাহা নূতন বা পুরাতন যেদিকেই হউক না কেন), সেদিকের চল্‌তিস্রোতে গা ভাসাইয়া দেওয়ার মধ্যে অলস লঘুতার আরাম আছে, প্রগতিপন্থীর লক্ষণ তাহা নয়। তাহার মধ্যে আছে সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্ম—আপন শক্তিতে প্রতিকূল স্রোত ঠেলিয়া আপনি চলার বেগ। পুরাতন বা নূতন কাহারও প্রতি তাহার কোনও মোহ নাই, অথবা কাহাকেও দেখিবামাত্রই নাসিকাকুঞ্চন করে না, উভয়কেই সে সংস্কারমুক্তভাবে যাচাই করিয়া দেখে। তারপরে, ব্যক্তি ও সমাজের অন্তরাত্মা অনাদিকাল ধরিয়া আপন বিকাশের জন্য যে প্রেরণার দ্বারা স্পন্দিত হইয়া চলিয়াছে, সেই প্রেরণার অনুকূল সর্ব্বোত্তম গতিপথটি বাছিয়া লয়; পুরাতন তাহাকে অযথা ভয় দেখাইয়া বাঁধিয়া রাখিতে

পারে না, অথবা নূতন তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া পথ ভুলাইতেও পারে না। পুরাতনের সহিত অকারণ কলহ অথবা নূতনের প্রতি অযথা পক্ষপাত তাহার নাই। ইহাকেই আমরা প্রগতি বলিয়া জানি এবং যে সাহিত্য সমাজ ও ব্যক্তির সম্মুখে এই প্রগতির পন্থা নির্দ্দেশ করে ও বলিবার সাহস যোগায়, তাহাই প্রগতিসাহিত্য। কালে কালে দেশে দেশে এই সাহিত্যের রূপ বদলায়, কিন্তু প্রকৃতি বদলায় না। এককালে হয়তো যে সাহিত্য তদানীন্তন সমাজের অন্ধতা ও জড়তার শৃঙ্খল ভাঙ্গাইয়া নূতন সত্যের সন্ধান দিয়াছে, সেই তৎকালীন প্রগতিসাহিত্যই আজ হয়তো আমাদের কাছে স্থবির ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। আর আমাদের তাহাকে ইতিবৃত্তের গৌরবময় স্তম্ভ ব্যতীত অন্যরূপে প্রয়োজন নাই, তাহার সত্যকে অতিক্রম করিয়া আমরা বৃহত্তর সত্যের সন্ধান দিব। এবং তাহাই হইবে বর্ত্তমান যুগের প্রগতিসাহিত্য।

কোনও কোনও সাহিত্যিকসম্প্রদায়ের মুখে আপত্তি শুনা যায় যে, সাহিত্যকে এমন করিয়া উদ্দেশ্যের নিগড়ে বাঁধিয়া রাখা চলে না! সমাজের মঙ্গলচিন্তা ফিলানথ্রপিষ্টরা অথবা রিফর্মারগণ করুন, সাহিত্যকে সমাজমঙ্গলের দাস করিয়া রাখিবার প্রচেষ্টা নিছক অত্যাচার, এবং সাহিত্যের পক্ষে অধোগতি। সুতরাং প্রগতিবস্তুটি যতই বাঞ্ছনীয় হউক, তাহার দায়িত্ব সাহিত্যিকের স্কন্ধে না চাপাইয়া সমাজসেবীর স্কন্ধে ন্যস্ত করাই বিধিসঙ্গত। সাহিত্যিক অগ্রপশ্চাৎ আশে পাশে না তাকাইয়া আপন আনন্দে আপনি উচ্ছ্বসিত হইয়া ফুটিয়া উঠিতে থাকুন। নতুবা তাঁহার সৃষ্টিতে একটা কৃত্রিমতার ও স্থূলতার ছাপ লাগিয়া যাইবে। তাহা দোকানদারী এসেন্সের মত কাজে আসিবে বটে, কিন্তু তাজা গোলাপের অনির্ব্বচনীয় সৌরভ আর মিলিবে না। সাহিত্য তথা আর্ট-সম্বন্ধে এই যে একটি বিতর্ক বহুকাল হইতে চলিয়াছে এবং আজও উভয়পক্ষে সন্ধি হয় নাই, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে বর্ত্তমানে ইচ্ছা নাই এবং আমাদের প্রয়োজনও নাই। কারণ, প্রগতি-সাহিত্যের প্রচলনকে যাহারা সমর্থন করেন, তাঁহারা ইহাদের কোনটিরই একচেটিয়াভাবে কবলীকৃত হইতে বাধ্য নন। তবে 'Man shall not live by bread alone'—কথাটিকে উলটা করিয়া সমান জোরের সঙ্গে যখন ইহাও বলা চলে, মানুষ শুধুই ভাবলোকের হাওয়া গ্রহণ করিয়া বাঁচেনা, এই স্থূল মাটির সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ যোগ এবং তাহার স্তন্যধারা, তাহার ফল, মূল, জল মানুষের বাঁচিবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, তখন এইগুলির সম্যক্ বিকাশ ও বিস্তারের দ্বারা মানুষের সমাজকে সুসমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার একটি মহৎ দায়িত্ব চিন্তাশীল মানুষমাত্রেরই আছে। প্রগতিলেখক তাঁহার চিন্তা ও ভাবকে তাঁহার রচনার মধ্যে যখন এই দায়িত্ব স্মরণ করিয়া রূপ দিবেন, তখন সে-রূপ আলোকসম্পাত করিবে প্রগতিরই পথে, পশ্চাৎ পথে নয়—এইটুকুমাত্র সমাজের কাছে তাঁহার বাধ্যতা। তাই বলিয়া কোনও একটি অপূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাঁহার অন্তর যদি মাটি হইতে আল্‌গা হইয়া যায় এবং ভাবলোকের অনির্ব্বচনীয় উদ্দেশ্যহীন আনন্দ তাহাকে রসসিক্ত করিয়া তোলে, তখন সেই আনন্দকে তিনি যে সাহিত্যের মধ্যে রূপায়িত করিবার অধিকার হারাইলেন, এরূপ দাসখত কাহাকেও লিখিয়া দেন নাই। 'Art for Art's Sake' সৃজন করিতে কোন বাধা নাই। সেই-ই

বন্ধনহারা অপার্থিব মুহূর্ত্তগুলি যখন তাঁহার আসিবে তখনই তিনি তাহা করিবেন, কিন্তু তাই বলিয়া পৃথিবীর প্রতি দায়িত্বকেও তিনি বিস্মৃত হইবেন না, মাটির মানুষকে অবজ্ঞা করিবেন না। বরং, আপনি ভাবলোক হইতে স্থূলতর লোকে অবতরণ করিয়া আপনার প্রগতিমুখী চিন্তাধারা ও সাহিত্যসৃষ্টি দ্বারা স্থূল এই পৃথিবীকে সেই পীঠস্থানে উপনীত করিয়া দিবার প্রয়াস পাইবেন যেখানে আসিলে ভাবলোকে উত্তীর্ণ হইয়া ঐ অনির্ব্বচনীয় অমৃতধারা আস্বাদন করিবার যোগ্যতা সমগ্র সমাজেরই হয়। শতদলকে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে পঙ্ক বা মৃণালের কাঁটাকে আশ্রয় করিয়াই ফুটাইতে হয়, তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া নয়। সুতরাং ভাব-সাহিত্য ও প্রগতিসাহিত্য এক না হইতে পারে, কিন্তু ভাবসাহিত্যসেবীর সহিত প্রগতিসাহিত্যসেবীর কোনও মৌলিক বিরোধ নাই।

উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য শ্রেষ্ঠসাহিত্যের পঙক্তিতে পড়ে কিনা, ইহা লইয়া বাক্‌বিতণ্ডা চলিতে পারে। যাঁহারা শুধুই ভাববিভোর, তাঁহারা ইহাকে অপাঙ্‌ক্তেয় বলিয়া পরিহার করিতে পারেন। কিন্তু জগতে কর্ম্মেরও যে একটি প্রধান গৌরবময় আসন আছে তাহাকে অস্বীকার করা চলে না, বরঞ্চ সেইটিই অধিকতর প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্ট। প্রগতিসাহিত্য সেই পরিবর্ত্তনশীল কর্ম্মজগতেরই গতি বেগবতী করিয়া তুলিবার সাহিত্য। এবং জাতির জীবনে এই সাহিত্যের প্রয়োজন ও প্রভাব অতুলনীয়। জাতির গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করিবার একটি প্রবল সহায়ক সাহিত্য, সুতরাং সাহিত্যের এই দিক্‌কার দাবীকে অবহেলা করিতে পারি না। তাই প্রগতিলেখকসঙ্ঘের উদ্ভব। আমাদের দেশে, আমাদের বর্ত্তমান সমাজে যখন সংস্কার ও অন্ধতা, আলস্য ও জড়তা এবং পশ্চাতের প্রতি একটি অহৈতুকী আসক্তি ভূতের মত বুকের উপর চাপিয়া রহিয়াছে, তখন এখানে এইশ্রেণীর সাহিত্যিকের প্রয়োজন আরও বেশী গুরুতর। প্রগতিসাহিত্যিকগণ ভাবের ও চিন্তার সুদৃঢ় আঘাত দ্বারা এই অচলায়তনের ভিত্তি শিথিল করিয়া দিবেন এবং প্রগতিকর্ম্মিগণ সবল বাহুবলে সরাইয়া ফেলিবেন সেই ভগ্নস্তূপের জঞ্জাল, যাহাতে নূতন সৌধনির্ম্মাণ সম্ভবপর হয়।
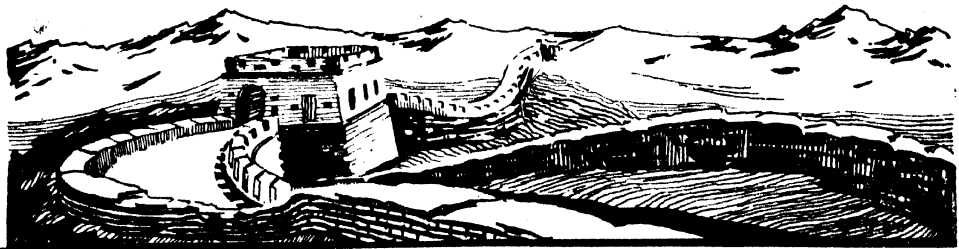
ইতর

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

এক

প্রকাণ্ড হাসপাতাল।

বিপুল অর্থ ব্যয়ে বিরাট ব্যবস্থা। রাজপ্রাসাদের মত বড় বড় ইমারত। ছোটখাটো বাড়ীর সংখ্যাও কম নয়। মাঝে মাঝে এক টুকরা মাঠ—চারিদিকের গায়-গায় লাগানো ইঁটের পাহাড়-গুলির মধ্যে একটু-আধটু স্বস্তির নিশ্বাস যেন।

মহানগরীর হাসপাতালই বটে!

আউট্-ডোর ওয়ার্ড—মেয়েছেলেদের। বেজায় ভীড়। আজ রবিবার। প্রশস্ত হল-ঘরের সবগুলি বেঞ্চি দখল করিয়া ঠাসাঠাসি বসিয়া আছে নানান বয়সী মেয়েছেলে। পুরুষ সঙ্গীরা পাশের বিশ্রামাগারে।

চুপচাপ বসিয়া থাকিতে আর কত ভাল লাগে! সবাই অপরিচিত। সাধিয়া আলাপ করিতে নারাজ। সুতরাং মনে মনে আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিতে ভাবিতে এক সময় সম্মুখের আকাশ-ছোঁয়া বাড়ীটার ছাতের দিকে চোখ চালাইয়া দিলাম। রোগীর কথা দূরে থাকুক, অত উঁচুতে খানিক চাহিয়া থাকিলে আমার মত সুস্থ সবল লোকেরই যে ঘাড় আড়ষ্ট হইয়া আসে! তন্ময় হইয়া মানুষের সেবাব্রতের এই অতুল কীর্ত্তি দেখিতেছি এমন সময় চাপা গলায় গৃহিণী ডাকিল, "শুন্‌ছ?"

"কী?" ঘাড় ফিরাইলাম।

"এত করে নিষেধ করলাম, কথা আমার কানেও তুললে না। কতগুলো টাকার শ্রাদ্ধ।—এবার দেশে ফিরে চল।"

"আবার তোমার কী হল গো?"

"হবে আবার কী!" শোভা উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিল, "শিগ্‌গির হাসপাতালে ভর্ত্তি হবার কোন আশা নেই।"

"কেন?"

"এক মাস দেড়-মাস ঘুরে ঘুরেও 'বেড' খানি পাওয়া যায় না।"

"কে বললে তোমায় ?"

"সবাই বলছে। তুমি তো সব খবরই রাখো ! এত করে বারণ করলাম আসবার আগে—" শোভা হল-ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "ঐ কোণের মেয়েটিকে দেখছ তো ?—ঐ যে লাল-পেড়ে কাপড়-পরা বৌটি ?"

"হুঁ"—অবশ্য দেখি নাই। তাহাকে দেখিবার আমার প্রয়োজন নাই। আপাততঃ গৃহিণীর উতলা হইবার প্রকৃত কারণটা সম্যক জানিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া রহিলাম। শোভা বলিয়া চলিল, "—ওই মেয়েটি, আজ একমাস হয়ে গেল, এসে এসে ফিরে যায়। তবু আজো নাকি 'বেড্' খালিই হয় না।—না, এমন জানলে কে আসত তোমার কলকাতায়। আমার ছেলেমেয়ে ফেলে রেখে আমি কিন্তু এদ্দিন থাকতে পারব না, তা আগেভাগেই বলে রাখছি।"

"তুমি পাগল না খ্যাপা ! তা হ'লে লোকে হাসপাতালে ছুটে আসে কেন ? ঐ বৌটির নিশ্চয়ই তেমন কিছু নয়—"

বাধা দিয়া শোভা কহিল, "ওর যে কী দুরবস্থা তা তুমি—যাক্, আমি ছেলেমেয়ে ছেড়ে এতদিন কলকাতায় কিছুতেই থাকব না।"

এবার একটু উষ্ণ কহিলাম, "এ তোমার স্বভাব। একটুতেই উতলা হয়ে ওঠ। কে না কে আন্দাজে কী সব বললে, অমনি তুমি—"

বাধা পাইলাম। এতক্ষণ আমারই ডান পার্শ্বে চুপচাপ বসিয়াছিল যে লোকটি, হাতের আধ-পোড়া বিড়িটা ফেলিয়া দিয়া সে কহিল, "আপনার স্ত্রী ঠিক কথাই বলেছেন, মশায় ?"

পরপুরুষের আকস্মিক মধ্যস্থতায় শোভা মাথায় একটু আঁচল টানিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। শত হইলেও পাড়াগাঁয়ের মেয়ে তো।

কিন্তু লোকটার ধৃষ্টতায় অবাক হইলাম। এক অপরিচিত দম্পতির জরুরী আলোচনার মাঝখানে এমন গায়ে-পড়িয়া আলাপের চেষ্টা আর যাহাই না হউক, ভদ্রতা যে নয় একথা নিঃসন্দেহ।

লোকটা একটু কাশিয়া লইয়া কহিতে লাগিল, "আপনার স্ত্রী ঠিক কথাই বল্‌ছেন মশায় ! উনি যার নাম করলেন সে আমার স্ত্রী। আজ এক মাস—রিকশা ভাড়ায়ও কোন্ আর দু'চার টাকা খরচ হয়ে যায় নি, বলুন—তবু শালাদের এখনো বেড্ খালিই হয় না। চালাকি পেয়েছে ! হুঁ, এটা হাসপাতাল ! ভেবেছে, চাবিকাঠির কোন খবরই আমরা রাখি নে। দেব সব কথা খবরের কাগজে তুলে —বুঝবে ঠেলা।"

আমি নিরুত্তর রহিলাম। এই লোকটি এতক্ষণ যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিতেছিল তিনি কহিলেন, "খবরের কাগজে লিখে কিছু হয় না।"

"হয় না মানে ? আপনি কিছু জানেন না মশায়।" লোকটা যেন তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল ; "জানেন আমার এক সম্বন্ধীর খুড়তুতো ভাই খবরের কাগজের আফিসে কাজ করে।

তাকে দিয়ে একটিবার ব্যাটাদের কাণ্ডকারখানার কথা ছাপিয়ে দিলে বুঝবে তখন কত ধানে কত চাল। মগের মুলুক পেয়েছে কিনা!"

ভদ্রলোক চুপ করিয়া গেলেন। বুঝিলাম, লোকটার মগজের গুটিকয়েক স্ক্রু ঢিলা রহিয়া গিয়াছে। তবু তাহার নিস্ফল অভিযোগের সবখানিই আর বাড়ানো নয়। আসল ব্যাপার জানিবার ইচ্ছা হইল বটে; কিন্তু একটি অশিক্ষিত উনপঞ্চাশী প্রকৃতির লোকের সঙ্গে আলাপ জমাইতে আমার শিক্ষিত অভিমানী মন গররাজী হইল। কলেজ-জীবন আমার মফঃস্বল সহরেই কাটিয়াছে। কলিকাতায় বার কয়েক না আসিয়াছি এমন নয়, হাসপাতালের ভিতরে যাইবার দুর্ভাগ্য আমার হয় নাই। পাড়াগাঁয়ের এক বে-সরকারী হাইস্কুলের স্বল্পবেতনের দরিদ্র মাষ্টার। শুধু জানি, দরিদ্র মধ্যবিত্তের কাছে ব্যয়বহুল আধুনিক চিকিৎসার পূরাপূরি সুযোগ-সুবিধা মিলে একমাত্র হাসপাতালেই। অথচ এ-লোকটা বলে কি!

লোকটির মুখে যেন তপ্ত খোলায় খৈ ফোটে অজস্র। খানিক বাদে আমার সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। উদগ্রীব হইয়া তাহার অনর্গল কথার স্রোতে বাধা দিয়া প্রশ্ন করিলাম, "আপনাকে এক মাস ধরে ঘোরাচ্ছে কেন?"

"কেন মানে?"—

"না, এই, বলছিলেন কিনা আজ একমাস ধরে—" লোকটি আমার মুখের কথা কাড়িয়া নিয়া কহিয়া চলিল, "তবে কি মিথ্যে বলছি মশায়? আপনি তো বেশ ভদ্রলোক।—জিজ্ঞেস করুন না ঐ ভদ্রলোককে, উনিও আজ দিন পনের ওঁর বিধবা মেয়েকে ভর্ত্তি করাবার জন্য এসে এসে ফিরে যাচ্ছেন। কি মশায়, মিথ্যে বলছি?"

ভদ্রলোক সায় দিল কি দিল না সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। তেমনি এক নিঃশ্বাসে বলিয়া চলিল, "গেল রোববার বললে, আসছে বুধবার নিশ্চয় ভর্ত্তি করাবে; বুধবার বললে, শনিবার; আজ শনিবারও এক কথাই বলবে—ঠিক দেখে নেবেন মশায়।"

এবার একটু থামিয়া সে বিড়ি ধরাইল। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি মন্তব্য করিলেন, "খাতিরে কী না হয়, বলুন। এরি মধ্যে কত জন পরে এসেও এ্যাড্‌মিশন পেয়ে গেল, চোখের উপর দেখলাম।"

বিড়ি টানিতে টানিতে লোকটা আবার রুখিয়া উঠিল, "সবুর করুন, মশায়। আর দুচা'র দিন দেখে খবরের কাগজে উঠিয়ে দেব।" তারপর আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "কী বলব মশায়। আজ নিয়ে বাইশ দিন। ইদিকে রোগীর তো প্রায় দফা রফা। ঘরে মশায় পাঁচ পাঁচটা আণ্ডাবাচ্চা। দেখুন না ব্যাটাচ্ছেলেদের কাণ্ড।"

একটু করুণা হইল। তাহার এত বর্ষণের পর একটা কিছু না বলিলে অন্ততঃ মনে মনে আমার যেন আর মান থাকে না। কহিলাম, "তা হলে শুধু আপনাকেই নয়, সকলকেই এমনি করে বুঝি—"

"সবাইকে ঘোরাবে কেন মশায় ?" আমার কথায় বাধা দিয়া লোকটি অট্টহাস্য করিয়া কহিল, "আপনি দেখছি মশায় কিছুই জানেন না—কোন খবর রাখেন না। সবাইকে ঘোরাতে যাবে কেন। আসল কথা—এই—এই চাই," বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সংযোগে এক প্রকার আওয়াজ তুলিয়া টাকার ইঙ্গিতটা সুন্দর করিয়া বুঝাইয়া দিল।

লোকটির ঘন ঘন 'মশায়' সম্বোধনটা বেশ উপভোগ্য। তাহার একটানা কথার কতক শুনিয়া আর কতক না শুনিয়া সময়টা কাটিয়া যাইতেছিল মন্দ নয়। কি-ই বা আর করি। কতক্ষণে যে শোভার ডাক পড়িবে। সবে তের নম্বর। চৌত্রিশের ডাক উঠিতে অনেক দেরী।

খানিকবাদে লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, "মশায়ের বুঝি স্ত্রীর অসুখ ?"

"হ্যাঁ।"

"আমারো।"

চুপ করিয়া রহিলাম।

"নিবাস ?"

"মলহাটা—পাবনা জেলায়।"

উত্তর দিয়াই তাড়াতাড়ি সেদিনের ভাজকরা 'আনন্দবাজার' খানি খুলিয়া লইলাম। তবু সে প্রশ্ন করিল, "মশায়ের নামটা কী ?"

সংবাদপত্রের স্তম্ভ হইতে মুখ না তুলিয়াই জবাব দিলাম, "রমানাথ মিত্র।"

"বেশ, বেশ !—আপনি তা হলে আমার স্বজাতি। আমিও মশায় কায়েত। আমার নাম শ্রীলোকনাথ দে।"

বেশ তো লোকনাথই হউক আর বিশ্বনাথই হউক, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু এ কি বেয়াদবি ! লোকটি আমার বাহিরের পরিচয় লওয়া সাঙ্গ করিয়া হাঁড়ির খবর লইতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কহিল, "মহাশয়ের কী করা হয় ?"

"মাষ্টারি"

"হেড মাষ্টার ?"

"না।"

"মাইনে কত ?"

ধৃষ্টতা কম নয়। তবু জবাব দিলাম, "চল্লিশ টাকা"।

"আমারও মাইনে চল্লিশ টাকা।"

ভালকথা ! মুখ ফিরাইয়া লইলাম। তবু নাছোড়বান্দা লোকনাথ দে থামিবে না। আবার প্রশ্ন, "বাপ-মা বেঁচে আছেন ?"

"না।"

"আমারো নেই মশায়।"

বিরক্তি গোপন করিয়া আবার সংবাদপত্র পড়িতে বসিলাম। খানিকবাদেই আবার বাধা।

"মাপ করবেন মশায়। আপনার নাম না কী বললেন?"

"রমানাথ মিত্র।"

"এই দেখুন মশায়, নাথে নাথে মিলে গেছে—" বলিয়া লোকনাথ উল্লসিত হইয়া উঠিল।

আচ্ছা বিপদ! কিছুতেই সে থামিবে না। আমি এবার সশব্দে খবরের কাগজ পড়িতে আরম্ভ করিলাম। তবু—

"আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি?"

"দুটি ছেলে, একটি মেয়ে।"

"কলকাতায় সঙ্গে নিয়ে এসেছেন?"

"না"।

"সে কি মশায়! মা ছেড়ে ছেলেপেলে অদ্দিন কেমন করে থাকবে?"

যেমন করিয়া থাকুক, তাহাতে লোকনাথের অত মাথা ব্যথা কেন! অসহ্য বোধ হইলেও চুপ করিয়া রহিলাম। লোকনাথ দে, সুতরাং কায়স্থ সে, ভদ্র সন্তান সন্দেহ নাই। লেখাপড়া জানা যাহাকে বলে সে-পাঠ যে তাহার ছোটবেলাই খতম হইয়াছে, তাহা তো অতি-প্রত্যক্ষ। না-ই বা জানিল। সবাই শিক্ষিত হইবে আজো এমন কোন বিধান নাই। তাই বলিয়া মানুষকে অমন অতিষ্ঠ করিয়া না তুলিবার ভদ্রতাজ্ঞান তাহার নাই কেন! রাগ দেখাইবার মত পরিচিত নয়, সুতরাং চুপ করিয়া যাওয়া ছাড়া আর উপায়ই বা কি!

লোকনাথ একথা সেকথা নানাকথা শেষ করিয়া অবশেষে আবার আমাকে স্মরণ করাইল, "কাজটা কিন্তু ভালো করেন নি, রমানাথবাবু। ছেলে মেয়ে ক'টিকে নিয়ে আসাটা উচিত ছিল। ওতে আর কত টাকাই বা লাগত। আপনার স্ত্রীকে ভর্তি হ'তে কদ্দিন দেরি হবে কে বলতে পারে! আমরা আগে যারা এসেছি, তাদের সব হবে, তবে তো আপনাদের পালা! মা ছেড়ে ছেলেমেয়েরা না জানি কত কষ্ট পাচ্ছে।"

লোকনাথের অযাচিত উপদেশের কবল হইতে রেহাই পাইলাম। [illegible]ত্রিশের ডাক উঠিয়াছে।

সেদিনের মত শোভাকে লইয়া বাহির হইয়া আসিতেছি। লোকনাথ পিছনে ডাকিল, "ও রমানাথবাবু!"

ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। সঙ্গে একটি আধ-ঘোমটা মেয়ে। বুঝিলাম, লোকনাথের স্ত্রী। মুখখানি ভালো দেখা গেল না। ইতিমধ্যে আমাদের দু'জনকে পিছন করিয়া উভয় পক্ষের গৃহিণী সংলাপ সুরু করিয়াছে। লোকনাথের স্ত্রীর সস্তা শাঁখার চুড়ি পরা একখানি হাত দেখিয়াই তাহার দীর্ঘকাল রোগভোগের পরিচয় পাওয়া গেল।

"বলছিলাম না লোকনাথবাবু, আজোও শালারা সে কথাই বলবে। সামনের বুধবার নাকি হবেই হবে। দেখা যাক।—আপনায় কী বললে?"

"আমাদেরও সামনের বুধবার আসতে বলে দিলেন। আবার পরীক্ষা করাতে হবে।"

লোকনাথ মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, "কত বুধবার আসবেন এখন থেকে—চিন্তা কি!"

লোকনাথ আরো অনেক কথা বলিতেছিল। কিন্তু আমি শুনিতেছিলাম, পিছনের অনুচ্চ কণ্ঠের আলাপ।

"কথায় বলে না দিদি, পথিকে পথিকে পথের আলাপন।"

শোভা কহিল, "এত লোকের মধ্যে তোমার সঙ্গেই বা আলাপ হবে কেন!"

"কে জানে, আর জন্মে তুমি হয় তো আমার মায়ের পেটেরই বড় বোন ছিলে।"

"তাই তো এক ঘর লোকের মধ্যে তোমায় চিনে নিলাম। আর কার সঙ্গে তো ভাব হল না।"

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। রেলষ্টিমারে শোভাকে কত মেয়ের সঙ্গেই না কুটুম্বিতা পাতাইতে দেখিয়াছি। এতগুলি মায়ের পেটের বোনের পূর্ব্বজন্মের গর্ভধারিণী নিশ্চয়ই গান্ধারীর স্বজাতীয়া ছিলেন। শোভাদের উপভোগ্য কথাবার্ত্তার মাঝখানে মূর্ত্তিমান রসভঙ্গের মত লোকনাথ বিড়ির কৌটা খুলিয়া ধরিল, "নিন—একটা বিড়ি ধরান।"

"আমি খাই না।"

"বেশ, বেশ! ও বদ অভ্যেস না করাই ভাল। আমাদের রাত-জাগা কাজ কি না। নেশাটা-আশটা না করলে আর চলে না মশায়।"

"আচ্ছা, এখন তবে—"

"নমস্কার, আবার বুধবার দেখা হবে।"

ওদিকে শোভা কহিতেছে, "তবে আজ যাই বোন।"

"একদিন আমাদের বাসায় কিন্তু যেতে হবে দিদি"।

"আচ্ছা, সে পরে হবে।"

শোভাকে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতে যাইয়া দৃষ্টি পড়িল লোকনাথের স্ত্রীর পাণ্ডুর মুখের উপর। তাহার ক্ষীণ দেহটি ঘিরিয়া ব্যাধির কাতর কুশ্রীতা। তবু কোটরস্থ ডাগর চোখদুটি হইতে নিকট-দিনের এক পূর্ণশ্রীর সকল সাক্ষ্য এখনো একেবারে মুছিয়া যায় নাই।

"একদিন আমাদের ওখানে কিন্তু যেতেই হবে", বলিয়া সে অস্থিচর্ম্মসার ডান হাতখানি দিয়া মাথায় আঁচল আর একটু তুলিতে তুলিতে একগাল মিষ্টি হাসির ব্যর্থ চেষ্টা করিল।

রিক্শা চলিয়াছে ঠুন্ঠুন্। লোকনাথের স্ত্রীর অসহায় অবস্থার কথাই বুঝি ভাবিতেছিলাম! শোভা কহিল, "লক্ষ্মী মেয়েটি বেশ।"

"লক্ষ্মী কে?"

"বা-রে ! এতক্ষণ না ওর বরের সঙ্গে বসে বসে আলাপ করলে।"

"হুঁ"।

তারপর গৃহিণী সবিস্তারে অনেক কথাই শোনাইল। ধন্য এই মেয়ে জাতটা! দু'দণ্ডের পরিচয়েই একবারে গলাগলি ভাব। শোভার জিম্মায় এখন লোকনাথের সংসারের সকল তথ্য জমা আছে। লোকনাথ কোন্ এক ছাপাখানার কাজ করে। সে নাকি যত সব বই ছাপায়। বুঝিলাম, কম্পোজিটর সে। মাহিনা পায় পঁচিশ টাকা। বেলেঘাটায় কি একটা গলিতে তাহাদের বাসা। লক্ষ্মীর ছেলেমেয়ে চারটি। বয়সে সে শোভারাণীরও ছোট। অতএব চব্বিশের বেশী নয়। বছর দুই নানা রোগে ভুগিতেছে। আবার নাকি অন্তঃসত্ত্বা। বাপের কুলে বড় একটা কেউ নাই। ইত্যাদি ও ইত্যাকার অনেক সংবাদ অবগত হইলাম। শুধু কি তা-ই। শোভা যেন আপন মনেই বলিয়া চলিল, "বেলা আর মণি প্রায় সমান। মাঝে লক্ষ্মীর একটা গেছে, নইলে তো আমার পল্টুর বয়সীই হত।" বুঝিলাম, লোকনাথেরও একটি নয় বছরের মেয়ে আছে, এবং বিধাতা বাদ না সাধিলে, এতদিনে সাত বছরের আর একটি ছেলেও থাকিত।

এত কথা, এত কাণ্ড! আর আমি কিনা শোভারাণীর পূর্বজন্মের মায়ের পেটের বোনটির স্বামীটিকে এতক্ষণ অবজ্ঞা করিয়া আসিলাম।

দুই

আমার ভাগ্য ভাল। পরদিন সন্ধ্যাবেলা হেদুয়ায় বহুকাল পরে এক পুরাণো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। সকল কথা শুনিয়া লোকনাথের মতই হাসিয়া কহিল, "তুমি দেখছি কিছুই জান না।"

যাহা হউক্, বন্ধুর নিকটে আটঘাটের কথা জানিয়া লইলাম এবং পরদিন দুপুরবেলা শোভাকে লইয়া ল্যান্সডাউন রোডে ডাঃ চক্রবর্ত্তীর বাসায় গেলাম। বাড়ীতে ডাকিলে ডাঃ চক্রবর্ত্তীর ষোল টাকা ভিজিট, আর বাসায় নিয়া দেখাইলে আট টাকাতে হয়।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী বলিয়া দিলেন, রোগ তেমন সিরিয়স নয়, তবু ইন্-ডোরে ভর্ত্তি করাইতে হইবে এবং বুধবারদিন রোগিনী যেন ভর্ত্তির জন্য প্রস্তুত হইয়াই হাসপাতালে যান। তথাস্তু।

বুধবার যথাসময়ের বহু আগেই সস্ত্রীক হাসপাতালে হাজির হইলাম। ডাঃ চক্রবর্ত্তী তখনো আসেন নাই। সন্ধান লইয়া জানিলাম, তাঁহার আসিতে আজ ঘণ্টাখানেক দেরী হইবে। দেরী হউক্ আপত্তি নাই। আজ আমি নিশ্চিন্ত মনে আসিয়াছি। আট টাকার ফলপ্রাপ্তি অপরিহার্য্য।

ইতিমধ্যেই রীতিমত ভীড় জমিয়াছে। আজ আবার কত অচেনা মুখ। লোকনাথ সেদিনের জায়গাটিতে বসিয়া আছে। এই কয়দিনে ঐ বেঞ্চিটায় তাহার বুঝি দখলিস্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। আমাকে দেখিয়াই এক গাল হাসিয়া সোল্লাসে কহিল, "এই যে রমানাথ বাবু, ইদিকে—এখানে এসে বসুন।—কতদিন এমনি আসতে হবে মশায়—সবে সুরু।"

• লোকনাথের সাদর সম্ভাষণ আজ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। তাহার পাশেই বসিয়া পড়িয়া কহিলাম, "আপনার স্ত্রীকেও বোধ হয় আজই ভর্ত্তি করে নেবে—"

"আরে মশায়, আমার ভাবনা আমি ভাবব। আগে নিজের কথাটাই ভাবুন। এই তো সুরু। কত আসবেন এখন থেকে।"

লোকনাথের কথা শুনিয়া খচ করিয়া আজ মনের কোণে কোথায় যেন বিঁধিল। অপরাধীর মত চুপ করিয়া রহিলাম। আমাকে আনমনা দেখিয়া লোকনাথ সান্ত্বনার কথা আরম্ভ করিল, "ভাবছেন কী মশায় ?"

"কিছু না।"

"হুঁ—লোকনাথ হাসিয়া উঠিল, "প্রথমটায় অমনি হয় মশায়।—ভেবেছিলেন, কলকাতায় পৌঁছেই সরাসর হাসপাতালের বিছানায়। এবার বুঝুন।"

চুপ করিয়া রহিলাম। সকল কথা খুলিয়া বলিতে কোথায় যেন লাগে। লোকনাথ একমাস ধরিয়া ঘুরিতেছে। আমি অবশ্য লোকনাথ নই। যে সামান্য অর্থ লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছি তাহা ফুরাইলে শোভারাণীর গলার সরু চেনটায় অন্ততঃ গোটা বাটেক টাকা তো মিলিবেই। তবু আমাদের সৌভাগ্যের কথাটা লোকনাথকে মুখ ফুটিয়া বলা চলে না। অথচ কেন যে বলা চলে না তাহারও সদুত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি কোন অপরাধ করি নাই নিশ্চয়ই। তবে অপরাধটা তাহার, না আমার, না কাহার ? যাহারই হউক বা না হউক, লোকনাথের কাছে আজ এমন অপরাধীর ভাব লইয়া বসিয়া আছি কেন ! আমাকে নীরব দেখিয়া লোকনাথ সুরু করিল—

"মশায়, এত লেখাপড়া শিখেছেন, খবরের কাগজে চুটিয়ে লিখে দিন না। ব্যাটারা চাকরির মায়ায় বাপ বাপ করে লাটের দোরে ধরণা দেবে।"

আস্তে আস্তে কহিলাম, "লিখে কিচ্ছু হয় না, লোকনাথবাবু।" চাহিয়া দেখিলাম, আমার 'লোকনাথবাবু' সম্বোধনে তাহার মুখেচোখে এক ঝলক খুশির হাসি ফুটিয়া উঠিল। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি এবার মুখ খুলিলেন, "হাসপাতাল বলে কেন মশায়, সব জায়গায়ই এক।"

আর যায় কোথায় ? লোকনাথ সবিস্তারে তাহাদের ম্যানেজারের শ্রাদ্ধ করিতে বসিল। আমি এক অস্বস্তিকর মনোভাব লইয়া বসিয়া আছি। ডাঃ চক্রবর্ত্তী আসিয়া পড়িলেই বাঁচিয়া যাই।

লোকনাথের অনর্গল বক্তৃতার মাঝখানে পাঁচ ছয় বছরের একটি মেয়ে আসিয়া তার কোলে বসিল। সেদিকে তাহার ভ্রুক্ষেপ নাই। বলিয়া চলিয়াছে, কবে তাহাদের প্রেসের কম্পোজিটর সব একযোগে ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। ম্যানেজারের তর্জ্জন-গর্জ্জন ! কম্পোজিটরদের আস্ফালন। অবশেষে আবার তাহারা ভালো ছেলের মত কাজে লাগিল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি এখানে প্রশ্ন করিলেন, "আপনিও কাজ আরম্ভ করলেন ?"

"আমি তো আর কাজ ছাড়ি নি।"

"ও, আপনি ষ্ট্রাইক্ করেন নি।"

"খেপেছেন মশায়? চার চারটি ছেলেমেয়ে, শেষকালে সকল গোষ্ঠী শুকিয়ে মরি আর কি?"

ভদ্রলোক হাসিলেন। হাসিল লোকনাথ নিজেও। আমি এতক্ষণ রোগা মেয়েটির দিকেই তাকাইয়া ছিলাম।

"এটি আপনার মেয়ে?"

"হাঁ। আজ ওদের সবাইকে নিয়ে এসেছি। কি জানি আজ যদি ওকে ভর্ত্তি করে, তবে রোববারের আগে তো হাসপাতাল-মুখো হ'তে পারব না।"

মেয়েটি আমার দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া পিতাকে কহিল, "বাবা, মাসিমা পুঁটিকে একখানা রোমাল দিয়েছে, দেখবে?

"পুঁটি কিরে, দিদি বল্" বলিয়া লোকনাথ আমার দিকে চাহিয়া হাসিল। আমাদের উভয় পরিবারের মধ্যে যে একটা সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে সেই কথাটা অমন মুখর লোকনাথও শুধু খুশির হাসিতেই প্রকাশ করিতে চায়। জিজ্ঞাসা করিলাম, "পুঁটি বুঝি আপনার বড় মেয়ে?"

"হাঁ,—আন্না, তোর দিদিকে আসতে বলতো—তোর মেসোকে পেন্নাম করে যাক।"

একটু বাদেই আট নয় বছরের একটি মেয়ে আসিয়া হাসিয়া হাজির। লোকনাথ কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিল, "বুড়োধাড়ি মেয়ে, তবু তোর বুদ্ধি হল না? তোর মেসোকে পেন্নাম করেছিস?"

মেয়েটি লজ্জিত হইয়া আমার পায়ের ধুলো লইল। দেখাদেখি তাহার ছোট বোনটিও।

তাহারা চলিয়া যাইতেই লোকনাথ হাসিতে হাসিতে কহিল, "ওদের মা কাল রাত্তিরে কী স্বপ্ন দেখেছে, শুনবেন? আজ ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠেই আমাকে বলে, হাসপাতালে পাশাপাশি দুট' বিছানায় ওঁরা দুজনে নাকি শুয়ে শুয়ে গল্প করছে, আর আমরা দুজনে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্‌ছি।—হাস্‌ছেন কি মশায়, শেষ রাত্তিরের স্বপ্ন! ফলতে কতক্ষণ।"

আমি আদৌ হাসি নাই। বরং একটু বিরক্তি বোধ করিতেছিলাম। খানিক আগে আমার সৌভাগ্যের জন্যই লোকনাথের উপর একটু করুণা জাগিয়াছিল। কিন্তু সে যে আমাকে সর্ব্ববিষয়ে তাহার সমতুল্য করিয়া লইবে এতখানি উদারতা আমার নাই। আমার এই অভিমান হাস্যোদ্দীপক স্বীকার করি। কিন্তু হাসপাতালের দুয়ারে স্বপ্নের মধ্যেও আমি তাহার সঙ্গে গলাগলি ধরিয়া হাসাহাসি করিতে একেবারেই নারাজ!

আমাকে আনমনা দেখিয়া লোকনাথ কহিল, "রমানাথবাবু, পুঁটির বিয়েতে কিন্তু আপনাদের কলকাতায় আসতে হবে, আগে থেকে বলে রাখছি। ওর মা কাল বলেছিল—"

"মা, তোমায় ডাকছে—" মেয়েটি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। লোকনাথ উঠিয়া পড়িল।

খানিকবাদে ফিরিয়া আসিয়াছে। মুখের ভাব অসম্ভব রকম গম্ভীর। বুঝিলাম, আমি

এতক্ষণ যে কথাটা গোপন করিয়া আসিয়াছি, শোভার নিকট হইতে সে কথা এখন লোকনাথের কাছে তাহার স্ত্রীর মারফৎ পৌঁছিয়াছে। খানিকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে কহিলাম, "লোকনাথবাবু—"

লোকনাথ সাড়া দিল না।

"আপনাকে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, কাল সন্ধ্যাবেলা এক বন্ধুর সঙ্গে—"

লোকনাথ যেমন ছিল তেমনি আছে। তবু একটু থামিয়া আবার কহিলাম, "আপনাদের ডাক্তার বোধ হয় এসেছেন। একবার খোঁজ নিন না, আজ নিশ্চয় এ্যাডমিশ্‌ন্ পাবে।"

লোকনাথ নির্ব্বাক। তবু আর একবার চেষ্টা করলাম, "আপনার স্ত্রীর শেষ রাত্রের স্বপ্নের বাকি অর্দ্ধেক নিশ্চয়ই ফলবে—।" লোকনাথ বিড়ি ধরাইল। তাহার অস্বাভাবিক মুখের ভাব দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে সাহস হইল না। মনে মনে হাসিলাম, করুণার হাসি। লোকটা অভিমান করিল কাহার উপর? আমি? ডাঃ চক্রবর্ত্তী? আটটি রৌপ্য মুদ্রা? গোটা হাসপাতাল? না, সারা দুনিয়া? না, নিজেরই দুরদৃষ্ট?—বোধ হয় আলাদা করিয়া কোনটাই নয়, সবগুলি জড়াইয়া এক অবোধ্য অভিমানে সে গুম হইয়া আছে।

আসল সমস্যা তো ল্যান্সডাউন রোডেই সেদিন সমাধান হইয়া রহিয়াছিল। সুতরাং দেরী হইল না। কয়েক মিনিটেই সকল ব্যবস্থার হুকুম হইয়া গেল। এখন শোভা সামনের এই মাঠটুকু পার হইয়া ঐ বিরাট লাল রঙের বাড়ীতে গেলেই হয়।

সিঁড়ির পথেই লক্ষ্মী তাহার ছেলেমেয়ে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। শোভাকে দেখিয়াই কহিল, "দেখা না করেই চলে যাচ্ছিলে বুঝি?"

"সে কি বোন! আমি তো হল-ঘরে তোমার খোঁজ করে এই আসছি।—তোমার আজ হ'ল না?"

লক্ষ্মী চুপ করিয়া গেল। আজ তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। পরণে সেদিনের সেই আধ-ময়লা শাড়িখানি। গায়ে একটি রঙিন সেমিজ। একমাথা রুক্ষ চুল; সিঁথিমূলে জ্বলজ্বল করে সিঁদূর। গণ্ডস্থল ভাঙ্গিয়া নামিয়াছে। কণ্ঠাস্থি বেয়াড়া রকমে জাগিয়া উঠিয়া ডাক্তারি-বই-এ-দেখা মনুষ্য-কঙ্কালের ছবিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আরো ঢের আগে হাসপাতালে আসা উচিত ছিল। এখনো বুঝি আশা আছে। আমি একটিবারে চতুর্দ্দিকের বিরাট ইমারত-গুলির উপর চোখ বুলাইয়া লইলাম। চমৎকার বাবধান। হাসপাতালকে কেন্দ্র করিয়া আমার চোখের সম্মুখে তখন সারা দুনিয়াটা তার সকল জারিজুরি লইয়া বার কয়েক ঘুরিয়া লইল।

লক্ষ্মী কহিতেছিল, "কী কপাল নিয়েই জন্মেছিলাম দিদি, আমারো ভোগান্তি এবং শান্তি

নেই। রাত-জাগা কাজ, আমার অসুখের জন্য ওভারটাইম খাটে—দিনের বেলাও যদি একটু চোখ বুজতে না পারে—"

লোকনাথ পিছন হইতে রুক্ষস্বরে হাঁকিল, "পুঁটি, তোরা কি আজ সারাদিন এখানেই থাকবি! বাসায় যেতে হবে না!"

লক্ষ্মী জবাব দিল, "আদিকোতা ত্যাখ না। এতক্ষণ বসে রইলে, আর ত্নমিনিটে ব্রহ্মাণ্ড যেন রসাতলে যাবে।"

লোকনাথ রুখিয়া উঠিল, "তোমার আর গায়ে লাগ্‌বে কী!—আমি শালা নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, কেবল ডাক্তারখানা আর হাসপাতাল করছি।"

লক্ষ্মী স্বামীকে উপেক্ষা করিয়াই শোভাকে কহিতে লাগিল, "দেখ্‌ছ তো দিদি, কী সুখে আমি ঘর করি। আর হু'মিনিট দাঁড়ালে ওঁর—"। লোকনাথ তিড়বিড় করিয়া উঠিল, "আমি চললাম। তুমি এখানে বসে বসে সারা রাজ্যের লোকের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি কর।"

এবার লক্ষ্মীও ফোঁস করিয়া উঠিল, "ভদ্দলোকের সঙ্গে তো মেশ না, তাই কোথায় কী বলতে হয় তাও জান না।"

কথা আর শেষ হইল না। লোকনাথ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "চুপ্‌ কর হারামজাদি! তোর কাছে আমি ভদ্দলোক ছোটলোক শিখতে আসব?"

গতিক ভাল নয়। লোকনাথ 'তুমি' থেকে 'তুই'এ নামিয়া আসিয়াছে। এবার মানে মানে সরিয়া না পড়িলে আরো কিছু শুনিতে হইবে।

শোভা ত তাড়াতাড়ি ছোট ছেলেটাকে কোল থেকে নামাইয়া দিয়া আমার অনুসরণ করিল। একবার শোভার সঙ্গে সঙ্গেই পিছনে ফিরিয়া দেখিয়া লইলাম, ছেলেমেয়ে লইয়া লক্ষ্মী সেখানেই দাঁড়াইয়া আছে, লোকনাথের দৃষ্টিও আমাদেরই গমনপথে নিবদ্ধ।

শোভা মন্তব্য জানাইল, "লোকটা কী ইতর!"

আমি কেবল হাসপাতালের বাড়ীগুলির উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইলাম।

চীনের জাতীয় আন্দোলন *

চিন্মোহন সেহানবিশ

যেমন চীনের ভাষা, তেমনি তাহার রাষ্ট্রনীতি। আমাদের দেশের শিক্ষিত এবং জ্ঞানলিপ্সুগণও এ বিষয়ে তেমনি বিশেষ আগ্রহ দেখান না। চৈনিক রহস্যের মত উভয়ই অত্যন্ত জটিল এবং নিরুৎসাহজনক। কিন্তু বর্ত্তমানে জাপানের সহিত তাহার এই সর্ব্বনাশা সমরের ফলে চীন আজ জগতের দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে। প্রধান সেনাপতি চ্যাং-কাইসেক এবং তাঁহার পত্নীর কথা আজকাল খবরের কাগজে একটী বিশেষ সংবাদ। এর পূর্ব্বেও জাপানের সহিত চীনের খণ্ডযুদ্ধ ও ডাঃ সান্-ইয়াং-স্যানের নাম অতি সাধারণ লোকেরও জানা ছিল। কিন্তু যে লক্ষ লক্ষ গ্রাম্য চীনাবাসীর পক্ষে এই মহানুভব ব্যক্তি দাঁড়াইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে এবং প্রাচীন চীনের এই নব অভ্যুদয় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুব সুস্পষ্ট নয়। জাপানের সহিত চীনের এই অবিশ্রান্ত সংগ্রাম শুধু এই নব অভ্যুদয়েরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। আমাদের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম আজ কঠিন বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। তাই চীনের দিকে চোখ ফিরাইয়া দেখা আমাদের প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ সেখানেও জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম এক ভীষণ রক্তস্রোতের ভিতর দিয়া এক রোমহর্ষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে।

ম্যাডাম চ্যাংকাই সেক

পাশ্চাত্যদেশের সহিত সংস্পর্শের ফলেই আমাদের দেশের মত চীনেরও জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ইহার মূলগত কারন তিনটী। প্রথমতঃ ধনতান্ত্রিক পাশ্চাত্যের অর্থনীতি চীনের প্রগতিবিমুখ, সঙ্কীর্ণ এবং গ্রাম্য অর্থনীতিকে একবারে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। তাহার পরিবর্ত্তে যে ব্যাপক Commodity economy আরম্ভ হইল তাহাই জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, পাশ্চাত্যের সহিত চীনের এই সংস্পর্শ দুই সমকক্ষ বন্ধুর সম্বন্ধ নয়। পাশ্চাত্য শক্তিগুলি ধীরে ধীরে চীনের রাজ্যসমূহ আত্মসাৎ করিতে লাগিল। এই সংস্পর্শের অর্থ দাঁড়াইল—অপমানজনক সন্ধি, রাজস্ব-সংক্রান্ত ক্ষমতালোপ, বাধ্যতামূলক অহিফেন

* স্বলিখিত ইংরেজী প্রবন্ধ অবলম্বনে

সেবন, অর্থনৈতিক সর্ব্বনাশ এবং মনুষ্যত্ব বিলোপ। কিন্তু সুপ্রাচীন এবং গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতার স্মৃতিসম্পন্ন একটা জাতির পক্ষে এই অবস্থা স্বভাবতঃই অসহ্য হইয়া উঠিল। ইহার ফলে জাগিয়া উঠিল এক চরম জাতীয়তাবাদ। তৃতীয়তঃ, পাশ্চাত্যের সহিত সংস্পর্শের ফলে চীন ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় রাষ্ট্রনীতি ক্রমে ক্রমে পরিগ্রহণ করিতে লাগিল। কনফিউসিয়াসের যে ভাবধারায় তাহারা এতদিন পরিচালিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাও বর্জ্জন করিতে লাগিল। আমাদের দেশের ন্যায় চীনের জাতীয়তাবাদও মিল, হাক্সলি, রুশো, এডামস্মিথ এবং পরবর্ত্তীকালের মার্ক্সের ভাবধারা গ্রহণ করিয়া সবল হইয়া উঠিতেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের মধ্যেই চীনের জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৮৯৪-৯৫ খৃঃ জাপানের হাতে পরাজয় এই স্বর্গরাজ্যের (celestial empire) অধিবাসীদের আরামের তৃপ্তিখানিকে কঠোর আঘাত করিল। শক্তিমান্ পাশ্চাত্য-জাতিরা তাহাদের উপর যে অপমানের বোঝা চাপাইয়াছিল, এ আঘাত তাহা হইতে স্বতন্ত্ররকমের। একটা সামান্য প্রাচ্য-শক্তির হাতে পরাজয় তাহাদের আত্মাভিমানকে ক্ষুণ্ণ করিয়া দিল, এবং তাহাদের অন্তরে জাগিল একটা আত্ম-বিশ্লেষণ। জাপানের এই সাফল্যে অন্যান্য জাতিরাও লুব্ধচিত্তে লুটোপুটি করিতে লাগিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আফ্রিকা লইয়া কাড়াকাড়ির ব্যাপারেও ইহারই প্রতিরূপ দেখিতে পাই। জাপানের মত দ্রুত প্রগতির পথে চলিতে না পারিলে রাজ্যলুব্ধ গৃধ্রগণ যে অচিরেই গ্রাস করিবে, একথা বুঝিতেও বাকী রহিল না। অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি এবং সমরনীতিতে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইল। বর্ত্তমান চীনের সুলেখক ক্যাং-ইউ-ওয়েই ও তাহার প্রতিভাবান্ শিষ্য লিয়াং-চি-চৌ সংবাদপত্রের মারফতে এই সংস্কারের আবশ্যকতা প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারাও উপলব্ধি করিলেন না যে, কয়েকটী পাশ্চাত্য ব্যবস্থাকে গ্রহণ করিলেই ম্রিয়মাণ চীনদেশের পক্ষে যথেষ্ট হইবে না। প্রয়োজন ছিল একটা আমূল পরিবর্ত্তনের, একটা বিপ্লবের। তৎকালীন সম্রাট কিয়াং হস্যু, ক্যাংএর সাহিত্যকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। ইহার ফলস্বরূপ যাহার উদ্ভব হইল তাহাকেই বলা হয় "১৮৯৮ সালের সংস্কারের শতদিবস" (Hundred days of reform)। কিন্তু সম্রাটের বিধবা পত্নী ইহাকে হঠাৎ এরূপ আক্রমণ করিলেন যে সংস্কারপন্থীরা হয় কারারুদ্ধ নয়ত দেশত্যাগী হইতে বাধ্য হইলেন।

ম্যাডাম স্যান

এই প্রতিক্রিয়া চীনের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেও জনসাধারণ ধীরে ধীরে বুঝিতে পারিল যে এইরূপ আংশিক সংস্কারে কোনই ফলোদয় হইবেনা। বাস্তবিক সাম্রাজ্যের অবস্থা এতই

শোচনীয় ছিল যে ঐ ভাবে তাহার উন্নতি হওয়া অসম্ভব ছিল। চীনবাসীর উন্নতি সাধন করিতে বিপ্লব ভিন্ন অন্য উপায় ছিলনা। সুতরাং বিপ্লবকেই উদ্দেশ্য করিয়া গুপ্তসমিতি সমূহ গড়িয়া উঠিতে লাগিল। সাধারণতঃ ক্ষুদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় লইয়াই এই সমিতি গঠিত হইত, গণ-আন্দোলনে ইহাদের বিশ্বাস ছিল অতি অল্প। আমাদের দেশের মত তাহাদেরও উদ্দেশ্য ছিল গোপন-ষড়যন্ত্রমূলক। বিপ্লবের স্বরূপ সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট। তাহাদের প্রতিষ্ঠান ছিল কতকটা ব্যষ্টিমূলক এবং তাহাতে কোন সুচিন্তিত কার্য্য-প্রণালী ছিল না। প্রায়ই প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং সুবিধাবাদ ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ খুঁজিত। পরবর্ত্তী কালের ঘটনাবলীই ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

চীন সাধারণতন্ত্রের জন্মদাতা ডাঃ স্যান্-ইয়াং-সানও তাঁহার রাজনীতিক জীবনের প্রথম অধ্যায়ে এইরূপ একটী সমিতির সভ্য ছিলেন। ক্যাণ্টন ও অন্যান্য স্থানে তিনি একাধিকবার ষড়যন্ত্রমূলক উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন। অতঃপর ধীরে ধীরে তিনি উপলব্ধি করিলেন যে এখানে সেখানে সামান্য একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করিলেই বিপ্লবের উদ্ভব হইবে না। তাহার মধ্যে জনসাধারণকে টানিয়া আনিতে হইবে। ছাত্রজীবনে এবং একজন কর্ম্মঠ বৈপ্লবিক হিসাবে তাঁহাকে দূরদূরান্তে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। তথায় তিনি দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিকের (Second International) কয়েকজন সভ্যের সংস্পর্শে আসিয়া প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন রাজনীতিক দলের ভাব ও সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন।

১৯০৫ খৃঃ অব্দে ইয়োরোপ পর্য্যটনকালে ডাঃ স্যান্-ইয়াং, টাং ম্যাগ হই (Tang Mag Hai) বা মিলন সমিতি নামক এক বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের নেতারূপে কাজ করিয়াছিলেন। ইহা কোন স্বতন্ত্র গুপ্তসমিতি ছিলনা। তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন, সমস্ত বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে একই ভিত্তিতে স্থাপনপূর্ব্বক একটী কার্য্য-প্রণালী গঠন করিতে। এই কার্য্যপ্রণালীই স্যান্ ম্যানচু বা সূত্র-ত্রয়ী (Three Principles) নামে অভিহিত।

ডাঃ স্যান্ স্বয়ং এই সূত্র তিনটী উদ্ভাবন করেন এবং ইহার উপরেই চীনের জাতীয় আন্দোলনের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এইবার এই সূত্র তিনটীর একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যাউক।

প্রথমটী জাতীয়তার (Nationalism) মূলসূত্র। ডাঃ স্যানের ভাষায় "কোন জাতি কোন বিদেশীকে তাহাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অপহরণ করিতে দিবে না"—এই আদর্শের উপরই প্রথম সূত্রটী প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ইহাকে জাতীয় বিপ্লব (national revolution) বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় সূত্রটীর উদ্দেশ্য গণতন্ত্র (Democracy)। শুধু জাতীয়তাই যথেষ্ট নয়। স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা থাকিবে সমগ্র জাতির উপর। কোন এক ব্যক্তি বিশেষের উপর নয়। ইহাই এই সূত্রটীর মূল অর্থ। সুতরাং জাতীয় বিপ্লব ব্যতীত এই সূত্রটী রাজনৈতিক বিপ্লবের (Political revolution) প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করিয়াছে।

তৃতীয় সূত্রটী জীবিকা বিষয়ক (Peoples Livelihood)। ইহার মূলকথা—প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন এবং জমি ও আয়ের উপর সকলেরই সমান অংশ রক্ষা। এই সূত্রটীতে ডাঃ স্যানের উপর সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কারণ, ইহার মধ্যে সমাজতন্ত্রের বীজ নিহিত রহিয়াছে। ইহাতে সমাজ-বিপ্লবের (Social revolution) প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে।

জাতীয়তা, গণতন্ত্র এবং জাতির জীবিকা—এই তিনটীই ছিল চীনের জাতীয় আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। ডাঃ স্যান বলিয়াছেন—"ব্যক্তিগত সুবিধালাভের জন্য মুষ্টিমেয় মাঞ্চুগণ সমগ্র মহাচীনের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছে। ইহার প্রতিবাদকল্পেই আমাদের জাতীয় বিপ্লব চালাইতে হইবে। কোন ব্যক্তিবিশেষ সমগ্র রাজনৈতিক ক্ষমতা একচেটিয়া করিয়া রাখিবে, ইহা আমরা সহ্য করিব না। তাই আমরা চাই রাজনৈতিক বিপ্লব। আমরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনও বোধ করি ; যেহেতু, মুষ্টিমেয় বণিকশ্রেণী দেশের সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করিবে, ইহা আমাদের অসহ্য। আমাদের এই তিনটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে চীনাগণ তাহাদের মাতৃভূমির গৌরবে গর্ব্ব বোধ করিতে পারিবে।" তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, কঠোর সাধনা ব্যতীত এই অবস্থা সম্ভব হইবে না। এই উদ্দেশ্যে তিনি সামরিক, শিক্ষানৈতিক, বৈধ রাজনৈতিক (military educative, and constitutional) শাসন-প্রণালী গঠন করিবার প্রস্তাব করিলেন।

ইহাই ছিল চীনের জাতীয় আন্দোলনের মূলসূত্র। ডাঃ স্যানের অধিনায়কত্বে এই আন্দোলন ক্রমশঃই শক্তি অর্জ্জন করিতে লাগিল। হঠাৎ মাঝে মাঝে সন্ত্রাসমূলক আক্রমণাদিও ঘটিতে লাগিল। তন্মধ্যে ওয়াং-চিং-ওয়েই কর্ত্তৃক প্রিন্স এজেন্টকে হত্যার চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ওয়াং-চিং-ওয়েই পরবর্ত্তী কালে ডাঃ স্যানের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়াছিলেন।

১৯১১ খৃঃ ওয়োচাং সৈন্যদলের বিদ্রোহ এইরূপ প্রচেষ্টার চরম পরিণতিরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। চীনের বহু প্রদেশ, বিশেষতঃ দক্ষিণ চীনের প্রদেশগুলি এই বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল। ঐতিহাসিক কারণে যে সাম্রাজ্যের পতন আরও পূর্ব্বেই ঘটা উচিত ছিল, এইবার তাহা বিনা বাধায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করা হইল। ডাঃ স্যান এইসময় আমেরিকায় যাইয়া এই নবগঠিত সাধারণতন্ত্রের জন্য সহানুভূতিলাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। জাতীয় সম্মেলন (National convent) তাঁহাকেই সাধারণ-তন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত করিল।

কিন্তু এই সময়েই ডাঃ স্যান্ তাঁহার গৌরবমণ্ডিত দীর্ঘ রাজনীতিক জীবনের সর্ব্বপ্রধান ভুল করিয়া ফেলিলেন। পরবর্ত্তী ঘটনাবলীই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। সমগ্র চীনদেশকে একই সাধারণতন্ত্রের মধ্যে আনিবার জন্য এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব এড়াইবার উদ্দেশ্যে ডাঃ স্যান্ সুবিধাবাদী য়ুয়ান্-সি-কাই এর পক্ষে পদত্যাগ করিলেন। য়ুয়ান-সি-কাই চীনের প্রেসিডেন্ট হইলেন। এদিকে ডাঃ স্যান্, ট্যাং-মেঙ-হুই নামক গুপ্তসমিতিকে পুনরায় একটী প্রকাশ্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিবর্ত্তিত করিলেন এবং ইহার নাম রাখিলেন কুয়োমিনট্যাং বা জাতীয় গণ-প্রতিষ্ঠান। এদিকে য়ুয়ান-সি-কাই এক বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। তিনি জাতীয় মহাসভা (National Congress)

ভাঙ্গিয়া দিলেন। কুয়োমিনট্যাংকে বে-আইনী ঘোষণা করিলেন, সমগ্র শাসনতন্ত্রই উল্টাইয়া দিয়া নিজেকে আজীবনের জন্য প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করিলেন এবং সর্ব্বোপরি নিজেকে অবশেষে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। সমগ্র দেশ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। সুদূর নির্ব্বাসন হইতে ডাঃ স্যান বজ্রকণ্ঠে জানাইলেন—'সাধারণতন্ত্রকে রক্ষা করিতেই হইবে।' চারিদিকে ধীরে ধীরে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল। এই সময় হঠাৎ য়ুয়ান মারা গেলেন (১৯১৬)। চীনের চারিদিকে হুলুস্থূলু গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। নবগঠিত সাধারণ-তন্ত্র অক্ষুণ্ণ থাকিলেও শাসনদণ্ড সামরিক নেতাদের হস্তে চলিয়া গেল। কেবলমাত্র দক্ষিণ অঞ্চলে বৈপ্লবিক দল সামান্য ক্ষমতা বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন।

এদিকে চীনকে আবার মিত্রশক্তিদের পক্ষে যুদ্ধলিপ্ত হইতে হইল। চীন ভাবিয়াছিল যে, এইরূপেই সে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রগুলির সহানুভূতি লাভ করিবে। কারণ ১৯১৫ খৃঃ অব্দে জাপান চীনের নিকট ২১ দফা দাবী জানাইয়াছিল এবং সেই দাবী পরিপূরণের অর্থ চীনের রাজক্ষমতা লোপ। কিন্তু অবস্থা যাহা দাঁড়াইল তাহাতে চীনের আশা একেবারে নির্ম্মূল হইল। ডাঃ স্যান এবার বুঝিতে পারিলেন, তাহার জাতীয়তার মূলমন্ত্র হওয়া উচিত সাম্রাজ্যবাদের বিলোপ সাধন।

ইতিমধ্যে পুঁজিবাদী দেশ সমূহের শতবাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া রাশিয়ার সুবিখ্যাত দশ দিনের বিপ্লবের ("the days that shook the world") খবর চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

বহুদিনের দুর্ভিক্ষ অনশন ও বিবাদ-কলহের পর জারতন্ত্রের (czarism) জীর্ণ প্রথার পরিবর্ত্তে নব-উদ্ভাবিত সমাজতন্ত্র সমগ্র পৃথিবীর দুঃস্থ জন-সাধারণের অন্তরে আশার সঞ্চার করিল।

বিদেশী শক্তিদ্বারা পদদলিত চীনও সোভিয়েটের এই সত্য সোল্লাসে গ্রহণ করিল। ঘোষণা করা হইল—পুরাতন শাসন-ব্যবস্থায় যে সকল সন্ধি করা হইয়াছিল তাহা আর মানিয়া লওয়া হইবে না এবং যে সকল রাজ্য বেদখল হইয়াছিল তাহাও আর ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না এবং তজ্জন্য কোন ক্ষতিপূরণও করা হইবে না। চীনের রাজনীতি রাশিয়ার পন্থায় পুনর্গঠিত হইতে লাগিল।

য়ুয়ানের ক্ষণস্থায়ী সাম্রাজ্যের পতনের পর যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল তাহাতে প্রত্যেক বিপ্লবীই গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি করিয়া দলগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিল। ডাঃ স্যান দেখিলেন, চীন-সোভিয়েট-মৈত্রী (Sino-Soviet Entente) হইবে এই পুনর্গঠিত দলের মেরুদণ্ড স্বরূপ। সুতরাং ১৯২২ খৃঃ ডাঃ স্যান এবং সোভিয়েটের বিশেষ দূত এড্‌লফ জফ (Adolf Joffe) সম্মিলিত ভাবে একটী খসরা তৈরী করেন। ইতিহাসে ইহা স্যান-জফের সর্ত্তাবলী নামে প্রসিদ্ধ। এই সর্ত্তানুসারে রাশিয়া কুয়োমিনট্যাং সমিতিকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং জাতীয় বিপ্লবে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিল এবং বর্ত্তমান চীনে কম্যুনিষ্ট সমাজ (Communist society) গঠনের উপযোগী নয় বলিয়া তৎসম্বন্ধে সর্ব প্রকার প্রচার কার্য্য নিষিদ্ধ হইল। ১৯২৪ খৃঃ অব্দে কুয়োমিনট্যাংয়ের প্রথম জাতীয় মহাসভায় এই সকল সর্ত্ত গৃহীত হইল এবং গণতন্ত্রের

উপর প্রতিষ্ঠিত এক নূতন রাষ্ট্রতন্ত্র (constitution) উদ্ভাবিত হইল। ১৯২০ সালে কম্যুনিষ্ট কোমিণ্টর্নের মহলিন(Mohlin) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চীনীয় কম্যুনিষ্ট দলের সভ্যগণকেও কুয়োমিন-ট্যাংয়ের সভাশ্রেণীভুক্ত করা হইল। শ্রমিক ও ছাত্র আন্দোলনকে প্রকাশ্যভাবে সাহায্য কর হইতে লাগিল। এবং এই সময়েই সুপ্রসিদ্ধ উত্তর অভিযান আরম্ভ হইল।

কুয়োমিনট্যাং ছিল সকল সম্প্রদায়ের মিলনভূমি। রাশিয়ার ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তিতে শঙ্কিত হইয়া কোন কোন সম্প্রদায় দল ছাড়িয়া দিল। কোন কোন শ্রেণী নিষ্ক্রিয়ভাবে দলের মধ্যেই রহিয়া গেল। আবার অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি দলের মধ্যেই থাকিয়া কম্যুনিষ্টদের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। বঙ্গপ্রদেশ এই জয়দৃপ্ত বিপ্লবী সৈন্যদের নিকট অবনত হইল। কিন্তু ইহাদের ভিতরে ভিতরে জঞ্জাল গড়িয়া উঠিতেছিল। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বরোদিন (Borodin) এবং অন্যান্য রুষীয়গণ ধুরন্ধরগণ এই বিপ্লবী বাহিনী পরিচালনায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। কম্যুনিষ্ট ইন্‌টারন্যাশনেলের প্রতিনিধি মিঃ এম্ এন রায়ও এঁদের মধ্যেই ছিলেন।

চীনের দুর্ভাগ্য, এই সঙ্কট সময়ে ডাঃ স্যান-ইয়াট সানের মৃত্যু হইল। ফলে চীনের রাজনীতি-ক্ষেত্রে রাশিয়ার প্রভাব স্বতঃই ক্ষুণ্ণ হইল। এই সময়ে কুং-চ্যান্‌ট্যাং (The Chinese C. P.) অধ্যাপক চ্যান-টু-শিএর সম্পূর্ণ প্রভাবাধীন ছিল। ইনি সুবিধাস্থলেই মত পরিবর্ত্তন করিতেন। ফলে কুয়োমিনট্যাং এর প্রতিক্রিয়াশীল দল প্রবল হইয়া উঠিল। বরোদিনও ছিলেন দুর্ব্বল এবং অস্থির-চিত্ত। কুয়োমিনট্যাংয়ের দক্ষিণপন্থীরা চিয়াং কাইশেককে উপযুক্ত নেতারূপেই পাইলেন। ইনি সাংহাইয়ের ধনকুবেরগণের সহায়তায় এক বিপ্লব-বিরোধী আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। মিঃ রায়ের একটী ত্রুটীতে এই আন্দোলন আরও অগ্রসর হইল। মস্কো হইতে আগত একখানি গুপ্ত টেলিগ্রাম মিঃ রায় ওয়া-চিউ-ওয়েইকে দেখাইয়াছিলেন। ফলে রাশিয়ার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন হইল। কম্যুনিষ্ট দক্ষিণপন্থী, ছাত্র ও শ্রমিকদিগকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করা হইতে লাগিল। বরোদিনও রায় মস্কোতে পালাইয়া গেলেন। ক্যান্টনে কম্যুনিষ্টগণ শেষবার প্রতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। ক্যান্টনও রক্তে ডুবিয়া গেল।

কতিপয় কম্যুনিষ্ট সেই ধ্বংসলীলা হইতে রক্ষা পাইয়া চীনের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিল। এখানে ম্যায়োট সি ট্যাং এর সুযোগ্য নেতৃত্বে তাহারা কৃষক সোভিয়েট গঠন করিল। প্রথমতঃ এগুলি খুবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু তাহাদের সন্তোষজনক কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া অন্যান্য গ্রামবাসীরাও তাহাদের সহিত যোগ দিল। নানকিংএর ডিকটেটর এই ক্রমবর্দ্ধমান সোভিয়েট দর্শনে শঙ্কিত হইলেন এবং তাহাদিগকে দাবাইয়া দিবার জন্য অভিযান আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থান হেতু তাহাদের বিশেষ কোন ক্ষতি হইল না। এমন কি সমস্ত শক্তি সুসংবদ্ধ করিয়া তাহারা ৬০০ মাইল দীর্ঘ এক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পরিখা খনন করিল ; এবং জেনারেল চ্যুটার অধীনে একটী লালবাহিনী গড়িয়া তুলিল। কিন্তু তাহারা সত্যই বুঝিতে পারিল, তাহাদের বিরুদ্ধে প্রত্যেকটী অভিযানের ফলে জাপান চীনের কতকঅংশ দখল করিয়া লইবে। ইতিমধ্যেই

জাপান মাঞ্চুরিয়া, জিহল এবং চহার প্রভৃতি দখল করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং নানকিং এর সহিত সমবেত হইয়া জাপানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য তাহারা পুনঃ পুনঃ প্রস্তাব পাঠাইতে লাগিল। তাহারা যথার্থ বুঝিয়াছিল যে, জাপানই তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শত্রু। চিয়াংএর কিন্তু মন টলিল না।

এই সময়ের একটী ঘটনা জাপানের কর্ম্মপদ্ধতি বদলাইয়া দিল। চিয়াংকাইসেক কম্যুনিষ্টদের দমন করিবার জন্য মার্শাল চ্যাংসোলিয়াংকে পাঠাইলেন। কিন্তু তাহার মাঞ্চুরীয় বাহিনী লালফৌজের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিল। ১৯৩৩ খৃঃ অব্দে ১২ই ডিসেম্বর চিয়াং কাইসেক স্বচক্ষে সমস্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য নিজেই সিয়াংফুতে চলিয়া আসিলেন। এইখানে হঠাৎ মার্শালের সৈন্যগণ তাহাকে বন্দী করিল। ১৫ দিন তিনি বন্দী অবস্থায় ছিলেন। এই সময়ে মার্শাল ও কম্যুনিষ্ট প্রতিনিধি চৌ-এনলাই নানারূপ যুক্তি দিয়া তাহাকে সম্মিলিত দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে লাগিলেন। অবশেষে চিয়াং জাপান আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে কম্যুনিষ্টদের আন্তরিকতা উপলব্ধি করিলেন। চ্যাংকাইসেক সম্মিলিত দল গঠন করিতে সম্মত হইয়া মুক্তি লাভ করিলেন। নানকিংএ ফিরিয়া আসিয়া তিনি জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য দল গঠন করিতে লাগিলেন। জাপানও সমস্তই লক্ষ্য করিতেছিল; বিপদের আশঙ্কা ঠিক বুঝিতে পারিয়া জাপান কোন প্রকার অজুহাত না দেখাইয়াই সম্মিলিত দলের বিরুদ্ধে চীন আক্রমণ করিল। জাপানের এই জিঘাংসা-বৃত্তিই আমরা আজ বিস্মিত-নেত্রে তাকাইয়া দেখিতেছি।

ডাঃ স্যান-ইয়াত-সান

এই দ্বন্দ্বের ফল কি দাঁড়াইবে, কে জানে? রাজনৈতিক ভবিষ্যৎবাণী বড় গুরুতর। কিন্তু একটী ব্যাপার আমরা দেখিতে পাইতেছি। জাপানের এই অকারণ যুদ্ধসাজ চীনবাসীকে আজ যেরূপ সম্মিলিত করিয়াছে, পূর্ব্বে আর কখনও সেরূপ হয় নাই। বলদৃপ্ত এই শত্রুর নিকট যদিও আজ তাহারা আপদস্থ হইতেছে, এই সমর-অনল নিভিয়া গেলে ইহারই ভস্মস্তূপ হইতে বাহির হইয়া আসিবে এক সম্মিলিত, বলদৃপ্ত এবং বিজয়ী নবীন চীন!

ভারতের রাজস্ব-নীতি

অধ্যাপক অনাথগোপাল সেন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় আমরা পণ্যশুল্ক, ভূমি-রাজস্ব, আয়-কর, আবকারী, লবণ-শুল্ক হইতে ভারত-গবর্ণমেণ্টের আয় সম্পর্কে পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় অন্যান্য খাতে ভারত-সরকারের রাজস্ব সম্বন্ধে আমরা একে একে আলোচনা করিব।

ষ্ট্যাম্প্‌স্

ষ্ট্যাম্প-রাজস্ব প্রধানতঃ জুডিশ্যাল ও নন্-জুডিশ্যাল এই দুই ভাগে বিভক্ত। দেওয়ানি, ফৌজদারি ও রেভিনিউ আদালতে আর্জ্জি, দরখাস্ত, ওকালতনামা ও অন্যান্য দলিলের উপর যে ষ্ট্যাম্প ব্যবহৃত হয়, তাহা জুডিশ্যাল ষ্ট্যাম্প নামে খ্যাত। আর দান, বিক্রয়, খত, চেক, রসিদ, এগ্রিমেণ্ট প্রভৃতি বৈষয়িক ও ব্যবসায়িক দলিল-পত্রের জন্য যে ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন হয় তাহাদিগকে নন্-জুডিশ্যাল ষ্ট্যাম্প বলা হয়। উভয়বিধ ষ্ট্যাম্পস্ হইতে প্রাপ্ত মোট প্রায় ১২ কোটী টাকার শতকরা ৭৫ ভাগ জুডিশ্যাল অর্থাৎ আইন-আদালত সংক্রান্ত ষ্ট্যাম্প্‌স্ হইতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে আবার শতকরা ৭০ ভাগ একশত টাকার ন্যূন মূল্যের মোকর্দ্দমা হইতে আদায় হইয়া থাকে। ফৌজদারি মাম্‌লাতেও দরিদ্র লোকেরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জড়িত থাকে। সুতরাং ষ্ট্যাম্প-রাজস্বের বেশীর ভাগ পরোক্ষভাবে গরীবদের নিকট হইতেই আদায় হইয়া থাকে। ১৯১২ সালে ষ্ট্যাম্প্‌স্ হইতে মোট আয় ৭ কোটী টাকার অধিক হইয়াছিল। উহা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৩৫ সালে ১২ কোটী টাকার উর্দ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। ইহা হইতে দেখা যায়, যে বিগত ২৩ বৎসরের মধ্যে এই আয় শতকরা প্রায় ৭২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ দেশের লোকের মত মাম্‌লাবাজ জাতি পৃথিবীর আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের সমাজ-দেহ এই বিষে কিরূপ দূষিত ও বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে—যাহার চক্ষু আছে তিনিই তাহা দেখিতে পাইতেছেন। শিক্ষাভাব, কর্ম্মাভাব, সর্ব্বোপরি কূপমণ্ডুকত্ব যে এই অবস্থার জন্য দায়ী তাহা অস্বীকার করা যায় না।

রেজিষ্ট্রেসন

দান, বিক্রয়, হস্তান্তর, রেহানি তমসুক প্রভৃতি দলিল সম্পাদনের জন্য কেবল মাত্র ষ্ট্যাম্প দিলেই চলে না; অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনানুযায়ী এই সব দলিল সরকারী আফিসে রেজিষ্টারী করিতে হয় এবং তজ্জন্য সম্পত্তির মূল্যানুযায়ী একটা ফিস্ দিতে হয়। এই বিভাগের আয়ও বিগত ২৩।২৪ বৎসরের মধ্যে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯১২ সালে এই বিভাগ হইতে

আয় হইয়াছিল ৬৩॥ লক্ষ টাকা। ১৯৩৫-৩৬ সালে আয় হইয়াছে ১ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা। অনেকে মনে করেন মানুষের অবস্থা দিন দিন হীন হওয়ার ফলেই ভূসম্পত্তির দ্রুত হস্তান্তর ঘটিতেছে এবং ফলে এই আয় ঐরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই আয়ের একটা বৃহৎ অংশ দরিদ্র সাধারণের নিকট হইতে আসিয়া থাকে।

বন-বিভাগ

বৃটিশ ভারতের মোট আয়তনের শতকরা ২২ ভাগই বিশাল অরণ্যছায়াচ্ছাদিত। ২,৪৯,৭১০ বর্গ মাইল জুড়িয়া এই অমূল্য সম্পদশালী নিবিড় বনরাজি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু দেশের একান্ত দুর্ভাগ্য, গবর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য ও জনসাধারণের অক্ষমতার দরুণ আমরা ভগবদ্দত্ত এই অতুল নৈসর্গিক সম্পদকে একেবারেই কাজে লাগাইতে পারিতেছি না। এক কোটী টাকার অধিক মূল্যের কাগজ ও পেষ্ট বোর্ড এবং বহু সহস্র টন মণ্ড (pulp) প্রতি বৎসর আমরা বিদেশ হইতে আমদানি করি; অথচ ভারতের বনে-অরণ্যে যে বাঁশ ও ঘাস উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারা কাগজ প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতে পারিলে দেশের এতগুলি টাকা দেশেই থাকিয়া যায়, অধিকন্তু আমরা বিদেশে কাগজ চালান করিতে পারি। শুধু তাহাই নয়, দেশলাই, রবার, রজন, লাক্ষা, তারপিন তৈল ও চন্দন তৈল প্রভৃতির সাহায্যে বহু শিল্প গড়িয়া তোলা সম্ভব হইত। তক্তা, জ্বালানী কাঠ, নানা জাতীয় পাতা, ফল, তন্তু, ঘাস, আঠা, রজন, বল্কল, জীবজন্তু এবং খনিজ সম্পদ ভারতের বনে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। এতগুলি বহুবিধ শিল্পের সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধন করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ গবর্ণমেণ্ট যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহার ফলে তক্তা ও জ্বালানী কাঠ বিক্রয় ও বনগুলির সংরক্ষণ ভিন্ন দেশের ও দেশবাসীর কোন বৃহত্তর কল্যাণেই ইহা লাগিতে পারিতেছে না। পক্ষান্তরে যাহারা যুগ যুগান্তর ধরিয়া এই সব বনে ও অরণ্যে গোচারণ, কাষ্ঠ আহরণ করিয়া গোপালন ও জীবন ধারণ করিয়া আসিতেছে, তাহারা গবর্ণমেণ্টের বিধি-নিষেধের ফলে তাহাদের এই চিরন্তন অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া অশেষ অসুবিধা ও ক্লেশ ভোগ করিতেছে। বন-বিভাগ হইতে গবর্ণমেণ্টের আয় বিগত ৩৫।৩৬ বৎসরে দ্বিগুণের অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯০১ সালে এই বিভাগের আয় ছিল কিঞ্চিৎ ন্যূন ২ কোটী টাকা। ১৯৩৬ সালে এই আয় দাঁড়াইয়াছে ৪৷ কোটী টাকারও উর্দ্ধে। এই আয়ের অধিকাংশই তক্তা ও অন্যান্য কতকগুলি অরণ্যজাত জিনিষের বিক্রয়-লব্ধ অর্থ হইতে আসিয়া থাকে। পশু-চারণ, জ্বালানী-কাঠ, বাঁশ, বেত ও অন্যান্য কতকগুলি জিনিষ আহরণ করিবার অনুমতি প্রদানের জন্য ব্যক্তিবিশেষের নিকট যে ফিস্ আদায় করা হয়, তাহা হইতেও একটা আয় হয়।

রেলওয়ে

১৮৩৫ সালে সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ, বোম্বাই হইতে কল্যান এবং মান্দ্রাজ হইতে আরকোনাম পর্য্যন্ত প্রাইভেট কোম্পানীর সহায়তায় ভারতবর্ষে রেল প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সিপাহী বিপ্লবের পর হইতে সৈন্য চলাচলের সুবিধার জন্য ভারতবর্ষে ব্যাপক ভাবে রেলওয়ের প্রতিষ্ঠা সুরু হয়। এই উদ্দেশ্যে বিলাতী কোম্পানীকে বার্ষিক শতকরা অন্যূন ৫৲ টাকা লাভ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া ভারতে রেলস্থাপনার জন্য আহ্বান করা হয়। রেল-লাইনের জন্য প্রয়োজনীয় জমিও বিনা মূল্যে এই সব কোম্পানীকে দেওয়া হইবে, সর্ত্ত করা হয়। যত ক্ষতিই হউক না কেন, তাহা যখন তৃতীয় পক্ষ পরিপূরণ করিয়া দিবে এবং তদুপরি গৌরী সেনের অর্থে অন্যূন শতকরা ৫৲ টাকা লাভও পাওয়া যাইবেই, তখন কোম্পানী পরিচালনায় ব্যবসায়ানুমোদিত নিপুণতা ও মিতব্যয়িতার কোনরূপ প্রয়োজন থাকে না। বলা বাহুল্য, এরূপ অবস্থায় রেলওয়ে প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সময় ব্যয়ের দিকে একেবারেই দৃষ্টি দিবার আবশ্যক হয় নাই। ফলে অর্থের যতদূর সম্ভব অপব্যয় হইয়াছে এবং ভারতের অর্থে অপরের পকেট ভারী ও দেমাক বৃদ্ধির সুযোগ ঘটিয়াছে। অবশ্য বৃটিশ শাসনের গুণ রাশির কথা উঠিলে সর্ব্বপ্রথমেই রেলওয়ের বিষয় উল্লেখ করা হইয়া থাকে। রেলওয়ে হইতে ভারতবাসী নিশ্চয়ই কিছু আনুষঙ্গিক সুবিধা পাইয়াছে। কিন্তু তাহার জন্য মূল্যও যাহা দিয়াছে তাহা সামান্য নহে। এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, পরাধীনতার বন্ধন আরও দৃঢ় করিবার জন্যই সারা ভারতের বুকে এই লৌহ-দণ্ড বিছান হইয়াছিল এবং ইহারই সাহায্যে ইংরেজের পণ্য ভারতের সহর বন্দর ছাইয়া ফেলিয়া দেশীয় শিল্পের ধ্বংসের পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, রেলওয়ের জন্য আবশ্যকীয় বহুমূল্যবান কোচ, ইঞ্জিন ও যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম সব ইংলণ্ড হইতেই আসিয়াছে। ইহার মূল্য দিবার জন্য কোটী টাকা দেশত্যাগী হইয়াছে। ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত রেলকোম্পানীগুলি হইতে কোন প্রকার লাভ পাওয়া যায় নাই। অধিকন্তু ক্ষতিপূরণের জন্য ভারত-সরকারকে প্রায় ৭৮ কোটী টাকা দিতে হইয়াছে। এইরূপ ক্ষতি বহন করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ায় ১৮৮০ সালের পর যে সব বিলাতী রেল-কোম্পানীর সহিত নূতন চুক্তি করা হয়, তাহাতে প্রতিশ্রুত লাভের হার হ্রাস করিয়া শতকরা ৩।০ টাকা নির্দ্ধারিত করা হয়। অধিকন্তু এইরূপ সর্ত্ত করা হয় যে রেলওয়ের পরিচালনার ভার কোম্পানীর উপর থাকিলেও উহার মালিকি স্বত্ব গবর্ণমেণ্টের থাকিবে এবং পঁচিশ বৎসর পরে কিম্বা তৎপর প্রতি দশবৎসর অন্তর ইহার সর্ত্ত পরিবর্ত্তন করা চলিবে। বর্ত্তমানে কয়েকটি রেলওয়ে, যথা নর্থ ওয়েষ্টার্ণ, ইষ্ট বেঙ্গল, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান, গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার ও বার্ম্মা রেলওয়ে গবর্ণমেণ্ট মূল্য দিয়া নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে গ্রহণ করিয়াছেন। বোম্বে বরোদা এণ্ড সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া, বেঙ্গল নাগপুর, সাউথ ইণ্ডিয়া, আসাম বেঙ্গল এবং মান্দ্রাজ সাউথ মালাবার এই কয়টি লাইনের মালিক গবর্ণমেণ্ট, কিন্তু কোম্পানীর পরিচালনাধীন। বোম্বে এণ্ড নর্থওয়েষ্টার্ণ, রোহিলখণ্ড কুমায়ন ও সাউদার্ণ পাঞ্জাব প্রভৃতি কয়েকটি লাইনের মালিক এখন পর্য্যন্ত প্রাইভেট কোম্পানী। ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত মোট রেলওয়ের দৈর্ঘ্য ছিল ২৪,৭৫৩ মাইল, ১৯১৫ সালে ৩৫, ২৮৫ মাইল। বর্ত্তমান সময়ে ইহার পরিমাণ প্রায় ৪৩ হাজার মাইল। অবশ্য ইহার মধ্যে দেশীয় রাজ্যের অন্তর্গত রেলওয়ে ধরা হইয়াছে। বৃটিশ ভারতীয় কোম্পানীগুলির মোট মূলধনের

পরিমাণ প্রায় ৮০০ শত কোটী টাকা। ১৯০১ সালের পর হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট রেল কোম্পানীগুলি হইতে লভ্যাংশ পাইতে সুরু করেন। কিন্তু ১৯৩১ সালের পর ব্যবসা মন্দার দরুণ ইহারা পুনরায় লোকসান দিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এই লোকসানের পরিমাণ প্রায় দশ কোটী টাকায় দাঁড়াইয়াছে। বিলাত হইতে ভারত গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ের জন্য যে টাকা ধার করিয়া আনিয়াছেন, তাহার জন্য একই ভাবে উচ্চ হারে সুদ দিয়া যাইতেছেন; তদুপরি দেনা বৃদ্ধির দরুণ সুদের মোট অঙ্কও বাড়িয়াই চলিয়াছে; কিন্তু অন্যদিকে গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত মূলধন হইতে আয়ের পরিমাণ মন্দার দরুণ বিশেষ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতীয় রেল কোম্পানীতে নিয়োজিত বিলাতী মূলধনের নিরাপত্তা ও স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ভারত ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভার একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন স্বজাতি-গঠিত কমিটির উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। যাহাতে রেলওয়ে ব্যাপারে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব না থাকিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ১৯৩৫ সালের নূতন ভারত শাসন আইনেও পাকাপাকি ভাবেই করা হইয়াছে। ইহা হইতে ভারতে রেলওয়ে প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য ও নীতি সম্পর্কে আমরা কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিতে পারি।

পূর্ত্ত ও সেচবিভাগ

খাল কাটিয়া কিংবা নলকূপ বসাইয়া বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে কৃষিকার্য্যের জন্য শস্যক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করাই এই বিভাগের উদ্দেশ্য। ভারতের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে চাষের জন্য জলের আবশ্যকতার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। পুরাকাল হইতে এই সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ও ব্যাপক বন্দোবস্ত থাকার বহু প্রমাণ আমরা পাই। পর্য্যটক বাউরি (Bowrey) পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে ও পর্য্যটক বার্ণিয়ার (Bernier) সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে দামোদর ও গঙ্গা নদীর উভয় পার্শ্বে অসংখ্য সেচখাল দেখিয়া গিয়াছিলেন এবং ইহা তাহারা তাহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে বিস্ময়ের সহিত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কার্ল মার্কস এই সম্পর্কে ১৮৫৩ সালে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও প্রণিধান-যোগ্য। তাঁহার লেখা (ভারতে ইংরেজ শাসন) হইতে কিয়দংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:

"এশিয়ায় অতি প্রাচীনকাল হইতে তিনটী সরকারী বিভাগ চলিয়া আসিতেছে,—রাজস্ব, সৈন্য ও পূর্ত্ত। খাল কাটিয়া জমিতে জল সেচন ব্যবস্থা প্রাচ্যদেশে কৃষিকর্ম্মের প্রাণ-স্বরূপ। তাই প্রাচ্যের সকল শাসন-ব্যবস্থায় পূর্ত্ত বা সেচ বিভাগ একটা প্রধান স্থান চিরদিন অধিকার আসিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম্মদক্ষতার উপর ভূমির উর্ব্বরতা নির্ভর করিত। জল সেচন ও জল নিকাশ ব্যবস্থার অবহেলা দেশের কৃষিকর্ম্মের সর্ব্বনাশ সাধন করিত। এই কারণেই একটী মাত্র সর্ব্বনাশী যুদ্ধের ফলে একটা সভ্যতার বিলোপ সাধিত হইত, দেশ বহুকাল জনহীন হইয়া থাকিত।

শস্য রক্ষার জন্য জলের সুবন্দোবস্ত করা প্রত্যেক গবর্ণমেন্টের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিৎ। অতি পুরাকালেও রাজশক্তির এই বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি ছিল এবং তদনুরূপ ব্যবস্থা ছিল, পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ বিংশ শতাব্দীতে সুসভ্য ইংরেজ শাসনাধীনে বাস করিয়াও আমাদিগকে এখনো অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৈবের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইতেছে। নিজ প্রয়োজনে শাসনকর্ত্তারা লাভক্ষতি বিবেচনা না করিয়া ভারতের স্কন্ধে বিশাল ব্যয়ভার চাপাইয়া ঝড়ের বেগে সারা দেশময় রেল লাইন ছড়াইয়া দিতে পারিয়াছেন ; কিন্তু দরিদ্র দেশবাসীর মুখের গ্রাসটুকু যাহাতে ধ্বংস না পায় তাহার ব্যবস্থা করিবার বেলায় হিসেবের কষাকষি করিয়া অন্ততঃ শতকরা ৬৲ টাকা লাভ না পাইলে অর্থব্যয় করিয়া সেচ ব্যবস্থা করিতে দ্বিধাগ্রস্ত।

আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, সেচ-বিভাগের আয়ের অধিকাংশ ভূমি-রাজস্বের ন্যায় দরিদ্র কৃষককুলকে দিতে হয় এবং ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে স্বল্প বা অধিক জমির মালিক সকলকেই একই হারে দিতে হয়। ইহা কর-নির্দ্ধারণের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি (regressive principle)। বৎসরের ভালমন্দের উপর ইহার হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে না, ভূমিরাজস্বের ন্যায় ইহা অপরিবর্ত্তনীয়—আয়করের ন্যায় ইহা প্রতি বৎসর অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তনশীল নহে। সেই জন্যই ১৯৩০ সালের পর শস্যের মূল্য অর্দ্ধেকের অধিক হ্রাস প্রাপ্ত হইলেও গবর্ণমেন্টের লাভের হার তুলনায় অতি সামান্যই হ্রাস পাইয়াছিল। উপরের ১৯৩১-৩৩ সালের হিসাব দ্রষ্টব্য।

সিভিল এডমিনিষ্ট্রেশন

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বিচার, জেল, পুলিস, ষ্টেশনারী, প্রিন্টিং, ইমারত বিভাগের আয় ইহার অন্তর্গত। এই আয়ের পরিমাণ অতি সামান্য। মোট রাজস্বের শতকরা তিন ভাগ মাত্র। বিচার বিভাগের আয় আদালত কর্ত্তৃক আদায়ী জরিমানা, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ও মোকর্দ্দমার ফি হইতে, জেল বিভাগের আয় কয়েদীগণ কর্ত্তৃক জেলে প্রস্তুত দ্রব্যাদির বিক্রয়-মূল্য হইতে, শিক্ষা-বিভাগের আয় সরকারী স্কুল কলেজের ছাত্র-বেতন হইতে, স্বাস্থ্য-বিভাগের আয় সিরাম ও ভ্যাক্‌সিন বিক্রয় হইতে, কৃষি-বিভাগের আয় সরকারী পরীক্ষামূলক আবাদের বীজ ও ফসলাদি বিক্রয় হইতে এবং কৃষি শিক্ষালয় ও পশু চিকিৎসালয়ের ফিস্ হইতে, ইমারত বিভাগের আয়—সরকারী বাড়ী-ঘরের ভাড়া, রাস্তা ও খেয়াঘাটের টোল এবং সরকারী কারখানার আয় হইতে, প্রিন্টিং বিভাগের আয়—গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাদির বিক্রয় হইতে আসিয়া থাকে।

সরকারী দাদনের সুদ

ভারত-গবর্ণমেন্ট অনেক সময় প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে তাহাদের প্রয়োজনে ঋণ দান করিয়া থাকেন। আবার প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট ও মিউমিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট

বোর্ড, লোকাল বোর্ড প্রভৃতিকে সময় সময় তাহাদের অভিপ্রেত বিশেষ কোন বৃহৎ অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহার্থ টাকা ধার নিয়া থাকেন। এই সব ঋণের বাবদ যে সুদ পাওয়া যায় তাহাই এই বিভাগের আয়।

তপশীলভুক্ত কর (Scheduled Tax)

প্রমোদ কর, জুয়াখেলার কর, বিলাস কর (Luxury tax) ইহার অন্তর্গত। মুদ্রা ও টাকশাল, নোটের বিনিময়ে যে সিকিউরিটি রক্ষিত হয় তাহার সুদ, নোট ছাপিবার ও টাকা তৈয়ারীর লাভও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

সৈন্য বিভাগ

পুরাতন ও অব্যবহার্য্য সাজসরঞ্জামাদি বিক্রয়লব্ধ অর্থ, ক্যান্টনমেণ্ট অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব, জরুরী প্রয়োজনে অন্য দেশকে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করার দরুণ প্রাপ্ত অর্থ ইহার অন্তর্গত।

ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগ

এই বিভাগের আয় এত সামান্য যে ইহা ধর্ত্তব্যের সামিল নহে।
নিম্নোক্ত হিসাব হইতে এই বিভাগের পাঁচ বৎসরের লাভক্ষতি বুঝিতে পারা যাইবে:

বৎসর	মোট আয়	মোট ব্যয়
১৯৩০-৩১	১০,৭৭,৮৬ সহস্র টাকা	১২,১১,৩৫ সহস্র টাকা
১৯৩১-৩২	১০,৬৪.৫৯ " "	১১,৫৮,৪৪ " "
১৯৩২-৩৩	১০,৫৫,৪০ " "	১০,৯৭,৩০ " "
১৯৩৩-৩৪	১০,৭২,৬১ " "	১১,২৪,৫৫ " "
১৯৩৪-৩৫	১১,১৯,৮৭ " "	১০,৮১.৯৩ " "

সাধারণ মন্তব্য

আধুনিক করনীতির গোড়ার কথা হইতেছে এই যে, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে বিসদৃশ বৈষম্য সমাজে বিদ্যমান তাহা বিবেচনা করিয়া করভার বণ্টনের সময় দরিদ্রের উপর যাহাতে করের চাপ অধিক না পড়ে তদ্বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট থাকিতে হইবে। সেইজন্যই কর-শাস্ত্রে আধুনিক কালে

ক্রমবর্দ্ধমান নীতি (principle of progressive taxation) সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে। তাহার অর্থ মোটামুটি এই যে যাহার আয় যত বেশী হইবে তাহাকে তত অধিক হারে কর দিতে হইবে। কিন্তু আমরা আমাদের পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে দেখিতে পাইয়াছি যে, এই নীতি সাধারণতঃ এদেশে অনুসৃত হয় নাই। করের চাপ—তাহা প্রত্যক্ষ করই হউক, আর পরোক্ষ করই হউক—অধিকাংশ ক্ষেত্রে দরিদ্রের উপরই আসিয়া পড়িয়াছে। আয়-কর ভিন্ন অন্য কোন ক্ষেত্রে অগ্রগামী বা ক্রমবর্দ্ধমান নীতি অনুসৃত হয় নাই। এই ক্ষেত্রেও ইহা যতটা ক্ষিপ্র ও উগ্র হওয়া উচিত ছিল অর্থাৎ ধনীর উপর যতটা উচ্চহারে কর নির্দ্ধারিত হওয়া সঙ্গত ছিল, তাহা হয় নাই। ভূমি-রাজস্ব ও সেচ-কর প্রত্যক্ষ করের দুইটি প্রধান দৃষ্টান্ত। ইহাদের বেলায় প্রতিগামী বা প্রতিক্রিয়াশীল নীতি (principle of regressive taxation) অনুসরণ করা হইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই এক একরের মালিক ও একহাজার একরের মালিক, এই উভয়কেই অবস্থা নির্বিশেষে একই হারে কর দিতে হইতেছে। আয়-করের বেলায় যেমন ২০০০৲ টাকার অনধিক বার্ষিক আয়ের জন্য কোন কর দিতে হয় না, সেইরূপ ক্ষুদ্র আয়তনের কৃষকের বেলায় কোনরূপ অনুগ্রহ দেখান হয় নাই। ইউরোপের অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, মোট রাজস্বের তুলনায় আমাদের ভূমি-রাজস্ব কত অধিক। ইংলণ্ডে ভূমি-রাজস্ব মোট রাজস্বের সহস্র ভাগের এক ভাগও নহে; ফ্রান্সে শতকরা দুই ভাগের কিছু বেশী। ইটালিতে শতকরা একভাগেরও কম; অথচ আমাদের দেশে ইহা মোট রাজস্বের ১৫ ভাগ! ইহার উত্তরে অবশ্য বলা হইতে পারে যে, শিল্প-ক্ষেত্রে ভারতের অনুন্নত অবস্থাই ইহার জন্য দায়ী। রাজ্যশাসন করিতে হইলে রাজস্বের প্রয়োজন। শিল্পপ্রতিষ্ঠান হইতে উন্নত সমৃদ্ধিশালী দেশসমূহের যে বিপুল অর্থাগম হইয়া থাকে তাহার কোন অংশ যখন এ দেশের গবর্ণমেণ্টের পাইবার আশা নাই, তখন অনন্যোপায় হেতু তাঁহারা এই পন্থা অবলম্বন না করিয়া আর কি করিতে পারেন? ইহার উত্তরে ভারতে শ্রমশিল্পের আজ এরূপ দুরবস্থা কেন হইল, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।

আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক হইতে ভারত-গবর্ণমেণ্টের যে বিরাট আয় হইয়া থাকে—যে আয় মোট রাজস্বের শতকরা ৫ ভাগ—তাহার মূলেও শিল্পক্ষেত্রে ভারতবর্ষের কলঙ্ককর অনুন্নত অবস্থা গৌণভাবে সূচিত হইতেছে। বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের জন্য ইংলণ্ডের প্রয়োজন সস্তা কাঁচা মালের, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রয়োজন গম ও চাল। তাহাই ইংলণ্ড আমাদের দেশ হইতে প্রতি বৎসর গ্রহণ করিয়া থাকে এবং তাহাই কারখানায় রূপান্তরিত করিয়া বহুগুণ অধিক মূল্যে নানারূপ বিলাস সামগ্রীরূপে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়া থাকে। সেইজন্যই ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের এত আধিক্য এবং তাহার উপর নির্দ্ধারিত শুল্ক এত অধিক লাভজনক। বনবিভাগ হইতে যে আয় হইয়া থাকে, তাহাও প্রধানতঃ দরিদ্রের নিকট হইতেই আদায় হইয়া থাকে। পরোক্ষ করের মধ্যে লবণের উপর নির্দ্ধারিত শুল্ক অন্যতম এবং ইহার আয়ও প্রচুর। এই করের হাত হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র ব্যক্তিরও রেহাই পাইবার উপায় নাই, যেহেতু ইহা ধনী ও দরিদ্র

সকলের পক্ষেই সমান প্রয়োজনীয়। জীবনধারণের পক্ষে ইহা যেমন অপরিহার্য্য তদনুপাতে ইহার মূল্য নিতান্ত নগণ্য। উচ্চ শুল্কের দরুণই ইহার যাহা কিছু মূল্য। দরিদ্র ভারতবাসীকে এই কর বহন করিতে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় তাহা আমরা সহরের বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া অনুমান করিতে পারি না। পৃথিবীর কোন ধনী দেশেও লবণের উপর এতটা উচ্চ হারে শুল্ক নির্দ্ধারণের কথা চিন্তা করিতে পারে না। ষ্ট্যাম্পস্, রেজিষ্ট্রেশন, উৎপাদন শুল্ক প্রভৃতিও প্রধানতঃ দরিদ্রের নিকট হইতেই আদায় হইয়া থাকে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রেলের আয়ের শতকরা ৮০ ভাগ তৃতীয় শ্রেণীর দরিদ্র যাত্রীদের নিকট হইতে আদায় হয়। মালের ভাড়া পরোক্ষভাবে অনেকখানি দরিদ্রের উপর যাইয়াই পড়ে। অবশ্য কেহ এ কথা বলিতে পারেন যে, দেশের অধিকাংশই যখন দরিদ্র তখন দরিদ্রকে বাদ দিলে রাজার কড়ি আসিবে কোথা হইতে? ইহার উত্তরে অনেক কথাই বলা যাইতে পারে; যেমন, দেশের এইরূপ শোচনীয় অবস্থার জন্য শাসকবর্গের কি কোনরূপ দায়িত্ব নাই? যে দেশের অধিকাংশ নর-নারী দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, সেই দেশের সৈন্য পোষণ ও শাসনের ঠাট বজায় রাখিবার জন্য রাজস্বের বেশীর ভাগ ব্যয় করার সার্থকতা কোনখানে? আমাদের এই অসহায় ও হীন অবস্থা বৈদেশিক শাসনের অনুকূল, এমন কি তাহাদের ঈপ্সিত—শিক্ষিত ভারতবাসীরা যদি এইরূপ সন্দেহ হৃদয়ে পোষণ করিতে সুরু করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বেশী দোষ দেওয়া যায় কি? ইহার পর আমরা যখন একে একে ব্যয়ের দিক আলোচনা করিব, তখনও যে চিত্র আমরা দেখিতে পাইব তাহাতে এই দেশের শাসন-নীতি সম্পর্কে উদার মনোভাব পোষণ করা কঠিন হইয়া পড়িবে।

ক্রমশঃ
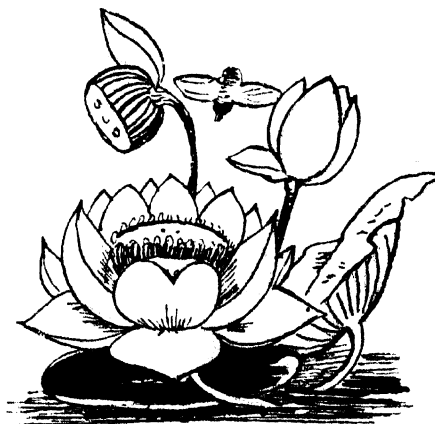
বিচিত্রা

বাসন্তী সেন

আমার, মন যেনরে সাঁঝের আকাশখানি,
সেথায় ফোটে রঙের শতদল,
স্বপ্নে ঢল ঢল।
কল্পনারি ইন্দ্রধনু রয় যে সেথায় জানি,
সেথায় রহে শুকতারার চাউনি ছলছল।

আমার, মন যেনরে নিবিড় বাদল রাতি!
সেথায় কভু আঁধার ঘন কালো,
বিদ্যুতেরি আলো।
হয়তো সেথা জ্বলবে নাকো করুণ প্রদীপ-ভাতি।
বাজবে শুধু বর্ষামেঘে মেঘমল্লার ভালো।

আমার, মন যেনরে চৈত্র শেষের ঝড়!
কেউ জানেনা কখন আসে যায়
বনের আঙিনায়,
নাচন জাগায় পাতায় শাখায় ছন্দে থর থর।
যায় যে চলে চিহ্ন রেখে অরণ্যেরই ছায়।

কৃষ্ণ-কমল

জ্যোৎস্নানাথ চন্দ এম-এ, বি-এল্

রাস্তার ওপারের গোল্ড্মোহর গাছটার উপর কে যেন স্বর্ণ-সম্ভার বসাইয়া দিয়াছিল। সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে লালের কী অপূর্ব্ব সমারোহ! কেন যেন জয়ন্তীর মনটা সহসা ভারি খুসী হইয়া উঠিল। ঐ গাছটা, ওর ঐ ফুলের, পাতার ঐশ্বর্য্য, এ তো সে বহুদিন দেখিয়াছে—কিন্তু মনে কোনদিনই এমনতরো প্রসন্নতার ছোপ্ লাগে নাই। বহুরাত্রি বিছানায় শুইয়া জয়ন্তী ওই গাছটার পানে চাহিয়া দেখিয়াছে। কখনো কখনো মৃদু গুঞ্জরণে দুই একটা গানের সুরেও টান দিয়াছে হয়তো। ইচ্ছায় হউক্, অনিচ্ছায় হউক্, তাহার অবসরের আঙিনায় ঐ গোল্ড্মোহর গাছটার একট স্থায়ী স্থান ছিল।

জয়ন্তী চেয়ারটাকে আরো একটু টানিয়া জানালার সান্নিধ্যে বসিল। সে ভাবিতেছিল: মানুষের আনন্দের কি কোন ঠিকানা আছে? এই তো সেদিন কেম্ব্রিজ্ হইতে প্রকাশিত অধ্যাপক ম্যাক্ডুগাল সাহেবের একখানা বইয়ে পড়িতেছিল যে, মানুষ আত্ম-প্রবঞ্চনার ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়; যাহাকে লইয়া আজ সে আনন্দ করিতেছে, মাথায় তুলিতেছে, কোলে বসাইতেছে, হৃদয়ের নিভৃততম স্থানে রাজতক্ত দিয়াছে, কালই আবার তাহাকে পথের ধূলার সামিল করিয়া দিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করিতেছে না। কিন্তু তাই বলিয়া জীবন-যজ্ঞ তো তুচ্ছ নয়। তাই জয়ন্তী ভাবিতেছিল, সে যাহাই হউক্, আনন্দ আসিলে তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়াটা ঠিক হইবে না। যিনি এই রঙের সমারোহ ঘটাইয়াছেন তিনিই তো খুসীর খেলার মালিক। এই ভাঙা-জীবনের জীর্ণ ফাটল দিয়া যদি এক ফালি আলো বিনা নিমন্ত্রণে আসিয়াই থাকে তো সে চোখেমুখে ঝরিয়া পড়ুক্—অন্ধকারের বুকে তীর হানুক্।

চা খাইয়া লিওনিদাস্ য়্যাদ্রিফের "দি রেড্ লাফ্" বইখানা লইয়া জয়ন্তী পড়িতে বসিয়াছিল। এই চিন্তা-স্রোতের মাঝখানে সেটী যে কখন ঠাণ্ডা মেঝেটাকে আশ্রয় করিয়াছে, জয়ন্তী কিছুই টের পায় নাই।

হঠাৎ টেলিফোনের আওয়াজে চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, বেলা প্রায় ন'টা বাজে। রিসিভারটা তুলিয়া লইয়া কহিল:

হাঁা, পার্ক ৫৬১। বলুন্, হাঁ।

দুই মিনিটে কথা শেষ হইয়া গেল।

কথাটা বিশেষ কিছু নয়। তাহার য়ুনিভার্সিটীর এক সময়ের সহ-পাঠী অপূর্ব্ব বিকালে আসিতেছে।

অপূর্ব্ব জয়ন্তীদের সঙ্গে ইংরিজি ক্লাশে পড়িত। পোষ্ট্-গ্র্যাজুয়েট্ ছাত্রদের মধ্যে এই ছেলেটীই ছিল সব চাইতে লাজুক। মানুষের সঙ্গ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখাটাই যেন ওর একটা আভিজাত্য ছিল। বেশীর ভাগ ছেলে এবং মেয়ে অপূর্ব্বকে অহঙ্কারী বলিয়াই লেবেল্ বসাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু গুটীকতক শুধু অপূর্ব্বকে একটু অন্য চোখে দেখিত। ইহারা ছিল প্রায় স্তাবক-পর্য্যায়ের। জয়ন্তী এই দুই দলের কোনটাতেই পড়িত না। এ-উপলক্ষ্যে কি ও উপলক্ষ্যে অপূর্ব্বের সহিত তাহার সামান্য আলাপ পরিচয় হইয়াছে; ব্যস্ ওই পর্য্যন্তই। কিন্তু দুই দলের কোনটীকেই বিশেষ দোষ দেওয়া চলে না; কারণ অপূর্ব্বের পোষ্ট্-গ্র্যাজুয়েটে পরিচিতি ছিল এই হিসাবে যে সে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ইংরিজি অনার্সে ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হইয়া আসিয়াছে। জয়ন্তী কোন কালেই বাড়াবাড়ির পক্ষপাতী ছিল না। সেইজন্য এক শ্রেণীর হ্যাংলা মেয়ে যখন গিয়া অপূর্ব্বের গায়ে পড়িয়া, তাহার নোট্ চাহিয়া আলাপের সূত্র ফাঁদিত, তখন জয়ন্তী সদম্ভে এই মেয়েগুলির উপর কৃপা-কটাক্ষপাত করিত।

অতসী তো একদিন বলিইয়াই বসিল: "কিরে জয়ন্তী, অত দেমাক্ দেখাচ্ছিস কেন? রমেন চ্যাটার্জ্জির ওই পুরাণো নোটের চাইতে অপূর্ব্ব বাবুর সেভেনথ্ পেপারের নোট্ ঢের ভালো হয়েছে—আমি টুকে নিইছি।" সেই হইতে অতসীর সঙ্গে জয়ন্তীর সাত দিন কথা বন্ধ ছিল। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দশটা ব্যাপারের সহিত এ ব্যাপারটারও সমাপ্তি ঘটিয়াছে, যবনিকাপাত হইয়াছে!

যাহাদের কথা স্মৃতির তট হইতে একেবারে মুছিয়া গেছে বলিয়া মনে করি, তাহাদেরই মধ্যে কেহ কেহ অকস্মাৎ বিনা নিমন্ত্রণে আসিয়া হাজির হয়. হাজির হইয়া সমস্ত ওলট্-পালট্ করিয়া যাহা স্থির ছিল, তাহাকে অস্থির করিয়া তোলে; যাহা মৃত-প্রায় ছিল তাহাতে প্রাণ-সঞ্চার করে। কিন্তু ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

জয়ন্তীর সঙ্গে হঠাৎ সেদিন অপূর্ব্বের বাসে দেখা হইয়া গেল।

—এই যে মিস্ সেন, কেমন আছেন? অনেক দিন পরে দেখা!

—তারপর, আপনি দিল্লী ছেড়ে এলেন কবে? জয়ন্তী শুধাইল।

জানা গেল অপূর্ব্ব দিল্লী কলেজের চাকুরী ছাড়িয়া সম্প্রতি প্রেসীডেন্সী কলেজে একটা চাকুরী পাইয়া আসিয়াছে। এই অপ্রত্যাশিত অপূর্ব্ব-সন্দর্শনে জয়ন্তী বিরক্ত হয় নাই। অপূর্ব্বর সঙ্গে বেশী মেলামেশা না করিলেও জয়ন্তীর এই লোকটীর উপর কোন আক্রোশ ছিল না। জয়ন্তীর জীবন-দর্শনে কাহারো আনুগত্য বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার নির্দ্দেশ ছিল না—এই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকেই লোকে অহমিকা বলিয়া ভুল বুঝিত। ছাত্রীজীবনে সে অপূর্ব্বকে ঘৃণা করিয়া পরিহার করে নাই; পাছে সে নিজেকে লঘু করিয়া এই ছেলেটীর সম্মুখে উদ্ভাসিত করে ইহাই ছিল জয়ন্তীর বিষম শঙ্কা।

দেখিতে দেখিতে বাস্‌খানা হাজ্‌রা-ল্যান্সডাউন রোডের মোড়ে আসিয়া গেল।

—এইবার আমাকে উঠ্‌তে হল, অপূর্ব্ব বাবু।

—আপনাদের বাড়ী কি এই রাস্তাটার ওপরই ?

—না, একটু এগিয়ে গিয়ে ল্যান্স্‌ডাউন এক্‌স্‌টেন্‌শানের ওপর। একদিন আস্‌বেন না আমাদের ওখানে। প্লট্‌ নম্বর পি ৭৩। নমস্কার!

জয়ন্তী তড়াক্‌ করিয়া নামিয়া গেল।

যতদূর দেখা যায় ততদূর অপূর্ব্ব চাহিয়া রহিল।

পাঠ্যজীবনে শেলী-বায়রণের প্রেম-কাহিনী অপূর্ব্ব অনেক পড়িয়াছে, কিন্তু বাস্তবে সে সব লইয়া এক্সপেরিমেন্ট করা চলে, এ কথা মোটেই মনে হয় নাই। কর্ম্ম-জীবনে যে পরিমাণ পরিণয়-প্রস্তাব তাহার নিকট সরাসরিভাবে পৌঁছিয়াছে, তাহাতে তাহার আর কিছু জ্ঞান হউক্‌ আর না হউক্‌, এটুকু হইয়াছে যে সে প্রেম-পাত্র হিসাবে একেবারে অনুপযুক্ত নয়।

জয়ন্তীকে লইয়া সত্য বলিতে কি অপূর্ব্ব য়ুনিভার্সিটী জীবনে বিশেষ মাথা ঘামায় নাই। ভুলেও সনেট্‌ লেখে নাই। বরং জয়ন্তীর অন্য দুই চারিটী সহপাঠিনীর "অটোগ্রাফ্‌"-বইয়ে এমনও তাহার দুই একটা সহি-স্বাক্ষর মিলিলেও বা মিলিতে পারে। তবে এইটুকু ও জানিত যে, মেয়েদের মধ্যে কেবলমাত্র জয়ন্তীই তাহার বিদ্যাকে পরিহার করিয়া চলিয়াছে; তাহার নোট্‌ হইতে নোট্‌ নেয় নাই বা বলে নাই যে "চসারটা একটু পড়িয়ে দিন্‌ না।" এই স্বাতন্ত্র্যটুকু অপূর্ব্বের চোখ এড়ায় নাই। আজ হঠাৎ বাসের এই সাক্ষাৎকারে সে যেন কেমন একটু বিচলিত বোধ করিল। জয়ন্তী ফর্সা নয়, কালোও নয়। অপরূপ সুন্দরীও সে নয়; কিন্তু দেখিলেই আকর্ষণ করে। ভালো লাগে। বেশ-ভূষার পারিপাট্য নাই, কিন্তু যাহা পড়ে তাহাই যেন অঙ্গের আভরণ হইয়া দাঁড়ায়। চওড়া পাড় একখানি শান্তিপুরী সাড়ীতে অপূর্ব্বের চোখে আজ যেন জয়ন্তী নবজীবন লাভ করিল।

মনে হইল, এ জয়ন্তীকে বুঝি সে ইতিপূর্ব্বে আর কখনো দেখে নাই। এ জয়ন্তী যেন নব-পরিচিতা। ভাবিতে ভাবিতে অপূর্ব্বের নিজেরই হাসি পাইল—সে কি তবে দস্তুর মতো রোমান্টিক্‌ নায়ক হইয়া উঠিল! প্রেমে পড়িবার বয়সে যে প্রেমে পড়িতে পারিল না, আজ তাহার এ কি দুর্ভোগ।

—ফাঁড়ি, ফাড়ি আ—গেয়া!

বাস্‌-কন্‌ডাক্‌টারের কলরবে অপূর্ব্ব রায়ের চমক্‌ ভাঙিল।

অপূর্ব্ব একটু আগেই রুস্তমজী ষ্ট্রীটের মোড়ে নামিবে। ঐখানে নামিয়া একটু গেলেই তার বাসস্থান বালীগঞ্জ প্লেস্‌।

হ্যাঁ, এই তো পি, ৭৩ !

অপূর্ব্ব লোহার গেট্‌টা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল।

সাম্‌নে ছোট্ট একটুখানি রাস্তা। লাল সুড়্‌কি দিয়া তাহার সবটা বিছানো। দেখিলে হাজারিবাগের পথের কথা মনে করাইয়া দেয়।

এত দাম দিয়া জায়গা কিনিয়া কলিকাতা শহরে এতটা স্থান-বিলাসিতা বড় একটা দেখা যায় না। গৃহস্বামীর রুচি-পারিপাট্যের প্রতি অপূর্ব্ব রায়ের শ্রদ্ধা আসিল।

হঠাৎ সাম্‌নে চাহিয়া দেখিল স্বয়ং জয়ন্তী সেন।

—এই যে আসুন, দিল্লী গিয়ে খুব কাজের লোক হয়েছেন দেখ্‌ছি। ফোন্ করে সময় ঠিক্ করে একেবারে যথাসময়ে পৌঁছে গেছেন ! জয়ন্তী অভ্যর্থনা জানাইল।

—বেশী অপবাদ দেবেন্ না, মিস্ সেন। কলেজে বরং মাঝে মাঝে আপ্‌নিই লেট্ হয়েছেন ; আমি হইনি।

কথা বলিতে বলিতে দুইজনে গিয়া ড্রইং-রুমে বসিল। ঘরটা কতকটা লাউঞ্জ'এর ধরণে সাজানো। বড় বড় পিতলের টবে এরিকা পামই সৌন্দর্য্য সহায়ক। জয়ন্তী অবাক্ হইয়া গেল য়ুনিভার্সিটীর সেই মুখচোরা ছেলেটীর নূতন রূপ দেখিয়া। অপূর্ব্ব আর সে অপূর্ব্ব নাই !

সেদিন রাত সাড়ে আট্‌টায় যখন অপূর্ব্ব বিদায় লইল, জয়ন্তীর মনে হইল যেন মারাঠা ইতিহাসের সব-চাইতে বড় রিসার্চ্চের চাইতেও তার আজিকার এই অপূর্ব্ব আবিষ্কার বেশী মূল্যবান।

দ্বিতীয় পল্লব

জীবনটা কাহাদের পক্ষে আনন্দের এবং কাহাদের পক্ষে দুঃখের, এ কথা হলপ্ করিয়া সঠিক বলা সহজ নয়।

পাঁচবছর মাষ্টারী করিলে জন্তুবিশেষের সঙ্গে মানুষের তুলনা করা চলে, এই সত্যটা যেন অপূর্ব্ব বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিতেছিল। ক্যান্টারবারী টেল্ বা ফিলোলজি একবার চেষ্টা-চরিত্র করিয়া পড়িয়া পরীক্ষা পাশ করা চলে ; ফার্ষ্ট হওয়া যায়। কিন্তু তিনশো পঁয়ষটি দিনের বছরে প্রতিদিন ইহাদেরকে লইয়া কারবার করিতে হইলে এমন দিন আসিতে বেশী দেরী হয়না যখন নিজের মস্তিষ্কের স্থিরতা সম্বন্ধে নিজেরই সংশয় জাগে।

অপূর্ব্ব নিজের জীবনে আনন্দের অভাব বোধ করিতেছিল। মনে হইতেছিল, তাহার সবই আছে অথচ কিছুই নাই। যন্ত্রপাতিগুলো ঠিকই আছে, অথচ সুর বাহির হইতেছে না। ভাগিস্ প্রতিমাসে বিলাতী বইগুলি কিছু কিছু তাহার হাতে পৌঁছায়, নহিলে সে দিন গুজরাণ করিত কি করিয়া ?

সেইজন্য গ্রীষ্মের ছুটীর প্রথম দিনেই অপূর্ব্ব কলিকাতা ত্যাগের প্রথম-পর্ব্ব ফাঁদিয়া বসিল।

মার্কোভিচের গোটা দশেক টিন, আধ্ ডজন রুমাল ও নূতন তুইটা টাই, এই স্বল্প সওদা শেষ করিয়া ছুটির দ্বিতীয় দিনেই একখানা আসাম মেলের কামরায় উঠিয়া বসিল অপূর্ব্ব রায়। গিরিডি মধুপুরে অপূর্ব্ব'র অরুচি ধরিয়া গিয়াছিল। সেইজন্য সে এবার ধুবড়ীর প্রোগ্রাম ফাঁদিয়াছিল। সেইসঙ্গে জুটিল সেখানকার এক স্থানীয় বন্ধুর নিমন্ত্রণ। সুতরাং সবদিক্ দিয়াই সুযোগ ঘটিয়া গিয়াছিল চমৎকার। সন্ধ্যা ছয়টায় অপূর্ব্ব এই নতুন জায়গায় নামিল।

আধো-আলো, আধো-অন্ধকারে স্তিমিত আলোকে অপূর্ব্ব আসামের এই অপূর্ব্ব শহরটীর সহিত মিতালি পাতাইল। সে ইহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইল। আসাম প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র ঃ ধুবড়ী বুঝিবা আকাশের ঐশ্বর্য্যকেও হার মানায় এমনই ইহার সৌন্দর্য্য-সম্ভার। অপূর্ব্বর সমস্ত সত্ত্বা যেন ধুবড়ীকে আঁকড়াইয়া ধরিল।

* * * *

জোৎস্না চারিদিকে যুঁইফুলের মতন অঝোরে ঝরিয়া পড়িতেছিল। মনে হইতেছিল, এমন ধরনী ছাড়িয়া মানুষের স্বর্গ-লোকে যাইবার সখ কেন যে জাগে।

ব্রহ্মপুত্রের পাহাড়গুলি নদীর ওপারে একটা আর একটার গা জড়াইয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

নদীর জলের উপর চাঁদের আলো ঝিকিমিকি করিতেছে।

অপূর্ব্ব সবান্ধব ব্রহ্মপুত্রের বালুচর বাহিয়া হাঁটিতেছিল। হঠাৎ সামনে তুইটি নারীমূর্ত্তি দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

— আপ্‌নি এখানে, মিস্ সেন ?

তুইটির মধ্যে একটি জয়ন্তী সেন।

—আপ্‌নি চমৎকার লোক অপূর্ব্ববাবু! ছুটীতে আপ্‌নি ধুবড়ী যাচ্ছেন, কই এ কথাটা তো আমাকে একবারও বলেন নি ?

অপূর্ব্ব স্মিত হাসিল।

—সে অপরাধে আপ্‌নিও তো অপরাধী, মিস্ সেন !

—যা বলেছেন। এখন বলুন্ তো আপ্‌নি কোথায় উঠেচেন ?

অপূর্ব্বর এইবার মনে হইল যে তাহাদের তুইজন ছাড়াও অপর তুইজন সেখানে উপস্থিত আছেন।

—বন্ধু-গৃহে। এই ইনি হচ্ছেন আমার এককালের সহপাঠী সুকুমার সরকার, ধুবড়ীর সহকারী সরকারী উকিল।

অপূর্ব্ব বন্ধুর সহিত জয়ন্তীর পরিচয় করাইয়া দিল। এটুকুনও জানিল যে জয়ন্তীর মামা

এখানকার সিভিল সার্জ্জন কর্ণেল গুপ্ত এবং জয়ন্তী মামীমাকে গাইড্ করিয়াই বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল।

সে রাত্রির উপাখ্যান সেইখানেই শেষ।

তৃতীয় পল্লব

নিঃসঙ্গ জীবনের একটা দারিদ্র্য আছে!

কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে ধুবড়ীতে অপূর্ব্বকে পাইয়া জয়ন্তী যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। মামীমার আদর-আপ্যায়নে জয়ন্তী প্রায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল।

সেদিন ডি. সি.'র বাঙ্লোর সামনের বেঞ্চটাতে জয়ন্তী বসিয়াছিল। পায়ের নীচ দিয়ে খর-স্রোতা নদী বহিয়া চলিয়াছে। মনে হইতেছিল এ চলার বুঝি আর শেষ নাই। মানুষও তো ছুটিয়া চলিয়াছে: কিসের পিছনে সব সময় সে কি তাহা ঠাওরাইয়া উঠিতে পারে! অথচ ছোটার তো বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই।

—আপ্নার ধ্যানভঙ্গ কর্তে পারি, মিস্ সেন?

অপূর্ব্ব মৃদুহাস্যে শুধাইল।

—এই যে অপূর্ব্ববাবু, আসুন! How I like this spot!

অপূর্ব্ব বসিল। কিন্তু একটা কথা তাহার মনে জাগিতেছিল; এই মেয়েটীর জীবনে তো সে কখনো উচ্ছ্বাসের ছোঁয়াচ্ পায় নাই। সবই বলে, সবই করে, কিন্তু সবটাই যেন রহস্যাবৃত!

বাঙালীর মেয়েদের সম্বন্ধে এতকাল অপূর্ব্ব রায়ের একটা অভিমত ছিল; তাহারা সত্য সত্যই স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে এবং সন্তানের জননী হইতে কখনো অরুচি প্রকাশ করে না।

জয়ন্তীর সহিত যতই তাহার ঘনিষ্ঠতা হইতেছে, ততই যেন এই মেয়েটীকে জানিবার পক্ষে তাহার বাধা জন্মিতেছে। অথচ ইহাকে বা ইহার সঙ্গকে তো কাম্য বলিয়াই তাহার বরাবর মনে হইয়াছে।

—দেশের জন্য কখনো ভেবেছেন অপূর্ব্ববাবু?

জয়ন্তী প্রশ্ন করিল।

অপূর্ব্ব চট্ করিয়া কথাটা ধরিতে পারিল না।

—আপ্নার প্রশ্নটা ঠিক বুঝে উঠ্তে পারলুম না, মিস্ সেন?

এইবার জয়ন্তী হাসিল।

—বল্ছিলুম কি, একথা আপ্নার কখনো মনে হয়েছে যে আপ্নার দেশ আপ্নার কাছ থেকে কিছু আশা করতে পারে?

সিগারেট্‌টায় অগ্নি-সংযোগ করিয়া অপূর্ব্ব বলিল ঃ

—মিস্ সেন, হাস্‌বেন না, দেশ বল্‌তে বুঝি আমার মেস্ বা ভাড়াটে বাসা ; আরো খানিকটা এগুলে আমার ভৃত্য রামটহলকে। যদি তারও বেশী যান্ তো আমার লাইব্রেরীটাকে।

—বেশীর ভাগ লোকই তাই। আমার দুঃখটা কোথায় জানেন ? সেটা হচ্ছে এই যে, যারা আমাদের মনুষ্যত্বটাকে নিলেমে চড়িয়েছে তাদেরই গোটাকত বুলি কপ্‌চে আমরা আত্মশ্লাঘা অনুভব করি।

—কিন্তু মিস্ সেন, নিজের ঘাড়ে সে দুঃখটাকে চাপানোর চাইতে মাটী চাপা দেওয়াটাই কি ভালো নয় ?

—সেটা কাপুরুষের কাজ। মানুষের কাচ হওয়া প্রয়োজন—উপকারেও লাগ্‌বে আবার দরকার হলে তরতর্ করে কেটেও যাবে। জীবনের ঐশ্বর্য্য বিসর্জ্জনে ; ভালোভাবে মরতে পাওয়া পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাক্‌বার চাইতে ঢের ভালো।

সেদিন নদী-তীর হইতে ফিরিয়া আসিয়া অপূর্ব্বের মনে হইল যেন গোটাকত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তাহার মনে বিঁধিয়া গেছে। কিন্তু এপথে যে কাঁটা অনেক জয়ন্তী কি তাহা জানে না অপূর্ব্ব নিজেকেই শুধাইল।

* * * * *

সেদিন দুপুর বেলার আহারের পর অপূর্ব্ব বিছানায় গা এলাইয়া দিয়া সেল্‌মা লাঁগারলফের একখানা বইয়ের পাতার উপর চোখ বুলাইতেছিল। চোখে সবে একটু ঘুমের আমেজ লাগিয়া আসিয়াছে। হঠাৎ বেয়ারাটা একটা কার্ড আনিয়া হাজির করিল। সাদা কার্ডে বাঙলা হরফে ছোট্ট একটুখানি নাম-পরিচায়িকা ঃ জয়ন্তী সেন। অপূর্ব্ব না উঠিয়াই হুকুম করিল ঃ সেলাম দেও। হিঁয়াই লানা।

মুখে একগাল হাসি লইয়া সমস্ত ঘরটায় একটা খুশীর ছোপ্ লাগাইয়া জয়ন্তী ঘরে ঢুকিল।

—আপ্‌নি এমন সময়ে মিস্ সেন ? অপূর্ব্ব শুধাইল।

আবার এক ঝলক্ হাসি। বাসন্তী রঙের একটা সাড়ীতে আজ জয়ন্তীকে অপরূপ দেখাইতেছিল ঃ আজ যেন খুসির চাপল্যে সে খুকী বনিয়া গেছে। এ জয়ন্তী যেন সুগম্ভীরা মহিলা জয়ন্তী নয় ; এ জয়ন্তী যেন তাহার বয়সের মাপকাঠিটাকে সজোরে পথের ধূলায় নিক্ষেপ করিয়া আবার কিশোরীর আবরণে নিজেকে গৌরবিনী করিয়া তুলিয়াছে। একদৃষ্টে অপূর্ব্ব জয়ন্তীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। আজ এই মেয়েটির ভিতর অপূর্ব্ব এত রূপ, এত জৌলুষ, এত মোহ, এত ঐশ্বর্য্য আবিষ্কার করিল যে সে এই সৌন্দর্য্য-যমুনায় নিজেকে ডুবাইয়া দিতে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উঠিল।

ভালো-মন্দ, বিবেচনা-বিবেক সব যেন এক মুহূর্ত্তে তালগোল পাকাইয়া গেল। মুহূর্ত্তে অপূর্ব্ব এক সত্য জানে : সেটী এই যে তার জীবনের যাত্রা-পথে এই মেয়েটীর সঙ্গ অপরিহার্য্য।

—অসময়ে এসে বড় অপরাধ করে ফেলেছি, কেমন ?

কল্‌কল্‌ করিয়া আবার এক হাসির হল্কা বহাইয়া দিয়া জয়ন্তী সোজা গিয়া অপূর্ব্ব'র মাথার কাছে বসিয়া অসঙ্কোচে তাহার চুলগুলির ভিতর হাত বুলাইয়া দিতে সুরু করিল। মা যেমন সস্নেহে সন্তানের মাথায় স্নেহ-স্পর্শ ঢালিয়া দেন, অপূর্ব্বর মনে হইল এ যেন তাই। জয়ন্তী যেন তাহার জননী। কিন্তু এ তাহার ভালো লাগিল না।

আবার অপূর্ব্ব জয়ন্তীর দিকে চাহিল। এ যেন বিজয়িনীর বেশ।

অপূর্ব্ব বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারিল না। কেমন যেন একটা আলস্য সর্ব্বদেহে ছড়াইয়া গেছে।

সে সোজা জয়ন্তীর হাতটা চাপিয়া ধরিল। মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া গেল :

—তুমি এখন বাড়ী যাও, জয়ন্তী।

—কেন ? যদি না যাই ?

অপূর্ব্ব এই প্রথম জয়ন্তীকে 'তুমি' সম্বোধন করিয়া বসিয়াছে। করিয়াই যেন সে লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল। ছি! ছি!! আজ সে একি করিয়া বসিল! নিজের দুর্ব্বলতাকে কি এমন বেহায়ার বেশে জাহির করিতে হয়! কোথায় গেল আজ তাহার বিবেচনার আভরণ! জয়ন্তীর চোখে যেন অপূর্ব্বর মনের কথাগুলি চেহারা লইয়া জাগিয়া উঠিল।

—আমার নামটা কি এতই বিচ্ছিরি যে একটী বারও তুমি আমায় নাম ধরে ডাক্‌তে পার না ?

হয়তো পারি জয়ন্তী, হয়তো ভালই পারি। কিন্তু সে অধিকার কি আমার আছে ?

জয়ন্তীকে অপূর্ব্ব কোলের কাছে টানিয়া লইল।

জয়ন্তীর আজ মনে হইতেছিল যেন এই আশ্রয় পাইলে তাহার সব-কিছু পাওয়া হয়। এতদিনে বুঝিবা সে বুঝিল একজন না থাকিলে সে কত অসহায়! কিন্তু, আজ নিজের সুখ চাহিতে গেলে যে তাহার আদর্শকে বিসর্জ্জন দিতে হয়—যাহাদের জন্য সে নিজেকে এতকাল নিয়োজিত করিয়া আসিয়াছে তাহাদের পরিত্যাগ করিতে হয়। জয়ন্তীর চোখ বাহিয়া জল উপ্‌চাইয়া পড়িতে লাগিল।

ওগো ছাড়, এতসুখ তো আমার সইবে না!

অপূর্ব্ব জয়ন্তীকে ছাড়িয়া দিল।

এতক্ষণে সে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়াছিল।

রুমাল দিয়া জয়ন্তীর চোখ মুছাইয়া দিয়া কহিল : ছিঃ! এতও ছেলেমানুষী করে ?

কিন্তু অপূর্ব্ব তখনও বুঝিতে পারে নাই কোন্ জায়গাটায় জয়ন্তীর বিঁধিতেছে। বুঝিল পরে!

* * * * * *

মানুষ যখন নানাভাবে ঘর ফাঁদিয়া বসিবার চেষ্টা করে; আপনার মনে ভবিষ্য সুখের কল্পনার জাল বুনিয়া চলে, বিধাতা-পুরুষ অলক্ষ্যে তখন হয়তো হাসেন।

অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিতেছিল: ছোট্ট একখানি সুন্দর বাড়ী।

সে গৃহের গৃহিণী জয়ন্তী: গৃহস্বামী সে স্বয়ং। দুই একটি কচি মুখও যে মনের মুকুরে উঁকি ঝুঁকি না মারিতেছিল তা নয়।

এমনি করিয়াই মানুষ যুগে যুগে খুশীর খেলা-ঘর সাজায়। তারপর এক ঝড়ে তাসের বাড়ী ধূলিসাৎ হয়—সে নিজেকে নিঃস্ব করিয়া, রিক্ত করিয়া চোখের নোনাজলে জীবন-দেবতার নৈবেদ্য রচনা করে।

* * * * * *

অপূর্ব্বের চায়ের কাপটা নিঃশেষ হয় নাই।

বন্দীশিবির হইতে লেখা জয়ন্তীর চিঠির কয়েকটী লাইন হইতে সে চোখ সরাইতে পারিতেছিল না।

.... তোমাকে নিয়ে ঘর সাজাবার সাধ এসেছিল। কিন্তু তাতে জীবন-যজ্ঞের আরাধনা অপূর্ণ থেকে যেত। আমি স্বার্থপর বিবেচিত হতাম। দেশকে ভালোবাসার অপরাধে আমি অপরাধী। তার পুরস্কারও পেয়েছি। এতে দুঃখ নেই। তোমাকে সাধারণ মানুষ হিসেবে পেলে হয়তো ঠিক মর্য্যাদা দিতে পারতুম কিনা সন্দেহ; সেইজন্যে দুষ্প্রাপ্য হিসেবে তুমি আমার মনের কোণে দেবতা হয়ে রইলে। যদি সেদিন আসে তো আবার দেবতার পায়ে মাথা ছুঁয়ে মনে যে প্রচ্ছন্ন লোভটা আছে সেটা মেটাব। কিন্তু সেদিন কি সত্যিই আসবে?....

অপূর্ব্বের দুইচোখে দুইফোঁটা জল টলমল্ করিয়া উঠিল।

কবে জয়ন্তী কলিকাতায় গেল, কবে সে বন্দীশিবিরে স্থানান্তরিত হইল, কিছুই তো জানেনা! তবে এটুকু আজ সে বুঝিল, চোখের জলে জানিল যে, তাহার কল্পনার কাঁচটী ভাঙিয়া খান্ খান্ হইয়া গেছে। আকাশে একটী দু'টি করিয়া তারা উঠিতেছিল।

উহাদের একটির চোখে যেন জয়ন্তীর চাউনি দেখিল অপূর্ব্ব।

স্তুপীকৃত চোখের জলের দাম হয়তো একদিন বিধাতা-পুরুষ চাহিয়া বসিবেন। তখন?

অপূর্ব্ব হাসিল!

বিনয় ঘোষ

এতদিন পরে ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি কর্ত্তৃক সমর্থিত ও অনুসৃত "নিরপেক্ষতা-নীতির" অর্থ দিবালোকের মত বিশ্ববাসীর সম্মুখে পরিষ্কার হ'য়ে গেল। আমরা বুঝলাম যে, স্পেনে অন্তর্বিপ্লব সুরু হবার পরেই গ্রেট্ বৃটেনের প্ররোচনায় যে নিরপেক্ষ নীতি সকলে সাদরে গ্রহণ করেছিল, তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বিদ্রোহী ফ্রাঙ্কোকে যে-কোন উপায়ে হোক্ স্পেনের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে' প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাশিস্ত গবর্ণমেণ্ট কায়েম করার জন্য পথ পরিষ্কার করে' দেওয়া। আজ গ্রেট্ বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলির স্ত্রৈণতা ও ক্লীবত্ব সম্বন্ধে কারও সন্দেহ নেই। আজ বৃটিশ বৈদেশিক নীতির মূলমন্ত্র যে শান্তিবাদ নয়, সুবিধাবাদ, এ-কথা সকলেই হলপ্ করে' বলবেন, কারণ ডাঃ গোয়েবেল্‌সের কথায় এর বিপরীত যা'তা' বৃটিশের আদৌ কাম্য নয়। ডাঃ গোয়েবেল্‌স্ ১৯৩৬ সালের ১৯শে আগষ্ট তারিখে বলেছিলেন: স্পেনীয় অন্তর্বিপ্লবে বৃটিশের মাত্র দুটি উপায় আছে। হয় সংক্রামক কম্যুনিষ্ট স্পেনকে সম্বর্দ্ধনা করতে হবে ফ্রান্সকে ব্যাধিগ্রস্ত করার দায়িত্বে, আর না হয় স্পেনকে একটা ন্যাশনালিষ্ট উপদ্বীপ করে' ইতালীর প্রতি সৌজন্য প্রকাশের জন্য জিব্রলটরের আধিপত্য বিসর্জ্জন দিয়ে বালারিক দ্বীপপুঞ্জের ভিতর দিয়ে গ্রেট্ বৃটেন ও ফ্রান্সের বাণিজ্য পথের অসুবিধাকে স্বীকার করে নিতে হবে। নিরপেক্ষ কমিটি সম্বন্ধে 'পোপোলো ডি রোমা' ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে লিখেছিল: এই

লর্ড হ্যালিফ্যাক্স

কমিটি কিছুই করবে না এবং কিছু-না-করার যে রাজনৈতিক আভিজাত্য, তাই হবে এর প্রধান উদ্দেশ্য। ইত্যবসরে ইউরোপ অস্ত্রসজ্জার যথেষ্ট অবসর পাবে এবং স্প্যানিয়ার্ডরা পরস্পরকে প্রাণ ভরে হত্যা করার সুযোগ পাবে এবং যদি নিরপেক্ষ কমিটির উদ্দেশ্য এই হয় তা হ'লে তার সাফল্যের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এককথায় নিরপেক্ষ নীতির অর্থ হ'চ্ছে ফ্রাঙ্কো, তথা ফ্যাশিস্ত জার্মানি ও ইতালীর পক্ষপাতিত্ব ও সর্ব্বোপায়ে সহযোগিতা করা এবং গণতন্ত্রী স্পেনের অর্থাৎ ইউরোপীয় গণতন্ত্রের বিরোধিতা করা।

আমরা খবর পেয়েছি বার্সিলোনা ফ্যাশিস্তদের করতলগত হ'লেও স্পেনের গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট ভ্যালেন্সিয়ায় স্থানান্তরিত হ'য়েছে এবং সেনর নেগ্রিন ঘোষণা করেছেন যে ক্যাটালোনিয়া পতনের পর আজও স্পেন সম্পূর্ণ ফ্রাঙ্কোর অধীনস্থ হয় নি। মধ্য স্পেনে আজও গণতন্ত্রীদের আধিপত্য নিরঙ্কুশ রয়েছে এবং স্পেনের সর্ব্বশেষ গণতন্ত্রকামী অধিবাসী জীবিত থাকা পর্য্যন্ত ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীল ইউরোপীয় ফ্যাশিজম্-এর বিরুদ্ধে যে অভিযান তা' অপ্রতিহত গতিতে চলবে। আজও মাদ্রিদের নির্ভীক বীর মিয়াজা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করছেন যে গণতন্ত্রী স্পেনের নিরাশ হবার কিছু নেই, ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার যথেষ্ট শক্তি আজও তার আছে। মিয়াজা গণতন্ত্রীবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এই অবস্থায় স্পেনে ফ্রাঙ্কো-গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করে' নেওয়া রাজনৈতিক যুক্তিসঙ্গত নয়। অথচ চেম্বারলেন সাহেব ২৭শে ফেব্রুয়ারী স্পেনে ফ্রাঙ্কোর গবর্ণমেণ্টকে সরকারীভাবে স্বীকার করে' নিয়েছেন এবং দালাদিয়েও সঙ্গে সঙ্গে চেম্বারলেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। চেম্বারলেনের রাজনীতিক যুক্তিতে ফ্রাঙ্কো কর্ত্তৃক ক্যাটালোনিয়া অধিকৃত হওয়ায় ইউরোপের শান্তি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বুকের উপর দিয়ে ফ্যাশিস্তদের বিস্তার ও বিস্ফোরণ-নীতির যে রথ আজ ধাবমান তার চক্রোৎক্ষিপ্ত জনার্ত্ত-নাদে চেম্বারলেন-হ্যালিফাক্স্ এবং তাঁর সাকরেদ-গোষ্ঠী দালাদিয়ে-বোনের মতানুসারে আশঙ্কার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই, অন্যায় বা অবিচারের ও কোন লক্ষণ নেই, বরং তাতে ইউরোপের মঙ্গলই সূচিত হ'চ্ছে। বৃটিশ জাহাজ 'ডেভন্‌শায়ারে' চড়ে' ফ্রাঙ্কোর সৈন্যরা মিনর্কার

নেভিল চেম্বারলেন।

পোর্ট ম্যাহনে গমন করে' যে মিনর্কা দখল করেছে, তার পিছনে বৃটিশের যে নীতি সে নীতি সহানুভূতির নীতি, কারণ মিনর্কাকে ফ্রাঙ্কোর হাতে সমর্পণ করে' বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্পেনের জাতীয়তাবাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন এবং ইতালীকে সেখানে হস্তক্ষেপ করার পরিকল্পনা

থেকে নিবৃত্ত করেছেন। ফ্রাঙ্কোকে এই মিনর্কা উপঢৌকন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী কোন আকস্মিক অনুপ্রেরণার বশে দেয় নি। এই হ'চ্ছে নিরপেক্ষ নীতির নিরাভরণ রূপ।

আজ এই নিরপেক্ষ নীতির নিরাভরণতার জন্য বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীকে ক্রুদ্ধ বিক্ষুব্ধ জনমতের সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছে। কমন্স সভায় বিরুদ্ধবাদী দলের নেতা আট্‌লির কোন প্রশ্নেরই তিনি সদুত্তর দিতে পারেন নি, উপরন্তু ডিক্টেটরী চালে শাসিয়েছেন যে বৈদেশিক নীতি পরিচালনার ভার তাঁর ও লর্ড হ্যালিফাক্সের উপর, সুতরাং উপযুক্ত সময় ভিন্ন যখন তখন যে-কোন প্রশ্নের জবাব দিতে তিনি রাজী নন। এ জবাব গণতন্ত্রী দেশের প্রধান মন্ত্রীর কাছ থেকে প্রত্যাশিত নয় এবং এই প্রকার গর্ব্বোদ্ধত উত্তরের প্রত্যুত্তর বৃটিশ জনসাধারণ শীঘ্র দেবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। কমন্স সভায় একজন লেবর সভ্য বলেছেন চেম্বারলেনকে উদ্দেশ্য করে : বৃটেনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য উন্মুক্ত আদালতে আপনি বিচার্য্য। লেবর সভ্যের এই তীব্র মন্তব্য থেকে বৃটিশ গণমতের উত্তাপ কত ডিগ্রী পর্য্যন্ত চড়েছে বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়। ক্ষিপ্ত জনসাধারণ ডাউনিং স্ট্রীটে চেম্বারলেনের সশস্ত্রপ্রহরী-বেষ্টিত প্রাসাদ পর্য্যন্ত ধাওয়া করছিল, কিন্তু আট্‌লি ও অন্যান্য বিরুদ্ধবাদীদলের নেতাদের অনুরোধে তারা শান্ত হয়েছিল। কিন্তু অশান্ত জনসাধারণকে দাবিয়ে রাখা এত সহজ নয়, তাই চেম্বারলেন সাহেবের প্রাসাদ গেটের সম্মুখে জনতার সহিত পুলিশের ধর্ষণ ঘর্ষণ হওয়ার যে খবর আমরা পেয়েছি, তা নগণ্য বলে উড়িয়ে দিতে পারিনা। এতে আমরা অবশ্য একটুও আশ্চর্য্য হইনি, এমন কি কমন্স সভায় লেবর সভ্য চেম্বারলেন সাহেবের যে ইম্পিচ্‌মেন্টের কথা বলেছেন তা ইংলণ্ডের ন্যাশানাল গভর্ণমেন্টের প্রত্যেকটি বিশ্বাসঘাতক রাজনৈতিক ধুরন্ধরের সম্বন্ধে প্রয়োগ করলেও আমরা খুবই স্বাভাবিক বলে মনে করতাম।

চেম্বারলেন সাহেবের রাজনৈতিক যুক্তি অনুযায়ী তাঁর নেতৃত্বে লর্ড হ্যালিফাক্স কর্ত্তৃক পরিচালিত যে বৃটিশ বৈদেশিক নীতি তার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ইউরোপে শান্তি স্থাপন করা। চেম্বারলেন সাহেবের অভিধানে শান্তির যে নূতন সংজ্ঞা আমরা পেয়েছি তা হ'ল "Peace through strength," অর্থাৎ শক্তির ভিতর দিয়ে শান্তি। শান্তির এই সংজ্ঞা এর পূর্ব্বে আমরা ফ্যাশিস্ত অভিধানে পেয়েছি। এই সংজ্ঞা দিয়ে চেম্বারলেন সাহেব তাঁর নূতন ৫৮ কোটী পাউণ্ডের সমর বিল সমর্থন করেছেন। এই সুবৃহৎ সমরায়োজন সার্থক করতে হ'লে যে কর বৃদ্ধি হবে, আমরা জানি তার সম্পূর্ণ ভার পড়বে শ্রমিক শ্রেণীর উপর। চেম্বারলেনের বৈদেশিক নীতির যে খয়রাতী ধর্ম্ম ও ফ্যাশিস্ত মনস্তুষ্টি সাধনের উদ্দেশ্য, তার যে যৌক্তিক পরিণতি এই হবে তা পূর্ব্বনির্দ্ধারিত।

কিন্তু শান্তিকামী চেম্বারলেন বৈদেশিকনীতির পরগাছা নিরপেক্ষনীতির খতিয়ান করে আমরা কি পাই? এই নিরপেক্ষনীতির জন্যই তিনি নিঅ চুক্তির কথা ভুলে গিয়ে বৃটিশ জাহাজ, বৃটিশ নাবিক ও বৃটিশ সৈন্যদের সমুদ্রপথে ইতালীয় বিমানপোত হ'তে নিক্ষিপ্ত ইতালীয় বোমার মুখে উৎসর্গ করলেন। ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তির মর্য্যাদা মুসোলিনী এইভাবে বজায় রাখলেন এবং চেম্বারলেন সাহেব তার যে পুরস্কার পেলেন তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করলেন না। কারণ তাঁর

নীতির মূলমন্ত্র হ'চ্ছে নিরপেক্ষতা এবং এই নিরপেক্ষতার উপর ইউরোপের রাজনৈতিক শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। তাঁর ডেভনশায়ার পদ্ধতির ব্যাখ্যা ঐ একই। তারপর তিনি যে স্পেনের গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট পরাজয় স্বীকার ক'রে নেবার পূর্ব্বেই সরকারীভাবে নিজে স্পেনে ফ্রাঙ্কো-গবর্ণমেণ্ট স্বীকার ক'রে নিলেন ও সুহৃদ্বর দালাদিয়েকে নিতে বাধ্য করলেন, তাও ঐ একই শান্তিস্থাপনের মহৎ উদ্দেশ্যে আত্মবিহ্বল হ'য়ে। অকারণে স্পেনের জনগণের এই দুঃখ তাঁর সহিষ্ণুতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে, সুতরাং একটা রফা ও মিটমাটের যে আবশ্যকতা আছে তা তিনি অনুভব করেন। আবশ্যকতার পরিসমাপ্তি ফ্রাঙ্কোর মিতালিতে হ'ল, কেন? হ'ল, তার প্রথম কারণ ইঙ্গ-জার্ম্মাণ ও ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তির মর্য্যাদা তিনি অক্ষুণ্ণ রাখলেন এবং ফ্রান্সেরও পরম বন্ধুত্বের কাজ করলেন। স্পেনে জার্ম্মানি ও ইতালীর আধিপত্য অটুট রইল, আর ফ্রান্স উপকৃত হ'ল এই হিসাবে যে কম্যুনিষ্ঠ স্পেনের সংক্রামণের হাত থেকে সে নিষ্কৃতি পেলে। কিন্তু এই চেম্বারলেনীয় শান্তি অচিরেই নূতন রূপ ধারণ করবে, সে সম্বন্ধে কিছু পরিচয় থাকা প্রয়োজন।

আমরা জানি, ইতিমধ্যে পিরেনীয় সীমান্তে ইতালী ও জার্ম্মানির সৈন্য চলাচল সুরু হয়েছে এবং হিট্‌লার ফ্রান্সের উপর তাঁর বহুদিনের আক্রোশ পরিতৃপ্তির জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। ফ্রান্স আজ ফ্যাশিস্ত শক্তির দ্বারা চতুর্দ্দিক থেকে অবরুদ্ধ। ভূমধ্যসাগরকে মুসোলিনীর বহুবাঞ্ছিত ইতালীয় হ্রদে পরিণত করবে যে পরিকল্পনা তাও বাস্তবে রূপান্তরিত হবে। জিব্রলটর ও মল্টা বিপন্ন হবে এবং ডোডোকনেস্ ও বালরিক দ্বীপপুঞ্জ হিট্‌লার মুসোলিনির করায়ত্তে আসার ফলে গ্রেট্ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের আফ্রিকার সঙ্গে বাণিজ্য যোগাযোগ ছিন্ন হবে। ইতালী ফ্রান্সের দিকে রক্তচক্ষু কপালে তুলে তর্জ্জনী শাসিয়ে নিস্, জাবুতি, সোমালিল্যাণ্ড, কর্সিকা, টানিস্ প্রভৃতির উপর তার "ন্যায্য" দাবী এইবার পেশ ক'রে ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তির প্রতি ফ্যাশিস্ত-রীতিতে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। লিবিয়াতে মুসোলিনীর সৈন্য চালানের সংবাদ আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি। হিট্‌লার এখন তাঁর এ্যাক্সিস্-অংশীদারকে সাহায্য করবেন এবং নিজে বৃটিশের বিপন্ন অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাঁর উপনিবেশ পুনরুদ্ধারের দিকে মনোযোগ দেবেন। ইউরোপীয় রাজনীতিতে চেম্বারলেন যে বিষ উদ্গীরণ করেছেন, সেই বিষ তাঁকেই গলাধঃকরণ করতে হবে। কারণ ফ্রান্সকে কেন্দ্র ক'রে এইবার শেষ সোরগোল উঠবে। ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশে এবং ফ্রান্সে ফ্যাশিস্ত আক্রমণের বিপদ ঘনিয়ে উঠলে চেম্বারলেনের আর দ্বিতীয় পথ থাকবে না ফ্রান্সের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ভিন্ন। গণতান্ত্রিক স্পেনের বলিদানের পর ইউরোপের রাষ্ট্রনীতিক সংঘর্ষের ফলে যে সমরাগ্নি এতদিন যাবৎ ধূমোদ্গীরণ করছে, তা এইভাবেই প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে।

এই সমরাগ্নি নির্ব্বাপিত করার এখনও হয়ত উপায় ছিল, কিন্তু সে-উপায় সফল হবার কোন আশু সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয় না। বৃটিশ লেবর পার্টির নেতৃবৃন্দ যদি পার্ল্যামেণ্টারী মনোভাব পরিহার ক'রে, সমস্ত রাজনীতিক সংস্কার মুক্ত হ'য়ে, ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌এর কার্য্যসূচী

পালন করতেন এবং প্রতিক্রিয়াশীল বৃটিশ ন্যাশানাল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমস্ত ফ্যাশিস্ত-বিরোধী গণতন্ত্রকামী পার্টির সহযোগিতায় একত্রীভূত দলসমষ্টি গঠনে সম্মত হ'তেন, তা হ'লে ন্যাশানাল গবর্ণমেণ্টের পরিচালক-গোষ্ঠীর পররাষ্ট্রনীতির পরিণাম আর যাই হোক, এত জঘন্যভাবে শোচনীয় ও নিন্দনীয় হ'ত না। কিন্তু তা হয় নি, ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌এর 'ইউনাইটেড্ ফ্রণ্টের' প্রস্তাব ও আন্দোলনের জন্য লেবর পার্টি তাঁকে পার্টির নীতিদ্রোহিতার অজুহাতে দল থেকে বিতাড়িত করেছেন। লেবর পার্টির নেতৃবর্গ মনে করেছেন যে পার্লামেণ্টে চেম্বারলেনের উপর তীব্র ভাষা নিক্ষেপ করলেই যথেষ্ট কাজ করা হ'ল। কিন্তু কাজ হলঘরে নয়, বাইরে জনসাধারণের মাঝখানে। এবং সেখানে গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁরা কম্যুনিষ্টদের পিছনে ফেউ লেগে আছেন এবং যে হেতু মস্কো থেকে এই দলসমষ্টি গঠনের নীতি নির্দ্দিষ্ট হয়েছে সেইজন্য তাঁদের যুক্তিতে সে-নীতি সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। আজ বৃটিশ লেবর-পার্টি এইভাবে পরোক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল চেম্বারলেন-গোষ্ঠীর মত বৃটিশ জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। ফ্রান্সের রেডিক্যাল পার্টি আজও দালাদিয়ের উপর ব্যক্তিগত সহানুভূতি বর্জ্জন করতে পারে নি, ফলে কম্যুনিষ্ট্ ও সোশ্যালিষ্টদের আন্তরিক সহযোগিতা থাকা সত্ত্বেও দালাদিয়ে বার বার পার্লামেণ্টে সংখ্যাধিক্যে জয়ী হ'চ্ছেন। রেডিক্যাল পার্টির উচিত দালাদিয়ের প্রতি সহানুভূতি বিসর্জ্জন দিয়ে কম্যুনিষ্ট্ ও সোশ্যালিষ্টদের সহিত সহযোগিতা ক'রে ফ্রান্সের মৃত 'পপুলার ফ্রণ্ট' গবর্ণমেণ্টকে পুনরুজ্জীবিত করা। এইভাবে 'পপুলার ফ্রণ্ট' গবর্ণমেণ্ট পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ'লে ফ্রান্সের এই নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার ও স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তার অভাবের জন্য হিংস্র ফ্যাশিস্তদের কাজে নিজেকে বিপন্ন হ'তে হ'ত না। কিন্তু আজ স্পেনকে ফ্রাঙ্কোর হাতে সমর্পণ করার পর ইউরোপের রাজনৈতিক স্রোত যে দিকে প্রবাহিত হ'চ্ছে সেখান থেকে তাকে ভিন্নমুখী করা সহজসাধ্য নয়। যদি ইউরোপের দু'টি বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয়, প্রগতিপন্থী দলগুলি পারস্পরিক বিরোধিতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে, বৃহৎ গণতান্ত্রিক ঐক্যের জন্য তৎপর না হয়, তা হ'লে ইউরোপে ঘন ঘন যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্জলিত হ'চ্ছে শীঘ্রই তা প্রচণ্ড দাবানলের সৃষ্টি করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এই সাম্রাজ্যবাদী সমরানল সমগ্র পৃথিবীব্যাপী প্রসারিত হবে, কারণ সুদূর প্রাচ্যে চীন-জাপান সংঘর্ষের ফলে ক্রমে ক্রমে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হ'চ্ছে তাতে আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক শৃঙ্খলাভঙ্গের সম্ভাবনা খুব বেশী। প্রকৃতপক্ষে সুদূর প্রাচ্যে বর্ত্তমানে যে যুদ্ধ চলেছে তা ঠিক চীনের বিরুদ্ধে নয়, পাশ্চাত্য শক্তিগুলির বিরুদ্ধে। অবশ্য পুনরায় চীনের উপর জাপানী সাম্রাজ্যবাদী ব্যভিচার আরম্ভ হ'য়েছে। চীনের ঘন বসতির উপর জাপানী বোমাবর্ষণের জন্য চীনসরকার চুংকিং সহরের চার আনা বসতি ভেঙে দেবার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। সাংহাইয়ের আন্তর্জ্জাতিক এলাকা ও ফরাসী এলাকায় সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য মিঃ ইতাগাকি জাপ পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেছেন যে, জাপান ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। এদিকে হাইনান দ্বীপ জাপানীদের দ্বারা অধিকৃত হওয়ার ফলে হংকং, ম্যানিলা, ও সিঙ্গাপুর জাপানী বোমার এলাকার মধ্যে এসেছে।

ফরাসী ইন্দো-চীনের নিরাপত্তার জন্য এই হাইনান্ দ্বীপের প্রাধান্য এত বেশী যে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে চীন ফ্রান্সের নিকট সম্মত হয়েছিল কোন তৃতীয় শক্তিকে এই দ্বীপ অধিকার করতে না দিতে। গত বৎসর বৃটেন জাপানকে যথেষ্ট সতর্ক করে দিয়েছে যে এই দ্বীপের উপর কোনপ্রকার আক্রমণ হ'লে একটা অবাঞ্ছিত ব্যাপার ঘটবে। হাইনান দ্বীপ অধিকার করে জাপানীরা একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে যে সুদূর প্রাচ্যে পাশ্চাত্য শক্তিগুলির দ্বারা ইউরোপের নিরপেক্ষনীতি প্রয়োগ করানো সম্ভবপর কিনা। ফ্রান্সের উপর চাপ দিয়ে তাকে ভয় দেখিয়ে জাপান চেষ্টা করবে যাতে ফরাসী ইন্দো-চীন ও চীনের মধ্যস্থিত টনকিন্-ইউনান্ রেলপথ দিয়ে চীনে অস্ত্রশস্ত্র চালান না হয়। কিন্তু এই চেষ্টা জাপানের ব্যর্থ হবে। গ্রেট্ বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা সুদূর প্রাচ্যে তাদের এই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ পরিত্যাগ করতে পারে না। বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা আন্তর্জাতিক চুক্তি ভঙ্গ করেও সেইজন্য চীনকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করছে। রুজভেল্ট প্রশান্ত মহাসাগরে নৌঘাঁটি করার যে বৃহৎ পরিকল্পনা করেছেন, তাতেও জাপানীদের যথেষ্ট আতঙ্ক হয়েছে। এইজন্য একদিকে সুদূর প্রাচ্যে চীনের জয়ের সম্ভাবনা যেমন খুব বেশী, তেমনি প্যাসিফিকে জাপানের সহিত পাশ্চাত্য শক্তিগুলির রেষারেষির ফলে আন্তর্জাতিক সমরানল প্রজ্জ্বলিত হবার সম্ভাবনাও নেহাৎ কম নয়। এখন কোথায় প্রথম অগ্নি সংযোগ হবে—পিরেনীয় সীমান্তে না প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে? ইউরোপের মিনর্কায়, না সুদূর প্রাচ্যের মিনর্কায়, হাইনান দ্বীপে?

ম্যাসিয়ে দেলদিয়ার

অগ্নিসংযোগ যে কোন কেন্দ্রেই হোক্, আগামী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সমররত রাষ্ট্রগুলি কিভাবে বিভক্ত হবে স্পষ্টই বোঝা যায়। শিবির-বিভাগ হবে—লণ্ডন—প্যারিস্ নিউ-ইয়র্ক নানকিং মস্কো এ্যাক্সিস্ বনাম বার্লিন-রোম-টোকিও এ্যাক্সিস্। সাম্রাজ্যবাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধীতার বেগভারে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যে মহাসমরের সম্মুখীন হ'চ্ছে তার ফলাফল ইতিহাসের ললাটে অঙ্কিত হবে সাম্রাজ্যবাদের অবশ্যম্ভাবী অবসানে।

এই সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃক আয়োজিত আসন্ন মহাসমরে উপনিবেশ ও অধীন রাষ্ট্রগুলির অবস্থা কি হবে এবং তাদের কি করা কর্তব্য?

ইউরোপে মিনর্কা ও সুদূর প্রাচ্যে হাইনান্ দ্বীপের মত অদূর প্রাচ্যে প্যালেষ্টাইনও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। ইতালী ও জার্মানির ফ্যাশিস্ত চক্রান্তে অনন্যোপায় হ'য়ে বৃটেনের তাগিদে লণ্ডনে আরব ও ইহুদী প্রতিনিধিবৃন্দের যে সভা আহূত হ'য়েছিল, প্যালেষ্টাইনের

দীর্ঘকাল স্থায়ী আরব-ইহুদী সমস্যা সমাধানের জন্য, বৃটিশ-পরিকল্পিত সমস্ত রাজনৈতিক বৈঠকের মত তারও একটা হাস্যাস্পদ উপসংহারের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। প্যালেষ্টাইন সমস্যা মীমাংসার জন্য বৃটিশ কূটনীতিকরা যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তা আমাদের কাছে অর্থাৎ ভারতবাসীদের কাছে আদৌ নূতন নয়। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার সেই চিরাগত চাল এখানেও আছে এবং সমর-বিভাগে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিপত্তি এখানেও অটুট থাকবে। ভারতবর্ষের উপর এতদিন ধরে যে সাম্রাজ্যবাদী লীলাখেলা চলছে প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে তার পুনরভিনয় সুরু হ'য়েছে। আরবরা দাবী করছে স্বাধীনতা এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা এই দাবীকে দূরে ঠেলে দেবার জন্য আপাততঃ এই পন্থা অবলম্বন করেছেন। গোলটেবিল বৈঠকের ব্যবস্থার যে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে প্যালেষ্টাইন সমস্যার ন্যায্য সমাধান কোন উপায়েই সম্ভব নয়। বরং প্যালেষ্টাইনে যে সংঘর্ষের আজও উপশম হয় নি, তা আরও ভীষণভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে।

প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই সব উপায় অবলম্বনের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য হ'ল প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ প্রাধান্যের যে শৈথিল্য এসেছে তাকে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা। সেই সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করার একই চেষ্টা চলেছে ভারতবর্ষের গলায় যুক্তরাষ্ট্রের ফাঁস পরিয়ে। এই যুক্তরাষ্ট্র প্রণালীর বিরুদ্ধে আমাদের যে সংগ্রাম তার গুরুতর ক্ষতি হয়েছে গান্ধীজীর নির্দ্দেশে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যবৃন্দের পদত্যাগে এবং পরিশেষে রাজকোট ব্যাপারে গান্ধীজীর প্রায়োপবেশনে। কংগ্রেসের গান্ধীবাদী ও দক্ষিণপন্থীদলের নেতারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন সুভাষবাবুর নেতৃত্বে ভারতের বামপন্থীদলের ঐক্য ও গণসংহতির সম্ভাবনা অঙ্কুরে বিনাশ করতে। কিন্তু সুভাষবাবুর নির্ভীক অভিযানের সুস্থির প্রতিজ্ঞা দেখে তাঁরা একটুই নিরাশ হ'য়েছেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশন যখন দ্বারপ্রান্তে তখন গান্ধীজী ঠাকুর সাহেবকে শেষ সিদ্ধান্ত জানিয়ে উপবাস আরম্ভ করলেন ভারতবর্ষের জটীলতর রাজনৈতিক আবহাওয়াকে জটীলতম করার জন্য। গান্ধীজীর উপবাসকাল আজ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করলে তিনি যে ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব্বাহ্ণে যে-কোন অছিলায় উপবাস করবেন, তাতে অবাক্ হবার কিছু নেই। তিনি বেশ বুঝেছিলেন যে উপবাসের শুভলগ্ন হ'ল এই এবং এতেই তাঁর পূর্ব্ব প্রকাশিত বিবৃতি অনুযায়ী বামপন্থীদের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক সঙ্কট সফল করা সম্ভব হবে। তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি ভুলাভাই দেশাই ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের ফোনে আলাপ আলোচনায় এবং সত্যনারায়ণ সিংহ ও বি, বি, ভার্মার বিহার মন্ত্রীসভার পদত্যাগের মর্ম্মে রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট তারের সংবাদ থেকে। ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যবৃন্দের পদত্যাগ যখন সুভাষবাবু স্বীকার করে' নিলেন, তখন দক্ষিণপন্থীদের একমাত্র পাশুপাত অস্ত্র রইল নিয়মতান্ত্রিক সঙ্কট এবং গান্ধীজী সেই অস্ত্র নিক্ষেপের সুবিধা করেছিলেন উপবাস করে'। তিনি উপবাস থেকে নিবৃত্ত হয়েছেন শুনে আমাদের অনেকখানি দুর্ভাবনা গেছে, কিন্তু ত্রিপুরী কংগ্রেসে তাঁর উপস্থিতি সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সুভাষ-বাবুকে অসুস্থ অবস্থায় ত্রিপুরী নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কারণ অধিবেশন মুলতবী রাখার আবেদন

গ্রাহ্য হয় নি। সুভাষবাবু তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত বিবৃতিতে যে কর্ম্মতালিকা দিয়েছেন তাতে যে শ্রেণীস্বার্থ কিছু জড়িত আছে এ কথা কোন বিবেচক রাজনীতিকই বলবেন না। তাঁর বিবৃতির মূল বিষয় হচ্ছে তিনটি : পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্র-প্রণালীর বিরোধিতা, দেশীয় রাজ্যে গণ-আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেসের অনুসৃত নিরপেক্ষ নীতির পুনর্বিবেচনা, এবং প্রবল ও ব্যাপক গণ-আন্দোলন চালাবার ব্যবস্থা করা, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা, ইত্যাদি। এর মধ্যে শ্রেণীগত গন্ধ কিছু নেই বলেই আমাদের বিশ্বাস এবং বর্ত্তমানে বামপন্থীদের ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রাম এই পথে পরিচালিত করাই কাম্য। এই কর্ম্মতালিকাকে সাদরে অভ্যর্থনা করা দক্ষিণপন্থীদেরও উচিত। ত্রিপুরী কংগ্রেসে যাঁরা এর বিরোধিতা করবেন তাঁদের উপর প্রতিক্রিয়াশীলতার ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত পক্ষপাতিত্বের দোষারোপ করলে আদৌ অন্যায় হয় না। এবং আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেভাবে সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠেছে, তাতে এই প্রতিকূলাচরণ নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর হবে।

৭ই মার্চ্চ, ১৯৩৯
কলিকাতা

বসন্ত

হরপ্রসাদ মিত্র

ছেঁড়া মেঘে ম্লান চাঁদ আজ উঁকি দিয়েছে,
স্মরণে তো কাঁপে চিরাতীত থরো-থরো
তবু বিষাক্ত এ পরিবেশের পরশে
নব বসন্ত শিরায় জোয়ার আনে আজ ?

ভীরু পায়ে হায়, তবে মিছে খোঁজা কন্দর !
কোথায় পাহাড় ? এ যে সমতল সাহারা।
সব রহস্য অতীত দিনের আলোকে।
ক্ষণজীবী রাতে মিছে তবে শ্বাস ফেলা আর।

পুরাণে কি লেখে ? পাঁজিতে তো মিলে গেছে ঠিক,
রাজকুমারীর অঞ্চল শ্লথ আবেশে।
ঋতু-সংহার মিছে আবৃত্তি তবুও,
রুধিরাক্ত এ নিশান উড়ায়ে দিলো কে ?

মহুয়ার ঘন সৌরভে ভেসে এলো দিন ;
যাযাবর কাল ব'লে যায় কানে-কানে,
অপটু নীড়ের কপালে কি আছে লেখা
পলাশ রঙীন দিগ্‌বলয় তা' জানে ॥

অভিভাষণ *

সমবেত ভগিনী ও বন্ধুগণ!

আপনাদের এই সম্মেলনে সভানেত্রীত্ব করবার জন্য আহ্বান কোরে আমাকে যে সম্মান ও প্রীতি প্রদর্শন কোরেছেন—আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি তা গ্রহণ কোরছি। যোগ্যতার বিচারে আপনাদের সব চেয়ে বড় যুক্তি ছিল—আমি এই সুরমা-উপত্যকার মেয়ে, এবং এই সহজ দাবীকে স্বীকার কোরে আপনাদের দেওয়া এ সম্মান গ্রহণ করতে আমার তরফ থেকেও দ্বিধা জাগেনি।

আমাদের কাজ আরম্ভ করার আগে, যাঁদের দেশ-প্রীতি, উদ্যম ও সাহসের ফলে সুরমা-উপত্যকার এই অভূতপূর্ব নারী-জাগরণ, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। অসহযোগ আন্দোলনে এ উপত্যকার মেয়েরা কি নির্ভীক বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রামের নেত্রীত্ব কোরেছেন, সেই জাতীয় দুর্দিনে, কত অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রামের কুলবধূ ও কন্যারা দ্বিধা-শূন্যভাবে কারাবরণ করেছেন—সেকথা স্মরণ কোরে গর্বে অন্তর ভরে উঠছে। অতীতে যাঁদের দানের পরিমাণ এত প্রচুর, ভবিষ্যৎ তাঁদের নিকট আশা করে অনেক। অতীতে আপনাদের কর্তব্য আপনারা পালন কোরেছিলেন যোগ্যতার সঙ্গে—বর্তমান ও ভবিষ্যতের জটিলতর কর্তব্যের জন্য যাতে আপনারা আবার প্রস্তুত হোতে পারেন তার জন্য এই আলাপ-আলোচনার সুযোগ-সৃষ্টি—এই সম্মেলনের ব্যবস্থা।

বর্তমান অধিবেশন সুরমা উপত্যকার দ্বিতীয় মহিলা-সম্মেলন। এ ধরণের সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে দুদিক্ দিয়ে—প্রথমতঃ যে কোন সম্মেলনই দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রকে প্রশস্ত কোরে বৃহত্তর পরিধিতে আলোড়ন ও সচেতনতা আনে। দ্বিতীয়তঃ অতীতের হিসাব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দৃষ্টিতে নূতন পথ ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করবার প্রয়োজনও সাধন হয়। এদিক্ দিয়ে বিচার করলে বর্তমান সম্মেলনের বিশেষ এক গুরুত্ব রয়েছে—কারণ জগত ও ভারতের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে আমরা আজ মিলিত হোয়েছি আমাদের আদর্শ ও কর্তব্য স্থির করবার জন্য।

আমাদের আদর্শ

কর্তব্য নির্ধারণ করবার আগে জানা দরকার আমাদের আদর্শ কি অর্থাৎ কি আমরা চাই। এক কথায় এর উত্তর—আমরা চাই এমন এক রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা

* সুরমা উপত্যকা মহিলা-সম্মেলনে সভানেত্রী শ্রীযুক্তা লীলাবতী নাগের অভিভাষণ, ২৪-২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯।

গড়ে তুল্‌তে যাতে প্রচুরতম লোকের প্রভূততম কল্যাণ সাধিত হয়। আমাদের বর্তমান অবস্থায় এই আদর্শ আমরা প্রতিষ্ঠিত কোরতে পারছি না—বাধা আস্‌ছে দুদিক্ থেকে। বাইরের বাধা আমাদের পরাধীনতা—আর ভেতরের বাধা আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থা। আমাদের পরাধীনতা দূর করবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বর্তমান কালে আর মতদ্বৈধতা নেই। এই পরাধীনতা আমাদের সকল উদ্যম ও প্রচেষ্টাকে নিষ্ফল করছে। কাজেই প্রচুরতম লোকের পক্ষে যা কল্যাণকর তা সম্ভবপর হোতে পারছে না। কিন্তু এই পরাধীনতাই আমাদের একমাত্র বাধা নয়—যদি পরাধীনতা দূর হয়, কিন্তু আমাদের আভ্যন্তরীণ বাধা অর্থাৎ বর্তমান সমাজব্যবস্থা অব্যাহত থাকে, তবে আমাদের আদর্শ থেকে বহু দূরে আমরা থাক্‌বো। এই যে বর্তমান সমাজব্যবস্থা যা দুহাজার বছর ধরে চলে আস্‌ছে—একে বিশ্লেষণ কোরে দেখতে হবে কোথায় এর অসম্পূর্ণতা, কোথায় এর ক্ষত, যাতে মানুষের জীবন সহজ ও স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হোতে পদে পদে বাধা পাচ্ছে। এই বিশ্লেষণের ফলে দেখি, বর্তমান সমাজব্যবস্থার মূলে রয়েছে ধন-বৈষম্য—এই বৈষম্যের লক্ষণ আজকের সভ্যতার সকল অঙ্গে ও স্তরে। বৈষম্য চিরদিনই ছিল—মধ্যযুগের প্রাচুর্য্য ও শস্যসমৃদ্ধির জন্য তা অনুভূত হয়নি। অন্যদিকে বর্তমান যুগের যান্ত্রিক-সভ্যতা ও আনুষঙ্গিক বিপুল উৎপাদন এই বৈষম্যকে অত্যুগ্র কোরে তুলেছে। এরই ফলে দেশে দেশে ও জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ, জগৎময় বেকার-সমস্যা, এরই ফলে জগতের মধ্যবিত্ত ও চাষী মজুরের অভাব-অনটন দূর হয় না। এক কথায় এই বৈষম্য দূর না হোলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ সত্ত্বেও প্রচুরতম লোকের কল্যাণ সাধন সম্ভবপর হবে না। কাজেই আমাদের আদর্শ, স্বাধীনতা লাভ কোরে এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা আনা যাতে এই ধনবৈষম্য দূর হবে। আজকের দিনে সকল সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ না কোরলে সমাধানের পথ পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ লক্ষণগুলিই ব্যাধি বলে ভুল করলে ব্যাধির মূলোচ্ছেদ সম্ভব হয় না—লক্ষণ দূর করবার ব্যর্থ প্রয়াসে শক্তির অপব্যবহার হয় মাত্র। কাজেই সমস্যা কি সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হওয়া প্রয়োজন এবং তার সঙ্গে চাই সমস্যা কি সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হওয়া প্রয়োজন এবং তার সঙ্গে চাই সমস্যা দূর করবার সুনির্দিষ্ট সুচিন্তিত পথ। তাহোলে আমরা দেখছি আমাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করবার পথে দুইটী বাধা—অধীনতা ও ধনবৈষম্যপুষ্ট সমাজব্যবস্থা। আমাদের সমস্যা হোচ্ছে, কি ভাবে এই বাধা দূর করা যায়?

পুরুষ ও নারীর কর্তব্য অভিন্ন

আমাদের কর্তব্য নির্দ্ধারণ করবার পূর্বে মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন, পুরুষ ও নারীর কর্মক্ষেত্র ও কর্তব্য বিভিন্ন কি না, ঘর ও বাইরের সনাতন কোন বিভেদ ও বিচ্ছেদ আছে কিনা। আমাদের মতে উভয়েই মানুষ, এই হিসেবে পুরুষ ও নারীর কর্তব্য একরূপ হওয়াই স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত।

ঘর ও বাইরের নির্দ্দিষ্ট কোন সীমা থাকতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করিনা। বিভিন্ন যুগে ঘর ও বাইরের সীমা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হোয়ে এসেছে প্রয়োজনের চাপে—যুগের দাবীতে, যেমন হোয়েছে বর্তমান স্পেন ও চীনে, যেখানে দেশ ও জাতিকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে নারীও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিচ্ছে পুরুষের পাশে—যেমন হোয়েছে রুশ দেশে, যেখানে সমাজব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে নারী আজ রাষ্ট্রে ও সমাজে দায়িত্বপূর্ণ পদেই শুধু অধিষ্ঠিত নয়—কলকারখানা পরিচালন করা থেকে উড়োজাহাজ চালানো পর্য্যন্ত সকল প্রকার কাজই—যা এতদিন নিছক পুরুষের কাজ বলে গণ্য হোত—যোগ্যতার সঙ্গে করছে। স্মরণ রাখতে হবে, খুব বেশীদিন আগে নয়—এই রুশ দেশেই সমাজে মেয়েদের স্থান গৌরবের বা সম্মানের ছিল না। কাজেই ঘর ও বাইরের মধ্যে সনাতন সীমা কিছু আছে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা এই সীমা নির্বাচন কোরেছে বিভিন্নরূপে। বর্তমানের সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের স্থান যে গৌরবের নয়, সেকথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই সমাজব্যবস্থা নারী পুরুষ উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে এমনি সঙ্কীর্ণ আড়ষ্টতা এনেছে যে, মুখে যাঁরা সমানাধিকারের বুলি আওড়ান এবং প্রগতিপন্থী বলে ঘোষণা করেন, তাঁদেরও নারী সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় মনোভাব যায়নি। নারীকে যে অধিকার তাঁরা দিয়েছেন তাতে নারীর সহজ দাবী তাঁরা স্বীকার করেন না। তাঁদের মধ্যে অনেকে অনুকম্পামিশ্রিত অবজ্ঞায় ভাবেন, "মেয়েদের পক্ষে এই যথেষ্ট"। সঙ্ঘবদ্ধ নারীশক্তিকে আজ এর উত্তর দিতে হবে, "মেয়েদের পক্ষে এ একেবারেই যথেষ্ট নয়। সকলক্ষেত্রে সহজ স্বাভাবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত কোন কিছুই যথেষ্ট নয়।" যে সমাজব্যবস্থা নারীর মনুষ্যত্বকে পঙ্গু কোরে তার কর্তব্যকে করতে চায় সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ, তার আমূল পরিবর্তন করবার দিন এসেছে। সামাজিক রাষ্ট্রিক সকল দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ণ অধিকার নারীকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে নিজের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির জোরে।

কাজেই বর্তমান যুগে স্বাধীনতা অর্জনের ও সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য যে সংগ্রাম চলছে জগতে ও আমাদের এই ভারতবর্ষে, নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে ভুল করা হবে এবং সিদ্ধিও তাতে সহজলভ্য হবে না। বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনের মধ্যেই আজকের বঞ্চিত, নিপীড়িত জনগণের মুক্তি নিহিত রয়েছে। এই বঞ্চিত, নিপীড়িতদের মধ্যে নারীও রয়েছে। বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থায় নারীর আত্মবিকাশের পথ নেই। কাজেই নারীর শ্রেণীগত সংগ্রামকে বৃহত্তর সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে দেখে সমগ্র সংগ্রামের দায়িত্ব বহন তাকে কোরতে হবে, জগতের যত নিপীড়িত বঞ্চিতদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। এদের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে নারীর নিজেরও মুক্তি আসবে নূতন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্যে।

কাজেই দেখ্‌ছি নারী ও পুরুষের কর্ত্তব্যে কোন পার্থক্য নেই। আর সে কর্ত্তব্য হোচ্ছে

স্বাধীনতাকামী সকল শক্তির সঙ্গে মিলিত ভাবে বৈদেশিক শাসন ও সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল, এই উভয় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া।

স্বাধীনতার সংগ্রাম

গত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে স্বাধীনতার সংগ্রাম চলেছে। ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ মূর্ত্ত হোয়ে উঠছে জগতের বৃহত্তম জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে। আত্মবিস্মৃত জাতি ধীরে ধীরে নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হোয়ে ১৯২৯ সনে লাহোর কংগ্রেসে সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঘোষণা করে। ভারতের ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় দিন। তারপর থেকে স্বাধীনতা-সংগ্রাম ক্রমেই বিপুল আকার ধারণ কোরছে। যা আগে ছিল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মধ্য-বিত্তদের মধ্যে আবদ্ধ, আজ ক্রমেই তা পরিব্যাপ্ত হোচ্ছে অগণিত জনগণের মধ্যে। স্বাধীনতার সংগ্রামকে বুঝতে হোলে এই গণজাগরণের লক্ষ্য ও স্বরূপ আপনাদের বুঝতে হবে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে এর যোগ অতি গভীর।

গণ-জাগরণ

বর্ত্তমান রাষ্ট্রিক ও অর্থ-নৈতিক সমাজব্যবস্থায় গণসাধারণ, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত, কৃষক ও মজুরের অবস্থা সব চেয়ে শোচনীয়। আর্থিক দৈন্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অভাব তাদের জীবনকে দুর্বহ কোরেছে সকল দিকে। এদের উপরই জমিদার ও মালিকের শোষণ ও শাসন চলে সব চেয়ে বেশী। কাজেই বর্ত্তমান অবস্থাকে পরিবর্ত্তন করবার আগ্রহও এদের সব চেয়ে তীব্র। এরা বুঝেছে রাষ্ট্রশক্তি আয়ত্ত কোরতে না পারলে অর্থাৎ স্বাধীনতা অর্জন কোরতে না পারলে নূতন সমাজব্যবস্থা আনা এবং অবস্থার পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হবে না। এরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের সংগ্রামকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে অভিন্ন কোরে দেখতে আরম্ভ কোরেছে। এদের জাগরণে কেবলমাত্র স্বাধীনতা সম্ভবপর হবে তা নয়, ধনবৈষম্যেরও অবসান ঘটবে, কারণ শোষণক্লিষ্ট এরা বুঝেছে সাম্রাজ্যবাদ ধন-তন্ত্রেরই শেষ অবস্থা। ধনতন্ত্র-বিরোধী আন্দোলন চায় নূতন সমাজব্যবস্থা এবং তার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করা, কাজেই গণ-আন্দোলনের স্বার্থ জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে শক্তিশালী করা। এই কারণে স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিমাত্রেরই গণ-আন্দোলনকে সমর্থন করা উচিত, এতে স্বাধীনতার আন্দোলনই শক্তিশালী হবে। গণ-আন্দোলনকে বুঝতে হোলে শ্রমিক ও কৃষকের অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হোতে হবে, তাদের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ বলে অনুভব করতে হবে, তাদের উপর যে শোষণ চলেছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম কোরতে হবে। যাঁরা মনে করেন, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনকে দমন কোরে ধনিক শ্রেণী তাঁদের ক্ষমতা অব্যাহত রাখতে পারবেন—হয় যুগের ইঙ্গিত

বোঝবার মত যথেষ্ট দূরদৃষ্টি তাঁদের নেই, না হয় স্বার্থবুদ্ধি তাঁদের যুক্তিকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। এ-যুগের দাবীকে আপনারা সকল দিক্ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করুন এবং সে দাবীকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য আপনাদের সমস্ত শক্তি ও উদ্যমকে নিযুক্ত করুন, এই আমার অনুরোধ।

দেশীয় রাজ্যে প্রজা-আন্দোলন

দেশীয় রাজ্যগুলিতে যে বিরাট প্রজা-আন্দোলন চলেছে—তার সংবাদ আপনারা নিশ্চয়ই রাখেন। স্বাধীনতাসংগ্রামকে এই আন্দোলন অভূতপূর্ব শক্তি দান করেছে। এতদিন সামন্তরাজ্যগুলি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রধান স্তম্ভ স্বরূপ ছিল—দায়িত্বশীল শাসন বা ব্যক্তিস্বাধীনতার নামও এখানে এতদিন কেউ শোনেনি—কিন্তু এতদিন পর দেশীয় রাজ্যের প্রজারা তাদের জন্মগত অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হোয়ে উঠেছে, তারা আজ দায়িত্বশীল শাসন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার দাবী জানাচ্ছে। ফলে তাদের ওপর জুলুম ও অত্যাচার প্রতিদিনই তীব্রতর হোয়ে উঠছে। এ ব্যাপারে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কৃতিত্বও বড় কম নয়, কারণ এই মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের ভরসাতেই তাঁরা যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষের স্কন্ধে চাপাবার আশা কোরেছিলেন। আপনারা জানেন উড়িষ্যার ঢেন্‌কানল, তালচের প্রভৃতি রাজ্যের প্রজারা কিছুদিন ধরে কী দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে তাদের সংগ্রাম চালাচ্ছে। সম্প্রতি জয়পুর, রাজকোট, হায়দ্রাবাদের উপর সামন্ততন্ত্র ও তার পরিপোষক বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছাচার ও রুদ্রনীতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে—সমস্ত ভারতের দৃষ্টি আজ এই রাজ্যগুলির উপর নিবদ্ধ। আপনারা জানেন, শ্রদ্ধেয় যমুনালাল বাজাজকে জয়পুর সরকার তাঁর মাতৃভূমিতে প্রবেশ করতে দেননি প্রজা-জাগরণের ভয়ে—রাজকোট রাজ্যে স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদে শ্রদ্ধেয় কস্তুরীবাই, মনিবেন প্যাটেল সত্যাগ্রহ কোরে কারাবরণ কোরেছেন, হায়দ্রাবাদেও দমননীতির মরসুম চলেছে। মহাত্মাজী এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে—কংগ্রেসও দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে নিরপেক্ষ নীতি বর্জন করবেন বলে অনুমান করা কঠিন নয়। ক্রমেই দেশীয় রাজ্যের প্রজা-আন্দোলন বিপুল আকার ধারণ কোরে সর্বভারতীয় সমস্যায় পরিণত হবে। বর্তমান কালে ভারতের পক্ষে এক বিশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ মুহূর্ত। একদিকে বৃটিশ ভারতের গণ-আন্দোলন, অন্যদিকে সামন্ততন্ত্রশাসিত ভারতের প্রজা-আন্দোলন, এই উভয় মিলিত হোয়ে বৃটিশ শাসন ও সাম্রাজবাদের বিরুদ্ধে এমন এক শক্তি সঞ্চার করবে যার সামনে কোন বাধাই টিক্‌তে পারবে না বেশীদিন। এই প্রজা-আন্দোলনের গতি ও পরিণতি সম্বন্ধে আপনাদের সজাগ হওয়া প্রয়োজন—এই আন্দোলন সর্বভারতীয় সমস্যা হোয়ে দাঁড়ালে আপনাদেরও এর অংশ গ্রহণ করবার প্রয়োজন উপস্থিত হবে। হয়তো সেদিন দূরে নয়।

যুক্তরাষ্ট্র

আপনারা সকলেই প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে শুনেছেন। ১৯৩৫ এর ভারত-শাসন আইনের দুইটী অংশ ছিল, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয়। গত ১৯৩৭ এর এপ্রিল মাসে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন কিছু পরিমাণে দেওয়া হোয়েছে—এবং কংগ্রেস যদিও একে একেবারেই যথেষ্ট মনে করেন না তব জাতিকে বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করবার পক্ষে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন কিছুটা প্রয়োজন সাধন করবে, এই আশা করে কংগ্রেস ৯টী প্রদেশে প্রাদেশিক শাসনভার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই শাসনবিধির কেন্দ্রীয় অংশ শুধু যে ভারতবাসীর আশানুরূপ হয়নি তাই নয়—পূর্ববর্তী শাসনবিধির তুলনায় অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল। ভারতবর্ষ যুক্তরাষ্ট্র চায়, কিন্তু প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষ চায় না—কারণ এর পরিকল্পনা ও গঠনে ভারতবাসীর মতামত গ্রহণ করা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ দুই অসমধর্মীকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের মূলনীতি-বিরুদ্ধ। বৃটিশ ভারতের প্রদেশগুলি আংশিক গণতান্ত্রিক, কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলি প্রধানতঃ স্বেচ্ছাতান্ত্রিক। এ ছাড়া প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের বৈদেশিক নীতি ও ভারতরক্ষা সম্পর্কিত ব্যাপারগুলি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে, এই অবস্থায় কংগ্রেস এই যুক্তরাষ্ট্র বর্জনের সঙ্কল্প দ্বিধাশূন্য ভাবে ঘোষণা করেছেন। এ বিষয়ে দেশবাসীর অভিমত ও রাষ্ট্রপতিনির্বাচনে নিঃসংশয়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। জলপাইগুড়িতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হোয়েছে সে সম্বন্ধে আপনারা সকলেই নিশ্চয় অবহিত আছেন। এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হোয়েছে যে ভারতবাসীর ইচ্ছানুযায়ী শাসন-ব্যবস্থা গঠন করবার অধিকার যদি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বীকার কোরে না নেন, তবে ভারতময় এমন এক জনমত সৃষ্টি কোরতে হবে যাতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের দাবীকে স্বীকার কোরে নিতে বাধ্য হন। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে জাতিকে যে এক বিরাট সংগ্রামের সম্মুখীন হোতে হবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। এখন থেকেই তার জন্য প্রস্তুত হোতে হবে। আপনাদের দায়িত্ব আপনারা বুঝুন এবং যথাযথভাবে তা পালন করবার শক্তি অর্জন করতে আত্মনিয়োগ করুন।

আসামে কংগ্রেস শাসন

আসামে শ্রীযুক্ত বারদোলইর নেতৃত্বে কংগ্রেস কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে এ প্রদেশে কংগ্রেসের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচারের অভূতপূর্ব্ব সুযোগ লাভ হবে এবং স্বাধীনতা ও গণ-আন্দোলন বিশেষ শক্তিশালী হোয়ে উঠবে বলে আমরা আশা করছি। শ্রীযুক্ত বারদোলইকে এবং এ প্রদেশের সকল কর্ম্মীকে আমরা বিশেষ ভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ তাঁদেরই কৃতিত্ব

ও নিষ্ঠার ফল এবং এর ফলে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন বহুল পরিমাণে শক্তিশালীহবে, সন্দেহ নেই। আমরা আশা রাখি, কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণের ফলে জনসাধারণকে বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করবার যে সুযোগ লাভ হোয়েছে, নারী-পুরুষ-নির্বিবশেষে আসাম প্রদেশের সকল কংগ্রেস-কর্ম্মী তার উপযুক্ত ব্যবহার করবেন এবং এমন এক শক্তিশালী আন্দোলন সৃষ্টি করবেন যাতে সাম্রাজ্যবাদের পতন ও ভারতের মুক্তি সম্ভবপর হোয়ে ওঠে।

আন্তর্জাতিক অবস্থা

ভগিনী ও বন্ধুগণ, বর্তমান যুগে কোন বিশেষ দেশের সমস্যা বিচ্ছিন্নভাবে দেখ্‌লে তার মীমাংসা হওয়া কঠিন। বিজ্ঞান আজ জগতের বিভিন্নাংশকে পরস্পরের অতি নিকটে এনে ফেলেছে। যাতে কোন দেশের সমস্যা আর একক একটী ঘটনা নয়, বিশ্বাবর্তের এক একটী বুদ্‌বুদ মাত্র। এদিক দিয়ে দেশের সকল সমস্যা ও তার সমাধানকে বর্তমান যুগোপযোগী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে। ইউরোপের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখি জার্ম্মাণী, ইটালী প্রভৃতি ফ্যাসিস্ত শক্তিগুলি ক্রমশঃ শক্তিশালী হোয়ে উঠ্‌ছে। অন্যদিকে সোভিয়েট ও গণতান্ত্রিক দেশও নিশ্চেষ্ট বসে নেই। অদূর ভবিষ্যতে এই দুই শক্তির সংঘর্ষ আসন্ন। এদিকে স্পেনের অন্তর্বিদ্রোহ ও মহাচীনে জাপানী সাম্রাজ্যনীতির নগ্ন লোলুপতা ফ্যাসিস্ত নীতিরই পরিপোষকতা করছে। আপনারা যদি মনে কোরে থাকেন, এসব ঘটনা আমাদের স্পর্শ করবে না, আমরা নিরপেক্ষ দর্শকের মতই উপেক্ষাভরে এগুলিকে দেখে যেতে পারি, তবে এ ভুল রূঢ়ভাবেই আপনাদের ভাঙবে। অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ যে জাপানের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না তার নিশ্চয়তা কি? সাম্রাজ্যবাদী বিভিন্ন শক্তিগুলির মধ্যেও যুদ্ধ আসন্নপ্রায়। এই সুযোগ ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। এজন্য পূর্ব্ব থেকেই প্রস্তুত হোতে হবে। আন্তর্জাতিক পটভূমিতে ভারতবর্ষের সকল সমস্যার বিচার করতে হবে। সেই দৃষ্টিভঙ্গী আলাপ-আলোচনা ও সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আপনারা গঠন করুন এবং সেই অনুযায়ী জাতীয় আন্দোলনকে পরিচালনা করুন। অন্ধের মত কাজ করবার দিন আর নেই। পূর্ব থেকে সমগ্র সংগ্রামের গতি ও রূপকে অনুমান কোরে আমাদের অগ্রসর হোতে হবে, যাতে উপযুক্ত সময়ে দেশ আমাদের উপযুক্তরূপে প্রস্তুত দেখতে পায়।

আমাদের করণীয়

ভারতের সমস্যা আমরা আলোচনা করেছি এবং সেই অনুযায়ী জাতির কর্তব্য কি, তাও নির্ধারণ কোরতে চেষ্টা কোরেছি। এখন প্রশ্ন হোচ্ছে, সেই জাতীয় কর্তব্য সাধন আমরা কি উপায়ে করবো অর্থাৎ আমাদের আশু করণীয় কি?

আমাদের সর্বপ্রথম করণীয়—মেয়েদের সঙ্ঘবদ্ধ করা। এই সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন এই জন্য যে, বিচ্ছিন্নভাবে মেয়েরা নিজেদের এবং জাতির জন্য যা করছেন বা করবেন, তাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধি কিছুতেই হবে না। কাজেই জাতির কল্যাণ যাঁদের কাম্য, তাঁদের উচিত অবিলম্বে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। এই সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আজ সকলেরই মুখে শোনা যায়, কিন্তু খুব মুষ্টিমেয় লোকেই এর মর্ম গ্রহণ কোরে থাকেন বলে আমার বিশ্বাস।

যথার্থ সঙ্ঘবদ্ধ যাঁরা হোতে চান—দুইটি সর্তকে তাঁদের মেনে নিতে হবে। প্রথমতঃ বহুর মতের নিকট ব্যক্তিগত ভাললাগা, খারাপলাগাকে তাঁদের খর্ব কোরতে হবে পদে পদে, দ্বিতীয়তঃ নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজনীয়তা তাঁদের শিক্ষা করতে হবে। বুঝতে হবে—আমাদের মত অন্যেরাও দেশ-সেবার অংশ গ্রহণ কোরতে চান এবং সে সুযোগ তাঁদের দিতে হবে। দেশসেবায় একচেটে অধিকার কারো নেই।

এখন প্রশ্ন হোচ্ছে যে, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া যায় কি উপায়ে? পূর্বে আমাদের ধারণা ছিল যে, মেয়েদের কোন প্রতিষ্ঠান কুটীরশিল্পজাতীয় কোন এক অবলম্বন ব্যতীত দানা বেঁধে ওঠে না। আমার বক্তব্য—নারী আন্দোলনের শৈশবে যদিও এর প্রয়োজন হোয়ে থাকে, আজ এর উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করবার সময় এসেছে। প্রথমতঃ কুটীরশিল্পকে অর্থকরী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোরতে না পারলে তার বিশেষ কোন উপযোগিতা নেই এবং রাষ্ট্রের সমর্থন ব্যতীত কোন কুটিরশিল্প অর্থকরীও হোতে পারে না। কাজেই রাষ্ট্রশক্তি আয়ত্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত কুটীর-শিল্পাদি প্রবর্তনের চেষ্টা অনেকটা বৃথা শক্তিক্ষয় বলেই আমার মনে হয়। এদিক দিয়ে আমাদের সুস্পষ্ট মতামত গঠন করতে হবে। আমাদের বোঝা প্রয়োজন, শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোন প্রশ্নেরই জাতিগতভাবে মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয়, যতদিন না রাষ্ট্রশক্তি সে মীমাংসার ভার গ্রহণ করছে। কাজেই আমাদের সকল শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে একটীমাত্র লক্ষ্যে—অর্থাৎ জাতীয় স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসে, যে স্বাধীনতা সকল সমস্যার মীমাংসা করবে। রাষ্ট্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে—জাতির ও আনুষঙ্গিকভাবে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীকে কেন্দ্র কোরে মেয়েদের বর্তমানে সঙ্ঘবদ্ধ হোতে হবে। যতদিন পর্য্যন্ত স্বাধীনতা লাভ না হয়—ততদিন গঠনমূলক কাজমাত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে—স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য জাতিকে প্রস্তুত করা—এদিক দিয়ে শিক্ষাপ্রচারের দিকে নারীদের বিশেষভাবে সচেষ্ট হওয়ার প্রয়োজন আছে।

শিক্ষিত মেয়েদের দায়িত্ব

বাংলার নারী সর্ব্বপ্রথম বিপ্লবী। মহর্ষি রামমোহন প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্ম আন্দোলনের ফলে এই বাংলাদেশই দেখেছে নারী জাগরণের প্রথম প্রভাত। কিন্তু আজ দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে

পারেনি, তারই ফলে আজ নারীজাগরণের পুরোভাগে বাংলার মেয়েদের দেখা যাচ্ছে না। এদিক্ দিয়ে শিক্ষিত মেয়েদের আত্মবিশ্লেষণ কোরে দেখ্‌তে বলি—দেশ ও জাতিকে কি তাঁরা দিচ্ছেন বা নিজেদের জীবনের সার্থকতাই বা তাঁরা কিসের মাঝে খুঁজ্‌ছেন ?

নারী আন্দোলনের নেত্রীত্ব গ্রহণ করতে যেমন তাঁদের দেখা যাচ্ছে না—তেমনি জাতির সকল আশা আকাঙ্খা সংগ্রাম পরীক্ষাও তাঁদের বিচলিত করতে পারছে না। শিক্ষার ব্যর্থতা এর চাইতে বেশী আর কিসে প্রমাণিত হবে ? শিক্ষিত মেয়েরা জাতীয় জীবন থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে পড়ছেন এবং স্বয়ং-সম্পূর্ণ গণ্ডী সৃষ্টি কোরে আপনাদের সকল শিক্ষা-দীক্ষাকে নিষ্ফল কোরে তুলছেন, এর চাইতে ক্ষোভের বিষয় আর কি হোতে পারে ? দুঃখের বিষয় তাঁদের এই উদাসীনতায় যে কি অনিষ্ট হোচ্ছে সে সম্বন্ধে তাঁরা একেবারেই সচেতন নন। ইতিহাসের ইঙ্গিতকে তাঁদের স্বীকার করতে হবে এবং শুধু নারী-আন্দোলনের নয়—সমগ্র জাতির মুক্তি আন্দোলনের দায়িত্ব তাঁদের গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যৎ সমাজ ও রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যই হবে এই, যে তার গঠনে থাক্‌বে নারীর দান। বর্তমান যুগের নারীকে ইতিহাসের এ দাবীকে পূরণ কোরে নতুন বিধান. নবসমাজ প্রবর্ত্তন কোরতে হবে।

শেষ কথা ৮

আমার বক্তব্য প্রায় শেষ হোয়ে এসেচে। আমি বলতে চেষ্টা কোরেছি ভারতের জাতীয়-মুক্তি-আন্দোলন একটী বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বিশ্বের নিপীড়িতদের মুক্তি-আন্দোলনের একটী অংশমাত্র—এই জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে অভিন্নভাবে যুক্ত রয়েছে গণ-আন্দোলন, শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তের জাগরণ এবং দেশীয় রাজ্যে প্রজা-আন্দোলন। এর সবগুলিই স্বাধীনতা আন্দোলনকে পরিপুষ্ট ও সম্ভব করে তুলছে। এই স্বাধীনতা আন্দোলনের সার্থকতা তখনই হবে যখন এর ফলে ধনগত বৈষম্য দূর হোয়ে নূতন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি প্রথমেই বলেছি, নারী ও পুরুষের কর্তব্যে আমি প্রভেদ করিনা এবং যাঁরা বলেন গৃহকোণই নারীর যথার্থ কর্ম্মক্ষেত্র, তাঁদের এ মত দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্কীর্ণতাপ্রসূত বলে মনে করি।

ঘর ও বাহির বলে কোন কৃত্রিম সীমারেখা টানা অস্বাভাবিক। বাইরের ঝড়ঝাপ্‌টা, চলিষ্ণু জগতের সকল গতিচ্ছন্দ ঘরকে প্রতিমুহূর্তে করে তুল্‌ছে অভিভূত, আজ ঘরের মানুষেরও বাইরের খবর না রেখে উপায় নেই—ঘরকে সামলাবার জন্যেই বাইরের পরিচয় তার প্রয়োজন। বর্তমানযুগে যে নারী বলেন তিনি রাজনীতির পক্ষপাতী নন্ তাঁর পক্ষে বলা চলে, তিনি জীবন সম্বন্ধেই উদাসীন—মানুষের জীবন পরস্পর সংযোগহীন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত নয়, মানুষের জীবনকে

দেখ্‌তে হয় সমগ্রভাবে—বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার কোরে কল্পনায় কৃত্রিম জগত সৃষ্টি করা চলে কবিতায় বা সাহিত্যে রসসৃষ্টির উদ্দেশ্যে, দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা তাতে চলে না। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজন পারিপার্শ্বিকের খবর রাখা ও সেই অনুযায়ী কর্তব্য স্থির করা। রাজনীতি বর্ত্তমান মানুষের পারিপার্শ্বিককে দিচ্ছে মুহূর্তে মুহূর্তে বদ্‌লিয়ে, তাকে রূপায়িত করছে নানা ভঙ্গীতে। সেই পারিপার্শ্বিকের খবর যে না রাখ্‌বে বা সেই পারিপার্শ্বিকের আনুকূল্য প্রতিকূলতা সম্বন্ধে যে উদাসীন হবে, সে বাস্তবজগতে থাকবার যোগ্য নয়।

ভগিনীগণ! বক্তব্য আমার শেষ হোয়েছে। জগতের এবং ভারতের এক সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে আমরা মিলিত হোয়েছি, আপনাদের বিচার-বিশ্লেষণ যেন শুধু এই উপত্যকার নয়, সমগ্র নারী আন্দোলনের গতি ও রূপ নির্ণয় করে। এ বিষয়ে আপনারা পথ প্রদর্শক হোন্! আপনাদের প্রীতি ও স্নেহের আহ্বান লাভের কতটা যোগ্যতা আমার আছে জানি না—তবে তাকে শ্রদ্ধা দিয়ে গ্রহণ কোরেছি। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ আপনারা গ্রহণ করুন!

ছোটরা

শকুন্তলা দেবী

বিদেশী সাংবাদিকেরা চলে যাবার পরে জেনারেল তাঁর ডেস্ক ছেড়ে উঠে সক্রোধ পদক্ষেপে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। গত দু'বছর ধরে তাঁর নাম সকলের মুখে এবং সংবাদপত্রে বড় বড় হরপে প্রকাশ হ'য়ে পুরোণো হ'য়ে গেছে, তবু আজও রিপোর্টারদের সম্মুখীন হওয়াটাতে তিনি অভ্যস্ত হ'তে পারলেন না। কি ভয়ানক অসুবিধা আজও তিনি অনুভব করেন তাদের সামনে—মাছির মত ভন ভন ক'রে সামনে সর্ব্বদা ঘুরে ঘুরে,—হাজারটা বিরক্তিকর প্রশ্ন করে কি বিরতই না করে তারা। এই যে লালচুলো মার্কিন রিপোর্টারটা কি নির্লজ্জের মত ভুল স্প্যানিশে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে প্রশ্ন করতে সাহস পায়—"জেনারেল, চারকোসের স্কুলের ওপরে বোমা ফেলার খবরটা কি ঠিক?" তার পোষাকী ভদ্রতার আড়ালে ব্যথামিশ্রিত হাসির বক্র রেখাটুকু অপ্রকাশিত থাকে না। বলে—'লোকে বলে দু'শোর ওপরে স্কুলের শিশুই নাকি শুধু ওতে মারা গিয়েছে?"

জেনারেল তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন। মিথ্যে কথা, শত্রুপক্ষের বিদ্বেষপূর্ণ মিথ্যা প্রচার মাত্র। নিষ্ফল আক্রোশে তিনি টেবিলটার ওপরে সশব্দে মুষ্ট্যাঘাত করেন। কিন্তু এ কথাও তিনি ভাল করেই জানেন যে বিদেশের সংবাদদাতাদের তাঁর কথা বিশ্বাস করান প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এতোক্ষণে লণ্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্ক প্রভৃতি সহরে টেলিগ্রাফে এ খবর রওনা হয়ে গেছে, জেনারেলের এই প্রতিবাদ সবারই অবিশ্বাস্য বোধ হবে, তিনি হবেন মিথ্যাবাদী।

পায়চারী করতে করতে তিনি জানলার ধারে সহসা থমকে দাঁড়ালেন। বাইরে দুটী ছোট ছেলে,—তাঁরই অধীনস্থ কোন সৈনিকের ছেলে,—একটা খেলনা এয়ারোপ্লেন নিয়ে মহা-স্ফূর্ত্তিতে খেলায় মগ্ন। এয়ারোপ্লেনটাকে একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে, ছোট্ট ঠোঁট দুটী উল্টে ভোঁ ভোঁ আওয়াজ করছে আর সমস্ত জায়গায় টেনে বেড়াচ্ছে। একটা নিরানন্দ হাসির রেখা জেনারেলের মুখে দেখা দিল, আপন মনেই তিনি বলে উঠলেন—"শীগ্গীরই জানবে বাছারা এয়ারোপ্লেন জিনিসটা ছেলেদের খেলবার জিনিষ নয়।"

আজ প্রায় দুবছর হ'তে চল্ল যুদ্ধ চলেছে। এক এক সময় মনে হয় যেন চিরকাল ধরে এই যুদ্ধ চলেছে, কোনদিন এর বিরাম হবে না। হায় ভগবান, কে আগে ভেবেছিল এই গোঁয়ার বোকা, অশিক্ষিত লোকগুলো এতদিন ধরে তাঁর এই সুশিক্ষিত সৈন্যদের দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখবে; আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুদ্ধাভিযানের সামনে এতোকাল টিঁকে থাকবে?

আজকাল মাঝে মাঝে মনে হয় এটা যেন তাঁর নিজের যুদ্ধ নয়। তাঁরই অঙ্গীকৃত

পুরস্কারের লোভে সাহায্যকরী সম্মিলিত মিত্র শক্তিরা যুদ্ধটা তাদের নিজেদের ব্যাপার করে নিয়েছে। আত্মশক্তিতে এদের সীমাহীন প্রত্যয় আর কি উদ্ধত মনোভাব।

এরা যে কতখানি অবজ্ঞা চোখে তাঁকে আর তাঁর স্বজাতীয়দের দেখে সেটুকু গোপন করবারও কোন প্রয়োজনীয়তা ওরা আজ অনুভব করে না। এই সাহায্যের প্রতিদানে তাঁর দেশের বহুমূল্য খনিগুলির দিকেই ওদের একমাত্র দৃষ্টি। লুটতরাজ ও বীভৎসতায় সমস্ত দেশটা ধ্বংস হতে চলেছে, কিন্তু তাতে ওদের কি এসে যায়? ওদের নিজের দেশ তো এটা নয়।

এই যে চারকোসের স্কুলের ওপরে বোমা ফেলার ব্যাপারটা। কি দরকার ছিল ওদের এটা করবার? কোন প্রাধান্য নেই জায়গাটার, সম্পূর্ণ অরক্ষিত, আর তাছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রের কত বাইরে। দু'শোর বেশী শিশুকেই শুধু হত্যা করা হ'য়েছে। হায় ভগবান—ওরা নিশ্চয়ই উন্মাদ!

বাইরে একখানা গাড়ী এসে দাঁড়াল। লম্বা একটি লোক, বৈমানিকের পোষাক পরা, গাড়ী থেকে নামল। রক্ষীরা সটান হ'য়ে দাঁড়িয়ে সামরিক সম্বর্দ্ধনা জানাল। ক্যাপটেন বেকার—সম্মিলিত মিত্রদলের বিমান বিভাগের অধিনায়ক।

জেনারেল তখনই ডেস্কে বসে কতকগুলো কাগজ পত্রে মন দেবার ভান করলেন। দরজায় একটা সাড়া দিয়ে আসবার সৌজন্যের বাহুল্য না করেই ক্যাপটেন বেকার ঠিক সেই মুহূর্তে ভেতরে ঢুকে পড়েন। কোনরকমে একটা স্যালুট করে ও বুটের গোড়ালী দুটো সশব্দে ঠুকে সে বল্ল—"এক্‌সেলেনসি।" জেনারেল বল্লেন "বসো ক্যাপটেন।"

এক্‌সেলেন্‌সি! ক্যাপটেনের উচ্চারণের ভঙ্গীটা অসহ্য লাগে, লোকটার গলার স্বরে যেন প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ কোথায় লুকিয়ে থাকে।

ক্যাপটেন বেকার বসল। লোকটির তীক্ষ্ণ, বহু ক্ষতচিহ্নের আভাষে ভরা কঠিন মুখ, বরফের মত শীলাভ চোখ, পুরু ঠোঁট আর শক্ত কাঁচা পাকা খোঁচা খোঁচা চুল। গোটা কয়েক কাগজ হেলাভরে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্ল—"কালকের আক্রমণের রিপোর্ট।" জেনারেল সে দিকে লক্ষ্য না করেই মৃদুস্বরে বল্লেন, "চারকোসের কথা—শুনেছি আগেই। আমার ধারণা ছিল, আমরা এটা স্থির করেছিলাম যে যেগুলো খোলা অরক্ষিত সহর, যার কোনো সামরিক বৈশিষ্ট্য নেই, সেগুলোর ওপরে আমাদের কোন আক্রমণ হবে না।"

"অ—হ্যাঁ। কিন্তু—"

"দু'শোর ওপরে শিশুদের হত্যা করা হয়েছে।" নিশ্চিন্তভাবে কাঁধদুটো একটু বাঁকিয়ে ক্যাপটেন বল্ল—"মনস্তত্ত্বমূলক আক্রমণ। এটা হচ্ছে সবচাইতে নতুন ও উৎকৃষ্ট সামরিক কৌশল।"

"আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, ক্যাপটেন বেকার।"

“কেন—দেখুন না, এতো খুব সহজ কথা। এটা কি সত্যি নয় যে যারা পেশাদার যোদ্ধা নয়, —যেমন ধরুন আপনার শান্ত্রী সৈনিকেরা—তারা কোন একটা উদ্দেশ্য একটা মহৎ কারণের জন্যে যুদ্ধ করে? নিশ্চয়ই করে! গৃহ পরিজন ও স্বদেশ, তাই নয় কি? যখন আমরা চাই যে তারা লড়ুক, এটা তো তাদের প্রত্যয় করাতেই হবে যে যার মূল্য তাদের কাছে সব চাইতে বেশী ঠিক সেইটেই আজ বিপন্ন। এটা ঠিক নয় কি?” একটু যেন অসহিষ্ণুভাবে জেনারেল বল্লেন—“তা বটে।” “হাঁ তাই। একজন মানুষ নিজের পরিবার ও স্বদেশের জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়। সে কখনই যুদ্ধে তার জীবন বিসর্জ্জন দেবার আকাঙ্খা নিয়ে যায় না, কখনোই নয়। কিন্তু সে জীবন দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই যায়, আর মনকে প্রস্তুত করে চতুর্দ্দিকে তার সঙ্গী যোদ্ধাদের জীবন বিসর্জ্জন চোখে দেখবার জন্যে। এটাই যুদ্ধ তা' সে জানে। তার সমস্ত মন পড়ে থাকে নিজের দেশ আর স্বদেশকে ঘিরে, তাদের কথা মনে করেই সে লড়াই করে চলে। কিন্তু যদি সে দেখে, যাদের জন্যে সে সমস্ত ত্যাগ করে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিচ্ছে তাদেরও প্রাণরক্ষা করতে পারছে না। তার মাতৃভূমি ছারখার হ'য়ে যাচ্ছে—তখন? সে তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে, তার সমস্ত শক্তিই যেন নষ্ট হয়ে যায়। এটা কি সত্যি নয়?”

“কিন্তু তাই বলে অসহায় শিশুদের হত্যা করা—” “ও,—কিন্তু ওইটেই তো হ'চ্ছে আসল কথা। সাধারণ একজন সৈনিক তার সঙ্গীদের মৃত্যু দেখতে সর্ব্বদাই অভ্যস্ত থাকে, কিন্তু অসহায় শিশু ও নারী, এদের কোমল দেহ ছিঁড়ে ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে দেখলে এক-মাত্র অত্যন্ত কঠিন হৃদয় সৈনিক ছাড়া কেউই অবিচলিত থাকতে পারে না। দুমড়ে পড়া ছিন্ন ভিন্ন ছোট্ট একটা দেহের যে একটা তীব্র আবেদন আছে এক্সেলেন্সি, তার শক্তি বড় বেশী, কঠিনতম দুর্দ্ধর্ষ হৃদয়কেও অসহায় বোধ করায়। যুদ্ধবিরোধী মূর্খ শান্তিকামীরা যাকে বলে ‘যুদ্ধের নিস্ফলতা' সেই ভাব তারও মনে জাগে। মনে করুন দু'শো ছোট্ট শিশুর কোমল ক্ষত বিক্ষত দেহ......”ক্যাপ্টেন নিজের কাঁধদুটো একটু কাঁপিয়ে ভাব প্রকাশের চেষ্টা ক'রে বল্ল—“সত্যি কথা বলতে কি আমার নিজেরও বড় বরদাস্ত হয় না। তবে কি জানেন, শত্রুকে নির্ব্বীর্য্য করতেই হবে—তাকে আত্ম-সমর্পণ করাতেই হবে, যেমন করে হোক।”

জেনারেল মুখ খুলতেই ক্যাপটেন যেন আন্দাজেই তাঁর আপত্তিটা এঁচে নিয়ে তীক্ষ্ণভাবে বল্ল—“এক্সেলেন্সি—আপনি এটা নিশ্চয়ই চান না যে আমার দেশ আপনার সঙ্গে সহযোগিতা বর্জ্জন করে, তার সাহায্য ফিরিয়ে নেয়?” জেনারেল পাথরের মূর্ত্তির মত ডেস্কের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ক্যাপটেন বেকার উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করে বল্ল—“তাহলে কালকে... আরও একটা আক্রমণ, এক্সেলেন্সি।”

জেনারেল প্রত্যভিবাদন করবার আগেই ক্যাপটেনের জুতোর খট্ খট্ শব্দ দরজার বাইরে মিলিয়ে গেল। অসহায়—ছোট্ট শিশুরা......চিন্তামগ্ন জেনারেলের মাথার ভেতরে চোখের সামনে ফুটে ওঠে ছোট্ট অনেকগুলো মুখ..... । ক্লান্তিতে মাথাটা টেবিলের ওপরে নুয়ে পড়ে।

চলেছে। ভালোমন্দের চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করবো না, কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা মানবত্বকে তারা স্বীকার করেছে, উঁচু-নীচু স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে। সকলকেই সাম্য ও স্বাধীনতা দেওয়ার এই যে প্রয়াস জগতের ইতিহাসে এ অপূর্ব, চিন্তা ও কর্মের জগতে এ নতুন আমদানী। সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্তরে যে ভেদ বৈষম্য ও পরাধীনতার কঠোর নিগড়, তাতে এক পক্ষ অনায়াসে অপরপক্ষের স্বাধীনতা হরণ করে চলেছে, আর্থিক অবস্থার তারতম্যে দুর্গতদের দুর্গতি অপরিসীম; স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার হোলেও সে সহজলভ্য সুখ ও সুবিধা হতে অধিকাংশই অকারণে বঞ্চিত, তাদের সাম্য স্বাধীনতার উন্মুক্তক্ষেত্রে আনবার দাবী করতে পারে রাশিয়া। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে আমরা সাম্য স্বাধীনতা ও মৈত্রীর বাণী প্রথমে শুনতে পাই, সে আহ্বান জনগণের চিত্তকে আলোড়িত করে তুলেছিলো নিঃসন্দেহ। কিন্তু জীবনের প্রতিদিনের কর্মক্ষেত্রে সাম্য ও স্বাধীনতাকে বহন করে আনা ও কার্যকরী তোলা সে যুগের মনীষীদের চিন্তার অগোচর ছিলো। সোভিয়েট-রাষ্ট্রই সর্বপ্রথমে সাম্য ও স্বাধীনতার বাণীকে সফল করে তুলেছে অসংখ্য ছোট বড় কার্যব্যপদেশে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সমাজে ও রাষ্ট্রে। বঞ্চিত উপদ্রুত জনসাধারণকে আত্মসংস্থ ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার সুযোগ দানে নতুনতর সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করে তোলার দাবী রাশিয়ার। কাজেই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীবৈষম্য দূর করবার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে নারীসমাজের প্রতি সমভাবাপন্ন দৃষ্টি দেবার প্রয়াসও এলো। সোভিয়েট-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা লেনিন নারীসমাজ ও তাদের প্রয়োজন সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে বিবেচনা করেছিলেন। জগতের ইতিহাসে একমাত্র রাশিয়াতেই নারী পুরুষের সমশ্রেণীভুক্ত হতে পেরেছে, তারাই কেবল সাম্যের বাণীকে কার্যে পরিণত করেছে।

বর্তমানে জগতের অভ্যুদয়শীল জাতির মধ্যে রাশিয়া অন্যতম। কিন্তু সে ইতিহাস বেশীদিনের নয়। বিংশ শতাব্দীর পূর্বে রাশিয়ার এত অবস্থা-বৈলক্ষণ্য দেখা যায়নি। পিটার দি-গ্রেটের সমকালেই এবং তারই চেষ্টায় রাশিয়াতে প্রথম ইউরোপীয় সভ্যতার আগমন হয়. শিল্প-জগতে বিপ্লব ও পশ্চিমী সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রবর্তন তিনিই করেছিলেন। এসব অতি পুরাতন কথা। জারের আমলে রাশিয়ার কি অবস্থা ছিল, পরবর্তী কালে বলশেভিক বিপ্লবের পর যে অবস্থার উদ্ভব হোল, তাতে আকাশ-পাতাল তফাৎ। আমরা সোভিয়েট রাজ্যের অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা না করে শুধু নারীসমাজের দ্রুত-পরিবর্তনশীলতা ও সর্বব্যাপিত্ব নিয়ে অবতারণা করছি।

বলশেভিক বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ার নারী-সমাজের কী অবস্থা ছিল, সমাজে রাষ্ট্রে ও পরিবারে তাদের কতটুকু অধিকার, কতটুকু দাবী ছিল? বহুযুগসঞ্চিত পরাধীনতা ও পরবশ্যতা—নারী ছিল প্রতি পদক্ষেপে পুরুষের হস্তে ক্রীড়নক স্বরূপ। রাষ্ট্রব্যবস্থায় তার অধিকার নেই, নাগরিক জীবনে নারীর সামান্য পরিমাণ সুখ সুবিধার দাবী নেই, পরিবারে স্বামীর গৃহে তার আসন হীনতম, স্বাধিকারের আলোতে দীপ্তিমান নয়, সেখানে কেবল কার্পণ্য সঙ্কোচ ও আত্মাবমাননা। সমাজের

রুষ-মেয়েদের পৌরুষক্রীড়া : উক্রেনের মেয়েরা নিখিল-রুষীয় শিকার প্রতিযোগিতায় (মস্কো শহরে)

সকল অবস্থার নারীদের একই আসন,—যারা কিছুটা পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্যের ভিতরে আছে বা যারা অভিজাতবংশীয়া অথবা দারিদ্র্যপ্রপীড়িতা সমাজের নিম্নস্তরের, সকলেই সমদুঃখভাগিনী। নারীর স্বাধীন সত্ত্বা, স্বতঃস্ফূর্ত অন্তরের পরিচয় কোথাও প্রকাশ করার সুবিধা নেই। নারী তো মানুষ

মোটর-সাইকেলে মহিলা-চ্যাম্পিয়ন

নয়, তার দেহে মনে কোথাও মনুষ্যত্বের স্থান নেই। সে শুধু খেলার পুতুল, বিলাসের সঙ্গিনী।—'a chicken is not a bird and a woman is not a person.'

আজ সে অবস্থা বদলিয়ে গেছে, বিপ্লব এসেছে—সমাজ জীবনে, পরিবারে, রাষ্ট্রে: এসেছে

আশার বাণী, নতুন যুগের আলো, নবতর ও সুন্দরতর জীবন পথের যাত্রী তারা—যদিও বাঞ্ছিত দেশ এখনো বহুদূরে।

প্রসিদ্ধ বিপ্লবী লুনাচারস্কি (Lunacharsky) বলেছেন, "Woman will first attain justice, will first be happy and free when in conjunction with men she will

লেনিনগ্রাডের এক রুটির কারখানায় কর্মরত মেয়ের দল—পরিপাটী পোষাক-পরিহিত।

build the Socialist State. In this task labouring women must stand side by side with men." নারীর প্রতি সর্বাগ্রে ন্যায় বিচার করা উচিত, সে সুখী হোক, স্বাধীন হোক, তবেই পুরুষের সঙ্গে সে গড়বে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র। এ কার্যে কর্মী নারী এসে দাঁড়াবে পুরুষের পাশে। সুতরাং সোভিয়েট রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক, সাম্য স্বাধীনতা সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও এলো নরনারী-নির্বিশেষে সমানাধিকার। লেনিনও বলেছেন—"Without millions of women with us we cannot exercise the

dictatorship of the proletariat." অসংখ্য নারীর সাহায্য ব্যতীত আমরা প্রলেটারিয়েট শাসিত রাষ্ট্র গড়তে পারবো না।

কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা অর্থনৈতিক সমস্যার—বর্তমান সমাজব্যবস্থার ধন-মূলক বৈষম্যে। নাগরিক ও রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা নারীর যতই থাকুক, আর্থিক স্বাধীনতা যদি না থাকে নারী চির-পরাধীন থাকবে। নারীকে তার অধিকার দাবী করবার সর্বপ্রকার সুবিধা দিতে হবে।

ষ্টেলিনগ্রাডের এক ট্রাকটর ফ্যাক্টরিতে একটি জর্জীয় মেয়ে কাজ করছে : কঠিন শিল্পকাজেও এরা পশ্চাৎপদ নয়

সত্যি সত্যি যাতে পুরুষের সমপর্যায়ভুক্ত হয়, সর্বক্ষেত্রে যদি পুরুষের সঙ্গে এসে দাঁড়ায় তবেই নারী বহুযুগসঞ্চিত হীনতা ও পরাধীনতা হতে মুক্ত হবে। সোভিয়েট ইউনিয়নে সে চেষ্টাই চলেছে, সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টায় নারী সাধারণকে ব্যবসায়ক্ষেত্রে ও সাধারণ কর্মস্থলে আহ্বান করা হয়েছে। ১৯১৮ সনে নারীবাহিনী গঠিত হয়। ঐ বছরই নভেম্বর মাসে সর্ব এশিয়া নারী প্রোলেটারিয়েট ও কৃষক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন সুরু হয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রের সর্বত্র

নারী বাহিরের কর্মক্ষেত্রে যোগ দিয়েছে ও কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছে। আমাদের দেশের জনসাধারণের ধারণা ছিল নারী বাহিরের কাজের অনুপযুক্ত, তাদের শরীর ও মন বহির্জগতের আলো বাতাস অপেক্ষা ঘরের কোণে থাকারই উপযুক্ত, গৃহকর্মই তাদের শরীরের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সোভিয়েট-রাষ্ট্রের ব্যবস্থায় দেখা গিয়েছে, উপযুক্ত শিক্ষা ও অভ্যাসে

প্রথম ভোট

১৯৩৭ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নে পার্লামেন্টারী নির্বাচন-প্রথা প্রবর্তিত হয়;
একটি মেয়ে এই ভোট দিতে যাচ্ছে

নারী সকল কর্মে যথোচিত দক্ষতা লাভ করতে পারে। এ কথা অবশ্য একেবারে অস্বীকার করতে পারা যায় না, নারীদেহের কোমলতার দরুণ সে পুরুষের মতো অত্যধিক পরিমাণে ভারবহনে অক্ষম হবে। আমাদের গৃহপালিত পশুগুলি মানুষ অপেক্ষা অধিকতর ভার বহনে সমর্থ, সুতরাং ভারবহনক্ষমতাই একমাত্র অত্যাবশ্যকীয় গুণ নয়। মোটকথা রাশিয়াতে প্রমাণিত হয়েছে যে 'women workers are by no means inferior to men in individual output—and in fact often surpass them in this respect.'

বাহিরের জগতে নারীর এই বিস্তৃতি—তাদের জীবনকে স্বাস্থ্যপূর্ণ আনন্দময় ও কর্মমুখর করে তুলেছে, সোভিয়েট-রাষ্ট্রে এমন কোন কাজ নেই যা নারীহস্তের দানে সুন্দর হয়ে ওঠেনি। শাসন-পরিষদেও রাশিয়াতে নারী-সমাজ সাফল্য দেখিয়েছে, তাই বিচারাধিপতির আসনেও নারীকে পাওয়া যায়।

কিন্তু বহির্মুখী দৃষ্টিতে রাশিয়ার সমাজ-জীবন অসুন্দর ও অস্বাস্থ্যকর হয়নি, অবশ্য একথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। গোড়াপত্তনকালে রাশিয়াতে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা

বিচারকের আসনে রুষীয় নারী

গিয়েছিল, সমাজ-ব্যবস্থায় নানা অসঙ্গতি দেখা দিয়েছিলো, কিন্তু বর্তমান রাশিয়াতে প্রথম উন্মাদনার স্রোত শান্ত হয়ে সমাজ-জীবনকে নতুনতর পথে চালাবার চেষ্টা চলেছে। পূর্বের সমাজব্যবস্থা, বিবাহ-বিধি, রাষ্ট্র-পরিচালনা পদ্ধতিতে তারা নতুনতর সংস্কারের সুর লাগিয়েছে। একথা সত্যি, "Before the Soviet woman stretches the boundless horizon of a happy, healthy life."

সমাজতন্ত্র—রূপ ও স্বরূপ

অমল রায়

আজকের দিনে মানুষের সমস্যা শুধু আধিভৌতিক নয়, আধ্যাত্মিকও। বিংশ শতাব্দীর এই পৃথিবী-ব্যাপী দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার দারুণ ঝঞ্ঝাবর্তে একথা কানে একটু অস্বাভাবিক শোনাতে পারে, কিন্তু একে অস্বীকার করার উপায় নেই। মানুষের অন্তর্জীবনে এমন দ্বন্দ্ব ও সংশয় আর কোন দিন আসে নি। অব্যবস্থ অনিশ্চয়তার মধ্যে মানবচিত্ত হাতড়ে বেড়াচ্ছে—সোয়াস্তি নেই, মীমাংসা নেই। সত্যি, মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনে ভাঙন ধরেছে। মানুষের বাইরের দৈনন্দিন জীবনটাই ধ্বসে পড়ছে না, ভিতরে ভিতরে আগ্নেয়-গিরির গলিত লাভা বহিরুদ্গমের অধীর প্রতীক্ষায় দিন গুণছে।

ভারতের মাটিতেও এই সমস্যা। আমাদের পূর্বজগণ যে নিরুদ্বেগ অলসমন্থর শান্ত জীবন যাপন করে গেছেন, আজ আমাদের কাছে তা স্বপ্ন। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, দীঘিভরা মাছ—এই শান্তস্নিগ্ধপল্লী-জীবনচ্ছবি আমাদের স্মৃতিপট থেকে মুছে গেছে। যা গেছে তার জন্যে আপশোষ করে লাভ নেই। কিন্তু সমস্যা-পীড়িত বর্ত্তমানের গতি কোন পথে, অমীমাংসিত বর্ত্তমানের মীমাংসার সন্ধান কোথায়?

আজকের পাশ্চাত্য জগতে এই সমস্যার মীমাংসায় অগ্রসর হয়েছে সোস্যালিজম বা সমাজতন্ত্রবাদ।

ইংরেজ মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল লিখেছেন, সোস্যালিজম একটি প্রবণতা (Tendency) মাত্র, সুনির্দ্দিষ্ট মতাবলী নয়। বস্তুতঃ সমাজতন্ত্রবাদকে আমরা কতকগুলো মত বা ধরা-বাঁধা আইন-কানুনের মধ্যেই আবদ্ধ রাখতে পারি না। এবং পারি না বলেই বহু বিচিত্ররূপে এর বিকাশ ও পরিণতি দেখতে পাই। রাসেল আরও স্পষ্ট করে লিখেছেন, সমাজতন্ত্রবাদ মানে জমি ও মূলধনের ওপর সমাজের আধিপত্য স্থাপন।

সোস্যালিজম একটি গতি এবং আধুনিক জগতে এই গতি ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু ও শক্তিশীল। এ এক জীবন্ত প্রবাহ, বর্ত্তমানকে এ ভাঙবে এবং গড়বে অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

সোস্যালিজমের ব্যাখ্যার অন্ত নেই। কম-সে-কম দু'শ' রকম ব্যাখ্যা এর হয়েছে। কিন্তু এর মূলসূত্রে কোথাও প্রভেদ নেই। বর্ত্তমান সমাজ ধনতান্ত্রিক—ব্যক্তিতন্ত্র এর ভিত্তি। অর্থাৎ বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় যে-কোন ব্যক্তি যথেচ্ছ অর্থের অধিকারী হতে পারে এবং এর ফলে সমাজে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সমস্ত অর্থ পুঞ্জীভূত হচ্ছে, আর কোটি কোটি নিপীড়িত মানবের দারিদ্র্য-অপমানে ধরণী অভিশপ্ত হচ্ছে। সমাজতন্ত্র এই প্রথার মূলোচ্ছেদ চায়; ব্যক্তির যথেচ্ছ অধিকারের

পরিবর্ত্তে সমাজের আধিপত্য চায়। এক কথায় সমাজতন্ত্র চায়, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদির ওপর সমাজের অধিকার এবং উহার আয় ন্যায্য ভাবে সকলের মধ্যে বন্টন।

এর ফলে ধনী ও গরীবের মধ্যে যে অতলস্পর্শী আত্মধ্বংসী ব্যবধান তৈরী হয়েছে, তা ঘুচে যাবে। জীবিকা ও সংস্কৃতি হতে মজুরদের অন্যায় বঞ্চনা দূর হবে। মানুষ মনুষ্যত্বের মর্যাদা পাবে, অর্থের মর্যাদা নয়। বর্তমান সমাজে অর্থবান আদৃত হয়, আর গুণবান্ হয় উপেক্ষিত। এই ঘৃণিত বর্বর ও মনুষ্যত্ব-বিধ্বংসী প্রথা বিলুপ্ত হবে। মানুষে মানুষে এই ভেদ-বৈষম্য বিদূরিত হলে সঙ্গে সঙ্গে দূর হবে বর্তমান সামাজিক ও আর্থিক বিপর্যস্ত পরিস্থিতি, মজুরের জীবনের শোচনীয় অবনতি, ধনীদের ব্যসন-বিলাস ও অলস পরভৃতিক দিনযাত্রা, আর্ট-ও-রুচিবিগর্হিত শিল্পপ্রয়াস, অপব্যয়, বুভুক্ষা, আর দূর হবে অগণিত শ্রমজীবীর মর্মভাঙা করুণ আর্তনাদ এবং ধনিকের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী নির্মম সংগ্রাম।

সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তি অর্থনৈতিক। বস্তুতঃ সমাজতন্ত্রবাদকে আমরা একটি অর্থনৈতিক মতবাদই বলব। কারণ ইহা অর্থ-নৈতিক সমস্যার সমাধানে প্রয়াস পেয়েছে; শ্রমজীবীর সাথে ভূমি ও মূলধনের যে সম্পর্ক, সমাজতন্ত্র তা-ই বদ্‌লে দেবে। অবশ্য এটা সত্যি কথা, এতবড় একটা অর্থ-নৈতিক পরিবর্তন সমাজ-দেহে ঘটলে, অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানেও রূপান্তর ঘটবে।

এখানে একটা কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অনেকে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে দর্শন ও সমাজতত্ত্বকে অঙ্গাঙ্গী জড়িত করেন। এককালে যেমন সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে ক্রীশ্চানধর্ম্ম জড়িত হয়েছিল, আজকাল আবার ধূয়া উঠেছে, জড়বাদ বা মেটেরিয়ালিজম বিজড়িত না হলে নাকি সমাজতন্ত্রবাদ সম্ভবেই না। দুই মতই দুই সীমান্তস্পর্শী। আগেই বলেছি, সমাজতন্ত্র নিছক অর্থনৈতিক মতবাদ। কিন্তু উনবিংশ শতকের জড়বাদ-প্রধান বিজ্ঞানযুগের প্রভাবে কার্ল মার্কস প্রচার করলেন, কম্যুনিজম বা সায়েন্টিফিক সোস্যালিজম এর সঙ্গে জড়বাদ ওতপ্রোতভাবে অভিন্ন সম্পর্কে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। শুধু তা-ই নয়। মার্কসীয় সোস্যালিজমের সঙ্গে জড়বাদ যেমন জড়িত, অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানও তেমনি অঙ্গাঙ্গী সম্পৃক্ত। অর্থাৎ মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদের অর্থনীতি, ধর্ম, দর্শন, বিবাহ, পরিবার প্রথা প্রভৃতি একটির সঙ্গে অপরটি সহসম্পর্কিত (co-related), একটি ছাড়া অন্যটির পরিকল্পনা সম্ভব নয়। স্থূল কথা, মার্কসবাদ অখণ্ড, অবিভাজ্য।

এখন কথা এই, মার্কসবাদ তো স্বয়ম্ভূ নয়, উহা বুদ্ধিনির্মাণ। কার্লমার্কস তদানীন্তন অর্থনীতিবিদ্ রিকার্ডো থেকে নিলেন অর্থনৈতিক মতবাদ, হেগেল ও ফয়ারবাখ থেকে নিলেন দর্শনের মতবাদ, মর্গান হতে নিলেন সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ এবং নিজের মনীষা-সহায়ে এদের একত্র করে গড়ে তুললেন অদ্যকার মার্কসবাদ।

কাজেই যা বুদ্ধিনির্মাণ, তাকে খণ্ডিত বা বিযুক্ত করা সম্ভব নয় একথা অযৌক্তিক (irrational) ও অনৈতিহাসিক (unhistorical)। সমাজের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান অঙ্গাঙ্গী সম্বদ্ধ একথা (organic theory) মার্কসীয়গণ নিজেরাও স্বীকার করেন না। জড়বাদী না হয়েও

মার্কসীয় শ্রেণী-সংগ্রামের আস্থা অনেক অধ্যাপকেই রাখেন, আমরা দেখি। ইংলণ্ডের বুড়ো ল্যান্সবেরি একজন গোঁড়া ক্রীশ্চান হয়েও, সমাজতান্ত্রিক নেতা। রাশিয়ায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ পেলেও পরিবার ও বিবাহ প্রথার মর্যাদা লুপ্ত হয়নি। অসভ্য জাতিদের মধ্যে একই সামাজিক অবস্থা বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিবেশে দৃষ্ট হয়। কাজেই দেখা যায়, সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে কোন বিশেষ দার্শনিক বা সমাজতাত্ত্বিক মত যুক্ত করার অপরিহার্যতা নিতান্তই গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা মনে করেন, সমাজতন্ত্রবাদী হলে ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতি বিসর্জন দিতে হবে, তাদের ভুল।

য়ুরোপে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভবের মূলে আমরা দুটি প্রকাণ্ড বিপ্লব দেখতে পাই: একটি শিল্প-বিপ্লব (Industrial Revolution), অপরটি ফরাসী বিপ্লব। শিল্প-বিপ্লব এনে দিল সমাজের কাঠামোর পরিবর্তন, ফরাসী বিপ্লব দিল ভাবজগতের আমূল পরিবর্তন। এই দুই মহাবিপ্লবের সুসন্তান সমাজতন্ত্রবাদ। ফরাসী বিপ্লবের অবদান যুক্তিবাদ ও চিন্তার স্বাধীনতা ছড়িয়ে পড়ে দেশে দেশে নূতন নূতন সমাজতন্ত্রবাদ সৃষ্টি করল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংলণ্ডে রবার্ট আওয়েন (Roberrt Owen) শিল্প-বিপ্লবের আওতায় এবং ফ্রান্সে সেন্ট সাইমন (St. Simon) ও ফুরিয়ার (Fourier) ফরাসী বিপ্লব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমাজতন্ত্রবাদের দুই ধারার প্রবর্তন করলেন। এঁদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদের ঐতিহাসিক যুগ শুরু হল। আগে বলেছি, বিভিন্ন সমাজতন্ত্রবাদী দল মূল সূত্রে একমত হলেও, ভাবীসমাজের গঠন ও সমাজ-বিপ্লবের রূপান্তরের পন্থা সম্বন্ধে পরস্পরের মতানৈক্য আছে। অর্থের বণ্টন ন্যায্য হবে, একথা সবাই স্বীকার করেন। কিন্তু এই ন্যায্যতা সম্বন্ধে ধারণার প্রভেদ আছে। সেন্ট সাইমনের দল বলেন, প্রত্যেক মানুষ সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে ও তদনুরূপ পুরস্কৃত হবে। ফুরিয়ার বলেছেন, প্রত্যেককেই জীবনধারণের পরিমিত অর্থ দিতে হবে এবং তারপর বাকী অর্থ শ্রম, বুদ্ধি ও মূলধনের পরিমাণ অনুসারে বণ্টন হবে। আবার জর্মনীর সোস্যালডেমোক্রাট দল ১৮৭৫ সালের গোথা প্রোগ্রামে বলেছেন, প্রত্যেককে প্রয়োজন-অনুরূপ অর্থ দিতে হবে, কিন্তু প্রত্যেকে কাজ করতে বাধ্য থাকবে।

ফরাসী দেশে সেন্ট সাইমন ও ফুরিয়ারের পরবর্তী প্রতিনিধি দেখতে পাই প্রুধোঁ ও লুই ব্লাঙ্ক, ইংলণ্ডের আওয়েনের প্রতিনিধি দাঁড়াল ক্রীশ্চীয় সোস্যালিষ্টগণ। এঁদেরই প্রভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত চলল।

এর পর থেকে সমাজতন্ত্রবাদের ইতিহাসে ইঙ্গ-ফরাসী যুগ শেষ হয়ে শুরু হল জর্মন-রুষীয় যুগ। এই যুগের প্রধান প্রতিনিধি জর্মন কার্ল মার্কস ও রুষীয় বাকুনিন: একজন কম্যুনিজমএর প্রবর্তক, অপর জন নৈরাজ্যবাদ বা এনার্কিজমের গুরু। ঊনবিংশ শতকের শেষার্দ্ধ এই দুই ব্যক্তিত্বের ও মতবাদের তুমুল দ্বন্দ্বে মুখরিত ছিল। এই আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসানে জর্মনীতে প্রবল হল সোস্যাল-ডেমোক্রাট ও রিভিশনিষ্ট দল, ফরাসীতে মাথা তুলল সিণ্ডিক্যালিজম, ইংলণ্ডে দেখা দিল গিল্ড্-সোস্যালিজম ও ফেবিয়ান্ মতবাদ। মহাযুদ্ধের অবসানে রুষবিপ্লবের পরে রাশিয়ায়

প্রবল হল মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ। বর্তমান দুনিয়ায় আমরা সমাজতন্ত্রবাদের এই বিভিন্ন মতই প্রাগসর দেখতে পাই। বারান্তরে আমরা ইহাদের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করব।

সমাজতন্ত্রের একটি সহজ আবেদন আছে—সে সাম্যের বাণী। মানুষের মর্মস্থলে তা সাড়া জাগায়। সমাজতন্ত্র নিছক অর্থনৈতিক হলেও, এর সংস্পর্শে সমাজের সরসীনীরে শতদল ফুটে ওঠে—মানুষ পায় স্বস্তি ঋদ্ধি মুক্তি। তার প্রতিটি প্রতিষ্ঠান নূতন প্রাণ পেয়ে নব-আদর্শে জীয়িয়ে ওঠে।

সমাজতন্ত্র সমাজে আনে পরিপূর্ণ গণতন্ত্র, মানুষের নৈতিকদৃষ্টি করে উন্নত উদার, শিল্পে ও আর্টে আনে সৌন্দর্য ও প্রাণের ছোঁয়াচ এবং সুযোগ তৈরি করে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের। মানুষে মানুষে সাম্য এবং সমষ্টি ও ব্যষ্টিতে সামঞ্জস্য সমাজতন্ত্রেই সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যষ্টি খর্ব বা নিপীড়িত হয় না, সহস্রদল মেলে বিকশিত হয়ে ওঠে। তখন মানুষ নিঃস্বার্থ-দৃষ্টিতে মানুষের জন্য দিনযাপন করে, স্বার্থের তাগিদ তার লোপ পেয়ে যায়।

বিংশ শতাব্দীতে আজ দর্শন ও বিজ্ঞান জড়বাদের আওতা ছেড়ে অধ্যাত্মবাদের রাজ্যে প্রবেশ করেছে। তাই দেখতে পাই, উনবিংশ শতকের জড়বাদ সমাজতন্ত্রকে যে-ভাবে প্রভাবিত করেছিল, আজ সে বন্ধন শিথিল হয়ে এসেছে। জড়বাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ তো অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক বলে পরিত্যক্ত হয়েছেই, বরং তৌলদণ্ড আবার ঝুঁকেছে অধ্যাত্মবাদের দিকে। মানুষের চিন্তায় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে আজকের অধ্যাত্ম-দর্শনের প্রভাবই পরিলক্ষিত হচ্ছে। সমাজতন্ত্র জড়বাদ-নির্মুক্ত হচ্ছে বলে যুক্তিশীল প্রগতিপন্থীর দল সোয়াস্তি পেয়েছে।

হাসছে রাজা, হাসছি মোরা তাই

ক্ষিতীশচন্দ্র রায়

কে বলেরে হাসছি মোরা—
এযে শুধুই জ্বালায় জ্বলা।
হাসছে ওযে পূর্ণ শশী,
পূর্ণ যে ওর ষোলো কলা।
চাঁদের হাসি সুধার ঝরা,
সবাই ওরে খোঁজে,
মোদের বুকে ব্যথার জ্বালা
কেউ বা তাহা বোঝে!
ধরার কবি ওর দরদী
ছন্দ গাঁথে নিরবধি
পাগল প্রেমিক গাহে ওরি গান,
হোক্‌না কেন বিশ্ব-প্রেমিক,
মোদের তরে কাঁদেনা তার প্রাণ।
কারো মনের একটি কোণে
মোদের তরে ঠাঁই
নাই যে কভু নাই;
আমরা হাসি, আমরা হাসি
শুধু হাসির জ্বালায় জ্বলে যাই।

সিংহাসনে সগৌরবে
হাসছেন সম্রাট,
রাখতে বজায় তখন সবার ঠাঁট
রাখতে তখন সঙ্গতি-তাল
পারিষদের হাসতে হবে মুখে
যতই ব্যথা বাজুক তার বুকে!

কান্না যতই উঠুক কণ্ঠ ছাপি'
রাখতে হবে চাপি'
অপমানের অভিমানের
দুঃসহ সব ব্যথা
সদ্যোমৃত পুত্র মুখের
দুইটি চরম কথা
ভুলতে হবে সব
সভার সাথে সমান সুরে
তুলতে হবে হাস্য কলরব ;
নইলে যে তা'র অভদ্রতা হবে
সবাই তাহা কবে।
সভার হবে ভীষণ অপমান
রাজার হৃদয় রোষে বহ্নিমান।
শাস্তি তাহার কঠিন অতিশয়.
শুনতে লাগে ভয় —
অপরাধীর পেতেই তাহা হবে।
রাজসভার মঞ্চ হতে
ফেলবে তারে ছুঁড়ে
অনন্ত কাল জুড়ে
নীচে-নীচে, আরো নীচে
পড়তে সে যে রবে!
চাঁদের সভায় তারা
তাইতো হাসে অমন হাসি
মৃতের হাসির পারা।

আমাদেরো অমনি দশা ভাই
হাসছে রাজা, হাসছি মোরা তাই।

সাম্রাজ্যবাদ হতে সমাজতন্ত্র

সুনীলকুমার দাস

আঁধারে আঁধারে দিঙ্‌মণ্ডল ছেয়ে গেছে, তারই মাঝে নীরবে ছুটে চলেছে বিপ্লবীর দল। সেনা-বারিকে ঢুকে নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে একখানি চাপাটী আর একটী কমল। সিপাহীরা আদরে ধরে নেয় দুহাত তুলে আর গর্জে ওঠে সহস্র সঙ্গীনের গভীর নিনাদ। দেশময় ছড়িয়ে পড়ে সিপাহী-বিপ্লবের মহাপ্রলয়ঃ ১৮৫৭ সালের গণ-জাগরণ।

পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালের এই প্রথম গণ-অভ্যুত্থান নির্মমভাবে এ নিষ্পেষিত হয়েছিল। আজও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের কাছে সিপাহী-বিপ্লবের প্রতীক চাপাটী ও কমল হেয়ালি হয়েই রয়েছে। কিন্তু আমরা জানি, ভারতের অন্তরের এই দুই সম্পদঃ চাপাটী তার আধিভৌতিক জীবন (Life Temporal), কমল আধ্যাত্মিক (Life Spiritual)। নবাগত পাশ্চাত্য শাসনে এ দুয়ের কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এসেছিল: তারই প্রতিবাদ ১৮৫৭ সাল।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র

সেই যে শুরু হল সংগ্রাম, আজও তার পরিশেষ নেই। অক্লান্ত গতিতে চলছে জাতির মর্ম-ছেঁড়া মুক্তি-সংগ্রাম।
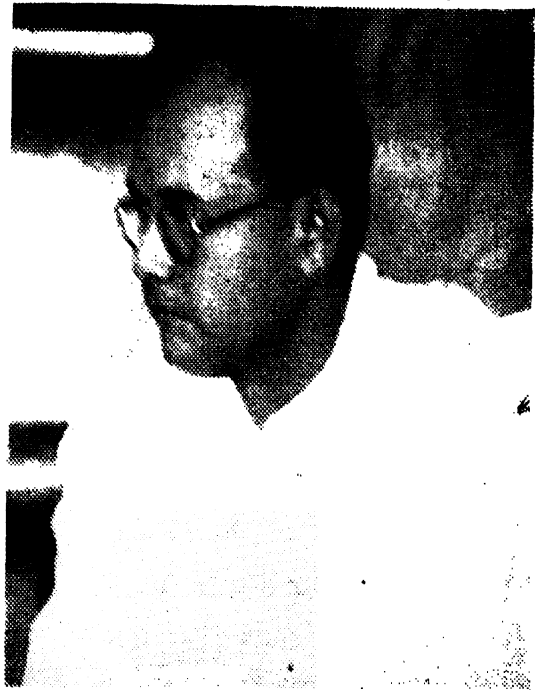
ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারত-ইতিহাস ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের ইতিহাস: ভারতবাসীর বুক-ফাটা তপ্তনিঃশ্বাস আর হাহাকারের কাহিনী। অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ বণিকদলের হাতে

ভারতের সোনার সিংহাসন হেলায় হেলায় চলে গেল : "অহো কে কহিবে সে সুদীর্ঘ কথ সমসিন্ধু অপার অগাধ ব্যথা।"

বর্তমান ভারত-ইতিহাসে আমরা তিন স্তর দেখতে পাই : প্রথম সাম্রাজ্যবাদের যুগ, দ্বিতীয় জাতীয়তার যুগ, তৃতীয় সমাজতন্ত্রের যুগ।

বিগত শত বৎসর ধরে ভারতের মাটীতে যে সাম্রাজ্যবাদের লোহার বনিয়াদ গড়ে উঠেছে, তারই বুক চিরে জাগল জাতীয়তার মর্মবেদনা। '৫৭ সালের বিপ্লবের পর থেকেই প্রদেশে প্রদেশে কবির দল স্বদেশ ও স্বাধীনতার করুণ-গীতি গেয়ে উঠলেন। বাংলায় সত্যেন্দ্রনাথ (ঠাকুর) গাইলেন, "গাও ভারতের জয়", রঙ্গলালের কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল—"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়?" এর পর হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকের দল জাতীয়তার উদ্বোধন গীতি গাইলেন। ইহাই জাতীয়তার ইতিহাসে সাহিত্যিক জাগরণের যুগ : এই যুগকে আমরা incubation period বলতে পারি। ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যেও এ সময়ে জাগরণের গীতি ধ্বনিত হয়ে ওঠে। উর্দু সাহিত্যের হালীর কণ্ঠে গীত হল, "হুব্-উল্-ওয়াতন হ্যায় নাম ও নেশাঁ হমারা" (স্বদেশপ্রেমই আমাদের নাম ও নিশানা)।

১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস—কালক্রমে যা ভারতের শ্রেষ্ঠ ও পৃথিবীর বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। '৮৫ সালের পূর্বে প্রদেশে প্রদেশে কয়েকটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল : বাংলায় ছিল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, বম্বেতে প্রেসিডেন্সী এসোসিয়েশন, মাদ্রাজে মহাজনসভা। শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে সংঘবদ্ধ হবার যে প্রেরণা এসেছিল, তাতে প্রত্যক্ষ সহায়ক হলেন জনকয়েক সহৃদয় ইংরেজ। এঁদের মধ্যে এ. ও. হিউম সাহেবের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য।

'৮৫ সালের কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হল বম্বেতে এবং প্রথম সভাপতি হলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonerjee)। '৮৫ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস আবেদন-নিবেদনের থালা বহন করেই এসেছে। দেশের সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিতদের মধ্যেই তখন কংগ্রেসের বিতর্ক ও প্রস্তাব আবদ্ধ ছিল—মধ্যবিত্ত ও জনসাধারণের সঙ্গে যোগ ছিল সামান্যই।

১৯০৫ সালে ঘটল ভারতের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনা বঙ্গ-বিভাগ—জাতীয় আন্দোলনে এনে দিল direct actionএর যুগ। আবেদন-নিবেদনের সনাতন-প্রথা পদদলিত হল, জাগল তুমুল আন্দোলন—বাংলার স্বদেশী-আন্দোলন সারা ভারতে বৈদ্যুতিক প্রেরণা হান্‌ল। সমগ্র জাতির বজ্রপণের কাছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে মাথা নোয়াতে হল : দাম্ভিক কার্জনের "settled fact" সুরেন্দ্রনাথ-বিপিনচন্দ্র তথা বাংলার জনশক্তির প্রাণ-প্রয়াসে "unsettled" হল। রুষীয় সাম্রাজ্যবাদ নব-অভ্যুত্থিত জাপানের হাতে যে লাঞ্ছনা পেল, বাংলার নব-জাগ্রত জাতীয়তার নিকট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ততোধিক অপদস্থ হল।

সোফায় শায়িত অবস্থায় রাষ্ট্রপতি বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশনে বক্তৃতা করিতেছেন

এই সময় হতেই জাতীয়তাবাদের উগ্র প্রকাশ বাংলা ও মারাঠায় দেখতে পাই। কংগ্রেসেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। জাতীয়তাবাদী চরমপন্থী (extremist) নেতাদের সঙ্গে লক্ষ্য ও কর্ম্মপন্থা নিয়ে মডারেট বা নরমপন্থীদের (moderate) বিভেদ সূচনা হল। ১৯০৭ সালের সুরাট কংগ্রেস এরই ফল। জাতীয়তাবাদী তিলক, অরবিন্দ, লাজপত রায় একপক্ষে, অপরদিকে সভাপতি ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বানার্জি, গোখেলে প্রমুখ কংগ্রেসের বনেদী নেতার দল। কংগ্রেস এই প্রথম দ্বিধা-বিভক্ত হল। গোলমালে সুরাট কংগ্রেস ভেঙে গেল। নব-জাগ্রত জাতীয়তাবাদীরা কংগ্রেসের সংশ্রব ত্যাগ করলেন—কংগ্রেস মহাসমর পর্য্যন্ত মৃতপ্রায় হয়ে রইল। এ সময়ে বাংলায় বিপ্লব-আন্দোলন ও ডাঃ এ্যানি বেসান্তের হোম রুল বা স্বায়ত্ত-শাসন আন্দোলন চলেছে।

১৯১৫ সালে জাতীয় দল কংগ্রেসে পুনরায় যোগদান করেন। এবং এর পর থেকে কংগ্রেসে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের আধিপত্য বেড়ে গেল অসম্ভব রকম, নরমপন্থীরা সরে গিয়ে আলাদা দল গড়লেন। ১৯২০ সাল থেকে কংগ্রেস গণ-আন্দোলনের ভিত্তি পত্তন করলেন। যে প্রতিষ্ঠান ও যে চিন্তাধারা এতদিন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজে আবদ্ধ ছিল, তা ভারতের নগ্ন দরিদ্র জনগণের প্রতিভূ হয়ে দাঁড়াল: কংগ্রেস ও স্বরাজ লোকের মুখে মুখে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে গেল। মহাত্মা গান্ধীর বিদ্যুৎস্পর্শে সমগ্রভারতে এক উত্তাল-তরঙ্গ-প্রবাহ ছুটে চলল।

মহাসমরের অব্যবহিত পরেই ভারতকে স্বায়ত্ত-শাসন দানের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, রাউলাট আইন প্রবর্ত্তন, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি ঘটনা এবং দেশময় অর্থ-নৈতিক বিপর্যয় মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনকে প্রবল করে তুলল। ১৯২০ সালের কংগ্রেসে আবার দু'দল দেখা দিল: বিপিনচন্দ্র ও তিলক প্রতিক্রিয় সহযোগিতার (responsive co-operation) কর্ম্মপন্থা দিলেন, কিন্তু দেশবাসী গ্রহণ করল মহাত্মাজীর অসহযোগ। এই বিচ্ছেদের দু'বছর পরে ১৯২২ সালের গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্যদলের পত্তন করলেন এবং কাউন্সিল প্রবেশের যুক্তিযুক্ততা প্রমাণ করলেন। ফলে কংগ্রেসে আবার দু দল হল: স্বরাজী ও গান্ধীপন্থী অপরিবর্ত্তবাদী (no-changer)। কাউন্সিলের ভিতরে যেয়ে কাউন্সিল-ধ্বংসের যৌক্তিকতা ও দেশের রাজনৈতিক প্রগতির পক্ষে এর প্রয়োজনীয়তা গান্ধীজীও পরে বুঝতে পেরেছিলেন এবং পরবর্ত্তী কংগ্রেসে কাউন্সিল-প্রবেশ অনুমোদিত হয়েছিল।

এই সময় বাংলাদেশে অর্ডিনান্স শাসনে শত শত নেতা ও যুবক বন্দী হন, দেশময় কৃষাণ ও মজুর আন্দোলনের পত্তন হয়, গান্ধীবাদের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে লোকে সন্দিহান হয়।
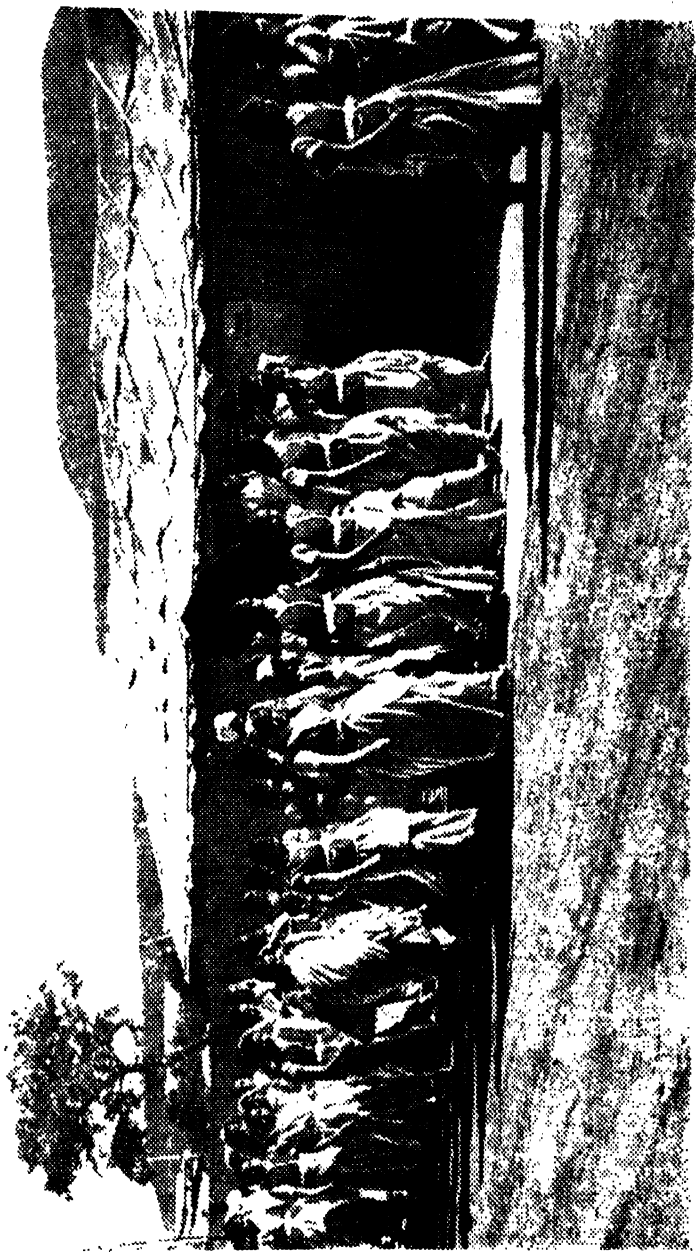
ত্রিপুরী কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবিকা দল

১৯৩০ সালে কংগ্রেস স্বরাজের মানে করেন পূর্ণ স্বাধীনতা। ঐ বছরই আইন অমান্য-আন্দোলন ও গান্ধীজীর ডাণ্ডী যাত্রা ঘটে, বাংলায় পুনরায় অর্ডিনান্স আইন পাকা হল, সহস্র সহস্র যুবক-যুবতী বিনা বিচারে আটক হলেন। দেশময় একদিকে বৈপ্লবিক ঘটনা ও অপরদিকে আইন-অমান্য-আন্দোলন তুমুলভাবে চলল। অবশেষে গান্ধী-আরুইন চুক্তির ফলে গান্ধীজি কারামুক্ত হলেন এবং ১৯৩১ সালে বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। ব্যর্থকাম গান্ধীজির প্রত্যাবর্তনের পরেই আবার আইন-অমান্য-আন্দোলন চলল, দমন-নীতিও চলল। ১৯৩৪ সালে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস দল প্রবেশ করেন এবং সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারা সম্পর্কে 'না বর্জন না গ্রহণ' নীতি অবলম্বন করেন।

১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে পণ্ডিত জবাহর লাল সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ দেন, তা দুটি কারণে প্রগতিপন্থীর প্রিয় হয়েছে : পৃথিবীর অপরাপর দেশের সঙ্গে যোগস্থাপন এবং সমাজতন্ত্রবাদের প্রয়োজনীয়তার বিস্তৃত আলোচনা। করাচী কংগ্রেসে স্বরাজ-শাসনের যে মূলনীতি গৃহীত হয়েছিল, তাহাই সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যায় বিশদীকৃত হল ঃ দেশময় মজুর-কৃষাণের যে আন্দোলন ও সংহতি গড়ে উঠেছিল তাদেরই চিন্তাধারা রূপ পেল জবাহরলালের অভিভাষণে। এইরূপে কংগ্রেসের বামপন্থী মত ও পথের দাবী দেশের সম্মুখে সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। বস্তুতঃ ৩০ সাল থেকেই সমাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রভাব কংগ্রেসে দেখতে পাওয়া যায়। এবং ফলে কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী মত ও দল সুস্পষ্ট ও প্রবল হয়ে ওঠে। ৩৭ সালের ফৈজপুর কংগ্রেসে প্রাদেশিক শাসনভার গ্রহণ করার প্রস্তাব এবং ৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরোধের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এইরূপে বামপন্থীদের প্রভাব ধীরে ধীরে অনুভূত হচ্ছে। গ্রামে কংগ্রেসের অধিবেশনের রেওয়াজ ফৈজপুর থেকেই শুরু হল।

এবার কংগ্রেসের অধিবেশন ত্রিপুরী গ্রামে—মহাকোশলের অপূর্ব নৈসর্গিক পরিবেশে। গিরি-ও-অরণ্য-বেষ্টিত নর্মদার তটভূমিতে কংগ্রেসের ঝঞ্ঝাবর্তময় অধিবেশন ঃ মৌন প্রকৃতির শান্তবক্ষে যুধ্যমান মানবযূথের বাত্যাবিক্ষোভ।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পূর্বেই সভাপতি নির্বাচন নিয়ে যে তুমুল দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল, কংগ্রেসের সুদীর্ঘ ইতিহাসে তেমনটি কমই হয়েছে। অবশেষে সুভাষ বাবু ভোটাধিক্যে সভাপতি নির্বাচিত হলেন। মহাত্মা গান্ধীর উষ্ণতার তীব্র স্ফুরণে লোকে বিস্মিত হল, ক্ষুব্ধ হল। দক্ষিণ পন্থী নেতাদের বারজন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য পদত্যাগ করলেন, জবাহরলাল পদত্যাগ না করেও পদত্যাগের ভাণ করলেন। তারপর উভয় পক্ষের বিবৃতি ও বাকবিতণ্ডা। ত্রিপুরী স্মরণ করিয়ে দেয় সুরাটের দক্ষযজ্ঞ।
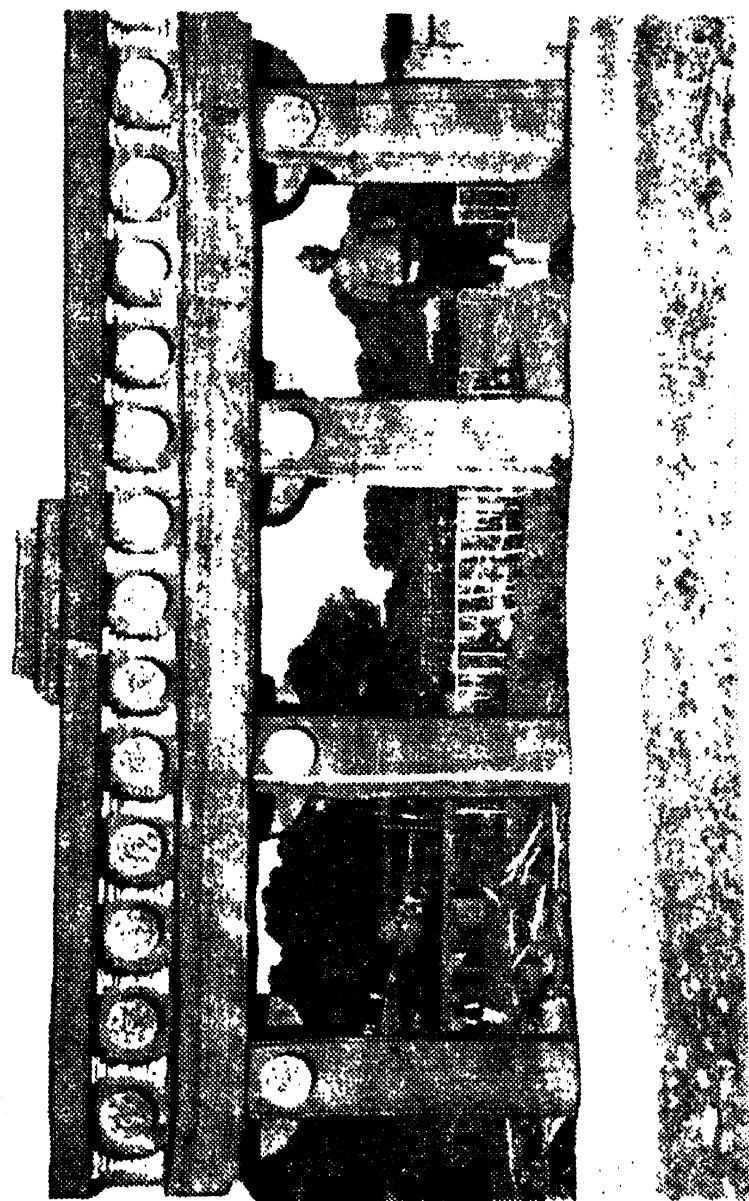
বিষ্ণুদত্তনগরের কংগ্রেসের প্রবেশদ্বার
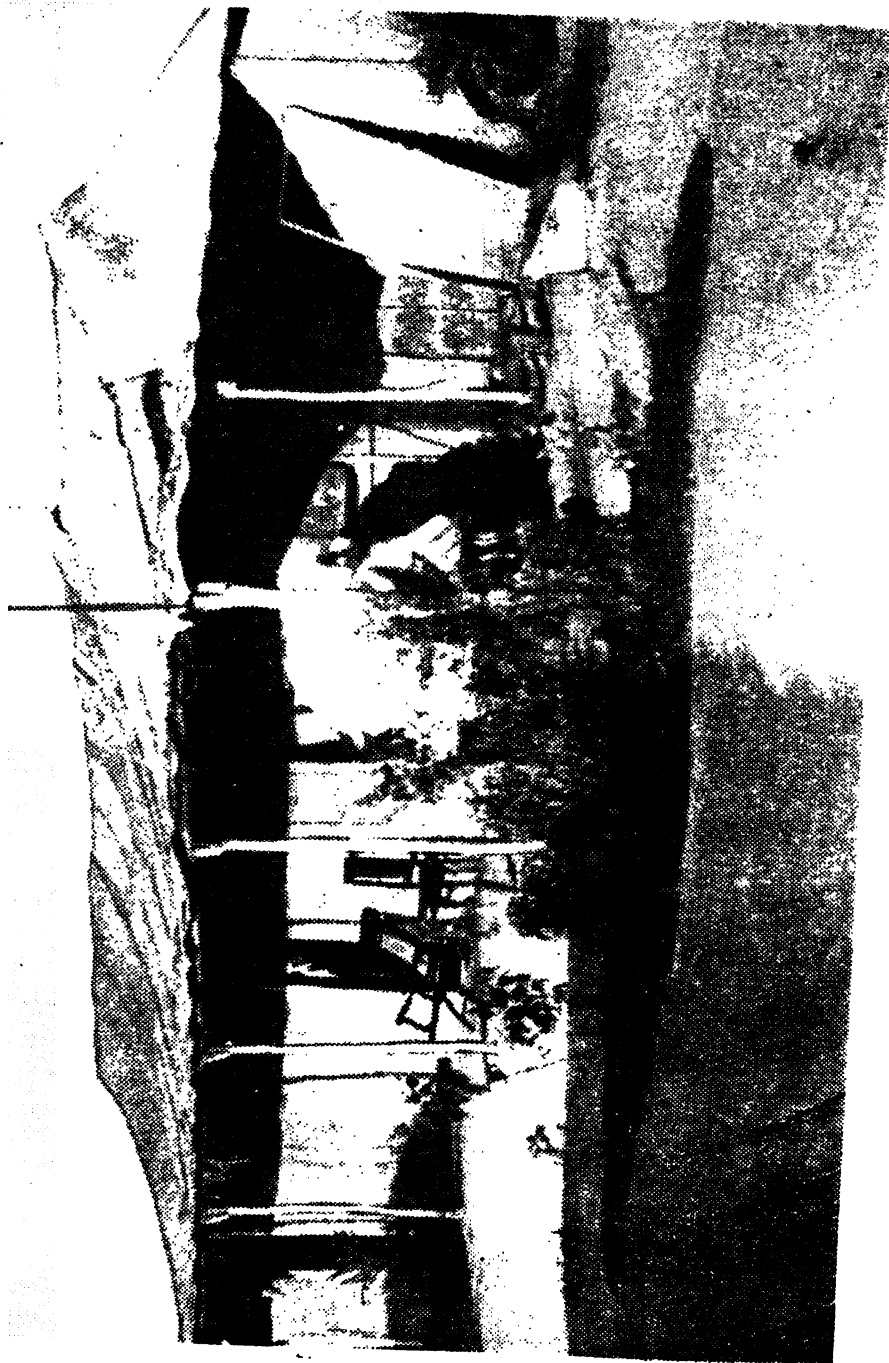
বিষ্ণুদত্তনগরে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের মণ্ডপে বক্তৃতা মঞ্চের ঠিক নিম্নে প্লাষ্টারে নির্মিত একটি কৃষাণ কর্মীর মূর্তি। মূর্তির উচ্চতা ২০ ফিট্

আগ্নেয়গিরির প্রবল ধ্বংসকাণ্ড বুকে নিয়ে ত্রিপুরীর অধিবেশন শুরু হল। বড়ই করুণ ও মর্মস্পর্শী দৃশ্য ত্রিপুরীর : প্রেসিডেন্ট সুভাষচন্দ্র রুগ্ন ষ্ট্রেচারে শায়িত, সম্মুখে রাজনৈতিক দলাদলির তীব্র ক্রুর ও কঠোর ঝঞ্ঝাবর্ত।

ত্রিপুরী কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থী নেতাদের কার্য্যকরী সুসংহত শক্তির নিকট বিচ্ছিন্ন বামপন্থীর অনির্ভরতা প্রমাণিত হল, কংগ্রেসের এই দুই আদর্শের দ্বন্দ্ব প্রবলভাবে শুরু হবার সূত্রপাত হল এবং সর্বোপরি ক্ষুব্ধ মহাত্মাজীর বিরাট পরাজয় গ্লানিকর বিজয়ে পরিণত হল : একতন্ত্রের হাতে গণতন্ত্র লাঞ্ছিত হল। এক কথায় ভারতের আসন্ন সংগ্রামের স্বর্ণমুহূর্তে ত্রিপুরী নবতর কোন কর্ম নির্দেশ বা ভাবধারা দেশকে দিতে পারল না, দিল গরলভরা রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের তীব্র বাষ্প প্রবাহ। ব্যর্থতায় পরিসমাপ্ত হল ত্রিপুরীর দ্বিপঞ্চাশং কংগ্রেস অধিবেশন।

এই সংখ্যায় কংগ্রেসের ছবিগুলো আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত

গ্রন্থ-পরিচয়

The Present Condition of India

By Leonard M. Schiff, Quality Press, Pp. 196, 6s, 1939.

বিংশ শতক বিজ্ঞানের উপাসক। বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি এ শতাব্দীর বিশেষত্ব বলে সবার ধারণা; কিন্তু বর্তমান যুগ যে ধীরে ধীরে ঐতিহাসিক ভাবাপন্ন হচ্ছে—এ বোধ হয় এখনও অনেকের নিকট সুস্পষ্ট হয় নি। এর কারণ বিজ্ঞানের সাফল্য চক্ষের উপর সবাই দেখছে। সমাজ জীবনের প্রতি স্তরে বিজ্ঞানের প্রভাব প্রতিফলিত হচ্ছে। আপাত দৃষ্টিতে ইতিহাসের এমন কোন প্রভাব দেখা যায় না। তাছাড়া চিন্তা জগতে জড়তা (Inertia) চিরকালই আছে। কোন নূতন ভাব সহজে সকলের নিকট আদৃত হয় না। জ্ঞান দরবারের প্রবেশ পথে প্রতীক্ষা না করে কোন চিন্তা পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত হয় না। বিশ্বে আজ নানা পরিবর্তনের সাড়া এসেছে। এ পরিবর্তন পরম্পরার ভিতরই রয়েছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ,. ধ্বংসের নিষ্ঠুর প্রয়োজন, সৃষ্টির অনন্ত সম্ভাব্যতা। পরিবর্তনের মুখে যাহা আবর্তিত এবং ঘাতপ্রতিঘাত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাহা সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি লাভ করছে ইতিহাস তারই প্রতিচ্ছবি। কাজেই এ পরিবর্তন বুঝতে হলে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন। ইতিহাস শুধু অতীত এবং বর্তমানের স্বরূপ ও ব্যাখ্যা নিরূপণের জন্য নয়। ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে ও সৃজন চাঞ্চল্যকে মূর্ত করার জন্যও ইতিহাসের প্রয়োজন। অনেকের ধারণা 'বর্তমান কালের পরিধি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, সদ্য উৎক্ষিপ্ত ঘটনার ধূলি আবর্তে আবিল, এই অল্প পরিসর অসচ্ছকালের মধ্যে' কোন ইতিহাস সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু বর্তমানকে বাদ দিয়ে যারা অতীত গৌরবের দিকে তাকিয়ে থাকেন তারা ইতিহাসের মূল ধারা ও যোগসূত্রটি ভুলে যান।

'History past politics and politics present history.' সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের যুগে সমসাময়িক ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা আরো বেশী। সে হিসাবে Leonard M. Schiffএর প্রণীত 'The Present Condition of India' বেশ সময়োপযোগী সুচিন্তিত ও তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ হয়েছে। তিনি সাধারণ পাশ্চাত্য লেখকদের মত গবর্ণমেণ্ট হাউসে ভোজ বিলাসের মধ্যে অথবা রোটারীয়ান ক্লাব হতে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন নি।

আজকাল 'Birds-eye View' Series বহু বেরুচ্ছে। আবার 'Drain Inspector' জাতীয় লেখকদেরও পাশ্চাত্য দেশে অভাব নেই। গ্রন্থকার নিজে বহু বৎসর ভারতে কাটিয়েছেন। গ্রাম্য জীবনের সুখদুঃখ, আশা আকাঙ্খার প্রতি তাঁর সুমহান সহমর্ম্মিতা আছে। সারা বইয়ের ভিতর একটা সুগভীর সমবেদনার সুর আছে। তাই পণ্ডিত জহরলাল ভূমিকায় বলেছেন 'This is valuable in giving us a glimpse of the real problem'.

এ বইটি বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত। কিষাণ, মজুর,বুদ্ধিজীবী, ধনিক, আভিজাত্য ও ইউরোপীয় সম্প্রদায় বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে। পরিশেষে আমলাতান্ত্রিক ইংরেজ শাসকদের নিকট সহানুভূতির আশায় এক আবেদন দিয়েছেন। অধ্যায়গুলি বিশেষ চিন্তা-উদ্দীপক, কারণ সমসাময়িক অবস্থার উপর সম্যক আলোক সম্পাত করে। অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করে বহু তথ্য এতে সংগ্রহ ও সমাবেশ করা হয়েছে। দেশের বড় সমস্যা হল দারিদ্র্য সমস্যা। আলোকহীন মাহাত্ম্যহীন ধূলিনত জীবনের ছবি প্রতিঘরে, প্রতিগ্রামে, প্রতিসহরে। এক কথায় এর কারণ বৈদেশিক শাসন ও শোষণ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দেশে দারিদ্র্য এসেছে একথা গ্রন্থকার স্বীকার করেন না। 'The number of births is not the cause of poverty and there is no reason why their children should not grow up to be happy and healthy, if other causes did not exist.'

কিষাণ ও মজুরগণ অমিতব্যয়ী বলে সাধারণ অপবাদ আছে। তিনি একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে ইহা দেখেন। 'The life of the Kisan is one of bitter drudgery, and occasional escapes in mirth and merriment come as an oasis in the desert.' সরকারী পল্লী-উন্নয়নের বৃহৎ চেষ্টার বৃথা পরিণামের কারণ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন 'The rural uplift has become the fashion. The Viceroy is photographed with a stud bull and on all sides Government is anxious to further 'rural schemes' but these are often ineffectual because of the gap between the official and the peasant.' সরকারী পক্ষ হতে এরূপ কপট আন্তরিকতা দেখাবার কারণ বর্ত্তমানের বিপ্লবাত্মক গণ-আন্দোলনকে উন্মার্গগামী করা—'To sidetrack the present militant outlook of the peasant.' তিনি ঠিকই বলেছেন 'The grinding poverty of the masses is not only crime ; it is unnecessary.'

ভারতীয় মজুরদের গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামের কথা উল্লেখ করে বলেছেন 'Faced with every kind of difficulty—intimidation, espionage, agents-provocatears there are endless complications and dangers. The full repressive powers of Government have been used to quell disputes and the workers are so

desparately poor that they cannot make contributions and therefore they receive no strike pay. Yet they have been known to stay on strike as long as six months.'

যাঁরা এ ধর্ম্মঘটকে সমাজতন্ত্রীদের প্ররোচনাপ্রসূত মনে করেন তাঁদের জানা উচিত—'Strikes do not occur at will; they are..... a world phenomenon due to the increase in production through the enormous increase in armaments and the consequent rise in prices and profits'. সরকারী শিক্ষা-বিভাগের তীব্রভাবে নিন্দা করেছেন। 'The disastrous 'filtration theory' which had set forth the ideal that by educating an illiterate, the learning would gradually percolate to the masses, as drops of water from the Himalayas gradually form a mighty stream to irrigate the parched plains, has proved a failure'.

ব্যক্তির চেয়ে ব্যষ্টিজীবনের স্বরূপ দিতে গ্রন্থকার চেষ্টা করেছেন। তবে গান্ধী, জহরলাল প্রভৃতি কয়েকজন রাষ্ট্রনেতার জীবনচরিত স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় ফেলে আলোচনা করেছেন। আদর্শের পরিপ্রেক্ষণিকায়ই শুধু প্রবল ব্যক্তিত্ব স্পষ্টতর রূপ পেতে পারে।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার মূলে সাম্রাজ্যবাদের ভেদনীতি। তিনি অতীত ইতিহাস আলোচনা করে দেখিয়েছেন হিন্দু মুসলমান পরস্পরের সাথে শান্তিপূর্ণ সৌহৃদ্যে কাটায়েছে এবং এক মহান জাতি হিসাবে ধীরে ধীরে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। জহরলালের ভাষায় 'they do not form different races, but are essentially the same amalgam of races'.

গ্রন্থকার মনে করেন ভারতবর্ষে রাশিয়ার অনুরূপ রাষ্ট্র ও সমাজ সংগঠন করা যায়, কিন্তু তিনি প্রশ্ন উঠিয়েছেন কায়েমী স্বার্থান্বেষী ধনিক সম্প্রদায় অথবা সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ড কি করবে? এর উত্তর ভবিষ্যতের বক্ষপটে দিন দিন ভাস্বর হয়ে উঠ্ছে।

The Anatomy of Revolution

By Crane Brinton, Allen and Unwin ,12 s.6d.

মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেশকাল নির্ব্বিশেষে বহুবার বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিপ্লবের স্বরূপ ও প্রকৃতি কি, কোন্ অমোঘ শক্তির প্রভাবে ও নিষ্ঠুর প্রয়োজনে সমাজ জীবনে বিপ্লবের সূচনা হয় তার বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ আজ পর্য্যন্ত খুব বেশী হয় নি। প্রসিদ্ধ সমাজ-বিজ্ঞানবিদ্ Sorokin তাঁর অধুনা প্রণীত Social and Cultural Dynamics নামক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ ও সমাবেশ করে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করেছেন।

মিঃ ব্রিণ্টন ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ফরাসী বিপ্লবের বিশ্লেষণ করেছেন 'to discover some uniformities which might form the basis for a future sociology of revolu-

tions'. কিন্তু পুস্তকখানা অনেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়াই মনে করিয়ে দেয়, বিপ্লবের বিরাট উৎক্ষেপ বিক্ষেপ ও ঘটনার বহুতা তাতে নেই। Trosky-র 'History of Russian Revolution' পড়লে মনে হয় চক্ষের সামনে বিপ্লবের ছবি একের পর আর একটি উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। তিনি বিপ্লবকে সমাজের অসুস্থ দেহস্ফীতি হিসাবে নিয়েছেন এ মূল ধারণা নিয়ে তিনি উক্ত তিন বিপ্লব বিশ্লেষণ করে পরস্পরের সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। 'Each displays governmental inefficiency and the break-down of the loyalty both of economic groups and of the intellectuals; each is begun by moderates who are men of substance and in each the terror is prefaced by a period of dyarchy, when the constitutional government is menaced and finally overthrown by an extra-legal organisation and finally each subsides in a Thermidor period, the attempt to introduce the puritan's millenium having failed', সমাজ জীবন সহজ শান্ত অবস্থায় ফিরে আসে। এ জন্যই তাঁর মতে বিপ্লব দ্বারা সমাজে কখনই কোন ব্যাপক ও গভীর পরিবর্তন সম্ভব হয় নি। 'Inspite of the efforts of the philosophers, theologians, moralists, political theorists, social scientists and a good many other inspired thinkers in the last two thousand years, social systems are still almost as perversely unaffected by revolutionary good intentions as tides or rubber bands'.

এ পুস্তক প্রণয়ন দ্বারা তিনি জ্ঞানবত্তার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু বুদ্ধিমত্তার একান্ত অভাব। অধ্যাপক মহলে এ দোষ সব সময়ই দেখা যায়।

শৈলেশ রায়

সম্পাদকীয়

ত্রিপুরীর শিক্ষা

ভালয় হোক মন্দে হোক, ত্রিপুরীতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৫২তম অধিবেশনের পরিসমাপ্তি হল। নদীমেখলা কানন-কুন্তলা গিরিরাজি-শোভিত অপূর্ব নৈসর্গিক শোভারাজ্যে ত্রিপুরীর প্রান্তরে ভারতের দিক্‌দিগন্ত হতে দেশসেবকের দল সমবেত হয়েছিলেন জাতির সম্মুখীন গুরুতর সমস্যার সমাধানের জন্য। কিন্তু ত্রিপুরীর এই লক্ষাধিক দেশসেবক এ তিন দিন ধরে কি নিয়ে বিব্রত ছিলেন? জাতীয় আন্দোলনকে অগ্রগতির পথে পরিচালনায় এবার তাঁরা কি নূতন সম্পদ দিয়ে গেলেন? দূর থেকে অনাসক্ত চিত্তে যদি সমগ্র ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা যায়, তা হলে আমরা কি দেখতে পাই?

অন্তর্দ্বন্দ্বের বিষাক্ত তিক্ততায় ত্রিপুরীর সমগ্র আবহাওয়া আচ্ছন্ন হল। মানবতা, গণতন্ত্র, কংগ্রেস-গঠনতন্ত্রের বৈধতা, অহিংস সত্যপরায়ণতা সব ভূলুণ্ঠিত হল; রুগ্ন ও শায়িত সভাপতির সম্মুখে অহোরাত্র চল্‌ল গরল-ভরা অন্তর্দ্বন্দ্বের নগ্ন নৃত্য। সমগ্র অধিবেশন যুধ্যমান দুই দলের কল-কোলাহলে ধূম ও ভস্মের উদ্গীরণ করেই ক্ষান্ত হল, গঠনমূলক কর্মপন্থা, আসন্ন সংগ্রামের জন্য শক্তিসঞ্চয়, জাতীয় ঐক্যের আয়োজন সকলই পেছনে রইল। সমগ্র লোকের দৃষ্টি একটিমাত্র অস্বাস্থ্যকর প্রস্তাবে নিবদ্ধ রেখে কংগ্রেসের মূল লক্ষ্যকে পণ্ড করার এমন ক্ষতিকর আয়োজন দ্বিতীয়টি হয় নি।

মহাত্মা গান্ধী ত্রিপুরীতে অনুপস্থিত থেকেও ত্রিপুরীর কংগ্রেস পরিচালনা করেছেন। কারারুদ্ধ না হয়ে গান্ধীজীর স্বেচ্ছাকৃত অনুপস্থিতি বোধ হয় এই প্রথম। মহাত্মার পক্ষে ইহা সঙ্গত ও শোভন হয় নি।

ত্রিপুরী কংগ্রেস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে আমাদের ভাবিত করেছে, এখানে তা সংক্ষেপে লিখলাম:—

(১) রুগ্ন সুভাষচন্দ্রের ত্রিপুরীতে যোগদান স্বদেশী-আন্দোলনের সময়ে ফেডারেশন্ হ প্রতিষ্ঠায় ষ্ট্রেচারে শায়িত আনন্দমোহনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু সেদিন ছিল মিল মহোৎসব, আর আজ ? সুভাষচন্দ্রের এ অবস্থায় পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভের প্রস্তাব মুলতবী র মানবোচিত হত। বিশেষতঃ ওয়ার্কিং কমিটির পদত্যাগী সভ্যদের সম্পর্কে কোন কট সুভাষবাবু করেন নাই, একথা পুনঃ পুনঃ বলা সত্ত্বেও, প্রস্তাব অত্যন্ত ক্রুর হয়েছে।

(২) গান্ধীজির অবিসংবাদিত নেতৃত্ব সম্বন্ধে দেশবাসীর মতদ্বৈধতা নেই। কিন্তু কংগ্রেসে চার আনার সভ্য না হয়েও কংগ্রেসের ক্যাবিনেট গঠন করবার ভার প্রকাশ্য সভায় অনুমোদি প্রস্তাবদ্বারা তাঁরই ওপর অর্পণ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা একেবারে হ্রাস কর অবৈধ হয়েছে। এই দৃষ্টান্ত ও ঘটনা ভবিষ্যতে গণতন্ত্রী কংগ্রেসের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।

(৩) এর ফলে গণতন্ত্রের আদর্শকে কংগ্রেস পদদলিত করেছে। পৃথিবীব্যাপী একতন্ত্রতা ক্রমবর্ধমান বীভৎসতায় ভারতীয় কংগ্রেসের এই পরিণতি অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া সৃষ্টি করবে সন্দেহ নেই। ব্যক্তিকে অতিরিক্ত বড় করে প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুণ্ণ করার এই দৃষ্টান্ত অনিষ্টকর।

(৪) বামপন্থীদলের পরস্পর অনৈক্য ও সংগ্রামক্ষেত্রে প্রগতি-বিরোধী মনোবৃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ অনিষ্টকর হয়েছে। অপরপক্ষে গান্ধীবাদীরা সংহত এবং কৌশলী।

(৫) যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা, দেশীয় রাজ্যে গণ-আন্দোলন, গণ-সংযোগ, জাতীয় দাবী পেশ ইত্যাদি বিষয়ে কংগ্রেসে বিশেষ কোন আলোচনা হল না—কোন সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার নির্দেশ হল না। অথচ এগুলো আজকের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সবচেয়ে গুরুতর। বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্র ও দেশীয় রাজ্যে গণ-আন্দোলন সম্বন্ধে জনমত অত্যন্ত সচেতন এবং একটা সক্রিয় কর্মপন্থার দাবী রাখে। কংগ্রেস আমাদিগকে এবিষয়ে নিরাশ করেছে।

(৬) ঠিক ত্রিপুরী কংগ্রেসের মুখে মহাত্মাজীর রাজকোটে গমন ও অনশন-ব্রত অবলম্বনের ফলে ত্রিপুরীর প্রধান বিষয় হতে সকলের দৃষ্টি স্থানান্তরিত করা এবং নিজে অনুপস্থিত থেকে কংগ্রেসের উভয় দলের মিলনে সাহায্য না করা, সমর্থন করা যায় না।

(৭) সমগ্র কংগ্রেসের কাজ ও দৃষ্টি পন্থজীর একটি অকেজো ও আত্মঘাতী প্রস্তাবের মধ্যে কেন্দ্রীভূত রাখা জাতির দিক দিয়ে অমার্জনীয় অপরাধ, এর ফলে সমগ্র অধিবেশন নিতান্ত খেলো হয়ে উঠেছে।

ত্রিপুরী আমাদের জাতীয় ঐক্যে বিভেদের বিষ ছড়িয়ে দিল, সার্থকতা দিল না, সমস্যা দিল, সমাধান দিল না।

দক্ষিণপল্লী কার্যকরী বুদ্ধি

রাজাগোপালাচারী ত্রিপুরী প্রদর্শনীর মাঠে এক বক্তৃতায় বলেছেন :—

"কাহাকে বিশ্বাস করা ভাল ? যে নৌকার মাঝি ৩২ বৎসর দক্ষতার সহিত নৌকা চালাইয়াছে তাহাকে

না নূতন মাঝিকে? দেখা গিয়াছে, পুরাণো মাঝির অধীনে নৌকা নিরাপদ থাকে, উহাতে জল উঠে না। সাজানো নৌকার তলায় যদি ফুটো থাকে, তাহা হইলে আপনি কি তাহাতে উঠিবেন?"

রাজাজীর মতো পদস্থ ব্যক্তির প্রকাশ্য ভাবে এরূপ বিরুদ্ধতা অত্যন্ত রুচিগর্হিত হয়েছে। কিন্তু জনসাধারণের কাছে এই যুক্তির আবেদন আছে এবং আছে বলেই রাজাজী একটি নিতান্ত সাধারণ দৃষ্টান্তের অবতারণা করে জনসাধারণের মনস্তত্ত্বে ঘা দিয়েছেন।

বামপন্থীদের বড় বড় বুলি আওড়ানের চেয়ে জনমনে ধরে এমন ভাবে বলা ও কাজ করা উচিত। দক্ষিণপন্থীর সাফল্যের যাদুকাঠি তাদের কার্য্যকরী ক্ষমতায়। সর্বোপরি, গান্ধীজির মতো সুপরীক্ষিত নেতৃত্ব তাদের সুসংহত করার বড় সহায়ক হয়েছে, সন্দেহ নেই।

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের দুর্বলতা

ত্রিপুরী কংগ্রেসে পন্থজীর প্রস্তাবে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের নিরপেক্ষতা আদর্শচ্যুতি ও ভীরুতার পরিচায়ক হয়েছে। সভাপতি নির্বাচনের সময় এঁরাই অগ্রণী হয়ে সুভাষবাবুকে সমর্থন করেছিলেন, আর আজ এঁরা প্রকাশ্য সভায় সুভাষবাবু থেকে সরে দাঁড়ালেন। নিরপেক্ষ থাকার মানে বিরুদ্ধদলের সহায়তা করা। শুধু তাই নয়, কংগ্রেসে গান্ধীবাদ ও গান্ধী-পদ্ধতিকে চিরস্থায়ী করার প্রস্তাবে বিরুদ্ধতা না করা আর সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক কর্ম-পদ্ধতির বিসর্জন দেওয়া সমতুল্য। একথাও এঁদের বিশেষভাবে অনুধাবন করা উচিত ছিল, কারণ এর ফলে ভারতে প্রগতিপন্থী সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রসারে বাধা পড়বে নিঃসন্দেহ। রাজনীতিক কৌশলের নামে সুবিধাবাদী মনোভাব পরিণামে সর্বনাশ আনে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মার্কসপন্থীদের যে অবস্থা ঘটেছে, এখানেও তারই সূচনা হল: পুনঃ পুনঃ অস্থিরচিত্ততা কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে শুভকর হয় না।

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের সম্পাদক শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণের বক্তৃতায় আমরা কোন যুক্তি খুঁজে পেলাম না। তাঁর এই প্রকার মনোভাবের কারণ অন্যত্র—বোধ হয় দ্বিচারী জবাহরলালের প্রভাব ও ভাবী ওয়ার্কিং কমিটির পদলাভের আকাঙ্ক্ষা। জয়প্রকাশ বলেছেন, "সভাপতি নির্বাচনের সময় সমাজতন্ত্রীরা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকেই সমর্থন করিয়াছিলেন। তখন তাহারা মনে করেন নাই যে, কংগ্রেস এইরূপ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া বিতর্কে দণ্ডায়মান হইবে।" এই উক্তি ও যুক্তি সত্যই হাস্যাস্পদ। অথবা যারা প্রত্যেক সভামণ্ডপ থেকে বড় বড় বুলি আওড়ান এবং কার্যকালে প্রত্যেকবারই পৃষ্ঠভঙ্গ দেন, তাদের পক্ষে এ-ই স্বাভাবিক। এর ফলে, আমরা ত্রিপুরীতেই দেখতে পেলাম, যুক্তপ্রদেশ, আজমীর, সীমান্ত ও বাংলার কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট দলের অধিকাংশ সভ্য দলের বিরুদ্ধে ভোট দিতে বাধ্য হয়েছেন এবং অনেকে দলত্যাগও করেছেন। একদিকে কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রীদের ভীরুতা যেমন ঘৃণ্য হয়ে দেখা দিয়েছে, অপরদিকে রুগ্ন শয্যাশায়ী ও বর্জিত সুভাষচন্দ্রের দৃঢ়নিষ্ঠ অনমনীয়তা যথার্থ প্রগতিপন্থীদের নির্ভরযোগ্য হয়েছে।

গান্ধীজির পরাজয়

কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের পর মুহূর্তে যেদিন গান্ধীজি লিখেছিলেন, "সুভাষচন্দ্রের বিজ আমারই পরাজয়", সেদিন সত্য সত্যই তাঁর পরাজয় ঘটে নি। কিন্তু ত্রিপুরীতে যেদিন কংগ্রেে প্রকাশ্য সভায় গান্ধীজির ন্যায় ব্যক্তিত্বশালী ও প্রভাববান নেতাকে অধিকসংখ্যক ভোটের জো নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখার প্রস্তাব পেশ ও পাশ হল, সেদিন যথার্থই গান্ধীজি ও গান্ধীবাে পরাভবের দিন বলতে হবে। মহাত্মার নেতৃত্ব কি ভোটগোণার প্রতীক্ষায় ছিল? যাে এতদিন জাতি অবিসংবাদী নেতারূপেই আসন দিয়েছে, তাঁর নেতৃত্ব সম্বন্ধে জাতির মনে সংশ জেগেছে, তাঁর মত ও পথ বর্জনের প্রয়াস হয়েছে। স্বয়ং গান্ধীজির নেতৃত্ব সমগ্রজাতি আজ মাথা পেতে নিতে পারে, কিন্তু তাঁর ফ্যাসিস্ত-গোষ্ঠী দক্ষিণাচারীদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে দে প্রবলভাবে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। সমগ্র জাতির ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ কোন বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠ কবলিত দীর্ঘকাল থাকা অবাঞ্ছনীয়—বিশেষতঃ যদি সেই মত ও পথ প্রতিক্রিয়াশীল হয়। ক্ষয়িঃ গান্ধীবাদকে আজ কৌশলে টিকিয়ে রাখা জাতীয় জীবনে অকল্যাণকর হবে। এই প্রচেষ্টার কুফ আমরা ত্রিপুরীতেই দেখতে পেয়েছি: পন্তজীর গান্ধীবাদ সমর্থক প্রস্তাব পাশ হওয়া দুষ্কর হ যদি কংগ্রেস প্রদেশের প্রধান মন্ত্রীরা প্রতিনিধিদের শিবিরে শিবিরে ভোটের জন্য চাপ না দিে এবং বামপন্থীদিগকে জবাহরলাল বিচ্যুত করতে অপারগ হতেন। কংগ্রেসের মূল্যবান্ দিনগুি এরূপভাবে নষ্ট হয়েছে এবং সমগ্র কংগ্রেস এক বিরাট ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এর জ দায়ী মহাত্মা স্বয়ং এবং তাঁরই অনুচরবৃন্দ: জাতির সমষ্টিগত প্রগতি ও কল্যাণ উপেক্ষা কে আত্মপ্রাধান্য রক্ষার এমন হীনপ্রয়াস অশোভন ও ঘৃণ্য বলেই পরিগণিত হবে। মহাত্মা স্বয় অনুপস্থিত থেকেও ভাবী ঐতিহাসিকের নির্মম সমালোচনা এড়াতে পারবেন না—বিশেষঃ নেপথ্যের সূত্রধার হয়ে স্বীয় অন্যায়কে অধিকতর কালিমালিপ্ত করে তুলেছেন, এ কাজ ক্ষম পাবে না।

সভাপতির অভিভাষণ

ভারতীয় জাতীয় মহাসভার ৫২শ অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর অভিভাষণ এবার একটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে: ইহা সব চেয়ে ছোট অভিভাষণ হয়েছে এবং সব চেয়ে কাজের বিষয়গুলোই এতে আলোচিত হয়েছে। মিশর প্রতিনিধিদিগকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে রাষ্ট্রপতি ভারতের তিনটী রাজনৈতিক কার্যের ওপর বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন—যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা, দেশীয় রাজ্যের গণ-আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলা এবং বর্তমান অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতের দাবী চরমপত্ররূপে উপস্থাপিত করা।

রাষ্ট্রপতির এই নিরলঙ্কার ও কার্যকরী অভিভাষণে জাতির বর্তমান কর্মপন্থা সূচিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অন্তর্বিবাদে ব্যাপৃত থাকায় কারও দৃষ্টি এদিকে বিশেষ আকৃষ্ট হয় নি, জাতির পরম দুর্ভাগ্যই বলতে হবে।

পন্থজীর প্রস্তাব অনাস্থাজ্ঞাপক?

গান্ধীজী, গান্ধীদল ও গান্ধীমত কংগ্রেসে কায়েমী করার প্রচেষ্টায় যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রী যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, তা নিয়েই কংগ্রেসের সমস্ত প্রতিনিধি তিনদিন বাদানুবাদে কাটিয়েছেন এবং উহা গৃহীত হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বের ওপর অনাস্থাজ্ঞাপন করা হয়েছে কিনা, তা নিয়ে বাক্‌বিতণ্ডা কম হয় নি। সুভাষবাবু দক্ষিণাচারী নেতাদের কার বিরুদ্ধে কি বলেছেন সে বিষয়ে অমূলক অভিযোগের অন্ত নেই, অথচ সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে সর্দার প্যাটেল ও স্বয়ং গান্ধীজি যে তীব্র ও অশোভন মন্তব্য করেছেন, তার ক্ষীণ প্রতিবাদও সভায় হয়নি। "সুভাষবাবুর সভাপতিত্ব দেশের অকল্যাণকর হবে' সর্দারজীর এই উক্তি অথবা "অবশ্য সুভাষচন্দ্র দেশের শত্রু নন" গান্ধীজির এই প্রকার উক্তি ক্ষুদ্রতা পরিচায়ক হয়েছে।

কিন্তু এখন যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে সভাপতির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে সুভাষবাবুর পক্ষে কাজ করা সম্ভব হবে কিনা তা বিবেচ্য বিষয়। বিশেষতঃ কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের এমন সুস্পষ্ট বিরুদ্ধতায় নিয়মতান্ত্রিক সভাপতিত্ব অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও পন্থজী বলেছেন, এ প্রস্তাব সভাপতির ওপর অনাস্থাজ্ঞাপক নয়, কিন্তু প্রস্তাবটি আলোচনা করলে সভাপতির ওপর অনাস্থা ছাড়া আর কিছুই মনে হয়না। যে সকল প্রতিনিধির সংখ্যাধিক্যে সুভাষবাবু সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, তাদের দ্বারাই আবার তাঁর বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করানো অনাস্থাজ্ঞাপক যদি বা না হয়ে থাকে, অগৌরবের নিশ্চয়ই। কংগ্রেসের ইতিহাসে এমন আত্মঘাতী অবমাননা এই প্রথম—এতে কার মর্যাদা বেড়েছে স্থির চিত্তে এখন ভাবা উচিত।

ত্রিপুরীর অভ্যর্থনা সমিতি এবং সভাপতির অভিভাষণ

শেঠ গোবিন্দদাস বড়লোকের ছেলে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় হতেই তিনি স্বদেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন এবং এজন্য এককালে পিতাকর্তৃক বর্জিতও হয়েছিলেন। এবারকার কংগ্রেস অধিবেশনে তিনিই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন।

গ্রামে কংগ্রেসের অধিবেশন হবে, এই উদ্দেশ্যে প্রকৃতির এক রম্য নিকেতনে এই মহতী সভা আহূত হয়। কিন্তু যেখানে কয়েক মাইলের মধ্যেও লোকালয় নেই সেই জনশূন্য মহাকোশলে এ জনসমাগমের ব্যবস্থা কেন করা হল, আমরা বুঝতে পারলাম না। একেই কি বলব

গণ-সংযোগ ? প্রতিনিধিগণ নিসর্গ-শোভা উপভোগের অবসর কেউ পেয়েছেন কিনা জানি না কিন্তু গ্রাম্য অধিবেশনের উদ্দেশ্য আদৌ ব্যর্থ হয়েছে।

এবার কংগ্রেসে সুশৃঙ্খলার অভাব সকলের কষ্টকর ও পীড়াদায়ক হয়েছে এবং স্বেচ্ছাসেবকদেরও যথোচিত তৎপরতা দেখা যায় নি। তারপর শেঠজীর অভিভাষণ। শেঠজী গৌরব ও গর্বভরে গান্ধীজিকে ভারতের হিটলার, মুসোলিনী ও ষ্টেলিন রূপে বর্ণনা করেছেন এতে যে মনোবৃত্তির প্রকাশ পেয়েছে, তাতে প্রগতিপন্থী গণ-তান্ত্রিকতা শঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

মিশরের ওয়াফ্‌দ দলের প্রতিনিধি

এবার ত্রিপুরী কংগ্রেসে সভাপতির আমন্ত্রণে মিশর দেশের ওয়াফদ দলের একদল প্রতিনিধি এসেছিলেন। ওয়াফদ দলের নেতা নাহাস পাশা রাজনৈতিক কারণে আসতে পারেন নি। যাঁরা এসেছেন তাদের মধ্যে মিশর আইন সভার ভূতপূর্ব সভাপতি এবং বর্তমান সরকার-বিরোধীদলের নেতা মাহমুদ বেসুইনীকে এবং ওয়াফদ দলের মুখপত্র 'আল-মিসরী'র সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। বম্বেতে এবং ত্রিপুরীতে এঁরা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হয়েছেন। এঁরা ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক যোগস্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই প্রতিনিধিদলকে আমরাও সসম্মান অভ্যর্থনা জানাচ্ছি এবং বহির্ভারতীয় রাষ্ট্রেগুলোর সঙ্গে এইরূপ প্রত্যক্ষ যোগস্থাপন জাতীয় মুক্তির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করি। বিশেষতঃ ইস্‌লামী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে কংগ্রেসের এই ঘনিষ্ঠতা এদেশের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিকে নষ্ট করে দৃষ্টি উদার করে তুলবে. ইহা আজকের দিনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

"পথের দাবী"র নিষ্কৃতি

বাঙালী মাত্রেই শুনে সুখী হবেন, বাংলাসরকার শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবীর' ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছেন। এজন্য নিশ্চয়ই বাংলাসরকার ধন্যবাদ ভাজন। কিন্তু গ্রন্থকারের জীবিত-কালে এই উদারতাটুকু প্রদর্শিত হলে পরলোকগত ঔপন্যাসিকের সোয়াস্তি মিলত, কার্যটুকু শোভন হত।

'ন্যাশন্যাল হেরাল্ডে' নেহেরুর প্রবন্ধ

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন সম্পর্কে 'ন্যাশন্যাল হেরাল্ড' পত্রিকায় নিজকে বল্লভাচারীদল হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলেই দেশবাসীদের বুঝাবার চেষ্টা করেছেন—'in my mind the gulf between them and me had grown'. কিন্তু বল্লভাচারীদলের পদত্যাগ সমর্থনের জন্য এ প্রবন্ধে পূর্ব্বাপর তাঁর যে প্রয়াস এবং ত্রিপুরী কংগ্রেসে তিনি যে অভিনয় করেছেন, তাতে দেশবাসীর আর কোন সন্দেহ নেই জওহরলাল কার হাতের ক্রীড়নক এবং কাদের মুখপাত্র।

• পদত্যাগেরও অন্য কারণ—Personal element was displacing the impersonal character of the organisation. Personal loyalties began to count more than loyalty to the organisation.'

কিন্তু গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের নিকট কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে সমর্পণ করার ঔৎসুক্য দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে এত বেশী দেখেও পণ্ডিতজী নীরব কেন?

কংগ্রেসের জাল সভ্য

সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতি পদে নির্ব্বাচিত হওয়ার পরেই স্বয়ং গান্ধী ও বল্লভাচারীদের মুখে কংগ্রেসের জাল সভ্য এবং আভ্যন্তরীণ দুর্নীতির কথা শোনা যাচ্ছিল। ত্রিপুরী কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থীদের জয় হয়েছে খাঁটি সভ্যদের সত্য ও সুনীতির বলে, মহাত্মা বোধ হয় এবিষয়ে নিঃসন্দেহ।

গান্ধী-লিনলিথগো সাক্ষাৎ

ত্রিপুরীর কর্মকোলাহল স্বেচ্ছায় বর্জন করে দেশীয় রাজ্যের বিশেষভাবে রাজকোটের সমস্যা সমাধান (এবং সম্ভবতঃ সেই সঙ্গে আস্‌ছে যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধেও আলোচনা) করার জন্য মহাত্মাজী দিল্লীতে বড়লাটের নিকট যাত্রা করেছেন। এই সাক্ষাৎ ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এ ব্যাপারে দেশবাসী তথা কংগ্রেস ও রাষ্ট্রপতির মতামত গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। আমরা জানিনে গান্ধীজি তা করেছেন কিনা। অন্ততঃ কাগজে তা দেখিনি এবং প্রকাশ্য আলোচনাও হয়নি। এর ফলে একটি নিয়মতান্ত্রিক-বিধিবহির্ভূত ঘটনা ঘটছে। গান্ধীজীর ব্যক্তিগত কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমরা দ্বিমত নই, কিন্তু যেখানে প্রতিষ্ঠান তথা জাতির কথা ওঠে, সেখানে মহাত্মা মহাত্মা হলেও স্বৈরতার প্রশ্রয় অনুচিত। উহা বর্ত্তমান গণতান্ত্রিকতার কণ্ঠরোধ করছে এবং ভবিষ্যতে একনায়কত্বের পথ পরিসর করে দেবে। পৃথিবীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে শোচনীয় দুর্নীতি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, সাম্য স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষা করতে হলে ভারতকে এখনই সতর্ক হতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে ভাইস্‌-চ্যান্সেলার খানবাহাদুর আজিজুল হক্ যে অভিভাষণ দিয়েছেন, তাতে তাঁর অসাম্প্রদায়িক ও উদার মনোবৃত্তির পরিচয় প্রশংসনীয়। শিক্ষাবিভাগে আমরা যেন এই মনোভাব কার্য্যকরী দেখতে পাই। আজকের জাতীয় প্রগতির দিনে বাংলার হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি যে কত বড় প্রয়োজন, যারা দেশের রাজনৈতিক বা অন্য জনহিতকর কর্মে ব্যাপৃত আছেন, তাঁরাই মর্মে মর্মে বুঝবেন। খানবাহাদুর বলেছেন,

"মুসলিম ছাত্রকে এমনভাবে শিক্ষালাভ করতে হবে যেন আধুনিক প্রগতিমূলক বৈজ্ঞানিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ইস্লামের সংস্কৃতির সঙ্গেও সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হইতে পারেন, আর সেই সঙ্গে তাঁরা যেন ভুলে না যান যে, তারা আসলে বাঙালী ও ভারতবাসী।"

এই কথাগুলো মুস্লেম শিক্ষার্থীদের শিক্ষণীয়।

বাংলার বাজেট

আত্মনিয়ন্ত্রিত প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার তৃতীয় বৎসরে রাজস্ব-সচিব পরিষদে আয়-ব্যয়ের যে বিবরণ ও বরাদ্দ উপস্থাপিত করেছেন, তাতে শঙ্কিত হবার প্রভূত কারণ রয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্রতন্ত্রে বাজেট প্রণয়ন একটি আংশিক কার্যবিশেষ নহে, ইহা অতীতের কর্মধারা ও ভবিষ্যতের অনুসরণীয় নীতি-সম্বলিত একটি অপরিহার্য পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা। নতুন করে না বললেও চলে যে বাজেট গণিতশাস্ত্রের মামুলি যোগ-বিয়োগের ব্যাপার মাত্র নয়, ইহা হিসাব-নিকাশ-বরাদ্দ ইত্যাদির ঊর্ধ্বে সমগ্র জাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের সুচিন্তিত পরিকল্পনা। আপাতদৃষ্টিতে একবাৎসরিক Planned Scheme হলেও রচয়িতার নিপুণ হস্তের ও কুশলী মনের দৃষ্টি বৎসরের বন্ধনকে ছাড়িয়ে দূর ভবিষ্যতের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করবার সুযোগ গ্রহণ করে। যথার্থ শক্তিমান কর্মীর কর্মকৌশল তাই প্রধান হিসাব-রক্ষকের (Accountant-General) নীরস, বৈচিত্র্যবিহীন, নির্জীব, নিষ্ক্রিয় সংখ্যা-ক্রীড়াকে স্বীকার করেও স্বকীয় দূরদৃষ্টি ও দরদের দ্বারা একটা সজীব সক্রিয় পরিকল্পনাকে রূপদান করে। দুঃখের বিষয় বাংলার রাজস্ব-সচিবের সুদীর্ঘ আলোচনার মধ্যে এমন কিছুর সন্ধান মিলল না যা আমলাতান্ত্রিক গতানুগতিকতার ধারাকে অতিক্রম করেছে; পরন্তু ইহাকে আশ্রয় করে জাতীয় জীবনের যে অবাঞ্ছিত পঙ্কিল রূপ প্রকট হয়ে পড়েছে তাতে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেছেন।

প্রাদেশিক বাজেটের সর্বাপেক্ষা অধিক দায়িত্ব জাতিগঠনমূলক কার্য, জনশিক্ষা ও স্বাস্থ্য। ১৯৩৮-৩৯ সালে শিক্ষা-বিভাগের জন্য বরাদ্দ ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা, আগামী বৎসরের জন্য সেখানে ধরা হয়েছে ১ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। টাকার অঙ্কে চৌদ্দ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেলেও যে নীতি এই অর্থবণ্টন উপলক্ষে অনুসৃত হচ্ছে তাহা অতীব ভয়াবহ। শিক্ষাক্ষেত্রেও যে সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি ও নির্লজ্জ পক্ষপাত অত্যুগ্রভাবে দেখা দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই এবং প্রকৃত শিক্ষা প্রসারে ব্যয় নিয়ন্ত্রিত না হয়ে অধিকাংশ সাম্প্রদায়িক বিদ্যায়তনের অযথা কলেবর বৃদ্ধির অজুহাতে কনট্রাক্টরদের ধনবৃদ্ধি করবার সুযোগ দেয়া হচ্ছে মাত্র। প্রাথমিক শিক্ষার প্রশ্ন অতিশয় সতর্কতার সহিত এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। পাঁচ-ছয় লক্ষ টাকার নামমাত্র বরাদ্দ দেশব্যাপী নিরক্ষতার মহামরুতে বারিবিন্দুর মত নিস্ফল, ইহা নিশ্চিত।

স্বাস্থ্যবিভাগের মোট বরাদ্দ ৪৮॥ লক্ষ টাকা। ব্যাধির নিয়মিত ব্যাপক আক্রমণ হতে

অনাহারে অর্ধাশনে ক্ষীণ-প্রাণ জনগণকে রক্ষা করবার কিছুমাত্র দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টের নয়, রাজস্ব-সচিবের হস্তের কার্পণ্য-দুষ্ট বরাদ্দই তার প্রমাণ।

কৃষি ও শিল্প বিভাগের প্রত্যেককে ১৬ লক্ষ টাকা সম্বল নিয়ে বৎসরের কাজ সমাধা করতে হবে, অনন্য-জীবী কৃষি-সম্বল প্রদেশে একমাত্র বৃত্তিকে অবহেলা করবার কি লজ্জাকর নিদর্শন! প্রত্যেক জনমঙ্গলবিধায়ক দাবীর উত্তরে অর্থের অসদ্ভাবটাকেই বড় করে দেখান হয়, কিন্তু রাজস্বের এক-ষষ্ঠাংশ ব্যয় করে যে শ্বেতহস্তী পরিপোষণের ব্যবস্থা রয়েছে উহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত বরাদ্দ দাবী করে চলেছে। রাজবন্দী মুক্তি দেওয়ার জন্য আনুমানিক ১১ লক্ষ টাকার ব্যয়হ্রাস নিশ্চিত জেনে ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেটে পুলিশের বরাদ্দ হয়েছে ২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা অর্থাৎ গত বৎসর হতে ৭ লক্ষ টাকা বেশী। প্রথমতঃ অন্তরীনেরা কারাপ্রাচীরের অন্তরাল হতে মুক্ত হয়েছে বটে কিন্তু সরকারের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি হতে মুক্তি তারা পায় নাই। দ্বিতীয়তঃ ব্যাপকতর ভাবে মৌলিক অধিকার নিয়ে কৃষক ও শ্রমিকের মধ্যে ক্রম-বর্ধমান আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টের আইন-শৃঙ্খলাকে যাতে পর্যুদস্ত করে না ফেলতে পারে তার জন্য পূর্বাহ্নে প্রস্তুতির ব্যয়— পুলিশ বাজেটের অঙ্কবৃদ্ধির গোড়ার কথা।

বর্তমান বাজেটের অপব্যয়ের মাত্রা সমস্ত সীমারেখা ছাড়িয়েছে সেখানে যেখানে অত্যুগ্র সাম্প্রদায়িক পত্রিকা 'আজাদে'র জন্য ত্রিশ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সরকার-প্রচালিত বাংলা ও ইংরাজী প্রচারপত্র থাকা সত্ত্বেও এমন ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হলাহল উদ্গীরণকারী তৃতীয় শ্রেণীর কাগজখানিকে জনসাধারণের কর-ভাণ্ডার হতে উৎকোচ দানের প্রস্তাব দুর্নীতির চরম দৃষ্টান্ত।

বাজেটের অনুসৃত মৌলিক নীতির অসমর্থনীয়তার আলোচনাশেষে বাজেটের অর্থনৈতিক দিক সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। ১৯৩৯-৪০ সনে বাংলা গবর্ণমেণ্টের আয় হইবে ১৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ১৪ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা, সুতরাং ব্যয়াধিক্য ৮৭ লক্ষ টাকা। বিগত বৎসরের মোট ঘাটতি দাঁড়াবে ১ কোটী ৯ লক্ষ টাকা। এই ঘাটতি মিটাবার জন্য আপাততঃ দুইটি নূতন ট্যাক্স বসানো হবে, একটি কুকুর দৌড়ের উপর ও দ্বিতীয় বিবিধ পেশা ব্যবসা প্রভৃতির উপর বার্ষিক ৩০৲ টাকা হিসাবে। এতদ্দ্বারা ১২ লক্ষ আয় হবে আশা করা যায়। প্রয়োজন হলে আগামী বর্ষাকালে নূতন কর-ধার্য করার পরিকল্পনা রাজস্ব-মন্ত্রীর রয়েছে। কুকুর দৌড়ের ট্যাক্স নীতি হিসাবে সম্পূর্ণ অসমর্থনযোগ্য। এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে আয়ের কথা বিবেচনা করলে একই নীতিতে Turf club এর উপর ট্যাক্স অধিকতর উপযোগী। আয় করের উপর একহারে ত্রিশটাকা স্বল্প-আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে অসহনীয় হবে বলে যে আপত্তি উঠেছে তাহা আমরা স্বীকার করি না। এই দেশে ১৬৬৷৵৮ পাই মাসে যাদের রোজগার তাদিগের মাসিক ২৷৹ টাকা ট্যাক্স দুর্বহ একথা মনে করা সমীচীন হবেনা। তবে উর্দ্ধতন

আয়ের উপর বর্ধিত হারে ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা হলে আপত্তির কারণ থাকত না। রাজস্বসচিবের বক্তৃতা হতে আমরা ইহা বুঝলাম যে কর নির্ধারণের সাধারণ নীতিকে এক্ষেত্রে বাধ্য হয়েই তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে, তা না হলে উহা আয়করের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ত এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের পক্ষে বিধি বহির্ভূত আদায় বলে গণ্য হত।

ঘাটতি মিটাবার জন্য গভর্ণমেন্টকে এক কোটি টাকা ঋণ করতে হবে এবং এতদ্দ্বারা বৎসরের শেষে ৩৬ লক্ষ টাকা বর্ষশেষের তহবিলে উদ্বৃত্ত থাকবে। ১২ লক্ষ টাকা দুর্ভিক্ষ বীমা ফণ্ড, ২৮৷৷ লক্ষ টাকার সিকিউরিটী ও ৮৫ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের ব্যবস্থা রেখে পুরোপুরি এককোটী টাকা ঋণ করে ৩৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত তহবিল দেখানোর পক্ষে খুব জোরালো যুক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়! আমাদের মতে Turf Club এর উপর ট্যাক্স বসিয়ে এই ঘাটতি অনায়াসেই মিটানো যেত। একান্ত পক্ষে ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ করিয়া বাকীটা ট্রেজারী বিলের পরিমাণে কমিয়ে দিলেও চলত। এত অধিক সতর্কতা কি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জন্যই প্রয়োজন?

কর্পোরেশন বাজেট

কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেট প্রস্তাব পেশ করবার প্রসঙ্গে প্রধান কর্মকর্তা যে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন তার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। এই নয় বৎসরে কর্পোরেশনের বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯০, ৩০,০০০ টাকা অর্থাৎ গড়ে নয় লক্ষ টাকা এবং বাৎসরিক উদ্বৃত্ত তহবিলের পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকা হতে ক'মে আগামী বৎসরে ৩৪ লক্ষ টাকায় দাঁড়াবে। একথা সত্য যে, আমরা অযথা এত অধিকপরিমাণ অর্থকে বন্ধ্যা করে রাখবার পক্ষপাতী নই, প্রয়োজন অনুসারে তার সদ্ব্যয় চাই। তবুও এদিকে যে নিয়মিত ভাবে প্রতিবৎসর আয়ের অতিরিক্ত বাঁধা বরাদ্দের ব্যয় চলেছে তা কাহারও দৃষ্টি এড়াতে পারেনা। এই প্রশ্নের সব চাইতে আশঙ্কার দিক হল এই যে, ১৯৩৭-৩৮ সালের হিসাবে ২৫ লক্ষ টাকা অনাদায়ী বলে দেখান হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ না করে পারা যায় না যে কর্পোরেশন পরিচালনার ব্যয় ভার সমস্ত আনুমানিক আয়ের শতকরা ২৮ ভাগ।

একথা অনস্বীকার্য যে কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির পথ খুঁজে বের করতে হবে। নাগরিক-জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উন্নততর পরিকল্পনার জন্য এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার খাতে খরচের পরিমাণ দিন দিন বেড়ে চলেছে। তা ছাড়া অবশ্যকর্তব্য হিসাবে রাস্তাঘাট জল সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালীর নির্মাণ ও সংস্কার কার্যেও যথেষ্ট ব্যয়বৃদ্ধির আবশ্যকতা রয়েছে। কথা অনুযায়ী প্রাদেশিক সরকারের কাছ হতে আমোদ প্রমোদের উপর ট্যাক্স, বিদ্যুৎ ব্যবহারের উপর ট্যাক্স ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণের ট্যাক্সের দাবী সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য, কারণ এগুলো প্রাদেশিক অপেক্ষা স্থানীয় ট্যাক্স হিসাবেই অধিকতর উপযোগী। এতদ্ব্যতীত কেন্দ্রীয় রাজকোষ হতে পাটশুল্ক ও আয়করের

অংশভাগী প্রাদেশিক সরকারকে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনশীল প্রতিষ্ঠানের জন্য কিঞ্চিৎ রাজস্ব বন্টনের জন্য চাপ দেওয়া অযৌক্তিক হবে না। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করবার জন্য প্রধান কর্মকর্তার অভিপ্রায় অনুযায়ী একটি শিক্ষাকর প্রবর্তনের পক্ষেও আমাদের অনুমোদন রয়েছে। আমাদের ন্যূনতম দাবী অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা--যদি নাগরিক বাঁধাবরাদ্দের দায় মিটিয়ে উদ্বৃত্ত না থাকে অগত্যা শিক্ষাকরই প্রবর্তন করা হোক। করভার-প্রপীড়িত নগরবাসীরা জাতীয় কল্যাণের এরূপ পরিকল্পনাকে মেনে নেবার পূর্বে কর্পোরেশনের পরিচালনার ব্যয়হ্রাস ও অপব্যয় নিবারণের জন্য প্রতিশ্রুতি দাবী করলে তা দিবার মতন সৎসাহস কাউনসিলারদের আছে বলে আমরা বিশ্বাস করতে পারবনা কি ?

বাঙ্গলার কৃষক আন্দোলন ও ক্যানাল-কর

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে কিষাণ সমস্যা আজ জাতির নিকট সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা। ভারতে শতকরা ৯৫ জন কৃষক। দেশের ভাগই একান্ত দুঃস্থ, এদের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ও বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করছে দেশব্যাপী বিপ্লবাত্মক গণ-আন্দোলনে। এ ক্রমবর্দ্ধনশীল বৈপ্লবিক চেতনার ফলে বাঙ্গালা দেশে কৃষক আন্দোলন ধীরে ধীরে তীব্র রূপ নিচ্ছে। ১৯৩৭-৩৮ সালের সরকারী রিপোর্টে জমিদার ও প্রজা বিরোধের কারণ আলোচিত হয়েছে। জমির উপর নিজের স্বত্ব সম্পর্কে প্রজাসাধারণের ধারণার পরিবর্তন, কৃষক প্রজা আন্দোলনকারীদের অনবরত ভূমি সম্পর্কে নূতন মতবাদ প্রচার, কংগ্রেস গণসংযোগ প্রচার এবং absentee জমিদার ব্যবস্থা ইত্যাদি কারণে কিষাণ আন্দোলন সুরু হয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লিখিত হোয়েছে। অত্যন্ত ভাসাভাসা কথা। এ অসন্তোষের মূলে রয়েছে বৈদেশিক শোষণ ও অর্থনৈতিক বৈষম্য।

বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সংঘাতে গণ আন্দোলন গড়ে উঠ্ছে। বর্দ্ধমান অঞ্চলে ক্যানাল-কর নিয়ে কৃষক আন্দোলন চল্‌ছে। এ সব খণ্ড আন্দোলন দেশব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামেরই অংশ। সরকারী কমিশন নিয়োগ বা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে এ আন্দোলন দমন করা যাবে না। দিন দিন ইহা ব্যাপক ও গভীর হবে। দেশ বিপ্লবের দিকে চলছে। অধ্যাপক রাধাকমল তাই বলছেন 'such a crisis demands wise, constructive land legislation and re-settlement, which should no longer be delayed from fear of angering vested interests or from apathy towards the unvocal classes ; for delay is bound to sow the seeds of an agrarian revolution'.

ওয়ার্কিং কমিটির পদত্যাগ

ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রাক্কালে এবং সুভাষচন্দ্রের অসুস্থাবস্থায় ওয়ার্কিং কমিটির পদত্যাগ যে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হয়েছিল, গত কংগ্রেস অধিবেশনে দেশবাসী বেশ স্পষ্টভাবেই

বুঝেছে। নিজেদের দুরভিসন্ধি গোপন করার জন্য বল্লভাচারীদল পদত্যাগকালে দেশবাসীকে বুঝাল 'time had come when the country should have a clear-cut policy not based on compromise between imcompatible groups of Congress.'. আজ সে সব কপট কথার স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। বৃহত্তর ঐক্য ও জাতীয় সংহতির নামেও যখন তাঁরা তাঁদের দেওয়া সর্ত হতে এক চুলও নড়তে পারলেন না, তাতেই মনে হয় 'Resignations were prompted by other than political reasons'. ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও দলগত ষড়যন্ত্র যে এর পশ্চাতে অনেকখানি কাজ করেছে তা আর বুঝতে কারো বাকী নেই। এর ভিতর সবচেয়ে নৈরাশ্যকর ব্যাপার হয়েছে জবাহরলালের কার্য্যকলাপ এবং আত্মদোষ স্খালনের জন্য তাঁর রাষ্ট্রপতিকে অপবাদ দেওয়া।

রাজকোট

মহাত্মার অনশনভঙ্গে আসমুদ্র হিমাচল ভারত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পেরেছে। রাজকোট সমস্যার সমাধান জনসাধারণের প্রাণে নতুন আশার ইঙ্গিত এনেছে। বিশ্বাস জাগিয়েছে—ক্ষুদ্র জয়ের পরে বৃহত্তর জয় অবশ্যম্ভাবী। ভারতের কালিমা ও বিস্ময় মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের ব্যাপক সংস্কার যে বৃটিশ ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত সে কথার উত্তরোত্তর স্বীকৃতি হচ্ছে। হরিপুরা নীতির পরিবর্ত্তন যে প্রয়োজনীয় তাতে আর সন্দেহ নেই। মহাত্মার অনশন ও ত্রিপুরীর সঙ্কল্প নতুন দিনের সূচনা এনে দিয়েছে।

Paramount Power এর 'status quo' নীতি যে অর্থহীন, এবং সামন্ততন্ত্রের ছদ্মবেশধারী আশ্রয়স্থল, এ কথা পুরাণো। অথচ প্রভুদের কাণে তা প্রবেশ করাতে হলে আমাদের সঙ্কল্প অটল হওয়া চাই। ভারতব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে সামন্তরাজ্যের সংগ্রামকে যুক্ত করলে তবেই ভারতের মুক্তি।

ত্রিপুরীতে হরিপুরা নীতির সাময়িক উপযোগিতাকে সমর্থন করার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়। তবে নিখিল-ভারত কিষাণ সভায় যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে আমরাও তার প্রতিধ্বনি করে এই কথা বলতে চাই যে, ক্ষুদ্র লাভের উল্লাসে যেন আমরা বৃহৎ হাহাকারকে ভুলে না যাই; রাজকোটের সাফল্যে অন্যত্রের নৃশংস বর্বরতা আমাদের সতর্ক দৃষ্টির নেপথ্যে না যাক; আমাদের সঙ্কল্প ও শুভবুদ্ধির সঙ্গে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি যেন সদাজাগ্রত থাকে। "Big struggles followed by hasty attempt of compromise are likely to stabilise the shaky system of state goverments"—এ কথা মনে রাখা চাই।

প্যালেষ্টাইন

মহাযুদ্ধের পরে কালনেমির লঙ্কাভাগ যখন সমাপ্তপ্রায়, বেচারা আরব চোখ চেয়ে দেখলো তার ভাগে প্রায় শূন্যই পড়েছে। ম্যাকম্যাহোন্ এর স্তোকবাক্যে ভুলে আরব রঙীন স্বপ্নে বিভোর

ছিল। সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পুরস্কার হিসেবে দেশের স্বাধীনতা যে করায়ত্ত হবে সে বিষয়ে আরববাসীর সন্দেহ ছিল না। সাম্রাজ্যবাদীর চক্রান্ত ও কূটরাজনীতি মক্কার শরীফ হুসেন বুঝে উঠতে পারেন নি, বিশ্বাস করেছিলেন ইংরেজের প্রতিশ্রুতিকে। তুরস্ক, তথা জার্মাণীর শক্তিক্ষয়ের সুরাহা কিচেনারের উর্বর মস্তিষ্কে ঠাঁই পাবার পর ম্যাক্‌ম্যাহোনের দক্ষতায় এবং বহুরূপী লরেন্সের কৌশলে আরব বিদ্রোহে পরিণত হোলো। এদিকে, প্রতিশ্রুতিতে কল্পতরু ইংরেজ য়িহুদীর দুঃখে বিগলিত হয়ে লর্ড ব্যালফুরের মারফতে ঘোষণা করলেন যে এই ভাগ্যহারা ছন্নছাড়াদের মাথা গোঁজবার ঠাঁই—একটা "জাতীয় বাসভূমি"—খুঁজে দেবার দায়িত্ব তাঁরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করছেন। সাম্রাজ্যবাদবিশারদ ইংরেজ সে দুর্দিনে য়িহুদী ধনকুবেরদের হাতে রাখবার এর চেয়ে ভাল ফন্দী আর খুঁজে পায়নি।

আরবের অশান্তি দুই বিভিন্নমুখী প্রতিশ্রুতির প্রতিক্রিয়া—একথা বুঝতে কষ্ট হয় না। প্রাণ দিয়ে সে স্বাধীনতা অর্জ্জনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হোলো,—প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের, বিশ্বাসঘাতকতার ইতরতাকে ব্যর্থ এবং পরাজিত করে তাকে আয়ত্তে আনতে হবে; নিজবাসে আর পরবাসী হয়ে থাকা চলবেনা— এই হোলো আরববাসীর সঙ্কল্প। আরববাসী ভীরু নয়, রক্তচক্ষুর মূল্য তাদের কাছে নেই, সত্য ক্রমেই সহজ-বধির সাম্রাজ্যবাদীর কাণেও প্রবেশ করছে। অতএব, আয়োজন হল লণ্ডনে প্যালেষ্টাইন বৈঠকের।

প্যালেষ্টাইনকে ত্রিখণ্ডিত করবার মূর্খ পরিকল্পনা যে অচল সে কথা বিলম্বে হলেও, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক দপ্তরখানার অন্ধ চক্ষুতেও অঙ্কশলাকার কাজ করবে। লণ্ডনে বিরুদ্ধ-স্বার্থকে সামঞ্জস্যে আনবার ব্যর্থ চেষ্টা যে হাস্যকর ভাবেই পরিসমাপ্ত হবে তাতে সন্দেহ নেই। এদিকে আরব— তথা মোসলেমজগতকে তুষ্ট রাখার প্রয়োজনীয়তা, অপরদিকে য়িহুদীর সাহায্যে পশ্চিম আরবকে সাম্রাজ্যের অটুট দুর্গ হিসেবে ব্যবহার করার স্বার্থ যে কেমন করে লণ্ডনের যাদুকররা এক সূতোয় গাঁথবেন—এ ভোজবাজী কৌতূহলোদ্দীপক হতে পারে, কিন্তু বাস্তব রাজনীতিক্ষেত্রে অসম্ভবকে সম্ভব করতে যাওয়ার মূঢ়তা অশান্তি এবং দুর্ভোগকেই বাড়িয়ে তোলে। ভাগ্যের দক্ষিণমুখ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করে এসেছে, কিন্তু হিসাব-নিকাশের দিনকে যথেচ্ছ পিছিয়ে দেওয়া চলেনা। সাম্রাজ্যবাদীর ব্রহ্মাস্ত্র Divide and rule অতঃপর আরবের ওপর হানবার প্রচেষ্টা লণ্ডন বৈঠকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভারত-ব্যাপারেও লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে এ নীতির শরণাগতি নেওয়া হয়েছিল। প্রভুভক্তদের প্রলুব্ধ করে আরবের জাতীয় সংহতিকে ব্যাহত করবার ষড়যন্ত্র কতদূর সফল হবে সে কথা বলা দুঃসাধ্য হলেও এটুকু বলা যায় যে ভারত ও আরবের প্রভেদ স্পষ্ট। কিন্তু চেম্বারলেনীয় নীতির বৈশিষ্ট্য—স্পষ্টকে অস্পষ্ট করে তোলা, অথবা জেগে ঘুমিয়ে থাকা। একদা এক বিকট দুঃস্বপ্নে চেম্বারলেনী অলীক ঘুম ভাঙ্গবে তা আমরা জানি। আরবের জাতীয় সংহতি সেদিনকে জাগিয়ে নিয়ে আসুক।

অনগ্রসর বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষৎ

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে কলিকাতা মিউনিসিপাল বিল, আয়কর বিল ইত্যাদি এবং ব্যবস্থাপক সভায় পুলিশকে অধিকতর ক্ষমতা দেবার জন্য এক বিল পেশ হয়েছে। যখন অন্যান্য প্রদেশ দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে, সেই সময়ে বাংলার মতো প্রাগ্রসর প্রদেশকে আমলাতন্ত্রী যুগে নিয়ে যাবার চেষ্টা ভবিষ্যতের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। এর বিরুদ্ধে জাতির সমবেত প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক।

নিবেদন। বৈশাখের 'জয়শ্রী' অধিকতর সমৃদ্ধ করবার আয়োজন চলছে। ভাল ফটো ও ছবি আমরা সাদরে গ্রহণ করব। যদি কোন সংখ্যা জয়শ্রী যথাসময়ে কেউ না পান, অনুগ্রহপূর্বক জানালে তৎক্ষণাৎ প্রতিকার হবে।

সপ্তম বর্ষ | বৈশাখ—১৩৪৬ | একাদশ সংখ্যা

জন্মদিন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তব জন্মদিনখানি
বিস্তীর্ণ করেছ তুমি কতদিকে কত দূরে টানি
দিয়েছ আতিথ্য তুমি তাহে
অবিরাম দাক্ষিণ্য প্রবাহে
অকুণ্ঠিত সমাদরে কখনো বা সস্মিত শাসনে
বসায়েছ সৌহৃদ্যের উদার আসনে,
কখনো বা সখাদের কখনো ক্ষণিক অতিথেরে।
বিচিত্র সংসারখানি অকৃত্রিম বন্ধুত্বের ঘেরে
সৃষ্টি করিয়াছ তুমি
তোমার আত্মার জন্মভূমি

পথে যেতে যেতে কবে আত্মীয়ের দলে
কুসুমিত কুঞ্জতলে
প্রবেশ করেছি এসে।

তুমি হেসে
ডাকিয়া ঘরের মাঝে ধ্রুব অধিকার
করেছ বিস্তার
পথিকের বিদায়ের পথ
কাড়িয়া নিয়াছে কবে তোমার জগৎ

আপন প্রাণের গড়া সে তব দ্বিতীয় জন্মস্থান।
ছায়ায় দাঁড়ায়ে তারি সঁপিলাম কবির এ গান।
তব জন্মদিনটিরে
ছন্দে মোর রাখিলাম ঘিরে।

শান্তিনিকেতন
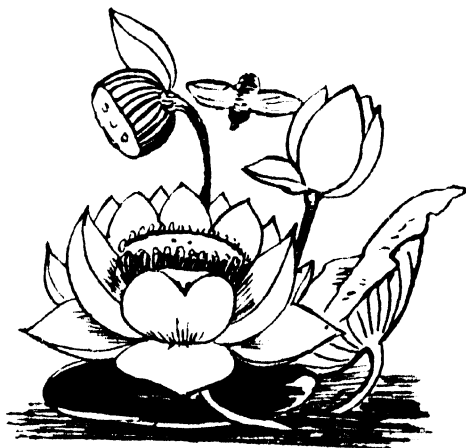
নব বর্ষ

যুগসন্ধির সিন্ধুতুফান ঘনায়ে আসে,
উত্তাল জল নাবিকের দল কাঁপিছে ত্রাসে।
ঘনায় কালিমা প্রলয়ঙ্কর ঈশান মেঘে,
ছোটে এলোমেলো উন্মাদ হাওয়া ঝঞ্ঝাবেগে।

সারা পশ্চিমে কোন্ সে সওয়ার হাঁকিয়া ফিরে,
চালায় সজোরে বিজলী-চাবুক আকাশ চিরে।
ফুঁষিয়া রুষিয়া ওঠে তরঙ্গ উর্দ্ধমুখে,
বিপৎপাতের ঘণ্টা বাজিছে পোতের বুকে।

বিদরি' গগন ধ্বনিয়া উঠিছে দামামা কাড়া,
ক্রুদ্ধসিংহ গর্জ্জিছে দিয়া কেশর নাড়া।
ক্ষুদ্রতরীর শংকিত মাঝি সভয়করে
চেপে ধরে হাল, চূর্ণ হবে কি পাষাণচরে?

শূন্য ঊর্দ্ধ হতে ডানা মেলি বিরাট ছাঁদে
ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে লৌহ-ঈগল তীব্রনাদে।
উগ্রলোচনে জ্বলে ঘর লোভ দুর্বিষহ,
পাখার আড়ালে মারণ-বজ্র বহ্নিবহ।

নিঃশ্বাসঝড়ে উষ্ণ অনল ঝলসি' উঠে ;
ধরা সংহারি ধ্বংস উহার চঞ্চুপুটে।
শূন্য আলোড়ি দ্রুত নেমে আসে ঈগল পাখী
বিশ্ব প্লাবিয়া রক্তের স্রোত বহাবে নাকি ?

গিরি পশ্চিম ঘুরিছে করাল ঘূর্ণী আঁধি,
জননী-পৃথ্বী ব্যথায় লুটায় গুমরি' কাঁদি।
প্রলয় নাচনে বুঝি মহাকাল উঠেছে মেতে,
সপ্তসিন্ধু উত্তাল হল গর্জনেতে।

আকাশে বাতাসে শংকা জেগেছে, সৃষ্টি কাঁপে,
সূর্য চন্দ্র যেন ম্লানমুখ সভয়ে ঝাঁপে।
শ্যামলা ধরণী হারায়ে যাবে কি পাতাল মাঝে ?
সারা পৃথিবীতে বিপদসূচক বংশী বাজে।

মহা মরুভূমি আছে একাকিনী অনেক দূরে,
কালো মেঘ হেরি হৃদয় তাহার পুলকে পূরে।
ঊর্ধ্বে তাকায়ে সে কাতরে কহে,—বজ্রপাণি,
ঘুচাও ধরার কলুষের ভার কুলিশ হানি।
সব সুধা মোর শোষিয়া লয়েছে যাহারা প্রভু,
দেবরাজ তুমি করিওনা ক্ষমা তাদের কভু।

নীলজল হেথা আছিল একদা নয়নলোভা,
চন্দ্রকিরণে কীর্ণ হইত স্বর্গশোভা।
মীনসন্ধানী রূপালী সিন্ধুকপোত যত,
ঊর্মিলহরী ঘেরিয়া উড়িত নিরন্তত।
হৃদয় হইতে লুটেছে আমার রত্নরাশি,
সাগর আজিকে ধূ ধূ মরুভূর অট্টহাসি।

লুপ্ত হয়নি অতীত চিহ্ন এখনো কত
জীবকঙ্কাল রয়েছে ছড়ায়ে ইতস্ততঃ।
কী নালিশ করে যুগ যুগ ধরি আকাশে তা'রা?
তপ্ত বাতাস ফুঁপিছে রুদ্ধ গরুড় পারা।

নীলসমুদ্র পীতবালু হ'ল ভাগ্যদোষে,
মধ্যাহ্নের সূর্য ঊর্ধ্বে জ্বলিল রোষে।
আজ পিঙ্গল উষ্ণ ঊষর সে মহামরু,
বিরাট বক্ষে ক্বচিৎ রুক্ষ কাঁটার তরু।

সে চাহে তো তাই প্রলয় ঝঞ্চা বর্ষাধারা,
দূর সিন্ধুর গানে আজো হয় আত্মহারা।
ঐ সমুদ্র সেও তো আছিল, মিথ্যা নহে,
মরু ঝটিকার বিষাক্ত জ্বালা আজ সে সহে'।

উষ্ট্রচরণ-বিক্ষত তার পাঁজর স্থলে,
পরধনহারী দস্যুর লীলা বক্ষে চলে।
নাই মানবতা নাই শ্যামলতা শ্বসিছে বায়ু,
আসুক প্রলয় পৃথিবী গ্রহের ঘুচুক আয়ু।

যত জলপোত ডুবুক অতলে তৃণেরই মত,
সমান হউক মাঝারি বড় ও ছোটরা যত।
ধ্বংসদেবতা, দাও ভেদাভেদ শূন্য করি,
মরুভূমি পুনঃ হোক মহোদধি, ভাসুক তরী।

প্রলয়ের পরে আবার সূর্য উদিবে প্রাতে,
শান্ত উষসী উতরিবে নব আলোক সাথে।
সেই প্রভাতের নূতন বর্ষ সত্য, শ্রেয়ঃ।
নববর্ষের বন্দনা কবি সেদিন গেয়ো।।

চাই আহাম্মুকি—বেআদবি

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার

১৯০৫ সালের গৌরবময় বাঙালী বিপ্লবের পর আজ তেত্রিশ-চৌত্রিশ বৎসর চলিতেছে। পশ্চিমা হিসাবে ইহা এক পুরুষ কাল। এই এক পুরুষে গোটা ভারত অনেকখানি বাড়িয়াছে। আমাদের বাংলা দেশ আর বাঙালী জাতিও বেশ-কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু বাড়িয়াছে কতটা, বাড়িয়াছে কোন্-কোন্ দিকে, জীবনের গতিভঙ্গী কিরূপ, গতির হার কিরূপ, ইত্যাদি বিষয়ে বাংলায় অথবা বাংলার বহির্ভূত ভারতে বেশী আলোচনা হয় নাই। এই সকল দিকে আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা যখন-তখন "আঙ্গুল ফুলে' কলাগাছ" হইয়া বসিয়া থাকেন। তাঁহাদের মেজাজ অল্পেই, নেহাং অল্পেই, সন্তুষ্ট। অধিকন্তু, যে-সকল বাড়তি বা উন্নতি তাঁহাদের নিজ জীবনের সঙ্গে জড়িত অথবা যে-সকল উন্নতি-বাড়তির ধাপগুলা তাঁহাদের পরিবারের কোনো-না-কোনো লোকের কৃতিত্ব বা কীর্ত্তির পরিপোষক সেই সকল উন্নতি-বাড়তির আলোচনা কিম্বা সমালোচনা এই ধরণের লোকের মেজাজে ঠাঁই পায় না। পাইতে পারে না।

কিন্তু পাঁচ কোটি বাঙালীর কথা অথবা পঁয়ত্রিশ কোটি ভারতীয় নরনারীর বর্ত্তমান ও আগামী ভবিষ্যৎ যাহাদের চিন্তায় ঠাঁই পায় তাহাদের পক্ষে এইরূপ "আঙ্গুল ফুলে' কলা গাছ" হইয়া বসিয়া থাকা সম্ভবপর নয়। তাহারা বরং কলাগাছগুলাকে বাঁশের কঞ্চি মাত্র অথবা এমন কি মামুলি দেশলাইয়ের কাঠি ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারে না। ষাঁড়ের ঘাড়ে মশাটা যে মশা মাত্র এই সামান্য কথাটা মশা মশায়ের মনে থাকে না। কিন্তু তার আশে-পাশে ইঁদুর-টিকটিকি, গরু-বলদ, কুকুর-বিড়াল সকলেই মশার হাঁম-বড়ামি দেখিয়া পরস্পর হাসাহাসি করে।

বাঙলার যৌবনশক্তিকে আজ আত্ম-সমালোচনায় অগ্রসর হইতে হইবে। আত্ম-সমালোচনার জন্য স্বতন্ত্র আত্মিক আন্দোলন যুবক ভারতে অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। সমালোচনার কষ্টিপাথর সম্বন্ধেও একাধিক আলোচনা-সমালোচনা চাই। ১৯০৫ এর পূর্ব্বেকার যুবক ভারত আর যুবক বাংলা কি ছিল, ১৯৩৯ সনের যুবক ভারত আর যুবক বাংলা কোথায় আসিয়া ঠেকিয়াছে,—এই

সকল বিষয়ে মগজ খেলাইবার জন্য চাই গণ্ডা-গণ্ডা গবেষক, লেখক, বক্তা। অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের মতন উন্নতি-বিজ্ঞান বা বাড়তি-বিজ্ঞানের জন্যও যুবক বাংলায় আর যুবক-ভারতে বাদানুবাদ, তর্কাতর্কি, আর মতামত পুষ্ট হইতে থাকিলে আমাদের একটা মস্ত অভাব পূরণ হইবে।

উন্নতি-বাড়তি মাপা সম্ভব আর্থিক কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ও চিন্তাক্ষেত্রে। এই জরীপ চালানো যাইতে পারে রাষ্ট্রিক আন্দোলনের কর্ম্ম ও চিন্তা সম্বন্ধে। তাহা ছাড়া জ্ঞানবিজ্ঞান, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ইত্যাদি নানা প্রকার বিদ্যা-কলার ক্ষেত্রে ভারত-সন্তান আর বঙ্গ-সন্তান এই এক পুরুষে কতখানি আগাইয়া আসিয়াছে তাহাও মাপাজোকা চলিতে পারে। জরীপ করিবার জন্য লোক চাই বহুবিধ, বহুসংখ্যক এবং বহু-মেজাজের। মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমাদের আসল জিজ্ঞাস্য,—একালের ভারত-সন্তানেরা কলাগাছ না কঞ্চি না দেশলাইয়ের কাঠি। বলা বাহুল্য, কতকগুলা নির্লজ্জ, বেহায়া, খাতির-নদারং, ঠোঁটকাটা সমজদার চাই। এই ধরণের নয়া-নয়া নির্লজ্জ-বেহায়া সমালোচকের উপর আগামী তিন-পাঁচ-সাত বৎসরের বঙ্গ-জীবন ও ভারত-জীবন নির্ভর করিতেছে।

আমার বিবেচনায় আত্ম-সমালোচনা, বেপরোআ, নিরপেক্ষ, ঠোঁটকাটা, খোলা মাঠের বিশ্লেষণ,—ছাড়া কোনো লোক কোনো দিন একটা বড়-কিছু করিতে সমর্থ হয় নাই। একটা দল, সঙ্ঘ, সমাজ, দেশ ইত্যাদি বৃহত্তর সত্তাকে জুতাইয়া ঠেলিয়া তুলিবার জন্যও জরুরী ঠিক এই ধরনের খোলামাঠের সমালোচনা। প্রতি মুহূর্তেই চাই প্রত্যেক ব্যক্তি ও সঙ্ঘের জন্য ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সঙ্ঘ-নিরপেক্ষ পরিদর্শন ও পর্য্যালোচন। সর্ব্বদাই প্রত্যেক আত্মিক অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলন এই ধরণের সংশোধন ও সংমার্জ্জনের জন্য বসিয়া আছে। নিজকে শুধ্‌রাইবার জন্য ও মেরামৎ করিবার জন্য, যে-লোকটা যে-দলটা, যে-প্রতিষ্ঠানটা সর্ব্বদা প্রস্তুত নয় তাহার কপালে উন্নতির বরাদ্দ শূন্য।

এই ধরণের সংশোধন, সংমার্জ্জন ও শুধ্‌রানো ইত্যাদি কাজের জন্য ওস্তাদ কাহারা হইতে পারে? আমার বিশ্বাস, দুই ধরণের অথবা দুই বয়সের লোক এই সকল ঠোঁট-কাটা সমালোচনা ও খাতির-নদারংপ্রশ্নপ্রশ্নি করিতে অধিকারী। প্রথমতঃ, যাহারা মোটের উপর ১৬ হইতে ২০ বৎসর বয়সের তরুণ-তরুণী, এক কথায় যাহারা ইস্কুল-কলেজের আওতা এখনো পার হয় নাই, বস্তুতঃ যাহারা এখনো ইস্কুল-কলেজের খানিকটা নিচের সিঁড়িতেই পায়চারি করিয়া থাকে। বর্ত্তমান দুনিয়াটা যে নেহাৎ অপদার্থ একথা চিন্তা করার এবং বিশ্বাস করার ক্ষমতা একমাত্র তাহাদের। সংসারের লোকগুলা যে স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর, ম্যাড়াকান্ত, "আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ" এইরূপ মত প্রচার করিবার মতন বুকের পাটা তাহাদের পক্ষে অতি-স্বাভাবিক। কোনো
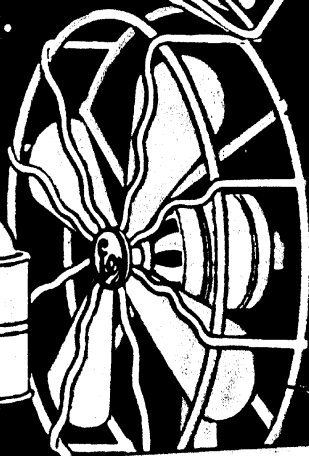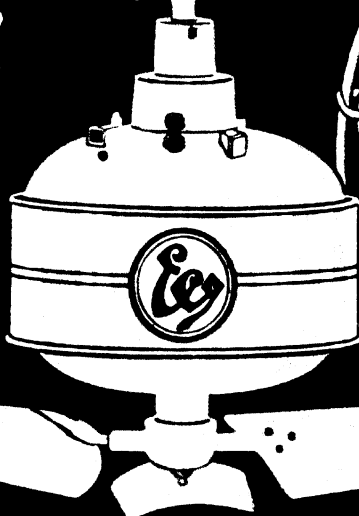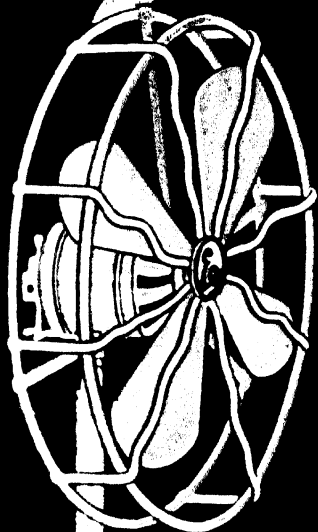
Eco Family
A.C.
D.C.
H. G.
Elegant
Comfortable
Economical
Efficient
Compact
MANUFACTURERS
The EVEREST ENGINEERING Co., LD.

নামজাদা লোকের দিকে তাকাইয়া তাহারা মত প্রকাশ করিতে বাধ্য হয় না। কোনো নামজাদা লোকের হাসির উপর তাহাদের জীবনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে না। তাহারা ভাবিতে সমর্থ যে, দুনিয়াটা যে ভাবে চলিয়া আসিয়াছে তাহাদের হাতে আসিলে দুনিয়া সে ভাবে চলিবে না। তাহারা নামজাদাগুলাকে কলা দেখাইয়া একদম অজানা পথে দুনিয়াটাকে হিড়-হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া যাইবে। এইরূপ চিন্তা করা আহাম্মুকি হইতে পারে, অলীক কল্পনা হইতে পারে, চরম বেআদবি হইতে পারে। কুছ পরোআ নাই। কিন্তু দুনিয়ার সকল দেশে সকল যুগে ১৬-২০ বৎসরের তরুণ-তরুণীরা সংসারের দিকে তাকাইয়াছে আর বলিয়াছে,—"সবুর কর, দুনিয়া, আমরা তোকে নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়িব।" পৃথিবীর উন্নতির গোড়ার কথা এইখানে। এই আহাম্মুকি-বেআদবির ভিতরই আধ্যাত্মিক দম্ভ কিল্‌বিল্ করিতেছে। ১৯০৫ সনের যুবক-বাঙলায় আর যুবক-ভারতে যাহারা ১৬-২০ বৎসরের লোক ছিল তাহাদের মধ্য হইতেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বিগত সাড়ে তিন দশকের কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীরগণ। এই সকল কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীরের কিম্মৎ যাহাই হউক না কেন, তাহারা ১৬-২০ বৎসর বয়সে অন্ততঃ একবার স্বপ্ন দেখিয়াছে যে, দুনিয়াটাকে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া দুরস্ত করিবার এক্‌তিয়ার একমাত্র তাহাদের।

আজ ১৯৩৯ সনের ষোল হইতে বিশ বৎসর বয়সের তরুণ-তরুণীদের ভিতর যাহারা কল্পনা করিতেছে, যে ১৯০৫ সনের পর হইতে আজ পর্যান্ত যাহা-কিছু ঘটিয়াছে তাহার কিম্মৎ এক দামড়িও নয় একমাত্র তাহারাই আগামী তিন-পাঁচ-সাত বৎসরের বাঙালী ও অ-বাঙালী ভারতীয় সমাজকে চাবকাইয়া বড় করিতে পারিবে।

এইবার বলিব দ্বিতীয় ধরণের বা বয়সের লোকের কথা। যাহাদের বয়স বৎসর ছাব্বিশেক পার হইয়াছে অথচ যাহারা এখনো ত্রিশকে জবাব দেয় নাই তাহাদের কথা বলিতে চাই। এই লোকগুলা ইস্কুল-কলেজ-জাতীয় পাঠশালার লেখাপড়া খতম করিয়াছে। তাহাদের চোখের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে দুনিয়া। এই সকল লোকের ভিতর যদি মানুষের মতন মানুষ থাকে তাহা হইলে তাহারা কি করিবে? তাহারা কোনো নামজাদা জননায়কের পা চাটিয়া নিজের বা দেশের ভবিষ্যৎ গড়িবার চেষ্টা করিবে না। তাহারা বসিবে সকল প্রকার হোমরা-চোমরাগুলাকে জরীপ করিতে,—দেখিবে রামা কিঞ্চিৎ-কিছু করিয়াছে বটে তবে বেশী-কিছু নয়। তাহারা বলিবে, আবদুলের কিম্মৎ নেহাৎ মন্দ নয় তবে হাতী-ঘোড়াও নয়, ইত্যাদি। নাক সিঁট্‌কানো তাহাদের ব্যবসা হইবে না। তাহাদের ব্যবসা হইবে "কত ধানে কত চাল" বস্তুনিষ্ঠরূপে বুঝিয়া লওয়া। তাহাদের লক্ষ্য থাকিবে বিগত ৩৩-৩৪ বৎসরের ভারতীয় ও বাঙালী কাজ এবং চিন্তাগুলাকে বাজাইয়া দেখা। বাজাইতে-বাজাইতেই তাহারা দেখিতে পাইবে যে আজ পর্য্যন্ত বেশীকিছু সাধিত হয় নাই। লাফালাফি করিবার কিছু নাই। চাই নতুন লোক, চাই নতুন উন্মাদনা,

চাই নতুন স্বার্থত্যাগ, চাই স্বাধীনতার নতুন আকাঙ্ক্ষা, চাই স্বদেশসেবার" নতুন আধ্যাত্মিকতা।

যে-কয়টা লোক কাজ বা চিন্তা করিয়াছে তাহাদিগকে স্বর্গে তোলাও বেআকুবি আবার নরকে পাঠানোও আহাম্মুকি। কঞ্চিকে কঞ্চিই বলা উচিৎ। কঞ্চিটা কলাগাছ ও নয় দেশলাইয়ের কাঠি ও নয়। আজ চাই গণ্ডা-গণ্ডা, ডজন-ডজন ২৬-৩০ বৎসরের লোক যাহারা নতুন-নতুন জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে নয়া-নয়া দুনিয়া সৃষ্টি করিবার জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িবে আর ভাবিবে যে, ১৯০৫-৩৯ এর লোকেরা যেখানে পাইয়াছে শতকরা ১৫-২৫ মাত্র সেখানে তাহারা পাইয়া ছাড়িবে কম-সে-কম ২৫-৩৫। বৎসর বার-তের হইল একগ্রন্থ "তাঁদড়ের দর্শন" ঝাড়িয়াছিলাম। তাঁদড়ের দর্শনেরই এক কাচ্চা আজ আবার পরিবেষণ করা গেল। সুরু হউক একালের তাজা বাংলার আবার এক নয়া জীবনের ধারা।

সংহতির পথ

অনিলচন্দ্র রায়

বছরগুলো ছুটে চলেছে বিদ্যুতের গতিতে ; তাদের বুকের ওপরে অজস্র ঘটনারাশি ঠাসাঠাসি করেও স্থান পাচ্ছে না। ১৯৩৮-১৯৩৯ সনে পৃথিবীর সর্ব্বত্র দ্রুত আবর্ত্তনের দামামা বেজে চলেছে। য়ুরোপের আকাশে উঠেছে ফ্যাসিজম্'র ধূমকেতু, তার তীক্ষ্ণ জ্বালা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। এতে কেউ বিস্মিত হচ্ছে, আর কেউবা হচ্ছে বিমুগ্ধ কিংবা বিক্ষুব্ধ। কেউবা বড়জোর গালাগাল করছে এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও বিতর্ক উত্থাপন করছে। এদিকে আগ্নেয়গিরির নিঃশব্দ আলোড়নে দেশকালের চেহারা বদলে যাচ্ছে। এমন ভাবে বদলে যাচ্ছে যে চেনবার উপায় নেই। কোলাহল নেই, তুমুল বিস্ফোরণ নেই, নিঃশব্দ আবর্ত্তনে চারদিক বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। অচির কালের মধ্যে অষ্ট্রিয়া গেছে, স্পেন গেল, চীনের বৃহৎ অংশ গেছে ; মধ্য য়ুরোপে একটার পর একটা দেশ হিট্‌লারের রাহুগ্রাসে অন্তর্হিত হচ্ছে। কোন্ মুহূর্ত্তে কী যে হবে কেউ জানে না।

এই সংশয়াচ্ছন্ন ক্ষণে ভারতবর্ষে কী দেখ্‌তে পাচ্ছি? এখানেও রাজনীতির ভূলোকে মৃদু ভূমিকম্প হয়ে যাচ্ছে। ইতিহাস বয়ে চলেছে কুটিল আবর্ত্তে ; ছোট-বড়ো সকল ঘটনার মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হচ্ছে কালপুরুষের পদচ্ছন্দ। যে পথে এতদিন চলা গেছে, সে পথ আজ ফুরিয়ে এসেছে। দ্বিধাভিন্ন পথের সামনে এসে সবাই ভাবছে, আমরা কোথায় এসেছি, এর পর কোন্ দিকে পা বাড়াবো? এমনি সংশয় ইতিহাস আপনার অব্যর্থ নিয়মে সৃজন করে থাকে ; শুধু আমাদের দেশে নয়, দেশ-বিদেশে সর্ব্বত্রই ক্ষণে ক্ষণে এমনি প্রশ্ন জেগে উঠেছে চিরকাল। রাশিয়ায় লেনিন একদিন যুগসন্ধিতে দাঁড়িয়ে লিখেছিলেন "What is to be done" (কিং কর্ত্তব্যম্)। আজকে জবাহরলাল জিজ্ঞেস করছেন "Where are we" (আমরা কোথায় এসেছি!)

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর থেকেই জিজ্ঞাসাটা বেশী প্রখর হয়ে উঠেছে। সবাই উৎকর্ণ হয়ে আছে, কখন কী ঘটে কিছুই ঠিক নেই। গান্ধীজী কী করবেন! সুভাষবাবু কী করবেন! জনসাধারণ কী করবে! সকলেই জিজ্ঞাসু চোখে চারদিকে দেখ্‌ছেন। স্বাধীনতা আমাদের চাই, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আমাদের লড়তে হবে, এতে কোনো সন্দেহই নেই। এবং লড়াই করতে হলে যে ঐক্য চাই, সংহতি চাই, তাতেও কোনো পক্ষেরই কোনো সংশয় নেই। ত্রিপুরীতে আজ এই ঐক্য দ্বিধাভিন্ন হয়ে গিয়েছে।

অথচ সকলেই ঐক্য চাচ্ছেন এবং যিনি যা' কিছু করছেন কেবলি ঐক্যের জন্যেই করছেন।

অন্ততঃ করছেন বলে ঘোষণা করছেন। গোবিন্দবল্লভ তাঁর প্রস্তাব আনলেন, সে-ও ঐক্যের মহৎ উদ্দেশ্যে। কংগ্রেস সোস্যালিষ্টরা পন্থের বিরুদ্ধতা করলেন, তাও ঐক্যের জন্যই। কিঞ্চিৎ পরেই আবার এঁরাই বিরুদ্ধতাকে সম্বরণ ক'রে উদাসীনতা এবং তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করলেন, সে-ও শুধু ঐক্যের জন্য। বিরুদ্ধতা করা এবং না করা, উভয়ই একই মহান উদ্দেশ্য। মহাজনদের এমনি হয়ে থাকে, কারণ "লোকোত্তরানাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমর্হসি"? কিন্তু যারা লোকোত্তর নন সেই সব সাধারণদের মনে এতে সন্দেহ উৎপন্ন হয়েছে।

কংগ্রেসের নীতি হলো অহিংসা এবং সত্য। এ হলো যোগমার্গ, কারণ "অহিংসা-সত্যমস্তেয়" ইত্যাদি পাতঞ্জলযোগের যম-নিয়ম বই আর কিছু নয়। কিন্তু শুধু যম-নিয়মে বোধ হয় চলে না, ক্যানভাস্ করে লোকসংগ্রহও দরকার হয়েছে। কাজেই কংগ্রেসী যোগীরা সব রাত জেগে ডেলিগেট ক্যাম্পে ক্যাম্পে লোক-সংগ্রহ করেছেন। আমাদের মতন সাধারণ লোকেরা যখন ঘুমিয়েছে, অহিংসা-সত্যের যোগমার্গীরা তখন ভোট-সংগ্রহে মগ্ন রয়েছেন। কারণ শাস্ত্রেই আছে, "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী"। কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করবার বস্তু হলো এই যে ভোটসংগ্রহ করাও কেবলি ঐক্যকে সুদৃঢ় করবার জন্য। জবাহরলাল সেদিন খোলা অধিবেশনে বাঙালীকে বললেন "গুণ্ডা" এবং অপর প্রদেশীদের বললেন "সংযমী"; এ দ্বিবাচনও ঐক্যকেই সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে। নরীমান বললেন, পন্থের প্রস্তাবে ভোট না দিলেই ঐক্য সুগম হবে। বল্লভাচারীরা বোঝালেন, ভোটের জোরে পন্থ-প্রস্তাব পাস করাতে পারলেই ঐক্য সহজ হবে। ত্রিপুরীতে এবার ঐক্যেরই নামগান হয়েছে; বক্তৃতায়, আস্ফালনে, আবেদনে সর্ব্বত্রই মৈত্রীর যশোকীর্ত্তন হয়েছে। কিন্তু ঐক্য?—"সে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, ডাক্ দিয়ে যায় ইঙ্গিতে"!

ঐক্যের কথা যখন উঠেছে, তখন প্রশ্ন ওঠে কাদের মধ্যে ঐক্য? এবং অমিলইবা কাদের মধ্যে? দ্বন্দ্ব যেখানে আছে সেখানে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ থাকবেই। কেউ বলছেন, দক্ষিণ ও বাম এই হলো বর্ত্তমান ভারতের দু'বাহু। এদের মধ্যে আজকে ঘটেছে অমিল এবং এদের মধ্যেই চাই মৈত্রী এবং মিল। কেউ বা বলেছেন, "নৈব নৈব চ"। দক্ষিণ বামের কথাই ওঠেনি। তাছাড়া ভারতমাতার মাত্র দুটী নয়, অনেক বাহু রয়েছে। এমনি নানা কথায় দেশে নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

কথাটা উঠেছে রাষ্ট্রপতি-নির্ব্বাচন থেকে। কংগ্রেস সোস্যালিষ্টরা সুভাষবাবুকেই একমাত্র যোগ্যব্যক্তি বলে রায় দিয়েছেন শুরু থেকেই এবং আজকালকার পরিস্থিতিতে যোগ্যতা মানেই মতামতের এবং বিচারভঙ্গীর যোগ্যতা। সুভাষবাবু স্বয়ং উত্থাপন করেছেন দক্ষিণ এবং বামের প্রসঙ্গ। তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে তিনি বামপন্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছেন এবং দাঁড়ান দরকার বোধ করেন। এমন কি নির্ভরযোগ্য যে কোন বামপন্থী—যথা আচার্য্য নরেন্দ্র দেব—দাঁড়ালে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। কংগ্রেস-সোস্যালিষ্ট এবং কম্যুনিষ্টরা এতে সায় দিয়েছেন।

জবাহরলাল বলেছেন, এতে "নীতি"র কোন সম্পর্কই নেই। এ নিতান্ত ব্যক্তিগত ও ঘরোয়া ব্যাপার; সুভাষবাবু এবং শ্রীযুক্ত সীতারামিয়া নামক দুটী স্বতন্ত্র ব্যক্তিমাত্র এই বিরোধে লিপ্ত হয়েছেন, কোন নীতি বা মতবাদ নয়। কিন্তু নির্ব্বাচনের পরে বিষয়টা আরো জটীল হয়ে উঠলো। গান্ধীজী আসরে অবতীর্ণ হলেন, তাঁর বিখ্যাত বিবৃতি নিয়ে। তিনি বললেন, শ্রীযুক্ত সীতারামিয়ার পরাজয়ে গান্ধীতন্ত্রেরই পরাজয় ঘটেছে। এতে নীতির কথা জড়িত আছে—শুধুমাত্র ব্যক্তির কথা নয়। ব্যক্তিরা অবিমিশ্র ও নিরালম্ব ব্যক্তি মাত্রই নয়। ব্যক্তিরা নীতির প্রতীক—বিশেষ মতবাদের প্রতিনিধি। তাই এ নির্ব্বাচনে গান্ধীবাদ পরাস্ত হয়েছে। দেশের ছোট-বড়ো সবাই বিস্মিত হলেন। কেউ কেউ দুঃখিত হলেন এবং বললেন, এ গান্ধীজীর একান্ত অবিচার।

নানা মতের কোলাহলে চারদিক মুখর হয়ে উঠলো। কিন্তু এতো বড়ো একটা সমষ্টিগত ব্যাপারকে যাঁরা নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে বুঝতে চাইলেন, তাঁরা এ নির্ব্বাচনের মর্ম্মকে একেবারেই ভুল বুঝলেন। যে আলোড়নে সমস্ত জনমন আন্দোলিত হয়ে উঠেছে, তার পশ্চাতের ইশারা আমাদের চোখে পড়েনি। তাই আমরা মনে করতে পেরেছি যে এর পেছনে কেবলি ব্যক্তিগত অভিমান বা পূর্ব্বসঞ্চিত আক্রোশ রয়েছে। বহুজনের চিত্তকে মথিত ক'রে ইতিহাস যে ঘটনাকে সৃজন করে সেখানে আকস্মিক কিছু ঘটে না। সেখানে ঐতিহাসিক শক্তিসংঘাতের সমষ্টিগত প্রভাবে বিপর্য্যয় ঘটে বসে। যবনিকার আড়ালে যে সূক্ষ্ম বিপ্লব ঘটে, তারই প্রকাশ্য অভিনয় হয় ইতিহাসের প্রত্যেকটী ঘটনা-বিপর্য্যয়ে। আমাদের দেশের চেতনা আজ উদ্ভাত হয়ে উঠছে। সচেতন সংহতি গড়ে উঠছে, অতি ধীরে ধীরে। সেই সংহতি আজো নেবুলার মতো অস্পষ্ট। আজো ঘনীভূত হয়ে বিশিষ্ট রূপ নেবার দিন আগত হয় নি। এই অস্পষ্ট, কিন্তু ধীরে ঘনায়মান অবস্থারই অস্ফুট প্রতিধ্বনি বেজে উঠেছে রাষ্ট্রপতি-নির্ব্বাচনে।

গান্ধীজীর দৃষ্টি ভুল করেনি। তাঁর গভীর দূরদৃষ্টির কাছে এ তত্ত্ব ধরা পড়েছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন, আজ যে হাওয়ার আন্দোলন এই নির্ব্বাচনে চারিদিকে মৃদু কম্পন তুলেছে, অচিরে একদিন এ হাওয়া ঝড় হয়ে ভারতবর্ষকে লণ্ডভণ্ড করবে। তাই গান্ধীজীর চিত্তে উঠেছে বিক্ষেপের তরঙ্গ। তারপরে ত্রিপুরী। এখানেও পন্তজীর প্রস্তাব ঘোষণা করলো সেই একই বার্ত্তা; ভারতবর্ষে নীতির সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছে; একদিকে গান্ধীতন্ত্র, অন্যদিকে নবতর চিন্তাপ্রণালী ভারতবর্ষকে পথ বেছে নিতে হবে। বিষয়নির্ব্বাচনী সভায় তাঁর অপরূপ বক্তৃতায় রাজাজীও বললেন, গুরুতর একটা ঘটনা ঘটেছে। "A Serious event has happened". কেবলি ব্যক্তিগত মন-ভাঙ্গাভাঙ্গি নয়, কেবলি আহত অভিমান কিংবা ব্যাহত মনোরথ নয়; এতে জড়িয়ে রয়েছে গভীর ও গুরুতর তত্ত্বকথা। ত্রিপুরীর কদিনের ইতিহাসও এই কথাই প্রমাণিত করছে। ভোটাভোটি এবং সজ্ঞাত রেষারেষি ইঙ্গিত করছে, সকল ঐক্যের ও মিলনের কথার নীচে লুকিয়ে রয়েছে গভীর অনৈক্য; মৈত্রীর আড়ম্বরের আড়ালে উঁকি দিচ্ছে বিশ্রী রকমের অমিল। এর পরে

আজ পর্য্যন্ত যা' ঘটেছে তাতেও এই একই আভাস পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, কারণ এ হলো ঐতিহাসিক পরিণতি।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কংগ্রেস-সোস্যালিষ্ট দল এই ঐতিহাসিক পরিণতিকে বুঝতে পারেন নি। (কিংবা বুঝতে পেরেও চোখ বুঁজে এড়িয়ে গেছেন!) তাঁরা মার্ক্সীয় নীতির বুলি আওড়িয়ে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ-প্রিয়তার বড়াই সতত্‌ই করে থাকেন। অথচ এতবড়ো সমষ্টিগত ব্যাপারকে তাঁরা "ব্যক্তিগত" বলে ব্যাখ্যা করে ফেললেন। সুভাষবাবুকে তাঁরা কোন নীতির প্রতিনিধি বলে সমর্থন করেননি! নিছক ব্যক্তি হিসেবে সুভাষবাবুকে তাঁদের পছন্দ হয়েছিল, তাই সমর্থনও করেছেন। রাষ্ট্রনৈতিক একটা বড়ো রকমের বিক্ষোভের এমনতরো ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা মার্ক্সীয়-দলের মুখ থেকে শুনে সবাই আশ্চর্য্য হয়েছে। অধিকন্তু তাঁদের পৃষ্ঠভঙ্গের আরেকটা মনোরম কারণ তাঁরা দিয়েছেন; সে হলো "ঐক্যপ্রীতি"। এঁরা নাকি ঐক্যের জন্যই এমন করতে বাধ্য হয়েছেন। দলাদলি, ঝগড়া তাঁরা পছন্দ করেন না, কারণ এসব অতি খারাপ কাজ। তাই তাঁরা বাক্য ও কার্য্য উভয়ই সম্বরণ করে মৌনী হয়ে রইলেন। কিন্তু এই উদাসীনতাকে কী বলবো? এর নাম যে যুদ্ধকৌশল নয়, একথা আজ শিশুরও বুঝতে বাকী নেই। এর নাম দোর্ব্বল্য এবং ভীরু অব্যবস্থিতচিত্ততা। নিদারুণ সঙ্কটের সময় যারা পিছন ফিরে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে, তারা প্রগতির বিরোধী; একথার সাক্ষ্য ইতিহাস বার বার দিয়েছে।

আসল কথা হ'ল এই যে রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করলে এসব ব্যক্তিবাদের বড় টেঁকে না। সকল ঘটনার পিছনে রয়েছে ইতিহাসের অমোঘ যাত্রার তাল। দিন আগত হয়েছে পথ নির্ণয় করবার। সে নির্ণয়ে বিশ্লেষণ ও বিচারই একমাত্র উপায়, "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"। ঐক্যের জন্যে আমরা সকল পক্ষই তৈয়ার আছি, কিন্তু ঐক্যের ভিত্তি কি? জোড়াতালি দিয়ে যেন-তেন-প্রকারেণ একটা স্ববিরুদ্ধ বস্তু গড়ে তুললেই ঐক্য হয় না। ঐক্যের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি চাই। সে ভিত্তি হচ্ছে মতবাদের সাজাত্য। একথা আমরা জানলেও, এ তত্ত্ব অনুসারে রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিক আমরা গঠন করিনি বা করতে পারিনি। বহুদিন ধরে আমরা ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বড়ো বড়ো থীসিস্ (প্রবন্ধ) লিখে আসছি। ঐক্য যে কতো বৃহৎ ও মহৎ বস্তু, ঐক্য ছাড়া যে আমাদের রাজনীতিচর্চ্চা কতো নিরর্থক, এসব ভালো ভালো কথা আমরা ব্যস্ত হয়ে চারদিকে বিকীর্ণ করেছি। কিন্তু ঐক্য কোথায়! গেঁয়ো লোকের মধ্যে চলিত আছে যে 'শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজে না"। কাজেই বাক্যবাগীশেরা যতোই আস্ফালন করুন, আর পণ্ডিতেরা যতোই ক্রুদ্ধ হোন, কথার আতসবাজীতে দেশে আগুন জ্বলবে না। এতে হয়তো মানী লোকদের মানে আঘাত লাগ্‌বে। কেউ বলবেন, তবে কি প্রচারের কোনো মূল্য নেই? কথার কি কোনো শক্তি নেই? নেই, একথা তো কেউ বলেনি। প্রচারের মূল্য আছে, কিন্তু প্রচারের সঙ্গে প্রচেষ্টা চাই। কথার সঙ্গে কাজ চাই। শুধু প্রচারে, শুধু কথায় পাথরের গায়ে দাগ বস্‌বেনা, তা সে কথা শব্দ-ব্রহ্মই হোন, আর যা-ই হোন। পাথর কাট্‌তে হাতুড় বাটাল

মাপ্তে হবে। কথার সঙ্গে কাজের মিতালী যদি না থাকে, তবে সে কথা হয় প্রলাপ। প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়াস থাক্‌লে তবেই প্রচার হয় সার্থক।

আমাদের দেশে নানা রকম-বেরকম ঐক্যের (front) রব উঠেছে বহুদিন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোনো বাস্তব পরিণতি ঘটলো না। না পারলো কংগ্রেস-সোস্যালিষ্ট দল কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে মিলতে, না পারলো মানবেন্দ্র রায়ের দল এদের কারুরই সঙ্গে মিলতে। এরা আবার সবাই নাকি কম্যুনিষ্ট মতবাদী। এ ছাড়াও আরো কম্যুনিষ্ট দল রয়েছে ছোট ছোট। কারুর সঙ্গে কারুর ঐক্য হচ্ছেনা; প্রস্তাব অবশ্য হয়েছে বারম্বার কিন্তু তার কোনো প্রভাব হয়নি। যারা কম্যুনিষ্ট নন তাদের অবস্থা আরো চমৎকার। ছিন্নবিচ্ছিন্ন কতগুলো এলোমেলো শক্তি হাওয়ার তালে দুলছে। এ যেন শরৎকালের হাল্‌কা মেঘের দল, আকাশ পরিক্রমণ করে বেড়াচ্ছে। কখনো কাছে ভেসে আসছে, কখনো দূরে যাচ্ছে। দেখ্‌তে শোভা আছে কিন্তু না পারে গর্জ্জাতে না পারে বর্ষাতে; আর বজ্রসম্পাত করবার সংহত শক্তি? সে তো বহুদূরের কথা।

কিন্তু একথা বললেই কেউ কেউ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলবেন, কেন? পশ্চিমে ঐক্য হয়েছে স্পেনে, পূবের মিতালী হয়েছে চীনে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু উচ্ছ্বাসে তো কাজ হবে না। রোমান্টিক চশমা চোখ থেকে খুলে ফেলে পৃথিবীর দিকে তাকাতে হবে। সাদা চোখে প্রতিভাত হবে যে সারা পৃথিবীতে ঐক্য (united front) আজো জোর ধরেনি। ফরাসীদেশে ফ্রন্ট শক্তিশালী নয়, স্পেনে নানা দলের আত্মকলহ সত্ত্বেও আংশিক ও সাময়িক মিল হয়েছিলো একটা প্রত্যাসন্ন, নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে। চীনেও যা ঘটেছে তা উদ্যত মৃত্যুর চোখ রাঙানিতেই ঘটেছে। তা'ছাড়া চীন-স্পেন ছাড়া অন্য দেশের ইতিহাস কি? ফ্যাসিজম্ যখন পরিব্যাপ্ত হচ্ছে দিনে দিনে, তখন তার প্রতিরোধী শক্তিগুলো আজো দুর্দ্ধর্ষ সঙ্ঘশক্তি গড়ে তুলতে পারেনি। চীনে-স্পেনে ঐক্য হয়েছে বলে হরষিত হয়ে উঠলে ভারতবর্ষের বাস্তব সংগ্রাম সহজ হয়ে উঠবেনা। এ এক ছদ্ম রোমান্টিক মনোবৃত্তি বই আর কিছু নয়। একদল লোক আছেন যাঁরা বাস্তব জগতের কোনো অপ্রিয় ছবি তাঁদের চোখের সামনে ধরলেই কলরব করে ওঠেন "নৈরাশ্যবাদ! নৈরাশ্য-বাদ!" বলে। আত্ম-সমালোচনাকে এঁরা মনে করেন আত্ম-অনাদর। বাস্তবের সম্মুখীন হতে এঁরা ভয় পান। অপ্রিয় সত্যকে উপস্থিত করে ভবিষ্যতের বাস্তব পন্থানির্দ্দেশের ইঙ্গিত করলেই এঁদের রোমান্টিক আত্ম-সমাদরের ধারণায় আঘাত লাগে। অমনি এঁরা দেশবিদেশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে প্রমাণ করতে লেগে যান যে কোনো চিন্তার কারণ নেই, চতুর্দ্দিকে ফ্রন্টএর রব উঠেছে, এবং গণজাগরণ সুরু হয়েছে ইত্যাদি। এই শ্রেণীর লোকের ফ্যাসিজ্‌মের উত্থান থেকে কোনো শিক্ষালাভ হয়নি।

আমাদের দেশে ঐক্য হয়নি, একথা ত্রিপুরীতে প্রবলভাবে ধরা পড়েছে। আমাদের মতে মতবাদের ভিত্তিতে দলগঠন না হলে সত্যিকার ঐক্য সম্ভব হবেনা কোনদিন। সাময়িক ও ক্ষীণায়ু গ্রন্থিবন্ধন হলেও হতে পারে কিন্তু সে গ্রন্থি বাস্তবের আঘাতে বারম্বার ভাঙ্গবে। শক্তিগুলোকে

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এদেশে তিনটে মতবাদের রূপায়ণ হচ্ছে: কম্যুনিষ্ট মতবাদ, সমাজতন্ত্র এবং গান্ধীবাদ।

কম্যুনিষ্টদের তিনটে দল আছে, (ক) কংগ্রেস-সোস্যালিষ্ট দল (খ) মানবেন্দ্র রায়ের দল (গ) পূর্ব্বতন কম্যুনিষ্ট দলের সভ্যগণ। এই তিনটে সম্প্রদায় সবাই কম্যুনিষ্ট, কারণ এঁদের সমাজদর্শন হলো মার্ক্সীয় দর্শন। পরস্পরের মধ্যে কলহ ও পার্থক্য থাকলেও এঁরা সবাই নিজেদের কম্যুনিষ্ট বলে আখ্যাত করেন। কম্যুনিজ্‌ম্‌ বলতে বোঝা যায়,—দার্শনিক ক্ষেত্রে ডায়লেকটীক জড়বাদ, আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ এবং সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যান।

দ্বিতীয় মতবাদ সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র বলতে আমরা বুঝে থাকি কেবল একটা অর্থনৈতিক মতবাদ: সম্পত্তিকে যাঁরা ব্যক্তির হাত থেকে সমাজের হাতে উঠিয়ে আনতে চান তাঁরাই সমাজতান্ত্রিক। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে জড়বাদ বা অন্য কোনো দার্শনিক (metaphysical) মতবাদের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই। কম্যুনিষ্টরা সমাজতন্ত্রকে সর্ব্বদাই জড়বাদের সঙ্গে যুক্ত করে থাকেন এবং বলে থাকেন যে জড়বাদী না হলে সমাজতান্ত্রিক হওয়া চলে না। সমাজতন্ত্রের অর্থনীতির সঙ্গে এঁরা জড়বাদ ও অন্যান্য নানা মতবাদকে জুড়ে দিয়ে যে সমাজদর্শনকে দাঁড় করেছেন তাকেই কম্যুনিজম বলা চলে। (কম্যুনিজম্‌ = সমাজতন্ত্র + জড়বাদ + ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যান) কম্যুনিষ্টরা বলে থাকেন, আর্থিক সাম্য ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য কায়েম করা হতে পারে না যদি সমাজে জড়বাদ ও নাস্তিকতা না প্রবর্ত্তিত হয়। মার্ক্সীয় ব্যতীত অন্য কোন পণ্ডিত একথা স্বীকার করেন না। আমরাও একথা স্বীকার করিনে। সাম্যবাদী আর্থিক ব্যবস্থার আদর্শে ভবিষ্যৎ সমাজকে গড়তে চান এবং পুঁজিবাদের উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম করছেন এমন বহুতর রাজনৈতিক কর্ম্মী আমাদের দেশে আছেন। এঁরা সমাজতান্ত্রিক কিন্তু কম্যুনিষ্ট নন। এই মতের বহু ব্যক্তি আছেন এবং বহু সঙ্ঘও আছে। কিন্তু এঁদের আজ পর্য্যন্ত কোন বৃহৎ সংহতি বা দল গড়ে ওঠেনি।

তৃতীয় মতবাদ হ'ল গান্ধীতন্ত্র। এঁরা শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাস করেন না, কলকব্জা ও কারখানা-প্রথায় উৎপাদন-রীতিও এঁরা চান না। এঁরা চান শ্রেণী সহযোগ এবং কুটীর শিল্পের প্রবর্ত্তন। গান্ধীজী যে সমাজ দর্শনের ও নীতির আভাস দিয়েছেন সেই দর্শনে এঁরা বিশ্বাস করে থাকেন। এঁদের দল অতি সঙ্ঘবদ্ধ এবং সুনিয়ন্ত্রিত। এ উক্তি যে সত্য তা ত্রিপুরীতে প্রমাণ হয়েছে।

এই তিনটে মতবাদের মধ্যে গান্ধীবাদীদের "দক্ষিণপন্থী" বলেই এদেশে এতদিন আখ্যাত করা হয়েছে। বাকী অন্য দুটো মতবাদকে "বামপন্থী" বলা হয়েছে। এই পরিভাষা অনুসারে আমাদের দেশে বর্ত্তমানে যে সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে তাকে দক্ষিণ ও বামের সংঘর্ষ বলা হয়েছে। দক্ষিণ ও বাম —এই দুটো শব্দ নিয়ে কিছুদিন হয় তর্ক উঠেছে। এ দুটো কথার অর্থ আপেক্ষিক এবং অনেকটা অস্পষ্ট, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সকল পরিভাষাই কিছু পরিমাণে অস্পষ্ট হতে বাধ্য। এমন

কি তর্ক-শাস্ত্রের ও বিজ্ঞানের পরিভাষাও নিখুঁত নয়। কাজেই রাজনৈতিক জগতে কার্য্যকারিতা থাকলেই এবং বোঝবার সাহায্য করলেই আলোচ্য পরিভাষা দুটো (দক্ষিণ ও বাম) গ্রহণীয় হওয়া উচিত। জবাহরলাল বলেছেন, ভারতবর্ষে দক্ষিণপন্থী বলে তেমন কেউ নেই। আছে "গান্ধী-পন্থী" এবং "বিজ্ঞান-পন্থী"। গান্ধীপন্থীদের তিনি দক্ষিণপন্থী বলতে রাজী নন। তাঁরা হলেন, তাঁর মতে,"বাম-মধ্যাচারী" (Left-Centrist) জবাহরলাল "দক্ষিণ", "বাম" এবং "মধ্য" এ সব পরিভাষার স্পষ্ট মানে সম্বন্ধে কোন নির্দ্দেশ বা বিচার কিছুই করেন নি। কাজেই তাঁর মতামত অনেকটা দুর্বোধ্য ও অর্থহীন বলে আমাদের মনে হয়েছে।

আমাদের মতে গান্ধীবাদকে "দক্ষিণপন্থী" বলা চলে। কাজেই বর্ত্তমান সংঘর্ষ আমাদের চোখে দক্ষিণ ও বামের সংঘর্ষ বলেই প্রতিভাত হয়েছে। এই সংঘর্ষ ঐতিহাসিক পরিণতির ফল এবং অনিবার্য্য। মতবাদের পার্থক্য থেকে কর্ম্মক্ষেত্রে সংঘর্ষ জন্ম নেবে, এতে আশ্চর্য্য কিছু নেই। কিন্তু আবার যত্র যত্র সাদৃশ্য রয়েছে সেখানে ঐক্যও কমবেশী গড়ে উঠবে। ঐক্য যেখানে থাকবে সেখানে পার্থক্যজ্ঞানটিও থাকা চাই। পার্থক্য যেখানে আছে সেখানে পার্থক্যের কথা ভুললে আশু সুফল ফললেও ভবিষ্যতের হানি হবে। চিরদিন বিভিন্ন মত ও মন্ত্র থাকবেই। এবং সেই মত ও মন্ত্রের ওপরে ভিত্তি করে বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ও গড়তে হবে। যাঁদের স্বতন্ত্র মতবাদ রয়েছে তাঁদের পৃথক দলেরও ঐতিহাসিক প্রয়োজন রয়েছে। পুরাণের ভাষায় "সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রা স্তে বিফলাঃ মতাঃ"। আমাদের দেশে অনেক দল আছে যাদের মন্ত্রসংহতি (Ideological Solidarity) নেই। আবার অনেক মন্ত্র বা মতবাদ আছে যাদের দল নেই। শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র রায়ের দলে এমন অনেকে যোগ দিয়েছেন যাঁরা কম্যুনিজম্ বিশেষতঃ জড়বাদের বিরোধী। তেমনি কংগ্রেস-সোস্যালিষ্ট দলে এমন বহু কর্ম্মী প্রবেশ করেছেন বা করবার উপক্রম করেছেন যাঁরা জড়বাদের বিরুদ্ধবাদী। এঁদের কংগ্রেস-সোস্যালিষ্ট দলে যোগ দেওয়া দুর্বোধ্য কারণ কংগ্রেস-সোস্যালিষ্ট দলের মন্ত্র হচ্চে জড়বাদ বা নাস্তিকাবাদ।

এখানে একটা কথা উঠেছে। আজকাল অনেকে বলছেন যে theory বা দার্শনিক মতবাদের ওপরে জোর দেবার দরকার নেই। কেবল আশু কর্ম্মপদ্ধতির ওপর নির্ভর করেই দল গঠন করা চলে। এ সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট মত এই যে theory বা দার্শনিক মতবাদের ওপরে দৃষ্টি রেখেই সত্যিকার দলগত সঙ্গতি হতে পারে। যাদের সঙ্গে মত পার্থক্য রয়েছে তাদের সঙ্গে কোন বিশেষ কর্ম্মের ক্ষেত্র অভিন্ন হলেও তাদের সঙ্গে চিন্তার পার্থক্য থেকেই যায়। এখানে চিন্তার ক্ষেত্রে বিরোধ থাকবেই কারণ পরস্পরের সমালোচনাও এস্থলে থাকবে। সমালোচনার অধিকার ও চেষ্টাই যদি না থাকে, তবে তাকে বিভিন্ন দলের দলগত ঐক্য না বলে দলগত ও মতগত আত্মসমর্পণ (Surrender) বলা উচিত। কম্যুনিষ্ট আন্তর্জ্জাতিকের সপ্তম অধিবেশনেই United Frontএর ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই অধিবেশনেও একথা স্বীকৃত হয়েছে যে সোস্যাল-ডিমোক্রাটদের সঙ্গে কম্যুনিষ্টদের সঙ্গতি হলেও কম্যুনিষ্টরা সমালোচনার অধিকারকে বর্জ্জন করবে না। থিওরীকে

পরিত্যাগ করা যে মতবাদের মৃত্যুরই তুল্য একথাটী ভুললে চলবে না। "We must not allow practice to become divorced from theory" (Dimitroff).

রাশিয়ায় এক যুগে "Dyelo" নামক বিখ্যাত কাগজে মার্কসবাদীদের থিওরী-প্রীতিকে বিদ্রূপ করা হয়েছিল। লেনিন ঐ আক্রমণের জবাবে লিখেছিলেন, থিওরীর প্রয়োজন আছে। বিশেষতঃ যে যুগে মতবাদের অনিশ্চয়তা চারদিক ছেয়ে ফেলেছে, সেই চিন্তা-শিথিলতার যুগে প্রোগ্রাম বা আশু কর্ম্মপদ্ধতির গুণগান করা বিড়ম্বনা। কারণ বিপ্লবের থিওরী বা দার্শনিক ভিত্তি ব্যতীত কোন বৈপ্লবিক আন্দোলন সৃষ্ট হতে পারে না। "To repeat these words in the epoch of theoretical chaos is sheer irony. Without a revolutionary theory, there can be no revolutionary movement" (Lenin).

আমাদের দেশে মতবাদের অস্পষ্টতার (Theoretical chaos) যুগ চলেছে। এখানে রয়েছে অব্যবস্থা এবং অনিশ্চয়তা মননার ক্ষেত্রে। স্পষ্ট মতবাদ সৃষ্ট হোক আগে, এবং সেই মতবাদের ভিত্তিতে দল গঠন হোক। তারপরে হবে আশু কার্য্যপদ্ধতিতে সাদৃশ্য ও পার্থক্যের বিচার এবং তখনই হতে পারবে কর্ম্মপদ্ধতির ওপরে বিভিন্ন দলের সঙ্গতি ও ঐক্য। সেই ঐক্যই হবে সচেতন ঐক্য। ত্রিপুরীতে গান্ধীপন্থী দলের বিজয় হয়েছে। কিন্তু বামপন্থীদের অবস্থা কী হয়েছে? তাঁদের মধ্যেকার শোচনীয় অনৈক্য, অসঙ্গতি এবং দুর্ব্বল অব্যবস্থিতচিত্ততা দেখা দিয়েছে।

এ অনিশ্চয়তা দূর করবার উপায় হলো বামপন্থী ছোট বড়ো সকল দলকে পরস্পরের সঙ্গে বোঝা পড়া করে একটা ব্যাপক সংহতি গঠন করা। মতবাদের ও কর্ম্ম পদ্ধতির আলোচনা দ্বারা দল গঠন করতে হবে। যে দলগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে যদি দুরকম মতের লোক থাকে তবে সে দল পূর্ব্ব হতেই বিভক্ত হয়ে রইলো। কারণ বিরোধী স্বভাবের বস্তু (Incompatibles) সঙ্গত হতে পারে না। কংগ্রেস-সোস্যালিষ্টদের বলতে শুনি, তাঁরা জড়বাদী হলেও আদর্শবাদীদের স্থান দিতে ইচ্ছুক। আদর্শবাদীদের বলতে শুনি তাঁরা জড়বাদীদের দলে সভ্য হতেও আপত্তি করেন না। এ রকম সঙ্গতির আয়ু বেশীদিন নয়। কম্যুনিষ্টদের যে তিনটে বড়ো উপদল রয়েছে তাঁদের প্রত্যেক উপদলের এক ধরণের দলগত সংহতি রয়েছে। কিন্তু যাঁরা সমাজতান্ত্রিক অথচ কম্যুনিষ্ট নন তাঁদের দল বাঁধবার সময় এসেছে। ঐক্যের যে ব্যাপক পীঠভূমি (United front) ভবিষ্যতে গঠিত হবে তার প্রথম ধাপ হবে কম্যুনিষ্ট ব্যতীত অপরদের দল গঠন। তার পরের ধাপ হতে পারে কম্যুনিষ্ট ও সোস্যালিষ্ট মতবাদীদের বৃহত্তর ঐক্য। বামপন্থীদের মধ্যে কেবল কম্যুনিষ্ট মতবাদীদেরই দল আছে, অপরদের আছে ছোট সঙ্ঘ এবং অগণিত ব্যক্তি। এঁরা দল বাঁধতে পারলে রাজনৈতিক আবহাওয়ার বহুল পরিমাণে পরিষ্করণ ঘটে যাবে সন্দেহ নেই। সুস্পষ্ট মত ও দল থাকলে, পরস্পরকে বোঝবার সুবিধা হয় এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক-স্থাপনও সহজ হয়।

• ত্রিপুরীর অভিজ্ঞতায় বামপন্থীদের চোখ ফোটা উচিত। গান্ধীবাদী বিজয়ের ফল হবে এই যে বামপন্থীদের কংগ্রেসে কাজ করাই হবে দুষ্কর। এখনি তার সূচনা দেখা দিয়েছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যারা জিতবে তারা কংগ্রেসকে দখল করবে, সন্দেহ নেই। গান্ধীবাদীদের কংগ্রেস দখলের আকাঙ্ক্ষা অন্যায় নয়, স্বাভাবিক। একদা ১৯ শতকে "প্রথম আন্তর্জ্জাতিক" (First International) নিয়ে এমনি দুই দলের ঝগড়া হয়েছিল। সেই ঝগড়ার ফলে "আন্তর্জ্জাতিক" ভেঙ্গে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে (১৮৬৭) সনে মার্কস্ লিখেছিলেন এঙ্গেল্‌স্‌কে, "আমরা, অর্থাৎ তুমি এবং আমিই, এই বিরাট প্রতিষ্ঠানকে দখল করবো অচিরে," ("When the next revolution comes, we, you and I, shall have this mighty engine in our hands.") মার্কসের যেমন এই দখলকারী মনোবৃত্তি স্বাভাবিক ছিল, তেমনি আজও গান্ধীবাদীর কংগ্রেস দখলের অভিরুচি অতি স্বাভাবিক। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন হবেই।

বামপন্থীরা যদি নিজেদের কতকগুলো সুনির্দ্দিষ্ট দলে গড়ে তোলে, এবং সেই দলগুলোর মধ্যে একটা ব্যাপক মিলন-ক্ষেত্র (front) গড়ে তোলে, তবেই দক্ষিণপন্থীর সঙ্গে বামপন্থীর সত্যকার ঐক্য ঘটিতেও পারে। নতুবা বাম পন্থীদের কোন উপদলই একক ও বিচ্ছিন্নভাবে দক্ষিণ পন্থীদের সঙ্গে পেরে উঠবে না, বরং নিজেরাই বিলুপ্ত হবে। সুতরাং সচেতন ঐক্য গড়বার পূর্ব্বাহ্নে আমরা বামপন্থী বিভিন্ন দলগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা এবং বোঝাপড়া করবার জন্য অনুরোধ করছি। তারও পূর্ব্বে আমরা আবেদন করছি সমাজতন্ত্রীদের কাছে। তাঁরা মতবাদের ভিত্তিতে দল গঠন করে ভবিষ্যত ঐক্যকে সহজতর করুন। "সমাজতন্ত্রী" বলতে এখানে আমি কম্যুনিষ্টদের কথা বলছিনে। আমি বলছি যাঁরা কম্যুনিষ্ট নন সেই সব সমাজতন্ত্রীদের কথা। সচেতনভাবে এবং ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে যে ঐক্য সেই ঐক্যই সত্যিকার সংহতি। আশু কোনো কর্ম্ম পদ্ধতির ভিত্তিতে যে ঐক্য সে সাময়িক এবং অস্থায়ী। কালের কষ্টি পাথরে এই সাময়িক সংহতির মূল্য অতি অকিঞ্চিৎকর।

ইহাই নিয়ম

মৃত্যুঞ্জয় রায়

পাথরের কুচি দিয়ে বাঁধান এক রাজপথ।

ওরি বুকের উপর দিয়ে চলা ফেরা করছে কত লোকজন। কত বিচিত্র তাদের অনুভূতি, কত বিভিন্ন তাদের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ। কেউ চোর আবার কেউ বা সাধু; কেউ তাদের লক্ষপতি আবার কেউ বা দিনভিখারী; কেউ তাদের অত্যাচারী আবার কেউ বা অত্যাচারিত; কিন্তু সবাই তারা মানুষ—জীবনের স্থায়িত্ব তাদের সবারই প্রায় সমান।

যান বাহনের চলারও বিরাম নেই। মুহুর্মুহু পথ কাঁপিয়ে আসছে যাচ্ছে কত বিরাট বিরাট কলের গাড়ী—ঘোড়ার গাড়ী!

একদিন হঠাৎ এক ঘোড়ার গাড়ীর চাকার ঘা লেগে কি করে যেন একটা পাথরের কুচি হোল স্থানচ্যুত।......

"ওই সব নোংরা পাথরের কুচিগুলোর সঙ্গে দম বন্ধ করে পড়ে থাকা কি আমার পোষায়," সেই স্থানচ্যুত পাথরের কুচিটা ভাবল আপন মনে। "ওদের সঙ্গে আর থাকব না আমি। এবার আমি থাকব একা একা।"

পথ দিয়ে যাচ্ছিল একটি কিশোর। সুন্দর ছেলেটি! খেয়ালের বসে সে পথ থেকে তুলে নিল পাথরের কুচিটি।

"বেড়ানোর ইচ্ছে হয়েছিল আমার, তাই এবার বেড়াচ্ছি," পাথরটি ভাবল মনে মনে: "আমার তো শুধু চাওয়ারই ওয়াস্তা তারপরই ত হয়ে যাবে সব।"

হঠাৎ কি ভেবে বালকটি ছুঁড়ে মারল সেই পাথরখানা একটি বাড়ীর দিকে। পাথরটি ভাবল: "উড়বার ইচ্ছে হয়েছিল, উড়লুম আরে এত সোজা কথা—আমার ইচ্ছে হয়েছিল তাই!"

পাথরটা সশব্দে এসে লাগল জানালার কাঁচে। ঝন্ ঝন্ করে কাঁচটা ভেঙে পড়ল। এতে কাঁচের হোল ভারী রাগ, বলল:

"শয়তান কোথাকার—দেখতো কি করলি!"

ওর কথা শুনে পাথরটি গম্ভীর ভাবে বলল: "তা তুমি এখানে কি করছিলে? আমায় আসতে দেখে তোমার সরে যাওয়া উচিত ছিল। আমার পথ কেউ রোধ করে তা আমি চাইনে—বুঝলে? যাও এবার!"

পাথরটা যেয়ে পড়েছিল একটা ধপ্‌ধপে নরম বিছানায়। শুয়ে শুয়ে সে ভাবল: "উড়ে আমার পরিশ্রম হয়েছে—এবার একটু বিশ্রাম করব।"

খানিকপর বাড়ীর একটা চাকর এসে ঘরে ঢুকল। বিছানার উপর পাথরটা দেখে তুলে বাইরে ছুড়ে ফেলে দিল। ওটা যেয়ে আবার ঠিক পথের মাঝে পড়ল।

ওকে ফিরতে দেখে সঙ্গীরা তো অবাক!

ও ওর সঙ্গীদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, "নমস্কার, বন্ধুগণ! ভাল আছ তো তোমরা? গিয়েছিলুম এক অভিজাতের বাড়ী নিমন্ত্রণ রাখতে। কিন্তু বুর্জোয়াদের ঐ সব আভিজাত্য ভাই আমার ভাল লাগল না। ভাবলুম: ছোটলোকই আমার ভাল। তাই চলে এসেছি আবার তোমাদের মাঝে!"

বিদেশী গল্পের ছায়ায়

পৃথিবীর বৃহত্তম মানুষ! —সন্দেহ কি তারা　(ম্যারিয়েন)

দার্শনিক শরৎচন্দ্র

অমলেন্দু দাশ গুপ্ত

বড় হওয়া মানে ছোটকে ছাড়াইয়া উঠা শুধু নয়; বড়র মধ্যে ছোটরও ইতিহাস থাকে। বড় যে সে ছোটকে ছাড়াইয়াও যেমন উঠে, ছোটকে তেমনি উপরেও উঠাইয়া লয়। বনের মধ্যে বড় গাছের ছায়ায় ছোটগাছগুলির আলো বাতাস ও রসের বরাদ্দ কমিয়া যায়,---এখানে বড় যে সে নিকটবর্ত্তী ছোটদের শত্রু। কিন্তু মানুষের সমাজে যারা বড় তারা ছোটদের শত্রু নয়। গূঢ় অন্তরাল হইতে সবার জন্য তাকেই প্রাণরস আকর্ষণ করিয়া আনিতে হয়, আর উপরের অদৃশ্য বাতায়ন তাকেই খুলিতে হয় যে পথে আরও নূতন আলো ও বাতাস আসে। মানুষের সমাজ আপন সীমায় ও শক্তিতে খণ্ডিত থাকে। বড়র মধ্য দিয়া সে সীমা প্রসারিত ও সে শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া সে লয়। যখনই সমাজে কোন বড় মানুষ আসে তখনই বুঝিতে পারা যায় যে, সমাজ আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডীর বিরুদ্ধে অলক্ষ্যে অভিযান চালাইয়াছে এবং তার জয় আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। মানুষের ইতিহাসের রাস্তায় বড় মানুষ অগ্রগতির এক একটি দিগদর্শন ও জয়কীর্ত্তি। বড় হওয়া একার ব্যাপার নয় বলিয়াই বড়কে ছোটকেও উচ্চে তুলিতে হয়; ছোটকে ছাড়াইয়া উঠিয়াই বড় কখনও সার্থকতা বা নিষ্কৃতি পায় না।

বড়কে আবার একা করিয়াও দেখা যায়। তখন তার মনের সংগ্রামক্ষেত্রে গিয়া ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হয়; জানিতে হয় নিজের ভিতরের ছোটগুলির সঙ্গে লড়াই করিয়া কেমনে কত দুঃখে কত কষ্টে একটা বড়কে তার জিতাইয়া আনিতে হইয়াছে। হয়তো ভিতরের ছোটগুলি লড়ায়ে মারা পড়িয়াছে বড়ও হয়তো স্থানে স্থানে আহত ও বিক্ষত হইয়াছে; কিম্বা হয়তো অসম্ভব চেষ্টার ফলে ছোটগুলি বড়র সঙ্গে একটা সুদৃঢ় সখ্যে ও শান্তিতে গ্রথিত হইয়াছে। বড় এখানে বড় একা, আপনার সঙ্গে আপনি অশ্রান্ত সংগ্রামে লিপ্ত একক যোদ্ধা। কিন্তু বড়র এ দিকটা বাহিরের দৃষ্টিতে তেমন ধরা পড়ে না; এ অন্তর ইতিহাস শুধু কতিপয় অন্তরঙ্গই জানিতে পারে, তাও সামান্য ভাবে।

বড় যে সে বড় হয় এবং বড় কিছু করে। নিজের দিক দিয়া সে বড় হয়, বাহিরের দিক দিয়া সে বড় সৃষ্টি করে। প্রত্যেক বড়র সঙ্গে বড় হওয়া ও করা পাশাপাশি চলে শ্বাস ও প্রশ্বাসের মত।

শরৎচন্দ্র বড় ছিলেন। বড় হওয়া ও করা তাঁর মধ্যে রহিয়াছে।—শরৎচন্দ্র শক্তিমান; আর শক্তির আধার কখনও ছোট হয় না। শক্তি ও শক্তিমান যদি একই হয়, তবে শরৎচন্দ্রের মধ্যে যে বিরাট শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে তার স্বীকৃতিতে শরৎচন্দ্রের বড়কেই স্বীকার পাওয়া হয়।

সাহিত্য সমাজের কতখানি এবং সে সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি কতখানি--তা জানিলে শরৎ-চন্দ্রের শক্তি সম্বন্ধে কতকটা ধারণা ও মূল্যবোধ হইতে পারে। কোন সাহিত্যেই তার মত শক্তিশালী পুরুষের সংখ্যা খুব বেশী নাই—একথা বলিতে কোন দ্বিধা বা কুণ্ঠা হয় না। সাহিত্যের সৌভাগ্যের মত এ শক্তি মাঝে মাঝে আসে। বাংলা সাহিত্যকে, কাজেই বাংলা সমাজকে, তিনি ঋণে আবদ্ধ রাখিয়া গিয়াছেন। এ ঋষি ঋণ; শোধ করিতে কত সাহিত্য সেবকের সাধনার দরকার হইবে, কিম্বা এখন আদৌ শেষ হইতে পারে কি না—ইতিহাসের সুদূর দৃষ্টি ছাড়া জানার পথ নাই।

এক জাতীয় বড় মানুষ আছে যারা পাহাড়ের চূড়ার মত. পাদদেশে দাঁড়াইয়া ঘাড় উঁচু করিয়া দেখিতে হয় যে, শিখর তার আকাশে মেঘলোকে উঠিয়া উধাও হইয়াছে। একবার ছুঁইয়া আসিতে দৃষ্টির নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে এত উর্দ্ধে সে। এঁরা মানুষের সমাজে থাকিয়া ভিন্ন জগতের ও ভিন্ন জাতির লোক। এঁদের সাথে আত্মীয়তার কথা মনেও আসে না, আত্মীয়তা সম্ভবও নয়। অন্য আর একজাতীয় বড় মানুষ আছে তাঁরা এর বিপরীত। তাঁরা যেন বিরাট বনস্পতি, কাছে গিয়া অসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া ছায়া ভোগ করা যায়, উপরে চড়িয়া খেলা ও দোল খাওয়াও চলে, এবং দরকার মত ডাল ভাঙ্গিয়া ছাগল গরুকে পাতা খাওয়ানো যায়। কোন খেয়ালই থাকে না যে, কত বড় প্রাণশক্তির ক্রিয়া এর মজ্জায় মজ্জায়, সহস্র শিকড় দিয়া সে মাটীর অন্ধকার হইতে রস শুষিয়া আনিতেছে, হাজার পাতা দিয়া সে রৌদ্রকে ছাকিয়া খাদ্য করিয়া লইতেছে এবং সেই ঝড়ের রাত্রে প্রবল বাতাসের সঙ্গে লড়াই করে এবং বলিষ্ঠ বাহু দিয়া বজ্রকে মাঝ পথে অবরোধ করে।

এমন মানুষের সঙ্গে আমরা আত্মীয়তা বোধ করি, সে যেন আমাদের ঘরের মানুষ আমাদেরই একজন। তার শক্তি তার বিরাটত্ব আত্মীয়তার পথে কোন বাধাই জন্মায় না। বিরাট শক্তি এত গূঢ় গোপন থাকে যে, তা আছে কি নাই এ আমরা যেন ভুলিয়া যাই। নিজের শক্তি যেমন নিজের কাছে ভারি ঠেকেনা, আশ্চর্য্য বোধ হয় না, এদের সম্বন্ধেও আমাদের তেমনি সহজ ভাব।

শরৎচন্দ্র ছিলেন এই জাতীয় বড়র দলে একজন। তাই আমরাও তাঁর সঙ্গে মিশিতে পারিয়াছি। তাঁর সময়ের যে কোন দাম আছে এ পরিষ্কার ভুলিতে এবং গল্প গুজব করিয়া সময় নষ্ট করিতে পারিয়াছি। এজন্য তিনি যদি মনে কিছু করিতেন, তবে হয়তো আমরা সতর্ক হইতে পারিতাম, তাঁর সময় জাতির সম্পত্তি একথা হয়তো বিস্মিত হইতে সাহস পাইতাম না। মাঝে মাঝে মনে হইত নিজের শক্তিকে তাঁর আরও বেশী শ্রদ্ধা করা উচিৎ ছিল। তাহা হইলে এত শিথিল ও দায়িত্বহীন ভাবে মিশিবার মত প্রশ্রয় আমরা পাইতাম না।

রবীন্দ্রনাথকে দূর হইতে দেখিয়াছি, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাঁর বক্তৃতা শুনিয়াছি এবং একাকী তাঁর বই নিয়া তাঁর মনলোকে চলাফেরা করিয়াছি। কাছে থাকিয়া যারা তাঁর সঙ্গ

পান তাঁরা যে তাঁর কাছে যাইতে পারিয়াছেন এ মনে হয় না। তিনি ধ্যানলোক নিবাসী, বার-আনা মন তাঁর অন্যত্র উদ্বৃত্ত থাকে, এ সত্য তাঁর কাছের মানুষেরও ভুলিবার অবকাশ হয় না। যে মানুষ মানুষের মনের সীমা অহরহ পার হইয়া যান, তাঁর সমস্ত অস্তিত্বে আশ্চর্যের রং লাগে, তখন তাঁকে নিয়া নিত্যকার ব্যবহার সম্ভব হয় না, কারণ ও জিনিষ ব্যবহার করার বস্তুই আর থাকে না: ভাগ্য ভালো থাকিলে কোন লোহা ছোঁয়া পাইয়া শুভক্ষণে সোনা হইতে পারে। আপনাকে যিনি আপনার অতীত জায়গায় দাঁড়াইয়া দেখিতে পারিয়াছেন ও দেখেন, সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, জীবনের দখল তাঁর উপর আর থাকে না। মেঘ যেমন নীচের পৃথিবীর উপর ঝরিয়া পড়ে তিনিও তেমনি আপনাকে ইচ্ছা করিলে দান করিতে পারেন ও করেন। কিন্তু এ মেঘ ও মাটীর ব্যবধান বর্ষণের জন্য থাকা চাই।—রবীন্দ্রনাথের কবি মনের আরও গভীরে অন্য পরিচয় গুপ্ত আছে,—তিনি ধ্যানী পুরুষ। ধ্যানলোকে পুরুষ চিরকাল একা, সৃষ্টি ও সৃষ্টির কোন সম্বন্ধ সেখানে প্রবেশপথ পায় না।

অনেক সময় ভাবিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের মত শরৎচন্দ্রের কি এই রকম কোন পরিচয় নাই। মানুষের জন্য তাঁর সহানুভূতি, তাঁর দুঃখ কষ্টে মমতা—এসব বুঝিতে পারি। তিনি রসস্রষ্টা—তাও বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু তিনি নিজে জীবনকে কি চোখে দেখিতেন, তাঁর মনের দার্শনিক গঠন কোন প্রকৃতির,—এ জানার কি কোন পথ নাই। তাঁর লেখা পড়িয়া এ বিষয়ে বিশেষ কিছু সঠিক ভাবে বোঝা আমাদের মত সাধারণ পাঠকের সম্ভব নয়। তাঁর গল্প শুনিতে শুনিতে আমরা মুগ্ধ হইয়া যাই, নিজেদের ছোটখাটো সুখদুঃখগুলিকেও ভালবাসিতে শিখি, এবং জীবন সম্বন্ধে রুচি ফিরিয়া পাই। কিন্তু তাঁর গল্পের মধ্যে তিনি কখনও সে জায়গায় আঘাত করেন না, যেখানে ঘা খাইয়া চমকাইয়া উঠিতে হয়, ভাবিতে হয়—এ জীবনের অর্থ কি, মানুষের সত্যিকার সার্থকতা কোথায়। অর্থাৎ তিনি অস্তিত্বের সে পর্দ্দায় কখনও হাত দেন নাই, যেখানে চাপা পড়িলে "অনন্ত জিজ্ঞাসা" বাজিয়া উঠে।

শুনিয়াছি, তাঁর এক ভাই সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। রূপনারায়ণ নদীর পারে শরৎচন্দ্র বাড়ীর সামনে ভাইয়ের সমাধি স্মৃতি রক্ষা করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রকে কে যেন বলিয়াছিল যে, তিনিও ভাবী জীবনে সন্ন্যাসী হইবেন। তিনি সন্ন্যাসী হন নাই, কিন্তু তাঁর রক্তে গেরুয়া রং ছিল, এই বিশ্বাস নিয়া অগ্রসর হইলে শরৎচন্দ্রের দার্শনিক দিকের পরিচয় পাওয়া অসম্ভব নয়।

ব্যক্তিগত জীবনে প্রথম দিকে তিনি ছন্নছাড়া ও ঘরছাড়া মানুষ ছিলেন। তাঁর মধ্যে একটা উদাসী খ্যাপা ছিল, তাই জীবনের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে এত ঘুরিতে তাঁকে হইয়াছে। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে, শরৎচন্দ্র একজন সহজিয়াপন্থী, তিনি জীবন পথে বাউল পথিক, এই দেখা যায়।

শ্রীকান্তে তাঁর আত্মজীবনের ছায়া পড়িয়াছে, এ রকম একটা কথা এ দেশে বহু প্রচলিত ও প্রায় স্বীকৃত। শ্রীকান্ত উদাসী অনাসক্ত; মেয়েমানুষের স্নেহ ও মমতার মধ্যে বন্ধনমুক্ত। কমললতাকে ও তার বৈষ্ণব আবেষ্টনকে তাই তিনি আনিয়াছিলেন নিজের বিশ্রাম আশ্রয়ের জন্য। কিন্তু

কমললতাকেও ভাগ্যের ও জনতার স্রোতে ভাসিয়া যাইতে তিনি দিয়াছেন। গহরের প্রেমে একটি নম্র পূজা ও অনাড়ম্বর আত্মবিসর্জ্জনের ভাব আছে। শরৎচন্দ্রের নিজের হৃদয়ের স্বাক্ষর কিছুটা তাতে পড়িয়াছে কি ?

বিপ্রদাসের চরিত্রও অনুসন্ধানের বিষয়—সেখানে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত পরিচয় থাকা মোটেই অসম্ভব নয়। বিপ্রদাস গৃহে থাকিয়াও গৃহী ছিলেন না। গৃহ ও গৃহের আবেষ্টন ত্যক্ত পোষাকের মত একদিন খসিয়া গেল এবং অবশেষে সন্ন্যাসী বিপ্রদাসকেই দেখা গেল। আনন্দকেও শরৎচন্দ্র সন্ন্যাসী বলিয়াছেন—কিন্তু এ সন্ন্যাসী বিপ্রদাসের জাতের নয়। সেবাধর্ম্ম ও সমাজের কল্যাণব্রত বিপ্রদাসের মূল সুর নয়। বিপ্রদাসের অন্তরের গভীরে একক মানুষ প্রশ্ন নিয়া জাগিয়াছিল। এই প্রশ্নের জন্যই পুরাকালে রাজপুত্র রাজ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং বোধিগাছের তলায় বসিয়া উত্তর খুঁজিয়াছিলেন। বিপ্রদাসের মধ্যে শরৎচন্দ্র নিজেকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন, অথবা গৃহত্যাগী ও লোকান্তরিত সন্ন্যাসী ভাইকে জীবন দিয়াছেন—এ ভাবিবার বিষয় বটে।

শেষ প্রশ্নের আশুবাবু ও কমল একই বস্তুর দুই রকম ছবি। বাহির হইতে উভয়ে যতই বিভিন্ন হউক না কেন, উভয়ের শক্তির একই উৎস; উভয়েই নিজেদের মধ্যে একটি মহৎ আশ্রয়ের সন্ধান পাইয়াছিল, পাত্রভেদে একই শক্তির প্রকাশ ভিন্ন হইয়াছে। শরৎচন্দ্র নিজেই কমলকে খুলিয়া দেখাইয়াছেন, নিজেকে জানিতে পারিয়াছিল, তাই কমলের এত শক্তি, এত নিরাসক্তি ও স্নেহ মমতা। স্বীয় মনের অন্তরালে শক্তির এই আদিম উৎস সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র সচেতন ছিলেন কিনা—এই দুই চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া জানার চেষ্টা চলিতে পারে।

আমার নিজের বিশ্বাস শ্রীকান্তের চেয়ে জীবানন্দের মধ্যেই শরৎচন্দ্রের মনের মূল দিকটা বেশী প্রচ্ছন্ন আছে। 'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের প্রথমদিকের রচনা, দেনাপাওনা পরিণত জীবনের রচনা। জীবনের অপরাহ্ন দিকেই জীবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা স্বভাবত আসে। অর্থ, খ্যাতি, কীর্ত্তি ইত্যাদি পার হইয়াই এমন একটা অবকাশের মুখোমুখী মানুষের আসিয়া পড়িতে হয় যখন জিজ্ঞাসা একমাত্র প্রধান হইয়া উঠে। এই কারণে শ্রীকান্তের চেয়ে জীবানন্দের মধ্যেই শরৎচন্দ্রের মানসিক ছবির বেশী প্রস্ফুট হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। শ্রীকান্ত জন্ম হইতেই ছন্নছাড়া উদাসী প্রকৃতির। জীবানন্দ জন্ম হইতেই অসংযত। মনে হইতে পারে একই প্রকৃতি ভোগ সম্বন্ধে উদাসী ও অসংযমী হইয়াছে ক্ষেত্রভেদে। জীবানন্দের অপরিমিত ভোগ কোথাও সংযম রেখা টানিতে পারে নাই। ভোগের এই অর্থহীন একঘেয়ে আবৃত্তি ভিতরে ভিতরে তাকে ক্লান্ত করিয়া আনিতেছিল এবং তৃপ্তির অভাবে একটা বিতৃষ্ণায় মনও তার ধীরে ধীরে ধূসর হইয়া আসিতেছিল। বয়স অপরাহ্নের দিকে যখন হেলিয়া পড়িয়াছিল—এই সময় ভোগক্লান্ত পুরুষের উপর প্রেমের কঠিন আঘাত আসিয়া পড়িল। সময় উপযুক্ত—আধারও উপযুক্ত, জীবানন্দ তপস্বী হইল, প্রেমের সাধনা তার। সাধনায় সিদ্ধি সে পাইয়াছিল; সাধনা তাকে সহজ মানুষ করিয়া নবজন্ম দিয়াছিল। আপনাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া আপনার মহত্তর অস্তিত্ব জীবানন্দ ফিরিয়া পাইয়াছিল। আসক্তিমুক্ত পুরুষের

সমস্ত মন প্রেমে পূর্ণ হইল, সকলের দুঃখের সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য যোগ গ্রথিত হইল। প্রগাঢ় প্রশান্তিতে আসিয়া জীবানন্দ মানুষের জীবনের সার্থকতা খুঁজিয়া পাইল। শ্রীকান্তের মধ্যে উদাসী আছে, প্রেমিক ও আছে—কিন্তু জীবানন্দের তপস্যা নাই, আর এ পরিণত প্রশান্তিও নাই।

দার্শনিক শরৎচন্দ্রকে জানা আমাদের প্রয়োজন। নিজের মনের গভীরের তিনি কতখানি সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাঁর দৃষ্টিতে সত্যের কোন রূপ কি ভাবে ধরা দিয়াছিল এবং কোন বিশ্বাসে আশ্রয় পাইয়া জীবনকে তিনি চালাইয়া গিয়াছেন—ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর পাইলে শরৎচন্দ্রকে সঠিক জানা যায়। শরৎচন্দ্রের রচনা হইতে তাঁকে আবিষ্কার করার চেষ্টা তাদের করা উচিৎ, যাদের এ বিষয়ে সুযোগ ও শক্তি দুইই আছে। একটা যুগ এই মনীষি আপনাকেই আপনার সৃষ্টির মধ্য দিয়া বাংলার মনে সংক্রামিত করিয়া ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান বাংলার মনের একটা স্তর তার মানসরসে পুষ্ট। শরৎচন্দ্র সেই কতিপয়ের একজন যাদের দ্বারা বাংলার মন পুষ্ট, লালিত, বর্দ্ধিত ও গঠিত। কাজেই, নিজের জীবনকে দেখার তাঁর ব্যক্তিগত ভঙ্গীটি আমাদের জানা প্রয়োজন—তাহা হইলে আমরা আমাদেরও কতকটা পরিচয় জানিতে পারি।

দার্শনিক শরৎচন্দ্রকে বাংলার নিকট খুলিয়া দেখাইবার দায়িত্ব তাদের, তাঁর জীবনী যারা পাঠকদের উপহার দিবেন—শরৎচন্দ্রের ভাবী জীবনীকারদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতে চাই। শরৎচন্দ্র নিজের সৃষ্টিতে অমরত্ব পাইবেন—তবু আমরা তাঁকে কি ভাবে জানিয়াছি এবং তিনি কি ছিলেন—বাংলার তাহা অবগত থাকা কম প্রয়োজনের নয়।

ভারতের রাজস্ব-নীতি

অধ্যাপক অনাথগোপাল সেন

আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধগুলিতে গবর্ণমেন্টের আয় সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করিয়াছি; এক্ষণে ব্যয়ের দিক সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ১৯২১ সাল হইতে সরকারী ব্যয়ের হিসাব পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯২৯ সালের পর বিশ্বব্যাপী অর্থ সঙ্কট উপস্থিত হইলে গবর্ণমেন্টের আয় অত্যধিক হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং তাহার ফলে ১৯৩১ সাল হইতে গবর্ণমেন্টের এই ব্যয় প্রবণতা খানিকটা বাধা প্রাপ্ত হয়। ১৯৩৫ সালে অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি পরিলক্ষিত হইবামাত্র ব্যয়ের রেখা পুনরায় ঊর্দ্ধগামী হইতে থাকে।

সৈন্য বিভাগ

ব্যয়ের দিকে সর্ব্বপ্রথমেই এই বিভাগের বিশাল ব্যয়-বহর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বলা বাহুল্য, এই বাবদ্ আমাদের ব্যয় শুধু অত্যধিক নহে, সমগ্র আয়ের শতকরা ২৫ ভাগই ইহার ক্ষুধা মিটাইতে যায়। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা কিম্বা ইহাকে নিজ শাসনাধীনে রাখার জন্যই যদি এই অর্থ ব্যয় করা হইত, তাহা হইলেও একটা কথা ছিল; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতে যে বিপুল সৈন্য সমাবেশ ও তদানুসঙ্গিক বিরাট আয়োজন করা হইয়াছে তাহা শুধু ভারতবর্ষকে পরাধীন রাখিবার জন্য নহে, উপরন্তু এশিয়া মহাদেশের সর্ব্বত্র ইংরেজের স্বার্থ-সুরক্ষিত ও তাহার মহিমা সকলের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য। প্রমাণ স্বরূপ ইহা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে যে ভারতবর্ষ ইংরেজ-শাসনাধীনে আসিবার পর ভারতীয় সৈন্যকে বহুবার ভারতের বাহিরে অন্যদেশে যুদ্ধে নিয়োজিত করা হইয়াছে। এই বাবদ যে প্রভূত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই ভারতবর্ষের উপরে চাপান হইয়াছে। সৈন্য বিভাগের ব্যয় কিরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করিলে এই ব্যয়ের পশ্চাতে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা অপেক্ষাও, বৃহত্তর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করিয়া প্রাচ্য ভূখণ্ডে ইংরেজ ক্ষাত্র-শক্তির প্রতিষ্ঠাই প্রধান উদ্দেশ্য তদ্বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ থাকে না। উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজ-কর্ম্মচারীদের স্বীকারোক্তি হইতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৮৬১ সালে এই বিভাগের ব্যয় ১৬ কোটী টাকা ছিল। তৎপর ইহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯২১ সালে প্রায় ৮৮ কোটী টাকা দাঁড়ায়। পূর্ব্বে ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা ভারতীয় সৈন্যের তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ কিংবা এক পঞ্চমাংশ ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া এক তৃতীয়াংশে দাঁড়াইয়াছে। বলা বাহুল্য যে উচ্চপদস্থ ও উচ্চ বেতনভোগী অফিসারদের মধ্যে

ভারতীয়ের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। শুধু তাহাই নহে, বৈদেশিক প্রয়োজনের জন্য যুদ্ধের সাজ সরঞ্জামের খরচও ভারতের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক অধিক। এই সম্পর্কে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অন্যান্য স্বাধীন দেশে সৈন্য বিভাগের দরুণ যে ব্যয় হইয়া থাকে তাহার ফল তদ্দেশীয় সৈন্য, অফিসার, যুদ্ধ-সরঞ্জাম-প্রস্তুতকারক দেশবাসীরা পাইয়া থাকে—এক কথায় দেশের ধন অনেকটা দেশেই থাকিয়া যায়, পরন্তু দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের ও বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সেদিক দিয়াও বিশেষ সুবিধা নাই। দেশীয় সৈন্য সংখ্যা যদিও ইংরেজ সৈন্য অপেক্ষা দ্বিগুণ, তথাপি তাহাদের মাহিনা ও ভাতা অনেক কম হওয়ায় তাহাদের জন্য ব্যয় কম। বলা বাহুল্য সৈন্য বিভাগের ব্যয় সম্পর্কে ভারতীয় জনমতের কোনই মূল্য নাই; এই বিষয়ে বড়লাটের অভিমতই চূড়ান্ত। ১৯৩৫ সালের নূতন ভারত গবর্ণমেণ্ট আইনেও এই ব্যয়ের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কিছুমাত্র অধিকার ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণকে দেওয়া হয় নাই।

সরকারী ঋণ

এই সরকারী ঋণের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমাদের অসহায় অবস্থার বিষয় আরও পরিষ্কাররূপে পরিস্ফুট হইবে। এই ঋণের পরিমাণ বর্তমান সময়ে ১২০৮ কোটী টাকার উর্দ্ধে দাঁড়াইয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজত্ব বিস্তার ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইংরেজকে যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে তাহাও ভারতের ঋণ স্বরূপ আমাদের উপরই চাপিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশ বিজয়ের অভিযান-খরচও আমাদের ঋণ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সিংহল, সিঙ্গাপুর, কেইপ কলোনি, মিশর, জাভা, বর্ম্মা, আফগানিস্থান, পারস্য, চীন,—এমন কি নেপাল অভিযান, ভারতের নামে টাকা ধার করিয়াই সম্পন্ন হইয়াছে। সহজ কথায় বলিতে গেলে আমাদেরই অর্থে আমাদের ও পার্শ্ববর্ত্তী দেশ বিজিত ও প্রাচ্য ভূখণ্ডে বৃটিশ কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিশাল রাজত্ব ও প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য যে সুদৃঢ় ইস্পাতের কাঠাম নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা সুরক্ষিত রাখিবার জন্যও ভারতবর্ষকে পুনরায় বহু টাকা ধার করিতে হইয়াছে। আরও একটি রহস্য এখানে প্রকাশ না করিলে ঋণের ইতিহাস খানিকটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে কিছুকাল পর্য্যন্ত তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের আয়-ব্যয় ও রাজ্যশাসনের আয়-ব্যয়ের হিসাব পৃথকভাবে রাখা হইত না। ইহার ফলে ব্যবসার ক্ষতি রাজ্যলব্ধ উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা পূরণ করা হইত। সুতরাং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের যে দেনা আমাদের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা রাজ্যশাসন জনিত কিংবা কোম্পানীর ব্যবসার ক্ষতির দরুণ তাহাও বিবেচনা সাপেক্ষ। ১৮৫৮-সালে বৃটিশগবর্ণমেণ্ট যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের সহিত ১১ কোটী ২২ লক্ষ পাউণ্ড (১৬৮ কোটী টাকা) ঋণভারও গ্রহণ করেন।

তন্মধ্যে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের দরুণ ঋণের পরিমাণ ৩ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড (৫২২ কোটী টাকা)। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ দমনের দরুণ ঋণের বোঝা ৪ কোটী পাউণ্ড (৬০ কোটী টাকা)। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে ভারতবর্ষরূপ বিশাল জমিদারী খরিদের মূল্য বাবদ (কোম্পানীর মূলধন ও লভ্যাংশের দরুণ) ইংলণ্ডকে আমাদের দিতে হয় ৩ কোটী ৭২ লক্ষ পাউণ্ড (৫৫॥ কোটী টাকা)। ইহাও আমাদের ঋণ। এতদ্ভিন্ন ১৮৫৮ সালে ভারতের শাসনভার কোম্পানীর হাত হইতে বৃটিশ পার্লামেণ্ট গ্রহণ করিবার পরও ভুটান, এবিসিনিয়া, আফগানিস্থান, মিশর ও সীমান্তের যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টকে প্রায় ৯০ কোটী টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। ১৯১৪ সালের ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে ভারতকে ব্যয় করিতে হয় ৩৬৪ কোটী টাকা। তন্মধ্যে ইংলণ্ডকে এই যুদ্ধের দরুণ নিছক সাহায্য দান করা হয় ১৮৯ কোটী টাকা। এতদ্ব্যতীত আর্থিক ব্যাপারে নানারূপ অব্যবস্থা ও অবিবেচনার দরুণ ভারত গবর্ণমেণ্টের বাজেটে ১৮৮২ সালের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত মোট ঘাট্‌তি দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৫০ কোটী টাকা। ইহাও ঋণ করিয়াই পূরণ করিতে হইয়াছে। টাকার বিনিময় হার নির্দ্ধারণে ভারত গবর্ণমেণ্ট আগাগোড়া যে স্বার্থান্ধ ও অদূরদর্শী নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন তাহার পরিণাম ভারতবর্ষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইয়াছে। বিনিময়ের হার অ-স্থির ও পরিবর্ত্তনশীল হওয়ার দরুণ ভারতবর্ষের যে লোকসান হইয়াছে তাহার পরিমাণও ১২০কোটী টাকার কম হইবে না। এতদ্ভিন্ন ১৮৭৭-৮০ ও ১৮৯৬-৯৭ সালে ভারতবর্ষে যে মন্বন্তর ও মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল তাহার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে প্রায় ৮০ কোটী টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। এই ত গেল নিষ্ফল ঋণের পরিমাণ যাহা হইতে এক কপর্দ্দকও প্রতিদান পাইবার উপায় নাই।

এক্ষণে আমরা অন্য প্রকার ঋণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব। এই সব ঋণ সম্পূর্ণ নিষ্ফল নহে, যেহেতু এই অর্থের বিনিময়ে আমরা কিছু প্রতিদান পাইয়া থাকি। এই শ্রেণীর ঋণকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে: (১) ষ্টেট রেলওয়ে নির্ম্মাণ বা কোম্পানীর রেলওয়ে খরিদ বাবদ ঋণ; (২) সেচ-খাল ও কূপ খননাদির জন্য ঋণ; (৩) ডাকবিভাগ ও সেই জাতীয় সরকারী ব্যবসা পরিচালনার দরুণ ঋণ; (৪) পোর্ট ট্রাষ্ট, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে কতগুলি জনহিতকর কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্টের ঋণ দান; (৫) সামন্ত রাজ্য সমূহকে ঋণ দান। উক্ত পাঁচ দফার মধ্যে রেলওয়ে বাবদ ঋণের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তন্মধ্যে আবার বিলাতী কোম্পানীগুলির নিকট হইতে রেল-লাইন ক্রয় করিবার সময় গবর্ণমেণ্টকে যে মূল্য দিতে হইয়াছে তাহাই প্রধান। একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ লাভ কোম্পানী-গুলিকে দিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত থাকায় রেলওয়ে প্রতিষ্ঠার সময় বহু অর্থের অপব্যয় হইয়াছিল, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তদুপরি ভারত গবর্ণমেণ্ট যখন এই রেললাইন-গুলি ক্রয় করেন তখন শেয়ার ও জিনিষপত্রের মূল্য অত্যধিক চড়া থাকায় গবর্ণমেণ্টকে উচ্চ মূল্য দিতে হইয়াছিল।

সেচ বিভাগের জন্য যে টাকা ঋণ করা হইয়াছে, জল-সরবরাহের মূল্য বাবদ উচ্চ হারে কর নির্দ্ধারণ করিয়া গবর্ণমেন্ট সেই টাকার উপর শতকরা ৬।৭ টাকা লাভ পাইয়া থাকেন। সুতরাং এই ঋণের দরুণ ঘর হইতে ভারত সরকারকে কিছু দিতে হয় না, যদিও ইহার চাপ অন্য-ভাবে (জল-কর হিসাবে) দরিদ্র প্রজাসাধারণের উপর যাইয়াই পড়ে। তৃতীয় দফার ঋণের পরিমাণ বেশী নহে এবং এই টাকার সুদ প্রায় ডাক-বিভাগ হইতেই পাওয়া যায়। রাস্তা-ঘাট প্রভৃতির উন্নতি সাধন জন্য মিউনিসিপ্যালিটী, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে যে টাকা ধার দেওয়া হয়, তাহার সুদ অধিকাংশক্ষেত্রে নূতন কর ধার্য্য করিয়া পরিশোধ করা হয়—যে সব হিতকারী কার্য্যে অর্থ নিয়োজিত হয় তাহার লাভ হইতে সুদ বহন করা সম্ভবপর হয় না। ভারতীয় রাজন্যবর্গকে যে সব টাকা ধার দেওয়া হয় তাহাও অনেক ক্ষেত্রে লাভজনক হয় না। শেষ পর্য্যন্ত কর ধার্য্য করিয়াই এই ঋণের দায় বহন করিতে হয়। মোট ঋণের উপর যে সুদ গবর্ণ-মেন্টকে দিতে হয় তাহার এক তৃতীয়াংশ বিদেশে চলিয়া যায়; কারণ সেই সব ঋণ অধিকাংশ ইংলণ্ডে করা হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, ভারতের বিরাট ঋণের বেশীর ভাগই তাহার নিজ স্বার্থ বা উন্নতির জন্য করা হয় নাই, পরন্তু এই অর্থের দ্বারা নিজের পরাধীনতার শৃঙ্খলকে দৃঢ়তর করা হইয়াছে এবং অপরের স্বাধীনতা হরণে সহায়তা করা হইয়াছে। অবশ্য ইহার জন্য গবর্ণমেন্টকে আমাদের সম্মতির অপেক্ষা করিতে হয় নাই। সেই জন্যই সিপাহী বিদ্রোহ দমনের ব্যয়ভার ও ভারত সাম্রাজ্য ক্রয়কালীন দিলদরিয়া মেজাজে দক্ষিণাদানের ব্যাপারটা আমা-দের উপর চাপাইয়া দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। এই নীতিকে "জোর যার আইন তার" নীতি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

বিগত মহাযুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যকে ফ্রান্সে ও অন্যান্য দেশে যাইয়া লড়িতে হইয়াছিল। ইহা নিশ্চয়ই ভারতের স্বার্থে তাহারা করে নাই। সেই যুদ্ধে যে সহস্র সহস্র ভারতবাসীর প্রাণ বিসর্জ্জিত এবং দরিদ্র ভারতের কোটী কোটী অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল তাহার ফলভোগী প্রধানতঃ হইয়াছিলেন ইংরেজ ও তাহার মিত্রশক্তি সমূহ। বিনিময়-হার নির্দ্ধারণ ব্যাপারে যে নীতি অনুসরণের ফলে ভারতের বহু কোটী টাকা লোকসান ঘটিয়াছে তাহার মূলেও ছিল ভারতে বিলাতীপণ্যের আমদানি বৃদ্ধি ও দেশীয় শিল্পের প্রতিকূলতা সাধন। কঠোর শুনাইলেও সত্যের খাতিরে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, ভারতের রাজস্বনীতি একদিকে তাহার অর্থোপায়ের সহজ ও স্বাভাবিক উৎসগুলির মুখ শুষ্ক করিয়া দিয়া আর্থিক উন্নতির পথে বাধা দান করিয়াছে, অন্য দিকে শাসন ও সৈন্য বিভাগের দুঃসহ ব্যয়ভার তাহার কুব্জপৃষ্ঠে চাপাইয়া দিয়া তাহার ক্লান্ত দেহকে আরও পঙ্গু করিয়া তুলিয়াছে।

সত্য বটে অধুনা সমর-বিভাগের ব্যয় চারিদিকে যুদ্ধভীতির দরুণ সর্ব্ব দেশেই অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সমর-ঋণের পরিমাণও পর্ব্বত-প্রমাণ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশ সমূহ আস্ফালন করে, লড়াই করে, রাজ্য বিস্তার করিবার জন্য, সৌরমণ্ডলে নিজের একটা

বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া লইবার জন্য। আর আমরা লড়াই করি, অর্থব্যয় করি, নিজেরই বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য, ও সঙ্গে সঙ্গে অপরের স্বাধীনতা হরণ করিয়া আমাদের বন্ধনকারীর ঐশ্বর্য্য ও গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য। আমাদের দেশের সমর-ঋণের সহিত অন্যান্য দেশের সমর-ঋণের সেইখানেই পার্থক্য।

শাসন বিভাগ

এই বিভাগের অমিতব্যয়িতা সকল বিভাগকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। সমর-বিভাগের ব্যয়-বাহুল্যের জন্য এইরূপ একটা যুক্তি অন্ততঃ উপস্থিত করা যাইতে পারে যে বৈদেশিক শক্তির আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার একটা প্রয়োজন আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সেরূপ অজুহাতের অবকাশ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। উচ্চতম রাজকর্ম্মচারী হইতে অধস্তন প্যায়াদা পর্য্যন্ত সকলেই কাগজপত্রে আমাদের "একান্ত অনুগতভৃত্য"; কিন্তু কার্য্যতঃ জন-সাধারণের কল্যাণ ও সেবার জন্যই তাহাদের অস্তিত্ব কিংবা তাহাদের মহিমা কীর্ত্তন ও রাজকীয় ঠাট বজায় রাখিবার জন্য জনসাধারণের অস্তিত্ব তাহা বলা কঠিন। মোট রাজস্বের শতকরা ৪০ ভাগই রাজকর্ম্মচারীদের বেতন, ভাতা ও শাসনের ঠাট বজায় রাখিতে যদি ব্যয় হয়, তাহা হইলে শাসন এবং শোষণ চলিলেও, পালন এবং পোষণ করিবার অর্থ আসিবে কোথা হইতে? কারণ ইহার উপর সমর বিভাগ, সরকারী ঋণ এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার নামে পুলিশ বিভাগের ব্যয়ও ত বড় কম নহে। শ্বেতহস্তী পোষা বলিয়া বাংলায় একটা চল্‌তি কথা আছে। ভারতে ইংরেজ শাসনের ব্যয়-বহর দেখিয়াই এই প্রবাদ বাক্যটির সম্ভবতঃ উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। ভারতের আর্থিক অবস্থার সহিত এইরূপ ব্যয়-বাহুল্যের তুলনা করিলে তাহার অসহায় অবস্থার কথাই ভাল করিয়া মনকে আঘাত করে। ভারতবর্ষ বিশ্বের দরবারে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র ও অনুন্নত দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম—অথচ ইহার শাসনব্যয় পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা অধিক। জাপানের প্রধান মন্ত্রীর বেতন মাসিক ৬০০৲ টাকার কিঞ্চিৎ অধিক। আমাদের দেশে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার, পুলিশ সাহেব এবং তাহাদের অপেক্ষা উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের কথা ছাড়িয়াই দিলাম—একজন সিনিয়র মুনসেফ্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বা অধ্যাপকও তাঁহার অপেক্ষা অধিক বেতন পাইয়া থাকেন। অথচ এই জাপান পৃথিবীর উন্নত, শক্তিশালী ও সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহের অন্যতম এবং ইহার প্রধানমন্ত্রী যে কয়জন রাষ্ট্রপতি পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন তাঁহাদের একজন। জাপানের অন্যান্য মন্ত্রীদের বেতন মাসিক ৪০০৲ টাকাও নহে। কোরিয়ার গবর্ণর-জেনারেল বেতন পান ৪৪০৲ টাকা। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী দেশ; মাথা পিছু তাহার আয়ও ভারতবাসী অপেক্ষা অন্যূন ২২ গুণ অধিক। তাহার মন্ত্রীরা বেতন পান ৩৪১২৲ টাকা। আমাদের দেশে বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্যগণ বেতন পান ৬৬৬৭৲ টাকা। গ্রেট বৃটেনের মাথা পিছু আয় আমাদের ১৪ গুণ; তাহার মন্ত্রীরা পান ৫৫৫০৲ টাকা। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের মধ্যে

যাহারা একটু সিনিয়র এবং জেলার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাদের বেতন ১৮০০৲ টাকা হইতে ৩৭০০৲ টাকা। বিভাগীয় কমিশনারদের মাহিনা ৩০০০৲ টাকা হইতে ৪০০০৲ টাকা। তদুপরি নানারূপ ভাতার ছড়াছড়ি ত রহিয়াছেই। অথচ বিলাতের সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারীদের মাহিনা ১০০০৲ টাকার অনধিক। কেনাডার মাথাপিছু আয় ভারতের ১৭ গুণ। দক্ষিণ আফ্রিকার আয় আমাদের আয় অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। তথাপি কেনাডার প্রধান মন্ত্রী পান ৩৩৭৫৲ টাকা ও অন্যান্য মন্ত্রীগণ পান ২২৫০৲ টাকা। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রীর বেতন ২৭৭৭৲ টাকা। কিন্তু ভারতের বড়লাটের বেতন ২০,০০০৲ টাকা এবং প্রাদেশিক লাটগণের মধ্যে পাঁচ জনের প্রত্যেকের ১০,০০০ টাকা। বলা বাহুল্য, এই সব উচ্চ বেতন-ভোগীদের প্রায় সকলেই ইংরেজ। উচ্চপদস্থ দেশীয় লোকের সংখ্যা পূর্ব্বে অতি সামান্যই ছিল। বহু আন্দোলনে ফলে উচ্চ-কণ্ঠ শিক্ষিত ভারতীয়দের মুখ বন্ধ করিবার জন্য সম্প্রতি তাহাদের সংখ্যা কিছুটা বাড়ান হইয়াছে। সুতরাং বেতন ও ভাতা বাবদ আমাদের যে অপরিমিত ব্যয় হয় তাহার একটা মোটা অংশই বিদেশে চলিয়া যায়। উচ্চপদের জন্য একদিকে যেমন দান সাগরের ব্যবস্থা, অন্যদিকে কিন্তু অধস্তন কর্ম্মচারীদের বেলায় (যাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই এই দেশীয়) ফকিরের ভিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ফলে ইহাদের মধ্যে যে পরিমাণ কর্ম্মনৈপুণ্য, সততা ও আন্তরিকতা থাকা প্রয়োজন তাহার যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। সম্প্রতি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে চাকুরীর ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারা নীতির অবতারণা করিয়া কর্ম্মচারীদের সততা ও যোগ্যতার মূলোচ্ছেদ ব্যবস্থা পূর্ণ করা হইতেছে।

পুলিশ বিভাগ

আইন ও শৃঙ্খলার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বাহ্যতঃ প্রয়োজন থাকিলেও ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ভারতে ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা। সেইজন্যই নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে ভারতবাসীর যতই চোখ ফুটিতেছে এবং স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য তাহাদের আন্দোলন বৎসরের পর বৎসর প্রবল হইতেছে, ততই এই বিভাগের ব্যয় ভার বাড়িয়া চলিয়াছে। আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া প্রজাগণের ধনপ্রাণের নিরাপত্তা বিধানই এই বিভাগের প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদের দেশে চোর ডাকাতের হাত হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করার জন্য তাহাদের যত না ব্যাকুলতা, তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক ব্যস্ততা দেশবাসীর আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও স্বায়ত্তশাসন লাভের ক্রমবর্দ্ধমান আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য। স্বাধিকার ও স্বাধীনতা লাভ করা যদি মানবের জন্মগত অধিকার হয় এবং এই নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই যদি ইংলণ্ড বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধে প্রাণপাত করিয়া লড়িয়া থাকে (ইহা যে সত্য নহে তাহা ইউরোপের বর্ত্তমান ঘটনায় ভালরূপে প্রমাণিত হইয়াছে), তাহা হইলে আমাদের এই আন্দোলন বিধিবহির্ভূত বলিয়া বিবেচিত হওয়া সঙ্গত নহে এবং আমাদেরই

অর্থে আমাদিগকে দমন করিবার নীতি আদৌ সমর্থনযোগ্য নহে। এই বিভাগের ব্যয় ক্রমশঃ কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে নিম্নলিখিত হিসাব হইতে তাহা পরিস্ফুট হইবে।

	১৮৬১-৬২	১৯৩৫-৩৬
পুলিস	২, ১৬, ৩১, ০০০ টাকা	১১, ৬১, ৪৯, ২০৮ টাকা
আদালত	১, ৯৫, ১১, ০০০ ,,	৫, ৩১, ৯৬, ৭১১ ,,
জেলখানা ও বন্দীশালা	৮৯, ৯৭, ০০০ ,,	২, ৪৭, ০৭, ৪৯১ ,,

সৈন্যবিভাগের সহিত পুলিশ বিভাগের ব্যয় একত্র করিয়া ১৯৩৫-৩৬ সালে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৭০,৫৯,০৬,৬৭৫ টাকা দাঁড়াইয়াছিল। সৈন্যবিভাগ, সরকারী ঋণের সুদ (যাহার অধিকাংশ ভারতের স্বার্থের সহিত সম্পর্কহীন যুদ্ধাদিতে ব্যয় করা হইয়াছে), পুলিশ ও সাধারণ শাসন বিভাগের ব্যয় বাবদ আমাদের মোট রাজস্বের শতকরা ৯৬ ভাগ নিঃশেষিত হইয়া যায়।* কাজেই দেশের সর্ব্বসাধারণের ভাগ্যে কিছুক সেচা জল পাওয়াও দুর্ঘট হইয়া পড়িবে ইহা আর বিচিত্র কি।

* সৈন্য বিভাগের ব্যয় শতকরা [illegible] ভাগ, সরকারী ঋণের সুদ ২২'৫ ভাগ, পুলিস ১০ ভাগ, শাসন বিভাগ ৪০ ভাগ—মোট ৯৬'৫ ভাগ।

অপরাজিত

ছায়া দেবী

অজ্ঞতার তমো মাঝে ক্ষুদ্র পরিসর,—
দৃষ্টি যার রুদ্ধ হয়ে থাকে নিরন্তর,—
স্বার্থ দ্বেষ হলাহলে, দহন-জ্বালায়
নিপীড়িত চায় নিত্য ; তাদের কথায়
তুচ্ছ তৃণ সম দলি' করি অবহেলা
যাপিব জীবন : যবে ফুরাইবে বেলা
রহিবে সান্ত্বনা মোর যা বুঝেছি ঠিক,
তাহারে করেছি পূজা ; যদি মাঙ্গলিক
শঙ্খ কভু নাহি বাজে জীবনে আমার
সর্ব্বনাশ নামে ঘোর ঘেরি চারিধার,
ভীষণ নির্দ্দয়রূপে পিশাচ উল্লাস—
নৃত্য করে মোর পাশে হাসি অট্টহাস,
তথাপি দুর্দ্দম বেগে দুই বাহু মেলি
চলিব ছুটিয়া পথে অবজ্ঞায় ঠেলি
বিঘ্নের তাণ্ডব নৃত্য, ঘৃণার ধিক্কার
ঝঙ্কৃবে শ্রবণ মূলে, উন্মাদ হুঙ্কার
গর্জ্জিবে সম্মুখে, তবু, ক্ষীণ দেহ মোর
শিথিল হবেনা কভু ; লৌহ সুকঠোর
বজ্র সম শক্তি লয়ে দুই মুঠি ভরি
চলি যাব নিশিদিন, কভু নাহি ডরি
অপমান নিন্দা যত ; দিব ফেলি দূরে
যা ছিল আবরি মোরে, সুতীক্ষ্ণ শঙ্কুরে
পদতলে লব বরি, শিরে লব তুলি
কলঙ্কের ধ্বজা মোর ; নাহি যাব ভুলি
আপনার মহিমায় উন্মুক্ত স্বরূপ
সত্যের গরিমামাঝে শুভ্র অপরূপ।

তপোদীপ্ত চিত্তে মোর জানিব নিশ্চয়—
লোকে যারে ক্ষতি বলে ক্ষতি তাহা নয়।

চলেছি জীবন পথে মুক্তি রাখি মোরে
নির্ভীক সবল পদে বিপদের ঘোরে,
সকল সঙ্কট মাঝে ভ্রান্তি মাঝে মোর
তিলে তিলে গাঁথিয়াছি জীবনের ডোর।
সূর্য্যের প্রখরতাপে করি নাই ভয়
শুকায় যদি সে মালা, যদি পড়ে রয়
অসম্পূর্ণ পথপারে, যেরূপে যখন
যাহা কিছু আসিয়াছে, করেছি গ্রহণ;
কোণে কোণে মনে থাকা ভীরুতার গ্লানি,
করেনি মলিন মোরে, চলিয়াছি মানি
সহজ সরল রীতি ধরিয়াছি শিরে
সত্যের পরম দাবী, চাহি নাই ফিরে
সুখ দুখ কিবা এলো, সব অমঙ্গল
এসেছি করিয়া তুচ্ছ—এ মোর সম্বল;
সব চেয়ে গর্ব্ব মোর—পরম সম্মান
নির্ভয়ে এসেছি বহি দেবতার দান।

সৈনিক প্রবর

প্রমীলা গুপ্তা

করপোরেল এসে পড়েছে। ভোরের আলো তখনও আবছা আবছা। সেই অস্পষ্ট স্তিমিতালোকে পাথরগুলো যেন সংজ্ঞাহীনভাবে মাটির গায়ে মিশে আছে। পিছনে নিস্তব্ধ কারাগার যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। হঠাৎ ভিতরে একটা বিকট শব্দ হল, দিগন্তের বুকে অদ্ভুত তার প্রতিধ্বনি, দূরের ঢোল যেন এখানের স্তম্ভিত নীরবতাকে আরো থম থম করে তুলল। চারিদিকের বাতাস নিরস্ত, নিস্পন্দ। ফিলিপ চোখ তুলে বিহ্বলের মত তাকাল, মনে একটা অনিশ্চিত আকাঙ্ক্ষা। করপোরেল তাদের তিন জনকে বাইরে আসতে আদেশ দিল। তিন সাথীর কেউ তখনও বুঝে উঠে নি। ভোরের আলো আর একটু স্পষ্ট হতেই পাহাড়গুলো চূড়াটি নিয়ে মাথা উঁচু করে তাদের দৃষ্টি পথে ভেসে উঠল। কানন-কুন্তলা পাহাড়গুলো যেন দিগন্তের কোলে নীল ছড়িয়ে দিচ্ছে। বুভুক্ষু দৃষ্টিতে ফিলিপ ও দৃশ্য দেখে নিল। পাহাড়ের পিছনেই তার বাড়ী।

স্পেনিস্ সৈন্যবাহিনীর এক উচ্চ কর্মচারী জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে জেলখানার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। তার ক্ষুদ্র ও ম্লান চেহারায় একটা প্রগলভ চটুলতা ছিল। তার ছোট্ট অথচ দুরস্ত পোষাক কোমরে আটসাঁট করে বাঁধা। টুপিটা মাথার উপর ফ্যাশন করে হেলান। মুখ ফিরে হতবাক্ বন্দীদের দিকে তাকাল। ওষ্ঠে ক্রূর হাসি। চোখে হিংস্র দীপ্তি। কুর্তার একটা আলগা বোতাম দেহ দোলার সাথে দুলছিল। ফিলিপ মন্ত্রমুগ্ধের মত তা দেখছে। বোতামটা কেন ছিঁড়ে পড়ছে না। হাত তুললেই বোতামটা খসে পড়বে যে। অফিসার মনের দুর্বলতা চাপতে একটু চেঁচিয়ে বলল, এখানে ক'জন? করপোরেল অভিবাদন করে জানাল তিনজন।

নূতন মেসিন গান চাই বলে সৈনিক-প্রবর তার বেল্ট বাঁধতে লাগল; বোতামটি দ্রুত দোলনে দুলছে। হতবুদ্ধি করপোরেল পাশেই দাঁড়ান। নূতন গান হাজির হতেই অফিসার রোষকষায়িত নেত্রে করপোরেলের দিকে তাকাল। হাঁ নূতন বন্দুকই বটে। দেখবে আমি ওটার কেমন সদ্ব্যবহার করি। দু'এক সেকেণ্ডের ভিতর ত্রিশ জনকে সাবাড় করব।

দুজন লোক সেই মেসিনগানটী এনে একটী ছোট টিপয়ের উপর রাখলো, সামনে কয়েদীর দল দাঁড়ান। সেই ঝকঝকে মেসিন গানটী তাদের দিকে মুখব্যাদান করে আছে। ফিলিপের কাছেই একজন কিশোর বালক, মুখ দেখে প্রাপ্তবয়স্ক বলা চলে না, যদিও সে কুড়ির কাছাকাছি। প্রার্থনার

মত কি যেন সে বিড় বিড় করছে। কপাল হতে অশ্রান্ত ঘাম ঝরছে, স্পঞ্জ নিংড়ান জলের মত। অফিসার মেসিন গানের কাছে গেল। মুখের ভাব গম্ভীর ও কর্ম্মকঠোর, একটু ঝুঁকে পড়ে ব্যারেলের উপর হাত বুলিয়ে বেল্টে কার্তুজ ঠিক আছে কিনা দেখে নিল। কর্কশ স্বরে বন্দীদের ফিরে দাঁড়াতে অর্ডার দিল। ধীর বিশীর্ণ গতিতে এরা আদেশ পালন করল।

পাঁচ কদম এগিয়ে এসো। মন্ত্রমুগ্ধের মত সন্ত্রস্ত ত্রিশটী প্রাণী সেই শক্ত মাটিতে পা ফেলে চলল।

ফিলিপ সোজাসুজি সামনে তাকাল, প্রান্তরের শুষ্ক রুক্ষতা বহুদূরে ধূ ধূ করছে। অদূরে পাহাড়ের পাদদেশে গির্জ্জার ঝিকমিক সাদা চূড়া, দুনিয়াটা আজ তার কাছে অতি প্রত্যক্ষ, ব্যাপক ও নিরাপদ মনে হল। যুদ্ধ বাধায় ইহা হঠাৎ অতি নগণ্য ও তুচ্ছ হয়ে পড়েছিল। সেই এক লাইন লোক কাঁপতে কাঁপতে থেমে দাঁড়াল। মেসিন গানের ট্রিগারে অফিসার আঙ্গুল উঠাতেই ফিলিপের পিছনে মৃত্যুর বিভীষিকা ঘনিয়ে আসল। তার প্রাণটি দুরু দুরু করে কেঁপে উঠল, যেন ছুটে যাবে—পাঁচ সেকেণ্ড যেন এক যুগ। তা'র শেষ হতে চায় না। অশ্রান্ত ঘাম ঝরছে, মেশিন গানটী কর্কর করে উঠল। এক ঝাপটা গুলি শ্রেণীবদ্ধ বন্দীদের গায়ে এসে পড়ল। উৎক্ষিপ্ত ধূলো-কঙ্করে চারিদিক সমাচ্ছন্ন। হাড় মাংস কোথায় ছিটকে গেল। বেদনা-বিকৃত এক লাইন লোক ঢেউয়ের মত লোটপোট হয়ে পড়ল। ফিলিপের গায়ে মাটি ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছে। পাথরের কুচিগুলি যেন সুতীক্ষ্ণ হুল। সে মাটির উপর লুটিয়ে আছে—গুলির কর্কশ শব্দ বাতাসের বুক চিরে ছুটে গেল। হঠাৎ বন্দুকের শব্দ থামল।

বুটের শব্দে বোঝা গেল অফিসার উঠে দাঁড়িয়েছে। কিছুদূরে একটী লোক আর্ত্তনাদ করছে, কণ্ঠস্বর অসম্ভব রুক্ষ। আবার অফিসারের দেরাজ গলা শুনা গেল। যারা এখনও বেঁচে আছ, গা ঝেড়ে উঠে পড়, তোমাদের আর অনিষ্ট হবে না। তোমরা নির্ভয়, মুক্ত ও স্বাধীন।

ফিলিপ কাষ্ঠের মত মাটিতে পড়ে রইলো, মুদিত চক্ষু, কপাল হতে ঘাম ঝরছে।

উঠোনা, অসাড় হয়ে পড়ে থাক। হে ভগবান! এদের চুপ করে থাকতে দাও, এ এক ফন্দি।

খুব কাছেই পাথরের খচ্ খচ্ শব্দ শুনা গেল। কয়েকজন বন্দী কম্পিত দেহে উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে অফিসারকে বলল। ফিলিপ তার ক্রূর হাসি শুনতে পেল। আবার বন্দুকের সেই মর্ম্মভেদী শব্দ। 'বোকার দল', ফিলিপ চুপি চুপি বলল। 'এ ফাঁকি, নিছক ফাঁকি, আমি আগেই জানতুম। এখন সব শেষ হয়েছে।'

খুব সন্তর্পণে সে চোখ খুলে তাকাল। শুধু এক চোখে সে দেখ্‌তে পেল। এ বেশ মজার ব্যাপার, অন্যটি যেন যথাস্থানে নেই, কিন্তু সেজন্য কোন ব্যথা ছিল না। মুখমণ্ডল হতে ধীরে ধীরে রক্ত ঝরে পড়ছিল। এখন তার দুনিয়াটা অত্যন্ত সঙ্কুচিত। পাহাড়, প্রান্তর, গাছপালা, ছোট গির্জ্জা আজ আর দেখাচ্ছেনা। তিন চার টুক্‌রো পাথর, বালি চিরে যেখানে বুলেটটা মাটিতে ঢুকেছে, তার ডান হাত, এই তার দুনিয়া। পায়ের কর্দ্দমাক্ত পেরেকযুক্ত বুট্‌। হঠাৎ যেন ধূলোতে ঘষা লেগে জীবন্ত প্রাণীর মত উৎপীড়ক হয়ে উঠ্‌ছে। ক্ষণে ক্ষণে তার টানটান, একটা পিঁপড়ে কুচি পাথর ডিঙ্গিয়ে তার দিকে আস্‌ছে। সূঁচের মত তীক্ষ্ণ পাগুলি নিয়ে মুখের উপর উঠ্‌লো। চোখের ধারে রক্তাক্ত ক্ষতস্থান তার লক্ষ্য।

ফিলিপের দিকে কে আসছে? এ কার কথাবার্ত্তা? করপোরেল চিৎকার করে উঠল, ও ওখানে একজন; অফিসার বলে উঠ্‌ল কোথায়?

পাখীর ছানা বা প্রজাপতি অন্বেষণকারী বালকের মত উত্তেজিত তার আওয়াজ। 'হে ভগবান, আমাকে নিস্পন্দ হয়ে থাকতে দাও,' ডান চোখের নীচেই এক টুকরা পাথরের দিকে সে তাকিয়ে আছে। সবুট এক জোড়া বিশাল পা তার ক্ষুদ্র দুনিয়াটা জুড়ে এসে দাঁড়ালো।

অফিসার বলে উঠ্‌ল 'এইজন'। ফিলিপের নাড়ী ভুঁড়ি যেন ভিতরে ঢুকে গেল। মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে যেন বরফ গল্‌ছে নামছে। 'ভগবান আর পারিনা, সব শেষ করে দাও।'

অফিসারের বুটের দিকে সে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল। বুট পুরান, হাঁ করে আছে, বহুদিন কালির সম্পর্ক শূন্য। চামড়া ফাঁক দিয়ে ছাই রংএর মোজা দেখা যাচ্ছিল পাশেই আরেকটি বুট। মৃতপ্রায় কোন সাথীর।

পিঁপ্‌ড়েটা তখনই তার ক্ষত স্থানে ঢুকে পড়লো। অসহ্য যন্ত্রণা। দাঁত মুখ খিঁচে ভয়ে-জমা আড়ষ্টের মত পড়ে রইল। তুমি ঠিক ধরেছ। সে আমার মতই মৃত, হা! হা!

একটা হুইসেল পড়ল, সঙ্গে লাঠির ভোঁ ভোঁ শব্দ। তার পর ব্যাকুল বিক্ষেপ। সেই বুটটি ভীষণ ভাবে মোচড় খেয়ে ধূলোর কাছে লুটোপুটি করছিল। একটু পরেই আবার গুলির শব্দ। মুহূর্ত্তের জন্য চারিদিক নিস্তব্ধ। বুটের সজোর প্রক্ষেপ, পরক্ষণেই আবার নিরস্ত, নিঃস্পন্দ।

ফিলিপ অফিসারের হাসি শুনতে পেল। 'বন্দুকটির লক্ষ্য বেশ ভাল। প্রথমবারেই এতটা সাফল্য। এরূপ বহু মার্কসিষ্ট জুট্‌বে। ক্রেদের কীট, ক্রেদেই তাদের পরিসমাপ্তি করা গেল।'

সূর্য্য ওঠার সাথে সাথে আরো পিঁপড়ে তার মুখমণ্ডলের ক্ষতে ঢুকতে সুরু করল। তাদের তাড়াতে চেষ্টা করেও সে কৃতকার্য্য হলনা। সে যেন আর তার মধ্যে নেই। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করে

পুড়ছে। ফিলিপের দেহ নিঃসৃত ঘামে আশেপাশের মাটি ভিজে গেছে। জ্বলন্ত সূর্য্য আবার উহা জলীয় আকারে তার হাড়ের ভিতর দিয়ে শুষে নিচ্ছে।

সময় যেন আর চলছে না, থেমে থেমে পড়ছে। পায়ের রক্তের দাগ জমে শক্ত হয়ে গেছে। পিঁপড়ের দল ক্ষতদেশে নিজেদের একাধিপত্য স্থাপন করছে।

গতকালের ঘটনা যেন এক যুগ আগে হয়েছে...রাস্তায় যুদ্ধ, ধীরে ধীরে পশ্চাৎ অপসারণ, আহতদের করুণ আর্তনাদ, গুলিবিদ্ধ ঘোড়া। পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি এবং ক্ষুরের আঘাতে আহতদের আতঙ্ক, তার বাবার সাদা ফেকাশে মুখ, মুরদের চক্রব্যূহ আরো কত কি...। এখন তার পালাতে হবে। সে প্রথম কারাগার, তারপর একে একে বন্দুক, অফিসার ও পিঁপড়ে হতে রক্ষা পেয়েছে। কাজেই তার বাঁচার পিছনে কোন অভিপ্রায় আছে। ধূলিশায়িত ডান হাতের দিকে সে নিষ্প্রভ ভাবে তাকাল। তার আঙ্গুল অসার, গতি কঠিন আড়ষ্ট ও বেদনা ব্যঞ্জক। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ফিলিপ আস্তে আস্তে হাত মুঠ করল। তার দৃঢ় ক্ষুদ্র মুষ্টি পাষাণের উপর তখনও প্রসারিত।

চার সপ্তাহ সে তার আদর্শের জন্য যুদ্ধ করেছে। একদিন সে সত্যিকার মানুষ ছিল। তার বয়স সবে মাত্র ষোল।

রবার্ট ওয়েষ্টারবি লিখিত 'Militia-man' হইতে

রোমের একটি খবর

একজন ফ্যাসিষ্ট-বিরোধীকে বধ্য ভূমিতে নিয়ে যাবার পর জিজ্ঞেস করা হল, মৃত্যুর পূর্বে সে কি চায়।

"আহা, আমি যদি ফ্যাসিষ্ট হতাম!"—চট্ করে সে জবাব দিলে।

অফিসারটি উৎসুক হয়ে উঠল, জিজ্ঞেস করল, "কেন এমন চমৎকার কথা শেষটায় বললে?"

তখনই জবাব এল—"তোমরা যখন আমায় গুলি করবে, একটি ফ্যাসিষ্ট তো দুনিয়া থেকে কমবে? এমন মধুর সান্ত্বনা কোথা পাব বল ত?"

বৈশাখের বাণী

সুরমা মিত্র

আমাদের দেশে প্রাচীন কাল হইতে নানা সময়ে বর্ষের আরম্ভ গণনা করা হইয়াছে। কিন্তু বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ গণনার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। প্রাকৃতিক জগতে বৈশাখ মাসের কিছু পূর্ব্ব হইতেই যে নবীন জীবন আরম্ভ হয় বৈশাখ মাসেই তাহা পরিসমাপ্ত হয়। প্রকৃতির দিকে চাহিলে দেখিতে পাই যে ফাল্গুন ও চৈত্র ধরিয়া অনেক গাছেরই পাতা বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়া যায় এবং নূতন পত্রোদ্গম হইতে আরম্ভ হয়। অনেক গাছের বেলা এমনও দেখা যায় যে তাহারা একেবারে পত্রশূন্য হইয়া সমস্ত বৎসরের চরম পরিণতিস্বরূপ শেষ পুষ্প-অর্ঘ্য অসীম আকাশের উদ্দেশে সমর্পণ করিয়া পত্রে পুষ্পে সম্পূর্ণ রিক্ত হইয়া যায়। আবার ইহাও দেখা যায় যে, অনেক গাছে কখন পত্র ঝরে কখন নূতনের উদয় হয় কিছুই বলা যায় না। দৃষ্টির অন্তরালে একটি একটি করিয়া জীর্ণ পাতা খসিয়া পড়ে, তাহার স্থানে নূতন পাতা মুঞ্জরিত হয়,—এই ঝরা ও মুঞ্জরণের ব্যবধানটুকু চোখে ধরা পড়ে না। দেখিয়া মনে হয় তাহারা আজীবন শ্যামল হইয়াই রহিয়াছে, ক্ষয়ের কোনও চিহ্ন নাই। মরণের সংগ্রামের মধ্য দিয়া যেন তাহাকে যাইতে হয় নাই, চিরযৌবন ও চিরজীবন অক্ষুণ্ণ হইয়া রহিয়াছে। এই যে বৃক্ষহইতে বসন্ত ঋতুতে সমস্ত পাতা ঝরিয়া পড়ে, মৃত্যুর গহন ছায়া তাহাকে রিক্ত, মলিন করিয়া তোলে, আবার নূতন পাতার মধ্য দিয়া নূতন জীবন স্ফুট হইয়া ওঠে—এই কথাটি অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথের অনেক কাব্য নাটক অনুপ্রাণিত হইয়াছে। তিনি প্রকৃতির দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঝরা পাতার মধ্য দিয়া প্রাণিজগৎ মৃত্যুগুহার দুর্গম অভিযানে ধাবিত হয় ও অপরদিকে আলোকের ঝরণার মধ্য দিয়া নূতন শোভাসম্পদে জীবনধারায় অভিষিক্ত হইয়া দেখা দেয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়া জীবনেরই পুনঃ পুনঃ প্রাপ্তি,—ইহা শুধু প্রকৃতিরই ধর্ম্ম নয়, মানুষের এবং সমগ্র প্রাণিলোকেরও রহস্য তাহাই। উপনিষদে লেখা আছে—শস্যের মতই মানুষ বিনষ্ট হয় ও নূতন অঙ্কুরে অঙ্কুরিত হইয়া ওঠে। দেখা না দেখা আসা ও যাওয়ার লীলাতেই বিরাট জীবলোক স্পন্দিত হয়।

এই মৃত্যু বা অদেখার স্থান কোথায়? ঝরার সহিত মুঞ্জরণের কি সম্পর্ক? গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ে, ফুল শুকাইয়া যায়—ইহার সহিত গাছের জীবনীশক্তির সম্পর্ক কোনখানে? সমগ্র জীবনে প্রাণপ্রবাহের মধ্যে জীবন মরণের দ্বন্দ্ব কোথায়? এই প্রশ্ন উঠিলেই প্রাকৃতিক জীবন হইতেই তাহার সমাধান ভাসিয়া আসে। গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ার অর্থ এই যে, যে পাতা

দিয়া বৃক্ষটি সূর্য্যের উত্তাপ ও পারিপার্শ্বিক বায়ু হইতে জীবনের রস সংগ্রহ করিয়াছিল, সেটি অকর্ম্মণ্য হওয়াতে নূতন পাতার দ্বারা জীবনকে রক্ষা করার প্রয়োজন হইয়াছে—তাই নবীনের আগমন। নিরন্তর মৃত্যুর মধ্য দিয়া পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন হইতে বৃদ্ধির উপযোগী রস আহরণ করিবার জন্যই নূতন নূতন পত্রের উদ্গম হয়। পুরাতনের বিয়োগে জীবনের নূতন বাহনের আবির্ভাব হয়। এই মৃত্যু ও জন্মের লীলা প্রাত্যহিক জীবনে নিরন্তর অলক্ষ্যেও চলিতে থাকে, কখনও বা ঋতুর পরিবর্ত্তনকালে বিশিষ্ট সময়ে একটি বিশেষ স্বরূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সর্ব্বত্র জীবনের ধারাকে নিত্য সরস, নব নব সম্ভাবনায় স্যন্দমান করিয়া রাখাই ইহার গূঢ়তম তত্ত্ব—চিরন্তন রহস্য।

প্রাকৃতিক জীবনেরই একটি প্রতিচ্ছায়াকে অভিনব আলোকসম্পাতে আমাদের অন্তর্জীবনে প্রস্ফুরিত হইতে দেখি। একটি একটি করিয়া হৃদয়ের জীর্ণ দল ঝরিয়া পড়ে, নূতন নূতন দল প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। এই ঝরিয়া পড়া ও নূতনের বিকাশ সম্বন্ধে হয় ত সকল সময় সচেতন হইতে পারি না। তিলে তিলে দণ্ডে পলে ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তরে বিভিন্ন ভাব, চিন্তা ও প্রেরণার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া নূতন বৃত্তি, নূতন প্রেরণার উদয়ে,—ক্রমপরিবর্ত্তনে অন্তর গড়িয়া উঠিতেছে। দৈনন্দিন জীবনের এই ক্ষয় ও বৃদ্ধি আমরা লক্ষ্য করিতে পারি না। কিন্তু কালের রেখা একটু দীর্ঘ করিয়া টানিয়া পরিমাপ করিতে গেলেই তাহা পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। দুই বৎসরের শিশুচিত্তকে তিন বৎসরের সহিত তুলনায় যাহা বুঝা যায় না—অনেক পরবর্ত্তী বয়সের সঙ্গে তুলনায় তাহা দেখা অত্যন্ত সহজ হয়। আবার প্রকৃতির ঋতু পরিবর্ত্তনের ন্যায় বিশেষ বিশেষ বয়ঃসন্ধিস্থলে অন্তরের এই বেশ পরিবর্ত্তন আমাদের এই সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলে। দীর্ঘ দেহ চাঁপা বকুল গন্ধরাজ বৃক্ষের মতই এতদিনকার সকল সঞ্চয়ের বিনিময়ে নূতন অর্ঘ্য আহরণ করিয়া যৌবনজাগ্রত চিত্ত আপনাকে সমৃদ্ধ করিতে প্রয়াসী হয়। কাহারও কাছে ইহা নূতন আবির্ভাবের ন্যায়, কাহারও পক্ষে ইহা তাহার চিরশ্যামল জীবনের শত সহস্র সমৃদ্ধ ক্ষণের মধ্যে একটি মাত্র। নিরন্তর বিনাশ ও ধ্বংসের মধ্য দিয়া হৃদয়ের একটি একটি করিয়া কোষ উন্মুক্ত হইয়া জীবনের পূর্ণতর বিকাশের সূচনা করে।

এই যে জীবন ও মৃত্যুর লীলা—একই প্রবাহে উত্থান ও পতন আমাদের সমস্ত বাহির ও অন্তর্জীবনকে ব্যাপ্ত করিয়াছে—ইহাকে শুধু পুরাতনের নাশ ও নূতনের আবির্ভাব এই আখ্যা দেওয়া যায় না; কেবলমাত্র পরিবর্ত্তনই ইহার মূল কথা নয়। জীবনকে সন্ধান করিবার জন্য তাহার গতিশীল স্রোতোধারাকে অনাবিল ও অপ্রতিহত রাখিবার জন্য শক্তি আহরণ করার মধ্যেই ইহার মূল তত্ত্ব নিহিত আছে। প্রাকৃতিক তরুলতা গুল্মের জীবনের সহিত আমাদের অন্তর্জীবনের এইখানেই পার্থক্য যে, এই নিরন্তর সৃষ্টিকার্য্যে আমাদের চিত্ত বুদ্ধ ও জাগ্রত হইয়া মূক প্রাণশক্তির সহজ পরিণতির সহায়তা করিতে পারে। যে জীবনধারা প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে, তাহারই একটি বিশেষ প্রকাশ আমাদের অন্তর্লোকে রূপ গ্রহণ করিতেছে। নূতন

দল বিকশিত হইয়া জীর্ণ, শুষ্ক ও ম্লান দলপত্রটির স্থান গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু এই স্থানবিনিময় ও মুঞ্জরণের মধ্যে আমাদের চেতনার প্রেরণারও কিছু অংশ আছে। এই অবিরাম ঝরিয়া পড়া ও প্রস্ফুটিত হওয়ার প্রণালী কেবল জৈবশক্তির দ্বারা বাহিরের নিয়মে পরিচালিত হয় না। আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রবৃত্তি তাহাকে কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

প্রায়শঃই শোনা যায় 'জীবন' এই শব্দটির অর্থ বিচিত্র অনুভূতি বা উপলব্ধি (Experience), কিন্তু সাধারণতঃ যে অর্থে এই কথাটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাপেক্ষা তাহার অর্থ অনেক বেশী ব্যাপক ও গভীর। কেবলমাত্র বিচিত্র ঘটনাপরম্পরার সমাবেশে বা নির্বাধ সুখভোগে বা মূক বেদনার অনুভূতিতে বা স্বাচ্ছন্দ্যে বিভিন্ন দেশের ও সমাজের সহিত পরিচয়কেই উপলব্ধি বলা যায় না। ইহারা বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন স্তরের ভোগ মাত্র। উপলব্ধি অর্থ কেবল প্রাপ্তি নহে—যাহা কিছু আমরা পাই তাহাকে বিশেষ কোনও তাৎপর্য্যের সহিত অন্বিত করিয়া গ্রহণ করা—বিশেষ ভাবে লাভ করাকে উপলব্ধি বলিতে পারি। এই যে বিশেষ তাৎপর্য্যে অনুভূত বিষয়কে উপরঞ্জিত করা—ইহার মূলে আছে শিল্পীচিত্ত ও আত্মসৃষ্টি। বাহিরের ঘটনার বৈচিত্র্য না থাকিলেও প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে চিত্তে যে অতি সহজ বা জটিল স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির সংঘাত চলে, সামঞ্জস্যের দ্বারা তাহাদের নূতনতর ও সুন্দরতর রূপ সৃষ্টি করাতেই উপলব্ধি বা Experience এর যথার্থ সার্থকতা। উপলব্ধি পরতন্ত্র (Passive), বহির্ব্যাপারাধীন নহে, কিন্তু তাহা স্বতন্ত্র (active বা creative)। যে উপাদান ঘটনার স্রোতে আমাদের কাছে ভাসিয়া আসে তাহার মূল্য ততটা নাই—যতটুকু আছে তাহাকে লইয়া চিত্তের শিল্পসৃষ্টিতে রূপায়িত করিয়া তোলার মধ্যে। কেবলমাত্র ভোগে নহে, চিত্তের ক্ষণিক বিলাসে নহে, কিন্তু ধ্যানলীন শিল্পীচিত্তের নিরন্তর আত্মসৃষ্টিতে তাহার যথার্থ সার্থকতা। আমাদের সমগ্র অন্তর্জীবন একটি শিল্পসৃষ্টি বা art এবং এই সৃষ্টি ও উপলব্ধিকে পৃথক্ করিয়া দেখা কঠিন। চিত্রী যেমন তাঁহার চিত্রের বিষয়টিকে তাহার যে নিগূঢ় স্বরূপে ধ্যানবলে প্রত্যক্ষ করেন এবং রেখা এবং বর্ণের সমাবেশে, আলো-ছায়ার সংমিশ্রণে তাঁহার অন্তরের স্পর্শটিকে রূপময় ও মূর্ত্ত করিয়া তোলেন, আমাদের অন্তরে যে শিল্পী সুপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তপস্যার দ্বারা তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিলে তিনিও তেমনই তাঁহার তুলিকার স্পর্শে সকল দুঃখ সুখ, আশা নিরাশা ও বিভিন্ন বৃত্তির ঘাত সজ্ঘাতকে নূতন রূপ ও তাৎপর্য্যে উপলব্ধি করিয়া চিত্তকে নব নব ভাবোচ্ছ্বাসে উপরঞ্জিত করিয়া তোলেন। এই সৃষ্টির সৌন্দর্য্য ও আনন্দ নির্ভর করে নূতন দৃষ্টির ভঙ্গিমায়; যে দৃষ্টি কেবলমাত্র দেখে না, যাহা সকল দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করিয়া, সংঘর্ষকে দলিত করিয়া সমগ্র চিত্তকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে সকল মানবের সহিত প্রেমে, করুণায়, ক্ষমায় ও দাক্ষিণ্যে একটি মিলনসূত্রে গ্রথিত করে। অন্তরের এই পরম সুন্দর, কল্যাণবাহী শিল্পের উৎকর্ষ নির্ভর করে দৃষ্টির প্রসার ও উদারতায়, বৃহত্তর জগতের সহিত একাত্মবোধের উপর, যেখানে সুন্দর শুভে পরিণত হয়, স্বাতন্ত্র্য মাধুর্য্যে বিগলিত হয়।

নিরন্তর সাধনায়, তপস্যার দৃপ্ত তেজে সেই বোধি বা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায়। যাহার বলে সকল কুশ্রীতাকে, গ্লানিকে, ভেদ ও দ্বন্দ্বকে তাহাদের ব্যাপকতর, শুদ্ধতর, সুন্দরতর স্বরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। অসম্পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখি বলিয়াই ঈর্ষা, দ্বেষ ও মলিনতা তাহাদের কলুষতায় আবিল হইয়া দেখা দেয়—তাহাকে একটু প্রসারিত করিয়া দেখিলে দেখি তাহারা অন্তরের এক একটি রেখার ভঙ্গী হইতে উদ্ভূত,—ব্যক্তিবিশেষের অজ্ঞতা, অক্ষমতা বা একদেশিক দুর্ব্বলতা মাত্র। স্রোতের মধ্যে বুদ্বুদের ন্যায় তাহার সকল জটিলতা বিলীন হইয়া যায়।

জীবনের এই উপলব্ধি বা পরম শিল্প জীবনের মর্য্যাদা ও সার্থকতা বহন করে। ইহাকে লাভ করিবার জন্য সেই অবিচল নিষ্ঠা, অপ্রমাদ (বা সতত জাগ্রত থাকা) ও সাধনার প্রয়োজন—শত বিক্ষোভে যাহা অচঞ্চল, ঘোর নৈরাশ্যেও যাহা অকম্পিত দীপশিখার ন্যায় আশার বর্ত্তিকাটিকে প্রজ্বলিত করিয়া রাখে। মৃত্যু জীবনের অকল্যাণ বহন করে না। কিন্তু চিত্তের অনড় জড়াবস্থাই দারুণ সর্ব্বনাশ বহিয়া আনে। যে চিত্ত উপকরণপ্রাচুর্য্যেও নিজের দীনতাকে ভুলিতে পারে না—যাহা দুঃখকে আশায়, বেদনাকে নূতন সম্ভাবনায় রূপান্তরিত করিতে পারে না, জীবনের অন্তবিহীন যৌবনোৎসবে যে আপনাকে পত্রে পুষ্পে বিচিত্র সম্ভারে সমৃদ্ধ করিতে পারে না, কেবল আপনার সঙ্কীর্ণ চক্রেই বারংবার আবর্ত্তিত হইতে থাকে তাহার অভিশপ্ত ভাগ্য সকল মৃত্যু হইতে ভয়ঙ্কর ও শোকাবহ। চিত্তের নিত্য নব উদ্বোধনে আসে কল্যাণ, জড়তায় অকল্যাণ। দুর্গমপথে তীর্থযাত্রী অনন্তকাল ধরিয়া নিত্য মৃত্যুর অমৃতসেচনে সকল গ্লানি ও জীর্ণতাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াছে—সকল লোকচক্ষুর অন্তরালে তাহারা আপন সাফল্যের জয়টীকা লাভ করিয়া ধন্য হইবে।

আমরা সকলেই শিল্পীর পদবী লাভ করিতে পারি কি না—এই একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। প্রাকৃতিক জীবন হইতেই তাহার উত্তর পাওয়া যায়। তরুলতা গুল্ম সর্ব্বত্র একই লীলা—একই ছন্দ বিহরণ করিতেছে। ক্ষুদ্রতম পুষ্পকলিকা হইতে রজনী গন্ধা, গোলাপ ও গন্ধরাজের বিকাশে একই নিয়মের নৃত্যছন্দে গুঞ্জরিত হয়। মানুষের জীবনেও তাহারই অনুরণন ধ্বনিত হইতে থাকে। প্রতি মানবের জীবন সমগ্র বিশ্বের গতির সহিত একই যোগ-সূত্রে গ্রথিত। বৈশাখে আমাদের নবজাগ্রত চিত্তে জীবনের পরম এই রহস্যটিকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। সকল তুচ্ছতা ও দৈন্যের আবরণ উন্মোচিত করিয়া আমাদের অন্তর্লোক আপন মহিমায় প্রকাশিত হোক্। জীবন ও মৃত্যুর মিলনে, চিত্তের নব উদ্বোধনে বৈশাখের জয়শঙ্খ ধ্বনিত হোক্। আমাদের অন্তরগুহায় তপস্যাপূত পরম শিল্পীর গহন গভীর স্বরূপটি উপলব্ধি করিয়া যেন বলিতে পারি—　　　'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'।

———

ক্রুপস্কায়া

লেনিনের জীবন সঙ্গিনী ও কর্মসহচরী

সুশীলা দাশগুপ্তা

"দেখ, আর হয়ত আমাদের দুজনের দেখা হবে না, এস পরস্পরের কাছ থেকে আমরা বিদায় নিই"—

রাশিয়ার ছোট একটি কুটীরে দাঁড়িয়ে লেনিন তাঁর স্ত্রী ক্রুপস্কায়াকে এই কথাগুলি বলছিলেন। বিদায়ের আহ্বান লেনিনের উচ্চারিত বাণীতে প্রকাশিত হ'ল, কিন্তু বিদায় মুহূর্তগুলির নিবিড়তার সামনে ভাষা নির্বাক হয়ে গেল। লেনিন ও ক্রুপস্কায়া পরস্পরকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন।

ক্রুপস্কায়া

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর বিপ্লবের কিছুদিন আগে যখন রাশিয়ার সরকার লেনিনকে ধরবার চেষ্টায় ছিলেন, তখন একদিন লেনিন স্থির করলেন যে তিনি ধরা দিবেন। সেদিন তাঁর সামনের অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে লেনিন ক্রুপস্কায়াকে ঐ কথাগুলি বলেছিলেন।

তাঁর বন্ধুদের চেষ্টায় লেনিন তাঁর মত শেষে পরিবর্তন করেছিলেন। যদি তিনি সত্যই ধরা দিতেন, তাঁকে হয়ত আর বেঁচে থাকতে হ'তনা। অক্টোবর বিদ্রোহের ভাগ্য কি দাঁড়াত তা'হলে কে বলতে পারে।

ক্রুপস্কায়াকে শুধু লেনিনের স্ত্রী বললে দৈনন্দিন জীবনের একটা ব্যবহার মলিন কথার ফ্রেমে তাঁর ব্যক্তিত্বকে সীমাবদ্ধ করা হয়। ক্রুপস্কায়া শুধু লেনিনের স্ত্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর কল্পনা ও কর্মক্ষেত্রের নিত্য সহচরী। প্রবল ব্যক্তিত্বের জ্বলন্ত পরিমণ্ডল ঘিরে একটি স্নিগ্ধ জীবনপ্রদ, চন্দ্রমা। ক্রুপস্কায়া লেনিনকে ভালবেসেছিলেন আর ভালবেসেছিলেন রাশিয়াকে। লেনিন যে রাশিয়ার কত বড় সম্পদ ছিলেন, ক্রুপস্কায়া তা বুঝতেন ভাল করে। তাই লেনিন বেঁচে থাকতে

তাঁর প্রধান কাজ ছিল লেনিন ও রাশিয়ার মধ্যে সংযোগ ঘটানো। এ কাজে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়া।

লেনিনকে অনেকে একনিষ্ঠ কর্মকঠোর বিপ্লবী নেতা হিসাবে জানেন। তাঁর চরিত্রে কোমল ও স্নিগ্ধ দিকের খবর বড় একটা রাখেন না।

ক্রুপ্‌স্‌কায়ার সাহচর্যে সেদিক কিরূপ পরিস্ফুট ও সুষমামণ্ডিত হয়েছিল মেময়রস্ অব্ লেনিনের পাঠক মাত্রেই জানেন। বৈপ্লবিক কাজের ভিতর দিয়ে প্রথম পরিচয় কি ভাবে ধীরে ধীরে দাম্পত্য জীবনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে পরিণতি লাভ করে, ক্রুপ্‌স্‌কায়া সুনিপুণভাবে তা' লিপি-বদ্ধ করেছেন। কারাগারের বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবন যাপনে লেনিনের মত দৃঢ়চিত্ত একনিষ্ঠ কর্মীকেও মাঝে মাঝে মানসিক অবসাদগ্রস্ত দেখা যেত। সে সময় ক্রুপ্‌স্‌কায়ার প্রাণাত্মক সংযোগ ও আন্তরিক সামীপ্য লেনিনকে অনেকভাবে সঞ্জীবিত রেখেছে। লেনিন সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হলে ক্রুপ্‌স্‌কায়া তাঁর অনুগমন করেন। ওখানে তিনি শুধু লেনিনের সেবারতা কল্যাণময়ী সহচরী ছিলেন না; যাবতীয় গুরুতর কার্যের প্রধান সহায়ক ও পরামর্শদাতা ছিলেন। নির্বাসন কাল শেষ হবার পূর্বে লেনিন ভবিষ্যৎ কর্মক্রম ও সংগঠন নীতির ভিত্তিমূল নির্ধারণের জন্য প্রায় সব সময় বিশেষ চিন্তামগ্ন থাকতেন। এ মানসিক পরিশ্রমের জন্য তাঁকে বহু বিনিদ্র রজনী কাটাতে হত। ফলে লেনিন ভীষণ রোগা হয়ে যান। ক্রুপ্‌স্‌কায়া তখন আপন ধৈর্যে, কল্যাণে ও মাধুর্যে লেনিনকে অনুপ্রাণিত রেখেছেন। ফলে বিপ্লবীরা পেল তাদের পথ-বর্তিকা 'what is to be done.' (কিং কর্তব্যম্)। পরবর্তী জীবনে লণ্ডন ও সুইজারল্যাণ্ড প্রবাসকালে লেনিনের সকল ব্যাপারে তাঁর কর্মকুশল তৎপরতা দেখা যেত।

দিনের পর দিন লেনিনের সাথে রাশিয়ার কর্মীদের পত্র বিনিময় হত—শত শত চিঠি—ক্রুপ্‌স্‌কায়া প্রাণপনে সেই সমস্ত চিঠিপত্র লিখে সাহায্য করতেন। অনেক সময় লেনিনকে বিরক্ত না ক'রে নিজেই উত্তর দিতেন। শব্দহীন, খ্যাতিহীন কর্মে তাঁর ছিল অসাধারণ নিষ্ঠা। তাই লেনিনের প্রবল প্রকাণ্ডতার মধ্যে তিনি নিজেকে রাখতেন লুকিয়ে ফুলের মর্মকোষের মত।

১৯১৭ সালে বিপ্লবের আগে লেনিন যখন রাশিয়ায় ফিরে এলেন, বিরোধীদল প্রচার ক'রে দিলে, যে লেনিন জার্মাণীর স্পাই, সে অর্থ ঘুষ দিয়ে মজুরদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে, তাদের মহাযুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হতে বলছে। ইহা এরূপভাবে প্রচার হয় যে, লেনিনকে হত্যা করবার জন্য সাধারণের মধ্যে একটা উত্তেজনা দেখা যায়। ক্রুপ্‌স্‌কায়া তখন ঐ প্রচারের বিরুদ্ধে আপন শক্তি ও লেখনী নিয়োগ করেন।

বিপ্লবের পূর্বে লেনিন ফিনল্যাণ্ডে কিছুদিন আত্মগোপন করেছিলেন। সে সময় বৈপ্লবিক কার্যে ও সহকর্মীদের সাথে লেনিনের সংযোগ রক্ষা করতেন ক্রুপস্‌কায়া। বলশেভিক পার্টি সংগঠন ও পত্রিকা পরিচালনকার্যে তিনি লেনিনকে অকুণ্ঠচিত্তে সাহায্য করতেন। তাঁর মত এরূপ

আত্মবিলোপী একনিষ্ঠ সহকর্মী না পেলে বোধ হয় লেনিনের পক্ষে কিছুতেই এত কাজ করা সম্ভব হত না।

ক্রুপস্কায়া লেনিনের ব্যক্তিগত জীবনে অনেকখানি আলোক সম্পাত করেছেন। লেনিন একজন বড় সাহিত্য-রসিক ছিলেন। কান্ট হেগেলের সাথে টলষ্টয়, গগল্, পুস্কিন, লারমন্টক, বেলজ্যাক প্রভৃতি লেনিনের শয্যার পাশে ক্রুপ্স্কায়াকে রাখতে হত। কারাগৃহে নির্বাসন ও পরবর্তী জীবনে কর্মক্লান্ত সন্ধ্যায় লেনিন উপন্যাস পড়তেন। সাইবেরিয়ায় বাসকালে লেনিন অত্যন্ত শীকার প্রিয় ছিলেন। পরে ষ্টেট্ হতে তাঁর জন্য মাঝে মাঝে সে ব্যবস্থা করা হত; কিন্তু লেনিন শীকারে আর তেমন উৎসাহ দেখাতেন না! তাঁর হৃদয়ের কোমল দিক তখন এমন প্রবল ছিল যে, কোন প্রাণীহত্যা তাঁর পক্ষে একান্ত অসম্ভব। তিনি অনেক সময় সেজন্য নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী হয়ে পড়তেন। পার্টি গঠন নীতি বিরোধ নিয়ে মার্টব্ ও অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে তার বিরোধ ও বিচ্ছেদ লেনিনের পক্ষে কত মর্মান্তিক হয়েছিল ক্রুপ্স্কায়ার মারফত তা' জানা যায়— সেদিন রাত্রে লেনিন গভীর বিষাদমগ্ন ও বিনিদ্র অবস্থায় শীতে ঠক্ঠক্ করে কাঁপছিলেন। কোন কিছু খেয়াল নেই।

শিশুদের প্রতি লেনিনের আসক্তি ও স্নেহপ্রবণতা অত্যন্ত প্রবল ছিল। ক্রেমলিনে অবস্থান কালে এত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সুবিধা পেলে এদের সাথে মিশ্তেন।

আততায়ীর গুলিতে লেনিনের জীবন যখন সঙ্কটাপন্ন, ক্রুপ্স্কায়ার সেবাসিদ্ধ হস্ত ও প্রীতি-পূর্ণ সাহচর্য লেনিনকে আবার পুনর্জীবন দান করেছে বল্লেই চলে।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পর ক্রুপ্স্কায়া দেশকে শিক্ষার দিক দিয়ে উন্নীত করবার চেষ্টা করতে সমর্থ এবং বহুল পরিমাণে সফল হয়েছিলেন। সমস্ত সোভিয়েটের শিক্ষা বিভাগের তিনি ছিলেন ডেপুটী কমিশনার। লেনিন বেঁচে থাকতে এবং তাঁর মৃত্যুর পর পনের বছর ধরে তিনি 'Pravda' কাগজে রাশিয়ার জনগণের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং উদাহরণ রাশিয়া বা বল্তে গেলে সারা ইউরোপের বহু নর এবং বিশেষ করে নারীদের উৎসাহিত করেছে।

আজ আর ক্রুপ্স্কায়া জীবিত নেই। বিপ্লবী নারী হিসাবে তার স্থান রোসা লাকেসবার্গ, ক্লারাজেটসিন, পেসিয়নারা প্রভৃতির সাথে। লেনিনের সঙ্গে চিরকাল নাম বিজড়িত থাকবে তাঁর। সমাজতান্ত্রিক গণবিপ্লবের ইতিহাসের পাতায় লেনিন যদি বেঁচে থাকেন, ক্রুপ্স্কায়াও বেঁচে থাক্বেন। মানুষ অন্তত একথাটা ভুলবেনা যে জগতের কাছে লেনিনের সাধনাকে মূর্ত করায় ক্রুপ্স্কায়ার দান কতখানি।

———

কলি

কল্যাণী সেন।

শুনেছি সে সত্যযুগে
দেবতা দানবে লেগেছে ভীষণ দ্বন্দ্ব।
কখনো দেবতা জয়ী, কখনো দানব,
নিরন্তর চলেছিল চক্র-আবর্তন সৌভাগ্য রথের ॥

তারপরে একদিন সমুদ্রমন্থনে এল লক্ষ্মী সুধাভাণ্ড করে ;
সে অমৃত পানে দেব হল বলী,
দুর্বল দানব হ'ল পরাজিত চিরকাল তরে ;
অখণ্ড রাজত্ব পেল দেবতা আপন স্বর্গে ॥

তারপর কোন যুগে
রসাতল ছেড়ে দানব সে উঠে এল পৃথিবীর বুকে ;
শ্রান্ত দেহে তার আলোক-বাতাস দিল পরম সান্ত্বনা,
বল পেল ফিরে।
ভুলাল তাদের মন ধরিত্রীর এই
ফলশস্যপরিপূর্ণ ঋদ্ধি, শ্যামলিমা,
আক্রমিল তাই তা'রা মানবের ধরা ॥

দানবে মানবে তবে লাগিল ভীষণ দ্বন্দ্ব।
সৃষ্টি গেল রসাতলে,
শ্রান্ত, ভীত, পরাজিত, দুর্বল মানব
ঝড়বৃষ্টিঝঞ্ঝাবাতে হ'ল প্রপীড়িত,

ভূকম্পের করাল কবলে গেল তার গৃহধন,
আত্মীয় স্বজন,
পাপীর প্রহারে তা'র ধর্ম হ'ল নাশ ॥

বিজয়ী দেবতা স্বর্গে ছিল নিদ্রাতুর
পরম শান্তিতে,
সহসা উঠিল জেগে কাতর ক্রন্দনে।
যুগে যুগে নারায়ণ অবতীর্ণ হয়ে
দানবের পরাজয় হল, জয় মানব ধর্মের ॥

আশ্বস্ত মানব জ্ঞান-সমুদ্র মন্থনে
একে একে অস্ত্র লভি বাঁধিল দানবে অচ্ছেদ্য বন্ধনে,
নিয়োজিল তারে স্বগৃহকর্মায়।
নর হ'ল রাজা, আর দানব তাহার চির পদানত ভৃত্য ॥
শত্রু হ'ল পরাজিত ; তবুও মন্থন
থামালনা মূঢ় নর।
উঠিল গরল,
ঔষধ যে ছিল, কালে সেই হ'ল বিষ।
যেই বল ছিল তা'র সহায় রক্ষক,
সেই বল অতিমাত্রা হয়ে উন্মোচিল বিনাশের দ্বার।
মৃত্যুন্মুখী বৃশ্চিকের মতো
মানব হানিল অস্ত্র আপনার পরে ॥

স্বর্গের দেবতা আছে পরম নিশ্চিন্তে, নিদ্রাগত।
তারা জাগিলনা, জানিলনা তারা,
তা'দের সাধের সৃষ্টি ধ্বংস হ'ল আজ ॥

মানবে মানবে আজ লেগেছে সংগ্রাম।
শৃঙ্খলিত, পাশবদ্ধ যত দৈত্যদাস
মানবের সেনাদল।
বন্ধন তাদের খুলে দিয়ে মুক্তি দিল শত্রুদল পরে ;
বন্য কুক্কুরের মত ছিন্নভিন্ন করে তা'রা মানবের দেহ,
বেড়ে ওঠে মৃত্যু ক্রমাগত,
নদীস্রোত রক্ত হয়ে বয়ে যায় রক্তিম সাগরে।
ধরিত্রী শ্মশান হ'ল—ভীষণ পাটল,
চূর্ণ হ'ল পল্লীগ্রাম, নগর, সংসার,
মরে গেল মানবের মানবতা।
দেবতা ঘুমায় তবু নিশ্চিন্ত আবেশে।
সৃষ্টি মুছে দিল তাঁ'র করসৃষ্ট জীব ;
তবু তো জাগেনা তাঁ'রা।

বোস ইলেকট্রন (Bose-Electron)

অধ্যাপক প্রমথনাথ সেনগুপ্ত

বিশ্বছবিতে সব চেয়ে যা চোখে পড়ে সে হোলো নক্ষত্রলোক এবং তারই প্রত্যন্তদেশে অবস্থিত একটি সাধারণ নক্ষত্র সূর্য্য, যে তার গ্রহপরিবার নিয়ে বহুযুগ ধরে বিশ্বজগতের নিয়ম ও শৃঙ্খলা পালন করছে। সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষের মনে এরাই এতোকাল প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে মানুষকে সব চেয়ে অভিভূত করে দিয়েছে এই বিশ্বের ভিতরকার লুকোনো বিশ্ব, যা চোখে দেখা যায়না অথচ যা সমস্ত সৃষ্টির মূলে। একদিন মানুষ যখন সৃষ্টির মূল পদার্থের সন্ধান করেছিলো তখন সে কল্পনা করেছিলো এই মূল পদার্থ এমন একটা কিছু যার সূক্ষ্মতর ভাগ সম্ভব নয়, তার নাম দিয়েছিল পরমাণু, য়ুরোপীয় ভাষায় যাকে বলা হয় atom। পরীক্ষার ফলে ৯২টি মৌলিক পদার্থের সন্ধান মিলেছে; কিছুকাল এরাই জগতে মৌলিক বলে খ্যাতি লাভ করেছিল। কিন্তু বিজ্ঞানীর দুর্দ্দমনীয় শক্তির কাছে হার মেনে, আপন অভ্যন্তরে সঙ্গোপনে সঞ্চিত বৈদ্যুৎকণা উজার করে দিয়ে, বিদায় নিতে হোলো মৌলিক পদার্থের পর্য্যায় থেকে। অদৃশ্য অতি ক্ষুদ্র এই বৈদ্যুৎকণাদের পরীক্ষা করে কয়েকটি বিশেষ গুণ এদের উপর আরোপ করা হয়েছে। মৌলিককণা মাত্রেরই বৈদ্যুৎ, ওজন, ঘোরার ভঙ্গী ও বিন্যাসের একটা বৈশিষ্ট্য থাকা চাই (A fundamental particle is characterised by its electrical charge, mass, mechanical and magnetic moments and the statistics it obeys, either Bose-Einstein or Fermi-Dirac)। বিন্যাস অর্থাৎ কি নিয়মে এ সব কণা পরস্পর সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকতে পারে তাকেই বিজ্ঞানীদের ভাষায় নাম দেওয়া হয়েছে Statistics। প্রচলিত দুটি statisticsর কথা এখানে সামান্য একটু বলবো। বাংলার কৃতী সন্তান অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বসু ও জার্ম্মানীর অধ্যাপক আলবার্ট আইনস্টাইন এই দুই বিশ্ববিশ্রুত মনিষীর সম্মিলিত চেষ্টার ফলে যে statistics গড়ে উঠেছে আজ তা "বোস-আইনস্টাইন" statistics নামে পৃথিবীতে সুপরিচিত। Fermi ও Dirac নামে দুজন বিজ্ঞানী অপর statisticsর নিয়মাবলী বেঁধেছেন, যা Fermi-Dirac statistics নামে খ্যাতি লাভ করেছে। জ্যামিতিতে যাকে বিন্দু (point) বলি তার চলাফেরার স্বাধীনতা থাকতে পারে তিন প্রকারের (three degrees of freedom), সবই স্থান পরিবর্ত্তনের (translation); কিন্তু এই তিন প্রকারের স্বাধীনতা ছাড়াও মৌলিক কণাদের আরো একটি স্বাধীনতা রয়েছে যাকে বলতে পারি "ঘোরার ভঙ্গী," ইংরেজীতে যার নাম দেওয়া হয়েছে spin। Fermi-Dirac Statisticsএ ধরে নেওয়া হয়েছে যে কোনো পদার্থে

তার মৌলিক কণাগুলোর চলা ও ঘোরার ভঙ্গী ঠিক এক হতে পারে না, কিন্তু "বোস-আইন্‌স্টাইন" statisticsএ এই রকম কোনো বাধা রাখা হয়নি।

১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক জগতে মৌলিক কণা বলে প্রাধান্য পেয়ে এসেছে ইলেকট্রন ও প্রোটোন। এর পরেই আরো দুটি মূলকণার খবর জানা গেছে যাদের নাম দেওয়া হয়েছে "ন্যুট্রন" (Neutron) ও " পজিট্রন " (Positron)। ন্যুট্রন আবিষ্কার করেন Chadwick। Bothe ও Becke র অনুসন্ধানকে কেন্দ্র করে তিনি দেখলেন যে Polonium ধাতু নিঃসৃত বিপুল তেজ-সম্পন্ন আলফা-কণার (α-particle) প্রচণ্ড আঘাতে Beryllium ধাতু থেকে গামা-রশ্মি (γ-rays) ছাড়া তীব্রতর আরো একপ্রকার রশ্মির সৃষ্টি হয়। সাধারণ রশ্মি থেকে এই নূতন রশ্মির গুণ সম্পূর্ণ আলাদা ; পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুর (Nucleus) সঙ্গে সংঘাত না হলে এর চলার পথের কোনো রেখাই উইলসন্ আবিষ্কৃত যন্ত্রের (Wilson-Chamber) ভিতর পাওয়া যায় না। বিপুল তেজসম্পন্ন অদৃশ্য অতিপরমাণুদের চলার পথ দৃশ্যমান করেছেন C. T. R. Wilson তার আবিষ্কৃত যন্ত্রে। বৈদ্যুতের দল যখন হাওয়ার ভিতর দিয়ে যায় তখন তাদের প্রচণ্ড আঘাতে হাওয়ার অণুপরমাণু থেকে ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ; ইলেকট্রন-মুক্ত এই সব অণুর উপর জলীয় বাষ্প থেকে বিন্দু বিন্দু জল জমা হয়ে অদৃশ্য বৈদ্যুতের চলার পথ আমাদের দৃষ্টিগোচর করে। হাইড্রোজেন সংযুক্ত কোন যৌগিক পদার্থকে আঘাত করে এই রশ্মি তার ভিতর থেকে প্রচণ্ড গতিশীল প্রোটোন-কণা বের করে আনে, কিন্তু কোনো ইলেকট্রনের সঙ্গে এর সংঘাত ঘটেনা। Röntgen রশ্মি জাতীয় সাধারণ আলো কিন্তু পদার্থের ভিতর থেকে সহজেই ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কাজেই এই নূতন রশ্মিকে সাধারণ আলোর পর্য্যায় না ফেলে প্রোটোনের ওজনের সম-তুল্য বৈদ্যুৎহীন একপ্রকার মৌলিককণা বলে ধরে নিলে এর রীতিনীতির একটা সহজ কিনারা করা যায়। এই বস্তুকণার নাম দেওয়া হয়েছে "ন্যুট্রন" (Neutron)। এদের পরীক্ষা করে জানা গেছে এরা প্রোটোন থেকে সামান্য একটু ভারি। এদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয় Fermi-Dirac Statistics মেনে।

মার্কিন বিজ্ঞানী C. D. Anderson দ্বিতীয় মৌলিককণা আবিষ্কার করেন। একটি উইল-সন্ যন্ত্রকে প্রবল চৌম্বিকক্ষেত্রে রেখে, কস্‌মিক-রশ্মি (Cosmic Rays) সেই যন্ত্রে তার চলার পথে যে রেখা সম্পাত করে, তার ফটোগ্রাফ তুলে এণ্ডারসন এমন একটি রেখার খোঁজ পেলেন চৌম্বিক ক্ষেত্রে যার দিক্ পরিবর্ত্তন ইলেকট্রন রেখার দিক্‌পরিবর্ত্তনের সম্পূর্ণ বিপরীত। একটা কথা এখানে বলে রাখা দরকার যে বৈদ্যুৎকণা চৌম্বিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে তার চলার পথ পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়, পজিটিভ ও নিগেটিভ্ কণার ব্যবহার একেবারে বিপরীত। প্রোটোন-কণা যে রেখা সম্পাত করে তা ইলেক্‌ট্রনের রেখার চেয়ে অনেক মোটা, কারণ প্রোটোন তার ওজনের গুরুত্বে হাওয়ার ভিতর বিপ্লব সৃষ্টি করে অনেক বেশী। যে নূতন রেখার সন্ধান Anderson

পেলেন তার দিক্‌পরিবর্ত্তন দেখে এটা নিঃসন্দেহে স্থির হোলো যে এই উজ্জ্বলরেখা কোনো পজিটিভ্ বৈদ্যুৎকণার; কিন্তু প্রোটোন-রেখার চেয়ে অনেক সরু বলে প্রোটোনের সমান ওজন এর থাকতে পারে না। অতি চঞ্চল হাল্‌কা ইলেকট্রন যে রেখা সম্পাত করে এই নূতন বৈদ্যুৎ-কণার রেখাও তেমনি বিচ্ছিন্ন আলোকবিন্দুর সমাবেশ। ইলেকট্রনের বিপরীত-ধর্ম্মী কিন্তু ওজনে তার সমতুল্য একটি নূতন বৈদ্যুৎ-কণার অস্তিত্ব এ ভাবে প্রমাণ হোলো, নাম হলো তার "পজিট্রন" (Positron); একে পজিটিভ্ ইলেকট্রনও বলা যেতে পারে। এর গতি নিয়ন্ত্রিত হয় Fermi-Dirac Statistics র নিয়ম মেনে।

পজিট্রনের সন্ধান পাওয়ার পর দেখা গেল যে প্রোট্রোন ও ন্যুট্রনকে সম্পূর্ণ আলাদা দুটী মৌলিক কণা বলে ভাববার আর দরকার করে না, কারণ এককণা থেকে অন্য কণার সৃষ্টি সম্ভব।

ন্যুট্রন=প্রোটোন+ইলেকট্রন

প্রোটোন=ন্যুট্রন+পজিট্রন

ন্যুট্রনের ওজন ১·০০৯১, প্রোটোনের ওজন ১·০০৮১ এবং এই পরিমাপে ইলেকট্রন ও পজিট্রনের ওজন ·০০০৫৪। প্রোটোন ও ইলেকট্রন মিলে ন্যুট্রন সৃষ্টি হয়েছে একথা মেনে নেওয়ার একটা মস্তো অসুবিধা এই যে প্রোটোন ও ইলেকট্রনের সম্মিলিত ওজনের চেয়ে ন্যুট্রনের ওজন অনেক বেশি। আরো একটা বড়ো বাধা এই যে উপরোক্ত প্রত্যেকটি কণার ঘোরার ভঙ্গি এক রকমের; ঘোরার ভঙ্গি যাদের এক সে রকমের দুটি মৌলিককণার সংযোগে এমন কণাই সৃষ্টি হতে পারে যার ঘোরার ভঙ্গি পূর্ব্বোক্ত কণাদের চেয়ে আলাদা।

অন্য আর একস্থলেও এসব বাধা ও অসুবিধা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। রেডিয়ম জাতীয় তেজস্কর পদার্থের (radio-active substance) কেন্দ্র বস্তু থেকে ক্রমাগত ছিটকে পড়ে আল্‌ফা-কণা ও বিটা-কণা (Beta-Particles)। এই বিটা-কণাগুলো প্রচণ্ড বেগবান ইলেকট্রনের দল। একই পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু থেকে এরা মুক্তি পেলেও এদের ভিতর তেজের (Energy) কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রত্যেকটি আল্‌ফা-কণার তেজ নির্দ্দিষ্ট, কিন্তু এই নিগেটিভ বৈদ্যুৎ-দলের ভিতর তেজের পার্থক্যই দেখা যায় বেশি। তেজস্কর কোনো পদার্থের পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন ছাড়া পেলে তার ওজনের বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন ঘটে না, কারণ পরমাণুর ওজনের তুলনায় ইলেকট্রনের ওজন অত্যন্ত কম; কিন্তু কেন্দ্রবস্তুর বৈদ্যুতের হিসেব করলে দেখা যায় যে একটি ইলেকট্রন বেরিয়ে যাওয়ার পর নূতন কেন্দ্রবস্তুতে পজিটিভ বৈদ্যুতের পরিমাণ বেড়েছে, পরমাণুর তালিকায় তার স্থান এগিয়েছে এক ঘর। কেন্দ্রবস্তু থেকে ইলেকট্রন মুক্ত হওয়ার পর যে নূতন পরমাণুর সৃষ্টি হোলো সেই পরমাণুর এবং প্রথমোক্ত পরমাণুর তেজের পরিমাণ একে-বারে নির্দ্দিষ্ট তেজসম্পন্ন কোনো পরমাণুর ইলেকট্রন বিচ্যুতি ঘটার দরুণ অন্য কোনো পরিমিত

তেজসম্পন্ন পরমাণুতে যদি তার রূপান্তর ঘটে, তাহলে "তেজের বিনষ্টি নেই" এই সূত্রের (Principle of the Conservation of Energy) মর্যাদা রক্ষা করতে হলে কেন্দ্রবস্তু থেকে ছাড়া পাওয়া ইলেকট্রনের দলের ভিতর তেজের সামঞ্জস্যই থাকা উচিত। দ্বিতীয় বাধা হচ্ছে ঘোরার ভঙ্গি নিয়ে; একটি ইলেকট্রন মুক্ত হওয়া পরে নূতন কেন্দ্রবস্তুর ঘোরার ভঙ্গির পরিবর্তন হবে, কিন্তু সম ওজনের কণাদের ভিতর ঘোরার কোনো পার্থক্য আজো দেখা যায়নি। বহু পরীক্ষায় প্রমাণিত এই চিরন্তন নিয়ম লঙ্ঘন করে এদের এই যে বিরুদ্ধাচার তা মেনে নিতে হলে নিম্নোক্ত দুটি পন্থার একটিকে বেছে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই—(১) হয় ভাবতে হবে পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু থেকে ছাড়া পাওয়া নিগেটিভ বৈদ্যুতের দল তেজ ও ঘোরার ভঙ্গির নিয়মের মর্যাদা রক্ষা করে না (২) কিংবা অন্য একটি মৌলিককণা এই ইলেকট্রনের সঙ্গে মুক্ত হয়, যার ঘোরার ভঙ্গি ইলেকট্রনের অনুরূপ; এই কণা কিছুটা তেজ আত্মসাৎ করে নিয়ে যায়।

Pauli সর্বপ্রথমে এই জাতীয় মৌলিককণার কথা প্রচার করেন, তাঁর মতে এদের কোনো বৈদ্যুৎধর্ম নেই, শুধু সামান্য ওজন আছে। তিনি এদের নাম দিলেন ন্যুট্রিনো (Neutrino)। কাল্পনিক এই ন্যুট্রিনোর অস্তিত্ব মেনে নিয়ে কি উপায়ে পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু থেকে ইলেকট্রন ছাড়া পায় তার একটা কিনারা করার চেষ্টা করেছেন Fermi। তিনি বলেন যে কেন্দ্রবস্তুর ভিতরে আছে যে ন্যুট্রন তার প্রলয় ঘটে এবং তা থেকে সৃষ্টি হয় তিনটি মৌলিককণা—প্রোটোন, ইলেকট্রন ও ন্যুট্রিনো।

ন্যুট্রন=প্রোটোন+ইলেকট্রন+ন্যুট্রিনো

এই ন্যুট্রিনোর অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন অনেকেই; কিন্তু বিনাতর্কে নিঃসন্দেহে ন্যুট্রিনোর অস্তিত্ব মেনে নেবার মতো তথ্য আজও কেউ যোগাড় করতে পারেন নি। এই বিষয়ে কোনো চরম পরীক্ষা না হলে এই নূতন মৌলিককণা ন্যুট্রিনোকে কাল্পনিক ছাড়া বাস্তব বলে ভাবা সহজসাধ্য নয়।

ইলেকট্রন, প্রোটোন, ন্যুট্রন, পজিট্রন কাল্পনিক ন্যুট্রিনো এই পাঁচ রকমের মৌলিককণার কথাই এপর্যন্ত বলা হয়েছে। এরা সকলেই Fermi-Dirac Statistics র নিয়ম মেনে চলাফেরার গতি নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু Wave-Mechanics থেকে জানা যায় যে "বোস-আইনস্টাইন" Statistics মেনে চলে এরূপ বস্তুকণা থাকাও খুবই সম্ভব। যতদূর তথ্য সংগ্রহ হয়েছে তা থেকে জানতে পাই ফোটোন (Photon) ড্যুটারন (Deuteron) এবং অন্য অনেক পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু বোস-আইনস্টাইন Statistics র নিয়মেই বাঁধা পড়েছে; কিন্তু ড্যুটারন ও পরমানুর কেন্দ্র বস্তু মৌলিক পদার্থ নয়, আর তেজের সূক্ষ্মতম ভাগ বলে ফোটোনকে কোনো বস্তুকণা বলে ভাবা যায় না। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে বোস-আইনস্টাইন Statistics মেনে চলে এমন কোনো মৌলিককণা কি নেই? ধরে নেওয়া যাক এমন ইলেকট্রন আছে যার গতিবিধি

এই Statistics ই নিয়ন্ত্রিত করে, এর নাম দিতে পারি "বোস-ইলেকট্রন" (Bose-Electron) এরূপ ইলেকট্রন যদি থাকে তাহলে পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুর বাহিরে, যেপথে Fermi-Dirac Statistics মেনে চলা সাধারণ ইলেকট্রনের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখানে তার স্থান হওয়া অসম্ভব ; কেন্দ্রবস্তুর অভ্যন্তরেই "বোস্-ইলেকট্রন" তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে রাখবে।

এরূপ ইলেকট্রনের অস্তিত্ব স্বীকার করে Stueckelberg বলেন যে কেন্দ্রবস্তু থেকে ইলেকট্রন ছাড়া পাওয়ার ব্যাপারকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ ন্যুটন ভেঙে বের হয় প্রোটোন ও বোস-ইলেকট্রন :—

ন্যুটন = প্রোটোন + বোস-ইলেকট্রন

দ্বিতীয়তঃ, এই বোস-ইলেকট্রনের প্রলয় ঘটে, তার থেকে সৃষ্টি হয় সাধারণ ইলেকট্রন ও ন্যুট্রিনো :—

বোস-ইলেকট্রন = ইলেকট্রন + ন্যুট্রিনো

এই বোস-ইলেকট্রনের অস্তিত্ব স্বীকার করলে এক মৌলিককণা থেকে অন্য মৌলিককণায় রূপান্তরের যে সব বাধাবিঘ্নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সহজেই দূরীভূত হয়। এরূপ অনুমান করার মস্তো সুবিধা এই যে ঘোরার ভঙ্গির নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম এতে হয় না, আর এই রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় যে তেজ উদ্ভূত হয় তা আসে বোস-ইলেকট্রন থেকে। এই তেজের পরিমাণ হিসেব করে বোস ইলেকট্রনের ওজন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি খবর জানা গেছে ; সাধারণ ইলেকট্রনের চেয়ে বোস-ইলেকট্রন প্রায় ১৫০ গুণ ভারি, ওজন বেশী বলে এদের ভারি ইলেকট্রনও বলা যেতে পারে।

১৯৩৫ সন থেকে এই বোস-ইলেকট্রন বিজ্ঞানীমহলে এক বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। ন্যুট্রন-প্রোট্রোন সৃষ্টির বাধা ও সমস্যাগুলো এর সাহায্যে অতি সহজেই মীমাংসা করা যায় বলে এর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্যে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর দল আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। বোস্-ইলেকট্রনের খবর জানা মোটেই সহজসাধ্য নয়, কারণ পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুতে এদের অবস্থিতি, তাই কেন্দ্রবস্তুর প্রচণ্ড আকর্ষণ কাটিয়ে মুক্তি পাওয়া এদের পক্ষে একটা দুরূহ ব্যাপার। অল্প কিছুদিন হোলো Anderson ও Neddermayer এবং Street ও Stevenson এমন সব আশ্চর্য্য তথ্য যোগাড় করেছেন যার থেকে বোস-ইলেকট্রনের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে মেনে নেওয়া যেতে পারে। Bethe ও Heither বলেন যে বস্তুপুঞ্জ ভেদ করে চলে আসার পথে বৈদ্যুৎকণার তেজের কিছুটা লোকসান হবে, এই লোকসানের পরিমাণ নির্ভর করবে তার আপন তেজের তহবিলের উপর। কস্‌মিক আলোর আঘাতে প্রচণ্ড তেজ নিয়ে ছাড়া পায় যে-সব বৈদ্যুৎকণা তাদের সাহায্যে Bethe-Heitlerর মতের যাথার্থ্য নির্দ্ধারণ করতে চেষ্টা করলেন Anderson ও Neddermayer।

প্রবল চৌম্বিক ক্ষেত্রে রক্ষিত একটি উইলসন-যন্ত্রের ভিতরে তাঁরা রাখলেন প্রায় আধ ইঞ্চি পুরু Platinumর একটি পাত। কস্‌মিক-রশ্মির প্রচণ্ড আঘাতে পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু থেকে দুই প্রকারের কণা মুক্ত হয়ে এলো, একজাতের কণার তেজ অন্যজাতের কণার তেজের চেয়ে অনেক বেশি। প্রথমোক্ত বাধাভেদকারী কণাদের আলোক রেখা পরীক্ষা করে দেখা গেল যে এই ধরণের আলোক-সম্পাত প্রোটোন বা আলফা-কণার মতো ভারি বৈদ্যুৎকণা দ্বারা ঘটা সম্ভব নয়; ইলেকট্রন ও এদের (প্রোটোন বা আলফা-কণা) মাঝামাঝি ওজনের কোনো নূতন কণা রয়েছে এর মূলে। এই দুই জাতের কণাদের মধ্যে একজাত হচ্ছে ইলেকট্রন ও পজিট্রনের দল, অন্যজাত প্রোটোনও নয় ইলেকট্রনও নয়। প্রশ্ন উঠলো এরা তবে কী? বৈদ্যুৎকণার বাধাভেদ করার শক্তি নির্ভর করে বৈদ্যুতের পরিমাণ ও ঐ কণার ওজনের উপর: ওজন বাড়লে বা বৈদ্যুতের পরিমাণ কমলে এদের বাধাভেদ করার ক্ষমতাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে। সাধারণ ইলেকট্রনের চেয়ে এদের বস্তুপুঞ্জ ভেদ করার শক্তি অনেক বেশি, তাই মনে করতে হবে এরা ইলেকট্রনের চেয়ে ভারি, আর না হয় এদের বৈদ্যুতের পরিমাণ ইলেকট্রনের চেয়ে কম। দ্বিতীয় অনুমান মেনে নিলে এদের আলোক রেখার প্রকৃতি নির্দ্ধারণে নানাপ্রকার বিরোধ ও বৈষম্য দেখা দিবে। কাজেই বলতে হবে এই নূতন বৈদ্যুৎকণা সাধারণ ইলেকট্রনের সমধর্ম্মী কিন্তু তার চেয়ে ওজনে অনেক ভারি। চৌম্বিক ক্ষেত্রে সরল পথ ছেড়ে দিয়ে যে বৃত্তাকার পথে এরা চালিত হয় তার পরিমাপ থেকে এদের ওজনের হিসেব কষে দেখা গেছে যে সাধারণ ইলেকট্রন থেকে এরা প্রায় ২৫০ গুণ ভারি। ১৯৩৭ সালে এ ভাবেই প্রথম প্রমাণিত হোলো বোস-ইলেকট্রনের অস্তিত্ব; বোস-ইলেকট্রন বেঁচে থাকে খুব অল্প সময়, এক সেকেণ্ডের দশলক্ষ ভাগের একভাগ সময়ের মধ্যেই এদের পরিণতি ঘটে সাধারণ ইলেকট্রন ও ন্যুট্রনোতে। মহাজাগতিক বিপুল তেজসম্পন্ন কস্‌মিক আলোর বর্ষণ ছাড়া সাধারণ বস্তুপুঞ্জ থেকে আজও এই বোস-ইলেকট্রনের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

আব্দুল চৌকিদার

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার

ছোট বয়স থেকেই আব্দুল চৌকিদারের নাম শুনে আসছি। সবার কাছেই আব্দুল চৌকিদার, আব্দুল চৌকিদার—আব্দুল চৌকিদারের মত শীকারী, আব্দুল চৌকিদারের মত জোয়ান, আব্দুল চৌকিদারের মত অমুক আর তমুক হয়না ইত্যাদি হাজিবাজি অনেক কথা ছোট বয়স থেকে শুনে আসছি। এত শুনার মধ্যেও কিন্তু আমরা কয়েকটি ছোট ছোট ভাই আব্দুল চৌকিদারকে জানতে পারলাম না। আমাদের মনে হ'তো আমরা কয়েকটি ভাই ছাড়া আর সবাই আব্দুল চৌকিদারকে চেনে কিন্তু এখন বুঝি অনেকেই আব্দুল চৌকিদারকে না দেখেই তার কথা আমাদের বলতো। কিন্তু তখন তাদের কথা শুনে বুঝতে পারতামনা যে তারা আব্দুল চৌকিদারকে দেখেনি।

আমরা নিজেরা নিজেরা বলতে থাকতাম "হারে ভুতু আব্দুল চৌকিদার কেরে"? "জহরালী নাকিরে?" আরেক ভাই সন্দেহ ভাবে বলত জহরালী আবার আব্দুল চৌকিদার কি করে হবে। তাইতো।...কিছুতেই যেন আব্দুল চৌকিদারের নাগাল পাচ্ছিনা। দেখবার একটা অজানা ইচ্ছা নিয়েই ভোর বিকেল রাস্তার দিকে চেয়ে থাকি। কিছু কাজ করতে গিয়ে হেরে গেলেই আপনা আপনিই আব্দুল চৌকিদারের কথা মনে এসে যেতো। মনে হতো আবদুল চৌকিদারকে দেখতে পেলে যেন হেরে যাওয়ার দুঃখটা কিছুটা ভুলতে পারতাম।

একদিন আমরা সবগুলো ছোট ছোট ভাই বাগানে গিয়ে নানা রকম পাখীর আওয়াজ করতে থাকতাম। কিছুক্ষণ শব্দ করেই চুপ করে থাকতাম আশা করে যে পাখীর শব্দ পেয়ে হয়ত আব্দুল চৌকিদার পাখী মারার জন্য আসতে পারে। বাগানে কারো আসবার শব্দ পেয়ে চেয়ে দেখতাম আব্দুল চৌকিদার কিনা—না এ যে পূর্ণমুদি বাজারে যাচ্ছে। সব গুলো ভাই চোখ দেখা দেখি করতাম এক জোটেই যেন সব ঠিক হয়ে যেতো ফস করে গল্প তুলে দিতাম "দেখ কাল নদীতে একটা ধানের নৌকা ডুবছিল"। গল্প জমতো না, চট করে আমাদের কেউ হয়তো গাছের পাতার দিকে কেউ বা দীঘির জলের মধ্যে নিরাশ ভাবে তাকিয়ে থাকতাম। এর মধ্যে একজনা হয়তো কি মনে করে ঘুঘু পাখীর মত শব্দ করে উঠতো। যাই-যাই করে কিছুক্ষণ কাটিয়ে বাড়ী চলে আসতাম। পথে আসতে বেশী কোন কথা জমে উঠতো না।

অনেক কিছু করেও আবদুল চৌকিদারকে কিন্তু জানতে পারলাম না। একদিন মাকে গিয়ে বললাম "মা আব্দুল চৌকিদার কে গো?" "তার বাড়ী কোনখানটায়?" মা বললেন "আব্দুল চৌকিদারকে দেখিস নি, এ'যে গৈজদ্দির মার বাড়ীর কাছে থাকে।" মা তো মনেই আনতে পারলেন না যে আমি গৈজদ্দির মার বাড়ীই চিনি না, আব্দুল চৌকিদার তো দূরের কথা। তারপর কি ভেবে যেন মা বললেন "আচ্ছা তোকে আজ রাত্রে যখন আব্দুল চৌকিদার ডাকে বেরুবে তখন দেখিয়ে দেবো।" কিন্তু মার আর দেখানো হয় না। আমি সন্ধ্যার পর খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে থাকি তাই আব্দুল চৌকিদারকে আর দেখানো হয় না, সে গ্রামে পাহারা দিতে বেরোয়, রাত এগারটারপর।

এক একদিন রাত্তিরে না খেয়েই ঘুমিয়ে পরতাম। মা এসে হাত ধরে টেনে বলতেন— "খোকন উঠ খাবে না।" আমি একবার উ-আ করে কাত হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতেই মা একটু টেনে বলতেন "খোকন তাড়াতাড়ি উঠ, এ'যে আবদুল চৌকিদার আসছে।" আবদুল চৌকিদার কথাটায়ই যেন আমার ঘুম ছুটে যেতো। চট্ করে উঠে বসে চোখ ডলতে ডলতে বলতাম "কৈ আবদুল চৌকিদার কৈ?" মা যেন একটু ব্যস্ত হয়ে বলতেন "আরে এই যে চলে গেল, তোমার উঠতে দেরী হয়ে গেল।" মার কথার সাথে সাথেই যেন আমি আবার বিছানায় ঢুলে পরতাম। মা তাড়াতাড়ি আমাকে কোলে করে বলতেন "খোকন তুমিতো লক্ষ্মী, আজ খেয়ে নাও, কাল তোমাকে দেখিয়ে দেবো।" আমদন্তের কথা আসতেই চোখটা একটু পরিষ্কার হয়ে ঘুমের ঘোরটা কেটে যেতো।

এমনি ভাবে দিন যায়, হঠাৎ একদিন আবদুল চৌকিদারকে দেখে ফেললাম। স্কুল থেকে আমরা কয়েকটি ভাই বাড়ীর দিকে আসছি, পথের মাঝে আমাদের দীঘির পারে একটি গাছের গোড়ায় বন্দুক হাতে উপর দিকে তাকিয়ে আছে—দেখতে পেলাম একটি লোক। দেখেই আমরা বুঝলাম যে এই আবদুল চৌকিদার। চেহারা দেখলে মনে হয় যে এক কালে লোকটি বেশ জোয়ান ছিল। বেশ মাংসপেশীওয়ালা লোক। চুলগুলি বাবড়ি করা। চুলগুলি রেশমের মত একদম ঝক্‌ঝক করছে। কিছু কিছু পাকা চুলও আছে। চুলের উপরে গাছের থেকে পড়া দু-এক টুকরা পাতা পড়ে দেখলাম আটকিয়ে আছে। মনে হলো যেন কোন শিল্পী নিখুঁত ভাবে আটকিয়ে দিয়েছে, পরণে একখানা পুরাণ রঙ্গীন লুঙ্গী। মাজায় একখানা ডোরাকাটা গামছা জড়ানো। চোখগুলো বড়, সমস্ত চোখদুটোই লাল, দেখলেই ভয় করে মাজায় লুঙ্গীতে জড়ানো একটি পানের কৌটা, তাতে আস্ত আস্ত কয়টা পান, লাল কয়েকখণ্ড সুপুরী আর টুক্‌রো টুক্‌রো কিছু খয়েরের চাকা আর কৌটার এক কোণায় লাগান কিছু চূণ, হাতের বন্দুকটি পুরাণো ধরণের —যাকে আমরা গাদা বন্দুক বলে জানি, চেহারার সবখানি মিলালে যেন একটা ভয়ানক কিছু। গালে একটিও দাঁত নেই, মুখ খুললেই যেন মনে হয় খিল্ খিল্ করে হাসছে কিন্তু হাসবার শব্দ নেই। পানের লাল্‌চে দাগে দাঁতের মাড়িগুলো আরও বিদ্‌ঘুটে দেখায়। আমরা দেখতে পেয়েই আস্তে আস্তে খানিকটা সরে এসে দেখতে লাগলাম চৌকিদার কি করে। এদিক ওদিক খানিকখন তাকিয়ে আবদুল চৌকিদার বন্দুকটি নিয়ে আস্তে আস্তে গ্রামের রাস্তা ধরলো। আমাদের দিকে যেন মুখ ফিরিয়ে একটু তাকাল মাত্র। আমরাও আস্তে আস্তে বাড়ী চলেএলাম।

তারপর থেকে প্রায়ই আবদুল চৌকিদারকে দেখতে পেতাম। দেখলেই ভয় হতো। মনে হতো, গুলি করতেও তো পারে। তাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে হাসিখুসি ভাবে কথা জিজ্ঞাসা করতাম —"কেমন আছেন, কোথায় যান ইত্যাদি।" সে দু-একটি কথার জবাব দিয়ে চলতে আরম্ভ করতো। আমার শুধু মনে হতো তাকে খুসী করতে পারলাম না।

এর পর এক রবিবার দিন আবদুল চৌকিদার বন্দুক নিয়ে আমাদের বাড়ীতে আসলো।

আমরা সব এসে জড়ো হলাম। বাড়ীতে অনেক লোক পাওয়ায় এবার আর আব্‌দুল চৌকিদারকে ভয় করলাম না। আমরা সবাই লাঠি নিয়ে চৌকিদারের সাথে বাঁদর মারবার জন্যে বের হয়ে পড়লাম। বেলা দুপুরের সময় ঘুরতে ঘুরতে আমাদের বাড়ীর কোনে একটা নারিকেল গাছের উপর চৌকিদার একটি বাঁদরকে মারলো। ঠাকুরমা দৌড়ে এসে বললেন —"আহা, চৌকিদার এই কি করলে—এযে আমাদের মধু বাঁদরটা"।

এর পরই যেন আব্‌দুল চৌকিদার বড় বেশী পরিচিত হয়ে গেল। মধ্যে মধ্যে মাকে বলতে শুনতাম "ছোট বউ তাড়াতাড়ি করে কাজ সেরে নাও, রাত্রি অনেক হয়েছে, এসে আব্‌দুল চৌকিদার ডাকে বেরিয়েছে।" আব্‌দুল চৌকিদারের মোহটুকু যেন এরপর একটু কমে গেল। আমাদের কাছে বড় বেশী চিনা হয়ে গেল। এর পর থেকে আব্‌দুল চৌকিদারকে নিয়ে আমরাও মাঝে মাঝে শিকার করতে যেতাম। শিকারে তার হাত খুব পাকা ছিল। কোনদিন তার গুলি ফিরতে দেখতাম না। তার এমনি হাত ঠিক ছিল যে আমরা কোন সময় আম বা আর অন্য কিছু পারতে গিয়ে ঢিল ছুঁড়ে এক ঢিলে যদি কেউ পারতে পারতো একজন আর একজনকে বলে উঠতাম "আব্‌দুল চৌকিদারের হাত দেখি।"

এমনি ভাবে দিন কাটতে লাগলো। একদিন আমরা কয়েক বন্ধু স্কুল থেকে ফিরছি, ফিরবার পথে আমাদের দীঘির পারে এসে কিসের খস্‌ খস্‌ শব্দ শুনতে পেলাম। ভাল করে তাকাতেই দেখলাম আব্‌দুল চৌকিদার বেত ঝোপের মাঝে বন্দুক নিয়ে কি যেন দেখছে। আমরা আসতেই হাত দিয়ে সে আস্তে আস্তে আসবার জন্য সঙ্কেত করলো, গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম —"কি দেখছেন ?" বললো "মাছ দেখছি", আমরা দেখতে পেয়ে বললাম "এ যে মাছ"। দেখলাম কতকগুলো ছোট ছোট মাছ, আর তার সাথে একটা বড় মাছ ঘুরছে। আমরা বললাম "মারেন না মারেন না এযে যাচ্ছে মাছটা"। আব্‌দুল চৌকিদার আমাদের দিকে একটু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে বললো "বাচ্চা নিয়ে মাছটা মারবো —রম্‌জানের দিনটা।"

আমরা কিন্তু উৎসাহ দিতে লাগলাম "এযে এযে-এ গেল-গেল" চৌকিদার গুলি ছাড়লো কিন্তু মাছ মরলো না, এই তার প্রথম হার আমরা দেখলাম। চৌকিদারের মুখখানা একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল, আস্তে আস্তে এদিক ওদিক চেয়ে বাড়ীর দিকে চলে গেল।

এর পরদিন শুনতে পেলাম আব্‌দুল চৌকিদারের বন্দুক চুরি হয়ে গেছে। পুলিস বাড়ীতে এসে খোঁজ নিচ্ছে। চৌকিদার বন্দুক হারিয়ে যেন পাগল হয়ে গেল। বুড়ো মানুষ, দেখতাম শুধু দিন দুপুর রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতো। কয়েকদিন পর দেখি বন্দুক পাবার জন্য সে নানা জায়গায় ঘুরতে লাগলো। একদিন যায় টরকি কালী বাড়ীতে কালীসিদ্ধার কাছে—বন্দুক কোথায় জানবার জন্য। একদিন যায় মামুদখোলার পীরের কাছে—তার কাছে, শুনতে বন্দুক কোথায় পাবে। বন্দুক কিন্তু আর পাওয়া গেল না। বন্দুক হারিয়ে যেন চৌকিদার এক মাসের মধ্যে রোগা

হয়ে গেল, মনে হলো যেন বড় মুষড়িয়ে পড়েছে। এদিক ওদিক যায়, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়, দেখলেও কষ্ট হয়। তার যে বন্দুক ছাড়া আর কোন কাজ করবারও নেই।

দুপুর বেলা যেদিন আমাদের স্কুল হতো না সেদিন জানালার পাশে বসে দেখতাম বাড়ীর সামনের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা দিয়ে আবদুল চৌকিদার আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছে। তার চলা যেন শেষ হবে না.....রাস্তার যেন আর শেষ নাই। দুপুর রোদের অপর্য্যাপ্ত নীলাভ আলোর মাঝে সে যেন তাকে হারিয়ে ফেলতো। আমি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলতে থাকতাম। কিসের যে মায়া কেউ যেন আমাকে বলতো না।

প্রায়ই দেখতাম সে আমাদের দীঘির পাড়ের বুড়ো বড়ই গাছটার গোড়ায় বসে বসে চাষাদের খেতের কাজ দেখতো আর এর ওর কাছে একটু আধটু তামাক খেত। বন্দুক হারিয়ে যেন এদের কাছেও তার দাম কমে গেছে, আগের মত যেন তারা তাকে সম্মানটুকু করে না। এদের অনাদর যেন এ সইতে পারে না, পিছন দিকে চেয়ে যেন একটু দম নিয়ে কি ভেবে যেন আস্তে আস্তে আবার শিথিল হয়ে আসে। বড় বাঁশঝোপটায় পাখীর কিচি মিচি শুনে চোখ দুটো যেন তার জ্বলজ্বলে হয়ে উঠতো কিন্তু পিছন দিকে চেয়ে দেখত তার বন্দুক যে নেই—মনটা অবশ হয়ে আসতো। আমার মনে হতো চৌকিদারের বন্দুক না থাকবার পর যেন দেশে শিকার করবার অনেক কিছু এসে জমা হয়েছিল।

আমার সাথে প্রায়ই তার স্কুলে যাবার পথে দেখা হতো, আমি তার সাথে নানা রকম গল্প করতাম। কিছু দিনের মাঝে আমাদের এই অশোভনীয় বয়সের দুইটী প্রাণীর খুব খাতির হয়ে গেলো। দুজনায়ই দুজনকে ভাল করে জেনে ফেললাম। বৃদ্ধ আমাকে পেয়ে যেন অনেকটা আরাম পেয়ে গেল। আমি বাড়ী থেকে আসবার সময় তার জন্যে কিছু কিছু তামাক ও এটা সেটা নিয়ে আসতাম। আমার কাছে সে অনেক শিকারের কথা বলতো, আমি নির্ব্বাক হয়ে শুনে যেতাম। কি ভাবে বন্দুক ছুঁড়তে হয় আমাকে মুখে মুখে শিখাতে লাগলো। আমাকে প্রায়ই বলতো "খোকন তোমাকে বড় শিকারী করে দেবো," কোন দিন যেন তোমার একটি গুলিও কেটে না যায়।" আমার মনে পড়ে যেতো তার মাছ মারবার কথা। দিন চলতে লাগলো আমাদের ভাব বেশ জমে গেলো। আমাকে দেখলেই তার আনন্দ হতো। দিন দিনই যেন চৌকিদারের শরীর খারাপ হতে লাগলো। একদিন স্কুলে দেখি গাছতলায় শুয়ে আছে, আমাকে দেখেই উঠে বসলো। দেখেই আমার বড় কষ্ট হলো, আমি কেঁদে ফেললাম। বললাম "তুমি যে মরে যাবে চৌকিদার কাকা।" সে আমাকে একটা ঝাঁকি দিয়ে বললে "নারে ব্যাটা, এত তাড়াতাড়ি মরবো কিরে।"

এর কিছুদিন পর একদিন ভোরে, বাবা তখনো অফিসে যান নি, তাই খুব জোড়ে জোড়ে পড়ছিলাম, এমন সময় কাচারি ঘরে কে এসে যেন বললো যে আবদুল চৌকিদারের বন্দুক পাওয়া গেছে। ছুটে এসে শুনলাম আবদুল চৌকিদার আগের দিন রাত্রে জ্বরে মারা গেছে আর তার

বিছানার উপরে বন্দুকটা ভাঙ্গাবস্থাতে পাওয়া গেছে। সেদিন এদিক ওদিক চেয়ে নিষ্প্রভ ভাবে ঘরে চলে আসলাম।

আজ নদীর পারে দাঁড়িয়ে দেখছি চারিদিকে শুধু রৌদ্রের ছুটোছুটি। যেন আনন্দে এরা নাচছে, বিরাম নেই, অভাব নেই। বাড়ির চড়ায় আবদুল চৌকিদারের কবরটা দেখা যাচ্ছে। কবরের কাছে ধুতুরা গাছটায় দুটো ফুল হাওয়ায় দুলে বেড়াচ্ছে মনে হচ্ছে রৌদ্রের নাচের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটছে মনে পড়ে গেল সেদিনকার কথা যেদিন আবদুল চৌকিদার আমাদের কথার ভয়ে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাছটাকে গুলি করে হেরে গিয়েছিলো, তার ব্যর্থতার কথা মনে এসে গেল, সেই লজ্জায় বাড়ীতে এসে বন্দুক ভেঙ্গে মাটির নীচে লুকিয়ে রেখে চুরি গেছে বলে প্রচার করার কথা। মনে পড়ে গেল মৃত্যুর দিন রাত্রে তার আদরের বন্দুকের টুকরা গুলোকে নিয়ে তার শেষ দেখা।

চারিদিকে নদী কিছুই দেখবার জো নেই। হঠাৎ কি যেন কোন এক অজানা পাখীর শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। মনে এসে গেল, মা যে দোকান থেকে চিনি নিয়ে যাবার কথা বলছিলেন। মনে হতেই তাড়াতাড়ি দোকানের দিকে এসে গেলাম।
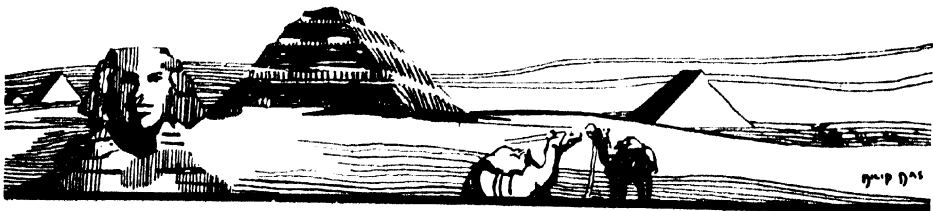
"জনতায় এক হোক মাটির পৃথিবী"

শান্তি মিত্র

মাটির পৃথিবী ঘিরে তাহাদের আশা
    তাদের কল্পনা নয় সুদূর প্রসারী,
তোমাদের আলো আছে, শিক্ষা স্বচ্ছ হাওয়া,
    তাদের জগতে অবরুদ্ধ পথ ভারি।

মাটির বুকের প'রে লাঙ্গলের ফলা
    সৃষ্টি করে ভারে ভারে সোনার ফসল।
শস্যের সারাংশ যায় তোমাদের ঘরে
    তাদের ভাগ্যের ভাগ খোসাই কেবল।

পাতালের অন্ধকারে যারা যায় নামি
    খনিজ সম্পদ আর ধাতুরাশি তরে,
তাহাদের রুধিরাক্ত পণ্যের সম্ভারে
    ঝলসে শাণিত অস্ত্র তোমাদের করে।

নীরস মাটিতে যারা আনে শ্যামশোভা
    তারা মরে প্রতিদিন নিরন্ন ক্ষুধায়।
তাদের ক্ষয়িষ্ণু হাতে গড়া রাজপথে
    মোটরে উত্তরী ওড়ে উল্লাস হাওয়ায়।

বিবর্ণ ঘোলাটে চোখে জ্বলে লাল আলো
    ঝিমান জীবনে দাবী জাগে—'নিবি-দিবি!'
আলো চাই, হাওয়া চাই, নিশ্বাসের হাওয়া
    জনতায় এক হোক মাটির পৃথিবী।

শান্তিপর্বের উদ্যোগ

রেণু সেন

'শান্তির জন্য আমি সব করতে রাজী'—চেম্বারলেন (There is hardly anything I ould not sacrifice for peace).

আঃ! বুড়ো শালিকের মুখে শান্তি!

চেম্বারলেনী শান্তি রক্ষার জন্য পৃথিবীর সামরিক ব্যয় অধিক বেড়ে যাচ্ছে। ক্রুপ্, ভাইকার, আর্মষ্ট্রং প্রভৃতি বড় বড় যুদ্ধোপকরণ তৈরীকরার কারখানাগুলি কোটী কোটী টাকা এ উপলক্ষে শুষে নিচ্ছে। ১৯৩৮ সালে পৃথিবীর ৬৪টি দেশে সমরসজ্জার জন্য ৫৭৬০ কোটী টাকা ব্যয় হয়েছে। ইহা ঠিক সংখ্যা নয়। কারণ প্রত্যেক দেশই সঠিক খবর অনেকটা গোপন রাখে। তার উপর প্রত্যক্ষভাবে স্থল-সৈন্য, নৌ ও বিমানবহরে যে সব খরচ হয় তাই শুধু ধরা হয়েছে। সামরিক উদ্দেশ্যে রাস্তা নির্মাণ, পুলিশ গোয়েন্দা এবং গোপনপ্রচার কার্যে বহু অর্থ ব্যয় হয়। এ সব সামরিক খরচের অঙ্গীভূত হলেও এখানে ধরা হয় নি।

১৯৩২ সালে অস্ত্রসজ্জা নিয়ন্ত্রণ ও নিরোধ করার জন্য শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি এক বৈঠক করে। কার্যত কোন সুফল হয়নি। সামরিক ব্যয়ের অঙ্ক ক্রমেই ভারী হচ্ছে। যুদ্ধেচ্ছু জাতিগুলির

মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত অত্যন্ত প্রবল থাকায় এ সকল বৈঠক শুধু রাষ্ট্রধুরন্ধরদের চালবাজিতেই পর্যবসিত হয়। ১৯২৭ হতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত প্রতি বৎসর গড়পরতা ৪১০ লক্ষ স্বর্ণ ডলার হিসাবে মোট ১০৬০ কোটী স্বর্ণ ডলার পৃথিবীর সামরিক ব্যয়। কিন্তু বৈঠকের পর এ ব্যয় উত্তর উত্তর বেড়ে দ্বিগুণের চেয়েও বেশী হয়েছে। ১৯৩৪ হতে ১৯৩৮ সালের মোট ব্যয় ৩৩০০ কোটী স্বর্ণ ডলার, প্রতি বৎসর ৬৫০ কোটি করে।

১৯৩৮ সালে ৯৪০ কোটি ডলার সামরিক ব্যয়ের মধ্যে ৬৪টি দেশের হিসাব ধরা হয়েছে। এর ভিতর ৭টি শক্তিশালী রাষ্ট্রের খরচ ৭৪০ কোটি অর্থাৎ সমগ্র ব্যয়ের শতকরা ৭৮·৭ ভাগ। ১০ বৎসর পূর্বে ১৯২৯ সালে ঐ ৭টি দেশে মোট সামরিক ব্যয়ের শতকরা ৬৬·৭ ভাগ বা ২৮·৭ কোটি ডলার ব্যয় হয়েছিল। ৭ক বৎসরের ভিতর বৃটেন, জার্মেনী, ফ্রান্স, ইতালী, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, জাপান ইত্যাদি শক্তিগুলি মোট ৪১০০ কোটি ডলার ব্যয় করেছে। কাজেই গড়পরতা ৫৮০ কোটি করে পড়েছে। অবশিষ্ট দেশগুলি ১০ বৎসরে ১৪৫০ কোটি বা প্রতি বৎসর প্রায় ১৪৫ কোটি ডলার সামরিক কাজে নিয়োগ করেছে। ১৯৩৮ সালে পৃথিবীর শতকরা ৭২·৩ ভাগ ব্যয় ইউরোপীয় দেশগুলিতে হয়েছে।

জার্মেনীর সামরিক ব্যয় শুধু আনুমানিক ভাবে বলা চলে, কারণ গবর্ণমেন্ট সাধারণের নিকট কোন বাজেট প্রকাশ করে না। তবে ইহা নিশ্চিত যে জাতীয় রাজস্বের এক তৃতীয়াংশ রণসম্ভারের আয়োজনে ব্যয় হয়।

ফ্যাসিষ্ট ইটালী অবশ্য বাজেট প্রকাশ করে, তবে সাধারণ ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ ব্যয়ের উল্লেখ এতে থাকে না। তবু দেখা যায় যে গত দু বৎসরে ইতালী সামরিক ব্যয় দ্বিগুণের চেয়েও বেশী করেছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে সামরিক ব্যয় ২৬০·৭ কোটি লায়ার। ১৯৩৮-৩৯এ ৮২৭·৫ কোটি এবং বিশেষ বরাদ্দের জন্য আরো ১০০ কোটি লায়ারের বাজেট্ করা হয়েছে।

জাপান—

১৯৩৭-৩৮ সালে সামরিক বিভাগের সাধারণ ও বিশেষ ব্যয় ৫৫৩·৩ কোটি ইয়েন। বর্তমান সালের বাজেটে এ ব্যয় ৮৩৬·৫ কোটিতে উঠেছে। ইহা সরকারী ব্যয়ের শতকরা ৭২ অংশ।

গ্রেট ব্রিটেন—

ইংলণ্ডের সামরিক ব্যয় সব দেশের শীর্ষস্থানীয়। ১৯৩১ হতে বর্তমান সাল পর্যন্ত বাজেটে ইহার বরাদ্দ কত তা দেওয়া গেল।

সন	পাউণ্ড (ষ্টারলিং)	সরকারী আয়ের শতকরা কত অংশ
১৯৩১—৩২	১০৩,০০০,০০০	১২·৮
১৯৩৭—৩৮	২৬৮,০০০,০০০	২৮·৯
১৯৩৮—৩৯	*৪৩,০০০,০০০	৩৩·১

ইংলণ্ডের সামরিক ব্যয়ের মোটা অংশ পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষ, উপনিবেশ ও অন্যান্য শাসনাধীন দেশগুলি বহন করে। কাজেই উক্ত সংখ্যা হতে প্রকৃত ব্যয় অনেক বেশী। প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন নিজেই স্বীকার করেছেন অন্তত আরো ৪০ কোটি পাউণ্ড উক্ত বাজেট পূরণ করতে দেওয়া হয়েছে।

ফ্রান্স—

ইংলণ্ডের ন্যায় ফ্রান্সেও সামরিক ব্যয়ের জন্য সাধারণ বরাদ্দ ছাড়াও বাজেটে বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। ১৯৩৭-৩৮ সালের জন্য ৯৫১২·৩ এবং ১৯৩৮-৩৯ জন্য ১,১০৬·৪ কোটি ফ্রাঙ্ক্। কিন্তু মিঃ ব্লুম (১৯৩৮, এপ্রিল) ব্যবস্থা পরিষদের বক্তৃতায় স্বীকার করেছেন যে উক্ত সালে সাধারণ ও বিশেষ নিয়ে ২,৭৭৯·৩ কোটি ফ্রাঙ্ক্ ব্যয় হয়েছে। ইহা জাতীয় আয়ের শতকরা ৪৬ অংশ। আবার পরিকল্পিত বিমান-বহর ১৯৪০ সালের মধ্যে নির্মিত হবে। তার ব্যয় বাবদ ১৫,০০০ কোটি ফ্রাঙ্ক্ এ বাজেটের বাইরে।

যুক্তরাষ্ট্র

গত ১৯৩৬ সাল হতে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধোপকরণ নির্মাণে ইউরোপীয় শক্তিসমূহের সাথে পা ফেলে চলেছে। ১৯৩৭-৩৮ সালের জন্য বরাদ্দ ৯·৯৩ কোটি ডলার। কিন্তু এতে নৌ-বাহিনী নির্মাণের জন্য ১১·৫৬ কোটি ডলার ধরা হয়নি। শক্তিশালী বিমান বহরের জন্য আরো অর্থ মঞ্জুর হয়েছে বলে প্রেসিডেণ্ট রুজ্‌ভেল্‌ট গত জানুয়ারীতে ঘোষণা করেছেন।

সোভিয়েট রাশিয়া।

গত বছর রাশিয়া অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মতই রণসম্ভারের আয়োজন করেছে।

সন	রুবল্
১৯৩৬-৩৭	১,৪৮১·৬ কোটি
১৯৩৭-৩৮	২,০১০·২ „
১৯৩৮-৩৯	২,৭০০ „

সোভিয়েট্ ইউনিয়নের সামরিক ব্যয় বর্তমান বছর প্রায় দ্বিগুণে উঠেছে। রণসম্ভার ব্যাপকভাবে তৈরী করার জন্য বহু ফেক্টরী স্থাপিত হয়েছে। উক্ত সংখ্যায় এর ব্যয় ধরা হয়নি। অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির সামরিক ব্যয় নিম্নে দেওয়া গেল।

রাষ্ট্র	সামরিক ব্যয় (× ১০০০,০০০)			
	১৯৩৭-৩৮		'৯৩৮-৩৯	
পোলেণ্ড	৭৬৮	জ্লটি	৮০০	জ্লটি
রুমেনিয়া	৯,৬১৫	লেই	১০,৭৫০	লেই

রাষ্ট্র	সামরিক ব্যয় (× ১০০০,০০০)			
	১৯৩৭-৩৮		১৯৩৮-৩৯	
তুর্কী	৭৭	এলটি	১০১	এলটি
হাঙ্গেরী	১১৮	পেনগো	১,৫৬	পেনগো
বেলজিয়ম	১,৪৮১	বি, ফ্রাঙ্কল	১,৫৬৯	বি, ফ্রাঙ্কল
হলেণ্ড	৯৭	ফ্লরিনস্	১৩১	ফ্লরিনস
সুইডেন	১৮৬	এস্ ডব্লিউ ক্রণার	২৭৭	এস্ ডব্লিউ ক্র:
ডেনমার্ক	৪২	ডি. ক্রণার	৬১	ডি, ক্রণার
ফিনলেণ্ড	৯১৪	এফ্ মার্কস	১,২৩৯	এফ্ মার্কস
কেনাডা (১৯৩৬-৩৭)	৪৬	পাউণ্ড	৭০	পাউণ্ড

নৌ-বলে গ্রেটব্রিটেন অন্যান্য রাষ্ট্র হতে অনেক শক্তিশালী। ১১টি বৃহৎ রণপোত এবং বৃহৎ নূতন রণতরী নিয়ে ব্রিটেনের বর্তমান শক্তি—

১৩৯,০০০ টন—১৯৩৫
৩৭৫,০০০ ,, —১৯৩৭
৫৪৭,০০০ ,, —১৯৩৮

ফ্রান্সের নৌবল জার্মেণী ও ইতালীর সম্মিলিত শক্তির চেয়েও বেশী। বর্তমানে ফরাসীর ৭টি বৃহৎ রণপোত আছে এবং ১৯৩৯ সালের ভিতর ইহা আরো অনেক বৃদ্ধি পাবে। যুক্তরাষ্ট্র নৌবলে পৃথিবীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। বর্তমানে ১৫টি ভিন্ন আরো ৫টি বৃহৎ রণপোত ও ছোট বড় বহু এইভাবে শীঘ্র তৈরী হবে।

একতান্ত্রিক শক্তিগুলির মধ্যে নৌবলে জাপান সর্বশ্রেষ্ঠ। ৯টি বৃহৎ রণপোত ছাড়া আরো দুটি তৈরী হচ্ছে। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত জার্মেণীর কোন বৃহৎ রণপোত ছিলনা। এ বছর দুটির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়েছে, আরো দুটি শীঘ্র হবে।

বর্তমানে ইতালী চারটি বৃহৎ রণপোতের অধিকারী। আরো চারটি তৈরী হচ্ছে। ছোটবড় বহু ক্রুইজারের নির্মাণ এর সাথে চলছে। ইংলণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ইত্যাদি নৌবলে শ্রেষ্ঠ হলেও ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রগুলি বিমান শক্তিতে দুর্জয়। ১৯২৩ সালে ফ্রান্স ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বিমানশক্তি ছিল। বর্তমানে তার স্থান ৫ম। গত সেপ্টেম্বরের পর জার্মেণীর বিমানবাহিনী ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সম্মিলিত শক্তির চেয়েও বেশী হয়েছে। রাশিয়ার বিমানবহরও খুব পরাক্রান্ত। সৈনাবিভাগের কর্তা ভরসিলভ্ নানাভাবে একথা প্রচার করে আস্ছেন। এ বিপুল রণসম্ভারের আয়োজন আর কতদিন চল্বে এবং তার পরিণতি কোথায় এবং সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ কি ইহা প্রত্যেক চিন্তাশীল লোকমাত্রই ভাব্ছে। সমাজে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ ও সাম্যবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হলেই শুধু এ আত্মঘাতী ধ্বংসকামী মহাযুদ্ধের অবসান হতে পারে।*

* এ প্রবন্ধের তথ্যগুলি জাতিসঙ্ঘের আরমামেণ্ট ইয়ার বুক হতে সংগৃহীত।

বিশ্বদর্শন

ক্ষিতীশচন্দ্র রায়

ছিলাম সুখে ডিমের মাঝে
ভেবেছিলাম তবে
তুনিয়া গড়া হাল্কা খোসায়,
তেমনি ছোটই হবে !

ছোট্ট নীড়ে ঠাঁই হল মোর ;
ছোট্ট বাসাখানি ;
মায়ের যত্নে খড়-কুটাতে
তুনিয়া গড়া মানি !

কচি ডানায় উড়ি-উড়ি ;
বাইরে একটু দেখি—
কি মজা ভাই তুনিয়াটা যে
পাতায় গড়া—একি !

সবল ডানায় সবার সাথে
আজ দূরে দেই পাড়ি
তুনিয়া কেমন সবাই মোরা
সমান কইতে পারি !

বিক্ষুব্ধ সীমান্ত

মধুসূদন বসু

অত্যন্ত জটিল সমস্যা বৃটিশ রাজনীতিকে আজ চারিদিক হইতে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে। যে সমস্যার সম্মুখীন হইয়া বৃটিশ আজ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতীয় গ্রামাঞ্চলে অগ্নিবর্ষণ করিয়াছে তাহা সমস্ত সভ্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। মধ্য ইউরোপে ইহুদিগণের প্রতি অত্যাচার ও লাঞ্ছনার তীব্র প্রতিবাদে পার্লামেণ্ট মহাসভার বিরুদ্ধ আলোচনা ও কেবিনেট মন্ত্রীদের বক্তৃতা, জার্ম্মান এরই মধ্যে ভুলিয়া যায় নাই। তাহারি পাল্টা জবাবে জার্ম্মান বেতারঘাঁটি ও সংবাদপত্রগুলি ওয়াজিরিস্থানের উপজাতির প্রতি বৃটিশদের নীতি ও দুর্ব্যবহার ঢাক পিটাইয়া ঘোষণা করিতেছে। মনে হয় আফগানিস্থানের সহিত রাশিয়ার যে প্রাচীন সম্বন্ধ ছিল জার্ম্মানিই বুঝি তাহা অধিকার করিয়া বসিল। কারণ,গত ২।৩ বৎসর যাবৎ জার্ম্মানির প্রভাব আফগানিস্থানে অতিদ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। সে যাই হউক, বৃটিশ কিন্তু মনে করিতেছে যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুর্দ্ধর্ষ সমরপ্রিয় উপজাতির শাসনভার মূলতঃ বৃটিশেরই পররাষ্ট্র বিভাগের একটি বিশেষ অধিকার।

উপজাতি-অঞ্চলের খরচের জন্য, সীমান্তের প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবার অজুহাতে ও সামরিক ব্যয় বাবদ সরকারী তহবিল হইতে বাৎসরিক প্রায় সাড়ে সাত-কোটী টাকা বাহির হইয়া যাই-তেছে। উপজাতি অঞ্চলে সময়ে অসময়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে। এই সব গণজাগরণ দমন করিবার জন্য অজস্র অর্থের অপচয় হয়, কাজেই কামধেনু ভারতের দোহন কার্য্য বেশ চলে।
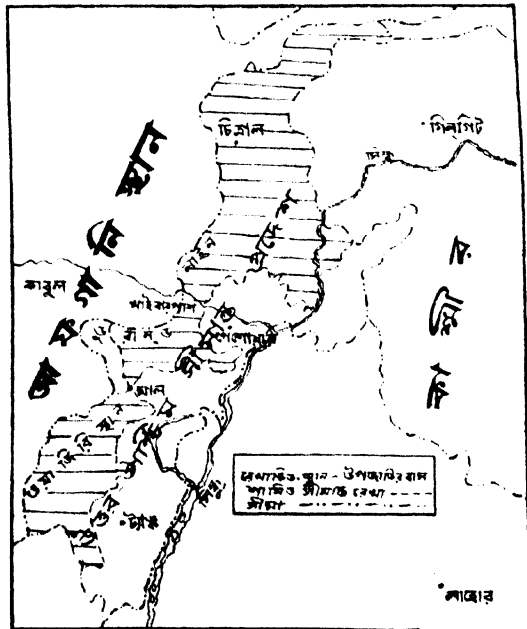
১৮৯৭ সালের মালাখান্দ-অভিযানের পর হইতেই সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে বৃটিশ সরকার বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হয়। আমীর আব্দার রহিম একজন পাকা রাষ্ট্রনীতিবিদ্। তিনি বৃটিশ নীতি সম্বন্ধে

পূর্ব্বাপরই সন্দিহান ছিলেন। এই সতর্ক সন্দিগ্ধতাকে বৃটিশ অধীনতার নাগপাশ হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

লর্ড রিপনের পর প্রথম সীমান্ত-প্রদেশের গোলমাল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার প্রতিরোধ কল্পে হইয়াছিল। ১৮৮৯ সালে রাশিয়া মার্ভ দখল করে এবং বৃটিশ ফ্রন্টিয়র কমিশনারদের ঘাটিতে হানা দেয়। ইহা 'পাঞ্জদে'র দুর্ঘটনা বলে অভিহিত। ইহাতে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এ আফগানদের মনে বদ্ধমূল হয় যে বৃটিশ তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। কিছুদিন পর আবার সাধারণ অবস্থা ফিরে আসে। সীমা নির্দ্ধারক কমিশনের কাজও বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই।

এ ঘটনার ১৬ বৎসর পর চামন রেলপথ স্থাপনের সময় আবার গণ্ডগোল সুরু হয়। বৃটিশ সরকার ১৮৮৮ হইতে 'অগ্রসর নীতি' (forward policy) অবলম্বন করে। ১৮৮৯ সালে গিলগিট এবং ১৮৯৩তে চিত্রলে ইংরেজদূত প্রেরিত হয়। আমীর আব্দার রহমানের বিরুদ্ধে আবার 'সামরিক অভিযান' (military mission) প্রেরিত হয়। লর্ড রবার্টসের নৃশংস অত্যাচারের (indiscriminate hanging and burning)এর জের তখনও শেষ হয় নাই। তিনি আফগানিস্থানে প্রবেশ করিলে মার্টিমার ডুরাণ্ড ইংরেজ প্রতিনিধি হিসাবে তথায় যান এবং ইঙ্গ-আফগান সীমানা Durand line নামে অভিহিত হয়। কিন্তু আমীর উপজাতিদের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া এই চুক্তি বদ্ধ হয়। এই জন্য ১৮৯৭ সালের বিদ্রোহ এবং ১৯ শতকের যে সকল বিদ্রোহ হইয়াছে তার মূলে (১) তৎকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া, (২) তুরস্ক, এশিয়ামাইনর ও উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম জাগরণ ও জেহাদ ঘোষণা (৩) জমির অভাবে পাঠানদের লুণ্ঠনপ্রবৃত্তি, (৪) ১৮৯৬ সালের লবন শুল্ক বৃদ্ধিতে অর্থ-নৈতিক অসন্তোষ (৫) স্বার্থান্বেষীদের ইন্ধন ইত্যাদি।

কিন্তু এর চেয়ে বড় কারন হইল তৎকালীন বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউনের ও লর্ড এলগিনের 'অগ্রসর নীতি' (forward policy)। ১৮৯১ হইতে লর্ড কার্জ্জনের আগমন কাল ১৮৯৯ পর্য্যন্ত এ নীতির ফলে পুরাদমে রাজস্বভাণ্ডারও খালি হইতে থাকে। লর্ড কার্জ্জন এই নীতির কিছুটা বিরোধী ছিলেন। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত সীমান্ত প্রদেশে 'Butcher and Bolt' নীতির কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। আফগানিস্থান আজো (the goat tied between the lion and the bear)। তবে লায়ন বিয়ার রেড্ বিয়ারে রূপান্তরিত হইয়াছে, এই মাত্র প্রভেদ।

গত দুই বৎসর যাবত সীমান্তের অশান্তি বৃদ্ধি পাইয়া কর্ত্তৃপক্ষকেও বিশেষ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এ সকল বিদ্রোহ ও গণ-জাগরণ ভারতের বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনেরই অংশ এবং অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সীমান্ত-গান্ধী আবদুল গফুর খাঁ এ সকল গণআন্দোলনের প্রধান প্রতীক। তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ১৯২৯ খৃঃ লালকোর্ত্তাদল সংঘবদ্ধ করেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত এই আন্দোলনই "খোদাই খিদ্‌মদ্‌গার" বা দেবদাস বলিয়া পরিচিত।

তথা কথিত "শাসিত অঞ্চল" (settled district) সীমান্ত প্রদেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ লইয়া অবস্থিত। ইহার প্রধান নগর পেশোয়ার এবং লোকসংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ। উপজাতি অধিকৃত

স্বাধীন অঞ্চলের লোকসংখ্যা প্রায় তদ্রূপ। ইহারা স্বাধীনতাকামী, সমরপ্রিয় ও সাহসী; স্বার্থ ও বিপদকে সমানভাবে তুচ্ছ করে। তাহাদের অপূর্ব্ব শরীর গঠন, অমানুষিক কষ্টসহিষ্ণুতা, স্থানীয় পাহাড় পর্ব্বত গিরিবর্ত্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহাদের অদ্ভুত জ্ঞান ইংরেজদিগকে সত্যই বিস্মিত করিয়া দিয়াছে। জাতীয় গৌরব ও আত্মমর্য্যাদা বোধ সম্বন্ধেও পাঠানদিগের মধ্যে অপূর্ব্ব নীতি প্রচলিত আছে শত্রু ও অতিথিরূপে আসিয়া সমাদর পায়। অতিথিকে প্রত্যাখ্যান এবং সমরে পৃষ্ঠপ্রদর্শন ইহাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ।

প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে বহুযুগ ধরিয়া এই অঞ্চলে সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থা হিসাবে কিছুই ছিল না। খাইবার গিরিবর্ত্ম দিয়া আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করিলেন; তারপর মহাবীর আলেকজান্দার আসিলেন। তারপরও সাইথিয়ান, কুশান, তোগলক, মোঘল প্রভৃতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু কেহই এই উপজাতিগুলিকে শাসনে আনিবার বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ অশোকের রাজ্য উত্তরে ইয়ারখন্দ ও পশ্চিমে আফগানিস্থান, কাবুল, গজনী ও কান্দাহার পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। মহারাজ অশোক ছিলেন বৌদ্ধ ধর্ম্মের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং ওয়াজিরিস্থান এবং সমগ্র উপজাতীয় অঞ্চলে বৌদ্ধস্তূপ ও বৌদ্ধ-ভাস্কর্য্যের চিহ্ন আজও পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক গঠন হিসাবে পৃথিবীর যে অংশ এমন নিষ্ঠুর ও হিংস্র তথায় বুদ্ধের অহিংসাবাণী কিরূপে প্রচার লাভ করিয়াছিল ইহা একটা ভাবিবার বিষয় বটে। বর্ত্তমানে মহাত্মার বাণীও এখানে পৌঁছিতেছে।

সীমান্ত প্রদেশের উত্তর ভাগে মোমন্দ ও আফ্রিদি, ওয়াজিরিস্থানে ওয়াজিরি ও মাসুদ এবং অন্যান্য বিভিন্ন স্বাধীন অঞ্চলে শিনোয়ারী, ওরাকজয়া, ভিটানী প্রভৃতি উপজাতিসমূহের বাস।

পাঠানদের মস্ত গর্ব্ব এই যে তাহারা অন্যায় এবং অন্যায়ের প্রতিশোধ লইতে কখনও ভোলে না। সীমান্তের উপজাতিসমূহের মধ্যে মাসুদগণই অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মাসুদ অঞ্চলের মধ্যস্থলে টঙ্ক নামক স্থানে দুইটি ইংরেজ মহিলা গত আট বৎসর যাবৎ একটী হাসপাতাল চালাইয়া আসিতেছেন। রক্ষীহীনা অবস্থায় মানব সেবার কার্য্যে তাঁহারা গ্রামের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত চলাফেরা করিতেন। উপজাতি অঞ্চলে চিকিৎসকের সাহায্য অত্যন্ত প্রয়োজন এবং তাহারাও চিকিৎসকদিগের যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকে। পেশোয়ারে জনৈক ভারতীয় চিকিৎসক জনৈক পাঠানের সাহায্যে একবার আশ্চর্য্যরূপে মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যুদ্ধের সময় এক সামরিক হাসপাতালে তিনি এক পাঠানকে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইয়া তুলিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞ পাঠান সে উপকার ভোলে নাই। তাই সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করিয়া সে তাহার প্রাণদাতার প্রাণরক্ষা করিল।

বিভিন্ন অঞ্চলের উপজাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং বিদ্বেষ লাগিয়াই আছে এবং বৃটিশ শক্তিও ইহার যথেষ্ট সুযোগ গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু মোটের উপর একটা গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তি ইহাদের

আছে। জির্গা বা জনসমিতিই সমস্ত বিচারাদি সম্পন্ন করিয়া থাকে। উপজাতির প্রত্যেক শাখার একজন করিয়া 'মালিক' বা দলপতি আছে। ইস্‌লামের প্রভাব ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। সুতরাং একজন রাজনীতিক বা সামরিক কর্ম্মচারী অপেক্ষা একজন মোল্লা, ফকির বা পীরের ক্ষমতা যে অনেক বেশীই হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

একটু ভাবিলেই বোঝা যায় নিরাপত্তা ইহাদের প্রধান লক্ষণীয় বিষয়। প্রত্যেকটী গ্রাম শক্ত মাটির প্রাচীরে ঘেরা। তার উপর সান্ত্রী বেষ্টিত প্রবেশদ্বার, উচ্চ টং হইতে পাহারার ব্যবস্থা (watch tower) প্রভৃতি দেখিলে মনে হয় এক একটী গ্রাম যেন এক একটী দুর্গ। প্রত্যেকটী লোকের হাতেই একটী করিয়া রাইফেল। বর্ত্তমানে ফ্যাক্টরীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় রাইফেলের দামও অনেক কমিয়া গিয়াছে।

ইংরেজদের তথাকথিত "নির্বিরোধ অন্তর্ভেদ" (peaceful penetration) নীতির অর্থ যে কি তাহা সীমান্তপ্রদেশে কিছুক্ষণ অবস্থান করিলেই সুস্পষ্ট বুঝা যায়। রাস্তানির্ম্মাণ বর্ত্তমান সভ্যতার অতি সামান্য প্রাথমিক চিহ্নমাত্র। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত নির্ঝঞ্ঝাটে একটী রাস্তাও তৈরী হইতে পারে নাই। উপজাতীয় রাজ্যের মধ্য দিয়া সামরিক রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য ইংরেজ যে চেষ্টা করিয়াছিল তাহাতেও উপজাতিগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে। অবশ্য তাহাদের কেহ কেহ আবার ইহার কনট্রাক্টও গ্রহণ করিয়াছে। একথা অতি সত্য যে ইংরেজ অধিকারের গণ্ডী কয়েকটী বিচ্ছিন্ন ক্যাম্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। যেসকল রাস্তা এই ক্যাম্পগুলিকে সংযুক্ত করিয়াছে তাহাও নিরাপদ নয়। সপ্তাহের কয়েকদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য এই রাস্তা খোলা হয়। কিন্তু এত সতর্কতা সত্ত্বেও এই যাতায়াতের পথে কখনও বা বোমাবর্ষণ হইতেছে, কখনও বা পুল ভাঙ্গিয়া ফেলা হইতেছে, এমন কি বৃটিশ রক্ষীদলের উপর অতর্কিত আক্রমণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

কোন বৃটিশ বাহিনী যখন উপজাতীয় অঞ্চলের মধ্যদিয়া চলিতে আরম্ভ করে, তখন উপজাতীয়গণ তাহাকে প্রাণপণ বলে আটক করে। কিন্তু তাহাদের স্বজাতীয়গণই যখন মোটর বাহনযোগে তাহাদিগকে ও তাহাদের খাদ্যসামগ্রী লইয়া যায়, তখন সকলে সরিয়া দাঁড়াইয়া স্বচ্ছন্দে যাইবার পথ করিয়া দেয়। অথচ এই খাদ্যসামগ্রী না হইলে ইংরেজগণ সেখানে বাঁচিতেও পারে না। ব্যাপারটা একটু দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এই সকল দেশীয় ট্রান্‌সপোর্ট কোম্পানীগুলিকে প্রচুর অর্থ সাহায্য দেওয়া হয় এবং ইহাদের ব্যবসায় প্রকৃতপক্ষে একচেটিয়া ; সুতরাং ভাড়াও আদায় করে অতিরিক্ত হারে। গোলযোগের সময়ে অধিক সংখ্যক বৃটিশসৈন্যের আমদানী হওয়াতে কনট্রাক্টের সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়িয়া যায়, এবং উপজাতিগণের লাভের অঙ্কে বেশ মোটা টাকা পড়ে। বর্ত্তমানে যে নীতি অনুসৃত হইতেছে তাহাতে শান্তিস্থাপন অপেক্ষা গোলযোগ টিকিয়া থাকিলেই উপজাতীয়গণের লাভ হয় অনেক বেশী। কৃষিকাজ করা এ অঞ্চলে বড় সুবিধার নয়। কখন বৃষ্টি হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই, বৃষ্টির পরিমাণও অতিশয় অল্প। তাই

কৃষিকাজ খুব লোভনীয় মনে হয় না। তার চাইতে এইরূপ অশান্তি ও গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া নগদ যাহা পাওয়া যায় তাহা উপজাতির নিকট অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট ও সহজ।

উপজাতিগণ যে রাস্তারক্ষা প্রভৃতি কাজ করিয়া থাকে, তাহার পুরস্কারস্বরূপ তাহাদিগকে অর্থসাহায্য দেওয়া হয়। খাসাদার নামে একশ্রেণীর উপজাতীয় সৈন্য মাসিক প্রায় ত্রিশটাকা বেতনে নিজেদের রাইফেল লইয়া পথ রক্ষা করিয়া থাকে। উপজাতীয় অঞ্চলে এইরূপ সহস্র সহস্র খাসাদার নিযুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু সীমান্ত অঞ্চল সম্বন্ধে যে সকল অফিসারদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে তাহাদের কেহই এই খাসাদারদিগকে বিশ্বাস করেন না;—বিশেষতঃ উপজাতীয় চাঞ্চল্যের সময়ে তাহারা আরও আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠে।

খাসাদার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক শ্রেণীর উপজাতীয় স্কাউট আছে, তাহারা সত্যই বিশ্বাসের যোগ্য এবং কর্ম্মকুশল। সাধারণ সৈন্যবিভাগ হইতে কয়েক বৎসরের জন্য বৃটিশ অফিসার আনিয়া ইহাদিগকে পরিচালিত করা হয়। শান্তির সময় তাহারা সামরিক কর্ম্মচারীগণের অধীনে থাকেনা। স্বতন্ত্র একটী বিভাগে পরিবর্ত্তিত হইয়া সাধারণতঃ পুলিসের কাজ চালায়। শ্রেণী বিদ্বেষ বা নরহত্যা প্রভৃতি ব্যাপারে ইহারা হস্তক্ষেপ করে না। স্কাউটদের প্রধান কাজ হইল গ্রামের অভ্যন্তরে বৃটিশ ক্ষমতার বা শাসনের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার বিপদ জ্বলিয়া উঠিতেছে কিনা তাহারই অনুসন্ধান করা। উপজাতীয়দিগের মধ্যে তীব্র শ্রেণী বিদ্বেষের ফলেই এই স্কাউটদল। নিজেদের কাজ বাজাইয়া লইবার যথেষ্ট সুযোগ পায়। খাসাদারগণ নিযুক্ত হয় সমগ্র পরিবার হিসাবে। অবশ্য সময়ে সময়ে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে। কিন্তু স্কাউটগণ প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে নিযুক্ত হয় এবং কয়েকমাস যাবত তাহাদিগকে একটী নির্দ্দিষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়।

উপজাতির মধ্যে এই চিরন্তন বিদ্বেষের উপর নির্ভর করিয়া ইংরেজ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। গত গ্রীষ্মের সময় সামী পীর নামে জনৈক সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি অতি অল্প সময়ের মধ্যে সহস্র সহস্র উপজাতির মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাহাদের মধ্যে একটা একতার বন্ধন সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অথচ স্থানীয় অবস্থা বা ভাষা সম্বন্ধে তাহার কোনই ধারণা ছিলনা। কাবুল ও আফ্‌গান তক্তের উপরই ছিল তাহার প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু বিমান সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এ বিদ্রোহ দমন করা হইল। সামী পীরও ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী নাটকীয় সজ্ঘর্ষটী দেখাইয়া দিয়াছে, সীমান্ত সমস্যায় ইংরেজের গলদ কোথায়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই বিভিন্ন সময়ে কোন এক ব্যক্তিবিশেষ দাঁড়াইয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে সমস্ত অসন্তোষের আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছে। মহাসমরের ২০ বৎসর পূর্ব্বে এই ব্যক্তিটী ছিলেন মোল্লা পোইণ্ডা। বৃটিশের নিকট তিনি 'pestilential priest' নামে পরিচিত, কিন্তু অনেকে তাঁহার অসাধারণ কর্ম্মকুশলতা ও গুনবত্তার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছে। তাঁহার পরেই হাজি তুরানগাজির কথা মনে পড়ে। ইনি সম্প্রতি ১০৮ বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার তিন

পুত্র, তাহাদের বংশের ধারা অব্যাহত রাখিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনটী ভাই-ই বাদশাগুল এই একই নামে পরিচিত।

বর্ত্তমান বিদ্রোহীদের নেতা ইপির ফকির এখনও চল্লিশ বৎসর অতিক্রম করেন নাই। ইনিও পূর্ব্ববর্ত্তীগণের ন্যায় নিন্দা প্রশংসা উভয়ই পাইতেছেন। ইপির ফকির সম্বন্ধে সীমান্তপ্রদেশে বহু জনপ্রবাদই প্রচলিত আছে; কিন্তু খাটী সত্য বলিয়া এখনও কিছুই জানা যায় নাই। টোকি অঞ্চলের মিরালীর বৃটিশক্যাম্প হইতে দেড়ক্রোশ দূরে একটি গ্রামে তাহার জন্ম হয়। একটী গল্প শোনা যায় টোকিতে ব্রিটিশ অধিকারের প্রতিবাদ কল্পে তিনি জন্মগ্রহণের পরেই চল্লিশদিনের জন্য মাতৃস্তন্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহার ঐন্দ্রজালিক জীবনযাত্রা এবং বৃটিশের গুলিতে তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারেনা ইত্যাদি বহু অদ্ভুত গল্প তাহার সম্বন্ধে শোনা যায়। কিন্তু উপজাতির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাহার আগ্রহ তাহার নিরপেক্ষতা ও সহৃদয়তার সম্বন্ধে বহু ঘটনা নানা উপায়ে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। গত দুই বৎসর যাবত তাহাকে ধরিবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় ও শত শত প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। এই সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যাহত করিয়া তিনি নিজ ক্ষমতা ও প্রভাব অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। গত বৎসর পণ্ডিত জহরলালকে লিখিত তাহার চিঠি হইতে বুঝা যায়, এদেশের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম কিরূপ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত। অর্থনৈতিক চাপ দিবার জন্য পুলিশের বোমাবর্ষণ আজও দেখানো চলিতেছে। সমালোচনা এড়াইবার জন্য কতকগুলি নির্দ্দিষ্টগ্রামে শাস্তিভয় দেখাইয়া লাল ইস্তাহার ফেলা হইতেছে এবং উপজাতীয় জির্গার সাহায্যে অন্যান্য সতর্কবাণীও প্রেরণ করা হইতেছে। সংঘর্ষ এড়াইয়া চলিবার জন্য বিমান চাকলদিগকে আদেশ দেওয়া হইয়া থাকে এবং ওয়াজিরিস্থানে অবলম্বিত নীতি সাক্ষাৎভাবে আলোচনা করিলে মনে হয় তাহারা সেই আদেশ মানিয়াই চলে নাই।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ পর্ব্বতসঙ্কুল বন্ধুর স্থানে বিমান যুদ্ধের সুযোগও অত্যন্ত কম। তাহার উপর আর এক অসুবিধা এই যে গ্রীষ্মকালে মেঘের মত ধূলির রাশি এক এক সময় কয়েক

দিন ঝাপিয়া উপত্যকাগুলিকে একেবারে ঢাকিয়া রাখে, কিছুই আর সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় না। এই অবস্থায় বিমানচালনার বিপদ যথেষ্ট তারপর কয়েকজনের আনুমানিক অন্যায়ের উপর নির্ভর করিয়া একটী গ্রামকে বোমাদ্বারা ধ্বংস করা আধুনিক বর্ব্বরতারই পরিচায়ক।

১৫ বৎসর পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল ভারতসীমান্তের এই বিপদসঙ্কুল স্থানে একটী শক্তিমান ও আত্মতৃপ্ত জাতি গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে উপজাতি অঞ্চলে ধীরে ধীরে সভ্যতা প্রচার করিয়া সমগ্র পাঠান জাতির মধ্যে একটা আত্মবোধ জাগাইয়া তুলিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যেই স্যার ডেনিস ব্রের সভাপতিত্বে একটী সরকারী কমিটীও গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, এই নীতিটী বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য কিছুই করা হয় নাই। দেশবাসী ইহা আদর্শ বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে উপজাতির মধ্যে একটীও স্কুল বা হাসপাতাল দেখা যায় না। উত্তাল নদীগুলিকে বাঁধিয়া দিয়া সারাবৎসর ব্যাপী প্রচুর জল সরবরাহের জন্যও কোনও সামান্য ব্যবস্থাও করা হয় নাই। জলের অসুবিধা দূরীভূত হইলে সীমান্তপ্রদেশ হইতে ভারতে প্রচুর ফল রপ্তানী হইতে পারিত।

রুক্ষ তৃণহীন পাহাড়গুলি জীবন অসুবিধাজনক। তথাপি এখানকার অরণ্য দ্রুত অপসারিত করিয়া পাহাড়গুলিকে নগ্ন করা হইতেছে। এই মূর্খতা ও পাপকে আইনের সাহায্যে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। সভ্যতার দানকে উপজাতিগণ অবশ্যই সাদরে গ্রহণ করিত। তাহাদিগকে অধীনতা হরণের কোন উদ্দেশ্য নাই ইহা বুঝাইয়া দিয়া প্রচ্ছন্ন উৎকোচস্বরূপ তাহাদের বৃত্তি চালাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ নীতি প্রথমে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হইলেও ভবিষ্যতে সুফলপ্রদ হইবে এবং ভারত ও সীমান্তের মধ্যে একটী শান্তিজনক মনোভাব সৃষ্টি হইতে পারে। এই নীতি সাফল্যলাভ করিলে সমগ্র উপজাতি অঞ্চলকেই ক্রমে ক্রমে তথাকথিত শাসিত অঞ্চলে পরিণত করা যাইতে পারে।

প্রত্যেকটী ট্রিবিউন্যাল এমনকি স্যার জন সাইমনের কমিশন পর্য্যন্ত সীমান্তের দুইটী অঞ্চলের ঐক্য অনুভব করিয়া উভয় অঞ্চলের একই শাসন ব্যবস্থার উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন। ১৯৩৫ সনের শাসন ব্যবস্থানুযায়ী অন্যান্য প্রদেশে যেরূপ শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত সীমান্তপ্রদেশেও সেই ব্যবস্থার প্রচলন করিতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু উপজাতীয় অঞ্চলের শাসনভার প্রাদেশিক কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত করে নাই। কাজেই বৃটিশ চণ্ডনীতির লীলাক্ষেত্রের নিদর্শন হিসাবেই ইহা থাকিবে।

বিনয় ঘোষ

দেশীয় ও বিদেশীয় বিশ্বাসঘাতক ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে প্রায় তিন বৎসর কাল অক্লান্ত সংগ্রাম করবার পর স্প্যানিয়ার্ডরা নিজেরাই স্পেনীয় গণতন্ত্রকে সমাধিস্থ করেছে। যখন ফ্রাঙ্কোর কাছে পরাজয় স্বীকার করা ভিন্ন কোন উপায়ান্তর রইল না, তখন স্পেনীয় কম্যুনিষ্টরা সম্মানজনক শান্তির দাবী নিয়ে শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হ'ল। সেনাধ্যক্ষ মিয়াজার অধিনায়কত্বে দ্রুতগঠিত "জান্টার" বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ ক'রলে এবং মিয়াজা গণতন্ত্রী স্পেনের শেষ সামর্থ্যটুকু নিঃশেষ করে দিলেন—কম্যুনিষ্টদের দমন করবার জন্য। ফ্রাঙ্কো মাদ্রিদে মহা উল্লাসে প্রবেশ করে গণতান্ত্রিক স্পেনকে ফ্যাশিস্ত রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করলেন। স্পেনীয় অন্তর্বিপ্লবের মর্মস্পর্শী কাহিনীর এইভাবে সমাপ্তি হ'ল।

ওদিকে চেম্বারলেনের পররাষ্ট্রনীতির শ্রেণীস্বার্থজাত প্রিয়চিকীর্ষা জার্মান্ ফুরহারকে মধ্য ইউরোপের অধীশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সংখ্যালঘিষ্ঠ সুদেতেন জার্মান্‌দের তৃতীয় রাইখের অন্তর্ভুক্ত করবার পর হিট্‌লার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ইউরোপে আর তাঁর সাম্রাজ্যলিপ্সা নেই এবং চেম্বারলেন তখন কমন্স সভায় চার্চ্‌হিলিয়ান্ বিদ্রূপকে উপেক্ষা করে' সগর্বে বলেছিলেন যে মিউনিকে চতুঃশক্তির চুক্তির ফলে ইউরোপের শান্তি রক্ষিত হয়েছে, এমন কি ইডেন্ ও ডাফ্‌কুপার প্রমুখ রক্ষণশীল নেতা ও আট্‌লি প্রমুখ বিরুদ্ধবাদী লেবারাইটদের প্রশ্নোত্তরে এই শান্তিভঙ্গের সুদূর সম্ভাব্যতাকেও তিনি অস্বীকার করেছিলেন। ইঙ্গ-জার্মান ও ফ্রাঙ্কো-জার্মান চুক্তিই ছিল তাঁর এই বিশ্বাসের লৌহস্তম্ভ। 'কিন্তু বোহিমিয়া ও মোরাভিয়া অধিকার ক'রে শ্লোভাকিয়ার স্বাধীন সত্তাকে ধ্বংস ক'রে রুসেনিয়াকে হাঙ্গেরীকে সমর্পণ ক'রে,

মেমেলকে করায়ত্তে এনে এবং রুমানিয়াকে হুমকি দিয়ে তার সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি ক'রে জার্মান ফুরহার যখন তাঁর মাইনকাম্ফ্-এ লিখিত জার্মান বৈদেশিক নীতির মূলমন্ত্র "An alliance whose object is not a future war is senseless and useless"-এর অকম্প অনুসরণের দৃষ্টান্ত দেখালেন তখন চেম্বারলেন সাহেব কমন্স সভায় গতানুশোচনের পর ঘোষণা করলেন, যে বৃটিশ বৈদেশিক নীতির যে শান্তিবাদ, তাকে নূতন করে ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন হয়েছে, হিট্‌লারের বাক্যখেলাপ ও বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি মর্মাহত হ'য়েছেন, সুতরাং অস্ত্র কারখানায় শ্রমিকদের শোষণ গণ্ডূষ ভরে' চলুক এবং ইংলণ্ডের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মানুষকে militarise করা হোক্। পররাষ্ট্র-সচিব লর্ড হ্যালিফ্যাক্স্ও স্বরূপ পরিবর্তন করে' বললেন যে বৃটিশ বৈদেশিক নীতির রাজনৈতিক ন্যায়দর্শিতা বর্তমানে বর্জনীয় এবং সমস্ত যুদ্ধবিরোধী রাষ্ট্রগুলির সহিত ক্রিয়াশীল সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজনীয়। চেম্বারলেন সাহেবের ভাবান্তর লক্ষ্য করে' রক্ষণশীলদলের মিউনিক-কালীন বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর প্রশস্তি গেয়ে বললেন যে ইউরোপের শান্তি প্রতিষ্ঠা হিসাবে প্রধান মন্ত্রীর সম্মান এত দিন পরে সুরক্ষিত হবে। কিন্তু বৃটেনের পররাষ্ট্র-নীতিক "গয়ংগচ্ছ" মনোভাব যে এখনও বিদূরিত হয় নি তা' বৃটেন, ফ্রান্স্, রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া এবং অন্যান্য ইচ্ছুক রাষ্ট্রগুলিকে বুখারেষ্টে মিলিত হয়ে ফ্যাশিস্ত আক্রমণ প্রতিরোধ করতে একটি সুনির্দিষ্ট পন্থাবলম্বনের জন্য সোভিয়েট রাশিয়া থেকে যে কন্‌ফারেন্স আহ্বানের প্রস্তাব এসেছিল, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক সে আহ্বান অগ্রাহ্য হওয়ায় সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং পোল্যাণ্ডের উপর হিট্‌লারের হুমকিকে লক্ষ্য ক'রে চেম্বারলেনের যে সিংহগর্জন তা নিতান্ত অর্থহীন নাকীকান্না না হ'লেও শেষ পর্যন্ত যে অরণ্যে রোদনে পর্যবসিত হবে তা এখনই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। সোদ্দা কথা বৃটিশ কন্‌জারভেটিজ্‌ম্-এর চূড়ান্ত পরিণাম চেম্বারলেনিজ্‌ম্ এবং এই চেম্বারলেনিজ্‌ম্-এর দুর্দমনীয় গতি আজ সাম্রাজ্যবাদী ও ধনতান্ত্রিক স্বার্থের ধ্বংসাভিমুখে। অতএব কন্‌জারভেটিজম্ ও প্লটোক্রাসি সংমিশ্রিত চেম্বারলেনিজ্‌ম্ এবং গণস্বার্থজড়িত ডিমোক্রাসি অন্যোন্য-বিরোধী।

সেই কারণে ফ্যাশিস্ত আক্রমণ ইউরোপে আজ অনিরুদ্ধ এবং ফ্যাশিস্ত স্বৈরাচারের সম্মুখে ইউরোপের বুর্জোয়া-প্রধান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি কম্পমান ও নির্জীব। সেইজন্য বৃটেন ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী শ্রেণী ক্ষতি ও অপমান স্বীকার করেও ফ্যাশিস্ত অভিযান ইউরোপে অপ্রতিহত রেখেছে এবং প্রাচ্যাভিমুখে তার পথ সুগম করেছে। বল্‌টিক্ থেকে কৃষ্ণসাগরের কোল পর্যন্ত হিট্‌লারের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। উপরন্তু চেকোশ্লোভাকিয়া আত্মসাৎ এবং জার্মান-রুমানিয়ান্ বাণিজ্যচুক্তির ফলে তার কৃষিপণ্য ও তৈলের উপর পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হওয়ায় জার্মানির অর্থনৈতিক অভাব দূর হয়েছে এবং স্কোডা অস্ত্র কারখানার ভার লাভে অস্ত্র স্তূপীকরণেরও সুবিধা হয়েছে। পরিশেষে স্পেনে ফ্রাঙ্কো-বিজয় একদিকে যেমন মাইন্‌কাম্ফ নির্দিষ্ট জাপান্ বৈদেশিক নীতির Gleiches Blut gehort in ein gemeinsames Reich-এর (Kindred blood should belong to common Empire) লক্ষ্য ভিন্নও যে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য 'negrified' ফ্রান্সের ধ্বংস

(vernichtung) তার পথ পরিষ্কার করেছে, তেমনি অন্যদিকে দ্বিতীয় এ্যাক্সিস্ অংশীদার মুসোলিনীকেও ভূমধ্যসাগরকে ফ্যাশিস্ত হ্রদে রূপান্তরিত করবার সম্ভাবনাও বর্ধিত করেছে। মুসোলিনী ইতালীয় ফ্যাশিস্ত পার্টির বিংশতিতম উৎসবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন যে ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সামরিক কারণে ভূমধ্যসাগর ইতালীর কাছে "vital space" এবং আদ্রিয়াতিক সাগরকেও তিনি ইতালীর 'closed sea' করতে চান। তিনি ট্যানিস্, জীবুতি ও সুয়েজখালের পুনরুদ্ধারের কথা উল্লেখ করেছেন। এইখানে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে যে আপাতত নীস্ বন্দর ও কর্সিকা দ্বীপকে ছুঁয়ে এড়িয়ে গেছেন। তার কারণ তিনি বুঝতে পেরেছেন যে বৃটিশ ও ফরাসী
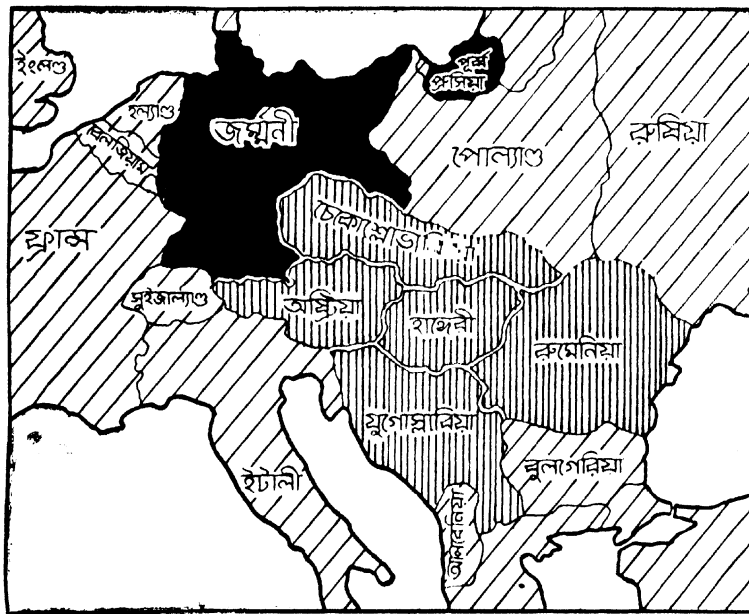
পূর্ব্বেকার জার্ম্মাণী

সংবাদপত্রে ইতিমধ্যে তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহজনক প্রচারকার্য আরম্ভ হয়েছে সুতরাং ফ্রান্স ও ইতালীর সীমানা-সংলগ্ন ও নিকটবর্তী নীস ও কর্সিকার কথা উল্লেখ না করাই নিরাপদ ও বাঞ্ছনীয়। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে মধ্য ইউরোপে যা ঘটেছে তা অবশ্যম্ভাবী এবং সেইজন্য যদি গণতান্ত্রিক দেশ[illegible]কান্না কাঁদে তা হ'লে তাতে তাঁরা আদৌ সমবেদনা প্রকাশ করবেন না। তাঁরা তাঁদের [illegible]অনুযায়ী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হবেন এবং যে রোম-বের্লিন্ এ্যাক্সিস্ পশুবল দ্বারা পরিচালিত তা চিরদিনই নিরঙ্কুশ রাখবেন। মুসোলিনী তাঁর দাবী-দাওয়া এত জোর দিয়ে ঘোষণা করেছেন তার কারণ বাইরে তিনি হিট্‌লারের উপর যতই আস্থা জ্ঞাপন করুন না কেন বা তাঁর কার্যকলাপের যতই প্রশস্তি গান না কেন, ফুরহার বল্‌ক্যান্‌এ আধিপত্য বিস্তারের পর

পাছে তিনি আদ্রিয়াতিক্ পর্যন্ত অগ্রসর হ'য়ে Brenner Pass-এর মধ্য দিয়ে সৈন্যচালনা করে' এ্যাক্সিস্-এর প্রিয় অংশীদারকে প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে না দিয়ে নিজেই আধুনিক জার্মান্ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন, এই আশঙ্কা তুচে মনে মনে পোষণ করেন। আদ্রিয়াতিক্‌কে ইতালীর 'closed sea' করবার কারণ হ'ল এই, এবং সেইজন্য জার্মান্ ফুরহার ডান্‌জিগ্ ও পলিশ্ করিডরের দাবী পেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে মুসোলিনী আলবেনিয়া আক্রমণ করেছেন এবং শোনা গেছে যে তিনি ইতিমধ্যে স্যান্টি-ইয়া-রান্টিন্, ভ্যালোনা, ডুরাজো ও গিওভানি ডি মেড়ায়া নামে চারটি অঞ্চল দখল করেছেন। এই আক্রমণ যে অচিরেই যুগোশ্লাভিয়ার উপর হবে তা বেশ অনুমান করা যায়।
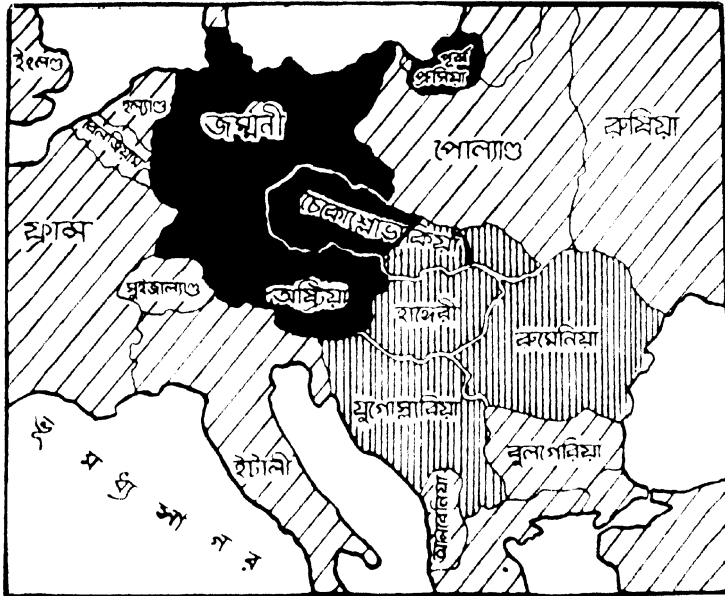
চেকোশ্লোভাকিয়া ও অষ্ট্রিয়া গ্রাসের পর

তা' হ'লে দেখা যাচ্ছে এবং বেশ স্পষ্ট ভাবেই যে রোম-বেলিন্ এ্যাক্সিস্ সম্প্রতি ভীষণ ক্রিয়াশীল হ'য়ে উঠেছে এবং ইউরোপীয় রাজনীতি এই এ্যাক্সিসের চতুর্দিকে বর্তমানে প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণায়মান। এই এ্যাক্সিসের ঘূর্ণ্যাবেগে ইউরোপের যে ভৌগোলিক পরি[illegible]টেছে তা সংক্ষেপে এই—অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী (রুথেনিয়া দান করে), রু[illegible]র্মান্-রুমানিয়ান্ চুক্তির দ্বারা), মেমেল, লিথুয়ানিয়া (প্রায় অধীনস্থ), ডান্‌জিগ ও পলিশ্ করিডর (পরবর্তী সূচী), সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম্ (ভবিষ্যৎ সূচী) প্রভৃতি দেশগুলি কমবেশী জার্মানির অধীনস্থ ও জার্মানির দ্বারা প্রভাবান্বিত। ওদিকে স্পেনের অন্তর্বিপ্লব ফ্রাঙ্কোর পক্ষে সমাপ্ত

হওয়ায় বালারিক, সার্ডিনিয়া, প্যান্টেলেরিয়া, ও ডোডোকানেস্ দ্বীপপুঞ্জ ইতালীর করায়ত্তে এসেছে জিব্রাল্টার ও মল্টাও বিপন্ন, ট্যানিস্ ও কর্সিকা ইতালীয় দাবীর অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং ভূমধ্যাসাগর প্রায় "ইতালীয় সাগরে" পরিণত হয়েছে। ফলে বৃটেন ও ফ্রান্সের আফ্রিকান্ ও প্রাচ্য সাম্রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ায় সম্ভাবনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ফ্রান্স ফ্যাশিস্ত শক্তির দ্বারা অবরুদ্ধ হয়েছে। ইউরোপের মানচিত্র দেখলে বোঝা যাবে বল্টিক্ থেকে কৃষ্ণসাগর তারপর আদ্রিয়াতিক্, ভূমধ্যসাগর এবং স্পেন ও ফ্রান্সের পিরেনীয় সীমান্ত পর্যন্ত রোম-বার্লিন এ্যাক্সিসের অধীন এসেছে। কিন্তু বৃটেন্ ও ফ্রান্স এতদিন পরে ফ্যাশিস্ত সহযোগিতার স্তর পার হ'য়ে মৌখিক প্রতিবাদের স্তরে পৌছেচে।

ষ্টালিন্ কম্যুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশনে ইউরোপের উপরোক্ত রাজনৈতিক গতিকে বেশ সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ষ্টালিন বলেছেন যে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি ১৯৩৭ সালের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নূতন অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে। বর্তমান সঙ্কটের বিশেষত্ব এই যে ১৯২৯ সালের সঙ্কট শিল্পোন্নতির যুগের পরে এসেছিল এবং ১৯৩৭ সালের অর্থনৈতিক সঙ্কট গত সঙ্কটের প্রভাব থেকে মুক্ত না হ'তেই আরম্ভ হয়েছে। এর অর্থ এই যে বর্তমান সঙ্কট আরও বেশী গুরুতর। এই সঙ্কটের দ্বিতীয় বিশেষত্ব হচ্ছে, এই সঙ্কট শান্তির সময়ে আরম্ভ না হ'য়ে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় আরম্ভ হ'য়েছে। যখন সমস্ত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সমর সজ্জায় ব্যাপৃত এবং জার্মানি, জাপান ও ইতালী যুদ্ধে রত তখন এই অর্থনৈতিক সঙ্কট সুরু হ'য়েছে। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পর গ্রেট্‌বৃটেন্, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি বিজয়ী রাষ্ট্রগুলি শান্তিরক্ষার এক নূতন রীতি প্রবর্তন করে' প্রত্যেক দেশের মধ্যে একটি নূতন পারস্পারিক সম্বন্ধ স্থাপন করলে। প্রাচ্যে নয়-শক্তি চুক্তি, এবং ইউরোপে ভের্সাই ও অন্যান্য কয়েকটি চুক্তি হ'ল সেই নূতন শান্তিরক্ষা রীতির ভিত্তি। উদ্দেশ্য হ'ল রাষ্ট্র সংঘের মধ্যে সমস্ত রাষ্ট্রগুলি ঐক্য বদ্ধ হ'য়ে প্রত্যেকের নিরাপত্তাকে রক্ষা করবে। প্রাচ্যে জাপান নয়-শক্তি চুক্তি ভঙ্গ করে' চীনের উপর যুদ্ধ আরম্ভ করেছে এবং ইউরোপে জার্মানি ও ইতালী ভের্সাই চুক্তি ছিন্ন করে' রাষ্ট্রসঙ্ঘকে পরিত্যাগ করে' মধ্য-ইউরোপে, আফ্রিকায় ও স্পেনে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আরম্ভ করেছে। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যে আরম্ভ হ'য়েছে সে কথা আজ সর্বস্বীকৃত সত্য। এই রোম বের্লিন-টোকিও ত্রিভুজ ষড়যন্ত্র করে' যে যুদ্ধ সুরু করেছে সে কি ইংলাণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার বিরুদ্ধে? তারা যে সকলে যুদ্ধ, করছে কমিনটার্ন-এর বিরুদ্ধে তা তাদের কমিনটার্ন বিরোধী চুক্তি থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে এই যে এখন এযুদ্ধ পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধে পরিণত হয় নি। আক্রমণকারী রাষ্ট্রগুলি, যথা জার্মানি, ইতালী ও জাপান শান্তিবাদী রাষ্ট্রগুলি, যথা ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার উপর চাপ দিচ্ছে এবং শেষোক্ত রাষ্ট্রগুলি ক্লীবের মত ক্রমে ক্রমে তাদের জবরদস্তিতে ঘাড় হেঁট করে পিছু হট্‌ছে। শান্তিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সামরিক ও অর্থনীতিক দিক দিয়ে ফ্যাশিস্ত রাষ্ট্রগুলির চাইতে অনেক বেশী

শক্তিশালী। তাই যদি হয়, তা হ'লে সকলের মনে এই ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে এই রাষ্ট্রগুলি অনেক বেশী শক্তিশালী হ'য়েও কেন ফ্যাশিস্তদের কাছে একটির পর একটি লজ্জাকর পরাজয় স্বীকার করছে? এর উত্তরে ষ্টালিন্ বলেছেন যে শান্তিবাদী (শান্তিকামী নয়) রাষ্ট্রগুলি বিপ্লবের আশঙ্কা করে এবং এও জানে এই দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধে পরিণত হ'লে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। বুর্জোয়া রাজনীতিকরা অবগত আছেন যে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর একটি বৃহৎ রাষ্ট্রে বিপ্লব সম্ভব হ'য়েছে এবং দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলে একটি বা একাধিক রাষ্ট্রে বিপ্লব ঘট্‌বে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির নপুংসকত্ব ও নিরপেক্ষতার মুখ্য কারণ হ'চ্ছে এই বিপ্লব-বিভীষিকা। এই আন্তর্জাতিক ফ্যাশিস্ত স্বৈরাচার ও সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে একমাত্র সোভিয়েট্ রাশিয়াই গণতান্ত্রিক শান্তি ও ঐক্যস্থাপনের পথে অবিচলিত রয়েছে এবং আক্রান্ত রাষ্ট্রগুলিকে যতদূর সম্ভব আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করবার জন্য সাহায্য করেছে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পক্ষে এখনও যে ঐক্যবদ্ধভাবে ফ্যাশিস্ত অগ্রগতি ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার কোন নিকট সম্ভাবনা নেই তা বৃটিশ লেবরপার্টি ও ফরাসী সোশ্যালিষ্ট পার্টির আভ্যন্তরীন মতদ্বৈধতা ও দোদুল্যমান মনোভাব থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। লেবরপার্টির নেতৃবৃন্দ আজও ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্-এর ইউনাইটেড্ ফ্রন্ট্ নীতির নয়টি ধারা অনুযায়ী কাজ করতে সম্মত নন। ফরাসী সোশ্যালিষ্ট্ পার্টির মধ্যেও ইতিমধ্যে ভাঙন ধরেছে। ফরাসী সোশ্যালিষ্ট পার্টির ন্যাশন্যাল কাউন্সিলের পর পর দু'দিন যে অধিবেশন হ'য়ে গেছে, তাতে পার্টির নীতি ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে সোশ্যালিষ্টরা আজও মতৈক্যে উপস্থিত হ'তে পারেন নি। দেশের একটি সর্বসম্মত বৈদেশিক নীতি নির্দিষ্ট করবার জন্য সকলে দাবী করছেন যে একটি আন্তর্জাতিক শান্তি সভা অহ্বান করে' সেখানে সকলের চাহিদার আলোচনা করা হোক্। মঃ ব্লুম ও ব্লুমের মতাবলম্বী সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজতান্ত্রিক সভ্যবৃন্দ বলছেন যে এই সভা বিনা সর্তে আহ্বান করা যায় না এবং ফ্যাশিস্ত আক্রমণ বন্ধ হ'লে এই সভা আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ প্যাশিফিষ্ট্ সমাজতন্ত্রীরা (৭৩১৮ জনের মধ্যে ৩১৪০ জন) বিনা সর্তে এই সভা আহ্বানের জন্য দাবী করেছেন। বৃটিশ ও ফরাসী বৈদেশিক নীতি আধুনিক গতিবিধি লক্ষ্য করেই ফরাসী ও বৃটিশ শ্রমিক নেতাদের মধ্যে প্যাসিফিষ্টদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন কি অনেক সোশ্যালিষ্টরা আজ উপনিবেশের জন্য "firm stand" নেওয়া পছন্দ করেন না। সেইজন্য আজ বহু বৃটিশ ও ফরাসী শ্রমিকরা জার্মানি ও ইতালীকে কিছু উপঢৌকন দিয়ে যদি শান্তিতে থাকা যায় তাতেও রাজী আছে।

ভারতবর্ষের সমাজতান্ত্রিকদের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। তাঁরাও আজ বৃটিশ লেবারইট্, ফরাসী প্যাসিফিষ্ট্ সোশ্যালিষ্ট এবং অন্যান্য দেশের সোশ্যাল ডিমোক্রাট্‌দের মত 'peaceful socialism'-এর সমর্থক। এঁরা সকলে নিজেদের বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক বলে' পরিচয় দিতে

একটুও কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আজও আমাদের দেশের সমাজতন্ত্রী নেতাদের মগজের বুদ্ধি জলের মত তরল রয়েছে, দানা বাধে নি। ত্রিপুরী কংগ্রেসে গোবিন্দ বল্লভ পন্থের প্রস্তাব গৃহীত হবার সুদীর্ঘ হাস্যাস্পদ ও লজ্জাকর কাহিনীর পুনরাবৃত্তির আর প্রয়োজন আছে বলে' মনে করি না, তবে ত্রিপুরীর নাট্যমঞ্চে সমাজতান্ত্রিকদের অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমাজতান্ত্রিকদের দলবদ্ধভাবে পন্থপ্রস্তাবকে পরোক্ষে সমর্থন করা, নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে', বর্তমানে ইউরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির নিরপেক্ষতার ছদ্মবেশে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করার' সঙ্গে সমানভাবে তুলনা করা যেতে পারে। কয়েকজন সমাজতান্ত্রিক নেতা প্রকাশ্যে পন্থ-প্রস্তাবকে সমর্থন করেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সমাজতন্ত্রীদের এই বায়বীয় ও ক্লীব মনোভাবকে কেন্দ্র করে যে লোকাপবাদের সৃষ্টি হয়েছে, দেশে তার বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রীনেতা জয়প্রকাশজী, মাসানি প্রভৃতি তাঁদের মুখপত্র 'কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট'-এ সাফাই গাইলেও এবং কম্যুনিষ্ট্ কমরেড যোশী জয়প্রকাশজীর সঙ্গে তাঁর মুখপত্র 'ন্যাশনাল ফ্রন্টে' যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করে' 'ইউনাইটেড্ ফ্রন্ট্', 'সোশ্যালিষ্ট্ ইউনিটি' প্রচার করে' 'Repair the damage' শ্লোগান দিলেও এবং বিরুদ্ধবাদীদের ১৩৫টা ভোট নিয়ে আনন্দে আত্মহারা হ'লেও, কেউ নেতাদের প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচার ও বিশ্বাসঘাতকতাকে সমালোচনা করেন নি। আমরাও সমাজতান্ত্রিক ঐক্য ও বামপন্থীদের ঐক্য সর্বান্তঃকরণে কামনা করি, কিন্তু যে কোন মূল্য দিয়ে ঐক্য ক্রয় করতে আমরা রীতিমত গররাজি। কারণ "National Demand"-এর কাগজে কলমে যথেষ্ট মূল্য থাকলেও, আসলে কর্মক্ষেত্রে তার যে কতখানি মূল্য আছে সে বিষয়ে আমরা কেউই পুরাপুরি আস্থাবান নই। এই সম্বন্ধে বৃটিশ পত্রিকা "New "Statesman and Nation"-এর সম্পাদকীয় থেকে কিছুটা অংশ আমি উদ্ধৃত করছি :—

"The Left led by Mr. Subhas Chandra Bose, is for a frontal attack on the whole scheme of Federation, a refusal to recognise it or to work it, with a return to non-coperation in every form as the ultimate tactics. Mr. Gandhi and the Moderates seem to veer towards critical co-operation. They might participate in the Federal scheme, 'if they could first secure democracy, or something like it, in some, if not all the states'." (11th March, 1939)

রাজকোট উপলক্ষ্য করে গান্ধীজীর উপবাসের কারণ তাই। গান্ধীজীকে আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করবার জন্য আমরা লর্ড লিনলিথ্গোকে এবং তাঁকে সুখী করবার জন্য মরিস্ গয়ারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কিন্তু গান্ধীজীর মত আমরা যে খুসী হইনি সে-কথা সরল মনে আমরা স্বীকার করছি। While Rome burns, Nero fiddles—গান্ধীজীর অবস্থা হয়েছে তাই। গান্ধীজী ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য নিয়ে 'fiddle' করছেন এবং এদিকে সমগ্র দেশ বৃহত্তম সঙ্কটের সম্মুখীন হ'য়ে

পথভ্রান্ত অবস্থায় সশঙ্কিত হয়ে রয়েছে। আজও জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি গঠিত হয় নি, শুধু বিবৃতির মারফত গাত্রদাহ নিবারণের পালা চলেছে। 'সাতকাণ্ড রামায়ণ' পাঠ করবার পর সুভাষ বাবুর শেষ প্রস্তাব আদৌ সন্তোষজনক হয় নি এবং পন্থ-প্রস্তাবকে 'ultra vires' বলে' দ্বন্দ্ব করারও এতদিন পরে কোন সার্থকতা নেই। এই নিন্দনীয় ও অবাঞ্ছিত সমস্যার আমরা সত্বর মীমাংসা দাবী করছি এবং বিশ্বাস করি সে মীমাংসা সুচিন্তিত হবে।

আন্তর্জাতিক আকাশে আসন্ন মহাসমরের যে মেঘগর্জন শোনা যাচ্ছে, সেই সমরের নিষ্ঠুর কবল থেকে জনগণকে মুক্ত ও নিশ্চিন্ত করতে হ'লে, বৃটিশ লেবর পার্টির কর্তব্য চেম্বারলেন-হ্যালিফাক্স্ পরিচালিত ন্যাশনাল গবর্ণমেন্ট্‌কে 'appeasement policy'-র পথ থেকে বিচ্যুত করে' এমন একটি গবর্ণমেন্ট গঠন করা (ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্স্-এর নয়-ধারা অনুযায়ী), যার সঙ্গে লেবর পার্টির সম্বন্ধ বর্তমান গবর্ণমেন্টের কনজারভেটিভ্ পার্টির সম্বন্ধের অনুরূপ হবে; ফরাসী সোশ্যালিষ্ট পার্টির উচিত কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে পপুলার ফ্রন্ট্‌কে পুনরুজ্জীবিত করা, আমেরিকার দিক থেকে কর্ডেল হালের বিবৃতি অনুযায়ী রুজভেল্টের উচিত রাষ্ট্রনৈতিক নিরপেক্ষতা বর্জন করা এবং এই সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির উচিত পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তিশালী শান্তিকামী সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাষ্ট্রের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। সেই সঙ্গে অধীন রাষ্ট্র হিসাবে ভারতবর্ষেরও একান্ত কর্তব্য, বিশেষ করে' সমাজতান্ত্রিক ও অন্যান্য বামপন্থী নেতাদের, সমস্ত আভ্যন্তরীণ বিবাদ থেকে নিবৃত্ত হয়ে, বিশ্বাসযোগ্য ঐক্যস্থাপন করে' বৃহত্তম জাতীয় সমস্যা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন শৃঙ্খলকে (যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা) ছিন্ন করা এবং গণ আন্দোলনকে জাতীয় কংগ্রেসের কর্মতালিকার পুরোভাগে রেখে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে অগ্রসর হওয়া॥

৭ই এপ্রিল, ১৯৩৯

কলিকাতা।

ইহুদী বিতাড়ন

বার্লিনের এক খবরে প্রকাশ নাজী আধিপত্য শুরু হবার পর থেকে আড়াই লাখ ইহুদী জর্মণী থেকে বিদায় হয়েছে। এদের বেশীর ভাগ আমেরিকায় ঠাঁই পেয়েছে।

বর্তমান য়ুরোপে গণতন্ত্র টাল সামলাচ্ছে—একহাতে তার রুগ্ন বেকার, আর হাতে খোঁড়া চাষী। পেছনে উদীয়মান একতন্ত্রতার স্মিত বদন।

(গ্লাসগো বুলেটিন)

জনবুল মেডিটারেনিয়ানে সাঁতার কাটছিল, ইটালী হেঁকে বললো—মিতা আর তো তুজনার ঠাঁই হবে না। কলের তুটো মুখই যে বন্ধ করে দিয়েছি।

এ্যাঁঃ—জনবুলের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে।

(ক্রকোডিল, মস্কো)

অপব্যয় নয় শোষণ

ওয়াজিরীস্থান অভিযানে গত ১৯৩৬ সালের নবেম্বর হইতে ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ৩০০ জন নিহত এবং ৯০০ জন আহত হইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে মোট ২ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে।

পথে প্রবাসে

যতীশ সেন

১৯৩৩ সালের মে মাস—মাত্র ক'দিন আগে জার্ম্মানীতে নাৎসীরা ক্ষমতা হাতে পেয়ে কিছু অত্যাচার এবং অনাচার সুরু ক'রেছে ব'লে শুন্‌তে পাওয়া গেল। আমার লণ্ডন থেকে, প্যারিস হয়ে বার্লিন রোম ইত্যাদি দেখে মার্সেল থেকে দেশে ফেরবার কথা। লণ্ডনে বন্ধুবান্ধবেরা নানারকম ভয় দেখাতে লাগ্‌লো—কেউ বল্লে যে সুধু ইহুদী নয়, কালা আদমীদেরও ছেড়ে দিচ্ছে না—জার্ম্মানরা নতুন আমলে একটু বেশী বাড়াবাড়ি সুরু ক'রেছে কাজেই ওদিকে না যাওয়াই ভাল। আমার অবশ্য 'ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়' কাজেই সে সব সৎপরামর্শ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলাম। ভিক্টোরিয়া ষ্টেসন থেকে নিউহ্যাভেন ডিয়েপের পথে প্যারি রওনা হলাম। ষ্টেসনে আমার ইংরাজ বন্ধু মি ইয়ং আমাকে বিদায় দিতে এসেছিলেন। ৮টার সময় গাড়ী ছাড়লো—আবার পথে বেরোলাম—মন্‌টা বেশ একটু চাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌লো। গাড়ী ছাড়বার মিনিটখানেক আগেই একটী বিদেশী মহিলা হুড়মুড় ক'রে আমার কামরায় এসে উঠ্‌লেন। বছর ৩০।৩২ বয়স, জাতে ফরাসী। কথায় কথায় তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল—বেশ ভাল ইংরাজী বল্‌তে পারেন—বল্লেন যে তিনি প্রায়ই লণ্ডনে আসেন—বাড়ী প্যারির সহরতলীর কাছে। সর্ব্বদা আসা যাওয়া করেন ব'লে ইংরেজী বুঝ্‌তে ও বল্‌তে তাঁর কোন কষ্ট হয় না। আমার ফরাসী ভাষাজ্ঞান অতি চমৎকার—কাজেই আমার প্যারিতে থাকার যায়গা ইত্যাদি সম্বন্ধে সব খবর জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বেশ পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন এবং আমি সেগুলো নোটবইএ লিখে নিলাম। প্রায় ১০টার সময় নিউহ্যাভেনে ট্রেন এসে দাঁড়াল। আমরা জিনিষপত্র নিয়ে কাষ্টমস্‌এর পরীক্ষা করবার যায়গায় গেলাম। সেখানে পাশপোর্ট দেখাবার পর আমরা জাহাজে চড়বার অনুমতি পেলাম। আমার সঙ্গে ১টা সুটকেশ, ১টা হ্যাণ্ডব্যাগ ও ১টী কম্বল ছিল, মহিলাটীর সঙ্গেও খুব হাল্‌কা জিনিষপত্র ছিল। কাজেই ১টী কুলীতেই আমাদের দু'জনের জিনিষপত্র জাহাজে তুল্লে। জাহাজের কুলী আবার আলাদা। সেখানে দেখলাম রেল থেকে ইংরাজ কুলী নামাচ্ছে, আবার জাহাজে তুলবার সময় ফরাসী জাহাজের খালাসীরা জিনিষপত্র তুল্লে। সবচেয়ে মজার কথা এই যে ফরাসী কুলীরা একটীও ইংরেজী কথা বল্‌তে পারে না। যা'হোক আমার সঙ্গে ফরাসী মহিলাটী থাকায় আমার কোন বিপদে পড়তে হয়নি। ১১টার সময় জাহাজ নিউহ্যাভেন থেকে ডিয়েপের দিকে রওনা হ'ল। জাহাজখানি ছোটই, গোয়ালন্দ ষ্টীমারের মত কি সামান্য বড় হ'তে পারে। বেশ কন্‌কনে ঝড়ো হাওয়া বইছিল, রাত্রিটাও বেশ মেঘে ঢাকা—তার মধ্যে আমরা ডিয়েপের দিকে এগিয়ে চলেছি। প্রায় রাত ১টার সময় ডিয়েপে এসে পৌছান গেল। প্যারির গাড়ী একেবারে তৈরী, জিনিষপত্র একটী কামরায় রেখে রেলওয়ে রেস্তোঁরাতে গেলাম। গরম দুধ, মাখন ও রুটী খেয়ে ট্রেনে ফিরে এলাম। মহিলাটীও দেখ্‌লাম অতরাত্রেও বেশ পেটভরে খেলেন। ট্রেণে এসে শুয়ে পড়লাম—গাড়ী ছাড়লো ১॥টার সময়। প্যারিসে পৌছোলাম প্রায় ৫টার সময়, তখনও বেশ

অন্ধকার র'য়েছে। মহিলাটী বল্লেন যে এখন শুয়ে থাক, কারণ সকাল ছ'টার আগে ট্যাক্সি ইত্যাদির ডবল ভাড়া। ঠিক বুঝ্‌তে পারলাম না বলায়—তিনি বল্লেন যে রাত ১২টা হ'তে সকাল পর্য্যন্ত প্যারিতে বাস্, ট্যাক্সি ইত্যাদির ভাড়া অন্য সময়ের ভাড়া অপেক্ষা দুগুণ। প্রায় ৭টার সময় তিনি আমাকে নিয়ে ষ্টেশনের বাইরে এলেন এবং একটী বাসে চড়িয়ে বল্লেন যে আমি যেন কুপন সিষ্টেমে বাসের টিকিট কিনি তা'হলে সস্তা পড়বে। তারপর বাসের কণ্ডাক্টরকে আমাকে ঠিক জায়গায় নামিয়ে দিতে অনুরোধ করে বাস্ থেকে নেমে গেলেন। এই মহিলাটী না থাক্‌লে আমার যে কি অসুবিধা হ'তো তা বল্‌বার নয়। তিনি পূর্ব্বেই বলেছিলেন যে শনিবার ও রবিবারের জন্য তিনি প্যারিস থেকে বাইরে চলে যাচ্ছেন, তা' না হলে আমাকে সঙ্গে করে প্যারি সহর দেখাতেন। আমার গন্তব্যস্থান ৪৩নং রু-দ্য-একোল ইউনিভার্সিটী বা সর্বোনের খুব কাছে। প্রায় ৭-১৫ মিনিটের সময় সেই রাস্তার মোড়ে আমাকে নামিয়ে দিয়ে বাস চলে গ্যালো। কিন্তু তারপর কি করি, বাসা কতদূর তাও জানি না—একটী লোকও পাইনা যে জিজ্ঞাসা করি—কুলীও দেখ্‌তে পেলাম না। অগত্যা কোন রকমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এবং কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নিয়ে অতিকষ্টে ৪৩নং বাসার দরজায় এসে দাঁড়ালাম। বাসা দেখে চক্ষু স্থির, প্রকাণ্ড পাঁচতলা দালান—লাণ্ডিং ইত্যাদি এত সুন্দর যেন কোন রাজা মহারাজার বাড়ী। যা হোক সাহস করে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু ভিতরে জনপ্রাণীও দেখ্‌তে পাই না। মিনিট পনের অপেক্ষা করে ঘন্টা টিপতে আরম্ভ করলাম, কিন্তু তাতেও কোন সাড়াশব্দ নেই। খানিকক্ষণ পরে দেখি যে একতলার নীচে যেন একটী ঝি ঝাঁট দিচ্ছে, তখন আরও জোরে জোরে বেল টিপ্‌তে লাগ্‌লাম। কিছুক্ষণ পরে ঝিটা লাণ্ডিঙে উঠে এসে আমাকে দেখে ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞাসা করলে যে আমি কি চাই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে সে ইংরাজী জানে কিনা। সে খানিকক্ষণ হাত পা নেড়ে কি বল্লে—তারপরে নীচে নেমে গেল—খানিকক্ষণ পরে দেখি বাড়ীর দারোয়ানকে নিয়ে এসেছে। সে এসেই জিজ্ঞাসা করলে যে আমি ফরাসী ভাষা জানি কিনা—আমিও জিজ্ঞাসা করলাম যে সে ইংরাজী জানে কিনা। এইভাবে দু'জনে হাত মুখ নেড়ে বিশেষ সুবিধা করতে পারা গেল না—তখন সে চট্ ক'রে একটা মতলব করে আমাকে বেঞ্চ দেখিয়ে বস্‌তে বল্লে—আর ছুট্‌তে ছুট্‌তে উপরের তালার দিকে চলে গেল—খানিক পরে দেখি একটুকরা কাগজ নিয়ে এসে আমাকে দিল, তাতে ইংরেজীতে লেখা রয়েছে—আমি কি চাই। আমি তার উত্তরে লিখে দিলাম যে আমি একটী কামরা চাই—৫।৬ দিন থাক্‌বো। দারোয়ান আবার ছুট্‌তে ছুট্‌তে উপরে গেল—সেখান থেকে আমার প্রশ্নের উত্তর নিয়ে এল যে হাঁ, একটী ঘর পাওয়া যাবে—ভাড়া দৈনিক ১১ ফ্রাঁ। তখন আমি বল্লাম যে এই ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে যেতে পারে কিনা। সে মাথা নেড়ে বল্লে যে হাঁ—তারপর ইশারায় বল্লে যে এখনই সেই ভদ্রলোক নীচে নেবে আসবেন।—

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থ-পরিচয়

সমাজ-বিজ্ঞান (প্রথম ভাগ)

শ্রীবিনয় কুমার সরকার প্রভৃতি। প্রকাশক—চক্রবর্তী চ্যাটার্জি অ্যাণ্ড্ কোং মূল্য ৩্ টাকা

উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত ও সংযোগে যে সৃজন চাঞ্চল্য বাংলায় তথা ভারতে নব যুগের সূচনা করেছিল, তার ক্রমবর্ধিষ্ণু বেগ পরবর্তী কালে জাতীয় জীবনকে নানা ভাবে উদ্ভাবিত ও উদ্বেলিত করে। ফলে চিন্তারাজ্যে এক বিপ্লব উপস্থিত হয়। উনবিংশ শতকের বাংলার চিন্তাবীর মনিষীরা সে বিপ্লবের সুসন্তান। বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডার মন্থন করে' তাঁরা জাতির চিন্তাক্ষেত্রকে সরস, সফল ও সমুজ্জ্বল করেছেন। এর সুফলন আজ সমাজে, রাষ্ট্রে, সংস্কৃতি-লোকে সর্বত্রই দেখা যায়। এ চিন্তারাশি আরো অধিক ফলপ্রসূ হ'ত যদি এদের বাহক বিদেশী না হয়ে কোন দেশীয় ভাষা হ'ত। মাতৃভাষা বহুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিরঙ্গণে ছিল। রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকে শিক্ষার ভাষা করার জন্য আজ বহু বছর বলে আসছেন। বাংলার কৃতী সন্তান আশুতোষের চেষ্টায় মাতৃভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পায়। কিন্তু শিক্ষার ভাষা বিদেশী হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় আজো নিজ পীঠস্থানের বাহিরে আপন সত্তা প্রসারণ করতে সমর্থ হয় নি। শিক্ষায়তনের বাইরে যাঁরা বিশ্বের চিন্তাধারা মাতৃভাষায় দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করেছেন, তাঁদের ভিতর অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এবং তাঁর 'টোলের' সহযোগিগণ অগ্রণী।

বিনয় বাবু ও তাঁর সহকর্মীদের প্রচেষ্টায় অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বহু বিষয়ের গবেষণামূলক চিন্তা বাংলা ভাষা ও জাতিকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁদের চেষ্টায় স্থাপিত 'আন্তর্জাতিক বঙ্গ পরিষদ' বা 'বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য জাতির জ্ঞানসম্পদ ও চিত্তশক্তি বৃদ্ধি করা। এদের মহৎ চেষ্টা যে সফলতার দিকে দিন দিন যাচ্ছে, তার প্রমাণ প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী এবং প্রকাশিত গ্রন্থমালা। ১৯৩২ সালে স্থাপিত 'আন্তর্জাতিক বঙ্গ পরিষদের' অন্তর্ভূক্ত সমাজ-বিজ্ঞান শাখা ১৯৩৭ সালে 'বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ নামে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তিত হয়। উদ্দেশ্য সমাজ বিজ্ঞানের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণা এবং ফলাফল মুখ্যত মাতৃভাষায় প্রকাশ করে' সমাজ-বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে বাঙালীর চিন্তাসম্পদ্ ও বাংলা ভাষাকে পরিপুষ্ট করা। পৃথিবীর সকল প্রকার সমাজ-বিজ্ঞান

বিষয়ক মত, পথ, রীতি, পদ্ধতি, দল বা কেন্দ্রের চিন্তা ও কর্ম স্বাধীন ভাবে আলোচনাও এ পরিষদের অন্যতম আদর্শ।

এ পরিষদ হতে প্রকাশিত 'সমাজ-বিজ্ঞান' ১ম খণ্ড বাংলাভাষায় লিখিত সমাজবিদ্যা বিষয়ক পুস্তকাবলীর ভিতর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহু অভাবের ভিতর এ অভাব আমাদের অনেকদিন ছিল। বিনয় বাবু ও তাঁর সহকর্মীদের চেষ্টায় তার কিছুটা পূরণ হয়েছে বলে আমরা আশা করি। আলোচ্য গ্রন্থটি তিনভাগে বিভক্ত ও বিভিন্ন রচনাবলীর সমাবেশ। লেখকেরা অধিকাংশই 'সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের' গবেষক, পরিচালক বা সহযোগী।

১ম ভাগ—বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের সূত্রপাত ও আবহাওয়া।

২য় ভাগ—সামাজিক প্রণালী, সামাজিক লেন-দেন ও সামাজিক গড়নের বিশ্লেষণ।

৩য় ভাগ—দেশী-বিদেশী সমাজ-চিন্তার ইতিহাস।

রচনাগুলি অধিকাংশই সুচিন্তিত, তথ্যবহুল ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। ভাষা সাধারণের বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষক। পুস্তকখানা চিন্তাসম্ভার ও ভাষাসম্পদে সমাজ-বিদ্ ও সমাজ-বিজ্ঞানে অনুরাগী পাঠকদের নিকট সমাদৃত হবে নিঃসন্দেহ।

বাংলা ভাষা পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদ কর্তৃক মনোনীত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩৮

রবীন্দ্রনাথ কবি ও সাহিত্যিক বা অন্য অনেক কিছু তাকে বলা যায়, কিন্তু তিনি যে একজন সূক্ষ্মদর্শী ভাষাতাত্ত্বিক এ খবর কম লোকেই জানেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে 'শব্দতত্ত্ব' নামে রবীন্দ্রনাথ যে বইখানি লিখেছেন, তাতেই তাঁর ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধেও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সুদীর্ঘ বৎসর পর রবীন্দ্রনাথ এবার ভাষাতত্ত্বের বর্তমান পুঁথিখানি লিখেছেন। এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি ভূমিকায় বলেছেন 'মানুষের মনোভাব ভাষাজগতের যে অদ্ভুত রহস্য আমার মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে' তারি ব্যাখ্যা করে এই বইটি আরম্ভ করেছি। তার পরে, এই বইয়ে যে ভাষার রূপ আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি, তাকে বলে বাংলায় চলিত ভাষা। আমি তাকে বলি প্রাকৃত বাংলা। সংস্কৃতের যুগে যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত প্রচলিত ছিল, তেমনি প্রাকৃত বাংলারও নানা রূপ আছে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অংশে। এদেরই মধ্যে একটা বিশেষ প্রাকৃত চলেছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে'। বইখানি কতকগুলো অংশে ভাগ করা, অংশগুলোর নামকরণ নেই। ভাষার জন্ম থেকে আরম্ভ করে উচ্চারণ, ছন্দ, কৃৎ, তদ্ধিত, বাক্যরচনা (syntax), ইত্যাদি ব্যাকরণ ও

ভাষাতত্ত্বের প্রায় সমস্ত বিষয়ই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু আদ্যন্ত কবির অনবদ্য ভাষায় লেখা। জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিমূলে জাতীয়ভাষা। 'মানব ও সমাজধর্ম উদ্জীবিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলেও ভাষার প্রাণবন্ধন অত্যাবশ্যক। সমাজ ও সমাজের লোকদের প্রাণগত মনোগত মিলনের ও আদান প্রদানের উপায় স্বরূপে মানুষের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে সৃষ্টি, সে হচ্ছে তার ভাষা। এই ভাষার নিরন্তর ক্রিয়ায় সমস্ত জা'তকে এক ক'রে তুলেছে— নইলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে মানবধর্ম থেকে বঞ্চিত হ'ত'। 'জাতিক সত্তার সঙ্গে সঙ্গে এই যে ভাষা অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠেছে এ এতই আমাদের অন্তরঙ্গ যে এ আমাদের বিস্মিত করে না। যেমন বিস্মিত করে না আমাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি, যে চোখের দ্বার দিয়ে নিত্যনিয়ত পরিচয় চলছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে'।

মানুষকে 'পরিপূর্ণভাবে বাঁচতে হবে, অপ্রমত্ত পৌরুষে বীর্যবান হয়ে সকলপ্রকার অমঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে।' সে বাঁচার সম্পদ ও সঙ্গতি আমরা পেয়ে থাকি ভাষার অফুরন্ত অমৃতভাণ্ডারে। শুধু জাতীয় ঐক্য ও দেশাত্মবোধ জাগানই ভাষার কাজ নয়, 'তার চেয়ে বড় কাজ দেশের চিত্তকে সরস, সফল ও সমুজ্জ্বল করা'।

ভাষাতত্ত্বের মত শুষ্ক বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বিষয়কে সরস ও প্রাণবন্ত করা সম্ভব শুধু রবীন্দ্রনাথের মত শ্রেষ্ঠ শিল্পীর। অন্যের পক্ষে ইহা কতদূর সম্ভব হ'ত বলা শক্ত, কিন্তু তিনি যে একাজে কত সিদ্ধহস্ত তা আমরা 'বিশ্বপরিচয়ে' এ দেখেছি।

গ্রন্থখানি ভাষাতাত্ত্বিকদের কতখানি সাহায্য করবে বলা শক্ত, সাধকের জ্ঞানবস্তুকে সাধারণের জ্ঞাতবস্তু করা যদি শিক্ষাপ্রচারের আদর্শ হয় তবে এ বইখানার মূল্য অত্যন্ত বেশী। সেজন্যই আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

কালী পূজা-চিত্রাবলী

শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

শিল্পী হিসাবে উভয়ই আমাদের সুপরিচিত। প্রকাশের সঙ্গে নির্দেশ, ভাষার সঙ্গে ভঙ্গী, ভাবের সহিত ভাবনা যোগ করে দেওয়া যদি চিত্রশিল্পের আদর্শ হয় তবে 'কালী পূজা-চিত্রাবলী' কিছুটা কৃতকার্য হয়েছে, নিঃসন্দেহ। ভারতীয় চিত্র ব্যঞ্জনা-প্রধান অন্তরের সূক্ষ্ম ভাবমালার আরোহ-অবরোহগুলিকে দেহবিন্যাসের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করাই ইহার বিশিষ্টতা। পাশ্চাত্য শিল্প বাস্তব-প্রধান এবং দেহভঙ্গীর সুচারুতা সম্পাদনই ইহার প্রধান লক্ষ্য। এ দু' মৌলিক বিশিষ্টতা যিনি না জানেন তার পক্ষে 'কালী পূজা চিত্রাবলী'র সত্যিকার রসাস্বাদন সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। শিল্পী ও রসিকের মিলিত আবেগেই শুধু শিল্পরস উপভোগ করা যায়। বাংলা দেশে শিল্প রসিক খুব বেশী নেই। কাজেই পুস্তকখানা কিরূপ সমাদৃত হবে বলা কঠিন।

ভারতের পণ্য

তাহার উৎপত্তি, বাণিজ্য ও ব্যবহার

প্রথম খণ্ড। কালীচরণ ঘোষ, মূল্য ১।০

ভারতের পণ্য সম্বন্ধে সকল আধুনিক তথ্য সম্বলিত দেশীয় ভাষায় লিখিত পুস্তক খুব বেশী নেই। অথচ বর্তমানের রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক সংচেতনাকে ব্যাপক ও সংহত জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে হ'লে এসব তথ্যগুলি জনসাধারণের জ্ঞানগোচর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ কার্যে কালী বাবু অনেকটা কৃতকার্য হয়েছেন। আমরা আশা করি এ বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যবহুল পুস্তকখানি অনেকের নিকট সমাদৃত হবে।

ভারতীয় রেলওয়ে সমস্যা

যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

সম্পাদক—আর্থিক জগৎ, মূল্য আট আনা

ভারতীয় অর্থনীতি ক্ষেত্রে রেলওয়ে একটি বিরাট সমস্যা। এ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে বিদেশী স্বার্থ রক্ষা ও ভারতীয় অর্থ শোষণের জন্য। কাজেই নিরন্ন ভারতের কোটী কোটী টাকা শাসকদের উদর পূর্তির জন্য গিয়েও জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়ে এ সমস্যার কোন সমাধান আজও হয় নি।

গ্যারান্টি প্রথায় রেলওয়ে নির্মাণ এবং পরবর্তীকালে এ উপলক্ষে নির্লজ্জ অর্থশোষণ (exploitation) বৃটিশ শাসনের এক কলঙ্কময় ইতিহাস। জনমতের প্রভাবে আজকাল রেলওয়ে নীতির কিছু পরিবর্তন হয়েছে সত্য, কিন্তু মৌলিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পূর্বের মতই আছে। এ সকল বিষয়ের প্রচার ও জনমত গঠন প্রত্যেক দেশ-সেবীর কাজ। উক্ত পুস্তিকা সে উদ্দেশ্য সাধন করলে গ্রন্থকারের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

মার্কসীয় দর্শন

রবি রায়, মূল্য আট আনা

আলোচ্য পুস্তিকাতে মার্কসীয় দর্শনের মূল তত্ত্বগুলি গ্রন্থকার অবতারণা করার চেষ্টা করেছেন, সমালোচক হিসাবে নয়, প্রচারক হিসাবে। কাজেই মতবাদের স্বপক্ষে যুক্তির চেয়ে অন্যের উক্তিই বেশী দিয়েছেন। সে অবশ্য অনেকের পক্ষে দোষের নয়, স্বীকার্য। বর্তমান

সমাজের অর্থনৈতিক দিক বুঝ্‌তে হলে বিপ্লবাত্মক সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। পুঁজিতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করে' সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর শুধু সমাজতন্ত্রের আদর্শে গণ-জাগরণ এবং উদ্বোধিত গণসংচেতনাকে সংহত ও কেন্দ্রীভূত করে' রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভে নিয়োজিত করা। কাজেই সমাজতান্ত্রিক মতবাদ আমাদের দেশে গড়ে উঠার সর্ববিধ প্রচেষ্টা ও প্রচার বাঞ্ছনীয়। এ কার্য আরো সফল হয় যদি উক্ত মতবাদগুলি আপন ভাষায় সর্বসাধারণের বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষকভাবে প্রদান করা যায়। এ বিষয়ে গ্রন্থকার আমাদের ধন্যবাদার্হ হতেন, যদি পুস্তিকাটি এত কোটেশন্-কন্টকিত না হত। তবু তার চেষ্টাকে আমরা সর্বান্তকরণে সমর্থন ও প্রশংসনীয় মনে করি।

মার্কস্ বাদের তিনটি দিক—ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা, পুঁজিবাদের গতিবিধি ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ।

গ্রন্থকার এ তিনদিক হতে মার্কসবাদের আলোচনা করেছেন। অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত অন্যান্য বিষয়ও ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পুস্তিকার উপসংহারে আছে 'বিশ্বের দুঃখ দূর করার ইচ্ছা হতে এই মতবাদের উৎপত্তি হয় নাই। সমাজের দ্বন্দ্বের অবস্থা নিরূপণ করে, এই মতবাদ দেখিয়ে দেয়, সমাজের গতি, সমাজের উন্নতির পথ। এই মতবাদ দেখিয়েছে, শ্রমিক শ্রেণী তাদের শোষণের কাহিনী শেষ করে' সমাজের শোষণের ইতিহাস শেষ করবে, তাদের স্বাধীনতার সাথে আনবে মানব জাতির স্বাধীনতা।' 'স্বাধীনতা' আনাই সমাজতন্ত্রবাদের শেষ না সুরু?

The True India

C. F. Andrews. Allen Unwin, 3 6d pp. 246, 1939.

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের মত ভারতের সমাজজীবন সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা খুব কম বিদেশীর আছে। তিনি বহু বছর ভারতে কাটিয়েছেন, গণমনের মর্মস্থলে ঢুকে গ্রাম্য জীবনের সুখদুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, আচার অনুষ্ঠান সব কিছুই তিনি সুমহান উদার ও সুগভীর সমবেদনার দৃষ্টিতে দেখেছেন। কাজেই তার নিকট ভারতের যে সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যাবে, এমন অন্য কোন বিদেশীর নিকট আশা করা যায় না। আবার বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 'inspired' লেখকদের আগমনও ভারতে কম হয় না। মিস মেয়োজাতীয় 'আঁস্তাকুড় পরিদর্শক' (drain inspector) সাম্রাজ্যবাদীর হীন পেশাদার দূতিকা আজকাল ভারতবাসীকে বহির্জগতের নিকট হেয় ও কলুষিত করাই একমাত্র কাজ হিসাবে নিয়েছে। আজ প্রায় দশবৎসর যাবত আমেরিকা ও গ্রেটব্রিটেনে ভারতের নৈতিক ও সামাজিক চরিত্রে কালিমা লেপন চল্‌ছে। এ সকল মিথ্যা কলঙ্ক অপনোদনের জন্যই এণ্ড্রুজ এ বই লিখেছেন (to refute some of the unjust charges laid at India's door and remove a great many false impressions).

বইখানা মিস মেয়োর মিথ্যাপ্রচারের প্রত্যুত্তর হিসাবে লেখা। তিনি যথাসম্ভব উদার নির্লিপ্তভাবে হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যতা, অনুন্নত সম্প্রদায়, নারীর দাবী, বাল্যবিবাহ, দরিদ্রতা, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, কালিঘাটের মন্দির, জাতিভেদ, একান্নপরিবার ইত্যাদি আলোচনা করেছেন।

তিনি উপসংহারে খ্রীষ্টধর্মের নীতিবাক্যটি উদ্ধৃত করেছেন।

Judge not, that ye be not judged.
For with what judgment ye judge,
Ye shall be judged ;
And with what measure ye meet
It shall be measured to you again

খ্রীষ্টধর্মের এ প্রভাব মিস্ মেয়োর 'কুমারীধর্মে' কিছু না পড়াই সম্ভব। কংগ্রেসের বৈদেশিক বিভাগ এই বইখানা পড়লে নিজেদের কর্তব্য নির্ধারণে কিছুটা সাহায্য পাবে নিঃসন্দেহ।

শৈলেশ রায়

Between 2 Wars

By "Vigilantes" (K. Zilliacus)--Penguin Books Ltd., P. 212.

আলোচ্য পুস্তকখানিতে বৃটেনের ন্যাশনাল গবর্ণমেন্টের যে "শান্তিমূলক" বৈদেশিক নীতি, তার সঙ্গে ১৯১৭ থেকে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে সময় গত মহাযুদ্ধের পর সমবক্লান্ত রাষ্ট্রগুলি শান্তিস্থাপনের জন্য ব্যস্ত ছিল সেই সময়ের বৃটিশ বৈদেশিক নীতির কি সাদৃশ্য আছে, খুব সুন্দরভাবে লেখক তারই আলোচনা করেছেন। এক কথায় বইখানিকে ১৯১৭-২১ এবং ১৯৩১-এর পর থেকে আজ পর্যন্ত বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতির তুলনামূলক সমালোচনা বলাও চলে।

সেই সময় কনজারভেটিজম্ ও প্লুটোক্রাসি মিত্ররাষ্ট্রগুলির সহিত সহযোগিতা করে' রক্ষক হয়েছিল এবং রুষ-বিপ্লবজাত নূতন সামাজিক শক্তি ও শ্রমিক অসন্তোষের বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম করেছিল। বর্তমানে কনজারভেটিজম্ ও প্লুটোক্রাসি আক্রমণকারী হয়েছে এবং বৃটিশ ন্যাশন্যাল গবর্ণমেন্টও অন্যান্য ফ্যাশিস্ত রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যোগ দিয়েছে অর্থনৈতিক অতিমন্দার (slump) ফলে ধনিকগোষ্ঠীর প্রতি ক্রিয়াশীল মনোভাবের বশীভূত হয়ে। প্রগতিমূলক বামপন্থী শক্তিগুলিকে তখন concessions দেওয়া হ'য়েছিল যুদ্ধ বন্ধ ক'রে, রাশিয়ার ব্যাপারে মধ্যস্থতা করবার মতলব থেকে নিবৃত্ত হ'য়ে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও আন্তর্জাতিক লেবর অফিস প্রতিষ্ঠিত ক'রে। আজকে প্লুটো-ফ্যাশিস্ত offensive-এর প্রথম ফল হচ্ছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ধ্বংস, নিরুপায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির উপর আক্রমণ এবং স্পেনে মধ্যস্থতা। তখন বৃটিশ কোয়ালিশনী গবর্ণমেন্ট যদিও ইতালী ও ফ্রান্সের চাইতে

কম প্রতিক্রিয়াশীল ছিল এবং তার মতামতও বিভক্ত ছিল, তা হ'লেও "it was far more important than they in waging the defensive war of Conservatism and Plutocracy against the offensive from the Left," এবং এখন যদিও বৃটিশ ন্যাশন্যাল গবর্ণমেন্ট ফ্যাশিস্ত রাষ্ট্রগুলির চাইতে কম প্রতিক্রিয়াশীল, তা হ'লেও "it has been more important than they in ensuring the success of the Pluto-Fascist international offensive." তখন বৃটিশ বৈদেশিক নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল রুষ-বিপ্লবের বিরুদ্ধে মধ্যস্থতা করা; এখন বৃটিশ বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে স্পেনীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে নূতন উপায়ে নিরপেক্ষতার ভাণ ক'রে মধ্যস্থতা করা। তখন গণতান্ত্রিক মতের advance guard ছিল "Labour" এবং রুষ-বিপ্লবকে মিত্ররাষ্ট্রগুলির মধ্যস্থতা থেকে রক্ষা করা কর্তব্য জেনেও অনেকবার ভয় পাবার ও ঠেকবার পর "Labour passed from acquiescence to verbal protests, and finally from words to deeds." আজ স্পেনীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফ্যাশিস্ত-তন্ত্রীর মধ্যস্থতাকে অন্যায় জেনেও, "democratic opinion and the labour movement have at last reached the stage of verbal protests."

বৃটিশ বৈদেশিক নীতি "is a perfectly consistent class-war policy." ইতালীকে আবিসিনিয়া জয়ের অধিকার দান থেকে সুরু ক'রে মধ্য ইউরোপ ও স্পেনে বিশ্বাসঘাতকতা করা পর্যন্ত সব বৃটিশ ন্যাশনাল গবর্ণমেন্ট এই class-war policy-র দ্বারা পরিচালিত হ'য়েই করেছেন। গত বছর বৃটিশ সম্রাটের প্যারী যাত্রার পূর্বে মঃ দালাদিয়ের যখন লণ্ডন পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন তখন তাঁকে বলা হয়েছিল যে "it was better to let Hitler dominate Central Europe without war than to risk Russian intervention in Europe. For, if Hitler were defeated with Soviet help half Europe would go communist and Soviet influence in the world would increase to the point where it menaced British and French 'vital interests'."

বৃটিশ বৈদেশিক নীতির এই ফ্যাশিস্ত ও ধনিকগোষ্ঠীর মনস্তুষ্টিসাধনের পরিণতি কোথায়? বৃটিশ আজ শান্তি চায় সত্য, কিন্তু শ্রেণীস্বার্থের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ান ও স্পেনীয় গণতন্ত্রের সহিত মিত্রতা ক'রে নিরাপত্তা চায় না, এবং এও সত্য যে ধনিকগোষ্ঠীর সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বিনিময়ে "শান্তি" ক্রয় করাও বেশীদিন চলবে না। ফল হবে এই যে "They will fall between the two stools of peace through collective security and peace through ceasing to be an Imperialist power, and blunder into a war they do not want and know they cannot win."

এই চেম্বারলেনিজ্‌ম্‌-এর কবল থেকে মুক্তি পেতে হ'লে বিরুদ্ধবাদীদের কি করা কর্তব্য সেই সম্বন্ধে লেখক কয়েকটি প্রস্তাব করেছেন। প্রথম হ'চ্ছে "An alternative Govern-

ment which should bear the same relation to the Labour Party and the interests of the common people that the National Government do to the Conservative Party and the interests of the Plutocracy." দ্বিতীয় প্রস্তাব হ'চ্ছে home-affairs-এ এই গবর্ণমেণ্টকে ব্যাঙ্ক, শিল্প-ব্যবসা, অস্ত্র ও বিমানপোত ব্যবসা প্রভৃতি সবগুলি আয়ত্তে আনতে হবে। তৃতীয় প্রস্তাব হ'চ্ছে "In Imperial policy a Labour or People's Government would take immediate steps to come to terms with the Congress movement in India. on the basis of recognising India's right to self-determination and frame her own or revise the existing constitution in a Constituent Assembly." এবং অন্যান্য উপনিবেশগুলিকে 'self-government' দিতে হবে।

এইভাবে লেখক বইখানির মধ্যে বৃটিশ ন্যাশনাল গবর্ণমেণ্টের বৈদেশিক নীতির বিশ্লেষণ ক'রে এবং নিজে কয়েকটি সুচিন্তিত প্রস্তাব ক'রে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতিক ঘটনাতে যারা উৎসাহী ও উৎসুক, তাঁদের কাছে বইখানি লোভনীয় ও অবশ্য পাঠ্য করেছেন।

বিনয় ঘোষ
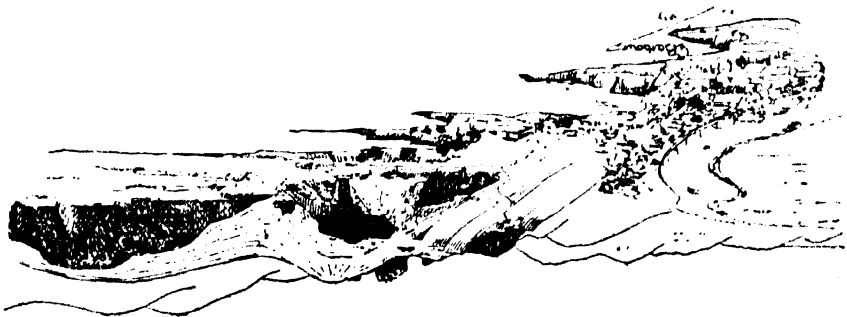
সম্পাদকীয়

জাতীয় সপ্তাহ

বিশ বৎসর পূর্বে সাম্রাজ্যবাদের লেলিহান শিখা পাঞ্জাবের প্রান্তরে যে দাবানল সৃষ্টি করেছিল, আজও তা নির্বাপিত হয় নাই। সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ আজও অপসারিত হয় নাই কিন্তু বিশ বৎসর যাবৎ সাম্রাজ্যবাদের লৌহনিগড় শিথিল হোয়ে আসছে। আজ সময় এসেছে সংহত শক্তির অবিরাম সংগ্রামে ধ্বংসের পথে সাম্রাজ্যবাদের অনিবার্য পরিসমাপ্তি ঘটাবার।

বিশ বৎসর পূর্বে ১৯১৯ সনে ১৩ই এপ্রিল (বৈশাখী পূর্ণিমা) তারিখে পাঞ্জাবের জালিওয়ান-বাবাগে বিশ সহস্র শান্ত নিরস্ত্র জনতার উপর জেনারেল ডায়ার গুলি বর্ষণ করেন। বিনা অনুমতিতে জনতার সমাবেশ হয়েছিল—তারই শিক্ষা স্বরূপ ঐ গুলিবর্ষণ। এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ জাতীয় কল্যাণে নিয়োজিত কোরে ঐ দিনটির স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা—এই জাতীয় সপ্তাহ।

১৩ই এপ্রিল জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন—জাতীয় জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। সাম্রাজ্যবাদের শুভবুদ্ধির উপর বিশ্বাস টুটে মোহমুক্ত জাতির মন সংগ্রামের পথ বেছে নিল। ভারতের জাতীয় সংহতি কংগ্রেস, নবরূপ পরিগ্রহ কোরে গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ কোরলো।

বিশ বৎসর পরে বিভিন্ন শক্তির সমাবেশে কংগ্রেস এক ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হোয়েছে।. কংগ্রেসের সংহতি, আসন্ন সংগ্রামে জাতির মুক্তিতে জাতীয় সপ্তাহের সার্থক পরিপূর্ণতা আনবে।

ত্রিপুরী অন্তে

ত্রিপুরীর বিতণ্ডা আজও শেষ হয় নাই। দেশ আজও সঙ্কটমুক্ত হয় নাই। ত্রিপুরীতে তথাকথিত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মহাত্মাজীর ছত্রছায়ায় বর্ধিত দক্ষিণ উপদল তারস্বরে অনৈক্যের আভাস পরিবেশন কোরতে সুরু কোরলেন—একমতবাদের প্রতিনিধিত্বের (Homogeneous representation) ধূয়া প্রচার কোরে। রাজাজী প্রচার করলেন

"গান্ধীজী মনে করেন কংগ্রেস কমিটিগুলিতে দক্ষিণ ও বামের প্রভেদ থাকা উচিত নয়।" রাষ্ট্রপতির বিলম্বে সত্যমূর্তি অধীর হোয়ে মত দিলেন "প্রাপ্ত-ক্ষমতাবলে গান্ধীজীর ওয়ার্কিং কমিটি মনোনীত করা উচিত।"

সুভাষবাবুর বিবৃতি

দক্ষিণপন্থী আবহের উত্তরে রাষ্ট্রপতি ২৫শে মার্চ্চ এক বিবৃতিতে ওয়ার্কিং কমিটী গঠনের বিলম্বের কারণ জনসমক্ষে উপস্থিত কোরেছেন।

ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে পন্থ-প্রস্তাবকে কেন্দ্র ক'রে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হোয়েছে সে সম্বন্ধে গান্ধীজীর মতামত জানা প্রয়োজন বলে রাষ্ট্রপতি মনে করেন। কংগ্রেসের প্রধান প্রধান দলের মধ্যে এখনও সহযোগিতা সম্ভব কিনা, একমতবাদের প্রতিনিধিত্ব সমর্থন করেন কিনা ও পন্থ-প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপক কিনা—মহাত্মাজীর নিকট মোটামুটি এই তিনটিই সুভাষবাবুর জিজ্ঞাস্য।

মহাত্মাজীকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হোয়েছে—পন্থ-প্রস্তাবে, এবং কারও মতে রাষ্ট্রপতি 'শীলমোহরে' (Rubber Stamp) রূপান্তরিত হোয়েছেন। সুতরাং রাষ্ট্রপতির বিবৃতিতে অসঙ্গতি নাই, বরং সদুদ্দেশ্য, সদ্বিবেচনা ও মিলন-ইচ্ছা প্রসূত। রাষ্ট্রপতি যে কয়েকটি প্রশ্নের অবতারণা করেছেন বিরোধের মূল ঐগুলিই। বিরোধ সহযোগিতায় পরিবর্ত্তিত হবে কিনা এর জবাব দেবেন গান্ধীজী। এই বিবৃতিতে পন্থ-প্রস্তাব বিধিবহির্ভূত বলে রাষ্ট্রপতি মত প্রকাশ করেন ও তার ফলে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় যে রাষ্ট্রপতি পন্থ-প্রস্তাব মান্য করবেন না।

৫ই এপ্রিল তারিখে আর এক বিবৃতিতে বলেন......"আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামত যাহাই হউক না কেন, আমি ঐ প্রস্তাব মান্য করিব। আমি যদি কোন কারণবশতঃ উক্ত প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি বিধিমত নিজের পথ বাছিয়া লইব। তবে আমি এ কথা বলিয়া রাখি যে, আমার ভবিষ্যত কর্মপন্থা পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর মতামতের উপর নির্ভর করিবে।"

রাষ্ট্রপতির এই বিবৃতিতে বিরোধ এখনও অবসান হয় নাই ঐ আভাসই রয়েছে। ওয়ার্কিং কমিটির দ্বাদশ সভ্য পদত্যাগকালে বিবৃতিতে বলেছিলেন ওয়ার্কিং কমিটিতে একমতবাদের প্রতিনিধিত্ব (Homogeneous Cabinet) প্রয়োজন। বিরোধের কারণ কি দ্বাদশ সভ্যের এই উক্তির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়? দেশকে নির্দেশ দিবার সময় এসেছে; দক্ষিণ-পন্থীর শুভবুদ্ধি কংগ্রেসকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করতে রাষ্ট্রপতির সহায় হউক—দেশ এই দাবী জানাচ্ছে।

—পন্থ-প্রস্তাব বিধিবহির্ভূত কিনা

প্রশ্ন উঠেছে—গান্ধীজীর ইচ্ছানুসারে রাষ্ট্রপতি ওয়ার্কিং কমিটি মনোনীত করবেন, এই প্রস্তাবটি বিধিবহির্ভূত কিনা। বৃটিশ পার্লামেন্টের ন্যায় ভারতীয় জাতীয় মহাসভারও শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নাই। জাতীয় মহাসভা সার্বভৌম শক্তিসম্পন্ন এবং জাতীয় মহাসভার শাসনতন্ত্র সংশোধনের ও সংযোজনের পূর্ণ অধিকার আছে—এই যুক্তি অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি মনোনয়নের ধারাটির (Article 15) সংশোধন অধিকারও জাতীয় মহাসভার আছে। কিন্তু, এখানে প্রশ্ন ওঠে পন্থ-প্রস্তাব কি সত্যই শাসনতন্ত্রের ১৫নং ধারার সংশোধন? এ বিষয়ে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার আদারকারের মত সমর্থনযোগ্য। প্রফেসর আদারকর মোটামুটি নিম্নলিখিত কারণে পন্থ-প্রস্তাব শাসনতন্ত্রের সংশোধন মনে করেন না।

১। পন্থ-প্রস্তাবের উদ্দেশ্য কোন স্থায়ী সংশোধন না বরং এ কথা বললে ভুল হবে না যে পদত্যাগী দক্ষিণপন্থীদের পুনঃ প্রতিষ্ঠাই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য; সাময়িক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হোয়ে শাসনতন্ত্রের সংশোধন নিতান্তই অস্বাভাবিক। শাসনতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করবার এ এক অপূর্ব ব্যবস্থা।

২। যে সংশোধনের উদ্দেশ্য স্থায়ী (পুনরায় পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত) সে সংশোধন প্রস্তাব ব্যক্তিবিশেষের সহিত সংযুক্ত থাকলে, ব্যক্তিবিশেষের তিরোধানের পর সে প্রস্তাবও তিরোহিত হবে।

৩। সংশোধন প্রস্তাবে ব্যক্তিবিশেষের নাম উল্লেখ থাকার উদাহরণ নাই। শাসনতন্ত্রে কাঠামোর নির্দেশ দেওয়া হয়, পদ-কর্তার নাম থাকে না।

৪। শাসনতন্ত্রের সংশোধন প্রস্তাব পাঁচমিশেলী প্রস্তাবের সাথে উপস্থাপিত করার রীতি নাই। এখানে মহাত্মাজীর নেতৃত্বে বিশ্বাস, ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের উপর অনাস্থা জ্ঞাপনের নিন্দা ও তথাকথিত সংশোধন প্রস্তাব একসঙ্গে উপস্থাপিত করা হোয়েছে। পন্থ-প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা খর্ব করা। মহাত্মাজীর প্রভুত্ব যদি অচল-প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাদের উচিত ছিল সরাসরি শাসনতন্ত্র খারিজ ক'রে মহাত্মাকে একমাত্র ডিক্টেটর কোরে দেওয়া।

শাসনতন্ত্র সংশোধনের নামে কংগ্রেসের সাধারণ সভ্যও না, এমন এক ব্যক্তিকে (এ ক্ষেত্রে গান্ধীজী, যিনি অন্যান্য বছরের রাষ্ট্রপতিদের পরামর্শ দিয়ে পরিচালনা করেছেন এবং যার পরামর্শ এ বছরকার রাষ্ট্রপতি সাগ্রহে গ্রহণ করবার অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন) একনায়কত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করাকে রাষ্ট্রনীতির দিক থেকে আমরা বিধিবহির্ভূতই অভিহিত করব।

যদি, সংশোধন প্রস্তাবে এ রকম বিশেষ একটা পদসৃষ্টি করে নির্দেশ দেওয়া হোত যে এই পদকর্তার ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্রপতি ওয়ার্কিং কমিটি মনোনীত করবেন এবং সেই পদে গান্ধীজীকে নির্বাচিত করা হোত তবেই এই প্রস্তাবটি বিধিসঙ্গত হোত।

সমাজতন্ত্রীর অন্তর্দ্বন্দ

ত্রিপুরীতে সমাজতন্ত্রীদলের দুর্বোধ্য আচরণ আমরা গত মাসে আলোচনা করেছি। ইতিমধ্যে জয়প্রকাশ ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয়েরা বিবৃতি ও বক্তৃতায় তাদের আচরণ স্পষ্ট করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। বামপন্থীদের অন্যতম কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির আচরণে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হোয়েছে, তা'তে স্বতঃই কয়েকটা প্রশ্ন উঠে—

১। ভারতের মুক্তি আন্দোলনে সমগ্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিগুলির সংহতি প্রয়োজন নিঃসন্দেহ। কিন্তু বামপন্থীর ঐক্য ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংহতি (ইউনাইটেড ফ্রন্ট)—এই দুই নীতির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হোলে সমন্বয় কোন পথে আসবে ?

২। সংহতির দাবী পূরণ কোরতে আত্মবিলোপ ঘটান সমাচীন কিনা ?

৩। সংহতির নামে গৌরবের সিংহাসনে একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয় কী ?

রাজকোট ও স্যার মরিসের মধ্যস্থতা

গান্ধীজীর অনশনভঙ্গের পর, তাঁর সম্মতিক্রমে, রাজকোট সমস্যার সমাধানের ভার বড়লাট ফেডারেল কোর্টের চীফ জষ্টিস্ স্যার মরিসগায়ারের উপর অর্পণ করেছিলেন।

যে মতদ্বৈধের ফলে রাজকোটের সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয় এবং গান্ধীজী উপবাস করেন তাহা সংক্ষেপে এই—

১। গত ২৬শে ডিসেম্বর সর্দার বল্লভাইয়ের সহিত এক চুক্তিতে ঠাকুর সাহেব, শাসন সংস্কার প্রবর্তনের জন্য দশজন সভ্য নিয়ে, একটি কমিটি গঠন ক'রতে রাজী হন। এই দশজনের মধ্যে সাতজন সর্দ্দারজী নির্বাচিত রাজকোটের অধিবাসী, তিন জন রাজকোট দরবারের প্রতিনিধি।

২। সর্দারজী নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গ্রহণ ক'রতে ঠাকুরসাহেবের অনিচ্ছা। মহাত্মাকে লিখিত ৩রা মার্চ্চের পত্রে ঠাকুর সাহেব অভিমত প্রকাশ করেন যে শাসন সংস্কার কমিটিতে সভ্য মনোনয়ের গুরু-দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত তাঁ'রই, অন্য কা'রও নয়।

৩। গান্ধীজী ঠাকুর সাহেবের এই মনোভাবকে প্রতিশ্রুতিভঙ্গের পরিচায়ক বলে মনে করেন। গান্ধীজী ও বল্লভাইয়ের অনুকূলে স্যার মরিস অভিমত প্রকাশ করেছেন। স্যার মরিসের মতে ঠাকুরসাহেব চুক্তিবদ্ধ হোয়েছিলেন স্বেচ্ছায় এবং তাঁর মনোনয়নের ক্ষমতা বল্লবভাইয়ের নির্বাচিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

রাজকোটের সঙ্কট ঠাকুরসাহেব ও তাঁর অনুচরবর্গের দুরপনেয় কলঙ্ক, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। স্যার মরিসের মধ্যস্থতায় ঠাকুর সাহেবের ব্যবহারের অযৌক্তিকতা প্রমাণিত

নামে তাঁকে আরো নিন্দনীয় কোরে তুলবে। সামন্ততন্ত্রের গৌরব-রবি স্তিমিতপ্রায়, দেশীয়রাজ্যে হাহাকার সে কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। রাজকোটের কালিমাময় অধ্যায়ও তারই নিদর্শন। সামান্য প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবার যোগ্যতা যে অর্জন করে নাই, রাজ্য সু-শাসনের যোগ্যতা তাঁর আয়ত্তের বাইরে—এ কথা বলাই বাহুল্য।

গান্ধীজী যে মূল্য দিয়ে রাজকোটের সঙ্কট মোচন কোরতে অগ্রসর হোয়েছিলেন, সে মূল্যের তুলনায় অর্জিত বিজয় কি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর নয়? জীবনপণের বিনিময়ে তিনি রাজকোটের প্রজাদের স্বায়ত্ত-শাসন এনে দেন নাই, সুশাসন এনে দেন নাই, এমন কি সুশাসনের প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত অর্জন করেন নাই। শাসন-সংস্কার কমিটিতে প্রজামণ্ডলের প্রতিনিধির সংখ্যাধিক্য থাকবে—এই তিনি আদায় করেছেন; কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করা না-করা ঠাকুর সাহেবের ইচ্ছার উপর নির্ভর ক'রবে।

রাজকোটের সংগ্রামের বিপুল সম্ভাবনা পূর্ণ-পরিণতি লাভ কোরবে—এই ছিল দেশবাসীর আশা। প্রজা আন্দোলনের রাষ্ট্রচেতনা, অগ্রহণীয় ও বর্জনীয় যুক্তরাষ্ট্রের (ফেডারেশন) অংশ বিশেষ ফেডারেল কোর্টের চীফ জষ্টিসের মধ্যস্থতায় সমাধি লাভ কোরবে—এই প্রকার জয়ে আমরা উৎসাহের কারণ খুঁজে পাই না। রাজকোটের অভিনয় কি ফেডারেশন বর্জনের ইঙ্গিত দিচ্ছে? মহাত্মাজীর বিবৃতি আমাদের সংশয় নিরসন কোরতে পারে নাই।

উপবাসের ভাষ্য

হরিজনে 'উপবাস' নামধেয় এক প্রবন্ধে গান্ধীজী লিখেছেন—ভগবানে জাগ্রত বিশ্বাস ও অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আহ্বান—একমাত্র এই দুই অবস্থায় উপবাস যুক্তিযুক্ত।

গান্ধীজী কতকগুলি পৌরাণিক আখ্যায়িকার অবতারণা কোরে উপবাসের অমোঘশক্তি প্রমাণ কোরতে চেষ্টা করেছেন। অবশ্যি তিনি সবিনয়ে স্বীকার করেছেন যে সে-সকল উপবাসের উদ্দেশ্য ছিল স্বতন্ত্র—রাজনৈতিক নয়। গান্ধীজীর অধিকাংশ উপবাসের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। রাজনৈতিক উপবাস মুখ্যত: প্রতিপক্ষকে সমতে আনয়ন কোরতে অথবা রাজনৈতিক দাবী পূরণ কোরতে ব্যবহৃত হয়। মোট কথা, রাজনৈতিক উপবাসের মূলে আছে একটা বাধ্য করাবার মনোবৃত্তি; স্থান ও অবস্থাভেদে এই মনোবৃত্তি প্রশংসনীয় অথবা নিন্দনীয় হয়। রাজনীতিতে ঐশী-নির্দেশ বা অন্তরের আহ্বানের স্থান নাই বলেই আমরা জানি। রাজনীতির তাগিদে চরম অস্ত্ররূপে অনুসৃত উপবাসই সচরাচর সমর্থিত হয়। এই উপবাসের পশ্চাতে অন্তরের আহ্বান না থাকলেও, একটা নৈতিক যুক্তি (moral sanction) আছে। আমরা জানি তুচ্ছ কারণে উপবাস কোরে তার কার্যকারিতা অনেক ক্ষেত্রে হ্রাস পেয়েছে, তথাপি উপবাস অথবা অনশনের এই আত্মিক ভাষ্য গ্রহণযোগ্য মনে করি না।

সত্যাগ্রহের মূলসূত্র

ত্রিবাঙ্কুরে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পুনঃ প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত কিনা এ প্রশ্নের উত্তর উপলক্ষে গান্ধীজী সত্যাগ্রহের কয়েকটি মূল সূত্রের উল্লেখ করেছেন। (১) আন্দোলনের গতি অহিংস থাকবে, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া কর্তব্য, (২) সত্যাগ্রহ ধ্বংসমূলক হবে না, যে আইনগুলি ক্ষতিকর অথবা যে আইন-অমান্যের উদ্দেশ্য হবে কর্তৃপক্ষকে উদ্‌ব্যস্ত করা ; এ প্রকার আইন হবে সত্যাগ্রহের কেন্দ্র।

(৩) আন্দোলন অধিক সংখ্যক লোকের অংশ গ্রহণ করবার উপযোগী হওয়া চাই।

(৪) ছাত্রদের আন্দোলন পরিহার করা কর্তব্য। (৫) আন্দোলনে গোপনীয়তা অনাবশ্যক।

এই পাঁচটি সূত্রের প্রায় সবগুলিই আমাদের পরিচিত। বিগত উনিশ বছরে সত্যাগ্রহ আন্দোলন ভারতের বিভিন্নস্থানে অনুষ্ঠিত হোয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন বারবার ব্যাহত হোয়েছে ; সূত্রগুলি অলঙ্ঘিত রয়েছে এমন একটি দৃষ্টান্তও আমাদের মনে পড়ে না। চোরিচোরা থেকে রাণপুর পর্য্যন্ত 'পর্বততুল্য ভ্রমগুলি' (Himalayan Blunders) তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। তথাপি সত্যাগ্রহ আন্দোলনে মহাত্মার বিশ্বাস অটল, পঞ্চসূত্রে মহাত্মার আস্থা গভীর। একটু আলোচনা কোরলেই দেখা যাবে মহাত্মার সূত্রগুলি পরস্পর বিরোধী। তিনি বিধান দিয়াছেন, আন্দোলন কখনই হিংসার পথে পরিচালিত হবে না—দেশের পরিবেশ যখন এই নিশ্চিত-বিশ্বাস জন্মাবে তখনই সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হবে ; অথচ তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে আন্দোলন অধিক সংখ্যক লোকের গ্রহণীয় হওয়া চাই। গণমনের প্রবৃত্তি যোগীসুলভ নিবৃত্তি লাভ করবে—এ ভরসা আমাদের নাই ; অহিংস সত্যাগ্রহী আমাদের কাম্য কিন্তু অহিংস সত্যাগ্রহী গণ-আন্দোলনে বাঞ্ছনীয় হোলেও দুর্লভ—সে এদেশেই হোক কি অন্য দেশেই হোক। সুতরাং, গণ-আন্দোলন অহিংসাবর্ত্মে সার্থক পরিণতি লাভ করবে—এ-কথা হলপ কোরে বলার সুদিন যেদিন আসবে সেদিন দেশের প্রতিটি মানুষ হবে এক একটি—যিশু, বুদ্ধ, চৈতন্য। গান্ধীজির জীবনে 'Himalyan Blunders' তো অনেক হয়েছে, কৈ স্বাধীনতার পথে দেশের অগ্রগতি তো আসেনি।

সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য ধ্বংসমূলক না হোলেও ধ্বংস যে সত্যাগ্রহের সহচর হোয়ে আসে এ-কথা কি গান্ধীজীর অবিদিত ? মহাত্মার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ডাণ্ডীযাত্রার উদ্দেশ্য ছিল লবণ আইন রদ করা—দুর্ভাগা দেশের দুস্থ জনগণের পুষ্টির পথে অন্তরায় দূর করা। কিন্তু এই সামান্য কল্যাণও কি ধ্বংসের, অকল্যাণের, পথ বেয়ে আসেনি ? সংগ্রামে অপচয় ঘটবেই, সত্যাগ্রহ সংগ্রাম সূচিত করে। সত্যাগ্রহের পথ নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণের পথ নয়। এ পথে ধ্বংসও আছে গঠনও আছে।

অসহযোগ আন্দোলনের উনিশ বছর পরে গান্ধীজী বিধান দিচ্ছেন ছাত্রদের সত্যাগ্রহে যোগ দেওয়া অসঙ্গত। আজকের দিনে গান্ধীজীর এ বিধান একেবারে অচল। তবে তিনি নাকি বলেছেন শিক্ষায়তনের বাইরে এসে ছাত্ররা আন্দোলনে যোগদান কোরতে পারে, কারণ তখন আর তারা ছাত্র নয় নাগরিক। এ কূট-যুক্তি আমাদের গ্রীক সফিষ্টদের (Sophists) কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ত্রিবাঙ্কুর ও কংগ্রেস

কিছুদিন পূর্বে ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ার দেশীয় রাজ্যে কংগ্রেসের হস্তক্ষেপ নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। রাজ্যের আভ্যন্তরীন ব্যবস্থার দায়িত্ব সম্পূর্ণ রাজার; শাসন সংস্কার আবশ্যক হোলে প্রজারা দাবী কোরবে, আন্দোলন কোরবে, রাজ্যের সীমানার মধ্যে—বাইরের প্রতিষ্ঠানের মুখাপেক্ষী হোয়ে থাকবে না। এই স্যার সি, পির অভিমত।

সামন্ত-নৃপতি ও তাদের অনুচরবর্গ বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক কোন দিনই স্বীকার করবে না। সার্বভৌম শক্তির (Paramount Power) নিকট তাদের কৃত-কর্মের জন্য দায়ী— এ কথা বার বার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে মূল বিষয়টি চাপা দেবার চেষ্টা তারা অনেকদিন যাবৎ করে আসছেন। জাতির ঐকান্তিকতাই যে সার্বভৌম শক্তির মূলধন—এই সহজ সত্য আজও তাদের মর্মে পৌঁছায়নি। গান্ধীজী ত্রিবাঙ্কুর দেওয়ানের আচরণে কংগ্রেসকে উপেক্ষা করবার নীতিকে বলেছেন—

"এ যেন শিশুর হাতের তালু দিয়ে দুর্বার বন্যা প্রতিরোধ করবার চেষ্টা", গান্ধীজির এই সাবধানী বাণী ত্রিবাঙ্কুর গ্রহণ কোরলে সার্বভৌম শক্তির বিলোপ ঘটবে না।

নরেন্দ্রমণ্ডল ও বড়লাটের উক্তি

নরেন্দ্র মণ্ডলের সভার উদ্ঘাটন কোরে বড়লাট বক্তৃতা করেন—মামুলী বিষয় নিয়ে ও মামুলি ভঙ্গিতে; শিষ্টতার আদান-প্রদানেই বক্তৃতা সমাপ্ত হয়।

এবারকার বক্তৃতার সুর সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। বড়লাট সামন্ত নৃপতিদের ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখ কোরে মৃদু-ভাষায় অভিযোগপূর্ণ বক্তৃতা দিয়েছেন। সুশাসনের অভাব, প্রজার হিতের প্রতি উপেক্ষা, স্বৈরাচার, বৎসরের অধিকাংশ সময় রাজ্য থেকে অনুপস্থিত থাকা, রাজার বিলাস-ব্যসনে অতিরিক্ত ব্যয়, শাসিত ও শাসকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অভাব—প্রধানতঃ এইগুলিই অভিযোগের বিষয়। অধিকন্তু স্পষ্ট ভাষায় নিয়মতান্ত্রিক শাসন-যন্ত্র প্রবর্তনের নির্দেশ দিয়েছেন।

বড়লাটের এই বক্তৃতায় দেশীয় রাজ্যগুলিতে শাসন সংস্কারের জন্য প্রজা আন্দোলন সমর্থিত হোয়েছে।

নরেন্দ্রমণ্ডলের মুখপাত্র নওনগড়ের জাম সাহেবের বক্তৃতায় মনে হয়, বড়লাটের উপদেশ অথবা নির্দেশ তাদের মর্মে পৌঁছায়নি।, তাঁর বক্তৃতায় আছে শুধু কংগ্রেসের দেশীয় রাজ্যে আন্দোলনের (outside interference) বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন উষ্মা ও সার্ব্বভৌম শক্তি (Paramount Power) ও সামন্তনৃপতিদের সহিত পুঁথিগত সম্পর্কের পুরাণো বুলি।

আমাদের বিশ্বাস বড়লাট সামন্ততন্ত্রের যেটুকু আবরণ উন্মোচন করেছেন তা নিছক দেশীয় রাজ্যের প্রজার শুভকামনায় নয়। দেশীয় রাজ্যে শাসন সংস্কার কোরে, ফেডারেশন সামান্য রদ-বদল কোরে, কংগ্রেসের জাতীয় পন্থীদের সন্তোষ বিধান করবার মহৎ সংকল্প বড়লাটের সমগ্র হৃদয় মন জুড়ে আছে। বড়লাটের স্পষ্ট ভাষণের পেছনে ফেডারেশন উঁকি দিচ্ছে।

ইঙ্গভারতীয় বাণিজ্য চুক্তি

বহুনিন্দিত অটোয়া চুক্তির নাগপাশ থেকে ভারতবর্ষের শিল্প-বাণিজ্যকে সুদীর্ঘ তিন বৎসরকাল পূর্ব্বে (১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে) মুক্ত করার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে পাশ হয়েছিল এবং সেই থেকেই ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্য চুক্তির কথা সুরু হয়। অন্যূন তিরিশ মাসের বিরক্তিকর আলাপ আলোচনা, ঘরোয়া বৈঠক, পক্ষ-প্রতিপক্ষের দাবী ও পাল্টা দাবী সম্বলিত চুক্তিপত্রের যে অদ্ভুত সর্ত্তাবলী গত ২০শে মার্চ প্রকাশিত হয়েছে তা বৃটিশ পুঁজিবাদিদের স্বার্থ সংরক্ষণের একটা সুকৌশল চেষ্টা সন্দেহ নেই। ল্যাঙ্কেশায়ারের মরণোন্মুখ বস্ত্রশিল্পকে বাঁচাবার নিমিত্ত বৃটিশ স্বার্থান্ধতা চুক্তি-পত্রটিকে প্রতিপদে কলঙ্কিত করেছে। সাধারণের চক্ষে ধূলি দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে "মোট সমস্ত বৃটিশ-পণ্য আমদানীর শতকরা ১৬ ভাগ—দামের দিক দিয়ে দেখতে গেলে ১৮ ভাগ—এই চুক্তিপত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেখানে শতকরা ৮২ ভাগ ভারতীয় পণ্য বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে বিনা শুল্কে প্রবেশ করছে।" কাজেই সর্ত্তটি কত ভুয়া তা সহজেই বুঝা যায়। ভারতবর্ষ আমদানী করে তৈরী মাল (finished goods) আর রপ্তানি করে কাঁচামাল যাহা বিনাশুল্কে আমদানীকারী দেশের নিজ নিজ স্বার্থের খাতিরে নিতে হয়।

অটোয়া চুক্তির শতাধিক (ঠিক সংখ্যা ১০৬) দ্রব্যের তালিকাকে খাটো করে নতুন ব্যবস্থায় মাত্র ২০টিতে দাঁড় করানো হ'য়েছে। শুধু তাই নয়, তালিকাভুক্ত দ্রব্যগুলোকে এমনভাবে বাছাই করা হয়েছে যাদের দেশীয় কোন উৎপন্ন দ্রব্যের সাথে প্রতিযোগিতা কর্ত্তে হয় না।

ইঙ্গভারতীয় চুক্তিপত্রের প্রাণবস্তু ল্যাঙ্কশায়ারের স্বার্থ-সংরক্ষণ। ১৯৩৬ সালের মে মাস পর্যন্ত টেরিফ বোর্ডের সুচিন্তিত অভিমত অনুসারে বিলাতী বস্ত্রের উপর শতকরা ২৫৲ টাকা আমদানী শুল্ক ধার্য ছিল। সে বৎসর জুনমাস থেকে তা ২০৲ টাকায় নামানো হয়, এক্ষণে যে ব্যবস্থা

দাঁড়াচ্ছে তাতে ওটা কমে ১২॥ টাকায় পৌঁছাবে সন্দেহ নেই। কারণ যে বৎসর ৩৫ কোটি গজের অধিক বিলাতী কাপড় আমদানী না হ'বে তার পর থেকে ৪২ কোটি ৫০ লক্ষ গজ বিলেতী কাপড় আমদানী না হওয়া পর্যন্ত শুল্কের হার ২॥ টাকা হিসাবে কমে যাবে অর্থাৎ ১২॥ টাকা হবে, এ ব্যবস্থা তিন বছরের ভিতর রপ্তানী শুল্ক অর্ধেক করার একটা হীন চক্রান্ত বই কিছু নয়। এরই বদলে ১৯৩৯ সালে পাঁচ লক্ষ এবং পরবর্তী প্রতি বৎসর এর উপর আরো পঞ্চাশ হাজার গাঁট করে বেশী তুলা ইংলণ্ডকে ভারতবর্ষ হ'তে কিনতে হবে। কিন্তু ইহা এত সব নিয়মে উপনিয়মে বাঁধা যে কখনই কার্যকরী হবে না।

বিলেতী কাপড় আমদানী ও তুলো রপ্তানীর বর্তমান অবস্থায় এই চুক্তি ইংলণ্ডে কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণেরই চেষ্টার কারণ, ভারতীয় তুলা রপ্তানীর বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থাই হয় নি এবং রপ্তানী তুলার প্রকার ভেদ সম্বন্ধে চুক্তি পত্র একেবারে চুপ। বেঙ্গল, উমরা প্রভৃতি ছোট আঁশ বিশিষ্ট তুলার একটা বড়োরকমের ভাগ যদি ইংলণ্ড নিতে বাধ্য না থাকে তাহলে শুধু এ চুক্তিতে তুলা-চাষীদের কোন সুবিধা হবে না। কারণ ইংলণ্ড ভিন্ন ভারতীয় তুলার চাহিদা অন্য কোথাও নেই।

গত তিন বৎসরে গড়পরতা ২৬ কোটী ৬০ লক্ষ গজ কাপড় এদেশে এসেছে বিলেত থেকে. অথচ আমাদের চুক্তি পত্রে শতকরা ১৫ টাকা হারে শুল্ক ধার্য হয়েছে যদি অন্যূন ৩৫ কোটী গজ কাপড় আমদানী হয়। এর কম হইলেই শতকরা ১২॥% টাকা ল্যাঙ্কেশায়ারের কাপড়ের চাহিদা ৩৫ কোটি গজ হবার আশা দূরপরাহত বলা যায়, কাজেই ১২॥ হিসাবে শুল্ক ব্যবস্থাটাই মেনে নেবার জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে। আজকাল নানা কারণে এম্নিতেই ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অবস্থা খারাপ হ'য়ে পড়েছে। নতুন বাজেটে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার উপর বর্ধিত হারে শুল্ক ব্যবস্থায় উৎপাদন ব্যয় আরও বেড়ে যাবে সন্দেহ নাই। এমতাবস্থায় এই চুক্তির প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের টিকে থাকা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার হ'বে বলেই মনে হয়।

যা হোক্, লীগপন্থীদের নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন সত্ত্বেও দেশবাসীর নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যে এই অকল্যাণকর চুক্তিপত্র অনুমোদন করেনি এ সুখবর কিন্তু ল্যাঙ্কেশ্যায়ারের স্বার্থকে উপেক্ষা করবার মতন ক্ষমতা ব্রিটিশ ভারতের নেই। হয়তো প্রত্যাখাত চুক্তিপত্র জরুরী ক্ষমতার বলে চালু হ'বে।

পরিষদে ফাইনান্স বিল

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ফাইনান্স বিল ভোটাধিক্যে প্রত্যাখ্যাত হোয়েছে মুস্লিমলীগ দলের নব-অনুসৃত নিরপেক্ষা নীতি অবলম্বন সত্ত্বেও। দফাওয়ারীভাবে অন্যান্য বিভিন্ন প্রস্তাবগুলি বিবেচনার

সময় ও কংগ্রেস-পার্টিরই জয় হইয়াছে। পোষ্টকার্ডের মূল্য, লবণ শুল্ক আর আর বছরের ন্যায়, এবারেও সার্টিফিকেটের সাহায্যেই বজায় রাখ্‌তে হোল।

ফাইনান্স বিলে এবছর তিনটি ট্যাক্স প্রস্তাব। প্রথমতঃ, বিদেশ হইতে আমদানী কাঁচা তুলার উপর ট্যাক্স, দ্বিতীয়ত—খান্দ্‌সারী চিনির উপর ট্যাক্স, তৃতীয়তঃ—আয়কর সংক্রান্ত অতিরিক্ত ট্যাক্স প্রস্তাব। প্রথমোক্ত ট্যাক্স প্রস্তাবের হেতু প্রদর্শন কর্তে গিয়ে অর্থসচিব বলেছেন যে বাণিজ্যগুলির আয় অপ্রত্যাশিত ভাবে কমে যাওয়ার জন্যে ভারত গবর্ণমেণ্টের ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেটে অনেক টাকা ঘাটতি পড়্‌বে, এই ঘাট্‌তিটুকু পূরণ করবার জন্যে এই শুল্কবৃদ্ধি প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। এ থেকে পরোক্ষ লাভও নাকি যথেষ্ট হবে ভারতের তুলা চাষীদের। এ কৃষকদরদের পেছনে যে অনিষ্টকর চক্রান্ত বিলাসী মন ক্রিয়া কর্ছে বাজেটের অধিবেশনে দেশনেতারা তা সাবধানে প্রকাশ করে দিয়েছেন। প্রথম কথা, বাজেটের ঘাটতি ব্যাপারটাই আগাগোড়া গড়ানো। আয়ের দিকটা যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করে দেখানো হ'য়েছে। আয়কর ও চিনির উপর আমদানী শুল্ক ইচ্ছে করেই কম দেখানো হোয়েছে বলেই অর্থনীতিবিদ্‌দের মত। তর্কের খাতিরে ধরা গেলো ঘাটতি হোবেই, কিন্তু ঘাটতি পূরাবার কি অন্য পথ ছিল না? উর্দ্ধতন সরকারী কর্মচারীদের বেতনের উপর শতকরা ১০ টাকা হ্রাস কর্লে দু'শো লক্ষ টাকা বিনা আয়াসে মিল্‌তো। ইনকাম ট্যাক্স আইনের একটু রদবদল কর্লে অর্থাৎ "ডাবল্ ট্যাক্সেশনের রিলিফ" বাবত যা আয়কর বিভাগকে ছেড়ে দিতে হয়, তা নাকচ করে দিলে একশো লক্ষ টাকার সংস্থান হয়। কিন্তু বৃটিশ স্বার্থের সাথে যেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংঘর্ষ ঘটবে সেখানে তা হ'বার জো নেই।

এদিকে নূতন ব্যবস্থায় ভারতীয় সূক্ষ্মবস্ত্রের উৎপাদন মূল্য শতকরা ৩৬ টাকা বাড়্‌বে। এই সুযোগে সমস্ত শ্রেণীর কাপড়ের দাম ও অন্নবিস্তর চড়্‌তে বাধ্য। ফলে ল্যাঙ্কেশায়ার ও জাপানী মিলের কাপড় বাজারে প্রবেশ করবার সুযোগ পাবে। ভারতীয় মিলের পক্ষে এটা অত্যন্ত ভাব্‌নার কথা, বিশেষ করে যখন ইঙ্গ-ভারত চুক্তিতে সংরক্ষণের পরিমাণ অপ্রত্যাশিতরূপে কমিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। অন্যদিকে কংগ্রেস পরিচালিত প্রদেশে তাঁতশিল্পের পুনরুত্থান প্রচেষ্টা এই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অর্থশূন্য বিফলতায় পর্যবসিত হ'বে। নিখিল ভারতীয় ক্ষেত্রে এ অসমব্যবস্থার প্রতিকূলাচরণ কাটিয়ে ওঠা দুঃসাধ্য হ'বে সন্দেহ নেই কিন্তু বাংলাদেশের শিশুবস্ত্র-শিল্প যা শুধু সূক্ষ্মবস্ত্র নির্মানেই নিয়োজিত রয়েছে তার পক্ষে এ আঘাত হ'বে সর্বাপেক্ষা দুঃসহ প্রাণান্তকর।

খান্দসারী চিনির উপর ট্যাক্স প্রবর্তন কর্তে গিয়ে অর্থসচিব দেখিয়েছেন যে কুটিরশিল্পকে ও প্রয়োজন হ'লে তার থলেতে কিছু ধরে দিতে হ'বে, তা'তে তার নিজের অস্তিত্ব থাকুক আর নাই থাকুক। সামান্য লাখকয়েক টাকার জন্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে এমন করে শোষণ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হোয়েছে। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের মাঝে মাঝে এদের বেঁচে থাক্‌বার যোগ্যতা ও উপযোগিতা বিষয়ে দেশবাসী নিঃসন্দেহ।

শেষ প্রস্তাব, আয়কর ব্যবস্থা। কর্পোরেশন ট্যাক্স নির্বিচারে ছোটবড় কোম্পানীর উপর ধার্য করায় ছোট কোম্পানীগুলোর উপর যথেষ্ট অবিচার হোয়েছে। শতকরা ৬।০ টাকা ট্যাক্স দেওয়া দুর্বহ হ'বে একথা নিঃসন্দেহ। এদের অনেকে শতকরা ৬।০ টাকা কামাইতে পারে না। সুতরাং ২৫০০০৲ ট্যাক্স হোক্ ৩০০০০৲ হাজার টাকা হোক্ কোথাও একটা সুপারট্যাক্স ধার্যের নিম্নতম সীমারেখা টানা অবশ্য প্রয়োজন ছিল। নতুবা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতায় এরা অচিরে লুপ্ত হবে।

কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা

নির্বাচনের মুখবন্ধে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মতামতের স্বাধীনতা অঙ্গীকার করে বিপুল ভোটাধিক্যে কংগ্রেস প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশ ক'রেছে। অতঃপর, অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রীত্বগ্রহণ, প্রগতি-বিরোধী ব্যবস্থা রদ করে আমলাতান্ত্রিক পঙ্কিল আবহাওয়া দূর কোরবে—দেশ এই আশায় উন্মুখ হোয়েছিল। কিন্তু কম্যুনিষ্টপার্টি আজও নিষেধাজ্ঞার কবলে।

২০শে মার্চ্চ তারই প্রতিবাদ জানিয়ে দেশময় সভাসমিতি হোয়ে গেল। কংগ্রেস স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্রদূত কিন্তু কংগ্রেসী শাসন হৃত-স্বাধীনতা প্রত্যর্পণ ক'রতে পরাঙ্মুখ না হোলেও উন্মুখ নয়। কংগ্রেস শাসনের এই স্ববিরোধী ব্যভিচার আর কত কাল চলবে?

নিখিল ভারত কিষাণ কনফারেন্স

এ বৎসর গয়াতে আচার্য নরেন্দ্রদেবের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত কিষাণ কনফারেন্সের চতুর্থ অধিবেশন হোয়ে গেল।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই নিখিল ভারত কিষাণ সভা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হোয়েছে। কংগ্রেস শাসিত বিহার প্রদেশের নিয়মতান্ত্রিক মনোবৃত্তি সর্বপ্রথম কিষাণ সভাকে অপাংক্তেয় কোরতে চেষ্টা করে। কংগ্রেস-নিয়মতান্ত্রিকতার সহিত কিষাণ সভার বিভেদ সেই অবধি একটা সংশয়ের আবহাওয়া সৃষ্টি কোরে রেখেছে। কংগ্রেস ও কিষাণ সভার দ্বন্দ্ব বিহার ও যুক্তপ্রদেশে বিশেষ কোরে প্রকট হোয়েছিল। কিষাণ স্বার্থের প্রতি কংগ্রেসী মন্ত্রীদের উপেক্ষা,—বিহার ও যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস-জমিদার চুক্তি তার নিদর্শন—কিষাণ সভাগুলিকে কংগ্রেসী শাসনের বিমুখ কোরে তীব্র সমালোচকের পর্যায়ে এনেছে।

নরেন্দ্রদেবের অভিভাষণে কিষাণ সভা ও কংগ্রেসের পরস্পর সম্পর্কের ব্যাখ্যা খুবই সময়োপযোগী। আশাকরি কংগ্রেসী মন্ত্রীরাও এ-সম্পর্কে অবহিত হবেন। নরেন্দ্রদেব বলেছেন—

......"কিষাণ সভা কংগ্রেসের প্রতিযোগী নয় .. .. দুইটী

প্রতিষ্ঠানই পরস্পর পরিপূরক। ....কিষাণদের দৈনন্দিন সংগ্রাম ও অর্থনৈতিক স্বার্থসংরক্ষণ—কিষাণ সভার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ এই দুইটি।........বৃহত্তর স্বাধীনতা সংগ্রামে অপরাপর শ্রেণীর সহিত কিষাণদের সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। কংগ্রেস জাতীয় স্বাধীনতার প্রতীক এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংহতি।......কংগ্রেস ও কিষাণদের অন্যতম প্রতিষ্ঠান।......"

ইউরোপে আসন্ন প্রলয়

মাত্র একমাসের ব্যবধানে ইউরোপে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে। ফ্যাসিস্তত্বের অপ্রতিহত গতি মধ্যইউরোপের মানচিত্র বদলে দিয়েছে—দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ ও পরিবর্তনের অপেক্ষায় রয়েছে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লুপ্ত হোয়ে জার্মানীর সঙ্গে মিশে গেছে। হিটলারের অনুমোদনক্রমে হাঙ্গারী রুথেনিয়া দখল করে নিয়েছে। শ্লোভাকিয়ার কতকটা অংশ হাঙ্গারী কবলিত। হাঙ্গারী পোলাণ্ডের সীমান্ত অবধি পৌঁছে গেছে। ফলে অসহায় রুমানিয়া নাৎসী ভমকিতে বাধ্য হোয়ে আর্থিক স্বাধীনতা জার্মাণীর নিকট বিক্রয় কোরেছে। রুমানিয়া নামে মাত্র স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে নাৎসী গ্রাসের অপেক্ষায় দিন গুণবে।

মেমেল নাৎসী কবলিত, লিথুয়ানিয়া পঙ্গু। চেকোশ্লোভাকিয়ার অস্ত্র-সম্ভার ও রুমানিয়ার শস্যক্ষেত্র নাৎসী স্পর্ধা সপ্তম পর্দায় তুলে দিয়েছে। সোভিয়েট 'গোলাঘর' ইউক্রাইনের পথে পোলাণ্ড নাৎসী জার্মাণের চক্ষুশূল হোয়ে রয়েছে।

বলকান দেশগুলির উপর ইউরোপের দৃষ্টি নিবদ্ধ। ইতালীর অতর্কিত আলবানিয়া আক্রমণ নাৎসী নগ্নতার চরম অভিব্যক্তি। যুগোশ্লাভিয়াকে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে গ্রাস কোরবার বাসনা নিয়ে। বল্‌টিক সাগর থেকে কৃষ্ণসাগর (Black Sea) পর্যন্ত এক বিরাট ফ্যাসিস্তত্বের সম্ভাবনা ইউরোপের ভবিষ্যত শঙ্কাময় কোরে তুলেছে।

আজ স্পেনে গণতন্ত্র বিজিত। ইতালী ও জার্মাণীর প্রভাব স্পেনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

চেম্বারলেনের শান্তিতে অচপল বিশ্বাস ইউরোপে সর্বনাশ ডেকে এনেছে। এই ঘন দুর্যোগের পরেও চেম্বারলেন কেন এত শান্তিকামী হোলেন সে প্রশ্ন সাধারণতঃ ওঠে। কেনই বা তিনি শান্তির নামে ভীরুতার আশ্রয় নিয়েছেন, বার বার অবহেলিত হোয়েও ফ্যাসিস্ত সততায় বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, তার প্রধান কারণ হোল বিগত মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা। আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বাধলে ধনতান্ত্রিক দেশে আভ্যন্তরীণ বিপ্লব অনিবার্য। সেই বিপ্লবে ইংলণ্ডের পুঁজিবাদী সমাজ শুধু বিনষ্ট হবেনা, বিশাল সাম্রাজ্য এবং উপনিবেশগুলিও বিধ্বস্ত হবে। ভারত ও অন্যান্য অধীন দেশগুলিতে গণশক্তি সংঘবদ্ধ ও বৈপ্লবিক রূপ নিচ্ছে। এই অপ্রমত্ত জনশক্তি বিপ্লবকামী হোলে ভারতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের শেষচিহ্ন বিলুপ্ত হবে ইহা ধ্রুব। ভারত স্বাধীন হোলে ইংলণ্ডের অস্তিত্ব কিরূপ সঙ্কটাপন্ন

হবে তাহাও চেম্বারলেন এবং তার পৃষ্ঠপোষক প্রতিক্রিয়াশীল ধনিকসম্প্রদায় জানেন। ইহার উপর ইংরেজ চরিত্রের বিশেষত্ব হইল 'নিষ্ক্রিয় কালক্ষেপণ' (wait and see)। জার্মাণী ও ইতালীতে অনুরূপ অন্তর্বিপ্লব ঘটবে, কারণ গণশক্তির অসন্তোষ সেখানে ক্রমবর্ধমান। হিট্‌লার মুসোলিনীর স্বৈরাচারের ও সমরপ্রিয়তার প্রতিক্রিয়া অন্তর্বিপ্লবের পথেই দেখা দেবে। আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ভীতি ও সাম্রাজ্যচ্যুতির আশঙ্কা চেম্বারলেনকে বিভ্রান্ত কোরে শান্তিবাণীর ধাপ্পার আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে।

ইউরোপের ভারসাম্য এই একমাসে প্রবলভাবে আলোড়িত হোয়ে গেছে। পূর্ব-ইউরোপে ফ্রান্সের ক্ষুদ্র মিত্রগুলি নাৎসী-কৃপার পাত্র। ফ্রান্সের চতুর্দিকে ফ্যাসিস্তজাল সুপ্রতিষ্ঠিত। ফ্রান্সের বর্তমান অবস্থার অনিশ্চয়তা লণ্ডনের 'টাইমস'এ লর্ড লোথিয়ান ব্যক্ত করেছেন—'বর্তমানে ফ্রান্সের সমূহ বিপদ, কারণ যদি ফ্রান্স বিজিত অথবা পঙ্গু হয় ইউরোপের তথা বিশ্বের কর্তৃত্ব বিজয়ীর সহজপ্রাপ্য হয়ে পড়বে'।

চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাসের অব্যবহিত পরে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট বুখারেষ্টে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুমানিয়া ও রুশ এই চতুঃশক্তির রণচুক্তির (military alliance) প্রস্তাব করেছিল। চেম্বারলেনের নিরুৎসাহে প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় নাই। রুশ গভর্ণমেণ্টের সহিত রণচুক্তি ক'রে ফ্যাসিস্ততন্ত্রের বিনাশ ঘটানো চেম্বারলেনের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই প্রকার বৃটিশশক্তির বিলোপে নিষ্ক্রিয় থাকাও তার পক্ষে অসম্ভব। ফ্যাসিস্ততন্ত্রের স্ফীতি ও বৃটিশসাম্রাজ্যবাদের স্থিতি পরস্পর বিরোধী—গতমাসের ঘটনার দ্রুত পরিবর্তনে এই সত্য আরও সহজ হোয়ে উঠেছে। একমাত্র চতুঃশক্তির আন্তর্জাতিক চুক্তি ফ্যাসিস্ত-অভিযান প্রতিরোধ করতে পারে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ফ্যাসিস্তবিরোধী মনোবৃত্তিই প্রবল। সুতরাং এই চুক্তিতে আমেরিকার সম্মতি পাওয়া অনায়াসসাধ্য হবে। চেম্বারলেনের সামনে আত্মরক্ষার এই একটি মাত্র পথ খোলা রয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়গণ

নেটাল ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি স্বামী ভবানী দয়াল দক্ষিণ-আফ্রিকায় প্রবাসী ভারত-বাসীদের অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। দক্ষিণআফ্রিকা ইউনিয়নের আইন পরিষদে বর্ণ বৈষম্যমূলক একটি প্রস্তাবের পরিকল্পনা উপস্থিত করা হোয়েছে। প্রস্তাবটি পাশ হোলে ভারতীয়দিগের জাতিক ও অর্থ-নৈতিক দুরবস্থা অনিবার্য। এইরূপ বর্ণ-বৈষম্য স্থাপনের আন্দোলন ১৯১৮ এবং ১৯২০ সালে আরো হোয়েছে। ১৯২০ সালের এসিয়াটিক তদন্ত কমিশন পৃথকীকরণের

বিরুদ্ধে তীব্র উক্তি কোরেছে। এরূপ ব্যবস্থা শুধু যে অন্যায় ও মানবতা বর্জিত তা নয়, এ এসিয়াবাসীদিগকে হেয় ও লাঞ্ছিত করবে এবং ইউরোপীয়দিগের মধ্যেও এর হীন প্রতিক্রিয়া সুরু হবে।' কিন্তু এর পর আবার ১৯২৪-২৫ সালে নূতন ভাবে বিল প্রবর্তিত হয়।

ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকায় এই বিলের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন হবার ফলে ১৯২৭ সালে ইউনিয়ন ও ভারত গবর্ণমেন্টের মধ্যে একটি সন্তোষ ও সম্মানজনক চুক্তি হয়। বর্তমানে উত্থাপিত বিলটি পূর্বের চেয়ে আরো কঠোর ও দমনমূলক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভারতের ব্যবস্থা পরিষদ ইউনিয়নগবর্ণমেন্টের বিলটি সম্বন্ধে কিছুই জানে না। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের স্বার্থ ও তদুদ্দেশ্যে আন্দোলন আমাদের জাতীয় স্বার্থ ও আন্দোলনেরই অংশ। স্বয়ং মহাত্মা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম আন্দোলনে ছিলেন প্রধান পুরোহিত। ভারতে জনমত প্রবল হোলে এবং ইউনিয়ন গবর্ণমেন্টকে অর্থ-নৈতিক চাপ দিলে শুধু এই বিল প্রতিরোধ করা যায়। অর্থ-নৈতিক চাপ সম্ভব হয় আফ্রিকান পণ্য বর্জন কোরে। কংগ্রেস এ উদ্দেশ্যে আন্দোলন সৃষ্টি কোরবে আশা করা যায়।

নির্বাসিত বিপ্লবীর মৃত্যু

প্রসিদ্ধ বিপ্লবী লালা হরদয়ালের আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া সহরে গত ৪ঠা মার্চ মৃত্যু হোয়েছে। পরাধীনতার তীব্রজ্বালা প্রথম জীবনে হরদয়ালকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ কোরে প্রবাসে স্বাধীনতা মন্ত্রের প্রচারে ব্রতী কোরেছিল। সে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বের কথা। লালাজীর স্বাদেশিকতায় প্রেরণা যুগিয়েছিল অক্সফোর্ডের আবহাওয়া ও স্বনামখ্যাত শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার ব্যক্তিত্ব। স্বাদেশিকতার দুর্বার বেগ লালাজীর চিন্তায় ও কর্মে বিপ্লবের জোয়ার এনে দিয়েছিল, ফলে শ্যামজীর সহিত মতভেদ ঘটেছিল। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ জীবনের আদর্শ কোরে ইউরোপে ও আমেরিকায় ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবাত্মক প্রচার উপলক্ষে লালাজী অদ্ভুত সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন—আমেরিকায় ভারতীয় বিপ্লবীদের সর্বজনবিদিত 'গদর' পার্টি তার নিদর্শন। শেষ জীবনে লালাজীর বিপ্লবী মন মানবতার সেবায় মুক্তি পেয়েছিল। কিছুদিন পূর্বে পাঞ্জাব ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় লালাজীর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কথা আলোচিত হয়েছিল। সেই সময় স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু লালাজীর মেধা, পাণ্ডিত্য ও শুভ্র ঔজ্জ্বল্যের যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন খুব অল্পসংখ্যক লোকেরই তা প্রাপ্য। স্যার তেজবাহাদুরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার থেকেই আমরা তখন জানতে পারি, দ্রষ্টা লালাজী বিপ্লবাত্মক কর্মপদ্ধতি ছেড়ে দিয়েছিলেন। স্যার তেজবাহাদুরের বিবৃতির পরে ভারত গবর্ণমেন্ট নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা আবশ্যক মনে করে নাই। সরকারের যুক্তিহীন অনমনীয়তা এক কৃতী সন্তানের পরিচর্যা থেকে দেশকে বঞ্চিত কোরলো।

স্যার নাজিমুদ্দিনের ত্রাস

পুলিশ বাজেটে দশ লক্ষ টাকার বাড়তি ব্যবস্থা ক'রে মঞ্জুরীর আশায় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাষ্ট্র সচিব 'বর্গীর আতঙ্ক' প্রচার করেছেন, অর্থাৎ 'টেররিজম' গুপ্তসমিতি প্রভৃতি বৈপ্লবিক উপাদান দেশে এখনও পূর্ণোদ্যমে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সাবধানী স্বরাষ্ট্র সচিব তাই পূর্ব্বাহ্ণেই প্রস্তুত।

পুলিশ বাজেটের অঙ্ক বৃদ্ধি করবার জন্য স্যার নাজিমুদ্দিনের অবলম্বিত কৌশল আমাদের নিকট অতি পরিচিত আমলাতন্ত্রী কৌশলের অপকৃষ্ট অনুকরণ। রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির অন্তরায় ঘটিয়েছিল গুপ্ত-সমিতি ও 'টেররিজমের' কপোল-কল্পনা। রাজবন্দীরা সেদিন মুক্তি পেয়েছে, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি আগামী কালের অনির্দেশ অপেক্ষায় আছে। এই অল্প সময়ের ব্যবধানেই মুক্ত বন্দীরা সংহতি ও সংগঠনে যথেষ্ট অগ্রসর হোয়েছে। স্যার নাজিমুদ্দিন দেশের এই সঙ্কট মুহূর্তে আইন ও শৃঙ্খলার গুরুদায়িত্ব নিয়ে দায়িত্ব সম্পাদনে বিমুখ হবেন না— এই সঙ্কল্প মূর্ত হোয়ে উঠেছে পুলিশ বাজেটে। স্যার নাজিমুদ্দিনের কল্পলোক বাংলাদেশের জনসাধারণের গোচরের অতীত।

ভারতের মুক্তি আন্দোলন আজ গণ-আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিগুলি কংগ্রেসে সংহত হোয়ে স্বাধীনতা আনবার জন্যে বদ্ধপরিকর। শ্রেণী স্বার্থের সংঘাত সমাজে যে ধনবৈষম্যের সৃষ্টি করেছে সাম্রাজ্যবাদ সেই অসম-ব্যবস্থা কায়েমী কোরে রেখেছে। সাম্রাজ্যবাদের বিলোপ তাই অনিবার্য। গণ-আন্দোলনের এই বিপ্লবীরূপ দেখে স্যার নাজিমুদ্দিন সন্ত্রাসবাদের মিথ্যা-বিভীষিকার আশ্রয় গ্রহণ করবেন তা আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করেনা। স্যার নাজিমুদ্দিনের বক্তৃতা শোষক ও শোষিতের স্বার্থ-বিভেদ স্মরণ করিয়ে দেবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন

সাহিত্য সাধনা এককের, বহুর ক্ষেত্রে এ সাধনা ব্যহত হয়; কিন্তু তা হোলেও এ কথা না স্বীকার করে পারি না যে সাহিত্য-সেবায় বহুর, বিভিন্ন মতাবলম্বীর সম্মেলনের প্রয়োজন আছে। গত উনিশ শতাব্দী হতে আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্য নানা বিশিষ্টরূপ ও বিভিন্ন পথকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে, সাহিত্য-সেবীগণ বাঙ্গলা সাহিত্যকে বিকশিত করার প্রচেষ্টায় রত। এ অবস্থায় আমাদের সে সকল প্রচেষ্টাগুলি সমগ্রভাবে ধরা পড়ে সাহিত্য সম্মেলনগুলির মারফৎ। আমাদের সমাজ-জীবনে অসংখ্য সমস্যা, রাষ্ট্রীয়পথ চিন্তা সঙ্কুল, সাহিত্যেও ধরা পড়েছে তার স্পন্দন, কুমিল্লা সাহিত্য অধিবেশনসম্পর্কে এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ অধিবেশন উপলক্ষে ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় যে অভিভাষণ পাঠ করেছেন

তাতে চিন্তার খোরাক আছে। আমরা তাঁর রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে বক্তব্যটী আলোচনা করতে চাই। বর্ত্তমানে হিন্দীভাষা সমগ্র ভারতের রাষ্ট্র ভাষারূপে স্বীকৃত হোয়েছে। ব্যাপকতা ও সহজ বোধ্য হিসাবে হিন্দীভাষার প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না, কিন্তু বাঙ্গলা ভাষার সপক্ষে তিনি যে সমস্ত যুক্তি দেখিয়েছেন তাও উপেক্ষনীয় নয়। যে প্রস্তাবিত হিন্দুস্থানীভাষা গড়ে উঠবে তার চেয়ে বাঙ্গলা ভাষার অনেক সাংস্কৃতিক ও সমৃদ্ধিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য রয়েছে, এবং বিস্তারের দিক দিয়েও শ্রদ্ধেয় সুনীতি বাবু উল্লেখ করেছেন যে ভারতবর্ষের অনেক ভাষাভাষীর মাতৃভাষা বাঙ্গলা এ অবস্থায় রাষ্ট্র ভাষা সম্বন্ধে নতুনতর সমস্যার উদ্ভব হয়।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ

কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইসচ্যান্সেলার ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সভাপতিত্বে বাঙ্গলার প্রাপ্ত-বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা-প্রচারের চেষ্টা আরম্ভ হোয়েছে। যে দেশে শতকরা ৯৩ জন লোক নিরক্ষর এবং গবর্ণমেন্ট যেখানে সম্পূর্ণ উদাসীন সেখানে জাতীয় কল্যাণের ব্যবস্থা জাতিরই করা উচিত। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়া পত্তনও বাইরের দানে, গবর্ণমেন্টের সাহায্য অতি সামান্য। কাজেই শিক্ষা প্রচারের প্রথম প্রচেষ্টা শিক্ষায়তনের বাইরে আরম্ভ হবে এ কিছুই আশ্চর্যের নয়। কংগ্রেস শাসিত দেশগুলিতে নিরক্ষতার বিরুদ্ধে অভিযান অনেক পূর্বেই আরম্ভ হোয়েছে। ইউনিভার্সিটির ছাত্র সমাজ জাতিগঠনের এই মহৎ কাজের ভার নিয়েছে, অত্যন্ত সুখের বিষয়। তাঁরা সেই উদ্দেশ্যে বিশবজ্ঞের তত্ত্বাবধানে শিক্ষান্তে আগামী ছুটিতে গ্রামে গিয়ে প্রাপ্ত-বয়স্কদের ভিতর শিক্ষা বিকীরণ করবেন। শুধু নিরক্ষরতা দূর করাই তাদের কর্তব্য নয়। এই গণসংযোগের ভিতর দিয়ে রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি এদের বুঝাতে হবে এবং জাতীয় সংচেতনা উদ্‌বোধিত কোরে বিপ্লবাত্মক আন্দোলন ও সংগঠনের ভিত্তিমূল স্থাপন কোরতে হবে। ছাত্রসমাজের নিকট এই আশা খুব বেশী নয়।

পরলোকে জলধর সেন

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সম্পাদক শ্রদ্ধেয় জলধর সেন পরলোক গমন করেছেন পরিণত বয়সে, সুতরাং তাঁর মৃত্যু আকস্মিক হোলেও অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু তাঁর অভাবে বাঙ্গলা সাহিত্য সেবীগণ যে একজন অকৃত্রিম সুহৃদকে হারিয়েছেন এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। স্বর্গত সাহিত্যিক তাঁর অমায়িক উদারতা ও অনাড়ম্বর সাহিত্য সেবায় বাঙ্গলাসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার কোরেছিলেন, সেজন্যই আজ তাঁর মৃত্যু আমাদের তার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছে। তিনি যে সাহিত্য-জগতের অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ ছিলেন সে কেবল তাঁর বয়সোচিত মর্যাদায় নয়

কিন্তু আজীবন সাহিত্য-সেবায় ও দরদী প্রাণের উজ্জ্বলতায়। তাঁর কর্মময় জীবনে তিনি একথাই প্রমাণ করেছেন যে তিনি বাঙ্গলা-সাহিত্যকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন ও বাঙ্গলা সাহিত্যিকদের আন্তরিক সুহৃদ ছিলেন, তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দান বাঙ্গলা-সাহিত্য-সেবীদের পক্ষে উপেক্ষনীয় তো নয়ই বরঞ্চ সাগ্রহে স্মরণীয়।

যেখানে বঙ্কিমপ্রমুখ সাহিত্য-সেবীদের যথোপযুক্ত সমালোচনা হয় নাই, সেখানে জলধর সেনের সাহিত্য-সেবার যে যথার্থ বিচার হবে না এ তার বেশী কথা নয়। কিন্তু তবু আমাদের মনে হয় সাহিত্যিক, সম্পাদক ও সাহিত্য-বন্ধু হিসাবে তাঁর সম্যক আলোচনা করা কর্তব্য তার ঋণী বন্ধুদের। কারণ বাঙ্গলা দেশের অনেক অখ্যাত বিখ্যাত সাহিত্যিক তার নিকট ঋণী। এখানে আমরা উল্লেখ করতে পারি শরৎচন্দ্রের কথা। বাঙ্গলা সাহিত্য শরৎচন্দ্র নিয়ে গর্ব করার সৌভাগ্যে অনাড়ম্বর প্রাণ জলধর সেনকে বিস্মৃত হতে পারবে না।

১৩ই এপ্রিল

বাঙ্গলার রাজনৈতিক বন্দীদের ভাগ্য আজও অপরিবর্তিত। কারাকক্ষের প্রাচীরের আড়ালে তারা বন্দীজীবন যাপন করছেন দেশকে ভালবাসার ও স্বাধীনতার আত্মাহুতি স্বরূপ। আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙ্গলার তরুণতরুণীরা আপন প্রাণের আবেগে যে পথকে বরণ করে নিয়েছিলেন তারপর অনেকদিন অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে দেশের অবস্থাও পরিবর্তিত হোয়েছে কিন্তু কারাকক্ষের অর্গল এখনও উন্মুক্ত হয় নাই। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের মোড় ফিরেছে। সে যুগে আর এ যুগের বাঙ্গলায় তফাৎ বিস্তর, তবুও একথা বিস্মৃত হোলে চলবে না যে শাসন সংস্কারে যে পরিবর্তন প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করেছে তার পশ্চাতে রয়েছে বাঙ্গলা দেশের এই সকল 'ক্রান্তিকারী' দলের আত্ম-বিসর্জী প্রাণের ত্যাগ ও কারাবরণ। কিন্তু সে সকল ইতিহাসের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমাদের প্রশ্ন এই যে সরকার কেন এদের আজও মুক্তি দিচ্ছে না, মুষ্টিমেয় বন্দীর মুক্তিলাভে ইংরাজ রাজ্যে কী নবতর বিপ্লব সাধিত হবে যে, বৃটিশ সাম্রাজ্য আতঙ্কে কম্পমান—না এর পশ্চাতে রয়েছে প্রতিহিংসা পরায়ণ মনোবৃত্তি? গত ১৩ই এপ্রিল গান্ধীর আশ্বাসবাণী তো ব্যর্থ হোয়ে গেলো এখন দেশবাসীর কী কর্তব্য। আমাদের এই বক্তব্য যে বাঙ্গলা দেশের এই দাবীকে সমগ্র জাতীর সমস্যা হিসাবে গণ্য করে তীব্র আন্দোলন করা। কিন্তু সে আন্দোলন যেন সুদৃঢ় নিয়ম ও কার্যপন্থা অনুসরণ করে।

ষ্ট্যালিনের বিশ্লেষণ

সোভিয়েট রাশিয়ার সাম্যবাদী দলের অষ্টাদশ কংগ্রেসের অভিভাষণে ষ্টালিন ইউরোপের বর্তমান সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতি এবং পুঁজিতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ সে সঙ্কটকে কিরূপে আসন্ন ও অনিবার্য

ক'রে তুলেছে তা বেশ সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। তার মতে ১৯২৯ হইতে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক সঙ্কটে জর্জরিত। ১৯৩৭ সালের সঙ্কট পূর্ববর্তী সঙ্কট হোতে বিভিন্ন, কারণ তা দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলার সময় তীব্র না হোয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রাক্কালে ঘনীভূত হোয়েছে। এ যুদ্ধের সূচনা আরম্ভ হোয়েছে আবিসিনিয়া, মাঞ্চুরিয়া, চীন, স্পেন প্রভৃতি দেশে এবং স্পষ্টতর রূপ নিচ্ছে অষ্ট্রিয়া, চেকশ্লোভেকিয়া ও মধ্য ইউরোপে। সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ড ও সাম্রাজ্য লিপ্সু ইতালী, জার্মেনী ও জাপানের স্বার্থসংঘাতে যুদ্ধকাল আরো আসন্ন হোচ্ছে।

হিটলার মুসলিনীকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় (appeasement policy) এবং 'নিরপেক্ষ' (non-intervention) নীতির পিছনে কোন দুর্বলতা বা যুদ্ধভীতি ইংলণ্ডের আছে কি না? ষ্ট্যালিনের মতে ইংলণ্ডের ধারণা এই যে অন্তর্যুদ্ধে লিপ্ত হোয়ে সাম্রাজ্যলিপ্সু ফ্যাশিস্ত রাষ্ট্রগুলি দুর্বল হবে। তখন তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইংলণ্ড ইচ্ছানুযায়ী সর্ত আদায় কোরতে পারবে। ('to allow belligerents to sink deep into the mire of war and when they become sufficiently weak to dictate their terms to the weakened belligerent nations.')

সপ্তম বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৬ | দ্বাদশ সংখ্যা

মার্কস্ ও মার্কস্‌বাদ

অনিমা দাস

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। এই সময়ে য়ুরোপে জাতীয়তাবাদ প্রবল। চারদিকে নূতন জাত গ'ড়ে উঠছে নব উদ্যমে। এই সময়েই আবার দেখতে পাই, সমাজতন্ত্রবাদ একটা নূতন রূপ নিয়ে ফুটে উঠল য়ুরোপের রাজনৈতিক গগনে। মার্কস্ ও তাঁর সহযোগী সুহৃদ এঙ্গেল্‌স্ সমাজ-তন্ত্রকে শক্তিমান করে তুললেন।

এর পূর্বেও সমাজতন্ত্রবাদ য়ুরোপে প্রচারিত হয়েছে। তাকে সাধারণতঃ কাল্পনিক (Utopian) বলা হয়ে থাকে। সেকালের কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিকেরাও কতকগুলো মত প্রচার করেছিলেন এবং তা কার্যকরী করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। বিশেষতঃ ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হচ্ছিল। কিন্তু কার্ল মার্কস্ ও ফ্রেডরিক্ এঙ্গেলস্‌ই একটি সুসম্বদ্ধ সমাজতান্ত্রিক মতবাদ এবং উহা কার্যকরী করার জন্য একটি রাজনৈতিক দল ও আন্দোলন গ'ড়ে তোলেন। এখানেই মার্কসের কৃতিত্ব এবং পূর্ববর্তী সমাজতান্ত্রিকদের থেকে তাঁর পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য। এর পর থেকেই আমরা দেখতে পাই, মার্কসের প্রবর্তিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ছে এবং বিগত পঞ্চাশ বৎসর যাবত সমাজে ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুলো কার্যকরী ও বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক মতবাদ গ'ড়ে উঠেছে এবং সমাজের বুকে প্রভাবশীল হয়েছে।

মার্কস্‌বাদ আলোচনা করতে হলে আগে মার্কস্‌কে জানা দরকার। মার্কসের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তার চিন্তার ক্রম-বিকাশ ও কার্যধারা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। ১৮১৮ সালে জার্মানীর রাইন প্রদেশের ট্রিভস্‌ শহরে কার্ল মার্কস্‌ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন ইহুদী আইনজ্ঞ এবং পিতামহ একজন 'রাব্বি' বা পুরোহিত। ইহুদী হলেও পরিবারটি শেষে খ্রীশ্চানধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ; তখন মার্কসের বয়স ছ' বছর। মার্কসের জন্মকালে আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। রামমোহনের আন্দোলন তখন পুরা দমে চলছে। মার্কস্‌ যখন তাঁর মতবাদ প্রচার করেন, সে সময়ে এদেশে একদিকে ব্রাহ্ম-আন্দোলন ও অপরদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুত্থান ও বৈধ রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে। মার্কসের প্রভাব তাঁর জীবিতকালে এদেশে আদৌ সম্ভব হয় নি, এমন কি ইংলণ্ডে পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর পরই যা কিছু প্রভাব সুরু হয়েছে—মার্কসের "ডাস ক্যাপিটালও" অনেক পরে ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রে য়ুরোপীয় অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক নেতাদের কিছু প্রভাব এবং তৎকালীন য়ুরোপীয় দার্শনিকদের পূর্ণ প্রভাব দেখতে পাই। মার্কসের শেষ বয়সের সমসাময়িক স্বামী বিবেকানন্দেও সমাজতন্ত্রের প্রভাব অনেকখানি ছিল।

সতের বছর বয়সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ ক'রে মার্কস্‌ কিছুদিন বন (Bonn) বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন। এই সময়ে তিনি অনেকগুলো বিষয়ে পড়াশুনো করেন ঃ দর্শন, আইন, ইতিহাস, সাহিত্য ও আর্ট। মার্কসের এক জীবনীকার লিখেছেন, "মার্কস্‌ লোকের সঙ্গে মেলামেশা ছেড়ে দিয়ে সারাদিন সারা রাত পড়াশুনায় ব্যস্ত হলেন। যা পড়তেন তার সারসংক্ষেপ করতেন, গ্রীক ও লাতিন থেকে অনুবাদ করতেন, বিভিন্ন দার্শনিক মত আলোচনা করতে সুরু করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিন ভল্যুম কবিতা লিখে ফেললেন।" এই সময়েই মার্কস্‌ কাণ্ট ও ফিক্‌টের দার্শনিক মত ছেড়ে ধীরে ধীরে হেগেলকে আশ্রয় করেছিলেন। অবশেষে হেগেলই তাঁকে পেয়ে বসল। তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে তিনি 'হেগেলের সাগরে ডুবে পড়লেন।' এমন কি একদিন তাঁর সাধের কবিতাগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেললেন।

মার্কসের জীবনে হেগেল একটা বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে হেগেলের মতবাদ চিন্তাশীল মনকেই প্রভাবিত করেছে। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত য়ুরোপে এই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল যে, জগৎ ও সমাজ শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়, অনড়। কিন্তু ঊনবিংশ শতক পরিবর্তন ও বিবর্তনকে স্বীকার করে নিলে। জগতের যা-কিছু সবই পবিবর্তিত হচ্ছে, সবই গতিশীল, সবই চলছে। এই চলমানের দর্শন একটি নূতন তর্কশাস্ত্রের প্রয়োজন বোধ করেছিল এবং হেগেল দিলেন তার 'ডায়েলেকটিক লজিক।' হেগেল বললেন, ইতিহাস একটি 'আইডিয়ার' বিকাশ। বিবর্তনের পথে একটির পর আর একটি পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে পৃথিবী এগিয়ে চলছে। এই পরিবর্তন বা অগ্রগতি ছুট্‌ছে বিরোধের ভেতর দিয়ে। মার্কস্‌ ইতিহাস বা সমাজের বিবর্তন ব্যাখ্যা করতে যেয়ে হেগেলীয় পদ্ধতিই হুবহু নিয়ে নিয়েছেন। হেগেলীয় পদ্ধতি নিলেও

দার্শনিক মতবাদের দিক দিয়ে উভয়েরই উল্টোমুখী গতি: হেগেল অধ্যাত্মবাদী আইডিয়ালিষ্ট, মার্কস্ জড়বাদী মেটেরিয়ালিষ্ট। এইজন্য মার্কস্‌কে 'মুখ-উল্টানো হেগেলীয়' বলা হয়। ১৮৪১ সালে মার্কস্ ডক্‌টরেট্ ডিগ্রী লাভ করে সংবাদপত্রসেবায় মন দিলেন। এই সময়ে রাইন প্রদেশে 'রাইনিশে জাইটুঙ্' নামে একখানি পত্রিকা উদারপন্থীরা বের করতেন। মার্কস্ শীঘ্রই এর সম্পাদক হলেন। এই সময়ে মার্কস্ অর্থনীতি অধ্যয়ন সুরু করেন। মার্কসের কাগজখানি প্রাগ্রসর মতের জন্য প্রুশিয় সরকারের কুনজরে প'ড়ে কিছুকাল পরেই উঠে যায়।

এই সময়ে মার্কস্ বিয়ে করেন এবং তাঁর তরুণী ভার্যাকে নিয়ে প্যারিসে আসেন। প্যারিসে মার্কসের সঙ্গে ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের আমরণ বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। এঙ্গেলসের বয়স তখন চব্বিশ বছর, মার্কসের ছাব্বিশ। এঙ্গেলস্ ইংলণ্ডের ম্যানচেষ্টারের এক মিলের মালিক ছিলেন। এমন আদর্শ বন্ধুত্ব পৃথিবীতে কমই দেখা যায়। বস্তুতঃ এঙ্গেলসের সহায়তা না পেলে মার্কস্ আজ মার্কস্ হয়ে উঠতেন কিনা সন্দেহ। তাহলে মার্কসের জীবনীকার ম্যাক্স বিয়ারের ভাষায় "মার্কস্ স্বীয় অকেজো অসহায় এবং দাম্ভিক মনোভাব নিয়ে সম্ভবতঃ নির্বাসনেই পচে মরতেন।" যেমন ব্যক্তিগত জীবনে তেমনি ভাব-ও-কর্ম-জীবনে এঙ্গেলস্ মার্কসের পরম সহায় ও সম্বল ছিলেন। এই বন্ধুদ্বয়ের জীবন, কাজ ও ভাব অভিন্নসূত্রে গাঁথা রয়েছে। মার্কস্ একবার এঙ্গেলস্‌কে লিখেছিলেন, "তোমা ছাড়া আমি 'ক্যাপিটাল' বইখানি কিছুতেই শেষ করতে পারতাম না। পর্বতের মতো বোঝা হয়ে এই কাজ আমার মনের ওপর চেপে বসেছিল। তোমার চমৎকার ক্ষমতাকে ব্যবসায়ে নষ্ট করেছ, মরচে ধরিয়েছ, তাই আমার কাজ এগিয়েছে।"

১৮৪৪ সালে মার্কস্ 'দি হোলী ফ্যামিলী' নামে একখানি পুঁথি লিখেন। এতেই আমরা মার্কসের পরবর্তী সুপুষ্ট মতবাদের উন্মেষ দেখতে পাই। ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ও শ্রেণীসংগ্রামের সুর এতে মিলে। কিন্তু ১৮৪৭ সালে সুবিখ্যাত 'কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো' বা সমানাধিকারীর ইস্তাহার-এ আমরা মার্কসের মতবাদের পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাই। এই সময়ে মার্কস্ ফরাসী গবর্ণমেণ্টের প্ররোচনায় প্যারিস ছাড়তে বাধ্য হয়ে ব্রুসেলস্ সহরে আসেন। প্যারিসে ১৮৩৬ সাল থেকে জর্মন শ্রমিকেরা 'লীগ অব দি যাষ্ট' নামে একটি সংঘ গড়েছিলেন। বছর কয়েক পরে এই লীগের হেড্ আফিস লণ্ডনে বদলি হয় এবং পরে এর নাম পাল্‌টিয়ে "লীগ অব দি কম্যুনিষ্ট" রাখা হয়। এই সমিতি একটি প্রোগ্রাম বা কার্যক্রম তৈরী করার ভার মার্কস্ ও এঙ্গেলসের ওপর দেন। কম্যুনিষ্ট ম্যানিফ্যাষ্টো সেই বিখ্যাত কার্যক্রম।

এই ইস্তাহারে মার্কস্‌বাদ সূত্রাকারে লেখা রয়েছে। একে চার ভাগে ভাগ করা যায়: প্রথম অংশে ধনতন্ত্রের অভ্যুত্থান এবং এর অনিবার্য ধ্বংসের কথা, দ্বিতীয় অংশে শ্রমিক ও সমাজতান্ত্রিক বা সমানাধিকারবাদীর সম্পর্ক, তৃতীয় অংশে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধবাদীদের প্রত্যুত্তর এবং শেষে একটি কার্যক্রম দেয়া হয়েছে।

কম্যুনিষ্ট ইস্তাহার বের হবার কিছু আগেই ফরাসী দেশে ১৮৪৮ সালের 'ফেব্রুয়ারী বিপ্লব' সুরু হয়। অন্যান্য দেশেও এই বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। অষ্ট্রিয়াতে ছাত্রদল এসেম্বলী হল চড়াও করে। সর্বত্রই শ্রমিকদের মনে নূতন আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু পরিশেষে বিপ্লব প্রশমিত হয়, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মাথা তুলে দাঁড়ায়। কম্যুনিষ্ট লীগের সভ্যরা গ্রেপ্তার হন এবং সঙ্গে সঙ্গে লীগও ভেঙে দেয়া হয়। কম্যুনিষ্ট লীগ ভেঙে গেল বটে, কিন্তু কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো শ্রমিক আন্দোলনের একখানি মূল্যবান দলিল হয়ে দুনিয়ার প্রভাব বিস্তার করছে।

১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর মার্কস্ কিছুকাল ফ্রান্সে ও জার্মানীতে থাকেন। তারপর লণ্ডনে চলে যান এবং সেখানেই জীবনের শেষ বছরগুলো কাটিয়ে গেছেন। এই সময়ে তাঁর দুটি কাজ কীর্তিমান হয়ে রয়েছে: একটি 'ক্যাপিটাল' নামক বিখ্যাত অর্থনৈতিক পুঁথি রচনা, অপরটি 'আন্তর্জাতিক' প্রতিষ্ঠা।

লণ্ডনের জীবন মার্কসের অনাড়ম্বর ও একটানা। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বিরাট গ্রন্থশালায় সারাদিন বসে বসে 'ক্যাপিটালের' মাল মশলা যোগাড় করেছেন। অভাব ও অনটনের সংসার, কিন্তু অসীম ধৈর্য নিয়ে কাজ ক'রে গেছেন। এমন দিন নাকি গেছে যখন তাঁর শেষ কোটটি বন্ধক রেখে লিখবার কাগজ কিনতে হয়েছে। এই সময়ে তাঁর সামান্য আয় ছিল পত্রিকায় লিখে এবং বন্ধুদের সাহায্যে। মার্কসের সহধর্মিনী সকল সংগ্রামের বড় সহায় ও বান্ধবী ছিলেন।

১৮৬৩ সালে লণ্ডনে একটি বিরাট সভায় রাশিয়ার পোলণ্ড আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। এই সময়ে অডগার নামে একজন ট্রেড্ ইউনিয়ন-নেতা নিয়মিত ভাবে কতকগুলো আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তাব করেন। ফলে ১৮৬৪ সালে ২৫শে হতে ২৮শে সেপ্টেম্বর লণ্ডনে একটি সম্মেলন ডাকা হয়। মার্কস জর্মন শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসেবে আহুত হন। লণ্ডনের সেন্ট মার্টিনস হলে এই সম্মেলনের অধিবেশন হয়। এটাই আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সম্মেলন (International Working Men's Association) বা সুবিখ্যাত প্রথম আন্তর্জাতিক (First International)। এই সম্মেলনের উদ্বোধন-অভিভাষণ মার্কস লিখেছিলেন এবং এর মূলনীতিও তাঁরই লেখা।

প্রথম আন্তর্জাতিকে আমরা প্রধানতঃ দুইটি ব্যক্তিত্ব এবং দুইটি মতবাদের সংঘর্ষ দেখতে পাই: একজন মার্কস, অপরে বাকুনিন, এক কমুনিজ্ম্, অপর এনার্কিজ্ম্ বা নৈরাজ্যবাদ। প্রথম আন্তর্জাতিকের অল্পস্থায়ী জীবন এই দুই মনীষীর বিরোধ ও দ্বন্দ্বে বিষিয়ে উঠেছিল এবং পরিশেষে আন্তর্জাতিকের অকাল মৃত্যুতে এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। এ ছাড়া ফরাসী সমাজতান্ত্রিক প্রুধোর সঙ্গেও বিবাদ কম হয় নি। একাধিপত্যপ্রয়াসী এবং জর্মন-অনুরাগী বলেও মার্কস অভিযুক্ত হয়েছেন।

প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার তিন বছর পরে ১৮৬৭ সালে, মার্কস তাঁর জীবনের কীর্তিস্তম্ভ 'ক্যাপিটাল' জর্মন ভাষায় প্রকাশ করেন। এতে 'ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রথার যুক্তিমূলক বিশ্লেষণ' করা হয়েছে। 'ক্যাপিটাল'কে কম্যুনিজমের বেদ বললেই চলে। উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য, অর্থ, মূলধন এবং এদের পরস্পর সম্পর্ক এতে আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া মার্কসের 'অতিরিক্ত মূল্য' (surplus value) সম্বন্ধে মতামত এবং ধনতন্ত্রের বিস্তার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। ক্যাপিটালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড তাঁর মৃত্যুর পর বিশেষ ভাবে এঙ্গেলসের চেষ্টায় প্রকাশিত হয়। মার্কস ক্যাপিটাল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে লিখলেও, নিছক বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে লিখেন নাই, লিখেছেন রাজনৈতিক প্রয়োজন-সাধনের উদ্দেশ্যে। তাই এই গ্রন্থে শ্রমিকের ওপর উৎপীড়নের এমন ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ও ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যা পড়লে পাঠক স্বতঃই ধনতন্ত্রের বিদ্বেষী হয়ে দাঁড়ায়। মার্কস এই গ্রন্থে দেখিয়েছেন, কি ভাবে ধনতান্ত্রিকতা শ্রমিককে শোষণ করে স্ফীত হয়ে উঠছে এবং পৃথিবীর সমগ্র অর্থ মুষ্টিমেয় ধনিকের হাতের মুঠে আবদ্ধ হচ্ছে। ফলে পৃথিবী-ব্যাপী কোটি কোটি লোক বঞ্চিত, রিক্ত, সর্বহারা। এরাই ধনতন্ত্রকে ধ্বংস করে নূতন সমাজের বনিয়াদ গড়বে—শোষণকারীরাই শোষিত হবে।

জীবনের শেষ কয়টি বছর মার্কস অসুখে বিসুখে ভুগেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই কার্যে মার্কসের দুই জামাতা অনেকখানি সাহায্য করেছেন। ১৮৮৩ সালের ৭ই মার্চ মার্কস লণ্ডনে মারা যান। এঙ্গেলস তখন তার এক আমেরিকান বন্ধুর নিকট লিখেছিলেন, 'মানব আজ মস্তিষ্ক হারাইল।'

মোটের ওপর মার্কসের জীবন তেমন ঝড়ঝঞ্ঝাময় বৈপ্লবিক ছিল না, যেমন ছিল তাঁরই সম-সাময়িক নৈরাজ্যবাদী বাকুনিনের। মার্কসের জীবন ছিল অনেকটা একনিষ্ঠ তপস্বীর ন্যায় ধীর ও শান্ত।

মার্কসবাদকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করিতে পারি: দার্শনিক, সমাজতান্ত্রিক ও অর্থ-নৈতিক। মার্কসবাদ আলোচনার মুখেই মনে রাখা উচিত, মার্কস উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তাঁর মতামত প্রচার করেন এবং সে-সময়ের প্রচলিত চিন্তাধারা দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হন। মার্কসের জীবনী-আলোচনায় আমরা তা কিছু কিছু উল্লেখ করেছি। কিন্তু আজকের বিংশ শতাব্দীর চতুর্থপাদে মানুষের চিন্তাধারায় প্রকাণ্ড বিপ্লব এনে দিয়েছে। বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব (সোসিওলজি), দর্শন ও অর্থনীতি নূতন রূপ নিয়েছে। এ নকার এই জ্ঞানোজ্জ্বল পারিপার্শ্বিকে গতশতকের মার্কসবাদের অনেকখানিই মরচে-ধরা হাতিয়ারের ন্যায় অকেজো ও পরিত্যজ্য হয়ে পড়েছে। আলোকসম্পাতে পুরাণোকে আঁকড়ে থাকার মোহ যুক্তিশীল চিত্তে ঠাঁই পেতে পারে না। তবে এ দেশে যেটুকু আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখা যায়, সে রাশিয়ার কার্যাকরী দৃষ্টান্ত ও এ দেশের মাটির ওপর এই মতবাদের নব-আবির্ভাব বলেই।

দার্শনিক মতের দিক্ দিয়ে মার্কসকে জড়বাদী বলা হয়:—অন্ততঃ তাঁর ভক্ত-শিষ্যগণ তা-ই প্রতিপাদন করতে ব্যগ্র। কিন্তু মার্কস নিজে জড়বাদী ছিলেন কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ

আছে। মার্কসের "ক্রিটিক্ অব্ পলিটিক্যাল্ ইকনমি" নামক পুঁথির ভূমিকায় একটি মাত্র উক্তিকে উদ্ধৃত করে মার্কসকে জড়বাদী বা মেটেরিয়ালিষ্ট প্রতিপন্ন করা হয়ে থাকে। কিন্তু উহাতে material conditions of life বা জীবনের অর্থনৈতিক অবস্থার কথাই বলা হয়েছে, দার্শনিক জড়বাদকে এর মধ্যে টেনে আনা নিতান্তই অপচেষ্টা ও হাস্যাস্পদ। এ বিষয়ে জি. ডি. এইচ্. কোল-রচিত "What Marx really meant" পুঁথিখানি উল্লেখযোগ্য। কোলের মতে মার্কসকে জড়বাদী না বলে বাস্তববাদী (realist) বলাই সমীচীন।

যা হোক, মার্কসকে জড়বাদী বলে প্রতিপন্ন করা হলেও, ভাষ্যকারগণ বলে থাকেন, মার্কসের জড়বাদ ডায়ালেকটিক জড়বাদ (Dialectic materialism), অষ্টাদশ শতকের যান্ত্রিক জড়বাদ (mechanistic materialism) নয়। ডায়ালেকটিক জড়বাদ বা চলমান্ জড়বাদ কথাটি অযৌক্তিক। হেগেল 'ডায়ালেকটিক আইডিয়ালিজম' প্রচার করেন। এর মানে আছে। যা চেতন, তা চলমান হতে পারে। কিন্তু জড়ের পক্ষে চলিষ্ণুতা অকল্পেয়। এ যেন অনেকটা আমাদের চলতি কথায় স্বর্ণময় পাথরের বাটী। হেগেলকে বিকৃত ও অপপ্রয়োগ করার এ এক চমৎকার দৃষ্টান্ত।

সমাজতাত্ত্বিক মতসমূহের মধ্যে প্রথমেই ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা উল্লেখ্য। মার্কসের পূর্বেও এ-মত আলোচিত হয়েছে, কিন্তু মার্কস একে চালু করেন। শুধু তাই নয়, একে কাজেও লাগান। এই অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাকে মেটেরিয়ালিষ্ট ব্যাখ্যাও বলা হয়ে থাকে। দুটোর মানে একই। এখানে মেটেরিয়ালিষ্ট ব্যাখ্যাকে জড়বাদী ব্যাখ্যা করলে ভুল করা হবে। মার্কসপন্থীরা প্রায়শঃই অর্থনীতিকে ইতিহাস্ গড়ার একমাত্র কারণ বলে থাকেন। অধিকাংশ সমালোচকই এই মতের প্রতিবাদ করেন। অনেক সময় মার্কস-এঙ্গেলসও বিরুদ্ধবাদীর আক্রমণে উত্যক্ত হয়ে, অর্থনীতির ওপরই জোর দিয়েছেন। ১৮৯০ সালে এঙ্গেলস একজন ছাত্রের নিকট লিখেছিলেন—"অনেকসময় দেখা যায় যুবকগণ অর্থনীতির ওপর অতিরিক্ত জোর দেন, যা অর্থনীতির প্রাপ্য নয়। এজন্য মার্কস ও আমিই দায়ী। আমাদের প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে যেয়ে অর্থনীতিকেই প্রবল শক্তি বলতে হয়েছে এবং সময় স্থান বা সুযোগ পাই নি অন্যান্য শক্তিগুলিরও তুল্য মর্যাদা দিতে—সবগুলি শক্তিই পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতে কাজ করছে।"

বস্তুতঃ মানুষের ইতিহাস বা সমাজের গড়ন ও প্রগতি এত সহজ নয়, যে একটিমাত্র শক্তি (factor) দ্বারাই তা সম্ভব হয়েছে। মানব-ইতিহাস জটিল ও বিচিত্র। তাকে সহজতম পন্থায় ব্যাখ্যা করার একটা মোহ থাকতে পারে, কিন্তু তা যুক্তির পথ নয়। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার লিখেছেন, "এই পারিভাষিক হিসাবে (অর্থাৎ relativityর হিসাবে) বলিতে চাই যে, আর্থিক ব্যাখ্যা-প্রণালীর স্বতঃসিদ্ধগুলিও 'রিলেটিভ' অর্থাৎ আপেক্ষিক।...কিন্তু মার্কস এঙ্গেলসের কট্টর সেবকেরা অবশ্য এই সকল সূত্রের আপেক্ষিকতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। কিন্তু বর্তমান লেখক মানবজীবনকে কোন এক খুঁটায় খাড়াভাবে দেখিতে, বুঝিতে বা ব্যাখ্যা করিতে অপারগ। একসঙ্গে বহু শক্তি জীবনকে পুষ্ট করিতেছে।" (পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র-ভূমিকা)।

অধ্যাপক সেলিগমান অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার যে বিবৃতি দিয়েছেন, তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন,—"ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার দ্বারা আমরা একথা বুঝবনা যে সমগ্র ইতিহাস একমাত্র অর্থনৈতিক পরিভাষাদ্বারা ব্যাখ্যাত হবে ......। অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার এ মানে নয় যে অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলোই একমাত্র প্রভাবশীল, বরং এ বলা উচিত যে সমাজের প্রগতির পথে এরা অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। (Economic Interpretation of History, ৬৭ পৃ:)।

মার্কস এই ব্যাখ্যাদ্বারা ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে ভাবী বিপ্লবের 'অবশ্যম্ভাবিতা' সম্বন্ধে 'ভবিষ্যদ্বাণী' করেন। অবশ্যম্ভাবিতা ও ভবিষ্যদ্বাণী—এ দুটি অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক শব্দ মার্কসের লেখায় মুদ্রাদোষের ন্যায় ছড়ানো রয়েছে ; বোধ হয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির চেয়ে আন্দোলনকারীর দৃষ্টিই (propagandists viewpoint) এক্ষেত্রে প্রবলতর।

এর পর মার্কসের অন্যতম মত শ্রেণী-সংগ্রাম। মার্কস শ্রমিক ও ধনিকের মধ্যে একটি অতলস্পর্শী বিরোধ স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, ধনবাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ দুই বিবদমান শ্রেণীতে বিভক্ত হবে। এক দিকে জগতের শোষিতদল, অন্য দিকে শোষক। দেশ বা জাতির গণ্ডিতে এরা সীমাবদ্ধ রইবে না—জগৎব্যাপী দুই আন্তর্জাতিক দলে পরিণত হবে। পৃথিবীর সমগ্র অর্থ মুষ্টিমেয় ধনিকের হাতে সঞ্চিত হবে এবং আর সবাই একেবারে নিঃস্ব সর্বহারায় পরিণত হবে। ধনিক ও শ্রমিকের সংঘর্ষের ফলে সমাজে শ্রেণীহীনতা আসবে। মানুষের ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশ।

মার্ক্সের এই সকল উক্তি যুক্তিসহ নয়, ইতিহাসের সমর্থিতও নয়। স্থূলতঃ সমাজে ধনী গরীবের বিভেদ ও সংঘর্ষ আছে, এ অস্বীকার্য নয়। কিন্তু যখন সমগ্র ইতিহাসকে শ্রেণীসংগ্রামেরই ফল বলা হয়ে থাকে, আপত্তি যত ওঠে এতেই। পূর্বেই বলেছি, ইতিহাসের জটিল ও বহুবিচিত্র টানা-বুনা কোন সহজ ও সুলভ পথে হয় নি। বার্ট্রাণ্ড রাসেল মার্ক্সবাদের নিম্নলিখিত সমালোচনা করেছেন : (১) জাতীয়তাবাদ ক্রমশঃ ক্ষীয়মান হয়ে আন্তর্জাতিকতার উদ্ভব হয়নি বরং জাতীয়তার উগ্ররূপই জগতে আজ দেখতে পাই। (২) পৃথিবীর সমগ্র অর্থ কতিপয় ধনিকের হাতে যেয়ে আবদ্ধ হয় নি, বরং যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে অসংখ্য মধ্যবিত্ত লাভবান হচ্ছে। (৩) মধ্যবিত্ত কারবার অনেক বেড়েছে। এ দুটো 'ভবিষ্যদ্বাণী'ই মার্ক্সের ভুল প্রতিপন্ন হয়েছে। (৪) মার্ক্স যে সময়ে পুঁথি লেখেন, তিনি ইংলণ্ডের শ্রমিকজীবনের দৃষ্টান্তই অধিকাংশ গ্রহণ করেন, তখনকার চেয়ে এখনকার শ্রমিকজীবন অনেক উন্নত হয়েছে, অধিকতর অবনত হয়নি। (৫) আজকাল অভিজ্ঞ শ্রমিকের মর্যাদা খুবই বেশী : এরাই শ্রমিকদের অভিজাত শ্রেণী সেজে আছে। (৬) দেখা যায়, সমাজ সম্পূর্ণ দুই বিরোধী দলে বিভক্ত না হয়ে কতকগুলো বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হয়েছে। (Roads to Freedom, পৃঃ ৪৩-৪৪)

এ ছাড়া মার্ক্সপন্থী বার্ণ্স্টাইনও অনেক যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন। বার্ণ্স্টাইনের কোন কোন মত অসঙ্গত ও অযৌক্তিক হলেও, এটা সত্যি যে শ্রমিকদেরও পিতৃভূমির জন্য টান আছে এবং সমাজতান্ত্রিকগণ উদারপন্থীদের বিরোধিতা করে সমীচীনতার পরিচয় দেন নি।

শ্রেণীসংগ্রাম সম্বন্ধে হ্যারল্ড্ ল্যাস্কি (যিনি অধুনা নিজেকে কম্যুনিষ্ট বলেই পরিচয় দিয়েছেন) কয়েকটি চিন্তাশীল কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন, ধনিক ও শ্রমিকের বিপ্লবের ফলে যে শ্রেণী-হীন সমাজই প্রতিষ্ঠিত হবে, তার যৌক্তিকতা কোথায় ? দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক শ্রেণীবিশেষের আধিপত্য লোপ পেয়ে অন্য ধরণের শ্রেণীর আধিপত্য তো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে—যেমন যে মতের প্রতিষ্ঠা হল সেই মতওয়ালা অভিজাতদের প্রাধান্য স্থাপিত হতে পারে ? তৃতীয়তঃ ক্ষমতার নেশার এমন মাদকতা আছে যে কম্যুনিষ্টগণ এর থেকে রেহাই পাবেন, তারই নিশ্চয়তা কি ? কাজেই তারা যে স্বেচ্ছায় অপরের উপর আধিপত্য করার মনোরম কার্যটুকু ছেড়ে দিয়ে নিঃশ্রেণিক সমাজ-প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবেন, তা কি বলা চলে ?" (Communism পৃঃ ৮৬-৮৭)

ল্যাস্কি শেষে বলেছেন, "His (Marx's) view is obviously built upon a confidence in rationalism which most psychologists would now judge to be excessive." (Ibid, পৃঃ ৮৬)—তাঁর (মার্কসের) মত গড়ে তুলেছেন যুক্তিবাদের ওপর আস্থা রেখে। কিন্তু আজকের অধিকাংশ মনস্তাত্ত্বিকই একে অতিরিক্ত বলে রায় দিবেন।"

মার্কসের অর্থনৈতিক মতবাদের মধ্যে তাঁর ভ্যালু ও সারপ্লাস ভ্যালু থিয়োরি (theory of value and surplus value) উল্লেখযোগ্য। মার্কস্ উনবিংশ শতাব্দীর রিকার্ডোর 'লেবার থিয়োরি অব্ ভ্যালু' গ্রহণ করেছিলেন। রিকার্ডো শ্রমকেই পণ্যের মূল্য নির্ধারণের একমাত্র উপকরণ ব'লে ধরেছিলেন। মার্কস্ও হুবহু তা-ই নিয়েছেন। কিন্তু আজকের অর্থনীতির ছাত্র মাত্রেই জানেন, বিগত শতকের এই মরচে-ধরা মত এখনকার অর্থনীতিবিদগণের পরিত্যক্ত হয়েছে। তবু যে এটার মোহ রয়েছে, তার কারণ রাজনৈতিক প্রয়োজন। মার্কসের চরিতকার ম্যাক্সবিয়ার যথার্থই লিখেছেন :

"For it is impossible to set aside the view that Marx's theory of value and surplus value has rather the significance of a *political and social slogan than an economic truth.* . . . . . It is with such *political fictions* that human history works. Marx's theory of value explains neither the vast and unparalleled accumulation of wealth nor movement of prices during the last sixty years.' (Life and Teachings of Karl Marx পৃঃ ১১৬-১৭)

মার্কস্বাদের অন্যান্য অঙ্গের আলোচনা এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সম্ভব হল না। যেটুকু আলোচিত হয়েছে, তাতে একটা প্রশ্ন মনে জাগে, এত ত্রুটি, অবৈজ্ঞানিকতা ও যুক্তিহীনতা সত্ত্বেও মার্কস্বাদ এমন ছড়িয়ে পড়ল কেন ? কি যাদু এতে, কোথায় এর শক্তি ? এর জবাবে একটি মাত্র কারণ বলব—সে রাজনৈতিক। শোষিত জনগণের আর্তনাদ সাড়া পায় বলেই মার্কস্বাদকে আঁকড়ে ধরতে চায়। এই আবেদন অন্তঃস্তলে ঘা দেয়। বছর দুই পূর্বে একজন সমালোচক মার্কস্ ও মার্কস্বাদ সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলেন, তাই উল্লেখ করা এখানে বোধ হয় অসমীচীন হবে না। "নিউ ষ্টেটস্ম্যান ও নেশন কাগজে" তিনি লিখেছিলেন :

"Marx is famous today for two reasons : first because few of his followers could read him and crude popularisations of his theories were produced, hopelessly unscientific but palatable to the semi-educated ; secondly because a series of fine slogans could be extracted from his works which stimulated an attitude of defiance to the old order and by the success of their mythological appeal proved (long before the coming of Hitler) that a political philosophy is not judged on its verifiability, but accepted for its emotive value. If it feels fire, it goes."

(New Statesman and Nation. dated 6th June. 1936).

"মার্কস্ আজ ২'টি কারণে বিখ্যাত : প্রথমতঃ, তার শিষ্যদের অল্পসংখ্যকই তাঁর লেখা বুঝতে পারত ; তাঁর মতগুলো নিতান্ত অবৈজ্ঞানিকভাবে জনসাধারণের উপযোগী করা হয়েছিল যা সহজেই অর্ধশিক্ষিতদের নিকট মনোজ্ঞ বলে মনে হয় : দ্বিতীয়তঃ, তাঁর লেখা থেকে কতকগুলি সুন্দর বুলি তৈরি করা যেতে পারত যেগুলো চল্‌তি সমাজকে অঙ্গুলি দেখাতে সাহায্য করতো—এগুলোর পৌরাণিক আকর্ষণে (অবশ্য হিটলারের আগমনের ঢের আগেই) এটাই প্রমাণিত হয় যে কোন রাজনৈতিক মতবাদের বিচার যৌক্তিকতা দ্বারা হয় না, হয় এর ভাবোদ্রেক শক্তির দ্বারা। যদি এর ভেতর আগুনের ছোঁয়াচ থাকে, তবেই এ চালু হয়।"

ভারতের রাজস্ব-নীতি

অধ্যাপক অনাথগোপাল সেন

আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় সমর-বিভাগ, সরকারী ঋণ, পুলিশ ও শাসন বিভাগের ব্যয় সম্পর্কে পৃথক্ ভাবে আলোচনা করিয়াছি—এবং দেখিয়াছি যে মোট রাজস্বের শতকরা ৯৬ ভাগই এই সবে নিঃশেষিত হইয়া যায়—এবং ফলে জাতিগঠনমূলক কার্য্যের জন্য আর অর্থের সংস্থান হয় না। ইহা যে কত দূর সত্য তাহাই আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রমাণ করিব।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য ব্যয়

কোন জাতির উন্নতি সাধনের জন্য সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন তাহার সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা। অর্থাভাব ও ঔদাসীনতার দরুণ এই অতি-প্রয়োজনীয় ব্যাপারেও কোনরূপ সুনিয়ন্ত্রিত ও ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করা আজ পর্য্যন্তও সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। ১৮৫৭ সাল পর্য্যন্ত—কোম্পানীর হাতে যত দিন শাসনভার ছিল তত দিন—শিক্ষার সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শ বা ব্যবস্থা কোন কিছুই ছিল না। শিক্ষার জন্য আলাদা ভাবে অর্থের বরাদ্দও করা হইত না। বৃটিশ পার্লামেণ্ট ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিবার পর স্থানীয় কর নির্দ্ধারণ দ্বারা কোন কোন প্রদেশে শিক্ষাদানের সামান্য ব্যবস্থা করা হয়; কিন্তু এই ব্যয়ের পরিমাণ অতি নগণ্য ছিল। ১৮৬৭ সালে সারা ভারতবর্ষে এই বাবদে ব্যয় হইয়াছিল মাত্র ৮৬ লক্ষ টাকা। ১৮৮২ সালে নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ভার মিউনিসিপ্যালিটি ও লোকাল বোর্ড সমূহের উপর অর্পণ করা হয় এবং তাহা-দিগকে সেই সঙ্গে শিক্ষাকর ধার্য্য করিবার অধিকারও প্রদত্ত হয়। কিন্তু তাহাদের আয় ও আর্থিক সচ্ছলতা এতই স্বল্প ছিল যে তাহার দ্বারা সুশিক্ষা কিংবা শিক্ষার উল্লেখযোগ্য বিস্তার আশা করা দুরাশা মাত্র ছিল। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া-ছিলেন বটে; কিন্তু তাহার ব্যবস্থাও প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য ছিল এবং এখনও নগণ্য বলা যাইতে পারে। মহামান্য গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও সে চেষ্টা ফলবতী হইতে অনেক দেরী আছে বলিয়াই মনে হয়। বিভিন্ন দেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তিনি তাহার একটি হিসাব (১৯১১ সালে) সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তাহা হইতে দেখা যায় যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মাথা পিছু ব্যয় করেন বার্ষিক ১৬ শিলিং; ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌স্ ১০ শিলিং; অষ্ট্রেলিয়া ১১ শিলিং ৩ পেনি; জার্ম্মানী ৬ শিলিং ১০ পেনি; ভারতবর্ষ ১ পেনিও নহে! ১৯৩৫ সালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপ্যালিটী ও লোক্যাল্ বোর্ড সকলে মিলিয়া সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার জন্য ব্যয় করিয়াছিল ১৫ কোটী, ৭০॥০ লক্ষ টাকা।

ইহাতে মাথাপিছু শিক্ষার জন্য বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ ॥০ আনা আন্দাজ দাঁড়ায়। সেই বৎসরের অন্যান্য দেশের হিসাব লইলে দেখা যায় যে, ইংলণ্ডে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৯৲ টাকা: ফ্রান্সে ১০৲ টাকা; যুক্তরাষ্ট্রে ৫৫৲ টাকা। এই প্রকার ব্যয়-বৈষম্যের ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, স্বাধীন ও সভ্য দেশের প্রায় সকল নর-নারীই লিখিতে পড়িতে জানে; কিন্তু ভারতবর্ষে সামান্য লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা শতকরা ৯·৫ ভাগ মাত্র। তন্মধ্যে ইংরেজী-জানা পুরুষ শতকরা ১ জন ও স্ত্রীলোক ·৩ জন মাত্র। ৪১১৩ বর্গমাইলের মধ্যেও ৫০ লক্ষ লোকের জন্য একটি মাত্র প্রথম শ্রেণীর কলেজ, ৩১৫ বর্গমাইল ও ৭৮,৩৬৫ জনের জন্য একটি উচ্চ বিদ্যালয়, ১০৩ বর্গমাইল ও ২৫,৫৯০ জনের জন্য একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৫ বর্গমাইল ও ১৩৫৫ জনের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভারতবর্ষে বিদ্যমান। ইহাদের শিক্ষা-প্রণালী ও ব্যবস্থার কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের আয়োজন যে কত সামান্য তাহা উল্লিখিত অবস্থা হইতে পরিষ্কার প্রণিধান করিতে পারা যাইবে।

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিভাগ

এই বিভাগের ব্যয় শিক্ষাবিভাগ অপেক্ষাও কম। ১৯৩৬ সালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্নমেন্ট সমূহের একত্রে এই বাবদে ব্যয় হইয়াছিল ৫॥০ কোটী টাকার কিঞ্চিৎ অধিক। ভারতের ভয়াবহ মৃত্যুর হারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে জাতির বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ব্যয়ের বরাদ্দ যে কত সামান্য তাহা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম হইবে। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের সহায়তায় কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, ম্যালেরিয়া, আমাশয় প্রভৃতি রোগ পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্য দেশ হইতে প্রায় বিতাড়িত হইয়াছে। যেখানে এ সব রোগ অল্পস্বল্প আছে, সেখানে বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক তাহার সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত রহিয়াছে। পানামা ও তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চল সমস্ত ম্যালেরিয়ার জন্য কুখ্যাত ছিল। সেই সব দেশ আজ ম্যালেরিয়া মুক্ত হইয়া স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত হইয়াছে। অথচ আমাদের দেশে শতকরা প্রায় ৪৪ জন একমাত্র ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে এবং প্রায় এক কোটী লোক প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া জীবন্মৃত অবস্থায় জীবন যাপন করে। বৎসরে প্রায় ৫ লক্ষ লোক বসন্ত ও কলেরা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অন্যান্য জ্বর রোগে মৃত্যুর সংখ্যাও বার্ষিক প্রায় ৪ লক্ষ। স্যার জন মিগাও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতের স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন তাহাতে তিনি অনুমান করেন যে, এক কোটী ত্রিশ লক্ষ লোক কুৎসিৎ ব্যাধিতে, বিশ লক্ষ লোক যক্ষা রোগে, ষাট লক্ষ লোক রাত্র্যন্ধতা রোগে ও ষাট লক্ষ লোক পূর্ণ-অন্ধতা রোগে এবং বিশ লক্ষ লোক পুষ্টিকর ও প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাবে রিকেট্‌স্ রোগে ভুগিয়া থাকে। এই সব ব্যাধির অধিকাংশই যথোচিত আহার্য্য ও প্রতিষেধক ব্যবস্থার অভাব হইতে উদ্ভূত হয়। সাধারণ স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া ভারতবাসীর অবস্থা আজ কতটা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা তাহাদের গড়পরতা আয়ুর পরিমাণ হইতে ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। ক্রমশঃ হ্রাস

প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে আমাদের আয়ুষ্কালের দৈর্ঘ্য দাঁড়াইয়াছে ২৩ বৎসর (গড়পরতা) মাত্র। অথচ জাপান, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের অধিবাসীগণের পরমায়ু ৪৫ হইতে ৬০ বৎসর। ভারতের শিশু-মৃত্যুর হারও মর্ম্মান্তিক রকমে অত্যধিক—হাজার করা ১৮৭ জন। অন্যান্য দেশে ইহার সংখ্যা হাজার করা ৩০ হইতে ৮০ পর্য্যন্ত। সকল বীমা কোম্পানীই ভারতবাসীর জীবন বীমার জন্য একটা অতিরিক্ত ফি আদায় করিয়া থাকে। কিন্তু সেই ব্যক্তিই যদি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপে বা আমেরিকায় বাস করিতে যায় তাহা হইলে তাহাকে আর এই অতিরিক্ত ফি দিতে হয় না! যে দেশের স্বাস্থ্য ও জীবনের অবস্থা এইরূপ সে দেশে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার জন্য কত অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু কার্য্যতঃ কর্ত্তৃপক্ষীয়দের চৈতন্যোদয়ের তেমন পরিচয় পাওয়া যাইতেছে কৈ? ১৯৩৫ সালে বৃটিশ ভারতে গবর্ণমেন্ট ও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষিত হাসপাতাল ও ঔষধালয়ের সংখ্যা ছিল ৬৭০০ অর্থাৎ ১৬৩ বর্গমাইলের ভিতর ও চল্লিশ হাজার নর-নারীর জন্য একটি মাত্র হাসপাতাল কিংবা ডিস্‌পেন্‌সারী। কয়েকটা বড় সহরের হাসপাতালগুলিকে বাদ দিলে অন্যান্য হাসপাতাল ও ডিস্‌পেন্‌সারীর আয়োজন ও ব্যবস্থা যেমন নিকৃষ্ট তেমনি অপ্রচুর।

কৃষিবিভাগ

ভারতবাসীর প্রধান অবলম্বন ও উপজীবিকা কৃষি। ভারতের যাহা কিছু শিল্পসম্পদ ছিল তাহা আধুনিক যন্ত্রদানব ও পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্রের নিকট উৎসর্গ করিয়া দিয়া আমরা অতি সামান্য অন্নবস্ত্রের জন্য একান্ত ভাবে কৃষির উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া আছি। এবং কৃষিসম্পর্কেও আজ পর্য্যন্ত আধুনিক-উন্নত রীতিনীতির কোন প্রকার ধার না ধারিয়া আমরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের হলকর্ষণের মধ্যে বাস করিতেছি। যাহাদিগকে শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থাই হয় নাই, নানা রোগে যাহারা নিত্য জর্জ্জরিত, দারিদ্র্য যাহাদের চিরসাথী, তাহারা গবর্ণমেন্টের আন্তরিক উৎসাহ ও সহায়তা ব্যতিরেকে কৃষি ও অন্যান্য বিষয়ে সকলের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ কি আছে? ১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত কৃষিসম্পর্কে গবর্ণমেন্টের কোন বিভাগই ছিল না। ১৯০৫ সালের পর কৃষির উন্নতি সাধন উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রদেশে একটি পৃথক্ কৃষিবিভাগ খোলা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কৃষককুলের সহিত এই বিভাগের আজ পর্য্যন্ত বিশেষ পরিচয় ও যোগ সংসাধিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ—উপকার তো পরের কথা। কৃষির উন্নতিমূলক 'গবেষণা'র প্রবর্ত্তন, আদর্শ কৃষি ফার্ম্ম্ প্রতিষ্ঠা ও গোটা ভারতবর্ষে দুই চারিটী কৃষি-কলেজ স্থাপিত হইয়াছে এবং এই সব কাজের জন্য উচ্চ বেতনের রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন সত্য; কিন্তু বিরাট কৃষকসম্প্রদায়ের প্রকৃত হিতসাধনে কিংবা কৃষি-সমস্যার সমাধানে ইহাদের দান কি পরিমাণ তাহা সূক্ষ্ম গবেষণা-সাপেক্ষ। ১৯৩৬ সালে এই বিভাগের জন্য মোট ব্যয় হইয়াছিল দুই কোটী ৭৭ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মোট ব্যয়ের শতকরা ১৩ ভাগ মাত্র!

শিল্প বিভাগ

বর্তমানকালে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শিল্প প্রতিযোগিতা কিরূপ ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং প্রত্যেক গবর্ণমেন্টই নিজ নিজ দেশের শিল্পের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য কত রকম ফন্দি-ফিকির উদ্ভাবন করিতেছে, নানা দেশের সহিত কত প্রকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক চুক্তি করিতেছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কতভাবে সহায়তা করিতেছে, তাহা আমরা চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু আমাদের দেশে অল্পদিন হইল গবর্ণমেন্ট একটি বাণিজ্য-বিভাগ খুলিয়াছেন বটে; কিন্তু ইহার কাজের মধ্যে—ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করা, শিল্পক্ষেত্রে চাহিদা মাফিক কিছু উপদেশ দেওয়া এবং কয়েকটি কুটীর শিল্পের উন্নতি-বিধান সম্পর্কে আধুনিক রীতি-নীতির কথা প্রচার করা। যেখানে এক একটা সুপারম্যান বা ডিক্‌টেটর অমিতবিক্রমে প্রবল ঝড়ের বেগে সমস্ত দেশকে প্রকম্পিত করিয়া একটা সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনার মধ্য দিয়া দেশের শিল্প ও সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য কাজে মাতিয়াছে, সেখানে একটা বিরাট ও প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সমাসীন মৃতকল্প জাতির শিল্পোন্নতি চেষ্টার নামে যাহা করা হয় তাহা না করিলেও দেশের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হইত বলিয়া মনে হয় না। ১৯৩৩ সালে সরকারী শিল্প-বিভাগের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তাহা মোট ব্যয়ের শতকরা ৪ ভাগ মাত্র।

দুর্ভিক্ষের প্রতিকার

ইংরেজ শাসন আমলে আমরা সভ্যতার আলো প্রাপ্ত হইয়াছি ইহা তাঁহারাও প্রচার করেন এবং আমরাও বিশ্বাস করি। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা ও আলোক প্রাপ্তির সাথে সাথে অন্যান্য সুসভ্য ও আলোক প্রাপ্ত দেশের ন্যায় অকাল মৃত্যু ও মহামারীর হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে অধিকতর সুখের বিষয় হইত না কি? অবনতি ও নিঃস্বতার এমন চরম সীমায় আমাদের অবস্থান যে সামান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগেও দেশের শত সহস্র লোক অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে তাহাদের হেয় মানবলীলা সম্বরণ করিতে বাধ্য হয়। ১৮৭৭ সাল পর্য্যন্ত এই সব মহামারী ও দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য গবর্ণমেন্টের কোনরূপ আলাদা তহবিল ছিল না। সুচিন্তিত কোন নীতিও ছিল না। সাধারণ তহবিল হইতে প্রয়োজনমত অর্থব্যয় করা হইত। পৃথক তহবিল না থাকায় ভয়াবহ দুর্দ্দিন যখন উপস্থিত হইত, তখন সাধারণ তহবিলের অর্থ হইতে ইহার প্রতিরোধ বা প্রতিকার সামান্যই হইতে পারিত। তাই ১৮৭৭ সালের পর হইতে প্রতি বৎসর দেড় কোটী টাকা এই বাবদ পৃথক করিয়া রাখা হইতেছে। অবশ্য এই তহবিলের টাকা পরবর্ত্তীকালে অনেক সময় রেলওয়ে নির্ম্মাণ, সেচখাল খনন ও পূর্ব্ববর্ত্তী ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে এবং এখনও হইয়া থাকে। ১৯১৯ সালের মনটেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার আমলে আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষের

প্রতিকারের জন্য যে প্রদেশে যত টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহার দুই-তৃতীয়াংশ ভারত গবর্ণমেন্ট ও এক-তৃতীয়াংশ প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টকে বহন করিতে হইয়াছে। অবশ্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট তাহার দেড় কোটী টাকার তহবিল হইতে প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টকে তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী একটা অংশ দান করিতেন। ১৯১৯ সালের পর প্রত্যেক প্রদেশ নিজেদের জন্য এই বাবদ আলাদা তহবিলের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হন এবং ইহার নাম হয় "ফ্যামিন ইন্‌সিওরেন্‌স্ ফণ্ড।"

দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিকারের জন্য যে ব্যবস্থা আমাদের দেশে অবলম্বিত হইয়া থাকে তাহা আদৌ প্রয়োজনের অনুরূপ নহে। প্রথমতঃ ১৮৭৭ সালের পর দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকের সাহায্যের জন্য সর্ব্বপ্রথম দেড় কোটী টাকার একটি স্বতন্ত্র তহবিলের সৃষ্টি হয়। ইহা ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র, দুর্ভিক্ষবিধ্বস্ত বিরাট দেশের পক্ষে যথেষ্ট নহে ; তদুপরি এই তহবিলের টাকা অন্যান্য বাবদেও ব্যয় করা হইয়া থাকে। তারপর কোন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে কর্ত্তৃপক্ষ ইহা সহজে স্বীকার করিতে চাহেন না। পরিশেষে অবস্থা প্রকৃতই অত্যন্ত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইলে কর্ত্তৃপক্ষ যখন দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করিয়া সাহায্যদানে অগ্রসর হন, তখনও সাহায্যের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় সাধারণতঃ অত্যন্ত কম হইয়া থাকে। মোট কথা, মানুষ যখন অনাহারে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া মৃত্যুর সম্মুখীন তখনও যতটা ঐকান্তিক চেষ্টা ও সাহায্যের প্রয়োজন তাহা প্রায়ই পাওয়া যায় না। এদিককার কয়েক বৎসরের হিসাব দৃষ্টে দেখা যায় যে ঠিক দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্য গবর্ণমেন্ট প্রতি বৎসর ১০।১২ লক্ষ টাকার অধিক খরচ করেন নাই।

পরিশেষে

ইহাই আমরা উল্লেখ করিতে চাই যে, গবর্ণমেন্ট প্রজাসাধারণের নিকট হইতে নানা উপায়ে যে অর্থ বা রাজস্ব আদায় করিয়া থাকেন তাহার অধিকাংশই ঋণের সুদ দিতে, সমর-বিভাগ, শাসন-বিভাগ, পুলিশ ও জেল-বিভাগের ব্যয় বহন করিতে শেষ হইয়া যায়। মানুষের মত বাঁচিবার জন্য জাতিকে তৈরী করিবার যে বিপুল ও বিস্ময়কর আয়োজন দেশে দেশে চলিয়াছে তাহার কোন কিছু করা এখানে সম্ভবপর হয় না। আধুনিক সুসভ্য দেশগুলিতে দরিদ্র, বেকার, বৃদ্ধ, পীড়িত—প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য গবর্ণমেন্ট কত চিন্তা করিতেছেন, কত রকম সুব্যবস্থা করিতেছেন। Unemployment relief, poorlaw relief, old age pensions, sickness insurance প্রভৃতি তাহারই দৃষ্টান্ত। দেশের কোন মানুষ কোন অবস্থায় যাহাতে একেবারে অসহায় হইয়া না পড়ে সেজন্য তাহাদের ভাবনার অন্ত নাই, নব নব পরিকল্পনা ও আয়োজনের অভাব নাই। কিন্তু আমাদের দেশের অসহায়দের শেষ আশ্রয়, অগতির গতি—ভগবান।

(সমাপ্ত)

১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দ

খরচের জায়	বৃটিশ ভারতের জনপ্রতি সরকারী খরচ
সমর-বিভাগ	৸/৭
পুলিশ, জেল, বিচার-বিভাগ	।৶১১
শিক্ষা-বিভ	।৶
চিকিৎসা ,,	৵৩
স্বাস্থ্য ,,	৶১১
কৃষি ,,	/৭
শিল্প ,,	৶৬
বৈজ্ঞানিক-বিভাগ	৶৫

আর একটি খরচের হিসাব

(প্রতি হাজার লোকের জন্য)

বৎসর	শাসন সংক্রান্ত ব্যয়	জাতি গঠন মূলক ব্যয়	কর-ভার
১৮৭৬	১৮১০৲ টাকা	১৫৯৲ টাকা	১৯৭৪৲ টাকা
১৮৮৬	২১০৮৲ ,,	১৬৬৲ ,,	২০৭৩৲ ,,
১৮৯৬	২১৪২৲ ,,	২০১৲ ,,	২২০৫৲ ,,
১৯০৬	২৪৬২৲ ,,	২৭৭৲ ,,	২৫৬২৲ ,,
১৯২১	৪৫১১৲ ,,	৫৮৩৲ ,,	৫১৯৬৲ ,,
১৯২৯	৪২১০৲ ,,	৮৭৬৲ ,,	৫৪০২৲ ,,

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ব্যয়

	১৯২১-২২		মোট ব্যয়ের অংশ (শতকরা)	১৯৩৫-৩৬		মোট ব্যয়ের অংশ (শতকরা)
	কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট	প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট		কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট	প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট	
রাজস্ব আদায়ের সরঞ্জামী খরচ	৫,২৭ লক্ষ	১১,৬৯ লক্ষ	৭·৬	৪,১১ লক্ষ	৮,৫৩ লক্ষ	৬·৭
লবণ ও অন্যবিধ কেপিট্যাল খরচ	×	×	×	১২ ,,	৮ ,,	·০২
রেলওয়ে রেভিনিউ একাউণ্ট	২২,৩০ ,,	৩ ,,	১০·৯	৩১,৯৮ ,,	৫০ হাজার	১৫·২
রেলওয়ে কেপিট্যাল একাউণ্ট	×	৩১ ,,	·১	×	×	×
সেচ-বিভাগ প্রভৃতির রেভিনিউ একাউণ্ট	১৪ ,,	৪,০৭ ,,	১·৮	২ ,,	৬,৬৯ লক্ষ	৩·০
সেচ-বিভাগের কেপিট্যাল একাউণ্ট	১২ ,,	১,১১ ,,	·৫	৩, হাজার	২ .	·০২
পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ রেভিনিউ একাউণ্ট	৫৭ ,,	×	·১	৭৯ লক্ষ	×	·৩
পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ কেপিট্যাল একাউণ্ট	১,০৯ ,,	×	·৬	৬১ হাজার	×	·০০৩
সাধারণ ঋণের সুদ	৩০,০০ ,,	২৭ ,,	১৩·৯	২৮,০১ লক্ষ	৮,৭৬ ,,	২২·৫
বাদ সুদ বাবদ রেলওয়ে	১৫,৬৩ ,,	৩ ,,	×	৩০,১৮ ,,	৫০ হাজার	×
,, ,, ,, সেচ-বিভাগ	১২ ,,	২,৬০ ,,	×	৩ ,,	৬,০০ লক্ষ	×
,, ,, ,, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ	৫৭ ,,	×	×	৮১ ,,	×	×
,, ,, ,, লবণ-বিভাগ	×	×	×	৪ ,,	×	×
,, ,, ,, প্রাদেশিক ঋণ-তহবিল	×	×	×	৭,৯৩ ,,	×	·
,, ,, ,, বন বিভাগ	×	৯১ হাজার	×	৭২ হাজার	১৪ ,,	·
,, ,, ,, শিল্প-বিভাগ	×	×	×	×	×	×
অবশিষ্ট দেয় (সাধারণ ঋণ বাবদ)	১১,০৯ ,,	৯৩ লক্ষ	×	–৯৬ লক্ষ	১,২২ ,,	×
অন্যান্য বাবদ সুদ	২,৬০ ,,	×	১·১	১১,৪৬ ,,	৩ ,,	৫·৫
ঋণ পরিশোধ	২,৩০ ,,	৯ ,,	১·১	৩,০০ ,,	১,৩৩ ,,	২·৮
সাধারণ শাসন-বিভাগ	১,৯৩ ,,	৮,৪১ ,,	৪·৬	১,৭০ ,,	১০,৩৬ ,,	৫·৭

অরণ্যকুসুম

নিশিকান্ত

অন্তহীন অরণ্যের সুনিবিড় গভীর অন্তরে
একটি কুসুম ফোটে, দুলে ওঠে একটি পল্লব,
একটি ভ্রমর শুধু সেথা এসে মধুপান করে,
একটু বাতাসে দোলে সে গোপন ঝুলন-উৎসব।

সেথায় স্পন্দিয়া ওঠে অদিগন্ত অরণ্যের প্রাণ ;
সীমার বন্ধনে সেথা মূর্ত্ত হয় মুক্ত অসীমতা,
সেথায় অমৃত বহে জীবনের ফুল্ল-অভিযান,
মাধুরীহিল্লোলে দোলে ক্ষণিকের পরম-পূর্ণতা।

হে অনন্ত, মোরে তব অন্তহীন বিশাল হৃদয়ে
স্পন্দিত করিয়া তোলো শুধু তব একটি নিঃশ্বাসে,
মূর্ত্ত করো প্রসূনের প্রস্ফুটিত একটি নিলয়ে
একটি পাতার পুটে মর্মরিত একটু বাতাসে।

একটি ভ্রমর হ'য়ে করো তুমি মোর মধু পান,
চিরন্তন স্পর্শে লও ক্ষণিকের এই আত্মদান।
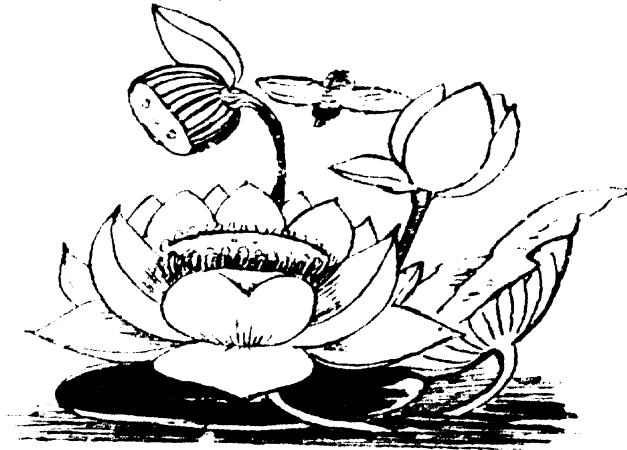
একতান্ত্রিক সংহতি

অতীন্দ্রনাথ বসু

বিশ্বযোড়া যে সমরযজ্ঞের অনুষ্ঠান আজ দেখা যাচ্ছে তার পুরোহিত ডিক্টেটরগণ। এই ডিক্টেটরেরা এক এক দেশে এক এক বেশে দেখা দেন। সৈন্য, দণ্ড এবং দল এই ত্রিরূপ একাত্ম শক্তির জোরে কখন তারা জুলুম ক'রে জনমত গড়েন। দণ্ডনীতির চেয়ে সয়তানীটা যাঁদের ধাতসহ তাঁরা জনমতকে রাজনীতিক চালে নিয়ন্ত্রণ করেন, শান্তি, ঐক্য প্রভৃতি কথার চাতুর্যে নিজেদের স্বার্থ ও প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখেন। দেশে দেশে ঘরে বাইরে আগুন দিচ্ছে এই দুই শ্রেণীর ডিক্টেটর।

নিরস্ত্র, পরাধীন দেশ ভারতবর্ষ,—এর জাতীয় প্রতিষ্ঠানে বেয়নেটের জুলুম অচল। জুলুম এখানে সাত্ত্বিক প্রকৃতির। আমার অন্তরদেবতার বিধিনির্দেশ মেনে চলতে পারো ভালো, না মানো ত' অনশনে দেহরক্ষা করবো কিংবা তোমাদের আমার আশীর্বাণী থেকে বঞ্চিত করবো। এই অহিংস, সত্যাগ্রহী জুলুম ফাসিস্ত-গোষ্ঠীর অনায়ত্ত। পুরুষানুক্রমিক অবতারবাদ ও বীর-পূজায় অভ্যস্ত অশিক্ষিত জনসাধারণ সমাদরে এ শাসনকে বরণ ক'রে নেয় আর মতবিরোধী ও যুক্তিবাদীরা এর পীড়নে ধ্বংস হয়। অবশ্য তাদের কারাগারে পচতে হয় না বা গুলিতে মরতে হয় না। অহিংস প্রণালীতে তাদের 'ঘরভাঙ্গা' বা 'দেশের শত্রু' ছাপ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। রাজকোটের 'অমূল্য রসায়নাগারে' এই অহিংস ডিক্টেটরী টেকে না, কিন্তু কংগ্রেসের বেদীতে রসায়নের প্রক্রিয়া নেই—শালগ্রাম শিলারও ক্ষয় নেই।

ব্যক্তিগত আক্রমণ বা দুর্বলের আক্রোশ প্রকাশের জন্য এ প্রসঙ্গের অবতারণা নয়। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার কলিকাতা অধিবেশনের অনিবার্য, নিঃসংশয় সিদ্ধান্তটা আমাদের পঠনীয়। সোদপুর, বালিগঞ্জ সারকুলার রোড ও ওয়েলিংটন স্কোয়ারে যে দাবাখেলা ও বাক্‌যুদ্ধ চার পাঁচদিন ধ'রে চলেছিল তার বিশ্লেষণ না ক'রেও কতগুলো স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ঘটনা থেকে আমরা মীমাংসায় পৌঁছতে পারবো।

এই আন্তর্জাতিক সঙ্কটের দিনে, ভারতের যুগসন্ধিক্ষণে জাতীয় সংহতি একান্ত প্রয়োজন এ কথা বাম, দক্ষিণ, মধ্য সকল পন্থীই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। এই সংহতির নাম ক'রে রাষ্ট্রপতি চাইলেন মিশ্র কার্য্যকরী সভা—দক্ষিণের সংখ্যাধিক্য রেখে, মহাত্মা চাইলেন স্থিতাবস্থা অর্থাৎ

সভায় পূর্ববৎ দক্ষিণীদের অখণ্ড কর্তৃত্ব। সুভাষ যুক্তি দিয়েছেন—পাশ্চাত্যদেশে যেমন যুদ্ধকালে বিভিন্নদল মতদ্বৈধ ভুলে মিশ্র মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করে, আমরাও এই সঙ্কটকালে কেন সেরূপ মিশ্র সভা রচনা করতে পারবো না—বিশেষতঃ তাতে যখন কার্যকরী সভার কর্তৃত্ব আরো দৃঢ় ও ব্যাপক হবে। মহাত্মা বলেছেন যেহেতু রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রাক্তন সভাদের মূলনীতিগত পার্থক্য রয়েছে সেহেতু তাঁদের একসঙ্গে চলা সম্ভব নয়,—অর্থাৎ হয় রাষ্ট্রপতি থাকবেন নয় প্রাক্তন সভারা থাকবেন,—এবং প্রাক্তন সভাদের মূলনীতি যে মহাত্মারই মূলনীতি সে কথা বলা বাহুল্য।

"Knowing your own views and knowing how you and most of the members differ in fundamentals it seems to me that if I gave you names it would be imposition on you."

অগত্যা মহাত্মা রাষ্ট্রপতিকে অনুমতি দিয়েছেন স্বেচ্ছামত সভা গঠন করতে। ত্রিপুরীতে যে তাঁরই শিষ্যদল রাষ্ট্রপতিকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন তা তিনি জানতেন। এ অনুমতিকে আমরা উদারতা না উপহাস বলবো ?

রাষ্ট্রপতির সাথেই যদি বনিবনা না হয় তবে তার মনোনীত বামপন্থীদের সাথে বনিবনা হবার প্রশ্নই ওঠে না—এই হলো মহাত্মা ও দক্ষিণীদের মনোভাব যা ব্যক্ত না হলেও অভিব্যক্ত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি প্রতিবাদ করেছেন—মতানৈক্য থাকলেও কি আমাদের কতগুলো মৌলিক বিষয়ে একতা নেই এবং তার ওপর কি আমরা মিলতে পারি না ? মধ্যপন্থী নেহেরু এবং চক্রবর্তী মাঝারী নাইডু বলেছেন—মিশ্র সভা নিশ্চয়ই উত্তম এবং সম্ভব, তবে সেটা জবরদস্তিতে না ক'রে কৌশলে, অর্থাৎ প্রাক্তন সভাদের মান বাঁচিয়ে করতে হবে।

দক্ষিণীদের মধ্যে কেউ দাঁড়িয়ে এ মত সমর্থন করেন নি। অতএব হয় তাঁরা মিশ্র সভায় অবিশ্বাসী, নয় বিশ্বাসী হয়েও মানের দায়ে মিশ্র সভার প্রচেষ্টা পণ্ড করেছেন।

নেহেরু বা বাঙ্গলার বামনেতা দত্ত মজুমদার কারও প্রস্তাবে মিশ্র সভার উল্লেখ ছিলো না; অথচ তাঁরা রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করেছেন। রাষ্ট্রপতি নিবেদন করেছেন—যদি আমাকে রাখতে চান তাহলে যে নীতি আমি ঘোষণা করেছি তাতে আপনাদের সহানুভূতি ব্যক্ত করুন। সভানেত্রী নাইডু আবার 'অনুরোধ' করলেন—অত কথায় কাজ নেই, থাকবে কি না, 'হাঁ বা না সোজাসুজি বলো'—'We want a definite answer, yes or no'।

তারপর চোখের পলকে নতুন রাষ্ট্রপতি ঠিক হয়ে গেলো। পেশোয়ার থেকে রেঙ্গুন কালিকাট পর্যন্ত ভারতব্যাপী লক্ষ লক্ষ ডেলিগেট যাঁকে ভোট দিয়ে নেতৃত্বে বরণ করেছিলো তিনি অপসারিত হলেন। তার স্থানে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বিশ হাত পরিমাণ মঞ্চের উপর থেকে মুহূর্তের মধ্যে 'নির্বাচিত' হয়ে এসে বসলেন নতুন রাষ্ট্রপতি।

যোগ্যতার প্রশ্ন তুলছি না। সভানেত্রীর রায় নিয়ে আলোচনাও পণ্ডশ্রম—কারণ তিনি পূর্বাহ্নেই বলেছেন যে জাতীয় কল্যাণ অর্থাৎ 'সংহতি'র জন্য আবশ্যক হ'লে তিনি বে-আইনি রুলিং দেবেন। জনমতের দিকে তাকিয়ে সভাপতি সুভাষ ত্রিপুরীর বে-আইনী প্রস্তাবও উত্থাপন করতে দিয়েছিলেন। প্রতিপক্ষের প্রতি অতখানি উদারতা দূরে থাকুক, তাদের আইনসঙ্গত অধিকারটুকু দেবার মত সৌজন্য সভানেত্রী নাইডু দেখাতে পারেন নি। কোন প্রস্তাব তাদের তুলতে দিলেন না, কোন মত ব্যক্ত করতে দিলেন না। সভানেত্রীর নিরপেক্ষতা, পদমর্যাদা ভুলে সভানেত্রীর অধিকারের সুযোগ নিয়ে তিনি দক্ষিণীদের চক্রান্ত কার্যে পরিণত করলেন।

কোথায় রইলো জনমত, নির্বাচকদের অধিকার ; বোনাপার্টির coup-de-tat, হিট্‌লারের putsch পুনরভিনীত হচ্ছে সার্বভৌম, অহিংসাবাদী মুক্তিপ্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের বুকের উপর। স্বাধীনতার চেয়ে দ্রুত আসছে ডিক্টেটরী যার উপরি জাতীয় দাসত্ব। এবং এই ডিক্টেটরীর পশ্চাতে রয়েছে 'সত্য' ও 'অহিংসা'—পাঁচ বৎসর আগে জওহরলাল যার সংজ্ঞা দিয়েছিলেন—"স্থিতস্বার্থ ও স্থিতাবস্থার আশ্রয়স্থল"—"a sheet-anchor for vested interests and status quo"!

দক্ষিণীদের দাক্ষিণ্য বুঝতে বেশী বেগ পেতে হয় না। বামপন্থী খণ্ডদলগুলোর মনোভাব ও কলকৌশল বোঝা তার চেয়ে কঠিন। সমাজতন্ত্রী, সাম্যবাদী ও রায়পন্থী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় থেকে এই তিন দলের ধারাবাহিক আচরণ অনেকের দুর্বোধ্য ঠেকেছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্যাটেলের ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে বামপন্থীরা একতা দেখিয়েছিলো আর প্রমাণ করেছিলো যে সংখ্যায় কংগ্রেসে বামমত বলবান। অতঃপর গান্ধী ও জওহরের বিবৃতি বেরুলো, কার্যকরী সভার সভারা পদত্যাগ করলেন, সমাজতন্ত্রীরা জাতীয় সংহতির নাম করে বাম-সংহতি ভাঙলেন, ফলে রাষ্ট্রপতিকে তাঁর আসনে বসিয়ে রেখে তাঁর অবিসংবাদী অধিকার কার্যকরী সভা গঠন তুলে দেওয়া হলো মহাত্মার হাতে। ত্রিপুরীর প্রস্তাব বে-আইনী এবং গণতন্ত্রবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রীরা নিরপেক্ষ থাকলেন। নিরপেক্ষতার কৈফিয়ৎ তাঁরা দিলেন যে সুভাষ বিবাদ করছেন নেতৃত্ব নিয়ে, কার্যসূচী নিয়ে নয় ; রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের অর্থ এ নয় যে গান্ধিনায়কত্বের চেয়ে সুভাষনায়কত্ব শ্রেয়, —অর্থ কংগ্রেস এবার বামনীতি গ্রহণ করুক। সুভাষ নাকি তাঁর আচরণে এই নৈতিক বিবর্তনের পরিচয় দেন নি এবং তিনি সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীদের পথে বসিয়েছেন—"The president let us down completely."

National Frontএ যোশী-জয়প্রকাশের যুগ্ম-কৈফিয়ৎএর মমার্থ আমাদের মতো বামপন্থীরা অনেকেই বুঝতে পারে নি। নির্বাচন-যুদ্ধে কার্যসূচী ছাড়াও ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন অবশ্যই আসে, নেতৃত্বকামনাও মোটেই দোষের নয়। জওহরলাল বলেছিলেন—"Whoever wins, federation is lost"—'যেই জিতুক, যুক্তরাষ্ট্র নিপাত হবে'। সীতারামিয়া ও তাঁর সমর্থক প্যাটেলদল বলেছিলেন তাঁরাও 'নখদন্ত দিয়ে' যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করবেন। তবুও কেন আমরা

সুভাষকে নির্বাচন করেছিলাম ? কারণ আমরা প্যাটেল-পট্টভির চেয়ে সুভাষের কথায় বিশ্বাস করেছিলাম বেশী। আর সুভাষকে ভোট দিয়েছিলাম ডেলিগেটের অধিকার, গণতন্ত্রের নীতি অপ্রতিহত রাখতে। ত্রিপুরীতে ডেলিগেটরাই কথার মারপ্যাঁচে ভুলে এ অধিকার ও নীতিকে পঙ্গু করেছেন তাই সাহস পেয়ে ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারে দক্ষিণী কর্তারা এই অধিকার ও নীতির শবশয্যা রচনা করলেন।

ইতিমধ্যে সুভাষ কী ভুল করেছিলেন যার জন্যে সমাজতন্ত্রীরা বিরূপ হলেন ? যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা, দেশীয় রাজ্যে আন্দোলন চালনা, গণতন্ত্রের পরিপোষণ এই ছিলো তাঁর নির্বাচনশপথ; কার্যসূচী এরই ওপর হবার কথা। রাষ্ট্রপতি অসুস্থ হয়ে পড়লেন,—বিস্তারিত কার্যসূচীর তাগিদ এমন কি প্রত্যাসন্ন হয়ে পড়েছিলো এবং দক্ষিণ বা বামের কোন্ দলই বা কী কার্যকরী কার্যসূচী দিয়েছিলেন যার জন্যে ডেলিগেটের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির ওপর দক্ষিণীদের অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবকে প্রশ্রয় দেওয়া হলো ?

আমাদের মনে হয়েছে গান্ধীদলের বিরোধিতায় এবং জওহরলালের নিরপেক্ষতায় সন্ত্রস্ত হয়ে সমাজতন্ত্রীরা জাতীয় সংহতির দোহাই দিয়ে বাম-সংহতি ভেঙ্গেছেন। দুই পক্ষের মাঝামাঝি থেকে নতুন কার্যকরী সভায় স্থান লাভ করবার অভিসন্ধিও কেহ কেহ অনুমান করেন। রায়বিরোধী এবং বাম-তথা-জাতীয় সংহতিকামী সাম্যবাদীরা অনেক ইতস্ততঃ করে শেষে সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে পা মিলিয়েছেন।

রাজনীতির বাজারে দরকষাকষির ব্যাপার খানিকটা থাকে সত্য। কিন্তু মনে মনে স্থির করে রাখতে হয় ন্যূনতম দর—যার নীচে আর কিছুতেই নামা চলবে না। সোদপুর-বালিগঞ্জ-ওয়েলিংটনে দুই পক্ষে আপ্রাণ দরকষাকষি চলেছে। দক্ষিণীরা তাঁদের ন্যূনতম দর ঠিক করে রেখেছিলেন,—সে হচ্ছে প্রাক্তন সভ্যদের মানমর্যাদা তিলমাত্র ব্যাহত না করে, কোনপ্রকার প্রস্তাবের বাঁধাবাঁধির মধ্যে না গিয়ে কিছু দিন বাদে জনা দুই সহনীয় গোছের বামপন্থী নেওয়া চলতে পারে। বামপন্থীরা তাঁদের ন্যূনতম দর ঠিক করতে পারেন নি। কলিকাতা অধিবেশনের প্রাক্কালে যোশী-জয়প্রকাশ যুগ্ম-ফতোয়ায় বলেছেন—১। রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ করা কিছুতেই সমীচীন হবে না, ২। মহাত্মার সঙ্গে আপোষে একটা রফা তাঁর করা চাই-ই, ৩। মিশ্র সভার দাবী যেন তিনি শেষ পর্যন্ত না ছাড়েন। ওয়েলিংটনের মঞ্চে শেষ মুহূর্তে যখন দেখা গেলো এ সর্তগুলোর সামঞ্জস্য হচ্ছে না তখন বামনেতা দত্তমজুমদার তাঁর প্রস্তাবে বুঝিয়ে দিলেন যে মিশ্রসভার উল্লেখও তাঁরা ছাড়তে প্রস্তুত,—মাঝারীদের স্তোকবাক্য ও আশ্বাসবাণীই তাঁদের ন্যূনতম দর। এই দর হেঁকে তাঁরা বামপক্ষকে খর্ব করেছেন।

স্বপক্ষের উপরোধে, প্রতিপক্ষের শাসনে বিচলিত না হয়ে, মিশ্রসভার নীতির ওপর দাঁড়িয়ে সেদিন ওয়েলিংটনের মঞ্চে একমাত্র পরাজিত রাষ্ট্রপতি একনিষ্ঠ দৃঢ়তা, সংযম এবং আত্মমর্যাদার পরিচয় দিয়েছেন।

. রায়পন্থী ভূপেন সান্যাল পদত্যাগের জন্য রাষ্ট্রপতিকে সাধুবাদ দিলেন, রাষ্ট্রপতিকে শৃঙ্খলিত করবার চক্রান্ত করছেন বলে দক্ষিণীদের ও নেহেরুকে ধিক্কার দিলেন। পরক্ষণে তিনি বল্লেন মহাত্মা-রাষ্ট্রপতি দ্বন্দটা নীতিগত নয়, ব্যক্তিগত ও কর্তৃত্বসন্ধী। রাষ্ট্রীয় মহাসভার কর্তব্য উভয়ের কারও পক্ষাবলম্বন না করে বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে নীতি এবং কার্যসূচী ধার্য করা এবং রাষ্ট্রপতিকে সেই নীতি ও কার্যসূচী প্রয়োগের দায়িত্ব অর্পণ করা।

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে রায় এ কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন,—কর্তৃত্বসন্ধী উভয় পক্ষকে বর্জন করে বৈপ্লবিক নেতৃত্ব আনতে হবে, বৈপ্লবিক কার্যপন্থা নিতে হবে। সুভাষের বিরুদ্ধে তাঁর নালিশটা কোথায় তা ঠিক বোঝা যায় নি—এবং বৈপ্লবিক নেতৃত্বের গুরুভার কার কাঁধে দিতে হবে সেটাও শুধু অনুমানে বোঝা যায়। রায় আরো বলেছেন কংগ্রেসের মূলমন্ত্র—'শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত উপায়' বদলাবার কথা, কংগ্রেসের গঠনযন্ত্র ঢেলে সাজবার কথা। চাটগাঁয় ও বৌবাজারের সভায় তিনি এমন ইঙ্গিতও করেছেন যে আবশ্যক হলে কংগ্রেসের বাইরে গিয়েও এই বিপ্লবীদল গড়তে হতে পারে। মনে পড়ে তাঁর পাঁচ বৎসর আগের কথা। কংগ্রেসের ভেতরে বা বাইরে কোন বামদল গড়লে কংগ্রেসের সংহতি ভঙ্গ হবে, বামদল ক্রমশঃ কংগ্রেস ত্যাগ করতে বাধ্য হবে এবং কংগ্রেসে দক্ষিণীদের অখণ্ড কর্তৃত্ব কায়েমী হবে। কংগ্রেসী সমাজতন্ত্রীদের তাই তিনি দল গড়তে নিষেধ করেছিলেন। নিয়তির পরিহাস,—আজ সমাজতন্ত্রীরা সর্বস্ব দিয়েও কংগ্রেস-সংহতি রাখতে তৎপর, আর রায় কংগ্রেস ও বাম উভয় সংহতি ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে বৈপ্লবিক দল গড়তে যত্নবান্। সুভাষ-গান্ধী দ্বন্দ্বের মধ্যে যেমন রায় ব্যক্তিগত নেতৃত্বলোভের পরিচয় পেয়েছেন—তাঁর আচরণেও অনুরূপ অভিসন্ধি কেউ কেউ অনুমান করছে।

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে রায় ও সুভাষ দু'জনার ভাষণই ভালো হয়েছে—প্রয়োগপ্রণালী থেকে বোঝা যাবে উদ্দেশ্য ও ফলাফল। কংগ্রেস-সংহতি যত দিন পারা যায় অব্যাহত রাখতে হবে এ অভিমত বেনামী বামরাও পোষণ করেন। কিন্তু বাম বিধ্বস্ত ও বিচ্ছিন্ন হলে এই সংহতি হবে একতান্ত্রিক বা ডিক্টেটরী সংহতি, জাতীয় সংহতি নয়। সুতরাং বামপন্থীদের সম্মিলিত দাবী নিয়ে বাম-সংহতি গড়ার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এর সাফল্য ও সুপরিণতি নির্ভর করবে প্রধান বামদল তিনটী কি ভাবে এই প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করে তার ওপর। রায়দলের ব্যবহার আশ্বাসপ্রদ নয়। সমাজতন্ত্রীদের সম্বন্ধে সুভাষ নিজেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। খারে, নরিম্যান, আনে, আয়েঙ্গার ইত্যাদি বহির্বঙ্গীয় মুষ্টিমেয় ধুরন্ধর আর বাঙ্গলা দেশের কয়েকটী বিপ্লবী খণ্ডদল নিয়ে এ প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ থাকলে প্রয়াস-প্রয়াসী কারও মঙ্গল হবে না। দুঃখের হলেও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে বাঙ্গলায় দল উপদলের রেষারেষির থেকে কোন ব্যাপক মহৎ প্রয়াসকে বাঁচিয়ে রাখা শক্ত। দলাদলির পাঁকে আবদ্ধ হয়ে পড়লে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে বলে আশঙ্কা হয়।

সুভাষ আজ বাঙ্গলায় ও ভারতে প্রতিষ্ঠার শীর্ষদেশে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ শীর্ষের

দুই পাশে পিছল উত্তুঙ্গ গিরিগাত্র দেখা যাচ্ছে—সুভাষের তা অজানা নেই। বাম-সংহতি গড়বার আগে তাঁকে দেখতে হবে বামদলগুলির মধ্যে তাঁর প্রতিপত্তি কতটুকু এবং বুঝতে হবে তাদের স্বরূপ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জানতে হবে যে পাকা ভিতে তাঁর নেতৃত্ব গড়ে তোলা দরকার। এর জন্যে তাঁর বেশী প্রয়োজন গণসাধারণের মধ্যে নেমে আসা—দৈনন্দিন স্থানীয় অভাব অভিযোগ নিয়ে যেখানে মজুর চাষী অবিশ্রান্ত সংগ্রাম চালাচ্ছে সেখানে এসে নেতৃত্ব গ্রহণ করা। সেই কাজের ক্ষেত্রে বাঙ্গলার তথা ভারতের বহু বিক্ষিপ্ত, বেনামী কর্মী তাঁর পাশে এসে জুটবে, মার্কামারা বামদলরাও তাঁর সহযোগিতা করবে—নিরন্ন, নিগৃহীত গণসাধারণ তাঁর হাতে নায়কত্ব তুলে দেবে। সেদিন তিনি বামশক্তির কেন্দ্রীভূত বলভরসা হয়ে দাঁড়াতে পারবেন, তখন তাঁর আঘাতে টলবে ডিক্টেটরী সংহতি ও স্বৈরশাসন এবং তার পশ্চাদ্বর্তী দেশীয় অবস্থিত স্বার্থ।

অনাবশ্যক

—শ্রীকান্ত—

রেল লাইনটার দক্ষিণে একটা চৌচালা টিনের ঘরে গ্রামের বালিকাবিদ্যালয় বসে। বিদ্যালয়টী প্রাচীনই বটে। অন্তত টিনের লালচে রং আর স্থানে স্থানে বেড়াবিহীন খুঁটির নির্লজ্জ উলঙ্গতায় তাহা নির্মমভাবেই প্রকট। ইতস্ততঃ টিনের ছিদ্রপথে যে অনাবশ্যক বৃষ্টিধারা ঘরের মধ্যে পণ্ডিত মশাই তথা বালিকাবৃন্দের মস্তকে বারিসিঞ্চনের অপচেষ্টা করে তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য চালের ফ্রেমের সঙ্গে স্থানে স্থানে কয়েকটী মাটীর নটও ঝুলান হইয়াছে।

আলমারী একটা আছে—তাহার উপরের তাকে কয়েকখানা জরাজীর্ণ বই ও ততোধিক জীর্ণ খাতাপত্র কয়েকখানা দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহারা কোন প্রয়োজনে কি সূত্রে কবে যে ঐ তাকটী দখল করিয়া বসিয়া আছে তাহা জানিবার উপায় নাই। মধ্যের তাক দুটীতে প্রচুর ধূলি ছাড়া আর কিছু দেখা না গেলেও নীচের তাকটী যে প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য্য, পণ্ডিত মহাশয়ের তামাকের কৌটা, টিকার ভাণ্ড ও পয়সা চারি দামের একটী ছোট হুকাই নিশ্চিত ও প্রত্যক্ষরূপে তাহা প্রমাণ করিতেছে। উই পোকায় আলমারীর অনেকখানি বিকৃত ও বীভৎস করিলেও উহার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ তখনও নষ্ট করিতে পারে নাই। টুলগুলির অধিকাংশই খঞ্জ—কিন্তু খঞ্জপদের অসুবিধা ইটের উপর ইট সাজাইয়া দূরীভূত করা হইয়াছে। পণ্ডিত মশাইর চেয়ারের একটী হাতল ও পিছনের খানিকটা কাঠও অনেক দিন যাবং অভাবিত রূপেই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

এত কিছু ধীরে ধীরে অপসারিত ও রূপান্তরিত হইলেও স্কুলটী আজ ত্রিশ বৎসর যাবং চলিতে-ই-ছে। এই চলার নিয়মের মধ্যে পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন খুব বড় একটা কিছু দেখা যায় না। গ্রীষ্মকালে ১২-৪৫ মিনিটের পর এবং শীতকালে সাতটা ১৫মিঃ-এর পর সাধারণতঃ স্কুলটী মুখর হইয়া উঠে। ঘড়ি অভাবে স্কুলের কাজে অসুবিধা কিছু হয় বলিয়া শোনা যায় নাই। স্কুলের সম্মুখ দিয়া যে রেলগাড়ীগুলি ছুটাছুটী করে—স্কুলের ঘড়ির কাজটা দীর্ঘ দিন যাবং তাহারাই সারিয়া লইতেছে।

স্কুলের তালা গুরুমশাই আসিয়া খোলেন এবং ছুটীর পর বন্ধও করেন। তালার জন্য স্কুল ঘরে প্রবেশ করিতে কাহারও অসুবিধা হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। তবু যে তালা কেন লাগান হয় তাহার কারণ দুর্ব্বোধ্য হইলেও অবোধ্য নাকি নয়। স্কুলের বেড়া না থাকায় যে সকল ছাত্রী স্কুল খুলিবার আগে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাদের প্রবেশ পথে দরজার তালা বাধা যদিও বা না জন্মায় তবুও তালা না দিলে স্কুল যে বন্ধ হইল তাহা বুঝা একটু কষ্টকর বই কি!

তালা লাগাইবার ব্যাপারটা বাদ দিলেও আরও যে একটী বিসদৃশ ঘটনা লোকের (অবশ্য

আগন্তুকের) চোখে পড়ে তাহার মীমাংসাও অনেক দিন আগেই হইয়া গিয়াছে। গ্রীষ্মকালে স্কুল বসে সকাল বেলা ও অন্যান্য দিনে দুপুর বেলা—ইহাই প্রচলিত রীতি। কিন্তু বিজুর বালিকা বিদ্যালয়টী একটী ব্যতিক্রম। অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে তাহার স্কুল বসে দুপুর বেলা আর শীতকালে সকাল বেলা। এ সম্বন্ধে সবাই যে কারণ দেখায় বিজু তাহার অতিরিক্ত আরও একটী কারণ যাহা দেখায় তাহাই গাঁয়ের লোকের নিকট মুখরোচক হয় বেশী। পণ্ডিত মশাইর ঐ বালিকা বিদ্যালয় ছাড়া একটী বালক বিদ্যালয়ও আছে। একটী মানুষের পক্ষে দুইটী স্কুল একই সময়ে করা সাধ্য নয় বলিয়াই যে এই বিসদৃশ ব্যবস্থা ইহা সবাই বুঝিলেও বিজু গাঁয়ের লোককে ব্যাপারটা অন্য ভাবেই বুঝাইয়াছে। বিজু বলে, "চৈত্রের কাঠ-ফাটা রোদে যে মেয়েদের রান্নাঘরে দুপুর বেলা হাঁড়ি ঠেলতে হবে বা মাঘের কন্‌কনে শীতে কাক ডাকার সাথে সাথে শয্যা ছেড়ে গোবর-ছড়া দিতে হবে তাদের পক্ষে এটা আর এমন খারাপ কি হ'ল বাপু?"

হারাণ কাকা বুড়া মানুষ, হাসিয়া বলেন—"তা বিজু কথাটা মন্দ বলে নি।"

টাক মাথায় হাত বুলাইয়া দুর্গাপুতিও সায় দিয়া যান। একে দুইয়ে গ্রামের প্রায় সকলেই বিজু পণ্ডিতের শিক্ষকতা বিষয়ে এবং বিসদৃশ সময়ে স্কুল করিয়া মেয়েদের কৃচ্ছ সাধন ব্রতে পরোক্ষে সাহায্য করার এই অভিনব প্রচেষ্টায় শ্রদ্ধাশীল হয়তো হইয়া উঠে। তাই স্কুলটাতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা একাদিক্রমে প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবতই চলিয়া আসিল।

ত্রিশ বৎসর স্কুল যে ভাবে চলিল একত্রিশ বৎসরে তাহা আর সে ভাবে চলিতে চাহিল না এবং এই চলিতে না চাওয়াকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের এই আখ্যানভাগ গড়িয়া উঠিল।

ত্রিশ বৎসর যাবৎ বিজু পণ্ডিত শিক্ষার পথে যে সকল ছেলেদের আগাইয়া দিয়াছিল তাহারাই শিক্ষিত হইয়া স্কুলটাকে সংস্কারের পথে আগাইয়া দিতে চাহিল। সংস্কার করিতে যাইয়া তাহারা উহার জীর্ণ বেড়া ও শীর্ণ আলমারীই শুধু বদল করিতে চাহিল না, বিজু পণ্ডিতের দীর্ণ বুকেও আঘাত করিল।

পাঁচ বছর বিনা বেতনে বা কিঞ্চিৎ বেতনে স্কুলটীকে দাঁড় করাইয়া আরও পাঁচ বছরে নিজের তথা গ্রামের ও ভিন্ন গ্রামের পাঁচ জনের প্রচেষ্টায় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের যে সাহায্য সে মঞ্জুর করাইয়াছিল তাহা নাকি তাহার একার অব্যবস্থায়ই নাকচ হইয়া গিয়াছিল। কারণ, তাহার হাজিরা বহি, হিসাবের খাতাপত্রাদি বা ম্যাপ, গ্লোব, ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি তৈজসপত্র যাহা সরকারী বা আধা-সরকারী সাহায্যাদি পাওয়া ও ভোগ করার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য, তাহা ঠিক ঠিক পাওয়া যায় নাই। কিন্তু সাহায্য বন্ধ হইলেও স্কুল বন্ধ হয় নাই। বিজু সে টাল সামলাইয়াছে।

প্রথম জীবনে সংসার চালাইবার জন্য স্কুল চালাইলেও পরবর্ত্তী জীবনে সংসারে চলিবার জন্যই যে বিজু পণ্ডিতের স্কুল অবলম্বন স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ইহা সম্পূর্ণ সত্য কথা। স্কুল করা তাহার নেশা—শিক্ষা দেওয়া বা বেতন পাওয়া না পাওয়া তাহার নিকট এখন মূল্যহীন। অসুখ হইলেও সে তাই স্কুল বড় একটা কামাই করে না—করিতে পারে না। উপার্জ্জনক্ষম

পুত্রের অনুরোধ, স্ত্রীর বিরক্তি, কন্যার স্নেহ-শাসন, কবিরাজের অনুজ্ঞা ইত্যাদি একত্র হইয়াও, কঠিন রোগের পরে বিশ্রাম করা প্রয়োজন হইলেও বিজুকে তাই বিছানায় ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। বিজু বলে স্কুল করার চেয়ে স্কুল না করা-ই তাহাকে নাকি দুরারোগ্য করিবে বেশী।

এ হেন স্কুল-অনুরক্ত বিজু পণ্ডিতকে স্কুলচ্যুত করিবার জন্য সংস্কারকের দল যখন অভিযান করিল, কি জানি কেন বিজু তখন আপনা হইতেই অতি সহজে এবং অতি নিঃশব্দেই সিয়া পড়িল। অল্প দিনের মধ্যেই গ্রামের প্রায় সকলেই অতি আশ্চর্য্যরূপে বুঝিয়া ফেলিল যে, দীর্ঘ দিন যাবৎ শিক্ষাব্যাপারে বিজু নাকি সবাইকে ভয়ানক রকমে ফাঁকিই শুধু দিয়া আসিয়াছে। বিনা পয়সায় বা নামমাত্র পয়সায় যাহারা বিজুর স্কুলে ক, খ, হইতে আরম্ভ করিয়া A fat cat পর্য্যন্ত পড়িয়া গিয়াছে তাহারাও পণ্ডিত মশাইর বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে একান্ত ফাঁকিবাজিটা আজ ধরিয়া ফেলিয়াছে। বিজুর পাড়ারই ছেলে জগাই 'পণ্ডিত তাড়ণ' মজলিসে সেদিন বলিয়া বসিল, "হাঁ, ভারী তো শিক্ষা দেন স্কুলে! তামাক না সাজতে পারলে বেতের চোটে পিঠের চামড়া তোলেন।"

গুরুনিন্দার মুখরোচক সন্দেশে মজলিসের সবাই মাতিয়া উঠিল এবং উৎসাহ পাইয়া জগাই বলিল যে একদিন সদ্যভস্মিত এক ছিলিম তামাকের আগুনটা ঢালিয়া কল্কীতে নূতন করিয়া তামাক ভরিয়া আগের সেই আগুনটা হাতে করিয়া উঠাইয়া কল্কীতে দিতে না পারায় পণ্ডিত মশাই যে শাস্তিটা তাহাকে দিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাকি আজও তাহার পিঠে আছে। গেঞ্জি খুলিয়া জগাই একটা দাগও দেখাইল।

মাধাই জগাইরই ভাই—পার্শ্বচরও বটে, বুদ্ধি কম এবং কম যে তাহাও ঐ সভায়ই আর একবার প্রমাণ হইয়া গেল। মাধাই বলে, "ওটা তো কঞ্চিতে যে পিঠটা কেটে গিয়েছিল তার দাগ রে দাদা।"

জগাই মাধাইর নির্ব্বুদ্ধিতায় ধমক দিয়া উঠিল, উপস্থিত সকলেই রে রে করিয়া আসিল, মাধাই চুপ করিয়া গেল। সুতরাং বিজু পণ্ডিতের নিষ্ঠুরতা, পড়াইবার অক্ষমতা এবং মাধাইর যে বুদ্ধি নেহাৎই অল্প তাহা চূড়ান্তভাবেই মীমাংসা হইয়া গেল।

এইরূপে বিজু পণ্ডিতের বিপক্ষে এবং সংস্কারকামিগণের স্বপক্ষে যখন বহুবিধ তথ্য ও তত্ত্ব একত্র সংগৃহীত ও ঘনীভূত হইয়া উঠিল এবং আর্থিক দিক্‌টারও কতকটা সুরাহার সম্ভাবনা দেখা গেল তখন হারান খুড়ো ও দুর্গাপুতিকে পুরোভাগে লইয়া সংস্কারকের দল একদিন বিজুর বাড়ীতে দেখা দিল।

হারাণ খুড়ো ও দুর্গাপুতি গ্রামের মাথা। সব কিছু জনসেবা ও গণজাগরণেই তাঁহারা এই বৃদ্ধ বয়সেও আশ্চর্য্য রকমে সাড়া দিয়া থাকেন। কংগ্রেসের চাঁদা, রাজার জয়ন্তী উৎসব, মুসলমানের ওয়াজ, হিন্দুর হরিসভা, সার্কেল অফিসার আসিলে থাকা-খাওয়ার যথাযোগ্য ব্যবস্থা, স্যানিটারী ইনস্পেক্টর বদলী হইলে বিদায় অভিনন্দন দেওয়া প্রভৃতি যাবতীয় ব্যক্তি বা সমষ্টিগত ব্যাপারেই হারাণ খুড়ো ও দুর্গাপুতি।

কথাটা যে বিজু পণ্ডিতেরও কাণে না উঠিয়াছিল এমন নহে। তাই হারাণ খুড়ো ও দুর্গাপুতির নেতৃত্বে দলটী যখন যাইয়া তাহার আঙিনায় পা দিল বিজু তখন তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিলেও হুকোটা খুড়োর দিকে আগাইয়া দিতে দিতে যথারীতি বিনয় ও ভদ্রতা সহকারেই অসময়ে পদধূলি দেওয়ার উদ্দেশ্য জানিতে চাহিল।

হারাণ খুড়ো বলিলেন, "এসেছি যখন উদ্দেশ্য তো নিশ্চয়ই আছে। বলছি সবই।"

নিবিষ্ট চিত্তে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তামাক টানিতে টানিতে ভূমিকাটার মুসাবিধাই খুব সম্ভব তিনি করিতেছিলেন। উপস্থিত সবাই চুপ্‌চাপ্‌। অপ্রাসঙ্গিক টানা হঁ্যাচড়া দুই একটী কথা জবরদস্তী করিয়া কেহ কেহ বলিয়া নিস্তব্ধতার বিশ্রীতা ভাঙিতে চাহিলেও শেষরক্ষা হইল না। কয়েক মিনিট হুকোটা টানিয়া অবশেষে খুড়োই সবাইকে মুক্তি দিলেন। খুড়ো বলেন,

—তা আমরা কেন এসেছি বিজু তা আশা করি বুঝতেই পারছ।

—কতকটা আন্দাজ করলেও সবটা বুঝতে পারি নি।

খুড়ো বলেন,—কথা হ'ল—এই স্কুলটা। মানে—বালিকা আর বালক বিদ্যালয়টা।

বিজু বলে, বেশ তো, তা বলুন।

—বলছিলুম কি, মানে আমরা—ঐ দুটোকে একটু আরও ভাল করে চালাতে চাই।

ম্লান হাসিয়া বিজু বলে, সে তো বেশ ভাল কথা। আপনারা যদি এদিকে একটু নজর দেন।

উপস্থিত সবাই এই কথায় খুসী হইলেও বিজুকে যে তাহারা অবসর দিতে চাহে এবং সেই কথাটাই যে তাহাকে জানাইতে আসিয়াছে তাহা তখনও বলা হয় নাই বলিয়া কতকটা উৎকণ্ঠাও প্রকাশ করিল।

দুর্গাপুতি ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার করিবার জন্য হুকোটা রাখিয়া আগাইয়া আসিলেন। পুতি বলেন, তা তুমি তো বুড়ো হয়ে পড়েছ—আর ভগবানের ইচ্ছায় তোমার সতীনাথ যখন দু' পয়সা আনচেও ভালই তখন এ সময় তোমার একটু নিরিবিলি নিশ্চিন্তে দিন ক'টা কাটিয়ে দেওয়াই ভাল।

উৎসাহ পাইয়া হারাণ খুড়ো বলেন, আমাদের মত বয়সে এখন কি আর এ সব ঝঞ্ঝাট পোষায়? ছেলেদের নূতন উদ্যম নূতন বয়েস, ওদের হাতে গেলে জিনিষটে হবে ভাল।

বিজু শুধু বলে, আপনারা পাঁচ জনে যে ব্যবস্থা করবেন তার বিরুদ্ধে আমি আর কি বলব? স্কুল আমি করলেও স্কুল তো আপনাদেরই।

দুর্গাপুতি বলেন, বিজু স্কুলের জন্য করেছে যথেষ্ট। মাইনেপত্র যা পাওয়া যায় তা তো আর জানতে কারু বাকী নেই—৪০ বছর ধরে সে তো দুই দুইটা স্কুল চালিয়ে এসেছে! যে যা-ই বলুক না কেন, আজ যারা নূতন করে স্কুলটাকে গড়তে যাচ্ছে তাদেরও তো এই বিজুর কাছেই প্রথম হাতেখড়ি!

ছেলেদের দল হইতে প্রায় সকলেই সে কথা স্বীকার করিল এবং পণ্ডিত মশাইর সে ঋণ যে অপরিশোধনীয় তাহাও সেই মুহূর্তেই সবাই সম্মিলিত ভাবে জানাইল।

ব্যাপারটা এত সহজে এবং এত অল্প কথায়-ই যে মিটিয়া যাইবে ইহা তাহারা আগে বুঝিতে পারে নাই। কাজটা যত শীঘ্র মিটিয়া গেল বিজু পণ্ডিতের উপর বিরুদ্ধ ভাবটাও মিটিয়া তত দ্রুতই কমিয়া আসিল। পণ্ডিতের লুপ্ত বা অজ্ঞাত অখ্যাত গুণাবলী আশ্চর্য্য রকমে সকলের মুখে মুখে প্রকাশও পাইতে লাগিল।

বিজু এখনও যথানিয়মে স্কুলে যায়। আর তিনটা দিন পরেই স্কুলে নূতন মাষ্টার আসিবে। তাহার হাতে সব তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত বিশ্রামে সে গা ঢালিয়া দিবে। গিন্নীকে এই কয় দিনে অন্ততঃ বিশ বার সে বলিয়াছে, "যাক্ ভালই হ'ল, এত খাটুনি আর সহ্য হয় না—দুপুর বেলা এখন নিরিবিলি নিশ্চিন্তে একটু ঘুমানও যাবে, শরীরটাও তাতে ভালই হবে।"

অকৌতূহলী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সে বহু বার জানাইয়াছে যে শীঘ্রই তাহাদের ভাল মাষ্টার আসিতেছে। সে-ই এখন হইতে তাহাদিগকে পড়াইবে। বিজু তো আর সারা জীবনই এই হৈ চৈ করিয়া কাটাইতে পারে না—তাহার বিশ্রাম প্রয়োজন।

ভিন্ন গ্রামের কাহারও সাথে দেখা হইলে সে আপনা হইতেই বলিয়া বসে যে, যাক্ স্কুলটার এবার একটা ভব সুরাহা হইল। সে না থাকিল তাহাতে কি আসে যায়—স্কুলটা তো ভাল হইল। আর সে তো নিজে ইচ্ছা করিয়াই ছাড়িয়া দিতেছে। সতীনাথ কতবারই তো তাহাকে স্কুল ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছে, এবার তো সে রীতিমত রাগ করিয়াই তাহাকে পত্র দিয়াছে—তাই না, সে স্কুলটার একটা সুবন্দোবস্ত করিয়া আজ অবসর লইতেছে। এখন কি আর তাহার দুই বেলা স্কুল করিতে চারিবার এত হাঁটা হাটি পোষায়?

আপন খেয়ালে সে কথাগুলি বলিয়া চলে। কে উহা বিশ্বাস করিল, কে মুখ টিপিয়া হাসিল তাহা দেখিবার তাহার ফুরসং নাই বা বুঝিবারও ক্ষমতা নাই। হন্ হন্ করিয়াই সে আসে, এক নিঃশ্বাসে যাহা বলিবার বলিয়া আবার হন্ হন্ করিয়াই সে চলিয়া যায়। ব্যস্ততা তাহার সারা জীবনেও ঘুচিল না।

কিন্তু এই ব্যস্ততার অভাব প্রথম দেখা গেল—শেষ স্কুল করার দিনে। ১১-৪৫এর গাড়ী চলিয়া গিয়াছে—বিজুর তখনও খাওয়া হয় নাই। অন্য দিনে সাড়ে দশটা বাজিতে না বাজিতেই সে রান্না হইল কিনা জানিবার জন্য রান্নাঘরে কতবার খোঁজ নিতে আসে। পাশের বাড়ীর টুনি, হেনা, বেলা প্রভৃতিকে স্কুলে যাওয়ার জন্য তাড়া দিতে থাকে। কিন্তু আজ সেই যে সে সকাল বেলা হইতে তামাকের গুলি, পুরাণ ঝুল প্রভৃতি পরিষ্কার করিতে লাগিয়াছে তাহা যেন আর শেষই হইতে চায় না। ১১-৪৫এর গাড়ী চলিয়া গেলে গিন্নী আসিয়া বলিল, "স্কুলে যাবে না?"

বিজু যেন চমকাইয়া উঠিল। স্কুলে এখনও তাহার প্রয়োজন আছে? কালই তো অবসর—প্রচণ্ড অবসর! বাকী জীবনব্যাপী বিশ্রাম। তাহার সারা চিত্ত যেন কিসের বিয়োগ-ব্যথায় সেদিন হাহাকার করিয়া উঠিল। চোখের কোণটা একটু ভিজিয়া উঠিল—কি একটা দেখিবার ছলে চৌকীর নীচে মুখ লুকাইয়া বিজু বলে, "হ্যাঁ, যাচ্ছি।"

* * * *

বিজুর অবসর মিলিয়াছে। স্কুলের কাজ নূতন মাষ্টার দিয়া যথারীতি আরম্ভ হইয়াছে। বিজুর অলস মধ্যাহ্ন আর যেন কাটে না, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে বিছানায় সে গড়াগড়ি করে; কিন্তু ঘুম তাহার চোখের পাতার ত্রিসীমানায়ও আসে না। অথচ স্কুলে গেলে এই সময়টায় ছেলেদের ভয়াবহ গণ্ডগোলের মধ্যে বেত্র আস্ফালন করিতে করিতেও তো টেবিলে মাথা রাখিলেই তাহার ঘুম আসিত! আজ এত নিরিবিলি, ভাল শয্যা, সেবাযত্ন—অথচ ঘুম তাহার নিকট হইতে কত দূরে!

কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া বিজু উঠিল, জামাটা কাঁধে ফেলিয়া সে আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহিরও হইল। ছিঃ! লোকে কি ভাবিবে? কেন? সে তো আর স্কুলে যাইতেছে না! স্কুলের সম্মুখের রাস্তাটা দিয়া একবার পোষ্ট অফিসে যাইবে বই তো নয়!

পোষ্ট অফিসের রাস্তা ধরিয়া চলিতে চলিতে ভুলেই হয় তো বা বিজু আসিয়া স্কুলের দোর গোড়ায় থামিল। নূতন মাষ্টার সাদরে তাহাকে আহ্বান করিয়া ভিতরে বসাইলেন। বিজু বলে, এই—পোষ্ট অফিসে একটু যাচ্ছিলুম, পথে ভাবলুম আপনাকে একবার দেখেই যাই। তা এরা সব পড়াশুনা করছে কেমন? ভাল করে পড়াশুনা করলে কমল কিন্তু বৃত্তি পেতে পারে।

নূতন মাষ্টার বিনীত ভাবেই বলেন, বৃত্তি পাওয়ার মত মনে তো হয় না। অঙ্ক আর ভূগোলে ভয়ানক কাঁচা।

বিজু একটু হাসে,—অঙ্ক আর ভূগোল? তা সে এমন আর কি? দরকার হলে এক দিনে ও সব শিখিয়ে দেওয়া যায়।

নূতন মাষ্টার অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। বিজু কবে কোন্ ছাত্রকে একদিনে ক, খ, শিখাইয়াছিল, কোন্ ছাত্রকে কিরূপে কড়াকিয়া লিখিতে শিখাইয়াছিল, মণকষা-সেরকষা কি রকম আশ্চর্য্যপ্রণালীতে হজম করাইয়াছিল, তাহা সব একের পর আর বলিয়া চলিল। বিজু যেন আজ আর থামিতে চায় না। প্রায় আধ ঘণ্টা সংলগ্ন অসংলগ্ন অনেক রকমের অনেক কথাই সে বলিয়া চলিল। হঠাৎ এক জায়গায় সে থামিয়া পড়িল। নূতন মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া সে বলে, "এদের পড়াশুনার বোধ হয় ব্যাঘাত হচ্ছে। আপনার কাজ করুন।" বিজু

উঠি উঠি করিয়াও উঠিতে পারিল না। একটী ছাত্র আসিয়া বই নিয়া দাঁড়াইল। নূতন মাষ্টার তাহাকে শঙ্কা বানান করিতে বলিলেন। সে বলিল, 'শ', 'অনুস্বার', 'ক' আর 'আ'।

বিজু অবাক্ হইয়া সেদিন জানিল যে বানানের প্রচলিত রীতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কাজেই 'শঙ্কা'র চেহারা বদলাইয়া শংকা, চর্চার একটা চ অনাবশ্যক, হ্রস্ব ও দীর্ঘ ঈকারের নানা স্থানচ্যুতি ঘটিয়া গিয়াছে।

স্কুল ছাড়ার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে ইহার পরে বিজু পণ্ডিত জোরের সঙ্গেই বলে, "বাপ দাদার আমল থেকে যে বানান শিখে এসেছি তা ভুলে নূতন করে আবার বানান শেখা পোষায় না ভাই,—তাই ছেড়ে দিয়েছি।"

ভারতের লোকসংখ্যা সমস্যা

সত্যব্রত সেন

১৯৩০-৩১ সালে আমাদের দেশের লোকসংখ্যা ছিল ৩৫ কোটীর একটু উপরে। সবাই অনুমান করছেন এ রকম চল্‌লে ১৯৪১ সালে এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ৪০ কোটীতে। দশ বছরে ৫ কোটী লোক বেড়ে যাওয়া যা' তা' কথা নয়। গোটা গ্রেট ব্রিটেন বা জার্ম্মানীতে যা লোকসংখ্যা তার চেয়ে বেশী লোক বাড়বে আমাদের এই দশ বছরে। পশ্চিমের দেশগুলিতে চেঁচামেচি লেগে গেছে শিগ্‌গিরই লোক কমে যাবে, লোক বাড়াও। লোকে যাতে বিয়ে করে, যাতে বড় ক'রে সংসার পাতে কর্ত্তৃপক্ষরা তাতে উৎসাহ দেন। আর এখানে যে অনুপাতে লোক বেড়ে যাচ্ছে, হয়ত কর্ত্তৃপক্ষের দরকার হ'তে পারে চীৎকার করতে লোক কমাও, কমাও।

জিনিষটা একটু খতিয়ে দেখা ভাল। লোক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম প্রশ্ন উঠতে পারে, এরা খাবার পাবে কোথায়? উত্তর সব সময় খুব কঠিন নয়। একটা পেট এ পৃথিবীতে আসার সময় সঙ্গে সঙ্গে দুখানা হাতও আসে। আপনি বা আমি যদি সেই দু'খানা হাতের জোরে খাবার জোটাতে পারি অন্য লোক যারা আসবে তারাও বা পারবে না কেন? কিন্তু সমস্যার এত সহজ সমাধান সর্ব্বদা হয় না। উৎপাদন প্রণালীর অবস্থা যদি একরকম থাকে তবে একটা সময় আসে যখন যত হাত বাড়বে সেই অনুপাতে উৎপন্ন দ্রব্য বাড়বে না। সেই সময় লোক বাড়ার সঙ্গে দ্রব্য-সম্ভার বাড়লেও গড়পড়তা মাথাপ্রতি আয় যায় কমে। এই আয় বাড়া কমা দিয়ে মাপা হয় যে দেশে যা লোক হওয়া উচিত ছিল তার কম বা বেশী হচ্ছে কি না। লোকসংখ্যা যত কোটীই

বাড়ুক শুধু তা দেখে কিছুই বোঝা যায় না। আসল কথা হচ্ছে সেই সঙ্গে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা ভাল হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে সেই খোঁজ করা। আমরা সেই দিক দিয়েই দেখতে চেষ্টা করব।

এই লোকবৃদ্ধির চাপ (population pressure) মাপার এক উপায় হচ্ছে, যতখানি আবাদী জমিতে একজন লোকের থাকাখাওয়া পোষাক হতে পারে তার সঙ্গে গড়পড়তা মাথাপ্রতি কতটুকু আবাদী জমি আছে তার তুলনা করা। আমাদের আবহাওয়াতে (climatic condition) এখন আমাদের যে চাষ প্রণালী তাতে এক একার (acre) জমিতে যা ফসল হয় তাতে একজনার কোনমতে ভরণপোষণ চলে (minimum nourishment)* তাই এক একার জমিকে মাথাপ্রতি যত একার আবাদী জমি আছে তা দিয়ে ভাগ দিলে যে সংখ্যা পাব তাই হবে আমাদের লোকবৃদ্ধির মাপ।

† উপরোক্ত মাপকাঠি অনুসারে কয়েকটি দেশের লোকবৃদ্ধির মাপ

	লোকবৃদ্ধির আনুপাতিক মাপ
জাপান	১·৮
চীন	১·৩
ভারতবর্ষ	১·৩
সোভিয়েট রুশ	০·২৯
কানাডা	০·০৩
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	০·৩০

এই মাপের অবশ্য অসুবিধা আছে। শস্যাদির যদি আমদানি রপ্তানি না হ'ত তবে এই মাপকাঠি কাজে লাগত। এখানে দেখছি লোকসংখ্যার চাপ জাপানে সবচেয়ে বেশী অথচ জাপানের লোক না খেয়ে মরছে না। তারা খাবার অন্যদেশ থেকে আমদানি করে। এ জন্যই ইংল্যাণ্ড বা জার্ম্মানীর মতন দেশকে এই তালিকাতে ধরা হয় নি; আমদানি রপ্তানি হিসেব ক'রে লোকের অনুপাতে কত খাবার আমরা পেতে পারি তাই ধরা দেখা যাক।

*Dr. Radhakamal Mukherjee—Food Planning for 400 Millions, p. 6.

† Ibid p. 6.

লোকসংখ্যা ও যা খাবার (শস্যাদি) আমরা পাই * তার তুলনামূলক হিসেব।

(Index No.) ১		২ লোকসংখ্যা	৩ শস্যের পরিমাণ	৪ লোকসংখ্যার সঙ্গে শস্যের বাড়া-কমার তুলনা
৫ বছর ক'রে	১৯১০-১৫	১০০	১০০	০
	১৯১৫-২০	১০৩	১১৫	+১২
	১৯২০-২৫	১০০	১১১	+১১
	১৯২৫-৩০	১০২	১১৭	+১৫
	১৯৩০-৩১	১০৭	১২৩	+১৬
	১৯৩১-৩২	১১৪	১২২	+ ৮
	১৯৩২-৩৩	১১৭	১২৩	+ ৬
	১৯৩৩-৩৪	১১৮	১২২	+ ৪
	১৯৩৪-৩৫	১২০	১২৩	+ ৩

১৯১০-১৫ তে যত লোক আছে বছর ধরে হিসেব ক'রে তাকে ধরা হয়েছে ১০০। অন্য বছরের বাড়া-কমাকে এই ১০০-র সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখান হ'য়েছে। ১৯১০-১৫তে যত লোক ছিল তাই যদি ১০০ হয় তবে ১৯৩১-৩২এ যা লোক আছে এই তুলনায় তা হবে ১১৪। শস্যের পরিমাণও এই হিসেবে দেখান হয়েছে। ১৯১০-১৫এর পরিমাণকে ধরা হয়েছে ১০০।

আমরা দেখাতে চাচ্ছি যে, লোক যখন বেড়ে যাচ্ছে সেই সঙ্গে দেশে আমদানীকে ধ'রে ও রপ্তানীকে বাদ দিয়ে খাবার জন্য দেশে যে শস্য থাকে তা কি রকমভাবে বাড়ছে বা কমছে। দেখছি লোক যে পরিমাণ বাড়ছে খাবার শস্যের পরিমান বরাবরই তার চেয়ে দ্রুততর গতিতে বাড়ছে কিন্তু দু'টোর ব্যবধান ক্রমশঃই কমে আসছে। ১৯৩০-৩১ সালে সেখানে ছিল ১৬, ১৯৩৪-৩৫এ সেখানে মাত্র ৩। এখানে একটু সাবধান হওয়া ভাল। ওপরের সংখ্যাগুলি শুধু তুলনামূলক, এক বছরের অবস্থার সঙ্গে অন্য বছরের অবস্থার তুলনা। ৪র্থ কলমে লোকসংখ্যা ও শস্যের পরিমাণের (available food supply) বৃদ্ধির ব্যবধান দেখান হয়েছে মাত্র। আমরা যেন মনে না করি যে, যা খাবার আছে তা সবাই খাবার পরও ১৯৩০-৩১ সনে শতকরা ১৬ জনের মতন খাবার উদ্বৃত্ত ছিল বা ১৯৩৪-৩৫ সনে শতকরা ৩ জনের মতন খাবার উদ্বৃত্ত ছিল।

আমাদের বেশীর ভাগ খাবার দেশের ভেতর থেকেই আসে, আমদানি হয়ে নয়। কাজেই দেশের ভেতর থেকে কতখানি খাবার আসে তার একটা আন্দাজ পাওয়া ভাল।

* Ibid p. 18.

	১৯৩১	১৯৩৫
লোকসংখ্যা	৩৫.৩ কোটী	৩৭.৭
দেশের ভেতর যত খাবার (সব রকম, শুধ্ শস্য নয়) উৎপন্ন হয় তাতে সুস্থভাবে খেয়ে বাঁচতে পারে	২৯.১ কোটী	৩১.৯
খাবার কম পড়ে	৬.২ কোটীর	৪.৮ কোটীর

যে খাবার কম পড়ে তার কিছুটা আমদানি হয়। আর এত সত্যি যে সুস্থভাবে থাকার জন্য যতখানি খাওয়ার দরকার সবাই তা খেতে পায় না।

১৯৩১ থেকে '৩৫ এর ভেতর ২০ লক্ষ একার জমিতে শস্যাদির চাষ বেড়ে গিয়েছে, তাই ১৯৩৫ সনের অবস্থা একটু ভাল দেখাচ্ছে। লোক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাষের জমি বাড়ার সম্ভাবনা আর খুব বেশী নাই। খাবার জোটাবার জন্য কাজেই বাইরের দিকে চাইতে হবে। কিন্তু বাইরের থেকে আমদানি করলে সে জিনিষের দাম দিতে হয়। আমাদের দেশের শিল্পের এমন অবস্থা নয় যে শিল্পদ্রব্য রপ্তানি করে আমরা সর্ব্বদা দাম পুষিয়ে যেতে পারব। Industrial crop রপ্তানি করা যায় কিন্তু তা বাড়াতে গেলে শস্যের জমী নিয়ে টান পড়বে। তাই আমাদের দেশে কত লোক খেয়ে সুস্থভাবে বাঁচতে পারে তা বিশেষ করে নির্ভর করছে আমরা কতখানি খাবার উৎপন্ন করতে পারি সেই সামর্থ্যের ওপর। এখনই যত লোক আছে তাদের সবার খাবার জোটাবার সামর্থ্য আমাদের নেই এর ওপর লোকসংখ্যা যদি এত দ্রুতগতিতে বেড়ে চলে তবে আমাদের ভবিষ্যৎ আর্থিক অবস্থা যে আরও খারাপ হবে তা পরিষ্কার।

লোকবাড়াবার রকমটা চক্রবৃদ্ধি সুদের মতন। গতি ক্রমশঃই বেড়ে যায়। মহাযুদ্ধের পর থেকে লোকসংখ্যা দ্রুত বাড়ার জন্য ১ থেকে ১৫ বছরের ছেলে মেয়ে অনেক বেড়ে গেছে।* এই বয়সের মেয়েরা যখন সন্তান ধারণ করার বয়সে আসতে (১৫ থেকে ৫০ বছর) আরম্ভ করবে তখন তাদের সংখ্যা আজ ১৫ থেকে ৫০ বছরের ভেতর সন্তান ধারণোপযোগী যত মেয়ে তার চেয়ে বেশী হবে। যদি জন্ম মৃত্যুর হার এখনকার মতন থাকে, তবে বেশী সংখ্যক মেয়ে থাকার জন্য সন্তানও হবে বেশী। এই রকম ভাবে জন্ম মৃত্যুর হার একরকম থাকলে, লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বাড়বে। জন্ম মৃত্যুর হার অবশ্য একরকম থাকে না। মৃত্যুর নিষ্ঠুর হাত কখনও বা অনেক দুর্ভাগাকে শাস্তি দেয়। রোগ, মহামারীর সময় জন্মের হারও কমে যায়। অবস্থার খেয়াল না রেখে সংখ্যা যখন ক্রমশঃই বেড়ে যায় তখন প্রকৃতির খেয়ালেই তাদের চলতে হয়।

প্রকৃতির খেয়ালে না চলে এই বিপদ সমাধানের কোন পথ আছে কি না এই আমাদের সমস্যা। দুটো দিক দিয়ে সমস্যার সম্মুখীন আমরা হতে পারি। প্রথম হচ্ছে উৎপাদন প্রণালীর

* যুদ্ধের পর কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বেড়ে যায় ও কৃষকদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল হয়। জন্মের হারও এই সঙ্গে বাড়ে ও মৃত্যুর হার কমে।

উন্নতি সাধন করে মাথা প্রতি উৎপত্তি বাড়ান (কৃষি ও শিল্প দুইই) ও দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে এমন দ্রুতভাবে সংখ্যাবৃদ্ধি হতে না দেওয়ার চেষ্টা করা।

কৃষির ক্ষেত্রে জমির ওপরে যত লোক ভাল ভাবে খেয়ে থাকতে পারে তার চেয়ে যে অনেক বেশী লোক আছে এটা এত জানা কথা যে এ নিয়ে তর্কও আজকাল ওঠে না। জমি ভাগ হ'তে হ'তে সাধারণ চাষীদের মাথা প্রতি যতটুকু জমি পড়ে তাতে উন্নতপ্রণালীর চাষবাস প্রচলন করার চেষ্টা বৃথা। ভাল সার কলের লাঙ্গল এ সব ব্যবহার করতে হ'লে এক দিকে যেমন মূলধনের দরকার অন্য দিকে তেমন এক সঙ্গে অনেকখানি বিস্তৃত জমি লাগে। তা' না হলে উন্নতপ্রণালী প্রচলন করে শুধু ক্ষতিগ্রস্তই হ'তে হয়। অথচ জমিতে কাজ করার জন্য যত লোকের দরকার তার উদ্বৃত্ত সংখ্যাকে অন্য জায়গায় কাজ করার সুযোগ না দিলে কৃষিজগতে কোন মীমাংসাই চলে না।

এখানেই শিল্পের কথা আসে। জমির ওপর থেকে অনাবশ্যক লোকের চাপ সরাবার কথার সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পের প্রসারের প্রশ্ন ওঠে। একের উন্নতি অন্যের উন্নতিতে সাহায্য করে। কৃষিতেই হোক আর শিল্পেই হোক যন্ত্র ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য হ'ল কম খেটে বেশী উৎপাদন করা। তাই দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতির কথা উঠলেই আমরা দেখতে চাই যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে উন্নততর প্রণালীর প্রচলন করার সম্ভাবনা আমাদের কতখানি আছে। অনেক দিন থেকে গণ্যমান্য লোকদের কাছে শুনে আসছি যে আমাদের নাকি কৃষি নিয়েই থাকতে হবে। প্রকৃতির খেয়ালে নাকি আমাদের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হয়ে গেছে। যন্ত্রশিল্পের প্রসারতার ক্ষেত্র আমাদের নাকি আজকালকার যন্ত্রশিল্পী দেশের তুলনায় অতীব সঙ্কীর্ণ। পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিকদের প্রচলিত ভাঁওতার কথা বলছি না। ভারতের কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীও এরূপ মনে করেন। মনে করার কারণ অবশ্য এই যে যন্ত্রশিল্পের উন্নতির সব চেয়ে প্রধান উপাদান বিভিন্ন খনিজদ্রব্য ভারতবর্ষে নিতান্ত কম। কলকারখানা চালাবার জন্য যে শক্তির দরকার কয়লা, তেল ও বিদ্যুৎ হ'ল সেই শক্তির উৎস। এর যদি অভাব হয় ভারতে সত্যি কেমন করে তা হ'লে বিস্তৃতভাবে যন্ত্রের প্রচলন হবে? তর্ক হয়ত আরও কিছু দিন ধরে চলবে, কিন্তু ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক মহল মনে করেন যে ভারতের শক্তির উৎস প্রচুর।

"The source of potential wealth today is not merely good agricultural land of all varieties capable of yielding all kinds of food and other economic products, but also mines capable of yielding minerals useful to man, and sources of power (coal, oil, peat and other fuel, water power).' India is one of the three countries which enjoy potential plenty, the other two being U. S. A. and Russia."

Science and Culture. February, 1938.

প্রকৃতি আমাদের বঞ্চিত করে নি। যন্ত্রশিল্পের প্রসারতার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ নয়। কিন্তু এ ত শুধু potential wealth কি হতে পারে তার জল্পনা কল্পনা। সেই potential wealthকে

ব্যাবহারিক জীবনে আনার সমস্যা একেবারে সহজ নয়। সময় লাগে, সামর্থ্য লাগে, সঙ্ঘবদ্ধতা লাগে। যন্ত্রযুগের আরম্ভ গ্রেট ব্রিটেন থেকে। তার মাটির নীচে কয়লা ছিল হাজারের পর হাজার বছর। কিন্তু কেন ঊনবিংশ শতাব্দীতেই যন্ত্রযুগ এলো? মাটির নীচে খনি থাকলেই হয় না সে খনির দরকার বুঝতে হয়, খুঁড়তে হয়। পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরণা ঝরলেই হয় না, বিদ্যুৎ পেতে হলে তাকে বাঁধতে হয়। উর্ব্বর ক্ষেত্র থাকলেই হয় না তাতে শস্য ফলিয়ে সেই শস্য মুখের কাছে নিয়ে আসতে হয়। সমস্ত ঐশ্বর্য্য থাকা সত্ত্বেও একটা দেশকে দ্রুত উন্নতির পথে আনতে বিরাট সঙ্ঘবদ্ধতা লাগে, অনুকূল সামাজিক আবহাওয়া লাগে। সেটা কিছুটা সময় সাপেক্ষ। কাজেই ভবিষ্যতের ঐশ্বর্য্যের কথা ভেবে আজকের লোকসংখ্যার গতি দেখে নিশ্চিন্ত হওয়ার অর্থ হয় না। এখন বছরের পর বছর উৎপাদনশক্তির যদি কিছু উন্নতি হয় বাড়্তি সংখ্যা সামলাতেই সেই অধিকাংশ শক্তি ব্যয় হবে। আজ আমাদের দেশের জনসাধারণের থাকা খাওয়ার যে অবস্থা, তাদের সেই অবস্থায় রেখে তাদের সংখ্যা বাড়াবার পক্ষে কোনপ্রকার যুক্তিই থাকতে পারে না। তাই উৎপাদনশক্তি বাড়লেও সংখ্যা কমাবার চেষ্টাকে সংচেষ্টাই বল্তে হবে। এই অতিবৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণের সমস্যা উপরোক্ত যে কোন অবস্থাতেই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত।

অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে যে অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই সেই শ্রেণীর লোকের জন্মের হার কমে যায়। ঠিক ওই রকম একটা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নেই। অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লোকের শিক্ষা, সহজ জীবন যাপনের ইচ্ছা ও পারিবারিক কর্ত্তব্যবুদ্ধি বাড়ে। জন্মের হার আস্তে আস্তে কমে যাওয়ার কারণ তাই। দু' একটা উদাহরণ আপনাদের চোখে পড়লেও, অনেক লোক সম্বন্ধে বল্তে গেলে, অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নারীর সন্তান ধারণের ক্ষমতা কমে যায়—একথা একটুও সত্যি নয়। সচ্ছল অবস্থার লোকেদের ভিতর জন্মের হার কমে যাওয়ার কারণ সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছাকৃত (subjective) *। কোন দেশের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জন্মের হার যে কমে যায় এটা অবশ্য সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। কিন্তু তাই বলে আমাদের দেশের অবস্থা একটু ভাল হলেই জন্মের হার কমতে আরম্ভ করবে আর সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে একথা মনে করা ভয়ানক ভুল। কিছুদিনের জন্য আমাদের অবস্থাটা হবে ঠিক উল্টো। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এত খারাপ যে উঁচু জন্মের হার আরও উঁচু হতে পারে নি, এ ছাড়া মৃত্যুর হার ভয়ানক উঁচু। অবস্থা কিছু ভাল হলে জন্মের হার আরও বাড়ার সম্ভাবনা আছে আর মৃত্যুর হার যাবে কমে, কাজেই লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোন চেষ্টা না করলে, কিছুদিন আরও দ্রুতগতিতে বাড়তে পারে। অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে একটা সময় আসে যখন থেকে জন্মের হার কমতে আরম্ভ করে—শিক্ষা যখন বেড়ে যায়, সামাজিক জ্ঞান অথবা সহজ জীবন যাপনের ইচ্ছা যখন বাড়ে। অন্য দিকে মৃত্যুর হার একটা স্তরের নীচে নামতে পারে না। লোকসংখ্যা কমে যাওয়ার ভয় তখন থেকে আরম্ভ হয়।

* Carr-Saunders এর World Population নামক বইতে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে।

একটা জিনিষ আমাদের পরিষ্কার করে বোঝা দরকার যে নিয়ন্ত্রণ না করলে লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হবে না। হবে, কিন্তু তার ভার নেবে প্রকৃতি নিজে, আমাদের অসংখ্য কষ্ট দিয়ে। অতি রুগ্ন, প্রাণহীন ছেলেমেয়ে দেখলে লোকে 'আহা' করে কিন্তু একবার জন্মনিরোধের কথা বলে দেখুন, 'রাম রাম' করবে। এ নিয়ে কোন কথা বলাও অনেকে সহ্য করতে পারেন না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, যেখানেই যৌন সম্বন্ধে কোন কথা ওঠে লোকে হঠাৎ যেন কেমন অযৌক্তিক হয়ে যায়। অথচ শুধু ব্যক্তির নিজের জীবনেই নয় সামাজিক জীবনেও যৌন সম্পর্কিত সমস্যা গুরুতর ও অত্যন্ত জটিল। বিশদ আলোচনা করে সেই জটিলতা দূর করার সাহায্য করতে আমরা নারাজ।

সব দেশেই দেখা যায় যে জন্মনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা ভুল দিক থেকে আরম্ভ হয়। যারা সচ্ছল, শিক্ষিত যাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত ও স্বাস্থ্যবান্ হওয়ার সুবিধা আছে, কোন না কোনো প্রকারে নিয়ন্ত্রণ তারাই আরম্ভ করে; আর যাদের ছেলেমেয়েদের মানুষ করার সামর্থ্য নেই বা সামর্থ্য অত্যন্ত কম তারা একেবারে নির্বিকার। যারা পড়বেন তাদের জন্য এই প্রবন্ধ বিশেষ করে লেখা নয়। এই সমস্যা সম্বন্ধে যদি চিন্তা করেন ও সত্যি সত্যি যাদের ছেলেমেয়ের সংখ্যাধিক্যের জন্য সমাজে অনেক দুঃখ আসে তাদের যদি কোন প্রকারে সাহায্য করতে পারেন—তার জন্য এই লেখা।

সব কথা বলার পরও একটা কথা থেকে যায়। দেশের যে শ্রেণীর লোককে দ্রুত লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি সব চেয়ে আঘাত করবে, যাদের সব চেয়ে বেশী সজাগ হওয়া উচিত, ব্যাপকভাবে তাদের নাগাল, বোধ হয়, একমাত্র দেশের কর্তৃপক্ষই পেতে পারেন। কিন্তু এই সমস্যা সাধারণকে বোঝাতে গেলে জীবনের আরও অনেক ন্যায্য দাবী যা এই সঙ্গে বোঝাবার দরকার হবে তা কি বর্তমান কর্তৃপক্ষ কোনও অবস্থাতে করবেন? তাই বলছিলাম, ঘুরে ফিরে আবার রাজনীতিই এসে পড়ে।
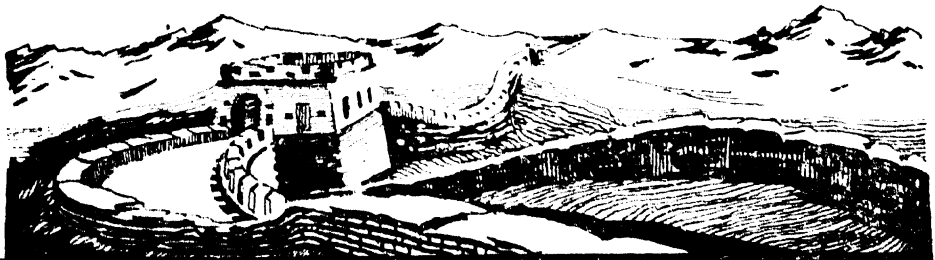
চীনা সংগ্রামের বর্ত্তমান অধ্যায়

ছায়া মিত্র

যুগে যুগে এক একজন মহামানব যখন সত্য ও শান্তির বাণী জগতের কানে শুনিয়ে যান, সন্তপ্ত জগৎ তখন স্তব্ধ বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় তাকে গ্রহণ করে। কিন্তু তার পরমুহূর্ত্তেই একটী বিশ্বগ্রাসী লোলুপতা তাকে অস্থির করে তোলে। আবার তার পশুবল, জঘন্য হিংসাবৃত্তি, পাপ লোলুপতা তাকে টেনে নিয়ে যায় একটা মহাজ্বালার পথে। যুগ যুগান্তব্যাপী সভ্যতার ফলেও মানুষ তার সেই জঘন্য হিংসাবৃত্তিটা ভুলতে পারেনি। মানুষ হোয়ে সে চায় মানুষকে ছোট করে রাখতে, বুভুক্ষু দরিদ্রের সম্মুখে সে সাজায় আপনার ভোগের সম্ভার, দুঃস্থের মৃত্যুক্রন্দনকে সে ছাপাইয়া দেয় উৎসব সঙ্গীত দিয়ে। নিঃস্বকে আরও নিঃস্ব করে, দুঃখীকে আরও দুঃখ দিয়ে, রক্তহীনের রক্ত শোষণ করে মানুষ তার দানব শক্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। আর সভ্য জগৎ এই পশুত্বকে বীরত্বের গৌরব দিয়ে আত্মপ্রবঞ্চনা করছে। কিন্তু প্রাচ্যে বা প্রতীচ্যে যারা এই পৈশাচিক লোলুপতার যুপকাষ্ঠে বিশ্বের শান্তিকে এমনি বলি দিতে যাচ্ছেন, তারা, পৃথিবীর তো দূরের কথা, নিজের দেশেরও সত্যিকারের কোন মঙ্গল সাধন করে যেতে পারেন কি? যুদ্ধ শুধু মানুষকে হত্যা করেনা, মানুষের সুরুচি, সুনীতি, মানুষের সর্ব্বস্ব হৃদয়টীকে পর্য্যন্ত অপহরণ করে।

ঐ প্রাচ্যের বলোদৃপ্ত জাপান লুব্ধ শকুনির মত নিরীহ চীনের উপর লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। চীনকে সে মানুষ করবে! তাকে শক্তিমান করবে, সুখী করবে! এ শুধু জগৎকে প্রতারণা নয়, এ আত্ম-প্রবঞ্চনা। শত সহস্র শ্রমিকের রক্তজলকরা পরিশ্রমের মূল্য নির্ল্লজ্জের মত আত্মসাৎ করে মুষ্টিমেয় ধনিকের এই যে আস্ফালন,—এরই অন্তরালে জাপান সমাজের স্তরে স্তরে রয়েছে যুগান্তের সঞ্চিত পুঞ্জীভূত গলদ। এত প্রাচুর্য্যের মধ্যেও জাপান সুখী নয়। এই ঐশ্বর্য্য জৌলুষের অন্তরালে আছে সহস্র আর্ত্তের সকরুণ ব্যথা, দরিদ্রের আকুল ক্রন্দন আর সহস্র নিপীড়িতের মর্ম্মন্তুদ হাহাকার। অসহায় অসহায়াদের ধন মান ও দেহদ্বারা পুঁজিবাদীদের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি ও লালসাতৃপ্তির বীভৎস চিত্র জাপানের সমাজকে পঙ্কিল করে তুলেছে।

কিন্তু এই আভ্যন্তরিক সামাজিক গলদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে জাপান আজ চীনে সভ্যতা বিস্তারের অজুহাতে যে পাপ যুদ্ধ সুরু করেছে, বর্ত্তমানে সেই সমরায়োজনের তৃতীয় অধ্যায় চলেছে।

পিপিং নগরে এই সমরায়োজনের প্রথম অধ্যায় সুরু হয় ১৯৩৭ খৃঃ জুলাই মাসে। জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য চীনবাসী প্রাণপণে বাধা দিতে লাগল। কিন্তু উপযুক্ত সামরিক শিক্ষার

অভাবে তারা কেবলি পশ্চাৎপদ হয়ে গেল। এই বৎসরই ডিসেম্বর মাসে নানকিংএর পতন হল। সাংহাইয়ে চীন সৈন্য যথেষ্ট বীরত্ব ও সাহস প্রদর্শন করল বটে : কিন্তু শেষ রক্ষা হল না।

প্রথম অধ্যায় শেষ হওয়ার পর কিছুদিন সংগ্রাম স্থগিত রইল। এই বিরতির মধ্যে জাপান নূতন করে আক্রমণ করার জন্য নববল সঞ্চয়ের দিকে মন দিল। কিন্তু চীনারাও নিঃশ্চেষ্ট ছিলনা। এই বিপদের দিনে তারা দলাদলি ও আত্মকলহ ভুলে গিয়ে সমগ্র দেশের শত্রু জাপানকে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করার সঙ্কল্প নিয়ে নবীন উদ্যমে সজ্জিত হতে লাগল। জাপানও তাহার সমস্ত শক্তি নিয়ে বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করল। হ্যাচাং আক্রমণ থেকে আরম্ভ করে পীতনদীর বাঁধভাঙ্গা, ইয়াংসির উপত্যকায় অভিযান, অবশেষে ক্যান্টন ও হ্যাঙ্কাউয়ের পতনই হল এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের চরম পরিণতি।

তারপর তৃতীয় অধ্যায়ে চীনজাপানের সমস্যাটা সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। বিশেষ করে আমেরিকার যুক্ত প্রদেশ এই ব্যাপারে বেশ একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। এসিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তের এই ঘটিকা আজ সমগ্র পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে।

আরও কতদিন এই প্রলয়লীলা চলবে তা এখনও কেউ স্থির করে বলতে পারেনা। আপোষ মীমাংসার সর্ত্তগুলির ভাঙ্গাগড়ার মধ্যদিয়ে জাপান তার চীন-অধিকারের ভিত্তিটা দৃঢ় করে তুলবার চেষ্টা করছে। সমস্যাটা এদিকে ক্রমশঃ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে বিশ্বসমস্যায় পরিণত হতে চললো। হয়ত বা এরই মধ্য থেকে আর একটা মহাসমরের বীজ গড়ে উঠছে।

গত দেড় বৎসর যাবত সমস্ত জগৎ বিস্মিতনেত্রে চীনজাপানের পরিস্থিতি লক্ষ্য করে আসছে। এই সংগ্রামের ফলে বহুধা-বিভক্ত চীনজাতি একত্র সংহত হয়ে যে সাহস ও শৌর্য্যের সহিত জাপান আক্রমণ প্রতিরোধ কর্ত্তে দাঁড়িয়েছে, তা বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। আঘাত পেয়ে জাতির প্রাণে একটা সাড়া এসেছে—উদ্বিগ্ন—জাগ্রত। মৃত্যু-তোরণে দাঁড়িয়ে চীন যেন আজ এক নতুন শক্তি লাভ করেছে। এদিকে জাপানও সুচিন্তিত অর্থনৈতিক প্রণালী উদ্ভাবনদ্বারা তার আর্থিক সঙ্কটের হাত হতে পরিত্রাণ লাভ করেছে। যুদ্ধের প্রারম্ভে জনৈক চিন্তাশীল ব্যক্তি বলেছিলেন—"এক-বৎসরের মধ্যেই চীন অপূর্ব্ব একতাসূত্রে বদ্ধ হতে পারবে আর জাপান অর্থনীতিতে পূর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।" সেই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে।

শত্রু বা মিত্র কেউ একবার ভাবতেও পারে নাই যে চীন এমনি বীরত্বের সহিত জাপানকে প্রতিরোধ কর্ত্তে সমর্থ হবে। যে হ্যাঙ্কাউ দখল করা জাপানের মাত্র ছয়মাসের কাজ বলে মনে হত, সেখানে প্রবেশ কর্ত্তেই দেড়বৎসর কেটে গেল ; অথচ জেনারেল চিয়াংকাইসেকের কেন্দ্রীয় সৈন্য-বাহিনী প্রায় তেমনি অক্ষুণ্ণ এবং অবিচলিত আছে। যে সামান্য দাবীর উপর সন্ধির আলো-চনা চলছে, তাও চীনের পক্ষে তেমন অগৌরবের বলা চলেনা। পরাজিত হলেও চীনের এই বিক্রম এই উন্নতি তিন বৎসর পূর্ব্বে কেহ কল্পনায়ও স্থান দিতে পারে নাই। অর্দ্ধশিক্ষিত অবস্থায় এবং তুচ্ছ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া চীনাসৈন্যগণ স্থল জল ও অন্তরীক্ষ পথের ত্রিধাবিভক্ত শত্রুর সহিত এই

দীর্ঘকাল যেভাবে যুদ্ধ চালিয়েছে তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। বর্ত্তমানে জাপান অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে পর্য্যন্ত চীনাগণ যে মনোবলের পরিচয় দিচ্ছে তা বাস্তবিকই আশাতীত। অবশ্য অনেক চীনা জাতীয় কর্ত্তব্য হতে বিচ্যুত হয়ে বিদেশীর প্রভুত্ব মেনে নিয়েছে। জাপান অধিকৃত বহুস্থানে জাপানী স্বেচ্ছাতন্ত্র মেনে নেবার জন্য বহু চীনাকেই বাধ্য করা হয়েছে। প্রাচীন কনফিসিয়াসের প্রভাবাধীন শ্যানটুং প্রদেশে বহু চীনা জাপানের অধিকার মেনে নিতে ও তাদের সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছে। কিন্তু চীনের অধিকাংশ লোকই যে এই পথ গ্রহণ করেনি বর্ত্তমানের খণ্ডযুদ্ধগুলিই তার প্রমাণ। মোটের উপর চীন আজ যেরূপ সংহত ও একতাবদ্ধ হয়েছে, পূর্ব্বে কেউ তা আশা করতে পারেনি। বর্ত্তমান যুদ্ধ চীনের প্রাণে একটা নব চেতনা এনে দিয়েছে।

পক্ষান্তরে জাপানও এই যুদ্ধে অনেক নতুন শিক্ষা লাভ করেছে। যে অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত জাপান দীর্ঘকাল এই যুদ্ধ চালিয়েছে, তা প্রশংসা না করে পারা যায় না। যোদ্ধা হিসাবে জাপানও কৃতিত্ব প্রকাশ করেছে। যুদ্ধের প্রারম্ভে অনেকেই মনে করেছিলেন—জাপান ভীষণ অর্থসঙ্কটে পড়বে। কিন্তু জাপান সে সঙ্কট এড়িয়ে চলতে সমর্থ হয়েছে। যোদ্ধা হিসাবে জাপানের সর্ব্ববিধ নৈপুণ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহই উঠে না। চেঙ্গিস খাঁ প্রভৃতি মোগলের পরে এমন প্রবল আক্রমণের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বড় একটা চোখে পড়ে না। চতুর্গুণ শত্রুসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াও জাপান তাহার অভীষ্ট লাভ করতে পেরেছে। এই সব আক্রমণকালে প্রকৃতির প্রতিবন্ধকগুলি অতিক্রম করতেও যথেষ্ট কর্ম্মক্ষমতার প্রয়োজন। নদীগুলি পার হওয়ার জন্য নিপুণ সাঁতার আগে থেকেই তৈয়ারী করা হয়েছিল। চীনের প্রত্যেকটী সহরের প্রাচীর-বেষ্টনগুলিকে ভাঙ্গবার জন্য বিশেষ কর্ম্মক্ষমতার দরকার। পরিখার মধ্যে অবস্থিত চীনাসৈন্যদের তাড়িয়ে দিবার জন্য তারা একদল নিপুণ বিমানসৈন্যকে শিক্ষিত করে তুলেছিল। এই সব সামরিক দূরদর্শিতার জন্য জাপানকে 'সাবাস' দিতেই হবে।

National mobilisation আইনের বলে সমরবিভাগ দ্বারাই জাপানের অর্থনীতি পরিচালিত হয়ে থাকে। ২ বৎসর পূর্ব্বে বড় বড় ব্যবসায়ীদের যেমন অনেকটা স্বাধীনতা ছিল, তেমনি তাহারা আবার দেশের কথা ভাবত অতি অল্প। কিন্তু আজকাল আর সে ব্যবস্থা নেই। আজ আর কেহ ইচ্ছানুরূপ আমদানী করতে পারে না। বহির্বাণিজ্যের ফলে আজকাল যে টাকাটা উদ্বৃত্ত হয় (trade surplus) তাহার সামরিক বিভাগেই দেওয়া হয়। ব্যবসায় ক্ষেত্র হইতে যে সহযোগিতা আদায় করা হয়, স্বয়ং জাপান সেনাপতিও এর চাইতে বেশী কিছু আশা করতে পারেন না।

অভীষ্ট লাভের পথে যা কিছু অন্তরায় ছিল সর্ব্বপ্রযত্নে সে সব দূর করে জাপান সমস্ত দেশময় একই মনোভাব সৃষ্টি করেছে। ইটালী জার্ম্মাণি বা রাশিয়াকে দেশের ভিতরকার যে বাধার সঙ্গে যুদ্ধ করে অগ্রসর হতে হয়েছে, জাপানের সে সব হাঙ্গামা বর্ত্তমানে আর কিছুই নেই। শ্রমনেতা, অধ্যাপক ও নানা ভাবের উদারনৈতিক ভাবাপন্ন প্রায় ৪০০ ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করে জাপান তার

সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত বাধা দূরীভূত করেছে। রেডিও এবং নানা সংবাদপত্রের উপরও কড়া অনুশাসন চাপান হয়েছে। এই সকল জবরদস্তির ফলে দেশের ভিতর যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী ছিলেন তাদেরও আর টু শব্দটী করার উপায় নেই। সহযোগিতা না করলেও বিরোধিতা করবার সাহস আর কারোই নেই। সকলেই অবনত মস্তকে সকল ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। সমস্ত দেশময় একই মতবাদ প্রচারিত হয়েছে।

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় এই দুইটী দেশই যেমন বিভিন্ন বিষয়ে শক্তিলাভ করেছে, তেমনি অনেক বিষয়ে আবার দুর্ব্বলও হয়ে পড়েছে। মোটামুটি দেখা যায়, জাপান যে পরিমাণে পার্থিব শক্তি অর্জ্জন করেছে, তেমনি সে হারিয়েছে তার আধ্যাত্মিক সম্পদ। চীনের এই প্রতিরোধ যেন পশুশক্তির সহিত মনঃশক্তির বিরোধ।

জাপান কর্ত্তৃক চীন গ্রাস ১৯৩২—১৯৩৮

নানকিংস্থিত বিমানবাহিনীর উপর চীনের অনেকখানি ভরসা ছিল। আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে নানকিনে বিমানযুদ্ধ চলল। প্রথমটায় উভয় দলই বিজয়ী বলে দাবী জানাল। কিন্তু অচিরেই চীন তাহার অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। চীনের বিমানশক্তি একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল। যথেষ্ট ক্ষতির ভিতর দিয়ে জাপান বিজয়গৌরবে নানকিং দখল করল।

মার্কোপলো ব্রিজের নিকট গুলিবর্ষণ আরম্ভ হবার তিন বৎসর পূর্ব্বেই চীনও জাপানের ন্যায় প্রস্তুত হতেছিল। সুপ্রচুর গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা সত্ত্বেও বিশেষ কোন সুবিধা হল না। বিমানপোতগুলি ধ্বংস হয়ে গেল, মূল্যবান্ কামানগুলো বিপদের সময় পরিত্যাগ করে পালাতে হল, যানবাহনগুলি সব নষ্ট হয়ে পড়ল এমন কি শত্রুর হস্তগত হওয়ার ভয়ে খাদ্যভাণ্ডার পর্য্যন্ত নষ্ট করে দেওয়া হল। জাপানীদের ভয়ে চীনাগণ সাংহাই হ্যাংচো, নানকিং প্রভৃতি অঞ্চলের সমস্ত দুর্গ ও জনপদ ত্যাগ করে অভ্যন্তর দেশে চলে গেল। শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে যুদ্ধ করতে পারলে হয়ত আরও ছয় মাস এগুলিকে রক্ষা করা যেত। সামান্য কয়েকজন মাত্র সৈন্য মেসিনগানের সাহায্যে জাপানীদের প্রাণপণে বাধা দিয়েও অকৃতকার্য্য হল।

গরিলাযুদ্ধের সাফল্য সম্বন্ধে অনেকের মনে সন্দেহ উঠেছে। কেউ কেউ ভাবেন জাপানী-দিগের ব্যতিব্যস্ত করে তাড়িয়ে দেওয়ার প্রায় সকল প্রচেষ্টাই তাদের ব্যর্থ হয়েছে। এটা স্বীকার্য্য
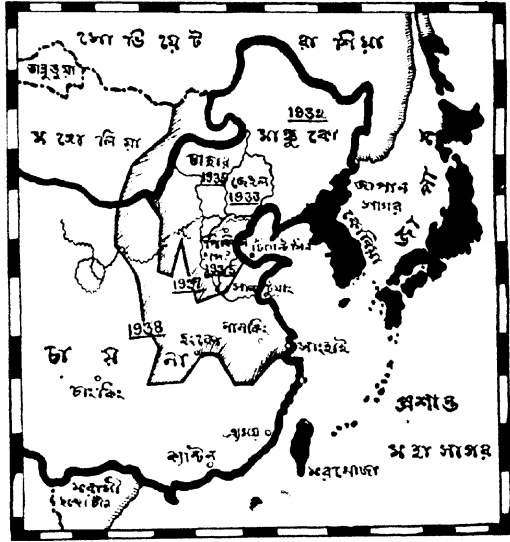
যে জাপানকে তারা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে; কখনও বা জাপানীদিগকে পিছু হটতেও বাধ্য করেছে। একজন জাপানীনেতা এদের সামান্য মশক ঝাঁকের সহিত তুলনা করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে এই গরিলারা জাপানীদের যথেষ্ট নাজেহাল করেছে।

জাপানের দিকে তাকালে মনে হয় আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাহারা অনেকটা নীচে নেমে গেছে। সমর বিভাগের উপর সর্ব্বসাধারণের আর তেমন শ্রদ্ধা নেই। তাই নানা প্রকার প্রচার আরম্ভ হয়েছে—চীন বিজয়টা যেন জাপানের একেবারে মুঠোর মধ্যে। নানা ভাবে প্রলোভিত করে সমর-বিভাগের দিকে সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করা হয়। তাইয়ার, চোয়াং ও নানকিংএর গোলযোগের পর থেকেই জাপানী সৈন্যদের মধ্যে একটু বিশৃঙ্খলার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন সামরিক কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ, টোকিওর জেনারেল stuffএর সহিত খাস-জাপানের সেনাপতিদের সহিত মতভেদ ও মনকষাকষি, সামরিক নীতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রভৃতি একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়—জাপানের সমরবিভাগের নীতি ও শৃঙ্খলা অনেকটা শিথিল হয়ে উঠেছে। বিগত কয়েক বৎসরের শৃঙ্খলাহীন সমরপ্রণালী লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে জাপানের জাতীয় জীবনের বেপরোয়া বিশৃঙ্খলতা যেন সমরবিভাগেও প্রবেশ লাভ করেছে। বিভিন্ন দলপতির মধ্যে প্রধান কর্ম্ম-কর্ত্তাটী যে কে—তাই বিচার করবার জন্য সাংহাইয়ের যুদ্ধ কয়েকদিন স্থগিত রাখতে হয়েছিল।

যুব আন্দোলন—প্রচারের জন্য তরুণ তরুণীরা গ্রামে কৃষকদের ভিতর প্রচার কার্য্য চালাচ্ছে

আত্মকর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে জাপানীদের একটা বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায়। অনেকেই মনে করে—কেবলমাত্র সে-ই নিজে সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষা করছে। 'প্যানয়ের' (Panay) বোমাবর্ষণ প্রভৃতি ঘটনা হ'তে এর সত্য প্রমাণিত হয়। এই আত্মম্ভরিতাই নাকি জাপানীদের "আইকোকু" অর্থাৎ দেশপ্রীতি।

জাপানের ঔদ্ধত্য আজ পারিপার্শ্বিক জাতিগুলিকে ত্যক্ত করে তুলেছে। আজ পর্য্যন্ত সকলেই নীরবে তার এই সব কুকীর্ত্তি দেখে যাচ্ছে। কিন্তু এরও প্রতিক্রিয়া একদিন অবশ্যই আরম্ভ হবে। নেপোলিয়নের মত হয়ত জাপানেরও শেষ রক্ষা হয়ে উঠবে না। পারিপার্শ্বিক

রাষ্ট্রগুলিকে জার্ম্মান উপেক্ষা করত বলেই পৃথিবীর মহাসমরের ডঙ্কা বেজে উঠেছিল। শক্তিমান্ রাষ্ট্রগুলিকে উপেক্ষা করার মনোবৃত্তি জাপানেরও চরিত্রগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কে জানে এর পরিণতি কোথায় ?

চীন-জাপানের পরিস্থিতি নিয়ে যারা চিন্তা করেন তারা অনেক কিছুই ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী করাটা একটু গুরুতর। তবু বর্ত্তমান পরিস্থিতি থেকে মনে হয় সন্ধির কথাবার্ত্তায় চীন ভুলে থাকবে না। সে তার প্রতিরোধ চালাতেই থাকবে। জাপান হয়ত এবার যুদ্ধে ক্ষান্ত হয়ে আভ্যন্তরীন বিধিব্যবস্থা নিয়ে কিছু দিন ব্যস্ত থাকবে। জাপানের আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির একটু গুরুতর আকার ধারন করা অসম্ভব নয়। হয়ত চীন থেকে তাদের দৃষ্টি ফিরিয়েই আনতে হবে।

জাপানের বিরুদ্ধে ধর্মঘট। স্কুল কলেজের মেয়েরা শ্রমিকদের সাথে একযোগে কাজ করছে

সংস্কৃতি আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ—চীনের যুবশক্তি

আন্তর্জাতিক ব্যাপারে জাপান ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের যে সম্বন্ধটা দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হয় এই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য্য হয়ে উঠেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে জাপানের প্রতি বিদ্বেষ ক্রমশঃই সাংঘাতিক আকার ধারণ করছে। জাপানে যুদ্ধসরঞ্জাম রপ্তানী বন্ধ করে দেবার জন্য কংগ্রেস সুস্পষ্ট আন্দোলন তুলেছে। কিন্তু জাপান তাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করে কিছুতেই যেন ভ্রূক্ষেপ করছে না। মোটের উপর জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A.) উভয়েই বুঝতে পারছে যে এর পরই আরম্ভ হবে অর্থনৈতিক চাপ—এবং তার ফল অনিবার্য্য যুদ্ধ।

চীন যদি জাপানের গতি প্রতিরোধ করতে সত্যই অসমর্থ হয়ে পড়ে, জাপানসৈন্যের বিশৃঙ্খলতার জন্যই হয়ত এই যুদ্ধের অবসান হবে। জাপান জাতিটাকে যারা ভাল করে জানেন তারাই জানেন জাপানের জাতীয় চরিত্রে দৃঢ়তার বেশ একটু অভাব আছে। কাজেই, সৈন্যেরাই যে একদিন বিদ্রোহী হয়ে উঠবে না—একথা নিশ্চয় করে বলা শক্ত। একটার পর একটা যুদ্ধরত নগরকে অবরোধ করে বসে থাকা অত্যন্ত ক্লেশজনক। গত চারি বৎসরে জাপানী সৈন্যদের মধ্যে বহুবার বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল বলে শোনা যায়। আক্রমণকারী সৈন্যদের অবস্থা কোনকালেই সুখের নয়। অসাধারণ ক্লেশ, তারপর ঘরে বাইরে শত্রু ও মিত্র উভয়ের গঞ্জনা ও গালাগালিই তাদের একমাত্র পুরস্কার।

সতর বছরের একটি চীন তরুণী। নৃত্যকলার ভিতর দিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে শিশুদের শিক্ষা দিচ্ছে

এদিকে চীনের অবস্থাও কম শোচনীয় নয়। একদল বলছে সন্ধি কর, আর একদল বলছে যুদ্ধ কর—এই দোটানায় পড়ে চীনও কিংকর্তব্য স্থির করতে পারছে না। ওয়াং-চিয়াং-ওয়েইর দলত্যাগের অর্থে যতই তুচ্ছ হোক তার ভিতরই চীনের জাতীয় শাসনতন্ত্রের অবস্থাটা কতকটা অনুমান করা যায়। সন্ধির সর্তগুলি যথেষ্ট অসুবিধাজনক হলেও তা গ্রহণ করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। যে সকল জাপ-বিরোধী নেতা যুদ্ধের জন্য উত্তেজনা সৃষ্টি করছেন তাদেরও খুব সমর্থন করা যায় না। কোন সুযোগ দেখলে হয়ত তারা সন্ধির জন্য চেষ্টাই করবেন।

কিন্তু চীনের প্রধান রণনেতা চিয়াংকাইসেক স্পষ্টই বুঝতে পেরেছেন যে জাপানের নিকট আত্মসমর্পণের অর্থ চীনের রাজনৈতিক মৃত্যু। গরিলাযুদ্ধে ব্রতী বিপুল সংখ্যক চীনাসৈন্য সন্ধির প্রস্তাবে কর্ণপাতও করে না। তারা শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করবার জন্য বদ্ধপরিকর। এরা যদিও বেশ সুনিয়ন্ত্রিত, তথাপি সন্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদের ফিরিয়ে আনতে পারে এমন কোন শক্তি চীনে নেই বললেও চলে।

এই যুদ্ধের তৃতীয় অধ্যায় চলছে, কালবৈশেখীর মত। উদ্দেশ্যহীন দমকাহাওয়ার মতই এখানে সেখানে গর্জ্জে উঠে। সন্ধিস্থাপনের প্রধান অন্তরায় এই যে চীন বা জাপান কেউ স্থির করতে পারছে না—কিরূপে সন্ধিও করা যায় অথচ নিজ নিজ স্বার্থও ষোল আনা বজায় থাকে। চীনের জনৈক দার্শনিক বলছিলেন—চীন যুদ্ধ করতে পারে, সন্দেহ নেই; কিন্তু শান্তিস্থাপনের বেলায়ই সে হয়ে যায় একান্ত অকর্ম্মণ্য।

সন্ধ্যারাগ

মণ্টুরাণী ঘোষ

চিহ্ন তোমার রাজে—
ধূলায় ধূসর বিজন পথে, পূর্ণিমার-ই সাঁঝে।
হাটের বোঝা নামিয়ে দিয়ে
হারিয়ে গেছ যে-পথ বেয়ে,
চারু চরণ-চিহ্ন দেখি তাহার ধূলি মাঝে।

দিনের শেষে প্রদীপখানি আঁচল দিয়ে ঢাকি
পথ চলিতে আপন মনে, চমকে চেয়ে থাকি।
ঐ তো হোথায় পরশ তব
জানিয়ে দে যায় বার্ত্তা নব,
বিস্মরণের অন্ধ প্রহর ফিরিল কোন্ কাজে!

ভীরু সে দীপ নামিয়ে দিলাম পথের ধূলি-তলে,
পরশ-মাখা চিহ্ন যেথায় নীরব হ'য়ে জ্বলে।
আপন-হারা নয়ন-কোণে
অশ্রু ঝরে সঙ্গোপনে,
মুক্তামালায় সাজিয়ে দিলাম,—বেদন-ভরা সাজে॥

সীমান্তে

সুশীলা দাশগুপ্তা

জনমানবশূন্য একটি ভুট্টাক্ষেতের পাশ কাটিয়ে মেয়েটি যাচ্ছিল ; খচ্চর, ভেড়া চড়ে এমন কোন পথের উদ্দেশ্যে, কিন্তু পথের উপর অগ্নিগর্ভ ধূম্রবর্ণ 'শ্বং' পাহাড়। উত্তপ্ত পড়ন্ত রৌদ্রে পাশের গ্রাম হতে সে এসেছে ঘুঁটে সংগ্রহ করতে, কারণ জ্বালানি কাঠ শুধু এখানে দুষ্প্রাপ্য নয়, ছোট মাটির উনানে ব্যবহারও একান্ত দুঃসাধ্য। মালভূমিতে শ্রেণীবদ্ধ মাটির ঢিপি, এর ভিতরে কোন মতে তার মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই আছে। সে ইতস্ততঃ শ্যেন দৃষ্টিতে তাকাল। প্রান্তরে জনমানবের কোন চিহ্ন নেই।

ক্ষণকালের জন্য সে প্রলম্বিত পাহাড়ে দাঁড়াল, নিদাঘের তপ্ত রৌদ্র, তাকান যায় না। হাত ঢাকুনি দিয়ে পাহাড়ের উপর কোন ঝোপ আছে কিনা দেখে নিল, কারণ যূথভ্রষ্ট খচ্চর বা ভেড়া রক্ষকের দৃষ্টি এড়িয়ে এ সকল ঝোপে একটু বিশ্রাম করতে আসে। কিন্তু কোথাও তৃণগুল্মের কোন চিহ্ন নেই। তার দৃষ্টিপথে উপত্যকার বুকে শুধু শাদা, লাল, পিঙ্গল পাহাড়ের পর পাহাড়। সুদূর দিগ্বলয়ে সীমাহীন আকাশে যেন রুদ্ধ, তপ্ত শ্বাসের মত পাহাড়গুলি মিশে গেছে। সে আবার চলতে সুরু করল। পায়ের জুতো ছেঁড়া। তলাটা শতছিন্ন। আজ ভোরে 'উড়োকল' হ'তে ছড়ান কাগজ দিয়ে কিছু পুরু করা হয়েছিল। পথ চলায় তাও নষ্ট হয়ে গেছে। জ্বলন্ত অঙ্গারের মত মাটি তার পায়ে লাগছে।

রুদ্ধ আবেগে মনে মনে বলে উঠল। 'সে আমার জন্য জুতো আনবে বলেছিল ; এখন তার কোন কথাই মনে নেই। পেশোয়ার হ'তে যে সকল লোক ফিরেছে ঘৃণাক্ষরেও তার কোন কথা তাদের মুখে শুনি নেই ; শুধু এক গুজব 'আংরেজ' সরকার তাকে আটক বন্দী ক'রে রেখেছে, খাঁন সাহেব ও তার ভাই আব্দুল গফুর খাঁর বক্তৃতা শুনার অপরাধে।'

মাথায় একটা প্রকাণ্ড ধামা। এর ছায়াশীতল হাওয়ায় তার চিবুকদেশ পাকা ডালিমের মত রক্তিমাভ হয়ে উঠেছিল। সে পথ চলছে। মাঝে মাঝে স্মৃতির পরশ এসে তার মনে লাগছে। এ সকল স্মৃতি এখন আর কথার মায়াজাল নয়, রক্তমাংসের মূর্ত্ত স্পন্দনরূপে তার দেহেই অনুভূতির মত মিশে আছে।

শামুদ তাকে নানা কথা বলে জ্বালাতন করত। 'আব্দুল রহমানের ডালিমকুমারী, গোলাপ-কুমারী কন্যা করিমা' ব'লে সে পুরাতন পার্ব্বত্যগাথায় নিষিদ্ধ অংশে টান দিত, সুরে অর্থপূর্ণ চটুলতা মিশ্রিত থাকত। তারপর হঠাৎ করিমাকে বুকে টেনে নিয়ে অজস্র চুমু দিত। তপ্ত আবেগে করিমার চিবুক আরক্ত হয়ে যেত।

আজ তার ভিতরটা যেন খালি খালি লাগছে। ভোরের পিপাসার মত কি একটা

অস্বস্তিবোধ তাকে উত্যক্ত করছিল। তার মনের নিভৃতকোণে নানা স্মৃতি এসে ব্যঞ্জনা দিচ্ছে। শামুদের দৃঢ় আলিঙ্গনে করিমা আবদ্ধ। বিস্রস্ত তার ইজার কামিজ। হঠাৎ গতিস্বাচ্ছন্দ্য ভঙ্গজনিত নিগূঢ় অস্বস্তিবোধ ধীরে ধীরে অন্তরের প্রশস্তিতে পর্য্যবসিত হল। সে লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠল। প্রাণের প্রাচুর্য্যে সে ভরপুর। চারিদিকে বনানীর সুগভীর মৌনতার মধ্যে দু'একটি ঝিঁঝিঁ ও শিষ পোকার শব্দ শুনা যাচ্ছিল। হঠাৎ তার মনে পড়ল শামুদ মাঠে ও গৃহে কেমন ভূতের মত কাজ করত।

সব সময়ই তার সেই অদ্ভুত কথা আব্দুল রহমানের 'ডালিমকুমারী গোলাপকুমারী কন্যা করিমা, তার ভাবী শিশু ইসমত এখনও একটি উত্তাপপ্রদ আরামদায়ক স্পন্দনের মত তার জ্রূণের মধ্যে আছে। মসজিদের নিকট কূয়া হ'তে কয়েক বালতি জল টেনে তার দেহ শীতল করল। পেটের ভিতর হাত পা সঞ্চালন অনুভব ক'রে শামুর উদ্দেশ্যে নালিশ করল। শামু যেন হাসিমুখে তার আগের কথা সুরু করে দিল। 'ডালিমকুমারী, গোলাপকুমারী করিমা,' তোমার ছেলে বেরিয়ে আসতে ছটফট করছে। পেটের মধ্যে একরত্তি ছেলে, এখনই তার এ অবস্থা। ভবিষ্যতে দুষ্টামি ও সাহসে তার বাপকে হার মানাবে যে। ......অদৃষ্টের কি পরিহাস।

ধামার চাপে নতদৃষ্টি হয়ে সে আবার পাহাড়ের দিকে তাকাল। স্মৃতির নিভৃতালোক হতে যেন তার ভাবী শিশু নবীন, কোমল কিশলয়ের মত উদ্‌গত হয়ে আসল। তার সতৃষ্ণ দৃষ্টি পিতার গন্ধসৌরভ মাখান ছোট্ট হাত পা গুলিতে নিবদ্ধ ছিল; চারিদিকে সূর্য্য উনানের ভস্মাচ্ছাদিত কয়লার মত অগ্নিবর্ষণ করছিল। সে জীবজন্তুর কোন চিহ্ন দেখতে পেল না। ধূমায়িত ক্রোধ এবং ক্ষোভে তার অন্তর ভরে উঠছিল। প্রায় এক বছর হল রমজানের পূর্ব্বে শামু চলে গেছে। সরকার তাকে আটক করে রেখেছে—কতদিন এভাবে যাবে সে জানে না। চারিদিকের নিষ্করুণ আকাশ বাতাস, পাহাড় পর্ব্বতকে লক্ষ্য ক'রে সে বিমূঢ়ের মত বলে গেল 'তোমরা আমাকে শুধু বল সে এখনও জীবিত আছে কিনা, হা খোদা! আমাকে জানতে দাও সে প্রাণে বেঁচে আছে কিনা। তা হ'লে ইংরেজ সরকারের জন্য দিনরাত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে ওয়াজিরস্থানের রাস্তা নির্ম্মাণও আমার গায়ে লাগ্‌বে না।'

ঘর্ম্মাক্ত মুখমণ্ডল মুছে স্বেদনির্গম জনিত ক্লান্তি দূর করার জন্য সে মোরগের পালকের মত গায়ের ছেঁড়া কাপড়-চোপড় একটু ঝেড়ে নিল। মনে মনে ভাবল শামু নিশ্চয়ই জীবিকার্জ্জনের জন্য ফিরিঙ্গীদের কাজে পাথর ভাঙ্গা পছন্দ করবেনা, কারণ এর ভিতরই লোকে বলাবলি করছে যে আদমের সন্তানগণকে গুলি করে মারার জন্য সৈন্যচলাচলের পথ তৈরী হচ্ছে। কিন্তু সে তাতে কি করবে? শিশুটির জন্য তার যেভাবেই হউক বাঁচতে হবে। ভুট্টা ও গমের জন্য যৎসামান্য জমি যা শামু চাষ আবাদ করতো স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহাও অসম্ভব। পূর্ব্বের সামান্য যে সঞ্চয়, বৎসরান্তে তা'ও শেষ হয়ে গেছে। এজন্য বাধ্য হয়ে তাকে এ সামান্য বেতনের কাজ করতে হয়। সাহেব লোক কখনও বেতন বেশী দেয়না। সারাদিনের পারিশ্রমিক এক আনা, ভোর হতে বেশী রাত্রি কাজ করলে

আরো দুপয়সা মিলত। এছাড়া করিমা এবং তার সহকর্ম্মী কয়েকজন মেয়ের ওপর, গ্রামবাসীগণ মোটেই সন্তুষ্ট ছিলনা। মোল্লার দল তাদের জাতিচ্যুত করার জন্য ভয় দেখাচ্ছিল। কিন্তু পয়গম্বরের নিকট সে ত নির্দোষ। একদিন কোন সৈন্য তাকে একটু কুৎসিৎ ইঙ্গিত করলে সে তার ছোড়া নিয়ে ছুটে আসল। সৈনিকপুঙ্গব তখনই পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। ফলে অন্যান্য সৈন্যগণ তাকে বাঘিনীর মত ভয় করত এবং পরে তার কাছে ঘেঁষতে সাহস পেতনা।

'রহমতের বাপ আমাকে যেমনটি দেখে গেছে ঠিক তেমনটি পাবে, লোকে যাই বলুক। আমি তার ছেলেকে যেভাবে পারি প্রতিপালন করব। সে কত বড় হয়েছে। বাপের মতই দুষ্ট। কালো তার চক্ষু, তীক্ষ্ণ তার নাসিকা, গায়ের জোড় সবই ত বাপের মত। সে নিশ্চয়ই এখন জেগে গেছে। আমার আর ঘুরাঘুরি করা উচিত নয়।'

মুহূর্ত্তের জন্য আবার পর্ব্বত প্রান্তে দাড়িয়ে রুক্ষ অধিত্যকাদেশ দেখে নিল, চমকি পাথর ঘন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত বালিকণা জ্বল জ্বল করছিল। সে ভাবল নিকটে নিশ্চয়ই জলাশয় আছে। গরু ভেড়া তবেত জল খেতে ওখানে আসে। জ্বলন্ত লৌহের মত পর্ব্বত গাত্র উত্তপ্ত হয়ে আছে। বার বার পা উঠিয়ে অধৈর্য্যের মত এদিক সেদিক তাকাচ্ছিল। সামনেই বিরাট ধূসর প্রস্তরখণ্ড। তার পিছনেই নেমে ঘুঁটে পাওয়া যায় কিনা দেখার ইচ্ছে হল। নিকটে একটা জামের গাছ। আল্লার মরজি হলে বা ছায়ায় ঘুঁটে মিলতে পারে। ফলকের মত কাটা পাহাড়ের প্রত্যন্ত ভাগে লাফ দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে সে উঠল। মাটির ফাটালে গর্ত্ত ছিল। প্রথমে তার কিছুটা ভয় হল; কারণ এসকল গর্ত্ত সর্পসঙ্কুল। সে একটু নীচে নেমে আসল। নেহাৎ কৌতুহলবশবর্ত্তী হয়ে সে মাথা নীচু করে একটি গর্ত্তের দিকে তাকাল এবং বা পা দিয়ে ভিতরে কিছু আছে কিনা বুঝে নিল। একটি তীব্র কর্কশ শব্দ। গর্ত্ত হতে আসছেনা নিশ্চিত হয়েও সে পর্ব্বতের পাদদেশে ইতস্ততঃ এক পাথর হতে অন্য পাথরে তাড়াতাড়ি লাফিয়ে পার হচ্ছিল। নীচে হঠাৎ থেমে দাঁড়াল। পা ভর দিয়ে আর থাকতে পারছেনা। ক্ষণিকের জন্য সমস্ত দুনিয়াটা যেন তার চক্ষের সামনে ঘুরতে লাগল। হৃদপিণ্ডে হাতুড়ি পেটার মত শত শব্দ তার কানে আসছিল। কিন্তু যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল সেখান হতে ইহা বুঝার কিছু উপায় ছিলনা যে সাপ, বনবিড়াল বা অন্য কিছুর শব্দ কিনা। তার পা থর থর করে কাঁপছিল, নিশ্বাস যেন আর আসছেনা, দেহ শক্তিহীন। তীক্ষ্ণধ্বনি এখন একটানা গভীর শব্দে পরিণত হল। 'গর্ত্ত অথবা পর্ব্বতের পাদদেশে ইহা নয়, ইহা আকাশে। বুক বেঁধে সাহসে ভর করে সে আকাশের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে উপরের প্রস্তর খণ্ডে লাফ দিয়ে উঠল। পিচ্ছিল পাথর হতে প্রায় পড়ে পড়ে তার অবস্থা। কোনমতে সে নিজকে সাম্‌লিয়ে নিল। হৃদপিণ্ড যেন অচল। অতিকষ্টে স্বচ্ছ ঝলসান বিস্তৃত আকাশের দিকে সে তাকাল। সূর্য্যরশ্মি কম্পমান ধূমবহ্নির মত আকাশ ছেয়ে আছে। 'কলের চিড়িয়া'গুলি আসন্ন দুর্ভিক্ষে মূর্ত্তিমান অমঙ্গল স্বরূপ আকাশচারী শ্যেনপাখীর মত ঘুরে বেরাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তভূমি বড় বড় শক্ত ঘুঁটের পিণ্ডে কালো হয়ে উঠছিল। পলকের মধ্যে কামার দিনগুলোর

বাড়ীর সামনে পাহাড়ের গায়ে ভীষণ শব্দে একটা বড় গোলকের মত কি পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ধূলিতে আকাশ ছেয়ে গেল।

'উড়োকলের, কর্কশ শব্দ ক্রমে দিগন্তব্যাপী বজ্র নির্ঘোষের মত শোনাচ্ছিল। আকাশ যেন চৌচির হয়ে গেছে। মুহু-মুহু সর্পিল বিদ্যুৎচমক কোরাণে লিখিত প্রলয়ের দিন মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

তুমুল শব্দ করে এবার আরেকটা পিণ্ড নিকটেই পড়ল। উচু উচু স্তূপগুলি ভূমিস্মাৎ হয়ে নগ্ন মাটি হতে ধূলিরাশি ঝরণার উৎক্ষিপ্ত বারিধারার মত ছিট্‌কে পড়ছিল। একের পর আর কেবল সেই পিণ্ডবৃষ্টি।

তার বিহ্বল দৃষ্টির সম্মুখেই প্রলয়ঙ্কর হুতাশনের মত স্পষ্ট জাজ্বল্যমান 'উড়োকলের' ধ্বংসলীলা, প্রকটিত হচ্ছিল।

'আমার বাছা, আমার বাছা', বলে সে কেঁদে উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। সে গ্রামের দিকে দৌড়াতে লাগল।

'উড়োকলের' সংখ্যা আরো বেড়ে গেল। দিগন্তের বুকচিড়ে শুধু এক ভৈরব নিনাদ। নরকের শত সহস্র প্রেতাত্মা মিলে স্বর্গ মর্ত্য দলিত ও মথিত করছিল। বিশ্বব্যাপী সেই আর্তস্বর পয়গম্বরের বর্ণিত 'কিয়ামতের' কথা যেন ঘোষণা করছে।

তার পায়ের নীচে এখনও মাটির অবলম্বন আছে। উৎকট শব্দ ও উৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশিতে তার দৃষ্টি ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছিল।

সে দৌড়াতে সুরু করল, কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে যেন কটিদেশ যন্ত্রণায় অসাড় হয়ে যাচ্ছিল। টিলা, ডোবা ডিঙ্গিয়ে সে চলছে একশ হাত দূরে তার মাটির ঘর সে দেখতে পাচ্ছিলনা। কিন্তু তার ওখানে পৌঁছতেই হবে; তাতে তার দেহ থাক বা না থাক। শরীরের হাড় ভেঙ্গে চুড়ে যাক তাতেও সে ক্ষান্ত হবে না উত্তাপ, উদ্বেগ আর কত বাধা দিবে। একলাফে যদি সে বাকী রাস্তাটুকু পার হয়ে যেতে পারত। এ অফুরন্ত ব্যবধান, যদি পাহাড় গড়ায়ে শেষ করা যেত। সে কি কোনরূপে সম্ভব নয়!

গতি মন্থর করে তার অবশ দেহকে মনের জোরে চালাতে চেষ্টা করল, কিন্তু আবার থলের মত একটি পাত্রপিণ্ড ফেটে গেল। তার হৃদয় আড়ষ্ট, পা অসাড়। সামনেই ভীষণ হাঁ করা এক ফাটল। সে হতবাক্ হয়ে একদিকে সরে গেল। দেহের সকল শক্তি সংহত করে 'আমার বাছা' 'আমার বাছা' বলে কখনও বিলাপ কখনও চীৎকার করে সে এগিয়ে যেতে লাগল। অন্তঃস্থল শূন্য করে যেন তার আশা নৈরাশ্যের অতলগর্ভে বিলুপ্ত হচ্ছিল। আবার প্রবল ইচ্ছা শক্তি ফিরে আসল। সে থেমে কিছু নিঃশ্বাস নিল, কিন্তু চারিদিকের বিকট শব্দে সে ত্রস্ত হয়ে গেল। উড়োজাহাজের দিকে তাকিয়ে ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে মিনতি জানাল যেন তার পুত্রকে এযাত্রা রেহাই দেয়।

কিন্তু তার চক্ষের সামনেই মাটির ঘরগুলি জ্বলে জ্বলে ছাই হয়ে ধ্বংস স্তূপে পরিণত হচ্ছে।

স্ত্রী-পুরুষ চমকিত, ভীত হয়ে ছুটাছুটি করছে, হুচট্ খেয়েও বড় বড় পাথরখণ্ডের পিছনে আশ্রয়ের জন্য সন্ত্রস্ত শিশুদের পশ্চাতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

'কলের চিড়িয়াগুলি' আবার সশব্দে গ্রামের উপর উড়ে আসল। কালো ধূমরাশি এদের ঝাপটে সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আরো বিস্ফোরণের শব্দ। ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে আবার থেমে বিমান বাহিনীর দিকে তাকাল। হিংসায় তার জিব পর্য্যন্ত তিক্ত হয়ে গেছে। মুখে শাদা ফেনা জমেছে। প্রতিহিংসার জ্বালায় সে ক্ষিপ্তের মত আকাশের দিকে হাত পা ছুড়তে সুরু করল। ক্ষণকালের জন্য দেখে নিল হিংসার প্রভাবে এরা বিধ্বস্ত হয় কিনা। কিন্তু 'এ কলের চিড়িয়াগুলি' উপত্যকার এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে উড়ে বেড়াচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বোমাবৃষ্টি। সে অসহায়ের মত নিদারুণ আর্ত্তনাদ করে উঠল 'তোমরা আমার বাছাকে রক্ষা কর, আমার বাছাকে রক্ষা কর'—কখনও করুণ আর্ত্তনাদ, কখনও তারস্বরে শুধু চিৎকার। কুমারের চাকার আড়াল হতে মোল্লার ভাই আবদুল মজিদ উড়োকল লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছিল। 'রহমতের মা থাম' বলে সে তার গতি রোধ করতে চেষ্টা করল কিন্তু সে থামলনা। আঁধার ঘনালে পথ চলা অসম্ভব। এ আশঙ্কা তাকে দুর্ব্বার আকর্ষণের মত টেনে নিচ্ছিল।

হাত বাড়িয়ে মজিদ তার পথ রোধ করে বলল, 'থাম বেকুব মেয়ে,—'তার দৃঢ় সবল হাত হতে মুক্ত হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে কেঁদে উঠল। চক্ষে অশ্রুর লেশ মাত্র নেই। শুধু কর্কশ চীৎকার 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও, আমার ছেলেকে বাঁচাতে হ'বে।' মজিদ চীৎকার করে উঠল, তুমি ত পাগল নও : দেখতে পাচ্ছ না গ্রামময় আগুন। শয়তানের বাচ্চারা ইহাকে বিনষ্ট করছে'।

'আমাকে যেতে দাও, আমাকে যেতে দাও' বলে সে আবার আর্ত্তনাদ করে তার হাত কামড়িয়ে দিল। বৃশ্চিক দষ্টের মত মজিদ তার হাত টেনে নিল। ব্যর্থ ক্ষোভ ধীরে ধীরে তার দেহ ও মনের উত্তেজনাকে প্রশমিত করল।

'আল্লার দোয়ায় কাফেররা কিছুতেই আদমের স্বাধীন সন্তানগণের উচ্ছেদ সাধন করতে পারবে না'—মজিদ উত্তেজিত কণ্ঠে বল্‌ল।

সে তীরের মত মজিদের পাশ কাটিয়ে জ্বলন্ত ধ্বংসস্তূপের দিকে ছুটল ; কিন্তু প্রজ্বলিত মাটির ঘর ও ভূপতিত দেওয়ালগুলি তার পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। মুহূর্ত্তের জন্য ভীতপদে আগুনের সামনে দাঁড়াল। তারপর দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চক্ষুবুজে 'বিসমোল্লার' নাম নিয়ে লেলিহান আগুনের ভিতর তীরবেগে ছুটে গেল।

অপর পারে উঁচু জায়গায় ধাক্কার চোট্ কোনরূপে সামলে নিয়ে কাপড় চোপড় গুটিয়ে সে উন্মত্তের মত উৎকট শব্দ করে দৌড়াচ্ছিল।

তার সামনে মসজিদের প্রাঙ্গণে একটি বোমা পড়ল। আগুনের হল্কা কালান্তক ধ্বংসের [illegible] ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

ধ্বংসলীলা সাঙ্গ হলে বিশ্বসংসারে চরম নির্বাণের জন্য—যেন গ্রহ নক্ষত্রগুলি আকাশ হতে ছিটকে পড়ছিল। উত্তাক্ত কণ্ঠরোধকারী অগ্নিদাহের ভিতরও সে দৃঢ়পদে চলছিল। পতনোন্মুখ দেওয়ালগুলি অতিক্রম করার সময় সে দেখে নিতে চেষ্টা করল—এ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তার ছেলে কিভাবে থাকতে পারে। কিন্তু চারিদিকের ধূলিসাৎ ভগ্ন গৃহগুলি দেখে সে প্রায় নিশ্চিত হল যে তার ছেলে মাটির চাপে পড়ে আছে। আতঙ্কে সে চীৎকার দিল। ছেলের মৃতদেহ যেন তার চক্ষের সামনে ভেসে উঠল, কিন্তু এ যে কিছুতেই তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। মসজিদের গম্বুজ এখনও অটুট আছে। তার ঘর ত কোনরূপে রক্ষা পেতে পারে? তবে তার ছেলে নিশ্চয় বেঁচে আছে; কান্নাকাটি ভিন্ন আর সে কি করতে পারে? সেই সঙ্কীর্ণ পথের বাঁকেইত তার ঘর। ছেলে নিরাপদ থাকলে পীরের দরগায় নিশ্চয়ই সে সিন্নি দিবে।

কিন্তু একটু পরেই সে দেখল তার ঘরের ছাদে আগুন দাউ দাউ করছে, দেওয়াল প্রায় পড়ে পড়ে। কাঠের কড়ির বড়গাও বিধ্বস্ত। এদিক সেদিক তাকাতে সে ইতস্ততঃ করছিল। দেহমনের নৈরাশ্য দূর করার মত সাহস বুকে টেনে নিয়ে সে উঠানের দিকে দৌড়াল।

কাপড় পোড়া গন্ধে তার নাক বন্ধ, ধোঁয়ায় চক্ষু আচ্ছন্ন। হাত বাড়িয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করল। কিন্তু সম্মুখে পর্ব্বত প্রমাণ ধূমরাশি। সে ঘরের ভিতর ঢুকে ছেলে খুঁজতে লাগল। ছোট্ট খাটিয়ায় আগুন ধরেছে। শিশুটি উত্তাপে লাল হয়ে গেছে! শেষ আশ্রয়ের জন্য আকাশের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল।

'হায় আমার বাছা, হায় আমার বাছা বলে' আদর বা আতঙ্কে সে ছেলের উপর হাত পা ছুড়ে লুটিয়ে পড়ল। তাকে কোলে তুলে গুটিসুটি হয়ে অগ্রসর হোল। খড় কুটার মাচা ভেঙ্গে তার পথ বন্ধ হয়ে গেলো। মেঝে হতে একটা জলের কলসী ভস্মস্তূপের দিকে ছুড়ে মারলো। আগুনের গায়ে একটু বাতাস লাগা ভিন্ন আর বিশেষ কিছু হ'ল না। অতি সামান্যই নিবল। কল্ কল্ ক'রে জল গড়িয়ে পড়ল। দেওয়ালের ভিতরকার গর্ত্ত দিয়ে হামাগুড়ি দেওয়া ভিন্ন আর উপায় নেই। রোরুদ্যমান মাংসপিণ্ডটী তার বুকের ভিতর চেপে নিয়ে বলল 'লক্ষ্মীটি আমার চুপ ক'রে থাক'। তার আবরণ দিয়ে তাকে জড়িয়ে সামনের দিকে ছুটতে লাগলো।

তার পা জ্বলন্ত কয়লায় ঢুকে গেল। সে চীৎকার ক'রে উঠলো। কিন্তু ছেলেটী নিয়ে নিরাপদে দেওয়ালের আর এক প্রান্তে পৌছল। সে যেন আর পারছে না। ভয়ে একেবারে পাংশু হ'য়ে গেলো। ছেলেটীকে বুকের ভিতর আরো গভীরভাবে টেনে নিলো। ছেলে ও নিজেকে সাহস দিতে সে একটু ক্ষীণ হাসির চেষ্টা করলো।

তারপর প্রাঙ্গণের দিকে ছুটে আসলো। সে বুঝতে পারলো তার পরিধেয় বসনে আগুন ধরেছে। একটু নীচু হয়ে মাথা হতে কিছুটা ছিঁড়ে ফেলার সময় জামার আস্তিনে আগুন ধরে গেলো। ওড়না চাপা দিয়ে তা নিবাল এবং রাস্তা দিয়ে দৌড়াতে লাগলো। মাটীর কুটীরগুলি ভেঙ্গে-চুড়ে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। রাস্তার উপর প্রজ্বলিত ধ্বংসস্তূপ। আগুনের উল্কা আকাশের গায়ে

ছিটকে গিয়ে নিভে যাচ্ছে। মসজিদের দিকে তাকিয়ে তার পিছনের পথে পালানো যায় কিনা দেখে নিলো। মসজিদের গম্বুজ প্রাঙ্গণের সোজাসুজি পড়ে আছে। খুব সম্ভব রাস্তা একেবারে বন্ধ। 'আব্দুল মজিদ, আব্দুল মজিদ,' বলে চীৎকার করে সে ফাঁদের ভিতর ঘুরতে লাগল। সেই নারকীয় প্রেতলীলার মধ্যে তার ক্ষীণ শব্দ মুমূর্ষুদের আর্তনাদে মিশে গেলো। নীচে অগ্নিশিখার গর্জন উপরে বজ্রনির্ঘোষ, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উভয়কে যেন খোদাতাল্লা সেই অভিশপ্ত নগরীতে পাঠিয়েছেন।

আর্তস্বরে ছেলেকে তার বুকের ভিতর টেনে নিয়ে যে দিক হতে সে প্রথম এসেছিলো সেদিকে ছুটলো। ভেবেছিল লাফিয়ে সামান্য আগুন ডিঙ্গিয়ে যাবে। দশ হাত দূর হতেই সে দেখল, সাড়া ছাদ প'ড়ে গিয়ে রাস্তার মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নীচে স্তূপাকৃত খড়-কুটা দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে।

'হা খোদাতাল্লা, তুমি কোথায়' বলে সে শিরে করাঘাত করল। খোদাতাল্লা আমার চোখের জল কি এমনি যাবে? পয়গম্বর তুমি কি এসে আমাদের রক্ষা করবে না? শামু, তুমি কোথায়?'

সে কেঁদে উঠল, কিন্তু কে তার কান্না শুনবে? সে উঠে দাঁড়াল। চতুর্দিক ঘিরে দুর্ভেদ্য অগ্নিব্যূহ। আগুনে তার শরীর দাহ হয়ে যাচ্ছে। ধূমের দুর্গন্ধ টেনে তার মাথা ঝিম্ ঝিম করছে। ছেলের দিকে তাকিয়ে দেখল সে মূর্ছিত। অগ্নিব্যূহ ভেদ করতে সে আবার মরণচেষ্টা করল। তার দুর্দম মন তখনও অন্তিম নিঃশ্বাসের সহিত ভগ্ন আশা নিয়ে সংগ্রাম করছে। হঠাৎ এক অগ্নিকুণ্ডে সে পড়ে গেল।

অগ্নি-শয্যায় সে শুয়ে আছে। মর্মান্তিক যাতনা বা দাহ কিছুই তার আত্মাকে স্পর্শ করতে পারেনি। কোটর থেকে রক্তাক্ত চক্ষু ছিটকে পড়ে গেছে কিন্তু বুঁজে যায়নি। শিশুটি তার বুকের উপর। 'আমার বাছা, আমার বাছা' তার শেষ কথা।

ধ্বংসলীলার অবসান হয়েছে। পশ্চিম সীমান্তের সুদূর দিকপ্রান্ত এখন নিরস্ত, নিঃস্পন্দ। ইবলিসের সুযোগ্য দূতগণ ধ্বংস, রক্ত ও দাবানলের মধ্যে নিজেদের কৃত অনুষ্ঠান দেখে আত্মপ্রসাদ লাভ করছে।

মুলকরাজ আনন্দ্ লিখিত 'On the Border' গল্প হতে।

শ্রমিক আন্দোলনের ধারা

চিন্মোহন সেহানবীশ

শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস গত দু'শ বৎসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর পূর্ব্বে 'শ্রমিক' বলতে আজ আমরা যাদের বুঝি সংখ্যা বা সামাজিক প্রতিপত্তির ক্ষেত্রে তারা ছিল নগণ্য, কাজেই তাদের কোন বিশিষ্ট আন্দোলনও তখন গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই দু'শ বৎসরের স্বল্পায়তন জীবনে শ্রমিক আন্দোলনকে অনেক জয় পরাজয়, সংশয়, সঙ্কট ও ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তার বিচিত্র, পুঙ্খানুপুঙ্খ ও ধারাবাহিক আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এখানে শুধু সেই ইতিহাসের কয়েকটী মূলধারা নির্দ্ধারণের চেষ্টা করব। এই প্রসঙ্গে উদাহরণ নেওয়া হল প্রধানতঃ ইংলণ্ড থেকেই। শিল্পবিপ্লবের জন্মভূমি হিসাবে এ সম্মান তার অবশ্য প্রাপ্য।

সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তির নামে যাদের ফিউডাল অনুশাসন ও ভূমি থেকে জোর করে ছিন্ন করে সহরের কারখানার খাঁচায় বন্ধ করা হোলো তারা সহজে ও সানন্দে এই অভিনবতাকে স্বীকার করতে পারেনি। কারণ এই নবজীবনের গ্লানি, ক্লেদ, অপমান ও অত্যাচার ছিল যেমন নিদারুণ, তেমনই সংগঠনের অভাবে এই সব দুর্গতির বিরুদ্ধে তারা ছিল সম্পূর্ণ অসহায়। তাদের বিরুদ্ধতা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। এই প্রাথমিক স্বতঃস্ফূর্ত বিপক্ষতা বহু ক্ষেত্রেই রূপ নিল অন্ধ যন্ত্রবিদ্বেষে। যন্ত্র যে যন্ত্রই, স্রষ্টা ছাড়া তার ভাল বা মন্দ করবার নিজস্ব কোন শক্তিই যে নেই এ সত্য তাদের কাছে ধরা পড়েনি এজন্য Lauditeরা কলকারখানা ধ্বংস করতে আরম্ভ করল।

Chartist আন্দোলন অবশ্য এর তুলনায় অনেক বেশী সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। আর তার রাজনৈতিক রূপও ছিল অনস্বীকার্য্য। বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে সে এক গৌরবময় অধ্যায়। তবুও তার অসাফল্যের কারণ ছিল অন্তর্নিহিত। ধনতন্ত্র সে সময়ে বিকাশোন্মুখ, তার সম্প্রসারণশীলতার মুখে Chartist আন্দোলনের স্রোতে ভাঁটা পড়ল। এ ছাড়া সেখানেও সংগঠনের চেয়ে স্বতঃস্ফুর্ত্তিই ছিল মুখ্য।

এই সব সংঘর্ষের মধ্যে থেকেই শ্রমিকেরা ক্রমশঃ বুঝতে পারল স্থায়ী সহযোগিতার প্রকৃত মূল্য। আর এই বোধ থেকেই জন্ম হল ট্রেড ইউনিয়ানিস্‌মের। শাসক শ্রেণীর বর্ব্বর অত্যাচার সত্ত্বেও কারখানায় কারখানায় শ্রমিক সংঘ দ্রুত গড়ে উঠতে লাগল। অভিজ্ঞতার ফলে স্বাভাবিকভাবেই এ কথাও তারা শিখলো যে ভিন্ন ভিন্ন ট্রেড্ ইউনিয়নের পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া কোন ব্যাপক এমন কি স্থানীয় যুদ্ধেও জয়লাভ অসম্ভব। শ্রমিক আন্দোলনে এই ট্রেড্ ইউনিয়নে সংগঠনই হল প্রথম স্তর।

এই ট্রেড্ইউনিয়ন গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হল শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ। এই দ্রুত ট্রেডইউনিয়ান সংগঠনের যুগের কাজ হল অর্থনৈতিক দাবীর ভিত্তিতে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করা। কিন্তু শ্রেণীসমাজে রাষ্ট্রও হচ্ছে শ্রেণীর হস্তগত, কাজেই মূলধনীদের কাছে অর্থনৈতিক দাবী অনবরত জানাতে জানাতে দেখা গেল যে রাষ্ট্রের

সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই রাষ্ট্রিক প্রশ্ন সমাধানের চেষ্টা এই স্তরে করা হল ভিন্ন ভিন্ন মূলধনীদের রাজনৈতিক দলের মধ্য দিয়ে। কারণ এই দলগুলিও দেশের ভিন্ন ভিন্ন ও প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থনৈতিক গোষ্টির মুখপাত্র; কাজেই এরা পতিদ্বন্দীর বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সাহায্যের মূল্য হিসাবে কিছু কিছু সুবিধা দিতে লাগল শ্রমিক শ্রেণীকে। এরই ফলে এল শ্রমিকের বয়স ও শ্রমের সময় সম্বন্ধে নানারকম সংস্কারমূলক আইনপ্রণয়ন। মোট কথা এযুগে স্থানীয় অর্থনৈতিক সমস্যা ও ব্যাপকতর জাতীয় সমস্যা Conservative, Liberal প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিত্তশালী শ্রেণীর রাজনৈতিকদলের মধ্যে দিয়ে সমাধানের চেষ্টা হল। ইংলণ্ডে শ্রমিক আন্দোলনের এই স্তর বিস্তৃত ছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত—আমেরিকা এখনও এই অবস্থার মধ্যে চলছে।

কিন্তু কিছু দিন পরেই বোঝা যায় যে শ্রমিকদের দাবী পূরণের জন্য অনির্দ্দিষ্টভাবে অন্য শ্রেণীর রাজনৈতিক দলের কৃপাভিক্ষা করলে চলেনা। শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব রাষ্ট্রনৈতিক দলগঠনের প্রশ্ন ওঠে। এই হল শ্রমিক আন্দোলনের দ্বিতীয় স্তর। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকেই ইংলণ্ডে এই শ্রমিকদল গঠিত হয়। ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, রাশিয়ায়ও এর অনুরূপ দল গঠিত হতে থাকে।

এখানে প্রশ্ন ওঠে শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব রাষ্ট্রনৈতিক দলের কেন প্রয়োজন হয়? তাদের অর্থনৈতিক দাবী মেটানোর জন্য ট্রেড ইউনিয়ন্ আন্দোলন ও রাজনৈতিক দাবীর জন্য অন্যান্য মূলধনী রাষ্ট্রিক দলগুলিই কি যথেষ্ট নয়, যেমন ছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি? যথেষ্ট যে নয় ইতিহাসই তা প্রমাণ করছে। কিন্তু কেন যথেষ্ট নয়? এর কারণ পুঁজিতন্ত্রের নিজস্ব নিয়মে উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেখা দেয় একচেটিয়া ব্যবসা—আর এর ফলে ধনতন্ত্রের প্রথম যৌবনে যে উদারনীতি ব্যক্তিমাত্রেরই স্বাধীন জীবনযাত্রার সুযোগ সুবিধা আনে তা ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যায়। আবার মূলধনীদের পক্ষেও আগের মত শ্রমিকদের সুবিধা দেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে নিজ রাজনৈতিক দলগঠন ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা। কাজেই সাধারণতঃ দেখা যায় যে ট্রেডইউনিয়ন স্তরের পরেই ধনতন্ত্রবিকাশের স্রোতে ভাঁটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের নিজস্ব স্বাধীন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়। এই হচ্ছে শ্রমিক আন্দোলনের দ্বিতীয় স্তর।

কিন্তু রাজনৈতিক দল গঠিত হয় কার্য্যপদ্ধতির ভিত্তিতে। কর্ম্মপদ্ধতি আবার নির্ভর করে বিশিষ্ট মতবাদের উপরে। কিন্তু রাজনৈতিক দল অনেক ক্ষেত্রেই বিশিষ্ট মতবাদ নিয়ে আরম্ভ করে না—ক্রমশঃ মতবাদ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ট্রেডইউনিয়নিস্‌ম্ ও নিজস্ব রাজনৈতিক দলগঠনের পরে শ্রমিক আন্দোলন যে তৃতীয় স্তরে এসে পৌঁছয় সেটা হচ্ছে রাজনৈতিকদলের সোসালিষ্ট রূপান্তরে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের শ্রমিকদল নানারূপ সোসালিসম্‌কে গ্রহণ করে—গোড়াপত্তনের সময় বৃটিশ শ্রমিকদল মোটেই সোসালিষ্ট ছিলনা। কাজেই বিশেষ ধরণের সোসালিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করে শ্রমিকদল বিশেষ ধরণের কার্য্যপদ্ধতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। এই হচ্ছে শ্রমিক আন্দোলনের তৃতীয় স্তর।

"মানবচরিত্রে"র বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

জিতেন্দ্র গোস্বামী

"দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ—"। যে জিনিষটাকে বুদ্ধি দিয়ে নাগাল পাওয়া গেলো না তাকে এই রকম করে এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল এ যুগেও চালাবার চেষ্টা বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির লক্ষণ নয়। দেবেরা কি জানেন জানি না, কিন্তু যা কিছু জ্ঞাতব্য তার সবটাকেই জানার গণ্ডীতে আবদ্ধ করার দুঃসাধ্য সাধনা আমরা করি। মানবপ্রকৃতির অতি সাধারণ রূপটিকেও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন আমরা করেছি কিনা সন্দেহ, তা না হ'লে "human nature being as it is—" বলে লেখক সাংবাদিক এমন কি বৈজ্ঞানিকদিগের এত frequent generalisation এর অবতারণা দেখতে হ'তো না। একটা মানুষ—সে খুন করে, আবার সেই প্রাণ দেয়। সম্পূর্ণ মানুষটার আপাত-বিরোধী কার্যক্রমের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে একথা বল্‌লে চল্‌বে না "বুঝলে না দাদা, এ মানুষের চরিত্র—'মারবেই' অথবা 'মরবেই'।" এই যে বিসদৃশ সমন্বয়-রহিত নিশ্চয়তা-সূচক "ই" সুবিধা-মাফিক মনুষ্যচরিত্রের অমোঘ নিয়মের নির্দ্দেশক হিসাবে অপ্রতিবাদে মেনে নেওয়া হচ্ছিলো আজকের দিনে এমন সহজ সমাধানটিকে এত সহজ বলে মনে করা সমীচীন হ'বে না। সমাজবিজ্ঞানের জটিল কম্পাউণ্ডের একমাত্র মহাদ্রাবক মানব-চরিত্র ফরমূল্যার মধ্যে নেই—এ কথা বলবার চেষ্টাই প্রবন্ধে করা হ'বে।

'মানবচরিত্র' কি? সংজ্ঞা দিয়ে সম্যক প্রকাশ করা কঠিন, এমন কি একপ্রকার অসম্ভব। তবে বিশ্লেষণ করে মানবচরিত্র বলতে কি বুঝায় তাই দেখানো সুবিধে। মানুষের আচরণ-সমষ্টি (behaviour) অর্থাৎ বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক ও আবেষ্টনের মধ্যে যে ভাবে সে ব্যবহার করে সেই সকলের সম্মিলিত রূপটিই এক কথায় "মানবচরিত্র"। সুতরাং এই বিচিত্র-চরিত্র জীবটির সকল দিক্‌কার সকল রকম আচরণের ফিরিস্তি বিচারবিশ্লেষণ যে কতো জটিল ও দুরূহ তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, সমাজতত্ত্বের ছাত্রের কাছে নিছক অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তির চরিতার্থতা বলে কোন জ্ঞানানুশীলন নেই, শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হ'য়ে মানবচরিত্র বলে যে আচরণসমষ্টি অপরিবর্তনীয়তার দাবী করছে এমন কি জৈবিক প্রক্রিয়ার সহিত অভিন্ন বলে গণিত হ'য়ে আসছে তারই বিশ্লেষণ করে দেখানো হ'বে মানুষের সৃষ্ট বিধিনিষেধ, বাইরে-থেকে-আরোপ-করা নির্দেশ তথাকথিত মানুষের চরিত্রকে কী গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে। মানুষের জৈব প্রকৃতিকেও বিশেষ ব্যবস্থায় ইচ্ছানুসারে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে পরিবর্তন করার ভার সুপ্রজনন ও জীববিদ্যার উপজীব্য; কিন্তু মানবচরিত্রের যে সুবৃহৎ অংশটুকু জৈব নয়, শুধু institutional বা লোকসৃষ্ট প্রতিষ্ঠানসম্ভূত বা পারিপার্শ্বিক-জাত (environmental) তাকে বিজ্ঞানসম্মত

ভাবে কল্যাণের পথে চালনা করবার ভার সমাজতাত্ত্বিককে স্বীকার না করলে কর্তব্য-চ্যুতির অপরাধ হ'বে।

মানবচরিত্রের জৈব এবং অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল কাঠামোর কথা স্থানান্তরে আলোচিত হ'বে। Institutional বা প্রতিষ্ঠান-মূলক উপাদানটুকু আলাদা করে দেখানো সহজ। প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে এখানে চুল-চেরা বিভাগ করবার অবস্থা এখনও আসে নি। অতিশয় মোটামুটি রকম—এমন কি অনেকটা arbitrary বিভাগ করা গিয়েছে মাত্র। প্রতিষ্ঠান-প্রভাবিত মানবের আচরণসমষ্টি বলতে আমরা এই বোঝাতে চাই যে, যে কোন কারণেই হোক্ একটা প্রথা বা নিয়ম সম্প্রদায় বা দলবিশেষের মাঝে প্রতিষ্ঠালাভ করে এবং অন্তর্ভুক্ত বা সংশ্লিষ্ট সকল লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করে। একটু তলিয়ে দেখলেই এগুলো যে লোক-সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রভাবের ফল এবং জৈবিক নিয়মে বা জৈবিক প্রয়োজনে উদ্ভূত হয় নি তা বুঝতে কষ্ট হয় না। গোঁড়া-মুসলিম রাজত্বে নারীদের বোরখা পরিধান, বিভিন্ন দেশে ধর্মাচরণ বা স্বাদেশিকতার স্বতন্ত্ররূপ, সম্প্রদায়-বিশেষের খাদ্য-বিশেষের প্রতি বীতস্পৃহা—এ সব যে জৈব-প্রেরণায় মানবচরিত্রে দেখা দিয়েছে তা মনে করার কোনো কারণ নেই। দীর্ঘকাল দুর্ভেদ্য প্রথার প্রাচীরের আবেষ্টনীতে পরিবর্ধিত মানুষ আপনার সৃষ্ট এই আচার-বন্ধনী থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে না—সুদীর্ঘকাল পরে তার চরিত্রের এই দিক্‌কার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নির্ঘণ্ট লিপিবদ্ধ ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অবাক্ হ'তে হয়—কী আশ্চর্য্য ভাবে এই খেয়াল-খুসীর জিনিস আজ জৈবিক নিয়মের সমপর্য্যায়ভুক্ত হ'য়ে পড়েছে এবং দুঃখ হয় এই কথা ভেবে যে, এর শক্তি দীর্ঘ-স্থায়িত্বের দাবীতে জৈবিক নিয়মের মতনই অমোঘ ও অপ্রতিহত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বোরখার কথাটাই ধরা যাক্। সোভিয়েট য়্যুনিয়নের মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চলে এমনও দেখা গেছে যে, পিতা-ভ্রাতা বা অন্য অভিভাবক পরিবারস্থ মেয়েদের বোরখা পরিত্যাগ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করেছে। মেয়ে সমাজ ছেড়ে যাবে, যাপন করবে রূপোপজীবিনীর জীবন তাও তারা সহ্য করতে পারে, কিন্তু প্রাণ থাকতে তারা বোরখাটি দেহচ্যুত করবে না। লোক-সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানের আচারের অনুশাসন মানুষের জৈবিক প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মতন মারাত্মক ভাবে অপরিহার্য হ'য়ে পড়েছে! সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের পেছনকার রাজনৈতিক চেতনার পরিমাণ নির্দেশ নিয়ে ঐতিহাসিক গবেষণা চলতে পারে কিন্তু গরুর চামড়া এবং শূয়োরের চামড়ার প্রশ্নটাই যে পরম গুরুত্বসূচক প্রত্যক্ষকারণ হ'য়ে দাড়িয়েছিলো তাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। অতীতের ইতিহাসের প্রামাণিকতা বাদ দিয়ে আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কঠিনতম সমস্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন ধর্মের অনুমোদিত খাদ্যাখাদ্যের ক্ষুদ্রতম বিভেদকে আশ্রয় করেই অনেক জায়গায় এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সূচনা ও কলঙ্কময় পরিণতি। একটু মনঃসংযোগ করে দেখলেই দেখা যাবে অনুমোদিত পরিধেয়, খাদ্যতালিকা যদিও সমাজতাত্ত্বিকের নিকট প্রত্যক্ষ সমস্যা নয়, তবুও মানুষের কাছ থেকে প্রতিষ্ঠান-বিধিগত অনুষ্ঠান সম্পর্কে যে সব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া নিত্যই সংঘটিত হচ্ছে

এবং সমাজ-ব্যবস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে চলেছে তার অভিব্যক্তি যে কোনো জৈবিক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তিরই সদৃশ। stimulus (উত্তেজকে) এ তফাৎ কিন্তু response (সাড়া) এর বেলায় তিলমাত্র বিভেদ নেই। মানুষের আচরণের এই দিক্‌টা অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়াসে বিশ্লেষণ করে বের করা যায় এবং তাই নিয়ে পরীক্ষামূলক গবেষণা চলতে পারে। এ যে নিতান্ত বাইরেকার ব্যাপার, সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠান-উদ্ভূত (institutional), সমাজব্যবস্থাসঞ্জাত, কৃত্রিম ও আকস্মিক তা প্রমাণের প্রয়োজন হয় না এবং এ কারণেই চেষ্টা ও অভ্যাসদ্বারা পরিবর্ধন, সঙ্কোচন, পরিবর্তন, এমন কি পরিবর্জন করাও চলে, এবং সমাজতাত্ত্বিকের প্রয়োজন এইখানেই।

মানব চরিত্রের দ্বিতীয় উপাদান আবেষ্টন-সঞ্জাত এবং প্রতিষ্ঠান-মূল উপাদানের মত আপাতদৃষ্টিতে সহজ বিশ্লেষণসাধ্য নয়। উদাহরণ দিয়েই আরম্ভ করা যাক্। লোভ ও ঈর্ষা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি বলেই আমরা জানি, কিন্তু স্থানবিশেষে এর মূলকারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে সব তথ্যের নাগাল পাওয়া যায় তারই ওপর নির্ভর করে বর্তমানযুগের শীর্ষস্থানীয় মনোবিজ্ঞানবিদ্‌দের এতদসম্বন্ধীয় ধারণাকেও অসঙ্গতিপূর্ণ—এমনকি অর্থহীন বলে মনে হয়। "Civlisation and Its Discontent"এ ফ্রয়েড মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এ সম্বন্ধে প্রামাণ্য মত দাবী কর্তে পারেন স্পেঙ্‌লারও। উভয়ের মতের নির্যাস নিলে এই দাঁড়াবে: "Such is human nature. Man will always be greedy, a victim of lust for wealth weighed with instincts of possession and aggression, showing no mercy to his fellowmen when the latter stands in his way. Man is a greedy predatory animal." বৈজ্ঞানিক সত্য বলে মানবার আগে মনে হয় বর্তমান সমাজব্যবস্থার স্বার্থ ও সংরক্ষণের ইঙ্গিত রয়েছে অতি সন্তর্পণে লুকোনো এই বিশ্লেষণের মাঝে। যুক্তিবাদী দার্শনিক তাই প্রশ্ন না করে নির্বিচারে তাই মেনে নিতে রাজী নয়। লোভের কথাটা ধরেই এগুনো যাক্। যেখানে জলের অপ্রাচুর্য এবং বাসিন্দারা সবাই নিঃস্ব সেখানে জল সংগ্রহ করে জমিয়ে রাখবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে সবাই। বৃষ্টি হওয়ামাত্র হাঁড়িকুড়ি বা'র করে তাতে জল ভর্তি করে নেবার প্রতিযোগিতায় মৌখিক বচসা থেকে মারাত্মক রক্তারক্তি বিপর্যয় কাণ্ড পর্যন্ত ঘট্‌তে পারে। তাই বলে মানুষ একটি অতি নিষ্ঠুর লোভাতুর জানোয়ার এবং এটাই তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এরূপ মনে করে নেওয়া সমীচীন হ'বেনা। মানুষের পরিবেষ্টনীই এর মুখ্য কারণ—এ তার সহজাত প্রবৃত্তি বা জন্মসংস্কার নয়। এই অত্যুগ্র আগ্রহশীল জলসংগ্রহকারী লোভী মানবসম্প্রদায়টিকে একটু বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে ফেলে তাদের আচরণ বিচার করে দেখলেই সন্দেহাতীতরূপে একথার সত্যতা সপ্রমাণ হ'বে। আধুনিক নাগরিক জীবনে যেখানে জীবনযাত্রার মান (standard of living) সমধিক উন্নত এবং যেখানে মাসিক বাড়ীভাড়ার সঙ্গে জলের খরচটাও ধরা আছে সেখানে বর্ষণ-উৎফুল্ল নরনারীর জলসংগ্রহ নিয়ে প্রলুব্ধ আগ্রহ ও বীভৎস কোন্দলের স্থান কোথায়? জলের জন্যে তাদের বিন্দুমাত্র লোভ নেই, তারা জল সঞ্চয় করেনা,

তারা কদাচ প্রার্থিতকে জলদানে বিমুখ হয় না। হিংস্র, লুব্ধ, পশু-প্রকৃতির মানুষ পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিকে একই পরীক্ষাক্ষেত্রে বিপরীত আচরণ করে।

আবেষ্টন-আপেক্ষিকতার আর একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্। পুরুষ অন্য নারীতে অনুরক্ত জানতে পেলে যে কোনো স্ত্রী সেই অনুরাগের পাত্রীটিকে সহজাত প্রবৃত্তির বশে ঈর্ষার যোগ্য বলে মনে করে—একথা আমরা স্বতঃসিদ্ধস্বরূপ জেনে এসেছি। কোনোদিন বিবেচনা কর্বার প্রয়োজন মনে করিনি যে নারীচরিত্রে এদিকটা সকল প্রশ্নের অতীত কিনা? একটুখানি আবেষ্টন বদলে দিয়ে দেখানো যাবে যে, মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে এ আপেক্ষিক সত্যমাত্র, বিশিষ্ট পারিপার্শ্বিকে এক-প্রকার আচরণমাত্র। এখানে স্বতঃসিদ্ধ সহজাত প্রবৃত্তির অমোঘতা আরোপ করা ভুল। সত্যি কথা বলতে, বহুবিবাহ-প্রচলিত সমাজে এ প্রকার ঈর্ষার স্থান থাকতে পারেনা। পুরুষ ও নারীর বিশেষ সম্বন্ধের একটা বিশিষ্ট অধ্যায় থেকে বিশেষ অধিকার সম্বন্ধে সচেতন নারী এপ্রকার ঈর্ষার বিলাস উপভোগ কর্তে পারে, তার আগে এ প্রশ্নই উঠতে পারেনা। মনে করা যাক্, আমীর উল্‌মুলক্ সাহেবের হেরেমে বিধিসঙ্গতভাবে গৃহীত ১০টি ধর্ম্মপত্নী ও শতাধিক রক্ষিতা রয়েছে। আমীর সাহেব তুরাণ থেকে নবাগতা জনৈকা সুন্দরীকে এনে হেরেমের জনসংখ্যা বৃদ্ধি কর্তে চাইছেন। হেরেমের প্রাক্তন অধিবাসিনীরা নিশ্চয়ই এই নিয়ে ঈর্ষাকাতর হ'য়ে পড়েনি বা উপেক্ষিত নারীত্বের জন্যে অভিমান জাগেনি তাদের অন্তরে। এই উপলক্ষে সুরমা-পরা আঁখিরপ্রান্ত অশ্রুসজল হয়নি, স্বর্ণভোজনপাত্রে অভুক্ত ভোজ্য অবশিষ্ট থাকেনি, ভূমিশয়নে নিদ্রাবিহীন উজাগর রাত্রিও যাপিত হয়নি। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কোন নতুনত্বই এদ্বারা সূচিত হয় নাই। যদি কখনও উল্লেখযোগ্য মানসিক সাড়া জেগে থাকে তবে তা উল্লাসের। কারণ, তাদের হেরেমের বন্দীজীবনের নিরানন্দ দাসত্বের অংশভাগিনী হ'বার জন্যে আর একটা ভাগ্যহতার সংযোজন হ'চ্ছে এবং তাকে পেয়ে তাদের কাজের ভার লাঘব হ'বে খানিকটা।

মানবচরিত্রের জৈবিক উপাদান বিশ্লেষণ সর্বাপেক্ষা কঠিন কার্য। কারণ প্রতিষ্ঠান-মূল ও আবেষ্টন-মূল আচরণ থেকে একে পৃথক্ করা দুরূহ—তাছাড়া জৈবিক, আবেষ্টন-মূল ও প্রতিষ্ঠান-মূল আচরণের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বাদ দিলেও শুধু জৈবিক অংশটিই এতো জটিল যে এসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায় পেরোয়নি। আমরা প্রবন্ধান্তরে এবিষয়ে আলোচনা কর্বার ইচ্ছা করি। *

* To-morrow Publishers এর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীও বিশেষ করে Mark Graubard এর Science of "Human Nature" এর নিকট ঋণ স্বীকার করা কর্তব্য মনে করি। —লেখক

পুনরাবৃত্তি

আর্যাকুমার সেন

আমার জীবনের কুড়ি হইতে তিরিশ বৎসর বয়স পর্যান্ত মোটামুটি একাই কাটাইয়াছিলাম। তাহার পর সহসা বন্ধন আসিয়া জুটিল।

অবশ্য এ বন্ধন এক রকম আমি নিজেই চাহিয়াছিলাম।

একদিন খেলার ছলে সুভাকে বলিয়াছিলাম, "সুভা, তোর মেয়েটাকে আমায় দিবি?"

সে হাসিয়াই জবাব দিয়াছিল, "বেশ তো, নাও না!"

আমার বয়স তখন সাতাশ, আমার জেঠতুতো বোন সুভারও। আর তাহার মেয়ে মঞ্জুর বয়েস তিন। ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি। সারা দিনে রাতে যতক্ষণ জাগিয়া থাকে মুখে মিষ্টি আধো-আধো কথার খই ফোটে। মঞ্জুকে আমার ভারি ভালো লাগিয়াছিল। মনে হইয়াছিল, চার ছেলে মেয়ের মা সুভা তাহাকে যতটা আদর যত্ন দিতে না পারে, আমি বোধ হয় তাহা পারিব।

সেই খেলার ছলে বলা কথাই যে এমন নিষ্করুণভাবে সত্য হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা কে জানিয়াছিল? কিন্তু সত্যই তিন বছর পরে মাতৃহীন মেয়ে মঞ্জুর ভার আমিই লইলাম, অনিচ্ছা-সত্ত্বেই। এ জন্য নহে যে তাহার ভার লইতে আমার আপত্তি ছিল। শুধু এই কথা ভাবিয়া চোখে জল আসিয়াছিল, যে একটা খেয়ালের কথা সত্যে পরিণত করিবার জন্য বিধাতার কি হৃদয়হীন প্রচেষ্টা!

সেই তিন বছরের পরে আরও তের বছর কাটিয়া গিয়াছে। এই তেরো বছর ধরিয়া মঞ্জুকে মানুষ করিয়াছি। বুঝিতেছি, আর বেশীদিন তাহাকে আমার কাছে রাখিতে পারিব না, নূতন দিনের কোন্ নূতন মানুষের হাতে তাহার ভার আমার হস্তচ্যুত হইয়া গিয়া পড়িবে, এবং আমার নিঃসঙ্গ জীবনের পুনরাবৃত্তি আরম্ভ হইবে।

আমার ছাব্বিশ বছর বয়সের কথা। এম্, এস্-সি পাশ করিয়া কিছুদিন নানা প্রকার বড় বড় জিনিষের চেষ্টায় থাকিয়া পয়সাকড়ি যাহা ছিল, সব উড়াইয়াছি। পরিশেষে আবিষ্কার করিলাম সরকারী ঈশ্বর প্রেরিত চাকরী বিধাতাপুরুষ আমার জন্য প্রেরণ করেন নাই। অগত্যা অগতির গতি প্রোফেসারী। কিন্তু প্রফেসারী চাকরী পাওয়া যতটা হাতের পাঁচ মনে করিয়াছিলাম, দেখিলাম তাহা নহে। তবু কিছু কিছু অস্থায়ীভাবে জুটিল। সেই অস্থায়ী চাকরীর টাকার সহিত টিউশানির টাকা কিছু মিশাইয়া ভবিষ্যতের বেকারজীবনের সম্বলের জন্য রাখিয়া দিলাম। সে সুযোগও শীঘ্রই আসিল।

এবং এই সময়েই সুলেখার সহিত পরিচয় হইল, এবং বুঝিলাম, ঝটিকাবহুল সমুদ্রের মধ্যে সহসা পোতাশ্রয়ের সাক্ষাৎ পাইয়াছি।

সুলেখাকে ভালোবাসিয়াছিলাম। যতদূর জানি সুলেখাও আমাকে ভালোবাসিয়াছিল। কিন্তু সুলেখার অভিভাবকের সম্মতি মিলিল না, কারণ আমাদের সম্পর্ক এত নিকট, যে এ বিবাহে হিন্দুসমাজের পুরাপুরি নিষেধ না থাকিলেও সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয়।

কিন্তু আমি জানি, হয়ত সুলেখাও জানে, যে এ আপত্তি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, আসল আপত্তির কারণ আমার সম্বলহীনতা। যে চার বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা পাশ করিয়া আজও একটা স্থায়ী কিছু জুটাইয়া লইতে পারিল না, তাহার অদৃষ্টে, অবিশ্বাস।

সুলেখার অন্যত্র বিবাহ হইয়া গেল, এবং যতদূর জানি সুলেখা আমার সহিত বিচ্ছেদের দুঃখে আকুল হইয়া উঠে নাই, বেশ শান্তভাবেই লক্ষ্মী মেয়েটির মত স্বামীর ঘর করিতে গিয়াছিল।

আমি কিন্তু বিবাহে যাইতে পারি নাই, কাজের ওজুহাত দিয়াছিলাম, যদিও সেটা নিতান্তই বাজে কথা। আজ তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে সেদিনের ছেলেমানুষী দুর্ব্বলতার কথা মনে করিলে হাসি পায়, সঙ্গে সঙ্গে মনের কোন্ নিভৃত অংশ যেন ব্যথিত হইয়া উঠে। সুলেখার জন্য নহে, সে দুর্ব্বলতা বহুদিন কাটাইয়া উঠিয়াছি, যে বয়স আর কখনও ফিরিয়া পাইব না, সেই বয়সটুকুর জন্য।

মধ্যে মধ্যে ভাবি সুলেখার কথা, অত বেশীদিন মনে করিয়া না রাখিয়া একটা বিবাহ করিলেই ত' চুকিয়া যাইত। বেশত, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা পরিবৃত হইয়া প্রৌঢ় বয়সটা আরামে কাটানো যাইত। তখনি মনে হয়, একা মঞ্জুর হাতে মধ্যবয়স্ক শরীরটা ছাড়িয়া দিয়াই ত' বেশ কাটিয়া যাইতেছে, আবার ও-সব কথা কেন?

যেন মঞ্জু চিরকাল আমার ছোট্ট মা-টির মত আমার খবরদারীর জন্য থাকিবে, যেন সে নূতন জায়গায় নূতন সংসার পাতিবার জন্য যাইবে না!

প্রোফেসারী করার আরাম যথেষ্ট আছে, অস্বীকার করা যায় না, কারণ কাজের স্বল্পতা এবং ঘন ঘন বিরামই নাকি আরামের প্রধানতম লক্ষণ। কিন্তু অসুবিধা এই যে বছর বছর নূতন নূতন ছাত্রদলের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের বর্দ্ধিষ্ণু বয়সটা বড় বেশী করিয়া মনে পড়াইয়া দেয়।

আজ বয়স বৃদ্ধির কথাটা বেশী করিয়া মনে পড়িতেছে, কারণ আজই তেতাল্লিশ পার হইয়া চুয়াল্লিশে পা দিলাম।

খবরটা ঢাক বাজাইয়া পাড়ার লোককে শুনাইবার মত নহে, তবু অসতর্কভাবে একজন নবাগত অধ্যাপককে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিলাম। বয়সবৃদ্ধির গৌরবে নহে, আসন্ন বার্দ্ধক্যের দুঃখে।

নবাগত অধ্যাপক, ওরফে নির্ম্মল, খবরটা শুনিয়া সহসা অত্যন্ত খুসী হইয়া উঠিল।

নির্ম্মল আমারই ছাত্র, এই কলেজ হইতেই বি, এস্-সি পাশ করিয়াছিল। ছেলেটি মেধাবী,

সুশ্রী, এবং সচ্চরিত্র, এবং আমাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করে। হয়ত' সেই শ্রদ্ধার প্রতিদানেই আমি তাহাকে বিশেষ স্নেহ করি।

নির্ম্মল নিতান্ত ছেলেমানুষ, বয়স বছর ছাব্বিশ। আমারও একদিন ছাব্বিশ বছর বয়স ছিল, যদিও বিশেষ করিয়া সেই বয়সটা ভুলিতে পারিলেই আমি খুসী।

নির্ম্মল কারণে অকারণে আমার কাছে যাতায়াত করে। এবং তাহার আগমনে যে একটি প্রাণী বিশেষভাবে চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহাও আমার দৃষ্টি এড়ায় না। এবং সেই রকম কোনো সময়ে নির্ম্মল "নেচারে" প্রকাশিত কোনো প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার সহিত আলোচনা করিতে সবিশেষ আগ্রহ দেখাইলেও আমি ঠাণ্ডা লাগার ওজুহাত করিয়া সরিয়া পড়ি। তাহাতে যে নির্ম্মল অথবা মঞ্জু বিশেষ দুঃখিত হয়, তাহাও কোনোদিন মনে হয় নাই।

আমি চাই নির্ম্মল এবং মঞ্জুর সম্বন্ধ আরও নিকটতর হোক। অন্ততঃ সেজন্য আমার দিক দিয়া যতটা করা সম্ভব আমি করিব, উভয়ের মিলনের পথে বিন্দুমাত্রও বাধা রাখিব না।

আমার নিজের ছাব্বিশ বছর বয়সের অভিজ্ঞতা দিয়া আমার এই বয়সটার উপর একটা অহেতুক এবং হাস্যকর ভয় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মনে হয়, যেন সারা যৌবনের মধ্যে এই বয়সটাই প্রেমের পথে সকলের চেয়ে দুর্লঙ্ঘ্য গিরি, এ বয়সের ভালোবাসায় শুধু ব্যথাই আছে, আনন্দ বা সাফল্য নাই।

আজ আমার তেতাল্লিশ বৎসর পূর্ণ হওয়াতে আমি ভবিষ্যতের বার্দ্ধক্যের চিন্তায় যতখানি বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিলাম, নির্ম্মল ঠিক সেই পরিমাণে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কহিল, চমৎকার হয়েছে স্যার, আজ আপনার ওখানে বিকেলে আমার চায়ের নেমন্তন্ন, বিকেলে পাঁচটার সময় যাবো।

আপত্তি করিতে পারিলাম না। সৌভাগ্যের বিষয় নিমন্ত্রণের কথাটা নির্ম্মল এমন সময়ে পাড়িয়াছিল, যে সময়ে ঘরে আর কেহ ছিল না। অবশ্য সেটা তাহারই সুবিধার জন্য, কারণ আমার জন্মদিনটা নেহাৎই গৌণ, একটু সকাল সকাল আমার বাসায় গিয়া বেশী সময়ের জন্য বিশেষ কোনো একটি লোকের সঙ্গলাভই যে মুখ্য উদ্দেশ্য, সেটা না বুঝিবার মত বুদ্ধিভ্রংশ আমার এখনও হয় নাই।

বাড়ী আসিয়া মঞ্জুকে বলিলাম, "মঞ্জু, আজ পাঁচটার সময় দুজনের মত চায়ের বন্দোবস্ত রাখিস্ ত', একজনকে নেমন্তন্ন করেছি "

সে বিস্মিত হইয়া বলিল, "তোমার জন্মদিনের জন্যে নাকি ? আমি যে আবার আমার এক বন্ধুকে ব'লেছি !"

বলিলাম, "বেশ ত', না হয় আর একজন বাড়ল ! তাতে আর কি ? কিন্তু আমার জন্মদিনে তোর বন্ধু কেন ?"

"বারে ! তুমি অন্যবারে চুপি চুপি জন্মদিন পার ক'রে দিয়ে তার পরে বল, এবার যখন

সময়েই বলেছ, তখন আমার এক বন্ধু এলই বা! তুমি অবশ্য মেয়েদের দুচক্ষে দেখতে পারনা,—

তাড়াতাড়ি ভীতভাবে বলিলাম, "এসব কথা তোকে কে বল্লে?"

"বল্‌বে আবার কে, সবাইত' জানে!"

অগত্যা কথা চাপা দিতে হইল। কহিলাম, "আমি কাকে নেমন্তন্ন করেছি, জিজ্ঞেস করলি না?"

"কাকে আবার! বিনোদমামাকে!"

বিনোদ আমার আবাল্য বন্ধু, এবং বর্ত্তমানে আমার এক গড়গড়ার ইয়ার।

বলিলাম, "হয়নি, হয়নি, ফেল্। আচ্ছা আর একবার!"

সহসা মঞ্জুর সমস্ত মুখ লাল হইয়া উঠিল; কহিল, "জানিনা, যাও!"

অর্থাৎ সে খুব ভালো করিয়াই বুঝিয়াছে কে আসিবে! আমি নলটা মুখে দিয়া অনেকখানি ধোঁয়া একসঙ্গে ছাড়িয়া তাহার আড়ালে নিঃশব্দে খানিকটা হাসিয়া লইলাম।

মঞ্জু সুন্দরী। সে সৌন্দর্য্য তাহার সুগৌর বর্ণে অথবা মুখের গঠনের খুঁৎহীনতায় নহে, তাহার সর্ব্বাঙ্গের লাবণ্যে। তাহার মায়ের রূপ সে পাইয়াছিল, আর পাইয়াছিল তাহার মায়ের বিদ্যুৎচঞ্চল ভাব।

নির্ম্মল যে মঞ্জুকে ভালোবাসে, সে বিষয়ে আমার একটুও সন্দেহ ছিলনা। ঈশ্বর যে সুখ, তৃপ্তি আমাকে দেন নাই, মঞ্জুকে সে সুখ, সে তৃপ্তি হইতে বঞ্চিত করিবেন না, সে আশা আমার ছিল।

নির্ম্মলের ঘড়ি সম্ভবতঃ একটু দ্রুত চলে, পাঁচটার সময়ে নিমন্ত্রণ হইলেও সাড়ে চারিটা বাজিতেই সে আসিয়া হাজির হইল।

আমি বলিলাম "Punctualityর পরীক্ষা হ'লে তুমি একশর মধ্যে শূন্য পেতে। তোমার ঘড়িতে কোথাকার সময় রাখো? জাভা, না জাপান?"

সে লজ্জিতভাবে একবার নিজের হাতঘড়িটার দিকে তাকাইয়া লইল। কহিল, "না, তা নয়, তবে চারটের সময় আমার ক্লাস শেষ হ'ল কিনা—ভাবলাম, আপনি একা আছেন—।"

যদি সত্যই সম্পূর্ণ একা থাকিতাম, এবং মঞ্জু নামক একটি প্রাণীর আমার বাড়ীতে অস্তিত্ব না থাকিত, তাহা হইলে সে কি করিত, তাহা জানিবার একটা উৎকট ইচ্ছা হইলেও বেচারার লজ্জার মাত্রা আর বাড়াইলাম না। বলিলাম, "বেশ ত', বেশ ত' একাই থাকি, তুমি মধ্যে মধ্যে একটু আসতে পারলে আমি ভারি খুসী হই। তবে তোমরা ইয়ংম্যান্, খেলা ধুলোর দিকে—"

কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত টেনিস্ খেলার দিকে নির্ম্মলের প্রবল আকর্ষণ ছিল। আজ কিন্তু সে কহিল, "খেলা ত আছেই, তবে আপনি একা থাকেন, তাই—"

চাকরে গড়গড়ার কলিকা বদলাইয়া দিয়া গিয়াছিল : আমি হাসি ঢাকিবার জন্য আবার ধূম্রলোকের আশ্রয় লইলাম।

মঞ্জু যে সহপাঠিটিকে আনিয়াছে, তাহার নাম নীলা। মেয়েটি মঞ্জুরই সমবয়সী এবং চমৎকার সুন্দরী। চাঞ্চল্য নাই, পরিবর্ত্তে আছে একটি শান্ত স্নিগ্ধ ভাব।

আমার জন্মদিনের "টি-পার্টি" কেন যেন তেমন জমিল না। বুঝিলাম, তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে নির্ম্মল এবং মঞ্জু তেমন স্বচ্ছন্দবোধ করিতেছে না। আমি অবশ্য ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নই : আমার বয়স এবং কেশবিরল মস্তক যে কোনো তরুণতরুণীর কাছে আমাকে উপন্যাসের অদৃশ্য মানুষের কোঠায় আনিয়া ফেলিয়াছে।

কিন্তু নীলা না আসিলেই যে নির্ম্মল ও মঞ্জু উভয়েই খুসী হইত, তাহা অত্যন্ত সহজে বুঝিলাম।

আমি ভাবিতেছিলাম আমার ছাব্বিশ বছর বয়সের কথা। আমিও সেদিন এমনি করিয়াই নানা অজুহাতে শুধু একটি মানুষকে চোখের দেখা দেখিবার আশায় ও কয়েকটি কথা শুনিবার আশায় একটি বাড়ীতে কথায় কথায় অনধিকার প্রবেশ করিতাম। অনধিকার প্রবেশ বৈকী ? শুধু সুলেখা ছাড়া আর কেহ আমার পায়ের শব্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত না, কেহ ভালো করিয়া দুই একটা কথাও বলিত না। কেনই বা বলিবে ? আমি ছিলাম সম্বলহীন ভবিষ্যৎহীন নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় একটি আপদ মাত্র। তবু সেখানে যাইতাম ; যেদিন প্রবেশপথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া গেল, সেদিন শুধু একটি প্রাণী চোখের জল গোপনে মুছিয়াছিল, সে সুলেখা। নিজের চোখে দেখিয়াছিলাম, তাই। না হইলে আজ আর বিশ্বাস করিতাম না। একটি মেয়ের অলক্ষ্য অশ্রুর ইতিহাস চির অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত, সে ছাড়া আর কেহ জানিত না।

কিন্তু হয়ত সেই ছিল ভালো! কি প্রয়োজন ছিল সেদিন সুলেখার চোখের জলের প্রহসন সৃষ্টি করার ? অকারণে আমার মনে বিবেচনাহীন অহেতুকী আশা জাগাইয়া রাখার, তাহার কি প্রয়োজন ছিল ? বিবাহ ত' সে করিলই!

সে দিনের কথা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে।

বাহিরে রাত্রি অন্ধকার হইতে অন্ধকারতর হইয়া আসিতেছিল, শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ খানিক-ক্ষণের জন্য দেখা দিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল। আমার ছোট্ট ঘরখানিতে বসিয়া মনে হইয়াছিল এ অন্ধকারের আবির্ভাব শুধু আমার জন্যই। এই ত' অল্প দূরেই ঐশ্বর্য্যপূর্ণ আর একখানি বাড়ীতে একটি তরুণী, যে এই সেদিনও আমার সহিত বিচ্ছেদে চোখের জল ফেলিয়াছিল, সে ত' আলোক-মালার মধ্যে বিবাহ-বাসরে শতলোকের দৃষ্টির সামনে সম্পূর্ণ অপরিচিত আর একটি লোকের হাতে হাত দিয়া চিরদিনের মত নিজেকে বিকাইয়া দিল! এই নূতন লোকটি আমার চেয়ে বড় কিসে ?

সুলেখার প্রতি প্রেমে? শুধু অর্থের সমারোহে! সে সেই জিনিষের অধিকারী, যাহার প্রাচুর্য্যে সব জিনিষই কিনিয়া লওয়া যায়, এমন কি প্রেমও!

আমার স্বল্পালোকিত ঘর মুহূর্ত্তে অসহ্য হইয়া উঠিল। মনে হইল বাহিরে বিরাট অন্ধকারের ঐশ্বর্য্যসম্ভার লইয়া রাত্রি আমার জন্য অধীর অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে, আমার যৌবনের সহিত নিশীথ রাত্রির মিলন, আলোকের সহিত অন্ধকারের!

সে রাত্রিটা বাহিরেই কাটাইয়াছিলাম।

মঞ্জু ও নির্ম্মলের মিলনের পথে আমি কিন্তু কোনো রকম বাধা রাখিব না। নির্ম্মল নিঃসম্বল না হইলেও ধনী নহে, তাহার প্রেমের স্থায়িত্বে আমি বিশ্বাস করি। মঞ্জু সুলেখা নহে।

আমার নিঃসঙ্গ জীবনকে সঙ্গ দিবার জন্য নির্ম্মলের আগ্রহ দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল। কলেজে নির্ম্মলের সমবয়সী নবীন অধ্যাপকের দল আমার অনুপস্থিতিতে, এবং কখনও কখনও আমার উপস্থিতিতেই, নির্ম্মলকে হাসিঠাট্টার কেন্দ্র করিয়া তুলিল। আমি পরম আনন্দে দূর হইতে তাহা উপভোগ করিয়া চলিলাম।

এখন আর আমার চোখ এড়াইয়া চলিবার প্রয়োজন রহিল না, মঞ্জুরও না, নির্ম্মলেরও না। আমি বাড়ী না থাকিলেও আজকাল নির্ম্মল মধ্যে মধ্যে আমাকে সঙ্গদান করিতে আসে, এবং আমি বাড়ী নাই শুনিলেও চলিয়া যায় না।

এমনি করিয়া কয়েক মাস চলিল।

শরৎ শেষ হইয়া হেমন্ত আসিয়াছে। তেতাল্লিশ যে চুয়াল্লিশের দিকে দ্রুতপদক্ষেপে চলিয়াছে, অল্প একটু ঠাণ্ডা পড়িলেই শরীরের অবস্থা বুঝিয়া অনুভব করিতে পারি। তবু প্রথম প্রৌঢ়ত্ব হইতে সহসা যাহাতে বার্দ্ধক্যে না গিয়া পড়ি, তাই সকালে উঠিয়া গায়ে মোটা কোট চাপাইয়া সমস্ত মাথাটা ও কাণ দু'টি বালাক্লাভা টুপিতে ঢাকিয়া একটু ঘুরিয়া আসি।

বেশী দূর নয়, মাইল খানেক, খুব বেশী ভোরেও নহে, প্রায় সাড়ে ছয়টার সময়।

কিন্তু তাহাতেই পঞ্চাশের নিকটবর্ত্তী শরীরে ঠাণ্ডা লাগিয়া গেল। দিন কয়েকের জন্য শয্যা আশ্রয় করিতে হইল।

অসুস্থ শরীরেও কিন্তু মঞ্জুকে খুব কাছে পাইতেছি না। নির্ম্মলের সর্দ্দিকাশির ছোঁয়াচ লাগার ভয় বড় বেশী, তাহা সত্ত্বেও রোজ একবার করিয়া দেখিতে আসে। ফলে খানিকক্ষণের মধ্যেই ঘরে আমি একা পড়িয়া থাকি, মঞ্জু অথবা নির্ম্মল, কাহারও অস্তিত্ব থাকে না।

ভাবিতেছি, ভালোবাসিলে মানুষ বড় স্বার্থপর হইয়া যায়। না হইলে মঞ্জু, যে আমার দাড়ি কামাইতে গিয়া গাল কাটিয়া গেলে কাঁদিয়া ফেলিত, সে সর্দ্দিজ্বরগ্রস্ত এই প্রায় চুয়াল্লিশ

বৎসরের বৃদ্ধটিকে একা ফেলিয়া রাখিয়াছে একটা সুস্থ সবল যুবকের খাতিরে! অন্যায়, ভারি অন্যায়।

একটু জোরে ডাকিলে মঞ্জুকে কাছে আনা যায়, কিন্তু স্থিরমস্তিষ্কে ভাবিয়া দেখিলাম, তাহা হইলে উল্টা ফল হইবে। নির্ম্মল ও মঞ্জু উভয়েই আমাকে, অর্থাৎ এই অপদার্থ স্থবিরটাকেই স্বার্থপর ঠাওরাইয়া বসিবে। তাহার চেয়ে রামনাথের শরণ লওয়াই ভালো। রামনাথের ঘটে বুদ্ধি বেশী নাই, গরম জলের বোতল ঠিক ভাবে সাজাইয়া রাখিতে সে জানে না, কিন্তু সে প্রেমে পড়ে নাই, এই সুবিধাটুকু আছে।

মোটামুটি রামনাথের যত্নেই শরীরটা সারিয়া উঠিয়াছে। আট দশ দিন পরে চেয়ার টানিয়া বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছি।

খানিক আগে অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত নির্ম্মল বিদায় লইয়াছে। সহসা মঞ্জুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁরে, নির্ম্মলকে বেশ ভালো লাগে, না?"

চঞ্চলা মঞ্জু সহসা স্থির হইয়া গেল। হাসিয়া কহিলাম, "নির্ম্মলকে খুব ভালবাসিস্?"

সে ধীরে ধীরে আমার চেয়ারের পিছনে আসিয়া ষোলো বছর আগের 'মঞ্জুর' মতই নিঃশব্দে আমার গলা জড়াইয়া ধরিল।

"তা হ'লে নির্ম্মলকে বলি?"

জবাব পাইলাম না। মৌন সম্মতিলক্ষণ বুঝিয়া লইলাম।

নির্ম্মলকে বেশী কিছু বলার প্রয়োজন হইল না। তাহার অভিভাবকের কাছে কথাটা তুলিবার ভার সেই লইল। ঠিক করিলাম, আমি শুধু গিয়া পাকাপাকি দিন স্থির করিয়া আসিব।

বাড়ী আসিয়া হঠাৎ মন খারাপ হইয়া পড়িল। তেরো বছর ধরিয়া যে মঞ্জুকে নিজের হাতে এত বড় করিয়াছি, আজ সহসা তাহাকে বিদায় দেওয়ার চিন্তায় অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, আমার সঙ্গীহীন জীবনের আবার নূতন করিয়া যাত্রা সুরু হইবে। নিজেকে অত্যন্ত স্বার্থপর বলিয়া মনে হইল। মনকে বুঝাইলাম, "যে মঞ্জুকে তুমি অত্যন্ত ভালোবাসো, তাহার সুখের জন্যই ত' এই বিচ্ছেদ! বিচ্ছেদের দুঃখটা অত্যন্ত ছোট, মঞ্জুর সুখ তাহার চেয়ে অনেক বড়। কাঁটা দেখিয়াই যদি গোলাপ ফুল অস্পৃশ্য বলিয়া বর্জ্জন করিতে হয় তাহা হইলে ত' আর চলে না!

দেখিলাম মঞ্জুর চোখে জল। বুঝিলাম, আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথাটা আমার একারই লাগে নাই, তাহারও লাগিয়াছে। আমার নিজের বেদনা যেন অনেকটা সহনীয় হইয়া উঠিল। কহিলাম, "কাঁদছিস্ কেন মা, তোর সুখেই আমার সব চেয়ে বড় আনন্দ। যাকে তুই ভালোবাসিস্, তার হাতেই যখন তোকে দিতে পারছি—"

এইবার সে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "না মামা, তোমাকে ছেড়ে আমি যেতে পারব না, কোথাও না।"

বলিলাম, "পাগলী কোথাকার! তুই ভাবছিস্ তোর বুড়ো মামা চিরদিন বেঁচে থাকবে, আর তুই চিরদিন তার ছোট্ট মা হয়ে থাক্‌বি? তা হয় না রে!"

এই ধরণের একটা পরিস্থিতির সম্ভাবনার কথা আগে হইতেই আমার মনে ছিল, মঞ্জুকে বুঝাইতে বেশী সময় লাগিল না।

কিন্তু পরের দিন নির্ম্মল আসিল না, তাহার পরের দিনও না।

ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। কলেজে গেলে খোঁজ পাওয়া যাইত, কিন্তু সদ্য ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতে উঠিয়াছি, এখনও দিন কয়েক কলেজে যাওয়ার উপায় নাই।

হয়ত নির্ম্মলের শরীর অসুস্থ হইয়াছে, আমার কাছে বেশী যাওয়া আসা করার দরুণ। খুব বেশী চিন্তিত হইলাম না।

কিন্তু মঞ্জু দেখিলাম, একটু ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছে। ঠিক করিলাম কাল যেমন করিয়াই হৌক, একবার কলেজে যাইব। আপাততঃ একখানা চিঠি লিখিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিলাম।

সন্ধ্যার দিকে অগ্রহায়ণের ঠাণ্ডা একটু বেশী পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইল। ঘরের ভিতরে গিয়া ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশয়ান হইয়া কম্বল গায়ে দিয়া একখানা বিলাতী মাসিক খুলিয়া বসিলাম।

একটু বোধ হয় তন্দ্রা আসিয়াছিল, রামনাথের ডাকে জাগিয়া উঠিলাম। হাত হইতে দুধের পেয়ালা লইয়া বলিলাম, "দিদিমণি কই?"

সে অত্যন্ত সন্তর্পণে এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া চুপি চুপি কহিল, "দিদিমণি ও ঘরে কাঁদছে।"

চমকিয়া কহিলাম, "কি করছে?"

"কাঁদছে।"

আমার ঘুমের ঘোর মুহূর্ত্তের মধ্যে কাটিয়া গেল। কম্বল ফেলিয়া মঞ্জুর ঘরে গিয়া ঢুকিলাম।

মঞ্জুর বিছানায় কয়েকখানি চিঠি ছড়ানো, তাহার মধ্যে একখানি লাল চিঠি খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারই পাশে বালিশে মুখ গুঁজিয়া মঞ্জু কাঁদিতেছে।

কম্পিত বক্ষে লালচিঠি খুলিলাম। কয়েকলাইন পড়িয়াই অবসন্ন হইয়া বিছানায় বসিয়া পড়িলাম।

নির্ম্মলের বিবাহ। নীলার সঙ্গে।

আরো একখানি চিঠিতে নির্ম্মলের বাবা সব কথা খুলিয়া লিখিয়াছেন। মঞ্জুর সহিত বিবাহে

তাঁহার আদৌ মত নাই, তিনি অন্যত্র নির্ম্মলের বিবাহ স্থির করিয়াছেন। পাত্রী আগে হইতেই পছন্দ করা ছিল, কাজেই আর উপায়ান্তর ছিল না। সমস্ত ঘটনার জন্য তিনি আন্তরিক দুঃখিত, এবং আমি যেন মনে কোনো ক্ষোভ না রাখিয়া বরকনেকে আশীর্ব্বাদ করি।

চিঠিখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিড়িয়া ফেলিলাম, লাল চিঠিখানাও। মঞ্জু শুধু একবার মুখ তুলিয়া দেখিল মাত্র, কোনো কথা কহিল না।

মঞ্জুকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। স্তব্ধতা ভঙ্গ করিল মঞ্জু। চোখ মুছিয়া সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, ভালোই হয়েছে মামা, তোমাকে ছেড়ে আর আমার কোথাও যেতে হবে না।"

হয়ত ভালোই হইয়াছে।

কিন্তু আমার মনে হইল বহুবর্ষ আগের একটি রাত্রির কথা। মনে হইল, সেদিন যে অন্ধকার-ময় রাত্রি আমাকে সাদরে ডাকিয়া সঙ্গী করিয়া লইয়াছিল, আজ মঞ্জুর জন্যও সে তেমনি অধীর আগ্রহে বাহিরে প্রতীক্ষা করিতেছে। দুইটি মনের অন্ধকারের সহিত স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার মিশিয়া আমাদের চারিদিকের সকল আলো আবৃত করিয়া দিল।

মঞ্জু অনেকক্ষণ আমার কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদিল। আমি বাধা দিলাম না।

বলিলাম "মঞ্জু, আমাদের দুজনের অদৃষ্ট বিধাতাপুরুষ এক ছাঁচেই গড়েছিলেন, তোর নির্ম্মল, আর আমার সুলেখা।"

সে চোখ মুছিয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "সুলেখা কে?"

আমার জীবনের যে বেদনার কাহিনী আমি এতদিন লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, সমবেদনার সাথী পাইয়া তাহা সমস্ত উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিলাম। আমার ছাব্বিশ বছর বয়সের কথা, আমার সম্বলহীনতার কথা, সুলেখার কথা, তাহার গোপন অশ্রুর কথা। সে নিঃশব্দে সব শুনিল।

শেষ করিয়া কহিলাম, "পৃথিবীর লোকের ভালোবাসার অস্তিত্ব আমাদের অদৃষ্টে নাই, তোরও না আমারও না। আর আমাদের সে জিনিষে দরকারও নাই। আমরা দুই মা আর ছেলে মিলে আমাদের নিজেদের ভালোবাসায় আর সবার ভালোবাসার অভাব পূর্ণ করব।"

সে বলিল, "সেই ভালো।"

অনেক অনেকদিন আগে, যখন মঞ্জু ছিল শিশু, যখন তার মুখে ভালো করিয়া কথা ফুটে নাই, ঠিক সেইদিনের মত আসিয়া মঞ্জু আমার গলা জড়াইয়া ধরিল।

যেমন করিয়া ধরিয়াছিল যেদিন নির্ম্মলের ভালোবাসার কথা তাহাকে মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সেইদিন।

বাহিরে রাত্রি গভীর হইয়াছে।

*   *   *   *

সমস্তটা পড়া শেষ করিয়া সুভা বলিল, "আমাদের কতকগুলো আপত্তি আছে।"

বলিলাম, "কি আপত্তি?"

"প্রথম কথা, তোমার বয়স তেতাল্লিশ নয়, সাতাশ। আমারও।"

"আর?"

"দ্বিতীয় আপত্তি, আমাকে অত চট্ ক'রে খুন করার কোনো অধিকার তোমার নেই।"

"তা অবশ্যই নাই, স্বীকার করিতে হইল।

তৃতীয় আপত্তির কথা তোলার আগেই সুভা বসিল, "সুলেখাকে আমি চিন্‌তে পেরেছি।"

"পেরেছ ত কি করতে হবে?"

"কিছুই করতে হ'বে না, তবে সুলেখার এখনও বিয়ে হয়নি।"

"এখনও না হলেও ভবিষ্যতে হবে।"

"ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে। তাছাড়া এখন থেকেই আমার মঞ্জুটাকে নিয়ে আবোল তাবোল কল্পনা করায় আমার তৃতীয় আপত্তি।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, "কল্পনা কে বল্ল?"

"তবে কি? বাস্তব?"

সুভার হাত হইতে কাগজের তাড়াটা ছিনাইয়া লইয়া বলিলাম, "না, দুঃস্বপ্ন।"
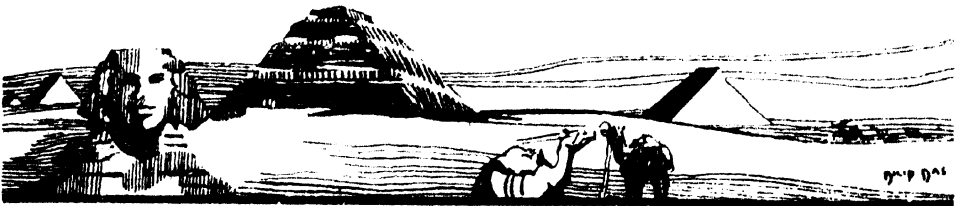
কংগ্রেস রাজনীতি

অধ্যাপক নীরদকুমার ভট্টাচার্য্য

কংগ্রেসই ভারতের একমাত্র রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান যাহা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব দাবী করে। এই প্রতিষ্ঠানে সম্প্রতি যে আন্দোলন ও পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে তাহা সত্যই দেশের পক্ষে প্রীতিকর ব্যাপার নহে। কংগ্রেসের সম্মুখে এইরূপ আভ্যন্তরিক সমস্যা নূতন নহে কিন্তু ইহার উদ্ভব ও পরিণতির দিক দিয়া বিবেচনা করিতে গেলে এইটি অগ্রাহ্য করা মোটেই চলে না। সমস্ত সমস্যাটি এত দ্রুতগতিতে এরূপ জটিল হইয়া উঠিয়াছে যে নিরপেক্ষভাবে বিচার করা ও সমস্যাটির প্রকৃত রূপ আবিষ্কার করা খুবই কঠিন। ইহা বাঙ্গালী ও অ-বাঙ্গালী সমস্যা নয় যদিও ঘটনাস্রোতে ইহাও খানিকটা আসিয়া পড়িয়াছে সকলের মৌখিক প্রতিবাদসত্বেও। ইহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিরোধও নয় কিম্বা নীতিগত বৈষম্যও নয়। এইরূপ সমস্যার উদ্ভব যে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মোটেই মঙ্গলকর নয়। কিন্তু সমাধান করিতে হইলে রাজনৈতিক মতামত পরিষ্কারভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। নীতিগত বিরোধ ও উপদলীয় স্বার্থ যদি পরস্পরের সহিত মিলিত হয় তাহা হইলে বিরোধের কোন সার্থকতা থাকে না। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে নীতিগত বিরোধ অবশ্যম্ভাবী ও অনেক সময় মঙ্গলকর কিন্তু কংগ্রেসের বর্ত্তমান ঘটনাবলী একটু বিবেচনা করিলেই দেখা যায় যে নীতি ও কর্ম্মপন্থার বৈষম্যই এই সমস্যার মূল নয়।

বর্ত্তমান সমস্যার পূর্ব্ব হইতেই কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী বলিয়া অভিহিত দুইটি দল বর্ত্তমান ছিল। দক্ষিণপন্থী বলিতে যাহারা সম্পূর্ণরূপে মহাত্মা গান্ধীর নীতি ও কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিয়া চলেন এবং ইহারাই সংখ্যাগরিষ্ঠের দাবীতে এতাবৎ কংগ্রেসের পরিচালনা কার্য্য করিয়া আসিতেছেন ও এখনও করিতেছেন। বামপন্থীদের মধ্যে অনেক দল বর্ত্তমান। তাঁহাদের প্রত্যেকের নীতি ও কর্ম্মপন্থা পৃথক যদিও কিছুটা নিজেদের মধ্যে ঐক্য থাকিতে পারে এমন কি দক্ষিণপন্থীদের কর্ম্মপন্থার সহিতও অনেকের যৎসামান্য মিল হইতে পারে। কিন্তু সকল বামপন্থীদের মধ্যে এইটুকু বৈশিষ্ট্য যে তাঁহারা দক্ষিণপন্থী অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধীর নীতি ও কর্ম্মপন্থার ষোল আনাই অনুসরণ করিতে রাজী নহেন। বামপন্থীদের মধ্যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রগতিশীল উপদল ব্যতীত তিনটী শক্তিশালী দল আছে যথা—কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল, সাম্যবাদীর (communists or ultra-leftist) ও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দল। এই তিনটির মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য অদ্যাবধি বর্ত্তমান, যাহার জন্য ইহারা একত্রে কোন কার্য্যপন্থা অনুসরণ করেন নাই। মানবেন্দ্ররায়ের দল সম্প্রতি Radical Congress Party নামে রূপান্তরিত হইতেছে। কংগ্রেসের শক্তিশালী দল হিসাবে প্রধান ও প্রথম বামপন্থীদল হইয়াছিল কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল বা Congress Socialist party এবং পণ্ডিত জহরলাল ইহার প্রতিষ্ঠাতা বলিলেও চলে ও তাঁহারই উদ্যোগে কংগ্রেসে বামপন্থীদলের আবির্ভাব।

কংগ্রেসের উপদলীয় পরিস্থিতি ছাড়িয়া এইবার বর্ত্তমান সঙ্কটের উদ্ভব দেখা যাক্। সকলেরই মতে গত জানুয়ারী মাসের রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে কোন বিরোধ দেখা যায় নাই; উপরন্তু সুভাষচন্দ্রের সহিত Working Committeeর অন্যান্য দক্ষিণপন্থীদের সৌহার্দ্দ্য বর্ত্তমান ছিল—ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্ব্বাচনে দক্ষিণপন্থীরা বলিয়া উঠিলেন যে বর্ত্তমানে দেশীয়রাজ্য সমস্যার উদ্ভব হওয়ায় দেশীয় প্রজাসম্মিলনের সভাপতি ডাঃ সীতারামিয়ার নির্ব্বাচনই দেশের পক্ষে কল্যাণকর। সুভাষচন্দ্র বিবৃতিপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে দেশের প্রধান সমস্যা যুক্তরাষ্ট্রের প্রবর্ত্তন এবং প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী নেতার রাষ্ট্রপতি হওয়া বাঞ্ছনীয় ও সেই জন্যই সুভাষচন্দ্র নির্ব্বাচনপ্রার্থী। সুভাষচন্দ্রের মত অনেকের আশঙ্কা যে দক্ষিণপন্থীরা যুক্তরাষ্ট্র চালু করিবে এমন কি প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার তালিকাও প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণপন্থীদের বিবৃতি অযৌক্তিক ও অশোভন এবং অপরদিকে সুভাষচন্দ্রের অভিযোগও সুস্পষ্ট। নির্ব্বাচনের পরেই সকলেই জানিতে পারিল যে মহাত্মাও সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচন সমর্থন করেন না—ইহা জানিবার সুযোগ দেশের লোক নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে পায় নাই। পরস্পর বাদানুবাদ, রাজকোট সমস্যা ও সুভাষচন্দ্রের পীড়ার মধ্যে ত্রিপুরীর অধিবেশন হইয়া গেল। মহাত্মাজী সুভাষচন্দ্রের নিকট পত্রে বলিয়াছেন যে তাঁহাদের মধ্যে মতদ্বৈধ থাকার দরুণ তিনি Working Committee-র সদস্য সুভাষচন্দ্রের উপর জোর করিয়া চাপাইতে চাহেন না, এই মতদ্বৈধের কথা সুভাষচন্দ্রও A. I. C. C.-র অধিবেশনে বিবৃতিপ্রসঙ্গে স্বীকার করিয়াছেন। এই মতদ্বৈধ স্বীকার করিয়া লইলে সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচনে গান্ধীজীর অসম্মতির কারণ পাওয়া যাইতে পারে তবে বহু বিলম্বে। ত্রিপুরীর পন্থপ্রস্তাব ও কলিকাতায় রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন এই দুইটিই দক্ষিণপন্থীদের বাঞ্ছিত। তাহারা যে কংগ্রেসে আজও পর্য্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই ও সেই জন্যই তাহারা উভয়ক্ষেত্রেই সফলকাম হইয়াছে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ইহাই ধর্ম্ম। ইহা অত্যাচার হইলেও সংখ্যাগরিষ্ঠের অত্যাচার।

এই ঘটনাগুলি এখানে বিচার্য্য বস্তু নয় বা এইগুলিই সমস্যা নয়; তবে ইহাদেরই মধ্যে সমস্যার সূত্রপাত। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে দক্ষিণপন্থী বা বামপন্থী, নরমপন্থী বা চরমপন্থী থাকা খুবই ভাল কিন্তু যেখানে নীতি বা কর্ম্মপন্থা লইয়া মতভেদ হয় সেখানেই দুইএর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উৎকর্ষ হয়। উপরোক্ত ঘটনাবলী হইতে এইটুকু অনেকটা বোঝা যায় যে বর্ত্তমান বৈষম্য কেবল নীতি বা কর্ম্মপদ্ধতি প্রসূত নয়; বা হইলেও তাহা জনসাধারণের অজ্ঞাত।

কংগ্রেসে বর্ত্তমানে যে সঙ্ঘবদ্ধ left wing আছে তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল। ত্রিপুরী ও কলিকাতার ঘটনাবলী হইতে স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে এই দলটি বর্ত্তমানে দক্ষিণপন্থীদের আমূল বিরোধিতা করিতে ইচ্ছুক নয় ও পণ্ডিত নেহেরুর চিন্তাধারায় অনেকটা প্রভাবান্বিত। উপরন্তু এই দলটি স্বকীয় পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া, নিজ কর্ম্মপন্থার স্বাধীনতা বজায় রাখিতে চাহে। অবশ্য সমাজতন্ত্রীরা যে সর্ব্বদাই পণ্ডিত নেহেরুর অনুসরণ করিবে

তাহা আমি বলি না কারণ জহরলাল স্বতাই তাঁহার নিজের কথায় "an individual in an organisation." ইহাও আমি বলি না যে প্রত্যেক কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীই ব্যক্তিগতভাবে এইরূপ মত পোষণ করে।

যে "Forward Bloc" কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত হইতেছে, তাহাতে সমাজতন্ত্রীদল যোগ দিবে না বলিয়াই অনুমান; সুভাষচন্দ্রও এইরূপই বলিয়াছেন। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন আসিতে পারেন। এই "Forward Bloc" বর্ত্তমানে কংগ্রেসের গঠন-প্রণালী, নীতি, কর্ম্মপদ্ধতি ও মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব ও অহিংস অসহযোগ প্রণালীতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবে কিন্তু বর্ত্তমান কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের উপর আস্থা রাখিবে এরূপ কোন স্থিরতা নাই। এই Forward Bloc-এর নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন সুভাষচন্দ্র; কংগ্রেসেরই অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া এই দল বামপন্থীদের সঙ্ঘবদ্ধ করিবেন, যেরূপ গান্ধীসেবা সঙ্ঘ দক্ষিণপন্থীদের প্রতিষ্ঠানস্বরূপ রহিয়াছে। কিন্তু এইখানেই আসল সমস্যা। দক্ষিণপন্থীদের কোন কোন কার্য্যে বিরুদ্ধতা ব্যতিরেকে সমস্ত বামপন্থীদের মধ্যে ঐক্যের সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে। বর্ত্তমান কংগ্রেস অধিবেশনগুলিতে ইহা সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। সমাজতন্ত্রীদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বামপন্থী, উগ্রবামপন্থী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদলগুলির মধ্যেও মতের অনেক পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে। এইখানেই দক্ষিণপন্থীদের সুবিধা। অনেকেই দক্ষিণপন্থীদের কার্য্যকলাপ সমর্থন করেন না কিন্তু এই অনেকের মধ্যে মতৈক্যের অভাব। প্রগতিশীল, সাম্রাজ্যবিরোধী বলিয়া সকলেই দাবী করেন এমনকি দক্ষিণ-পন্থীরাও। সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন যে সর্ব্বাংশে না হইলেও অনেকাংশ মিল আছে এরূপ একটি কার্য্যসূচীই হইবে সকল বামপন্থীদের যোগসূত্র। ইহাও বামপন্থীদের মধ্যে compromise বলিয়া মনে হয় এবং এরূপ compromise দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। সেই-জন্যই প্রতি পদে পদে দক্ষিণ ও বামপন্থীদের পরস্পরের বিরোধিতা করিতে হয়। সেইজন্যই প্রশ্ন উঠে যে বামপন্থীদের এইরূপ আংশিক মিল কিছুদিনের জন্য স্থায়ী হইলেও থাকিতে পারে কি? পণ্ডিত নেহেরু এতাবৎ দক্ষিণ ও বামপন্থীদের মধ্যে এইরূপ "greatest common measure of agreement" বজায় রাখিতে চাহিয়াছেন ও সেইভাবেই চলিতেছেন। ইহাতে অনেকের নিকট মধ্যে মধ্যে দোষভাজন হইয়া উঠিতেছেন।

এই "forward bloc" গঠন সম্পর্কে আরও কয়েকটি প্রশ্ন স্বতঃই উঠিতে পারে। বাম-পন্থীদের ইহা একটি 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট" স্বরূপ ধরিলে কোন্ issueতে ইহারা সংগ্রাম করিবে। কম্যুনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রবাদীদের স্বতন্ত্র issue আছে, কিন্তু অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বা ব্যক্তিবিশেষ যাঁহারা কোন কারণে দক্ষিণপন্থীদের উপর বিরূপ তাঁহারা কোন issue লইয়া সংগ্রাম করিবে? দক্ষিণপন্থী নেতাদের মধ্যে কয়েকজনের কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধতা করা ব্যতীত কোন নীতিগত বিরুদ্ধতা তাঁহাদের থাকিবে না। যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত আপোষ মনোভাবের যে অভিযোগ রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে শোনা গিয়াছিল, নির্ব্বাচনের পরে তাহাও আর আমরা শুনি নাই। ত্রিপুরীতে সুভাষচন্দ্র

বলিয়াছিলেন যে ভূতপূর্ব্ব ওয়ার্কিং কমিটির সহকর্ম্মীদের বিরুদ্ধে তিনি কোন অভিযোগ রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের সময় করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ যেভাবে forward bloc এর উদ্ভব হইতেছে তাহাতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাঙ্গালী অবাঙ্গালী প্রশ্ন রাজনীতিতে আসিয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। বৃহৎ রাজনীতিক্ষেত্রের দিক হইতে ইহা ভারত এমন কি বাঙ্গলাদেশের পক্ষেও ক্ষতিকর। বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কর্পোরেশনে হস্তক্ষেপ, রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি প্রভৃতি সমস্যা বাঙ্গলা দেশের সম্মুখেই রহিয়াছে অথচ ইহার সমাধানকল্পে বাঙ্গলাদেশে যথোপযুক্ত কিছুই আন্দোলন হইতেছে না এবং ইহাও সর্ব্বজনবিদিত যে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান অন্যান্য প্রদেশের তথা সমগ্র ভারতের সাহায্য, সহানুভূতি ও আন্দোলন ব্যতীত সফল হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থাকিলেও এই "forward bloc"এর ফলে ভেদবৈষম্য একটু হইবেই। সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন যে, "It would be much more desirable to face the internal crisis now ; go through it and emerge out of it before the external crisis seizes us." কিন্তু ইউরোপের অবস্থা ও যুক্তরাষ্ট্রের কথা ও দেশীয় রাজ্য সমস্যার বিষয় মনে করিলে এই external crisis যে কত নিকটবর্ত্তী তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। সুভাষচন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা ইহা অধিক হৃদয়ঙ্গম করেন। বোধ হয় এই crisis লক্ষ্য করিয়াই শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ত্রিপুরীতে "ultimatum resolution" উত্থাপন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত নেহেরুও এই external crisis উপলব্ধি করিয়াই ত্রিপুরীর পর কংগ্রেসের অচল অবস্থায় অস্থির হইয়াছিলেন ও যে কোন উপায়ে ইহার অবসানে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। বিংশশতাব্দীর রাজনীতিতে opportunism যে কতখানি সহায়ক তাহা হিটলার প্রত্যেক psychological momentএর সদ্ব্যবহার করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। উপরন্তু internal crisisএর সম্মুখবর্ত্তী হইলেও যে অবিলম্বে ইহার সমাধান করা যাইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। বহির্দ্বন্দ্বের পূর্ব্বেই এই ঘরোয়া দ্বন্দ্বের অবসান হইয়া যাইবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। পণ্ডিত নেহেরু ও কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল এই আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যে বামপন্থীদের united front এর পরিবর্ত্তে সমস্ত কংগ্রেসকে দেশের popular front স্বরূপ দণ্ডায়মান করাইতে বদ্ধপরিকর। আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে হয়ত ইহা "Surrender to the Rightist High Command" ; কিন্তু গত তিনবৎসরে কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধির কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কংগ্রেসের গত তিন বৎসরের বাৎসরিক অধিবেশনে বামপন্থীদের প্রগতিশীল নীতি দক্ষিণপন্থীরা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। গণসংযোগ, চাষী-শ্রমিক আন্দোলন, শ্রমশিল্পপ্রসারণ প্রভৃতি অর্থ-নৈতিক কার্য্যপদ্ধতি কংগ্রেস স্বীকার করিয়া লইয়াছে—এটি বামপন্থীদের পক্ষে জয়সূচক। যদি external crisis আসন্ন বলিয়া পরিগণিত হয় তবে সমস্ত কংগ্রেসকে দেশের বিরাট শক্তিশালী popular front করিয়া অবিলম্বে গড়িয়া তোলা উচিত। কয়েকজন দক্ষিণপন্থীর কার্য্যকলাপ গ্রাহ্য করাই উচিত নহে। এবিষয়ে পণ্ডিত নেহেরু ও সুভাষচন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা করিতে পারেন।

পথে প্রবাসে

যতীশচন্দ্র সেন

(পূর্বানুবৃত্তি)

কিছুক্ষণ পরে সেই ভদ্রলোক নেমে এলেন। পরিচয়ে জানলাম তাঁর নাম মিঃ কার্থি, জাতিতে আইরিশ। আমাকে বল্লেন যে ৫।৬ দিন থাকতে হ'লে ১২ ফ্রাঁর (তখনকার হারে প্রায় ২৲ টাকার মত) কমে ভাল ঘর পাওয়া যাবে না এবং আমাকে সেখানেই থাকতে পরামর্শ দিলেন। আর বল্লেন যে তাকে তখনই আফিসে যেতে হ'বে, তিনি আমার জন্য প্যারিশের একটা গাইড্ বই তাঁর চিঠি রাখবার তাকে রেখে যাবেন, যদি আমার কোন দরকার হয় তবে সেখানে 'চিঠি লিখে রাখলেই তিনি পাবেন। রাত্রিরে তাঁর সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ হ'ল সে কথা পরে বোল্‌বো। এইসব কথাবার্ত্তায় প্রায় ৯॥০টা বেজে গ্যালো --তখনও আমার মুখহাত ধোয়া হয়নি, বেশ ক্ষুধাও পেয়েছে। তাড়াতাড়ি জিনিষপত্র নিয়ে উপরে গেলাম---আমার ঘরখানা দোতালায় হওয়াতে বেশী কষ্ট পেতে হোলোনা --দেখলাম ছোট হ'লেও ঘরখানা বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, ঘরের ভেতর একটা বেসিন, তাতে গরম ও ঠাণ্ডা জলের নল, দুখানা চেয়ার, একটী টেবিল, ও একটী আলমারী ও পালঙ্ক, মেজেতে কার্পেট পাতা। তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে জিনিষপত্র কোনরকমে গুছিয়ে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়্‌লাম। দ্বারোয়ানকে জিজ্ঞাসা কল্লাম ২৭নং রু দ্য সমেরার্ড কতদূর। লণ্ডনে থাক্‌তেই শুনেছিলাম যে সেখানে ভারতীয় ছাত্রসমিতির অফিস ; দ্বারোয়ানের নির্দ্দেশমত ৪।৫ ধাপ সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতেই রুদ্য সমেরার্ড পাওয়া গ্যালো। ১৭ নম্বরে গিয়ে বেল টিপতেই একটী বৃদ্ধা মহিলা বেরিয়ে এলেন তাঁকে জিজ্ঞাসা কল্লাম এটা কি ভারতীয় ছাত্রসমিতির অফিস ? তিনি ইংরাজীতেই উত্তর দিলেন। য সে আফিস্ উঠে গিয়েছে এবং অধিকাংশ ভারতীয় ছাত্রেরা এখন ৯নংএ থাকে, তবে ডাঃ বসু সেই বাড়ীতে থাকেন, তিনি তখন না থাকায় সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। একটু যেতেই একটা চীনে রেস্তোঁরা দেখলাম। 'লণ্ডনে থাক্‌তেই আমার এক বাঙ্গালী বন্ধু পরামর্শ দিয়েছিলেন যে প্যারিশে আমি যেন চীনা রেস্তোঁরাতেই খাওয়া দাওয়া করি, কারণ সস্তায় প্রচুর ভাত ও মাছের তরকারী পাওয়া যায়। সেকথা মনে হওয়াতে তাড়াতাড়ি রেস্তোঁরাতে ঢুকে পড়লাম। আমাকে

দেখেই একটী ভীষণ মোটা ফরাসী মহিলা এগিয়ে এল, আমি ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা কল্লাম যে লাঞ্চ খেতে পাওয়া যাবে কিনা। সে ঘাড়নেড়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে বল্লে যে ১২টার আগে খাবার তৈরী হ'বে না। তখন প্রায় ১১টা। আমি বল্লাম 'যদি এখনই না দ্যাও, তবে আমি অন্যত্র চল্লাম'। খদ্দের ছুটে যাচ্ছে, দেখে সে আমাকে আদর করে বসালে ও মেনুকার্ড (খাদ্যের তালিকা) এনে দিলে। ফরাসীভাষায় লেখা থাকাতে ভারী মুস্কিলে পড়লাম, অনেক খুঁজে পেতে ভাত ও মাছের কারী পেলাম। প্রায় ১৫ মিনিট পরে চীনে খানসামা একটী চীনে মাটির হাঁড়ীতে প্রায় আধহাঁড়ী ভাত ও একটা চীনামাটীর বাটীতে একটু মাছের ঝোল রেখে গেলো—ভাত দেখেই ত চক্ষুস্থির প্রায় ৪ জনের খোরাক। মাছের ঝোলের মধ্যে কাল কাল জিনিষ দেখে বড্ড ঘেন্না কর্ত্তে লাগলো। জিজ্ঞাসা করাতে মহিলাটী বল্লে যে সেগুলো ব্যাঙ্গের ছাতা। একটু মাছ মুখে দিতে ভয়ানক বালি বালি লাগলো। কোনরকমে চাটিভাত অতিকষ্টে খেয়ে নিলাম। দাম নিলে ৮ ফ্রাঁ—ও বকশিশ নিলে ৮ সেণ্টিম। ফরাসী গভর্ণমেণ্ট আইন করে বকশিশের হার বেঁধে দিয়েছে। এই অভিজ্ঞতার পরে প্যারিশে আর কখনও চীনে হোটেলে যাইনি। প্যারিশে কাফে, রেস্তোঁরা ইত্যাদির জন্য প্রসিদ্ধ, অধিকাংশ রেস্তোঁরা বা কাফেতে ভেতরে বস্‌বার ব্যবস্থা তো আছেই তাছাড়া ফুটপাথে পর্য্যন্ত চেয়ার টেবিল পেতে রেখেছে। গ্রীষ্মের সময়ই এই ব্যবস্থা, শীতকালে বা বর্ষায়ও উপরে ত্রিপাল টাঙ্গান হয়। এসব রেস্তোঁরা প্যারিশের গরীব ও মধ্যম শ্রেণীর নাগরিকদের ক্লাবহাউসের কাজ করে। অধিকাংশ বাসিন্দারা দক্ষিণহস্তের ব্যাপারটা কাফে রেস্তোঁরাতেই সেরে ন্যায়। কফি, লেমোনেড, মদ বা বিয়ার ইত্যাদি বা সামান্যরকম জলযোগ কল্লেই, আপনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে পারেন—খবরের কাগজ ইত্যাদি পড়বার স্বযোগও আছে। শীতকালে খুব ঠাণ্ডার সময়ে অনেক ছাত্র এইসব কাফেতে এসে পড়াশোনা করে থাকে, কারণ প্যারিশের বাড়ীগুলি অধিকাংশই পাথরের তৈরী বলে শীতকালে অত্যন্ত ঠাণ্ডা হয়, এবং কাফে গুলিতে সর্ব্বদাই কয়লা জ্বালিয়ে গরম রাখা হয়।

যুগে যুগে ইউরোপের প্রায় অধিকাংশ দেশের বহু লোক নানা কারণে প্যারিশে এসে আশ্রয় নিয়েছে—এদের অনেকেই দুর্দ্দম, দুঃখজয়ীর দল, সর্ব্বহারা সর্ব্বজয়ী এরা, ল্যাটিন কোয়ার্টারের (ইউনিভারসিটী অঞ্চলের) কাফে ও রেস্তোঁরাগুলি এদের আড্ডার যায়গা, এখান থেকেই এদের নিত্যনূতন ভাবধারা জগতের বুকে নবীন স্পন্দন এনে দিয়েছে। সে হিসাবে এইসব কাফে বা রেস্তোঁরার দাম কম নয়। যাক্, অনেক অবান্তর কথা আলোচনা করা গেলো। চীনে রেস্তোঁরা থেকে বেরিয়ে ৯ নং রু দ্য সমেরার্ড গেলাম, সেখানে গিয়ে বেল টিপ্‌তেই ফরাসী পরিচারিকা বেরিয়ে এল, তাকে ছাত্রসমিতির কথা জিজ্ঞাসা কল্লাম, সে বাইরের দিকে হাত নেড়ে ফরাসীভাষায় বল্লে "সর্ত্তি", অর্থাৎ সবাই বেরিয়ে গেছে। অগত্যা সেখান থেকে বেরিয়ে বড়রাস্তা ধরে সোজা চল্‌তে লাগলাম কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একটা রাস্তার মোড়ে একটী ছেলেকে বাঙ্গালী বলে মনে

হোলো—তাকে গিয়ে বাংলাতে কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তেই তিনি ইংরাজীতে উত্তর দিলেন। আমি একটু অপ্রস্তুত হলাম। যাহোক শ্রীযুত দেশাই, আমাকে ৯ নম্বর রু দ্য সমেরার্ড যেতে পরামর্শ দিয়ে বল্লেন যে সেখানে আমি ভারতীয় ছেলেদের কাছ থেকে যতদূরসম্ভব সাহায্য পাব। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বড়রাস্তা দিয়ে সোজা চল্‌তে লাগলাম, কিছুক্ষণ পরে দেখি বিশ্ববিখ্যাত লুভ্যর মিউজিয়মের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি। প্রকাণ্ড চকমিলান প্রাসাদ। মস্তবড় একটী পার্কের মধ্যে সুন্দর কেয়ারী করা ফুলের বাগান। লুভ্যর সম্বন্ধে আমাদের দেশে বাংলা ও ইংরাজীতে হাজার হাজার লেখা বেরিয়েছে। কাজেই সে সম্বন্ধে আমার বেশী কিছু বলা বাহুল্য ; তবে এস্থানে এমন দ্রষ্টব্য ছবি, প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি আছে ; ভালকরে দেখতে হ'লে ২।৩ মাস কাটাতে হয়। প্রায় ১টার সময় ঢুকে ৫টার সময় বেরোলাম। ফরাসীভাষা না জানাতে ভারী অসুবিধা হয়েছিল, সঙ্গে ভুলক্রমে গাইড বইও নেই নেই। গাইড্ পাওয়া যায় তবে একজনের খরচ বড্ড বেশী পড়ে। দেখলাম পা ফুলে গেছে—কোনরকমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পোষ্টাপিস হয়ে বাসায় ফিরে এলাম।

(ক্রমশ)

পোল্যাণ্ড কি করিবে?

দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ইউরোপে বর্ত্তমানে যে রাজনৈতিক ঝড় উঠিয়াছে, পোল্যাণ্ড তাহাতে কি করিবে—ইহা লইয়া অনেক রকম জল্পনা-কল্পনাই শুনা যাইতেছে। জল্পনা-কল্পনা হওয়া অবশ্য খুবই স্বাভাবিক, কারণ পোল্যাণ্ড যদি হিটলারের কুক্ষিগত হয়, তবে নাৎসী দাপটে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির নাভিশ্বাস উপস্থিত হইবে। তাই সকলের মুখেই এক প্রশ্ন—পোল্যাণ্ড কি করিবে?

গত আগষ্ট মাসে পোলিশ বন্দর গিনিয়ার (Gdynia) ষ্টেশন মাষ্টার উইনিকি স্থানীয় একখানি ট্রেণে ডানজিগ এলাকায় ভ্রমণ করিতেছিলেন। উক্ত ট্রেণে কয়েকজন নাৎসীও ছিল। নাৎসীরা উইনিকিকে ধরিয়া বসিল, তাঁহাকে নাৎসী-কায়দায় সেলাম ঠুকিতে হইবে। উইনিকি তাহাতে অস্বীকৃত হন। নাৎসীরা তখন তাঁহাকে নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিয়া ট্রেণের বাহিরে ফেলিয়া দেয়। তিনি এমন গুরুতর-রূপে আহত হ'ন যে, তাঁহার দুইখানি পা এবং একখানি হাত একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। এই ঘটনায় সমগ্র পোল্যাণ্ডে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষের আগুন জ্বলিয়া উঠে। তবে সেই সময় চেকসমস্যা লইয়া ইউরোপ মহা বিব্রত থাকায় এই ব্যাপারটা অল্পেই চাপা পড়িয়া যায়।

মার্শাল পিলসুডস্কী

শুধু উইনিকিই মার খাইয়াছেন এমন নয়: ডানজিকে এবং পোল্যাণ্ডের সমুদ্র-প্রবেশপথ করিডর প্রদেশে জার্ম্মান এবং পোলদের মধ্যে এইরূপ দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রায়ই হইয়া থাকে। অনেক সময় এগুলির প্রতি কেহ তেমন নজর দেয় না, তবে এক এক সময় অবস্থা অতি গুরুতর আকার ধারণ করে।

ইউরোপের অনেকে মনে করেন পোল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র নীতি অতি দুর্ব্বল এবং পোলদের পক্ষে তাহা মারাত্মক। মার্শাল পিলসুডস্কী একজন বিচক্ষণ রাজনীতিক ছিলেন। জার্ম্মাণীর সহিত তিনি যে সম্পর্ক স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, পোল্যাণ্ড আজও তাহা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। পিলসুডস্কীর নীতি অনুসরণ করিয়া পররাষ্ট্র-ব্যাপারে আজও যে পোল্যাণ্ড বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় দিতেছে, একটু তলাইয়া দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে। ১৯৩৩ সালে পিলসুডস্কী বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, হিটলারকে বাধা দেওয়ার সময় আসিয়াছে। তাই তিনি ফ্রান্সের নিকট প্রস্তা

মঃ এন্টনী রোম্যান
(পোল্যাণ্ডের বাণিজ্য সচিব)

করিলেন, নাৎসীদের যে নূতন সমরায়োজন হইতেছে, তাহার বিরুদ্ধে ফ্রান্স এবং পোল্যাণ্ডের একযোগে লড়াই করা উচিত। ফ্রান্স সে কথায় কর্ণপাত করিল না ; কারণ ইউরোপের রাষ্ট্র-ধুরন্ধরগণ তখনও হিটলারকে ঠিক চিনিতে পারেন নাই, কাজেই তাঁহারা তাহাকে লইয়া তেমন মাথাও ঘামান নাই। কিন্তু মার্শাল পিলসুডস্কী ছিলেন দূরদর্শী, হিটলারকে তিনি তখনই চিনিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাই ফ্রান্স জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে লড়িতে অস্বীকৃত হইলেও পিলসুডস্কী হিটলারকে স্পষ্ট ভাষায়ই বলিলেন, জার্ম্মাণী শান্তি অথবা যুদ্ধ কোনটা চাহে—তিনি জানিতে চাহেন। হিটলার যুদ্ধ চাহিলেই তখন যুদ্ধ লাগিত ; কিন্তু পোল্যাণ্ডের সামরিক শক্তির কথা তিনি ভাল ভাবেই জানিতেন। তিনি জানিতেন, মার্শাল পিলসুডস্কীর সৈন্যবাহিনী ডানজিগ ও পূর্ব্ব-প্রুশিয়া
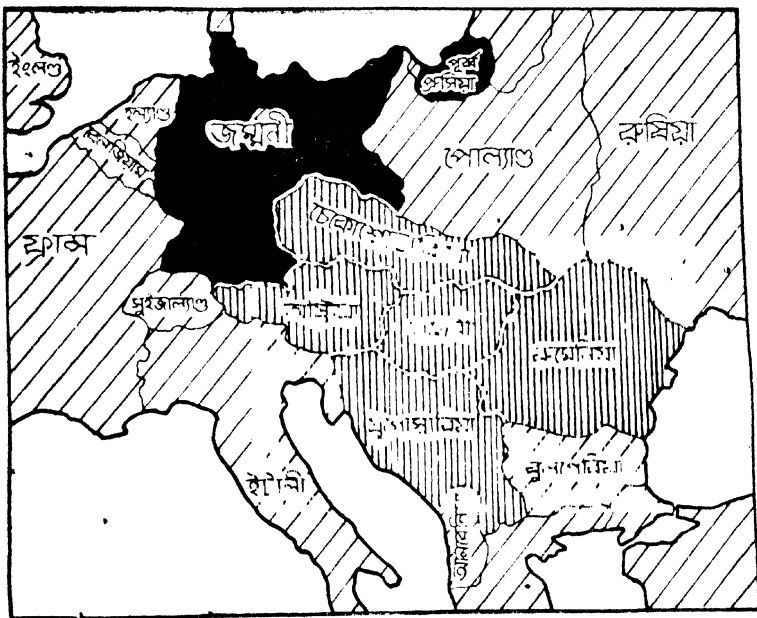
পোল্যাণ্ডের মানচিত্র

দখল করিয়া অনায়াসেই বার্লিনের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। পিলসুডস্কী বৃথা আস্ফালন করেন নাই একথা হিটলার ভাল ভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন : তাই তিনি তখন জার্ম্মাণী-পোল্যাণ্ড অনাক্রমণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। দশ বৎসরের জন্য এই চুক্তি হয়। সম্প্রতি হিটলার ঘোষণা করিয়াছেন যে, বৃটেনের সহিত পোল্যাণ্ড মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় জার্ম্মাণ-পোল অনাক্রমণচুক্তি বাতিল হইয়াছে, কারণ হিটলারের মতে পোল্যাণ্ড বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি শক্তির সহিত মিতালী করিয়া জার্ম্মাণীকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিবার চক্রান্ত করিতেছে। কর্ণেল বেক হিটলারের এই হুমকিতে ভরকাইয়া না যাইয়া দৃঢ়ভাবে উত্তর দিয়াছেন, হিটলারের এই উক্তি যুক্তিহীন।

ইচ্ছা করিলে জার্ম্মাণী পোল্যাণ্ডের মিত্রশক্তি হিসাবে আগের মতই থাকিতে পারে—আর তাহা না হইলে হিটলারের হুমকীতে পড়িয়া পোল্যাণ্ড সূচ্যগ্র ভূমিও ছাড়িয়া দিবে না।

১৯৩৫ সালে মার্শল পিলসুডস্কীর মৃত্যুর পর হইতে রাজনৈতিকক্ষেত্রে তাঁহার দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ কর্ণেল জোসেফ বেকই পোল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। মার্শাল পিলসুডস্কীর নিকটই তিনি আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিতে জ্ঞানলাভ করেন। কর্ণেল বেকের পররাষ্ট্র-নীতির মূলকথা হইল, পোল্যাণ্ড একমাত্র নিজের উপর ছাড়া আর কাহারও উপর নির্ভর করিতে পারে না। রাষ্ট্রসঙ্ঘের উপর তাঁহার কোনই আস্থা নাই; ইউরোপের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাসবাণীতে তিনি মোটেই বিশ্বাস করেন না। পাঁচটা রাষ্ট্র মিলিয়া একটা রাষ্ট্রকে বিপদের দিনে রক্ষা করিবে, এ কথা শুনিয়া তিনি মনে মনে হাসেন। নাৎসীদের কথা তো তিনি মোটেই বিশ্বাস করেন না। জার্ম্মাণীর সহিত সংগ্রাম বাধিলে বৃটেন ও ফ্রান্সের নিকট পোল্যাণ্ড সাহায্যের জন্য অবশ্যই হাত বাড়াইবে; কিন্তু হাত-বাড়াইলেই যে সাহায্য মিলিবে এ কথা তিনি বিশ্বাস করেন না। এই সব কথা বিবেচনা করিয়াই তিনি তাঁহার পররাষ্ট্রনীতি নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন।

পোল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র সচিব কর্ণেল বেক

মিউনিক চুক্তি হইবার পূর্ব্বে ইউরোপে অনেকেই বলাবলি করিত যে, জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে চেকোশ্লোভাকিয়া ভাল ভাবেই লড়িতে পারিবে, কারণ চেকোশ্লোভাকিয়ার পশ্চাতে সব বড় বড় মিত্রশক্তি রহিয়াছে। অপর দিকে পোল্যাণ্ডের কথা বলা হইত,—ওর যেমন একা থাকার অভ্যাস—বিপদ ঘনাইতে বেশী দিন নয়। পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হইলে উহার পশ্চাতে দাঁড়াইবে কে?— কর্ণেল বেক কিন্তু তখনই বলিয়াছিলেন, চেকো-শ্লোভাকিয়ার বিপদের দিনে কোন বন্ধুই থাকিবে না। হইলও সত্য তাহাই। চেকোশ্লোভাকিয়াকে হিটলারের মুখে দিয়া সকলেই পলাইল। মিউনিক চুক্তিতে চেকোশ্লোভাকিয়ার সমাধি রচিত হইল।

মিউনিক চুক্তির পর যে অবস্থা দাঁড়ায়, তাহাতে সকলেই মনে করিয়াছিল যে, মধ্য ইউরোপে হিটলারই একেবারে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া বসিবেন। কিন্তু দেখা গেল, মিউনিকে চতুঃশক্তির মিলনের কয়েক দিন পরই পোল্যাণ্ড ওডেরবার্গ সহরটি দখল করিয়া বসিল। ওডেরবার্গ একটি প্রসিদ্ধ রেলওয়ে জংসন এবং ইহা ছিল চেক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। জার্ম্মাণী পোল্যাণ্ডকে ওডেরবার্গ ছাড়িয়া দিতে বলিল, কিন্তু পোল্যাণ্ডের সৈন্যেরা সে স্থান ছাড়িয়া যাইতে অস্বীকৃত হইল। সে অবস্থায় ওডেরবার্গ পাইতে হইলে জার্ম্মাণীকে যুদ্ধ করিতে হয়; কিন্তু হিটলার যুদ্ধ করিতে সাহসী

হইলেন না, তিনি ব্যাপারটা বেমালুম হজম করিয়া গেলেন। না যাইয়া উপায় কি—পোল্যাণ্ডের শক্তিসামর্থ্য তো তাঁহার জানিতে বাকী নাই।

অতঃপর হিটলারের শ্যেনদৃষ্টি যখন ইউক্রেনের উপর পড়ে, তখন পোল্যাণ্ড তাহাতে বাধা দিতে উদ্যত হয়। কর্ণেল বেক বুঝিলেন, ঐ অবস্থায় হিটলারকে বাধা না দিলে তাহার আস্কারা বাড়িয়া যাইবে। তাই তিনি বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে হাত বাড়াইলেন। পোলিশ-সোভিয়েট আক্রমণ-চুক্তি পুনরায় ঝালাই করিয়া লওয়া হইল এবং ওয়ারস ও মস্কোর মধ্যে বাণিজ্যচুক্তির আলোচনা চলিল। জার্ম্মাণী দেখিল ব্যাপারটা বড় সুবিধা হইতেছে না। পোল্যাণ্ড নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য নাৎসীদের চিরশত্রু সোভিয়েটের সঙ্গে হাত মিলাইতেছে কাজেই জার্ম্মাণী আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। কর্ণেল বেকের কূটনীতির পাকচক্রে পড়িয়া হিটলারকেও ঘুর-পাক খাইতে হইতেছে।

পোল্যাণ্ডের সমর-নায়ক
মার্শাল স্মিগলী রিজ

জার্ম্মাণীর লোলুপ দৃষ্টি রহিয়াছে পোল্যাণ্ডের করিডর (Corridor) অথবা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশটীর উপর। ভার্সাই সন্ধির ফলে পোল্যাণ্ড সমুদ্রে যাইবার ঐ একটিমাত্র পথ পায়। জার্ম্মাণীর ইচ্ছা ঐ পথটী বন্ধ করিয়া দেয়। তাহাতে ব্যাল্টিক সাগরের উপকূলবাণিজ্য পোল্যাণ্ডের হাতছাড়া হইবে এবং জার্ম্মানী তাহাতে এক-চেটিয়া অধিকার পাইবে। আর তা'ছাড়া পোলিশ করিডর হাতে আসিলে পূর্ব্ব প্রুশিয়ার সহিত জার্ম্মাণীর যোগাযোগটাও ভালরকম হইয়া যায়। পোল্যাণ্ডের সহিত জার্ম্মানীর বিরোধের আর একটি সূত্র হইল ডানজিগ বন্দর এই বন্দরটীর পরিচালনার ভার রাষ্ট্র-সঙ্ঘের হাতে। ডানজিগে জার্ম্মানদের আধিপত্যই বেশী, কিন্তু এই বন্দরে পোল্যাণ্ডের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থও নিতান্ত কম নয়। বাল্টিক সাগরে পোল্যাণ্ডের গিনিয়া নামে যে নূতন বন্দর হইয়াছে—ওয়ারশ হইতে সেখানে রেলরাস্তা গিয়াছে ডানজিগের উপর দিয়া। আর তা'ছাড়া ডানজিগে যাইয়া যদি নাৎসীবাহিনী আড্ডা গাড়িতে পারে, তবে গিনিয়াতে যাইতে কতক্ষণ। ডানজিগ হইতে গিনিয়া তো মাত্র দশ-বারো মাইল পথ। এইসব দুর্ব্বুদ্ধি মাথায় খেলিয়াছে বলিয়াই সম্প্রতি জার্ম্মানী পোল্যাণ্ডকে জানাইয়াছে যে, ডানজিগ হইতে

রাষ্ট্রসঙ্ঘের হাই কমিশনার তুলিয়া লইবার জন্য আলোচনা চালান হউক। জার্ম্মানী আরও দাবী করিয়াছে যে, ডানজিগ হইতে পোলিশ কমিশনার জেনারেলকেও তুলিয়া লইতে হইবে, সেস্থলে পোল্যাণ্ডের একটি সাধারণ দূতাবাস থাকিবে মাত্র। জার্ম্মানরা দয়া করিয়া পোল্যাণ্ডকে বন্দরটী ব্যবহার করিতে দিবে সত্য : কিন্তু ডানজিগে পোলদের যেসব রাস্তাঘাট ও রেলপথ আছে সেগুলি জার্ম্মানদের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত ডানজিগে বাণিজ্যশুল্কের উপরও পোল্যাণ্ডের কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিবেনা। পোল্যাণ্ড ইহার কোন মৌখিক উত্তর দেয় নাই, সীমান্তে সৈন্যসমাবেশ করিয়া জার্ম্মানদের এই অসঙ্গত দাবীর সমুচিত উত্তর দিয়াছে। ফলে জার্ম্মানরাও খানিকটা চুপ করিয়া গিয়াছে।
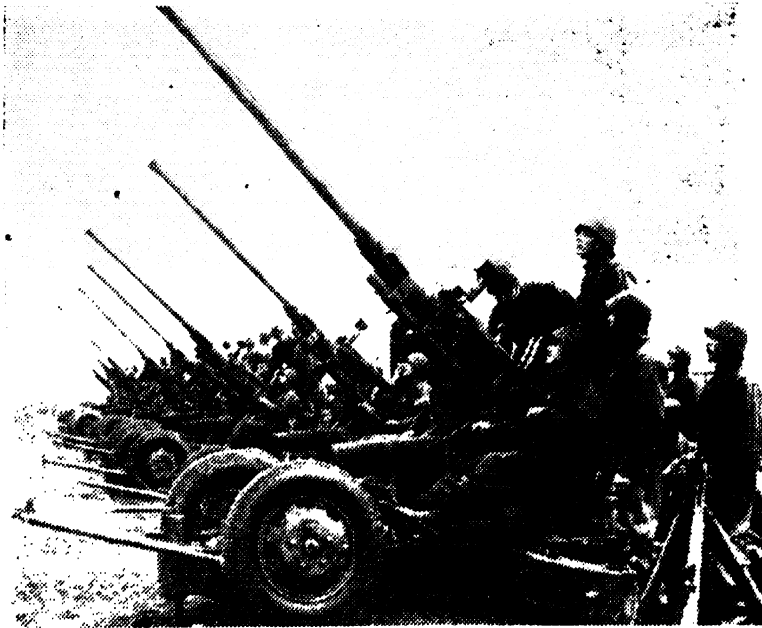
পোল্যাণ্ডের সীমান্তে সজ্জিত বিমানধ্বংসী কামানসমূহ। ডানজিগে কোনরূপ গোলযোগ বাধিলেই এই গুলি হইতে গুলী চলিবে।

পূর্ব্বে করিডর ছিল একটি বিপজ্জনক অঞ্চল। ট্রেণে ভ্রমণের সময় যাত্রীদিগকে সব জানালা-কপাট বন্ধ করিয়া রাখিতে হইত। আজকাল আর ততখানি ভয়ের কারণ নাই। পোল্যাণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ এখন উক্ত অঞ্চল হইতে নাৎসী জার্ম্মান কর্ম্মচারীদিগকে আস্তে আস্তে সরাইয়া তৎস্থলে পোলদিগকে নিযুক্ত করিতেছেন। করিডর অঞ্চলে নাৎসীদের প্রচারকার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোনরূপ চাল চালিয়া করিডর গ্রাস করার পথ বন্ধ হইয়াছে, উহা গ্রাস করিতে হইলে

জার্ম্মানীকে এখন যুদ্ধ করিতে হইবে। বিনাযুদ্ধে ডানজিগ বন্দরও জার্ম্মানী পাইবে বলিয়া মনে হয় না। অনেকে অবশ্য বলিতেছেন যে, করিডর ছাড়িয়া দিয়া পোল্যাণ্ড জার্ম্মানীর সহিত একটা আপোষ করিবে। কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই একথা স্বীকার করিবেন যে, করিডর জার্ম্মানীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার অর্থ হইল পোল্যাণ্ডের কোমড়ভাঙ্গা হইয়া থাকা। বাল্টিক সাগরে—যেখানে যাইয়া করিডর শেষ হইয়াছে, ঠিক সেখানেই পোল্যাণ্ডের নূতন বন্দর গিনিয়া অবস্থিত। এই গিনিয়া হইল নব্য পোল্যাণ্ডের সুখ সমৃদ্ধির প্রতীক। করিডর হাত ছাড়া করিয়া পোল্যাণ্ড তাহার এই 'স্বপ্নপুরী'কে বিসর্জ্জন দিতে যাইবে—ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

মোটকথা হইল পোল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রনীতি অতি সুস্পষ্ট। মিষ্ট কথায় তাহাকে কেহ তুষ্ট করিতে পারিবেনা—ভানুমতির ভেল্কী দেখিয়াও সে ভুলিবেনা। তথাকথিত গণতান্ত্রিক বৃটেন ও ফ্রান্সের ভণ্ডামি সে ভালভাবেই বুঝিতে পারিয়াছে—তাহাদের আশ্বাসের চোরাবালিতে দাঁড়াইয়া নাই। অপরের সাহায্য পায় ভাল,—না পায় তো একাই সে লড়িতে সক্ষম। কর্ণেল বেক ভালভাবেই জানেন, যুদ্ধ বাধিলে বৃটেন ও ফ্রান্স তাহাকে কতটুকু সাহায্য করিতে পারে। এইজন্যই তাহাদের কথায় তিনি তেমন গা মাখেননা এবং মাখেননা বলিয়াই 'একাচোরা' বলিয়া তাঁহাকে কেহ কেহ টিটকারীও দেয়। যে যাহাই বলুক তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করেন না—তিনি আত্মশক্তিতে নির্ভর করিয়া পথ চলিয়াছেন। তাঁহার রাজনৈতিক জীবনে যে একটু দৌর্ব্বল্য আছে—তাহা হইলে সাম্যবাদভীতি; কিন্তু পোল্যাণ্ড বিপন্ন হইলে সেই দৌর্ব্বল্যটুকু কাটাইয়া তিনি যে, সাম্যবাদী সোভিয়েটের সহিত হাত মিলাইবেন না—একথা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না। কাজেই পোল্যাণ্ড লইয়া আর যে যাহাই বলাবলি করুক—হিটলার ভালভাবেই জানেন পোল্যাণ্ডের জমি কত শক্ত।

কাল-বৈশাখী

ক্ষিতীশ রায়

ওই কাল-বৈশাখীর প্রচণ্ড তাণ্ডবে
জীর্ণ জরা-অন্তকরা প্রলয় উৎসবে
মত্ত হল রুদ্র আজি ; ভৈরব আনন্দে
ডমরুর তালে বিদ্যুৎ-চকিত ছন্দে
চঞ্চল চরণ পাতে নৃত্য করি আজ
মথিয়া স্বরগ মর্ত ফিরে নটরাজ
প্রলয় উল্লাসভরে ঊর্ধে ফণা মেলি
জ্বালাময়ী নাগিনীরা করি উঠে কেলি
খসে যায় বেণীবন্ধ ; দূর নীলাম্বরে
ঘন-কৃষ্ণ জটাজাল স্রস্ত হয়ে পড়ে
দিগন্তের কোলে স্বপ্নসম, যায় মিশে
ধরিত্রীর শ্যামলিমা সাথে দিশে দিশে।
সহসা করিয়া ছিন্ন সে-জটবন্ধন
নামে গঙ্গা ধরণীর তপস্যার ধন।

গ্রন্থ-পরিচয়

Britain in Spain

By—The Unknown Diplomat : Hamish Hamilton p. 270, 3s. 6d.

রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস আলোচনা ক'রলে সর্বাগ্রেই দেখতে পাওয়া যায় যে রাষ্ট্রের ভাবধারা ঐতিহাসিক পরিবেশের নিরপেক্ষ নয়। যুগে যুগে রাষ্ট্রে ভাবধারার মোড় ফিরেছে পরিবেশের নির্দেশে। পরিবেশের প্রয়োজনের সঙ্গে ভাবধারার সঙ্গতি যতদিন বজায় থাকে তত দিন ভাবধারার অচঞ্চল প্রবাহ রাষ্ট্রের পুষ্টি সাধন করে। কিন্তু ইতিহাসের তাগিদে অসঙ্গতি • ভাঙ্গন ধরিয়ে দিয়ে নূতন সৃষ্টির পথ সুগম করে তোলে। এরিষ্টটলের গ্রীসে ছিল দাস প্রথা। দাস প্রথার স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে এরিষ্টটল বলেছেন এদের হিতের জন্যেই ঐ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্পাদিত হয় রাষ্ট্রবাসীদের সমভাবে সন্তুষ্টি বিধানে। অসম ব্যবস্থায়ই দাসদের অধিকতর সন্তুষ্টির সম্ভাবনা—এই ছিল সেকালের গ্রীস রাষ্ট্রমনীষির যুক্তি। ইতিহাসের অমোঘ বিধান এ ব্যবস্থার অশোভনত্ব দূর কোরেছে।

ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে এমনি আরও অসংখ্য দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। যে কোন ভাবধারার পশ্চাতে বিশ্লেষণ কোঁরলে দেখতে পাওয়া যাবে যে চিন্তা-নায়কের সামাজিক পরিবেশ তার দৃষ্টিভঙ্গীকে (Value Judgments) ব্যাহত কোরেছে। ক্লাসিকাল চিন্তানায়কদের অন্তঃসারশূন্য প্রাকৃত স্বাধীনতা (natural system of liberty পরিত্যক্ত হোয়ে আজ সমাজের অসমপর্যায় স্বীকৃত হোয়েছে এবং রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার (concept of political freedom) প্রকৃত অর্থ খুঁজে পাওয়া গেছে সমাজের বৈষম্যের দিকে চেয়ে। অর্থনৈতিক সাম্যের ভিত্তিতে যে স্বাধীনতা আসে, সেই স্বাধীনতাই প্রকৃত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা।

সমাজের বর্তমান বৈষম্য প্রকৃত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পরিপন্থী। সেই হেতু বর্তমান রাষ্ট্রগুলিতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা দুর্লভ। ধনোৎপাদন, ধনবণ্টন ও রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের ভার প্রতি দেশেই কতিপয় ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকে, অর্থাৎ যারা দেশ শাসনের ব্যবস্থা করেন তাদের উপর।

শাসক ও শাসিতের বিভেদ এই খানেই আরম্ভ। শ্রেণীসংঘাতের এই খানেই সূচনা, ঊনবিংশ শতাব্দীর বহুবিঘোষিত ডেমোক্রেসী আজ (capitalist democracy)তে রূপান্তরিত

হোয়েছে। পুঁজিবাদের স্বচ্ছল অবস্থায় সমাজের অসম ব্যবস্থাগুলি মাথা তুলে দাঁড়ায় নাই, কারণ ক্যাপিট্যালিজম অর্থ নৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য বিতরণ করতে পেরেছিল সমাজের সকল স্তরেই। কিন্তু ক্যাপিট্যালিজমের দুর্দিনে এ কৃপণতা ঘুচে গিয়ে স্বার্থ সংঘাতের কুৎসিত রূপ আড়াল থেকে বেড়িয়ে এসেছে। পৃথিবীময় আজ ডেমোক্রেসীর আব্রুগুলি খসে' পড়ছে, সাম্রাজ্যবাদের নগ্নতা প্রকাশ কোরে।

ব্রিটেনকে বলা হয় cardle of democracy—ডিমোক্রেসীর জন্মস্থান। ইতিহাসের আইন ব্রিটেনও অগ্রাহ্য কোরতে পারে নাই; সাম্রাজ্যবাদ সেখানে বহুদিন যাবৎ অধিষ্ঠিত, শ্রেণী-স্বার্থ সেখানে উদগ্র, ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি এ অবস্থায় কি হোতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। ব্রিটিশ শাসকসম্প্রদায় অন্যান্য ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শ্রেণী-স্বার্থের ইতিহাস রচনা কোরেছে, কিন্তু শ্রেণী-সংগ্রাম কোন রাষ্ট্রবিশেষে সীমাবদ্ধ নয়—এ সহজ কথাটুকু ব্রিটেন কবে বুঝবে?

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে স্পেনে ব্রিটিশ নীতির প্রহসন কি উদ্দেশ্যে দু'বছরের উপর নিঃসঙ্কোচে চলেছিল বহু তথ্য দিয়ে তা লোক সমাজের গোচরে আনবার চেষ্টা করা হোয়েছে। ব্রিটেনের স্পেনীয় নীতির গোড়ায়ও সেই শ্রেণীস্বার্থের ইতিহাস! বলশেভিক আতঙ্কের কবল থেকে স্পেন ও পূর্বভূমধ্যসাগরকে রক্ষা করার মিথ্যা অজুহাতে ফ্যাশিষ্ট শক্তিবর্গের সাহায্যে স্পেনে অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হয়। গ্রন্থকারের মতে এই 'rising' এর কারণ ছিল।

(1) The transformation of Spain into a base for military operations in the coming war.

(2) To paralyse the transport of French troops from Northern Africa to the motherland by commanding France's lines of mobilisation.

(3) To seize those raw materials which Spain possesses in abundance and which are particularly needed by the Fascist powers for their armaments.

ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের শাসকশ্রেণী স্পেনীয় যুদ্ধকে ঘরোয়া যুদ্ধের পর্যায়ে নিয়ে এ সমস্যাকে একটা 'খণ্ড' সমস্যা হিসাবে সমাধান করবার জন্য উদবাস্ত হয়ে উঠলো। স্পেনীয় যুদ্ধের ব্যাপ্তির দু'বছরই ব্রিটেনের প্রচেষ্টা এই একই উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়েছে। ব্রিটেনের ভয় ছিল যে স্পেনীয় সমাস্যার কোন 'স্থানীয়' সমাধান না দিলে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। সেই অনাগত দিনকে যত পিছিয়ে নেওয়া যায় ততই ব্রিটেনের শাসকশ্রেণীর মঙ্গল। এই স্বার্থ-বুদ্ধি প্রণোদিত হোয়ে ব্রিটেনের সমগ্র স্পেনীয় নীতি নির্ধারিত হোয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই 'non-intervention committee'র প্রহসন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলে এসেছে। গ্রন্থকার যুক্তি প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন 'Non-intervention'এর নামে যে সমস্ত ব্যবস্থা করা হোয়েছে

তার প্রত্যেকটা দ্বারাই গণতন্ত্রী (Republican) স্পেনের প্রতিকূলাচরণ করা হোয়েছে এবং যতবার Franco বাহিনীর নিশ্চিত পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, ততবারই 'Non-intervention'এর নামে 'active intervention'এর প্রচেষ্টা চলেছে এবং তার মূলে রয়েছে ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডল।

পার্লামেন্টের কম্যুনিষ্ট সভ্য Gallacherএর প্রশ্নের উত্তরে তৎকালীন পররাষ্ট্রসচিব Eden কি বলেছিলেন তা এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

Gallacher: Whether the recognition of Franco by Italy and Germany constituted an open and deliberate breach of non-intervention and whether the British Govt. proposed to meet this new aggression by their policy of doing nothing.

Eden: Certainly not! It is quite possible to pursue a policy of non-intervention in respect of the supply of arms, while recognising a Govt. on one side or another.

এটা non-intervention না intervention? Britainএর non-intervention-এর আড়ালে interventionএর কতকগুলি উদাহরণ উল্লেখযোগ্য :—

(১) ভূমধ্য সাগরে Baleane Islandকে নিরাপদ করবার জন্য Italyর সঙ্গে স্বতন্ত্র চুক্তি। ফলে Spainএর অন্যত্র ইটালীর অবাধ স্বেচ্ছাচারের সুযোগ।

(২) ফাসিষ্ট মিলিসিয়াগুলিকে 'volunteer' আখ্যা দিয়ে intervention স্বীকার কোরে নেওয়া।

(৩) Italy ও Germanyর 'volunteer' অপসারিত করতে রাজী হবার পূর্বেই ইংলণ্ডে ১৮৭০ সালের আইন-দ্বারা বৈদেশিক বাহিনীর জন্য সৈন্যসংগ্রহ বন্ধ করা।

(৪) 'Noh-intervention'এর আলোচনা বার বার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া সত্বেও গণতন্ত্রী স্পেনকে অস্ত্র-সংগ্রহের সুযোগ না দেওয়া। কিন্তু সেই অবকাশে Italy ও German সৈন্যের স্পেনে অবতরণ সম্পর্কে ঔদাসীন্য।

Chamberlainএর আকাঙ্ক্ষিত স্পেনের 'স্থানীয়' সমস্যার 'settlement' হোয়েছে—গণতন্ত্রী স্পেনের পরাজয়ে। ব্রিটেনের 'National Government'এর 'non-intervention' এর নামে 'intervention' সার্থক হোয়েছে। কিন্তু এই সমাধান কি বাস্তবিকই সমাধান না নূতন প্রশ্নের সূচনা?

Chamberlain উটপাখীর নীতি অবলম্বন কোরে স্পেনের বিখ্যাত প্রবচনটি ভুলে গেছেন —"When Spain moves, the world trembles." কিন্তু গ্রন্থকার তা ভোলেন নাই; তাই তিনি ভবিষ্যতের আশঙ্কা মনে নিয়ে বই শেষ ক'রেছেন এই ক'টি কথায়—"One shudders to contemplate the European situation and more particularly the predica-

ment of France and Britain, the day that a settlement similar to that of Czechoslovakia is imposed on Spain, and the Germans and Italians become the masters of Spain that day will mark the end of all security for the western powers. Their main lines of communication will henceforth be at the mercy of their enemies then the arrogance and the provocations of the aggressors will pass all limits. War will become a certitude because those who have interest in waging it will be in a position to declare it."

আর্থিকজগৎ—

ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প অর্থনীতিবিষয়ক সাপ্তাহিক।

সম্পাদক—যতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য

আমাদের জাতীয় জীবনে আজ বড় সমস্যা হল অর্থনৈতিক সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান না হলে কখনই রাষ্ট্র ও সমাজ জীবন সর্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেনা। এ প্রচেষ্টার প্রথম সোপান হল বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন ও জ্ঞানসমৃদ্ধ করে তোলা। 'আর্থিক জগৎ' আজ এক বছর যাবত এ মৌলিক কার্যসাধনে ব্রতী হয়েছে। এই বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যপূর্ণ সাপ্তাহিকের প্রথম বার্ষিকী আমরা পেয়েছি। কেন্দ্রিক সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের আয়-ব্যয়ের মূলনীতি, রেলপথসমূহের ইতিহাস ও বর্ত্তমান সমস্যা, বীমাব্যবসায় ও ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক, সমবায় আন্দোলনের বর্ত্তমান অবস্থা, ভারতীয় ও দেশবিদেশের শিল্প—এক কথায় অর্থনীতির যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে এ বার্ষিকীতে প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলি অধিকাংশই বিশেষজ্ঞদের লেখা। ভাষার প্রাঞ্জলতায়, যুক্তিসম্পদে ও বৈজ্ঞানিকভাবের তথ্যবিশ্লেষণে প্রবন্ধগুলি বিশেষ প্রশংসনীয় হয়েছে। আমরা আশা করি 'আর্থিকজগৎ' বর্ত্তমান মৌলিক সমস্যাগুলি দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করে তাদের চিন্তাধারাকে গভীরভাবে স্পর্শ, জাগ্রত ও আত্মস্থ করবে।

New Age—a monthly, edited by S. V. Ghate

May Annual, 1939, price 3 annas, Madras.

সমাজতন্ত্রীদের মুখপত্র 'New age' এর মে বার্ষিকী আমরা পেয়েছি। সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ ও কর্মপদ্ধতি নিরূপণ বর্ত্তমানযুগের বিশেষ ধর্ম্ম। সাম্যবাদের আদর্শকে পরিস্ফুটরূপ দিয়ে ভবিষ্যৎ সমাজে ইহার বাস্তব পরিণতি দেওয়াই 'New

Age'এর উদ্দেশ্য। এ মহৎ উদ্দেশ্যের আংশিক প্রতিফলন 'New Age'এর প্রতি সংখ্যায় দেখা যায়। 'মে' বার্ষিকীতে তার কোন ব্যতিক্রম হয় নেই। আমরা এ মাসিকটির বহুল প্রচার কামনা করি।

সুনীল দাস

বঙ্গদর্শন—

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ১ম খণ্ড পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ; দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত। নয় খণ্ডে সম্পূর্ণ। সেট্ ২৭ টাকা. প্রতিখণ্ড ৩৲ টাকা।

উনবিংশ শতক ও তার পরবর্তী যুগের বাঙালী জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে ধারণা করতে হোলে বাঙ্গলাদেশের সাময়িক পত্রিকাগুলির উপরে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। জাতীয় ইতিহাস সংগ্রহের পক্ষে ওগুলি সবচেয়ে বড় উপাদান। আমাদের জাতীয় জীবনের নিখুঁত ছবি, ভাঙ্গা ও গড়ার কাহিনী প্রকাশ পেয়েছে ঐ সব পত্রিকার মারফৎ। রামমোহন, বিদ্যাসাগর বঙ্কিমপ্রমুখ সংস্কারক ও সাহিত্যিকগণের ভাবধারা ও কর্মপদ্ধতির বিবরণের পরিচয় মেলে সাময়িক পত্রিকার পাতায় পাতায়, আজও তার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। যে সকল প্রতিভার বৈচিত্র্য ও বহুমুখীনতায় আমাদের জাতীয় জীবনে ও সাহিত্য জগতে যুগান্তর এসেছে তারা সকলেই আপনাদের প্রকাশ করেছেন সাময়িক পত্রিকার সাহায্যে সুতরাং সাময়িক পত্রিকার দান অমূল্য ও অপরিশোধনীয়।

সাময়িক পত্রিকা সম্বন্ধীয় আলোচনায় বঙ্গদর্শনের প্রসঙ্গ সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বিশদ আলোচনার স্থান এ নয়, সংক্ষেপে আমরা বঙ্গদর্শনের প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কয়েকটী কথা উত্থাপন করবো মাত্র। বঙ্গদর্শন বাঙ্গালীর জীবন ও সাহিত্যের ইতিহাস। ১৯ শতকে—পশ্চিমী শিক্ষাদীক্ষা ও ভাবধারা এবং তার ঘাতপ্রতিঘাতে যে নবতর বঙ্গদেশসৃষ্টির সূচনা, তার সমগ্র ইতিহাস পাওয়া যায় বঙ্গদর্শনে। আমাদের বাঙালী জাতির সমগ্র ইতিহাস আজও রচিত হয় নাই বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে, তার উপাদান বঙ্গদর্শনের ভিতরে একত্রীভূত হয়ে আছে। সাহিত্যের দর্পনে ধরা পড়েছে সমাজের গতি ও বিকাশ। ইতিহাস দিয়েছে তার ব্যাখ্যা। এদিক দিয়ে বঙ্গদর্শনকে সাহিত্য—ইতিহাস (একাধারে সাহিত্য ও ইতিহাস) বলা যেতে পারে। উনবিংশশতাব্দী ও তার পরবর্ত্তী যুগের ভাবধারা কি ভাবে বাঙ্গালী জাতির মর্মদ্বার খুলে দিয়ে ইহাকে নানাভাবে রূপায়িত ও রসায়িত করে তুলল বঙ্গদর্শন তাহারই নিদর্শন। বঙ্গদর্শনের পূর্ববর্তী সাহিত্যের সহিত তার পরবর্ত্তী সাহিত্যের তুলনা করলে যে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় তাতেই বঙ্গদর্শনের নিকট আমরা কতখানি ঋণী তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বঙ্গদর্শনের সাহায্যে নতুনযুগের সাহিত্য ও সমাজ গড়ে উঠলো। ইহার ভিতর দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গ-সাহিত্যও

সমাজকে আধুনিকতায় দীক্ষা দিয়েছেন। গার্হস্থ্য, সামাজিক, ঐতিহাসিক ও কল্পনা-প্রসূত উপন্যাস রাজির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তাহা সাধিত হয়েছে; বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাপ্রদীপ্ত তেজোগর্ভ লেখনীর অগ্নিবাণীতে জাতি বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য্য ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার পথে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। বঙ্গদর্শন-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি 'বঙ্কিম-প্রতিভায়' যা প্রকাশ কোরেছে তা স্মরণযোগ্য। "বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন। আমাদের হৃদপদ্ম সেই প্রথম বিকশিত হইল।" এ শুধু ভাবোচ্ছাস নয়, কবি হৃদয়ের আবেগ-উদ্বেলিত স্তুতি-বন্দনা নয় বঙ্গদর্শন. বাস্তবিকই সে সূর্য্যোদয়ের আলোক সম্পাতে উজ্জ্বল। আষাঢ়ের জলভারাবনত মেঘের মত বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশের সমস্তপরিমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে বর্ষণে বর্ষণে উষর ভূমিকে সিক্ত করে তোলেন। সে ধারাপথেই উন্মুক্ত হয় বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের অবরুদ্ধ গতিবেগ। বঙ্গদর্শনে বিধৃত হয়েছে সেই গতিবেগ।

বঙ্গদর্শন বঙ্কিমমনীষার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচায়ক, তাঁর বহুমুখী প্রতিভা উপলব্ধির বিশেষ উপাদান। কবি, সমাজসংস্কারক, ঔপন্যাসিক, সমালোচক ও বন্দেমাতরম মন্ত্রের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের বিরাট স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে বঙ্গদর্শনে। বঙ্কিমচন্দ্রের অব্যবহিত যুগ পরিবর্তনের যুগ। যুগান্তকারী বিপ্লবের যুগ, সুতরাং সে বিপ্লবের মুখে পড়ে বঙ্কিম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ও আলোচনা অপূর্ণ রয়ে গেলো; কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে বঙ্কিমের স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে বঙ্গদর্শনের মূল্য নিরূপিত হবে। আরো বলা চলে বঙ্গদর্শনের ভিতরে শুধু যে স্রষ্টা বঙ্কিমের পরিচয় পাওয়া যাবে তা নয় তারই হাতে গড়া সেকালের সকল বিখ্যাত লেখক ও মনীষিদের মনের সহিত পরিচয় পাবার অব্যর্থ সুযোগ। সুতরাং বঙ্গদর্শনের পুন প্রকাশ কার্যে ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানীর প্রকাশকগণ যে আদর্শকে সম্মুখে রেখেছেন তাহা সর্বান্তকরণেই সমর্থনযোগ্য ও প্রশংসনীয়। আমরা এই অবিস্মরণীয়, অবলুপ্তপ্রায় অতুলনীয় সাহিত্য অবদানের বহুল প্রচার কামনা করি। প্রকাশকগণ স্বল্পমূল্যে সুন্দর বাঁধাই ও প্রচ্ছদ পটের জন্য জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন নিঃসন্দেহ।

বীণাপাণি রায়
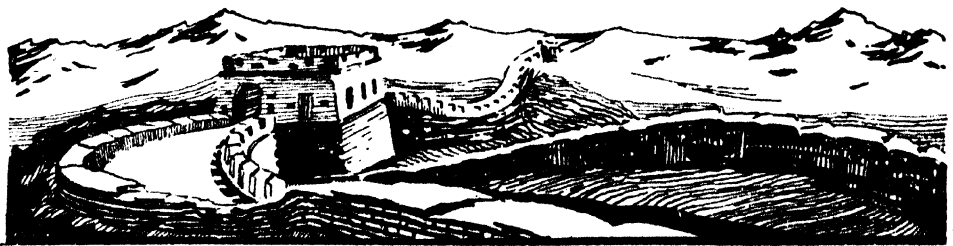
সম্পাদকীয়

সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ

২৯শে জানুয়ারী হ'তে ৩০শে এপ্রিল ভারতীয় জাতীর মহাসভার ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। ২৯শে জানুয়ারী তারিখে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রসার রূঢ়ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচনে। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের এই অভ্যুদয় ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনায় প্রগতিপন্থী দলগুলিকে জাতীয় সংহতি দৃঢ় কোরতে বদ্ধপরিকর কোরে তুলেছিল। গণতন্ত্রের অভিযানে বিহ্বল একনায়কত্ব লুপ্তগৌরব উদ্ধার কোরতে প্রয়াসী হোয়ে গ্রানিকর পন্থ-প্রস্তাবের আশ্রয় গ্রহণ কোরেছিল—সে-বিষয়ে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। দক্ষিণ-উপদলের একতান্ত্রিক মনোবৃত্তি পন্থ-প্রস্তাবে তৃপ্ত হোতে পারে নাই। জাতীয় সঙ্কটের দিনে ঘরোয়া দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে উন্মুক্ত হয় নাই, জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠিত কোরে দেশপ্রীতির পরিচয় দেয় নাই। উপদলের লাঞ্ছিত অভিমানের কাছে এ সবকিছুই ছিল তুচ্ছ। ভারতের একমাত্র নেতা উপদলের নেতার আসন নিয়ে রাষ্ট্রপতির সহিত দর কষাকষি সুরু কোরলেন। ত্রিপুরীর পরে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যে অনিশ্চয়তা ও দ্বন্দ্ব দেখা দিতেছিল তার অবসান ঘটাবার দায়িত্ব সুভাষচন্দ্রের; কারণ, সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ উপদলের বিরোধিতা ক'রে নির্বাচিত হোয়েছিলেন। জাতীয় সংহতি রক্ষা ক'রবার দায়িত্ব সুভাষচন্দ্রের; কারণ, সুভাষচন্দ্রের বহুদিনপ্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব উপেক্ষা কোরবার স্পর্ধা হোয়েছিল। সঙ্কটের সমাধানের জন্যে গান্ধীজী তাই সুভাষচন্দ্রের নিকট চরমমূল্য দাবী কোরলেন—ওয়ার্কিং কমিটিতে একমতের প্রতিনিধিত্ব Homogenous representation) থাকবে। সুভাষচন্দ্রের যুক্তি, অনুরোধ সবকিছু ব্যর্থ হোয়ে গেল। গান্ধীজী তাঁর দাবীতে অবিচলিত রইলেন। আসন্ন সংগ্রাম, জাতীয় সংহতি সবকিছু অকিঞ্চিৎকর হোয়ে গান্ধীজীর কাছে অমূল্য হোয়ে উঠলো—একমতের প্রতিনিধিত্ব। গান্ধীজী পূর্বেই জানেন শুধু বামপন্থীদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা সুভাসচন্দ্রের পক্ষে অসম্ভব। তাঁর দাবী অনুসারে শুধু দক্ষিণ-পন্থীদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করাও তেমনি অসম্ভব। বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ কোরলেন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ক্ষণস্থায়ী গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হোয়ে সঙ্কটের সমাধান হোল।

জওহরলালজীর প্রস্তাব

নামে মাত্র সর্বমতের প্রতিনিধিত্ব—সুভাষচন্দ্রের এই সর্বনিম্ন দাবী অস্বীকৃত হোল। গান্ধীজীর মতে এ ব্যবস্থা কল্যাণের নয়। কারণ, সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দক্ষিণপন্থীদের নীতিগত পার্থক্য

আছে। জওহরলালজী কিন্তু, এরকম পার্থক্য খুঁজে পান নি। জওহরলালজী সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগ প্রত্যাহার ও পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটি নিয়োগ ক'রতে অনুরোধ করে প্রস্তাব উপস্থিত করলেন; মুখেও বললেন, কিছুকাল পরে পুরাতন কমিটির দুইজন সভ্য অবসর গ্রহণ করলে, সুভাষচন্দ্র নূতনপন্থী নিয়োগ করবার সুযোগ পাবেন। এ-প্রস্তাবে দক্ষিণপন্থীদের সায় ছিল কারণ সরাসরি বিভিন্নমতের প্রতিনিধি গ্রহণ যেমন মূলনীতি বিরুদ্ধ হয় ইহা তেমন হয় না; কাজেই সত্যনিষ্ঠ দক্ষিণপন্থীদের আপত্তি হয় নি। এ প্রস্তাবে সরাসরি পুরাতন কমিটি নিয়োগের যে অনুরোধ রয়েছে তার মধ্যে, মূলনীতিগত প্রভেদ আছে একথা কারও অগোচর নাই। জওহরলালজীর সতর্ক উচ্চারণ সত্ত্বেও বলতে হবে ঐক্যের এই সূত্রেও ঐক্য অপেক্ষা হৃতগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাই প্রস্তাবটিকে দক্ষিণপন্থীদের সমর্থনীয় করেছিল। নীতিনিষ্ঠার চেয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবল প্রয়াস সংহতির অন্তরায় হোয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সভাপতি নির্বাচন

অসংযত বিক্ষোভের মাঝে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ নূতন সভাপতি নির্বাচিত হন। সভানেত্রী শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডুর আচরণ অসংযমের ইন্ধন দিয়েছিল। বৈধতার প্রশ্ন তুলে সভার কার্যে আপত্তি কেউ কেউ জানিয়েছিলেন, কিম্বা জানাতে চেয়েছিলেন. কিন্তু সভানেত্রী জোর গলায় বলেছিলেন 'in the interest of the congress I shall be unconstitutional'—কংগ্রেসের স্বার্থের দিকে চেয়ে আমি অবৈধভাবে সভার কার্য সম্পাদন করব'। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির সভানেত্রীর এই উক্তি একতন্ত্রের প্রতিধ্বনি। সুভাষচন্দ্রের পরিত্যক্ত আসনে যে কোন দক্ষিণপন্থীকে আসীন করবার অশোভন তৎপরতা অস্থায়ী সভানেত্রীর প্রতিটি কার্যেও বাক্যে পরিস্ফুট ছিল।

নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটির বার জন ও বাঙ্গলাদেশের দুইজন নূতন প্রতিনিধি—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ইঁহাদের নিয়ে নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করেছেন। সুভাষচন্দ্র, পণ্ডিত জওহরলাল ও শরৎচন্দ্র ওয়ার্কিং কমিটিতে যোগ দেন নাই। পণ্ডিত জওহরলালের নূতন ওয়ার্কিং কমিটিতে যোগদান কোরতে অসম্মতি, নূতন ওয়ার্কিং কমিটিকে আরম্ভেই পক্ষাঘাত দুষ্ট কোরেছে। জাতীয় সংগ্রাম প্রতিদিন যে নূতন নূতন শক্তি সংযোগে দুর্দম গতিতে কংগ্রেসকে বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত ক'রছিল, নূতন কমিটির গঠনে সে সব শক্তির কোন স্থান নেই; বরং কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্ব এই গতি প্রতিরোধ করবে, নূতন কমিটি যেন তারই পরিচয় দিচ্ছে।

গান্ধীজীর জয়ে বিলাতী সংবাদপত্র

বিলাতে এবং আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদী সংবাদপত্রগুলি রাষ্ট্রীয় সমিতির কলিকাতা

অধিবেশনে গান্ধীজীর জয়ে পুলকিত হোয়ে উঠেছে, সাম্রাজ্যবাদী সংবাদপত্রগুলির পুলক অহেতুক নয়। গান্ধীজীর আশ্রয়তলে দক্ষিণপন্থীদের জয়ের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের সহজসম্বন্ধ খুঁজে পাওয়াতেই এত সোৎসাহ উল্লাস। 'ডেলী টেলিগ্রাফ' লিখেছে 'মিঃ গান্ধী ও বোসএর মধ্যে তফাৎ এই বোস এখনই ব্রিটনের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন কোরতে প্রস্তুত কিন্তু যুদ্ধ আসন্ন হোলে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সঙ্গে কংগ্রেসের যে চুক্তির সুযোগ উপস্থিত হবে মিঃ গান্ধী ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সে সম্বন্ধে সচেতন।" এমন কি ম্যানচেষ্টার গাডিয়েন পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। 'ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানের' মতে "শীঘ্রই কংগ্রেসের ব্রিটেন, ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও মুসলিমদের সহিত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আরম্ভ ক'রতে হবে। এই আলোচনায় মিঃ গান্ধী মিঃ বোস হ'তে উপযুক্ত।" বিলাতী সংবাদপত্রের চোখে গান্ধীজী 'রিফর-মিষ্টের' আখ্যা পেয়েছেন আর সুভাষচন্দ্র অসহনীয় হোয়ে উঠিছিলেন তাঁর সংগ্রামশীল মনোবৃত্তির জন্য। এই আপোষ-রফার মনোভাবের সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষে আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি কোরতে পারবে এই আশায়ই বিলাতী কাগজগুলি উৎফুল্ল হোয়ে উঠেছে।

কংগ্রেসের শুদ্ধি প্রস্তাব

এক বৎসরের অধিকাল গান্ধীজী কংগ্রেসে দুর্নীতি সম্বন্ধে 'হরিজনে' প্রবন্ধ লিখে আসছেন। ত্রিপুরীতে গান্ধীজীর বাণী ছিল কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দূর করা। গান্ধীজী তাঁর বিখ্যাত 'কংগ্রেসে হিংসা প্রবেশ করিতেছে' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন হয় যাঁরা স্বরাজলাভে সত্য ও অহিংসা নীতিতে অনাস্থাশীল কংগ্রেস থেকে বিদূরিত হবেন, না হয় যাঁরা সত্য ও অহিংসাতে বিশ্বাস করেন তাঁরা কংগ্রেস পরিত্যাগ করবেন।

কংগ্রেসে দুর্নীতি আছে সন্দেহ নাই। ভুয়া সদস্য নিবাচন কালে একের পরিবর্তে অন্যের ভোট দেওয়া ইত্যাদি বহু প্রকারের দুর্নীতির কথা আমরা জানি। যে কোন প্রতিষ্ঠানের কার্য্য-কলাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুবর্তিতায় শৈথিল্য দেখা দেয়। স্থানবিশেষের শৈথিল্যকে উপলক্ষ্য করে সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে প্রচার করা যেমন অসঙ্গত, তেমনি অসঙ্গত সামান্য সামান্য দুর্নীতিগুলিকে উপেক্ষা করা।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে কংগ্রেস জনসাধারণের, চাষী, মজুরের প্রতিষ্ঠান হোয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃত্ব গণ-জাগরণ ও গণ-আন্দোলনকে প্রীতির চোখে অনেক স্থানেই দেখেন নাই, বিহারের কিষাণ-আন্দোলন কিংবা বোম্বাইয়ের মজদুর আন্দোলন কংগ্রেস নেতৃত্বের আশীর্বাণী লাভ করে নাই। সমাজতান্ত্রিক কিংবা সাম্যবাদী মনোবৃত্তি ও হিংসা অনেক কংগ্রেস-কাণ্ডারীর নিকট সমানার্থক—এ পরিচয় আমরা বহু বার পেয়েছি।

কলিকাতার রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে দক্ষিণপন্থীর জয় হোয়েছে, একমতবাদের (Homo-

genity) আতিশয্য ও ভেদঅসহিষ্ণুতা দিন ২ প্রকাশ পেতেছে। আচার্য শঙ্কর রাও দেওর শুদ্ধি-প্রস্তাব আগামী জুনে রাষ্ট্রীয় সমিতির বৈঠকে আলোচিত হবে। এতে জাতীয় আন্দোলনের গতি ব্যহত হবে। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বিভিন্ন মতবাদের স্থান হবে না। ফলে একমতবাদের একাধিপত্য অটল হোয়ে থাকবে। দুর্নীতি দূর কোরতে হবে অন্য পথে—কংগ্রেসের অঙ্গচ্ছেদ কোরে নয়। প্রাথমিক সভ্যদের কর্তব্য ও দাবী সম্বন্ধে সচেতন কোরে তুলতে পারলে কংগ্রেসে অনেক দুর্নীতির বাসা ভেঙ্গে পড়বে।

কংগ্রেস ও আগামী যুদ্ধ

বিগত চার বছর যাবৎ কংগ্রেস যুদ্ধ-বিরোধী প্রস্তাব গ্রহণ কোরে আসছে। লক্ষ্ণৌ, কানপুর, হরিপুরা ও ত্রিপুরী প্রত্যেক কংগ্রেসই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারতকে লিপ্ত করার চেষ্টার বিরুদ্ধে। কংগ্রেসকে সেদিকে চালাবার সদিচ্ছা আজ পর্যন্ত কার্যকরী করা হয় নাই। বর্তমান ইউরোপীয় পরিস্থিতিতে যুদ্ধ প্রত্যাসন্ন। কংগ্রেসের কর্তব্য, কাল বিলম্ব না কোরে দেশে যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ করা।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কলিকাতার অধিবেশনে পণ্ডিত জওহরলাল তাঁর প্রস্তাবে বলেছেন, 'ভারতবাসীদের সম্মতি ব্যতীত ভারতের উপর কোন যুদ্ধ চাপিয়ে দেবার চেষ্টা কংগ্রেস প্রতিরোধ করবে। ভারতবাসীদের সম্মতি ব্যতীত এই দ্ব্যর্থক উক্তিতে জটিলতা সৃষ্টি হ'বার সম্ভাবনা। যুদ্ধ যদি বাধে ভারতবর্ষের সম্মতির অপেক্ষায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট থাকবে না। কোন্ যুদ্ধে ভারতবর্ষ সম্মতি দেবে? বৃটেনের পক্ষ অবলম্বন কোরে ফ্যাশিষ্ট গভর্ণমেণ্ট বা অন্য কোন গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ভারতের অস্ত্রধারণ করা সম্ভব হবে না। স্বাধীন ভারত ডেমোক্রেসীর জন্য ফ্যাশিসমে প্রতিরোধ করতে পারে, কিন্তু পরাধীন ভারত সাম্রাজ্যবাদের সহায়তা করে অধীনতার নাগপাশ দৃঢ় করতে পারে না। কাজেই, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন ক্ষেত্রেই ভারতের যুদ্ধ করা সম্ভব নয়।

ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে লিপ্ত করবার চেষ্টা আরম্ভ হোয়ে গেছে। ভারতশাসন আইনের সংশোধন ও এডেনে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ তার সাক্ষ্য দেয়। ভারতশাসন আইন সংশোধন সঙ্কটের সময় কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দিয়ে প্রাদেশিক শাসনকে প্রহসনের পরিণত করবার ব্যবস্থা করেছে। জওহরলালজী প্রস্তাবে বলেছেন এই সংশোধন চালু করবার চেষ্টা ব্যর্থ করতে হবে। কিন্তু তাঁর নির্দেশ মোটেই স্পষ্ট নয়—'will be resisted in every wars open to the congress'—কংগ্রেস সর্বপ্রকারে প্রতিরোধ করবে; কি বিশেষ উপায়ে এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হবে সে বিষয়ে পণ্ডিতজী নীরব।

• কংগ্রেসের এই নীরবতা এবং সুভাষ বাবুর পদত্যাগে আপোষ-রফার পথ উন্মুক্ত থাকাতে বিলাতী সংবাদপত্রগুলির উল্লাস। যুদ্ধে যোগ দেওয়া 'ভারতবাসীদের সম্মতি সাপেক্ষ' এই দ্ব্যর্থক উক্তি—কংগ্রেসের সরকারী প্রস্তাবের সহিত সঙ্গতিবিহীন। কংগ্রেস নেতৃত্বে আন্দোলন সুরু কোরে এই অসঙ্গতি দূর করবার সময় এসেছে। এবিষয়ে বামপন্থীদের দায়িত্বই অধিক।

গান্ধীজী ও যুদ্ধ

কিছুদিন পূর্বে 'হরিজনে' যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে মহাত্মাজী লিখেছিলেন "আসন্ন পরীক্ষায় শান্তিবাদীদের যুদ্ধ বর্জন কোরে শক্তির পরিচয় দিতে হবে। কিন্তু যাঁরা অহিংসাকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন তারাই যুদ্ধ প্রতিরোধ করবেন। প্রতিরোধকারী ঐশী আহ্বানের পরিচালনায় তার কর্তব্য স্থির করবেন......"।

গান্ধীজীর যুদ্ধ প্রতিরোধের পূর্বোক্ত অভিমত কংগ্রেসের সুস্পষ্ট মতামতের বিরোধী। এ বিষয়ে কংগ্রেসের নীতি হোল "mass resistance by the entire people under the leadership of the congress"—কংগ্রেসের নেতৃত্বে গণ-সংগ্রাম। কিন্তু গান্ধীজী বলেছেন ঠিক এর বিপরীত কথা। "such resistance is a matter for each person to decide under the guidance of the inner voice".—প্রতিরোধ হ'বে ব্যক্তিগত, ঐশী আহ্বানের নির্দেশে। গান্ধীজী এব্যাপারে কংগ্রেসের কর্মনীতি সম্পূর্ণ বদলে দিতে চান। কংগ্রেস নির্দেশ দিয়েছে প্রতিরোধ হবে সমষ্টিগত. গান্ধীজী চান ব্যক্তিগত। কংগ্রেস নির্দেশ দিয়েছে, সমস্ত জাতির প্রতিরোধ, গান্ধীজী চান যারা অহিংসায় বিশ্বাসী শুধু তারাই প্রতিরোধ করবেন। কংগ্রেস নির্দেশ দিয়েছে আন্দোলন হ'বে কংগ্রেসের নেতৃত্বে, গান্ধীজী চান ব্যক্তি পরিচালিত হবে ঐশী শক্তির আহ্বানে।

যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন রাজনৈতিক সংগ্রামের পর্যায় থেকে নৈতিক পর্যায়ে নেমে এসে জাতীয় সংগ্রামের অনিষ্ট সাধন ক'রবে, যদি গান্ধীজীর এই নীতি অবলম্বন করা হয়।

রাজকোটের 'অমূল্য রসায়নাগার'—

কাথিয়াবারের ক্ষুদ্ররাজ্য রাজকোট বিগত ছয় সাত মাস যাবৎ ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরে আছে। স্বৈরাচার ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে এই ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রসিদ্ধি স্বৈরাচারের অনেক প্রখ্যাত লীলাভূমিকেই হার মানিয়েছে। বিগত তিন মাস যাবৎ গান্ধীজীর অবিশ্রান্ত চেষ্টা, আমরণ উপবাস, সার্বভৌম শক্তির হস্তক্ষেপ, ফিডারেল কোর্টের চীফ জাষ্টিস স্যার মরিস গায়ারের রায়—সবকিছুকেই তুচ্ছজ্ঞান কোরে ঠাকুর সাহেবের স্বৈরাচার অবাধগতিতে চলেছে। আমরা গত কয়েক মাসে এ বিষয় আলোচনা করেছি।

রাজকোট স্বৈরাচারের অবাধক্ষেত্র, ভারতের অন্যান্য ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ দেশীয় রাজ্যে অনুরূপ

স্বৈরাচার চলেছে। গান্ধীজীর ভাষায় রাজকোট—'weakest link', কিন্তু সামন্ততন্ত্রের সর্বাপেক্ষা দুর্বল আবাসটি মহাত্মাকে হার মানিয়াছে—"আমি পরাজিত হয়েছি..............রাজকোট আমার যৌবন অপহরণ করেছে"।

রাজকোটের কৌশলী বীরওয়ালা সাম্রাজ্যবাদের আমোঘ অস্ত্র ভেদনীতির নিপুণ প্রয়োগে গান্ধীজীর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে। বীরওয়ালা জানে যে সংগ্রাম যতদিন পর্যন্ত ঠাকুরসাহেব ও প্রজাদের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে সামন্ততন্ত্রের লোপ তত শীঘ্র সম্পন্ন হবে। কিন্তু, যদি স্বার্থের সন্ধান দিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি করা যায় সামন্ততন্ত্র নিরাপদে থাকবে। ভায়াত, মুসলিম, অনুন্নত সম্প্রদায় প্রত্যেকেই শাসন সংস্কার কমিটিতে স্থান পাবার দাবী গান্ধীজীকে বিফল মনোরথ ক'রল, বীরওয়ালার জয় হোল।

গান্ধীজী দেশীয় রাজ্যে সংগ্রাম বন্ধ করে দিয়েছেন, কাথিয়াবারে সংগ্রাম বন্ধ করে দিয়েছেন, রাজকোটের আন্দোলন স্থগিত রেখেছেন। ফলে প্রতিক্রিয়াশক্তি রাজকোটের সংগ্রাম নিষ্ফল কোরবার অবিচ্ছিন্ন সুযোগ পেয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদের উপস্বত্বভোগীদের স্বার্থহরণ করবার মূল্য গান্ধীজীকে রাজকোটে দিতে হচ্ছে। সংগ্রামের মীমাংসা কখনই আইনের দরবার মিলে না। সাম্প্রদায়িক দাবীর কাছে আত্মসমর্পণ কোরে সমস্যার মীমাংসা হয় না, বৃটিশ ভারতে অসংখ্যবার তা প্রমাণিত হোয়েছে। দেশীয় রাজ্যেও এই প্রকার আত্মসমর্পণে সাম্প্রদায়িকতা সংগ্রাম পঙ্গু করে ফেলবে। বীরওয়ালা এবিষয়ে কতকটা কৃতকার্য্য হয়েছে।

গান্ধীজী রাজকোটের কর্ম্মীদের বীরওয়ালা ও ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও দ্বন্দ্ব মীমাংসা ক'রতে পরামর্শ দিয়ে সমগ্র দেশে বিহ্বলতার সৃষ্টি করেছিলেন। গান্ধজীর এই অদ্ভুত স্বীকৃতি বীরওয়ালা ও তার প্রতিক্রিয়াশীল অনুচরদের শক্তিশালী কোরে তুলেছে।

রাজকোট এখনও গান্ধীজীর 'অমূল্য রসায়নাগার'। এই রসায়নাগারে একটিমাত্র রাসায়নিক শক্তি অভীপ্সা সিদ্ধি ক'রতে পারে—সেটা হচ্ছে উদ্বুদ্ধ গণশক্তি। গান্ধীজী এই রসায়নের ব্যবহার কবে ক'রবেন?

বোস-গান্ধীরপত্রাবলী

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর নিখিলভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি সংগঠন উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র এবং মহাত্মাজীর মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ চিঠির আদানপ্রদান হয়। মহাত্মাজীর অনুমতি অনুসারে সুভাষচন্দ্র এগুলি জনসাধারণের গোচরার্থে প্রকাশ করেছেন। এ সকল পত্র বিনিময় আরম্ভ হয় ২৪শে মার্চ জামডোবা হতে সুভাষচন্দ্রের মহাত্মার নিকট টেলিগ্রামে এবং শেষ হয়েছে ৫ই মে তারিখে বৃন্দাবন হতে গান্ধীজী পত্রগুলি প্রকাশানুমোদন করে যে তার করেছেন সুভাষচন্দ্রকে। এ সময়ের ভিতর সুভাষ গান্ধীর মধ্যে ৩৪ খানা টেলিগ্রাম ও ১৩টি পত্র বিনিময় হয়।

চিঠিগুলি পড়ে বেশ বঝা যায় কংগ্রেসের ভিতর মৌলিক মতবিভেদ আছে। এ বিভেদ বহুদিনের কিন্তু স্পষ্টতর ও ঘনীভূত হয়ে উঠেছে সুভাষবাবু রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলে এবং ওয়ার্কিং কমিটি সংগঠনের প্রশ্নে। সুভাষবাবু যদিও বলেন কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্মপন্থায় মতগত কোন মৌলিক বিভেদ নেই, বিশেষ অবস্থায় যদিও জওহরলাল দক্ষিণ ও বামপন্থী বলে কংগ্রেসে কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার না করে আত্মপ্রতারণা করেন কিন্তু গান্ধীজীর মতে সে বিভিন্নতা অত্যন্ত মৌলিক ও দুর্লঙ্ঘ্য। "The gulf is too wide......I see no way of closing ranks. The only way seems to me to recognise the differences." এজন্যই ওয়ার্কিং কমিটি গঠনকার্যে মহাত্মাজীর কোন সাহায্য সুভাষবাবু পান নেই : যদিও তিনি জাতির বৃহত্তর সংহতি ও স্বার্থের নিকট আত্মবিলোপ করতে প্রস্তুত ছিলেন। এ মতানৈক্য স্বীকার করে সুভাষচন্দ্রকে রাষ্ট্রপতির পদে প্রতিষ্ঠিত করা 'দেশের পক্ষে ক্ষতিকর' (harmful to the interests of the country) না হলেও গান্ধী এবং গান্ধীপন্থীদের নিকট যে ক্ষতিকর হবে তাহা নিঃসন্দেহ।

সুভাষবাবুর নির্বাচন গান্ধীবাদের পরাজয়। এজন্য নির্বাচন দ্বন্দ্বে পট্টভির পরাজয় গান্ধী স্বীকার করে নিলেন 'আমার পরাজয়' (my own defeat), এ পরাজয় এত গভীর ও মর্মদায়ক যে কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের আশঙ্কা ও গান্ধীজীকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে নি। সত্য ও সাধুতার অভাব না হলে আমি অন্তর্দ্বন্দ্বের ভয় করি না' (given truth and honesty I am not afraid of civil-war.)

আদর্শের সাজাত্য ও সাদৃশ্য না থাকলে দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতা কর্মপদ্ধতিতে সঙ্ঘাত আনবে, অনিবার্য। তাই সুভাষবাবুর মতে 'ত্রিশ বছর পূর্বের তুলনায় দেশে হিংসা বাড়ে নেই' ; কিন্তু গান্ধীজী বলছেন দেশের আকাশ বাতাস হিংসায় পরিপূর্ণ 'I smell violence in the air I breathe'। কংগ্রেস ও দুর্নীতিদুষ্ট। কাজেই গান্ধীজীর মতে এ দুর্নীতি ও হিংসার পরিমণ্ডলে কোন অহিংস গণ-আন্দোলন সম্ভব নয়। পিছনে গণশক্তি না রেখে চরম পত্র দেওয়া নিরর্থক আত্মপচয় (an ultimatum without an effective sanction is worse than useless) কিন্তু এখানে প্রশ্ন আসে অহিংসার অভাব না নিয়মতান্ত্রিকতার অনুরাগ গান্ধীজীকে বিপ্লবাত্মক গণ-আন্দোলন হতে দূরে রেখেছে।

সুভাষবাবুর মতে বর্তমান আন্তর্জাতিক সঙ্কটে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের নিকট চরমপত্র দিয়ে জাতীয় দাবী উপস্থিত করবার সন্ধিক্ষণ এসেছে এবং সমগ্র জাতিকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে তোলা গান্ধী নেতৃত্বের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু গান্ধীজীর দৃঢ় বিশ্বাস কংগ্রেস আজ প্রয়োজনানুরূপ ত্যাগ স্বীকারে অক্ষম : কোন কার্যকরী নিরুপদ্রব প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা কংগ্রেসের নেই। "I have firm belief that the Congress, as it is to-day, can not deliver the goods. cannot offer Civil Disobedience worth the name."

কংগ্রেসের যদি সে ক্ষমতা না থাকে তবে সেজন্য দায়ী কে ? গান্ধীজী ও দক্ষিণপন্থীরা আজ

বহুকাল কংগ্রেস নেতৃত্ব করে আসছেন। তাদের নেতৃত্বে যদি কংগ্রেসে দুর্নীতি, সংগ্রামবিমুখতা ও আত্মত্যাগের অভাব এসে থাকে তবে পুরাতন 'সমরনায়ক' (old guards) দের দৃষ্টান্তের ফলে। অসহযোগ আন্দোলনের অধিনায়ক যে গান্ধী একদিন প্রচলিত গভর্ণমেণ্টের হয় সংস্কার না হয় ধ্বংসের সঙ্কল্প নিয়ে কংগ্রেসের বাইরে এসেও গণঅভিযান সুরু করলেন এবং ব্যর্থপ্রয়াসে ডাণ্ডীর সমুদ্রে আত্মবিসর্জনেও পরাঙ্মুখ ছিলেন না ; তিনিই আজ বলছেন 'আমি বৃদ্ধ, এজন্য বোধ হয় দিন দিন ভীরু ও অতিসতর্ক হয়ে যাচ্ছি, ('I am an old man, perhaps growing timid and over-cautious'। কাজেই গান্ধীজীর অনুচর বর্গের ভিতর সংগ্রাম বিমুখতা ও আত্মত্যাগের অভাব আসবে তাতে আর বিচিত্র কি ? 'কংগ্রেস এখনও প্রস্তুত নয়, ইহা বলার পিছনে দক্ষিণপন্থীদের দ্বিধা, দুর্বলতা ও চিত্তদৈন্য কতখানি আছে তা ভেবে দেখবার বিষয়।

'ফরওয়ার্ড ব্লক'—

সুভাষচন্দ্রের নির্বাচনের পর থেকে তাঁর পদত্যাগ পর্যন্ত ঘটনাপরম্পরা আলোচনা কোরলে সর্বাগ্রে চোখে পড়বে বিক্ষিপ্ত ও বিধ্বস্ত বামশক্তির শোচনীয় অপচয়। সুভাষচন্দ্রের নির্বাচন সর্বাংশে না হোলেও অনেকাংশে বামপন্থীর জয় ঘোষণা করেছিল, কিন্তু সংহতির অভাবে সুসংবদ্ধ দক্ষিণপন্থীরা কংগ্রেসের নেতৃত্ব লাভ কোরল। পদত্যাগের অব্যবহিত পরেই সুভাষচন্দ্র বামসংহতির প্রচেষ্টা আরম্ভ কোরেছেন তাঁর 'ফরওয়ার্ড ব্লক' পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে।

'ফরওয়ার্ড ব্লক' কংগ্রেসের অভ্যন্তরে, কংগ্রেসের নীতি ও পদ্ধতি নিয়ে একটি নূতন সংহতি। 'ফরওয়ার্ড ব্লকের' বিশেষত্ব হোল যে কংগ্রেসের কার্যক্রমে নিয়মতান্ত্রিক মনোভাব নষ্ট কোরে, বৈপ্লবিক সম্ভাবনা সঞ্চার করা। 'ফরওয়ার্ড ব্লকের' নিজস্ব একটি কার্যক্রম থাকবে দেশকে স্বাধীনতার পথে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে।

সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগে কংগ্রেস নেতৃত্বে দক্ষিণাচারী মনোভাব সুস্পষ্ট হোয়ে উঠবার আশঙ্কা আছে, কংগ্রেস শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবার পর থেকে নিয়মতান্ত্রিক মনোভাব কংগ্রেসকে অক্টোপাশের মতো বেঁধে ফেলেছে, কংগ্রেসকে গতানুগতিক পাকচক্র থেকে উদ্ধার করতে হোলে সুভাষচন্দ্রের ভাষায় কার্য্যসূচীতে বৈপ্লবিক প্রাণশক্তি (revolutionary impulse) দেওয়া প্রয়োজন। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে ফেডারেশনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভই ফেডারেশন অগ্রহণীয় কোরে তুলেছে ; দক্ষিণপন্থীরাও ফেডারেশন নিরাপদে গ্রহণ করতে পারবে না, কংগ্রেসের প্রত্যেকটি কার্য্যসূচী সম্বন্ধে একথা খাটে, কংগ্রেস বৈপ্লবিক গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হলেই শুধু সঙ্কটের সুযোগ নেওয়া সম্ভব। দেশকে অবিলম্বে সংগ্রামশীল করা (prepare the country for the struggle)' ফরওয়ার্ড ব্লকের অন্যতম কাজ। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে

সমস্ত প্রগতিপন্থীদের গ্রহণীয় নিম্নতম কর্মপন্থা নিয়ে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' কাজ আরম্ভ কোরবে। ফরওয়ার্ড ব্লকের সাফল্য নির্ভর কোরবে অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি এই কর্মপন্থা কি ভাবে গ্রহণ কোরবে তার উপর।

মাঝদিয়া ট্রেন দুর্ঘটনা

ই. বি. রেলওয়ের এ ভয়াবহ লোকক্ষয়কর দুর্ঘটনা দেশবাসীর নিকট এক মর্মন্তুদ শেলের মত লেগেছে। শোকসন্তপ্ত পরিবারের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জানাবার মত ভাষা আমাদের নেই।

এ লাইনে হালসা ষ্টেশনে অনুরূপ দুর্ঘটনা কয়েক বছর পূর্বে হয়েছিল। কোন রেল-দুর্ঘটনা হলেই কর্তৃপক্ষের নিকট 'Sabotage' এর কথা শুনতে পাই। দুর্বৃত্তদ্বারা ফিস্ প্লেট অপসারণ, ইঞ্জিনের ভার সাম্য বিনষ্ট ও উৎকেন্দ্রিক গতি ইত্যাদি অনেক অভিনব আবিষ্কার রেল কর্তৃপক্ষ আজ পর্যন্ত করে আসছে; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কাহারও নিকট অবিদিত নয়। বিহিটা দুর্ঘটনার তদন্ত কমিটি ই. আই. রেলওয়ে কোম্পানীর দায়িত্বহীন কর্তব্য বোধের যে স্বচ্ছ স্বরূপ প্রকাশ করেছেন তাতে দেশবাসী বুঝেছে প্রকৃত গলদ কোথায়। আশা করি এবারের তদন্ত কমিটি নিজেদের নির্ভীক মতামত প্রকাশে কোন দ্বিধা বা দুর্বলতা দেখাবেন না।

গান্ধী-সেবাসঙ্ঘ

গান্ধী-সেবাসঙ্ঘের ৫ম বাৎসরিক অধিবেশন এবার বৃন্দাবনে হয়েছে। ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও দুর্নীতি সেবাসঙ্ঘের মত এমন সত্যনিষ্ঠ অনুষ্ঠানেও ঢুকেছে বলে মহাত্মার বিশ্বাস। বল্লভাচারী প্রমুখ বহু দক্ষিণপন্থী নেতা এখানে উপস্থিত ছিলেন। তাদের ভিতর অনেকে এ সেবাসঙ্ঘের সভ্য বা এর সাথে বিশেষ ভাবে যুক্ত। মহাত্মাজীর উক্তি শুনে দক্ষিণপন্থীদের নৈতিকনিষ্ঠা কিছু বৃদ্ধি পেলে কংগ্রেসে অনেক দুর্নীতির অবসান হ'ত। তাহলে গান্ধীজীর বার বার বোধ হয় কংগ্রেস'দুর্নীতি'র কথা বলতে হ'ত না। এত দিন আমরা মহাত্মার মুখে শুনে আসছি চড়কা অহিংসার প্রতীক্। অধিবেশনের বক্তৃতায় মহাত্মা এবার এর আরেক দিক দেখিয়েছেন। ভগবান্, ধর্ম ও অহিংস নীতিতে অনেকের তেমন আস্থা আজকাল দেখা যায় না। চড়কার উপর তাদের বিশ্বাস অটল থাকবে, কারণ ইহা হ'তে অন্ততঃ কিছু সুতো পাওয়া যায়। এ সুতোর জোরে সাধারণের বিশ্বাস আর কত দিন টিকবে?

আইনবহির্ভূত প্রদেশ

সাম্রাজ্যবাদের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র হ'লো ভেদনীতি। জগতের সর্বত্র এ কূটনীতির সাহায্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ টিকে আছে। এ জন্য এ দেশে বৃটিশ ভারত, ভারতীয় ভারত, মুসলিম ভারত, হিন্দুভারত ইত্যাদি সৃষ্টি করেও আমাদের শাসনকর্তাগণ নিশ্চিন্ত নয়। সে জন্য তারা নাতিসং

আদিম অধিবাসী, পার্বত্য ও অনুন্নত জাতিদের জন্য 'আইন বহির্ভূত প্রদেশ' (non-regulated province) সৃষ্টি করেছে। স্বাধীনতাপ্রিয় দুর্ধর্ষ পার্বত্যদের মধ্যে জাতীয় চেতনা আসলে বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদ বিশেষভাবে বিপদাপন্ন হ'বে। কাজেই বহির্ভূত প্রদেশ (Excluded Areas)-এর অস্তিত্ব রক্ষা ইংরেজের বিশেষ প্রয়োজন।

প্রফেসর রঙ্গের সভাপতিত্বে 'আইন বহির্ভূত প্রদেশ' সমূহের নিখিলভারত সমিতির এক কার্যকরী বৈঠক কলিকাতায় হয়েছে। গভর্ণমেণ্ট নীতির তীব্র প্রতিবাদ এবং এ সকল প্রদেশে অচিরে স্বৈরাচার বিলোপ করে যাতে স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তন হ'তে পারে তার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে। শুধু সাধু প্রস্তাবে স্থিতস্বার্থ বৃটিশ টলবে না, পিছনে যদি কোন শক্তি না থাকে। এ সকল অভিযোগকে বৃহত্তর আন্দোলনে পরিণত করতে পারলেই সে সম্ভাবনা আসে।

ডিগবয়ে গুলিবর্ষণ

১৮ই এপ্রিল ডিগবয় অয়েল কোম্পানীর শ্রমিকদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে তিন জন নিহত ও কুড়ি জন আহত হয়েছে। শ্রেণীস্বার্থের সংঘাতে শ্রমিক-আন্দোলন ক্রমেই ব্যাপক বিপ্লবাত্মক রূপ নিচ্ছে। ডিগবয়ের ধর্মঘট দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় চেতনারই খণ্ড প্রকাশ। 'Bolt and Butcher'-নীতি দ্বারা ইহা দমন করা যাবে, সাম্রাজ্যবাদী গভর্ণমেন্টের এরূপ বিশ্বাস মোটেই আশ্চর্যের নয়। ধর্মঘট সমাজতন্ত্রীদের প্ররোচনা-প্রসূত নয়। ইহা বর্তমান পুঁজিবাদের অমোঘ অর্থনৈতিক নিয়মের অবশ্যম্ভাবী ফল। কাজেই পুঁজিবাদের উচ্ছেদসাধন না হ'লে ইহা উত্তরোত্তর চলবে এবং শ্রেণীবিরোধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে শক্তি যোগাবে।

দক্ষিণ-কলিকাতা রাজনৈতিক সম্মেলন

সভাপতি নরীম্যান তাঁহার অভিভাষণে প্রগতিপন্থী রাজনৈতিক কর্ম্মীদের মনোভাব ও চিন্তাধারা অনেকখানি প্রকাশ করেছেন। গান্ধীজীকে সম্মুখে রেখে বল্লভাচারীর দল কংগ্রেসকে একটি 'ফ্যাসিষ্ট গ্র্যাণ্ড কাউন্সিল'এ রূপান্তরিত করেছেন। ফলে বৈপ্লবিক গণপ্রতিষ্ঠান দিন দিন নিয়মতান্ত্রিক নিরাপত্তায় আত্মবিক্রয় করছে। ইহার বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গঠন ও দক্ষিণপন্থীদের স্বৈরাচার প্রতিহত না হ'লে কংগ্রেসের এ আভ্যন্তরিণ বিষাক্ত আবহাওয়ায় কোন বিপ্লবাত্মক গণ-আন্দোলন সম্ভব নয়। সভাপতির দৃঢ়, সুস্পষ্ট সমালোচনা কংগ্রেসের বর্তমান সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় অনেকখানি আলোক সম্পাত করবে, আমরা নিঃসন্দেহ।

রাজনৈতিক বন্দিনী মুক্তি

সুদীর্ঘ কারাযন্ত্রণা ও দুঃখদহনের পর বাঙ্গলার রাজনৈতিক বন্দিনীগণ একে একে সব মুক্তিলাভ করেছেন। জনমতের চাপে সরকারী চণ্ডনীতির কবল হতে এক'জন দেশসেবিকা রক্ষা

পেল, ইহা অতীব সুখের বিষয়। জীবনের প্রারম্ভে যে অবিচলিত আদর্শানুরাগ ও কর্মনিষ্ঠা এদের উদ্‌বুদ্ধ করেছিল, কারাপ্রাচীরের নির্মম কঠোরতা ইহা স্পর্শ করতে পারে নেই। নূতন আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে এরা আবার দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করবে নিঃসন্দেহ। আমরা মুক্ত বন্দিনীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সর্বসম্মতিক্রমে পুনরায় আগামী বছরের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, বাঙ্গলার কংগ্রেস কর্মীদের তাঁর উপর সম্পূর্ণ আস্থা আছে এ নির্বাচনে ইহারই সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্য, কর্মকর্তা ও হিসাবপরীক্ষক ইত্যাদি মনোনয়নের ভারও প্রাদেশিক সমিতি সুভাষচন্দ্রের উপর ন্যস্ত করেছিল। বাঙ্গলার কংগ্রেস প্রতিনিধিগণ সুভাষ বাবুর নেতৃত্বে আস্থাশীল নিঃসন্দেহ।

কর্পোরেশনে মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্বাচন

শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন ও প্রিন্স ইউসুফ মির্জা যথাক্রমে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও ডেপুটী মেয়র হয়েছেন। সুভাষচন্দ্রের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে তাঁহারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। এ নির্বাচনে যে শুধু কংগ্রেস জয়ী হয়েছে তা নয়, কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েসনের ঐক্য অন্ততঃ এ ব্যাপারে অনেকটা প্রমাণিত হয়েছে। কর্পোরেশনের কার্য্যনির্বাহে কংগ্রেস আদর্শ অক্ষুণ্ন থাক্‌লেই এ নির্বাচন সার্থক হবে।

যুদ্ধ বিরোধী দিবস

গত ২৩শে এপ্রিল ভারতের সর্বত্র নিখিল ভারত যুদ্ধ বিরোধী দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। সাম্রাজ্যলিপ্সু ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিতে অতি দ্রুত সমরায়োজন চলছে। আসন্ন যুদ্ধে ভারত অর্থবল ও লোকবল দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে সাহায্য করবে না। ফৈজপুর, হরিপুর ও ত্রিপুরী কংগ্রেসে গৃহীত যুদ্ধবিরোধী প্রস্তাবগুলির পিছনে জনমত কত প্রবল ও জাগ্রত ২৩শে এপ্রিল দেশব্যাপী যুদ্ধবিরতি অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছে।

মে দিবস

১লা মে লাঞ্ছিত, দলিত সর্বহারাদের মুক্তি সংগ্রামে এক বিশেষ দিন। ১৮৮৯ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রথম অধিবেশনে বিশ্বশ্রমিকদের রাজনৈতিক অধিকার ও দৈনিক আটঘণ্টা কাজের দাবী বলবৎ করতে ১৮৯০ সালের ১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস বলে ঘোষিত হয়। ফরাসী বিপ্লবের ফলে উক্ত তারিখে অত্যাচার ও অত্যাচারীর প্রতীকস্বরূপ বেষ্টিল দুর্গের পতন হয়ে

সর্বহারাদের বিজয় অভিযান সুরু হয়। ১৮৮৩ সালে আমেরিকার শিকাগোতে শ্রমিকগণ বেষ্টিলপতন দিবস উদ্‌যাপন ও নিজেদের দাবী জানাতে গিয়ে হে মার্কেটে পুলিশের গুলিবর্ষণে বহু নিহত হয়। স্বাধীনতা-সংগ্রামে শ্রমিকদের আত্মত্যাগ ও অগ্রগামিতাকে স্মরণীয় করার জন্য দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ১লা মে তারিখকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস বলে ঘোষণা করে। এর পর প্রতি বছর সাড়া পৃথিবীর শোষিত, নির্যাতিত, সর্বহারার দল 'মে দিবস' পালন করে আস্‌ছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে 'মে দিবস' উদ্‌যাপন, পৃথিবীর সমস্ত কিষাণ ও শ্রমিকের সাথে গভীর সৌহার্দ্য এবং তাদের বৈপ্লবিক অভিযানে আস্থা ও বিশ্বাস জ্ঞাপন করছে।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মেলন

কলিকাতা বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশনে মূল সভাপতি শ্রদ্ধেয় আব্দুল করীম সাহেবের অভিভাষণ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। উদার মত ও জাতীয়তার আদর্শে অভিভাষণটি পূর্বাপর রঞ্জিত। সাহিত্য জাতিধর্ম্মের গণ্ডি মানে না এবং সব সময়ই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সৃষ্ট হয়। সাহিত্যের সর্বজনীনতা 'মসজিদ ও মন্দিরে সমভাবে প্রতিফলিত হইতে পারে। মসজিদ ও মন্দির সৌন্দর্য্যপ্রকাশের স্বচ্ছ আধার মাত্র। এজন্যই উভয়ের মধ্য দিয়া সর্বজনীন সৌন্দর্য্য শুধু বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রকাশিত হয়। আধারের গঠন-ভঙ্গীর তারতম্যে আধেয় পবিবর্ত্তিত হয়, একথা স্বীকার করিতে বাধে।'

মুসলমান সাহিত্যিকদের লক্ষ্য করে বলেছেন 'একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, মুসলমানেরা আপন জাতীয়, ধর্মীয়, সংস্কৃতি ও সভ্যতাগত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য লইয়া বাঙ্গালা ভাষার সেবা করিলে বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য অপ্রতুল ও অনুপমেয় মূর্ত্তি ধারণ করিবে।'

আমরা আশা করি সুযোগ্য সভাপতির কালোপযোগী সুচিন্তিত অভিভাষণটি শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে বিশেষ সমাদৃত হবে।

তুলোর উপর শুল্ক ও বাংলার মিল

কেন্দ্রীয় পরিষদের বাজেট-ঘাটতি মেটাবার জন্যে বিদেশ থেকে আমদানী সরু ও লম্বা আঁশ-বিশিষ্ট তুলোর ওপর পূর্বনির্দিষ্ট ট্যাক্সের পরিমাণ দ্বিগুণ করা হয়েছে। সর্বভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বাজেটের এই ট্যাক্স-বৃদ্ধির প্রস্তাব যে অসঙ্গত ও অসমর্থনীয় তা আমরা গত মাসে বাজেট-সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলেছি। কিন্তু এই বহুনিন্দিত ও জন-প্রতিনিধিগণের দ্বারা অগ্রাহ্য প্রস্তাব বাংলাদেশের বস্ত্র-শিল্পের যে কি অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করবে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা সমীচীন মনে করি। ট্যারিফ বোর্ডের সুপারিশের সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলা দেশের কলসমূহ গতানুগতিক ভাবে বস্ত্রোৎপাদনের পথ ছেড়ে মিহি সুতোর নানা প্রকারের উন্নত ধরণের শিল্পের দিকে মনোনিবেশ করে এবং এ কারণে মিশর, পূর্ব-আফ্রিকা এবং আমেরিকা থেকে উপযোগী তুলো আমদানী করতে থাকে। কারণ যে ধরণের কাপড় বাংলাদেশে তৈরী হয় এবং অনুরূপ যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা আ:

তাঁতে দেশী মোটা ও ছোট আঁশের তুলোর ব্যবহার চলে না। লব্ধপ্রতিষ্ঠ পশ্চিম-ভারতীয় কল-সমূহের তুলনায় বাংলা দেশের এই ব্যাপারে কিঞ্চিৎ আপেক্ষিক সুবিধাও ছিলো। হাতের কাছে তুলো পাওয়াতে মোটা কাপড়ের উৎপাদন ব্যয় বোম্বাই মিলের অপেক্ষাকৃত কম এবং প্রতিযোগিতায় বাংলার শিশু-শিল্প হেরে যেতে বাধ্য ছিলো। কিন্তু সরু সুতোর কাপড়ের বেলায় কাঁচা মালের সান্নিধ্যের সুবিধা মিলে না বলে অসম প্রতিযোগিতায় বাংলা-মিলকে বাজার থেকে হটানো সম্ভব ছিলো না কারণ বাইরে থেকে যে সব তুলো আসে তার দাম সমস্ত বন্দরে—সে বোম্বাই হোক আর কলকাতাই হোক—প্রায় সমান।

নূতন ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্যচুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার মিলের আসন্ন দুরবস্থার কথা আলোচনা করা যাক। হিসেব করে দেখা গেছে ট্যাক্স-বৃদ্ধির জন্যে সরু সুতোর উৎপাদন মূল্য শতকরা ৮৲ এবং সরু বস্ত্রের মূল্য শতকরা ৪৲ হারে বেড়ে যাবে। এমনিতেই যন্ত্রপাতির ওপর ট্যাক্স, শ্রমিকের ভাতা, আয়কর, স্থানীয় ট্যাক্স ইত্যাদি খাতে বর্ধিত ব্যয় একত্র মিলে বস্ত্রশিল্পের জন্য নির্ধারিত সংরক্ষণ শুল্ককে অর্থহীন করে দিয়েছে—বিশেষ করে ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্যচুক্তির সর্ত অনুসারে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল—ছোট, নতুন এবং সরু সুতোর ওপর নির্ভরশীল বাংলার মিলসমূহ প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হ'য়ে কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হ'বে। আরও একটা ভয়ের কথা এখানে বলে রাখা দরকার, সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে যে, আমেরিকা প্রতি পাউণ্ডে ১½ থেকে ২ সেণ্ট পর্য্যন্ত রপ্তানী ভাতা (subsidy) দিয়ে তার তুলো বিক্রয় করবার ব্যবস্থা করবে। এর ফল এই দাঁড়াবে যে এই ব্যবস্থার সুবিধা নিয়ে জাপান অপ্রত্যাশিত কম মূল্যে সরু সুতোর জিনিষ দিয়ে ভারতীয় বাজার ছেয়ে ফেলবে। তখন বোম্বাই মিলের অপেক্ষাকৃত এক চেটিয়া মোটা কাপড়ের বাজার থাকবে অপরিবর্তিত কিন্তু বাংলা-মিলের কারবার গুটানো ছাড়া আর গত্যন্তর থাকবে না।

প্রাদেশিকতার অপবাদ মাথায় নিয়েও আজ প্রয়োজন হয়েছে বাঙালীর বেঁচে থাকবার। তাই আজ তার ঘোর দুর্দিনে আমরা বাংলার অধিবাসীদিগের কাছে আবেদন জানাতে চাই, এই ব'লে যে, তাদের সর্বাঙ্গীন সহানুভূতি ছাড়া বাংলার এই শিশু-শিল্পের অস্তিত্ব বজায় থাকবে না এটুকু যেন তারা ভুলেন না। মিল-মালিকদের কাছে আমাদের অনুরোধ তারা যেন শুধু দেশবাসীর সানুগ্রহ দৃষ্টির দিকে চেয়ে না থাকেন। ব্যাপকভাবে সরু তুলোর চাষ সম্বন্ধে গবেষণার সফলতার উপরই তাদের ভবিষ্যত নির্ভর করে।

ডানজিগ

রুজভেল্টের আন্তর্জাতিক স্বস্ত্যয়ন প্রচেষ্টার সমর্থন করে চেম্বারলেনী নীতিদুরস্ত ব্রিটেন কিছু নতুন কীর্তি দেখায় নি। কিন্তু সমরশিক্ষা বাধ্যতামূলক করবার আয়োজন করে সে হিট্‌লার-মুসোলিনীকেও ভাবিয়ে তুলেছে। ডানজিগের ওপর হিট্‌লারের নজর দেখে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে ব্রিটেন মৈত্রীস্থাপন করলো—হিটলার পাল্টা জবাব দিলেন ইংরাজের সঙ্গে তার নৌ-চুক্তি ও

পোলাণ্ডের সঙ্গে সখ্য প্রত্যাখ্যান করে। ইংরাজের বিরুদ্ধে নালিশ যে তারা শুধু জার্মানীকে জব্দ করবার মৎলবে আছে। পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে নালিশ—প্রথমতঃ জার্মানীর সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাকা সত্বেও সে ইংরাজের গ্যারান্টি স্বীকার করলো—দ্বিতীয়তঃ জাতিসঙ্ঘ শাসিত পোলবন্দর ডানজিগ সে জার্মান সাম্রাজ্যের হাতে ছেড়ে দিতে রাজি নয়।

ডানজিগ গ্রাসের যে সর্ত হিট্‌লার দিয়েছিলেন—তাঁর মতে ইউরোপীয় শান্তিরক্ষার জন্যে এর চেয়ে বড়ো স্বার্থত্যাগ আর হয় না।—"the greatest imaginable concession in the interest of Europein peace". জার্মাণ সাম্রাজ্যে ডানজিগ একটা স্বাধীন নগরী হয়ে থাকবে এবং পোল করিডরএর ভেতর দিয়ে এই বন্দের পর্য্যন্ত যাবে জার্মান রেলপথ তার ওপর থাকবে, জার্মান রাষ্ট্রীয় অধিকার। এর পরিবর্তে ডানজিগে পোলাণ্ডের আর্থিক অধিকার স্বীকৃত হবে। পোলাণ্ডের সীমান্ত অক্ষয় থাকবে এবং পঁচিশ বৎসরের জন্য পোলাণ্ড ভোগ করবে শান্তির চুক্তি।

শান্তিরক্ষার জন্যে এত বড়ো 'স্বার্থত্যাগে' পোলাণ্ড ভুললো না কেন? কারণ জার্মাণ-পোলিশ মৈত্রীর সর্তে এপ্রকার স্বার্থত্যাগের কথা ছিল না। কর্ণেল বেক জবাব দিলেন—বাল্‌টিকে যাবার পথ আমরা রুদ্ধ হতে দেবো না আর করিডরে আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার ক্ষুণ্ণ করবারও কোন কারন ঘটে নি। ডানজিগে জার্মানজাতি সংখ্যাধিক কিন্তু তাদের সমৃদ্ধি নির্ভর করছে সম্পূর্ণ পোল বহির্বাণিজ্যের ওপর। ডানজিগ তার অস্তিত্বের জন্যে পোল জলপথ ও রেলপথের কাছে ঋণী।

হিট্‌লার দমলেন। এতটা দৃঢ়তা পোলদের কাছে আশা করা যায় নি। ইংরাজ ও ফরাসী পোলদের রক্ষণসর্তে আবদ্ধ; কিন্তু এতদূর অগ্রসর হয়ে আর ফেরা যায় না। ডানজিগের নাৎসীনেতা Goerster ও ডানজিগ্‌ রাষ্ট্রপতি Gricernএর সঙ্গে তাঁর গুপ্ত পরামর্শ চলছে—চেকনিপাতপর্বে হেনলাইন ও ফ্রাঙ্কোর যে ভূমিকা ছিলো এখানেও তাঁরা তাই অভিনয় করেছেন। বাডেন বাডেন-এ মিউনিক চক্রান্তের পুনরায়োজন চলছে। আশঙ্কা ঘন হয়ে উঠ্‌ছে যে পোলাণ্ডকে বিস্মিত চকিত করে এবং ইংরাজ-ফরাসীর কুম্ভীরাশ্রু মারিয়ে হয়ত ডানজিগ নিজেই সম্মোহিত শিকারের মত স্বস্তিকার মুখবিবরে প্রবেশ করবে।

আক্রমণ বিরোধী সংহতি

হয়ত এঘটনা এতদিনে হয়েও যেতো—যদি না সোভিয়েট গণতন্ত্র এক নতুন প্রস্তাব এনে হাজির করতো। ইঙ্গফরাসী-রুষ সামরিক সন্ধি পাতিয়ে সোভিয়েট এক আক্রমণ-বিরোধী সংহতির ভিত্তি স্থাপন করতে চেয়েছে। পোলাণ্ড এবং রুমানিয়াই ইঙ্গফরাসী রক্ষণসর্তে সোভিয়েট যোগ দেবে এবং হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও সুইজারল্যাণ্ড আক্রান্ত হলে ব্রিটেন ও ফরাসীকে সাহায্য করা যাবে। এর বিনিময়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্স লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও এস্থোনিয়া এই বল্‌টিক গুলির রক্ষণসর্তে আবদ্ধ হবে।

বিক্ষুব্ধ জলাশয়ে জলস্পর্শ না করে মাছধরার নীতিতে অভ্যস্ত ব্রিটেন এত বড় সাংঘাতিক একটা প্রস্তাবে একটু ভয় পেয়ে গেছে। সামরিক সন্ধির বাঁধাবাঁধির মধ্যে যেতে সে ইতস্তত করছে : এবং বলছে এমন কতগুলো শপথ করলে হয় না যাতে বাল্‌টিক ও বালকান প্রতিবেশীরা আক্রান্ত হ'লে সোভিয়েট সহায্যে আসবে আর পশ্চাৎ থেকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স শত্রুপক্ষের চাপ যথাসম্ভব হ্রাস করতে চেষ্টা পাবে। সোভিয়েট বলছে ত্রিশক্তির একটা খোলাখুলি সামরিক মৈত্রী না হলে রোমবার্লিন এক্সিসকে ভড়কানো যাবেনা।

এক্‌সিসের পররাষ্ট্রনীতি

ইঙ্গ-সোভিয়েট সংযোগ রোধ করতে এক্সিস যে চাল চেলেছে তা চেম্বারলেন ও রক্ষণশীল দলের বোধগম্য হয় নি। চেম্বারলেন ভাবছেন বিপন্ন সোভিয়েটের সঙ্গে সন্ধি করলে অনর্থক একটী সঙ্কটে জড়িয়ে পড়তে হবে তার চেয়ে পোলাণ্ড, রুমানিয়া ইত্যাদির ছোট খাটো রাষ্ট্রগুলির ওপর একটা গ্যারান্টির শপথ নেওয়া ভালো—যা আপৎকালে—অষ্ট্রিয়া ও চেকের ক্ষেত্রে যেমন, নিঃসঙ্কোচে অমান্য করা যেতে পারে। এই চেম্বারলেনী মনোবৃত্তির সুযোগ নিয়ে হিট্‌লার-মুসোলিনী সোভিয়েট ও ব্রিটেনের ব্যবধান জড়িয়ে তুলছে। চেকরাষ্ট্র দখল করে জার্মানী হাঙ্গেরীকে এবং আলবানিয়া জয় করে ইটালী যুগোশ্লাভিয়াকে এক্সিসের চক্রে এনেছে। পোলাণ্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রীস এদের এখন আর শক্তিমান প্রতিবেশীদের তোয়াজ না করে উপায় নেই—আত্মরক্ষার জন্যেও অস্ত্রধারণ তাদের পক্ষে কঠিন। সর্বনাশের সম্মুখে দাঁড়িয়ে অর্ধেক ত্যাগ করতে তারা প্রস্তুত। ব্রিটেনের গ্যারান্টি নীতি তাই স্রোতের মুখে বালির বাঁধের মত ভেঙ্গে যাচ্ছে।

চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে জার্মানী তাকাচ্ছে উক্রেইনের দিকে, ডোডিকানিস্ দ্বীপ থেকে ইটালী তাকাচ্ছে ড্যার্ডেনলিসের দিকে। হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ডকে নিঃশঙ্ক রেখে এক্সিস তার রথ চালিয়েছে পূর্বাভিমুখে। সেভিয়েটকে যত বিপন্ন করা যায়।

এই চাল না চাললে চেম্বারলিনী নীতি এতদিন ব্রিটেনে ভূমিসাৎ হতো। এই চালে শঙ্কিত হয়ে ফ্রান্সও সুয়েজ খাল ও টিউনিস্ সম্পর্কে ইটালীর সঙ্গে রফা করেছে। আক্রমণ বিরোধী সংহতি তাই পিপাসুর কাছ থেকে মরুভূমির মরিচীকার মতো অবিরাম দূরে সরে যাচ্ছে।

রুজভেল্টের বাণী

প্যান-আমেরিকান ইউনিয়নকে সম্বোধন করে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এক ঘোষণা দিয়েছেন ইয়োরোপে সমর সঙ্কট উপস্থিত হলে মার্কিন জাতি কি করবে। বিশ্বে শান্তি ও মৈত্রী সংস্থাপনের মহৎ অবশ্য যুক্ত রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করবে না। বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক আমেরিকার আন্তর্জাতিক স্বার্থ রয়ে গেছে, কাজেই ভাববাদী উড্র উইল্‌সনের অনাবিল শান্তি ও মৈত্রীর ভূয়া কল্পনায়

কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ রুজভেল্ট কখনই প্রণোদিত হবে না। "আন্তর্জাতিক ব্যাপারে আমাদেরও একটি স্বার্থ সঙ্কটাপন্ন। (we too have a stake in world affairs)। এ স্বার্থটি হচ্ছে পরাধীন দেশগুলিতে অবাধ বাণিজ্য ও অর্থমোক্ষণের (exploitation)। রোম—বার্লিন—জাপান অক্ষদণ্ড (Rome—Berlin—Japan axis)এর প্রভাবে সে স্বার্থে আঘাত পড়েছে। ফলে জাতীয়তার নাম দিয়ে আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিকে সংহত করার প্রচেষ্টা রুজভেল্ট করেন। আমেরিকা আমেরিকাবাসীদের এ Monroe doctrine—আবার নতুন ভাবে দেখা দিল রুজভেল্ট প্রণোদিত লিমা কনফারেন্সের রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও বৃহত্তর আমেরিকাবাদে (Pan-Americanism)। ঐ রাষ্ট্রগুলিকে আরো সুসংহত করার জন্য রুজভেল্ট বলেছেন জাতি সঙ্ঘের আদর্শ ইউরোপের আত্মঘাতী মহাসমর হতে আমেরিকাকে রক্ষা করবে। এ রাষ্ট্র-সংহতিতে আমেরিকায় যে শান্তি উৎসব করছি, তা দুর্বলতা প্রসূত নয়। আমাদের শাসনতন্ত্র অথবা সঙ্ঘভুক্ত কোন রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য সঙ্কটাপন্ন হলে সশস্ত্র শক্তি দ্বারা তা প্রতিরোধ করব। বাহির হতে অর্থনৈতিক চাপ দিলে আমরাও তার প্রত্যুত্তর দিব'। নতুন গোলার্দ্ধে শান্তি রক্ষার এ মহৎ প্রয়াস (the noblest defence of peace in our hemisphere) রুজভেল্ট করতেছেন পুঁজিবাদীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য। শান্তি ও মৈত্রীর উদ্দেশ্যে নয়।

লিটভিনফের পদত্যাগ (পদচ্যুতি?)

মস্কোর রয়টর সংবাদদাতা জানিয়েছেন, লিটভিনফ স্বেচ্ছায় সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্র সচিবের পদ হতে অবসর নিয়েছেন। মলোটোভ তার কার্যভার গ্রহণ করেছেন। লিটভিনফের পদত্যাগে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে তার পিছনে অন্য কিছু আছে কিনা? পররাষ্ট্রনীতিতে লিটভিনফ অদ্বিতীয়। তাঁর কূটনীতির প্রভাবে সোভিয়েট রাশিয়ার অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান এবং বহু রাষ্ট্র ধুরন্ধরের চালবাজি ব্যর্থ হয়। ফ্রান্স সোভিয়েট অনাক্রমণ চুক্তি, রাষ্ট্রসঙ্ঘে ধনতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের মধ্যে অর্থনৈতিক বিরোধিতা স্থগিত, নিরস্ত্র বৈঠক প্রভৃতিতে রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির মর্যাদা লিটভিনফ যেরূপ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, তাতে তাঁর পদত্যাগ সম্বন্ধে গুরুত্ব আরোপ করা স্বাভাবিক। কিছুদিন পূর্ব্ব হতেই লিটভিনফ ষ্টালিনের অসন্তোষভাজন হয়েছেন বলে খবর রটছে। নূতন পররাষ্ট্র সচিব মলোটোভ আবার ষ্টালিনের বিশেষ প্রিয়পাত্র। সোভিয়েট রাশিয়া নানা বহিঃসঙ্কটের সম্মুখীন। পররাষ্ট্রনীতির উপর এ সঙ্কটের অনেকখানি নির্ভর করে। এ অবস্থায় লিটভিনফের মত রাষ্ট্র ধুরন্ধরের পদত্যাগে ট্রট্স্কাইজমের গন্ধ আছে কিনা কে জানে!